তলস্তয় উপন্যাসসমগ্র

(চতুর্থ খণ্ড)

লেভ্ নিকোলায়েভিচ তলস্তয়

অনুবাদ

মণীন্দ্র দত্ত

তুলি-কলম

১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ: ১৩৬৬

প্রকাশক: কল্যাণব্রত দত্ত
॥ তুলি-কলম ॥
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক: সুমঙ্গল রায় ॥ আদর্শ প্রেস ॥
৭, গিরীশ বিদ্যারত্ন লেন, কলকাতা-১১

উৎসর্গ

-মার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে-

TOLSTOY UPANYASSAMAGRA

VOL IV

Translated by Manindra Dutta

Price Rupees Fifty Only.

সূচীপত্র

ভূমিকা

"তলস্তয় উপন্যাসসমগ্র" চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হল। এই সঙ্গে বাংলা ভাষায় তলস্তয়-সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটল। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ "তলস্তয় গল্পসমগ্র" পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। এই খণ্ডটি প্রকাশের সঙ্গেই "তলস্তয় উপন্যাসসমগ্র" সিরিজও সমাপ্ত হল।

পাঁচ বছরেরও অধিক কাল আগে এই দুঃসাহসিক ভাষান্তর-কর্মের ভার যেদিন স্বেচ্ছায় শিরোধার্য করেছিলাম একান্ত আগ্রহ ও উৎসাহ সত্ত্বেও সেদিন মনে দ্বিধা-সংকোচের অন্ত ছিল না। রুশ সাহিত্যের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক লেভ্ তলস্তয়ের গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তুর অপার বৈচিত্র্য, পটভূমিকার সীমাহীন বিস্তার ও ব্যাপ্তি, এবং রচনার দ্বিতীয়রহিত দৈর্ঘ্য ও বিশালতাই দ্বিধা ও সংকোচের অন্যতম প্রধান কারণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এই সিরিজের অন্তর্ভুক্ত "সংগ্রাম ও শান্তি" (War and Peace) উপন্যাসটি অদ্যাবধি পৃথিবীর দীর্ঘতম উপন্যাসরূপে চিহ্নিত। তাই সেদিন অকপটেই লিখেছিলাম: " তলস্তয় উপন্যাসসমগ্র" প্রকাশ করে বাংলা ভাষায় তলস্তয় সাহিত্যের ত্রিপাদ-ভূমি পরিক্রমা সম্পূর্ণ করার বাসনা রইল। জানি না সে দুঃসাহসিক স্বপ্ন সফল হবে কিনা; শুধু জানি, স্বপ্ন মৃত্যুহীন।" সেদিন থেকে নানাবিধ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে, বয়সের ভার এবং রোগ-জর্জর দেহের দুর্বলতা ও ভয়ংকর আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রতিকূলতাকে পার হয়ে, অক্লান্ত অধ্যবসায় ও নিরলস শ্রমে স্থিরলক্ষ্যে অবিচল থেকে দিনের পর দিন একটু একটু করে অগ্রসর হয়ে দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার পরে আমার স্বপ্ন-তরণীকে আজ সফল বাস্তবের কূলে পৌছে দিতে পেরেছি। আর এই ভেবে আত্ম-সন্তোষ ও গর্ববোধ করছি যে, ঋষি তলস্তয়ের অমর সাহিত্যের বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের গুরুদায়িত্ব ও দুর্লভ সৌভাগ্য আমার মত একজন সাধারণ সাহিত্যসেবীর উপর ন্যস্ত হয়েছে, আর সে দায়িত্ব সাধ্যমত পালন করতে পেরেছি এই প্রসঙ্গে একথাও অবশ্য স্মরণীয় যে বিশিষ্ট প্রকাশন-সংস্থা "তুলি কলম"-এর কর্ণধার শ্রীমান কল্যাণব্রত বাংলা ভাষায় এই ব্যয়-বহুল গ্রন্থরাজী প্রথম প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করে বিরাট আর্থিক ঝুঁকি ও পরিশ্রমের দায় মাথায় নিয়েছিল এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তাকে শেষ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে এসেছে। তার এই অকৃত্রিম সাহিত্যপ্রীতি ও মানসিক দুঃসাহস সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

পরিশেষে, অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই সেই সব শুভানুধ্যায়ী

পাঠক-পাঠিকা ও আত্মীয়-বন্ধুদের যাঁরা নানা পর্যায়ে নানাভাবে এই অসাধ্য সাধনের ব্রতে আমাকে সাহায্য করেছেন। গ্রন্থ-প্রকাশের শুভক্ষণে আরও কামনা করি, দীর্ঘদিনের সব শ্রম সার্থক হোক, সকলের প্রত্যাশা পরিতৃপ্ত হোক, আমার স্বপ্ন সফল হোক। ইতি

শ্রীম

অগস্ট, ১৯৫৯
॥ সুদর্শন ॥
৭৮/১২, আর. কে. চ্যাটার্জি রোড,
কলকাতা-৪২

নবজন্ম

RESURRECTION

তখন পিটার এসে তাকে বলল, প্রভু, আমার ভাই কতবার আমার বিরুদ্ধে অন্যায় করলেও আমি তাকে ক্ষমা করব? সাত বার পর্যন্ত কি? যীশু তাকে বলল, আমি তোমাকে বলছি না, সাত বার পর্যন্ত: বরং সত্তর গুণিত সাতবার পর্যন্ত।'

—ম্যাথু।১৮।২১-২২

প্রথম খণ্ড

'তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ রয়েছে সেটাকে না দেখে তোমার ভাইয়ের চোখের ধুলিকণার দিকে নজর দিচ্ছ কেন?—ম্যাথু।৭।৩

'তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ সেই সর্বপ্রথম মেয়েটির গায়ে প্রস্তর নিক্ষেপ করুক'।—জন।৮।৭

'শিষ্য গুরু অপেক্ষা বড় নয়: কিন্তু প্রতিটি মানুষ পূর্ণতা অর্জন করলেই নিজের গুরু হয়ে উঠবে।'—লিউক।৬।৪০

* * *

অধ্যায়—১

হাজার হাজার মানুষ যে ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের উপর ভীড় করে আছে তাকেই বিকৃত করতে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে: পাথর দিয়ে মাটিকে বেঁধেছে, প্রতিটি তৃণাঙ্কুরকে চেঁছে মুছে দিয়েছে; গাছের ডাল কেটেছে, পশু-পাখিদের তাড়িয়েছে, নাফ্থা ও কয়লার ধোঁয়ায় বাতাসকে ভরে তুলেছে,—তথাপি বসন্তকাল টিকে আছে, এমন কি শহরেও টিকে আছে।

সূর্য আতপ্ত কিরণ ছড়াচ্ছে, বাতাস সুরভিত, আর যেখানে একেবারে চেঁছে ফেলা হয় নি সেখানেই ঘাসেরা মাথা তুলেছে: পাথরের খাঁজে খাঁজে আর রাজপথের পাশের ছোট ছোট লনে। বার্চ, পপলার আর বুনো চেরি গাছগুলোতে চটচটে সুগন্ধি পাতা গজিয়েছে, লেবু গাছের ফুটন্ত কুঁড়িগুলো বাড়তে শুরু করেছে; কাক, চড়ুই আর কবুতরের দল বসন্তের আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে বাসা বুনতে লেগে গেছে; সূর্যের কিরণে শরীর উষ্ণ হওয়ায় মৌমাছিরা দেয়াল

জুড়ে গুন গুন করে ফিরছে। সকলেই খুশি: গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি পোকা-মাকড়, মায় শিশুরা। কিন্তু মানুষরা, বয়স্ক নরনারীরা, নিজেদের ও পরস্পরকে ঠকানোর ও কষ্ট দেওয়ার স্বভাব ছাড়ে নি। বসন্তকালের এই সকাল বেলাটাকেও তারা পবিত্রভাবে গ্রহণ করতে পারে নি; সকল প্রাণীর আনন্দে নিবেদিত ঈশ্বরসৃষ্ট এই জগতের সৌন্দর্য, যে সৌন্দর্য মনকে শান্তি, মিলন ও প্রেমের পথে টেনে নেয়, তার কথা চিন্তা না করে মানুষরা ভাবে শুধু একে অপরকে মেরে উপরে উঠবার নিজ নিজ কৌশলের কথা।

এইভাবে জেলা-শহরের কারা-কার্যালয়েও নরনারী ও পশু-পাখিদের এই পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ বসন্তের রমণীয়তায় ও আনন্দে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান করা হয়নি; বরং আগের দিন নম্বর-মারা ও কিছু বাড়তি মন্তব্য সম্বলিত যে বিজ্ঞপ্তিটা এসেছে তাতে বলা হয়েছে যে আজ ২৮শে এপ্রিল সকাল ন'টায় কারাগারে আটক তিনজন বন্দীকে—তাদের একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক (তাদের মধ্যে যে স্ত্রীলোকটি প্রধান আসামী তাকে আলাদা করে নেওয়া হবে)—আদালতে উপস্থিত করা হবে। তদনুসারে এখন ২৮শে এপ্রিল সকাল আট ঘটিকায় চিফ জেলার কারাগারের মেয়েদের অংশের অন্ধকার, দুর্গন্ধময় করিডরে প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক সেখানে হাজির হল; তার মাথায় কোঁকড়ানো পাকা চুল, মুখে যন্ত্রণার ছাপ। তার পরিধানের জ্যাকেটের আস্তিনে সোনালী ফিতে বসানো, কোমরে একটি নীল পাড়-বসানো বন্ধনী আঁটা।

জেলার সশব্দে লোহার তালায় চাবি ঘুরিয়ে সেলের দরজাটা খুলে ফেলল। ভিতর থেকে যে বাতাসের ঝাপ্টাটা এল সেটা করিডরের বাতাসের চাইতেও দুর্গন্ধময়। 'মাসলভা! আদালতে চল!' বলে ডাক দিয়ে কারাধ্যক্ষ আবার দরজাটা বন্ধ করে দিল।

কারাগারের প্রাঙ্গণের বাতাসে ভেসে আসছিল খোলা মাঠের তাজা সঞ্জীবনী হাওয়া। কিন্তু করিডরের বাতাসে বোঝাই হয়ে আছে টাইফয়েডের জীবাণু আর নর্দমা, মলমূত্র ও আলকাতরার গন্ধ। যে কেউ এখানে নতুন আসে সেই কষ্টে ভেঙে পড়ে। খারাপ বাতাসে অভ্যস্ত হলেও এই দুর্গন্ধ নারী-ওয়ার্ডারের নাকেও লাগল। এইমাত্র সে বাইরে থেকে এসেছে; করিডরে ঢুকতেই সে কেমন যেন শান্ত ও ঘুম-ঘুম বোধ করল।

সেলের ভিতর থেকে খস্‌খস্ আওয়াজ, স্ত্রীলোকের কণ্ঠ ও মেঝেতে খালি পায়ের শব্দ শোনা গেল।

কারারক্ষী হাঁক দিল, 'কইরে, জলদি কর্!' দু'এক মিনিটের মধ্যেই একটি ছোটখাট সুদেহী তরুণী দ্রুতপায়ে দরজা পেরিয়ে জেলারের কাছে হাজির হল। তার পরনে সাদা জ্যাকেট ও পেটিকোটের উপর একটা ধূসর আলখাল্লা। পায়ে সুতির মোজা আর কয়েদীদের জুতো; মাথায় জড়ানো একখানি

সাদা রুমাল, আর তার নীচ দিয়ে কয়েকগুচ্ছ কালো চুল ইচ্ছাকৃতভাবেই কপালের উপর চেপে বসানো হয়েছে। স্ত্রীলোকটির মুখের রং সেই ধরনের সাদা যেটা দীর্ঘদিন আটক-থাকা মানুষের মুখে দেখা যায়, বা যা দেখলে মাটির নীচের ঘরে রাখা আলুর নবোদ্গত অঙ্কুরের কথা মনে আসে। তার ছোট চওড়া দু'খানি হাতে এবং আলখাল্লার চওড়া কলারের নীচ দিয়ে বেরিয়ে আসা গলায়ও সেই একই রং। দুটি কালো ঝকঝকে চোখ, একটা ঈষৎ টেরা, তার মুখের বিবর্ণ আভার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সে খুব সোজা হয়ে হাঁটে, ফলে তার পুরো বুকটাই ফুলে ওঠে।

মাথাটাকে সামান্য পিছনে হেলিয়ে জেলারের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে সে করিডরে গিয়ে দাঁড়াল, যেন যে কোন আদেশ পালনে সে প্রস্তুত।

জেলার দরজায় তালা লাগাতে যাবে এমন সময় একটি কুঁচকানো-চামড়া কড়া চেহারার বৃদ্ধ স্ত্রীলোক সাদা মাথাটা বের করে মাসলভার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। কিন্তু দরজার ধাক্কায় বৃদ্ধার মাথাটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে রক্ষী দরজাটা বন্ধ করে দিল। সেলের ভিতরে নারী-কণ্ঠের হাসি শোনা গেল। সেলের দরজার ছোট গর্তটার দিকে ফিরে মাসলভাও হাসল। ও-পাশ থেকে গর্তটার উপর মুখটা চেপে ধরে বৃদ্ধা কর্কশ গলায় বলল :

'মনে রেখ, ওরা যখন জেরা শুরু করবে তখন একই কথা বার বার বলে যাবে ; বাজে কথা একটাও বলবে না।'

'কিন্তু যা হয়েছে তার চাইতে খারাপ আর তো কিছু হবে না : আমি চাই এসপার-ওসপার একটা কিছু হয়ে যাক।'

উপরওয়ালার আত্ম-নিশ্চিত ভঙ্গীতে চিফ জেলার বলল, 'এসপার-ওসপার একটা তো অবশ্য হবে। নাও, এখন চল।'

বৃদ্ধার চোখ দুটি গর্তের ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর মাসলভাও করিডরে পা ফেলল। চিফ জেলারকে সামনে রেখে তারা পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগল ; পুরুষ ওয়ার্ডের আরও দুর্গন্ধময় ও হৈ-চৈ ভরা সেলগুলো পার হল ; দরজার প্রত্যেকটি গর্তে চোখ লাগিয়ে সকলে তাদের দেখতে লাগল ; শেষ পর্যন্ত তারা আপিসে পৌছল ; স্ত্রীলোকটিকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সেখানে দুটি সৈনিক অপেক্ষা করছিল। যে কেরাণীটি সেখানে বসেছিল সে তামাকের ধোঁয়ায় মলিন একটুকরো কাগজ একজন সৈনিকের হাতে দিয়ে স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়ে বলল, 'একে নিয়ে যাও।'

একটি সৈনিক নিঝ্‌নি নভ্‌গরদের চাষী। লাল মুখে বসন্তের দাগ। কোটের আস্তিনের ভিতর কাগজখানা গুঁজে রেখে কয়েদীর দিকে এক নজর তাকিয়ে সে তার সঙ্গী চওড়া-কাঁধ জনৈক চুবাসকে (রাশিয়ার অধীনস্থ এসিয়ার একটি জাতি) চোখ ঠারল। তারপর কয়েদী ও সৈনিকদ্বয় প্রধান

ফটক দিয়ে কারা-প্রাঙ্গণ পার হল এবং উঁচু-নীচু বাঁধানো পথের মাঝ বরাবর দিয়ে শহরের পথে এগিয়ে চলল।

কোচয়ান, ব্যবসায়ী, রাঁধুনি, মজুর ও সরকারী কেরাণীরা চলা থামিয়ে কৌতূহলের সঙ্গে কয়েদীকে দেখতে লাগল। কেউ কেউ মাথা নেড়ে ভাবল 'এই হল পাপ কাজের—আমাদের থেকে ভিন্ন ধরনের কাজের—পরিণাম।' ছেলে-মেয়েরা হঠাৎ থেমে শংকিত দৃষ্টি মেলে ডাকাতনির দিকে তাকিয়ে রইল; দুটি সৈন্য থাকায় সে আর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না ভেবে তাদের ভয় অনেকটা দূর হল। জনৈক চাষী কাঠ-কয়লা বেচে শহরে চা-টা খেয়ে তাদের সামনে এসে হাজির হল। বুকের উপর ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে সে কয়েদীকে একটি কোপেক দান করল। কয়েদী লজ্জায় লাল হয়ে অস্ফুটস্বরে কি যেন বলল। সবাই তাকে দেখছে বুঝতে পেরে কয়েদীটি মুখ না ফিরিয়েই আড়চোখে সকলকে দেখতে লাগল : সকলে তাকে দেখছে এ কথা ভেবে সে খুশিই হল। বাইরের খোলা হাওয়ায়ও তার মনটা ভাল লাগল, কিন্তু সে হাঁটতে অভ্যস্ত নয় বলে কারাগারের বাজে জুতো পরে উঁচু-নীচু পাথুরে পথে হাঁটতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। একটি শস্য-ব্যবসায়ীর দোকানের সামনে কতকগুলি পায়রা নির্বিঘ্নে চড়ে বেড়াচ্ছিল। সেখান দিয়ে যাবার সময় একটা ধূসর নীল পায়রার গায়ে তার পা লেগে যেতেই পায়রাটা পাখা মেলে তার কানের কাছ দিয়ে উড়ে গেল। তার পাখার বাতাস লাগল তার চোখে মুখে। সে হাসল, আর তারপরেই নিজের অবস্থার কথা মনে করে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অধ্যায়—২

কয়েদী মাসলভার জীবনের কাহিনী খুবই সাধারণ।

মাসলভার মা ছিল জনৈকা গ্রাম্য স্ত্রীলোকের অবিবাহিতা কন্যা। সে কাজ করত জমির মালিক দুজন অবিবাহিতা মহিলার গোশালায়। ঐ অবিবাহিতা স্ত্রীলোকটি প্রতি বছর একটি করে সন্তান প্রসব করত, এবং গ্রামে সাধারণত যে রকম হয়ে থাকে, সযত্নে দীক্ষিত হবার পরেই প্রত্যেকটি অবাঞ্ছিত শিশুকে তার মা নিজের কাজের অসুবিধা ঘটায় বলে অনাদরে অনাহারে মেরে ফেলত। এই ভাবে পাঁচটি শিশু মারা গেল। তাদের সকলেরই খৃস্টধর্মে দীক্ষা হয়েছিল, কিন্তু তারপরেই পেটভরে খেতে না দিয়ে তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হল। ষষ্ঠ সন্তানের বাবা ছিল একটা ভবঘুরে জিপসি। তারও ঐ একই পরিণতি হত। কিন্তু ঘটনাক্রমে গরুর গন্ধওয়ালা মাখন বাইরে পাঠানোর দরুন গোশালার চাকরাণিদের বকুনি দেবার জন্য মহিলাদের একজন গোলাবাড়িতে এসে উপস্থিত হল। সুন্দর, স্বাস্থ্যবান নবজাত শিশুটিকে নিয়ে স্ত্রীলোকটি গোয়ালের এক কোণে শুয়ে ছিল।

সবেমাত্র প্রসব হবার পরেই মেয়েটাকে গোয়াল-ঘরে ফেলে রাখার জন্য চাকরাণিদের আর এক প্রস্থ বকুনি লাগিয়ে বৃদ্ধা মহিলাটি চলেই যাচ্ছিল, হঠাৎ শিশুটিকে দেখে তার মন গলে গেল এবং ছোট্ট মেয়েটির ধর্ম-মা হবার প্রস্তাব করল। ধর্ম-মেয়ের প্রতি করুণাবশতঃ সে তার মাকে দুধ ও কিছু টাকা দিল যাতে সে শিশুটিকে খাওয়াতে-পরাতে পারে। আর এইভাবে শিশুটি বেঁচে গেল। বৃদ্ধা মহিলারা তাকে ডাকত 'বাচনি' বলে। শিশুটির যখন তিন বছর বয়স তখন তার মা অসুখে পড়ে মারা গেল। সে তখন বুড়ি দিদিমার বোঝাস্বরূপ হয়ে পড়ায় দুই কুমারী মহিলা তার কাছ থেকে শিশুটিকে নিয়ে এল।

ছোট্ট কালো-চোখ মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী হয়ে উঠল। সে এতই প্রাণোচ্ছল যে মহিলা দুটিরও তাকে খুব ভাল লেগে গেল।

দুই বোনের মধ্যে সোফিয়া আইভানভ্না ছোট। সে-ই মেয়েটির ধর্ম-মা হয়েছিল। দুই বোনের মধ্যে তার মনটাও ছিল বেশী দয়ালু; বড় বোন মারি আইভানভ্না বরং একটু কঠোর প্রকৃতির। সোফিয়া আইভানভ্না মেয়েটিকে ভাল জামা-কাপড় পরাত ও লেখাপড়া শেখাত; সে তাকে একটি মহিলার মত শিক্ষিতা করে তুলতে চায়। মারি আইভানভ্না মনে করে, শিশুটিকে ভাল করে কাজ-কর্ম শেখানো দরকার। সে যাতে ভাল দাসী হতে পারে তেমনি শিক্ষা দেওয়া উচিত। সে মেয়েটির প্রতি কঠোর ব্যবহার করে, শাস্তি দেয়, এমন কি রেগে গেলে ছোট্ট মেয়েটাকে মারে পর্যন্ত। এই দুই বিপরীত প্রভাবের মধ্যে বড় হবার জন্য সে হয়ে উঠল অর্ধেক দাসী আর অর্ধেক এক তরুণী মহিলা। তারা তাকে কাত্যুশা বলে ডাকে, সেটা শুনতে কাতেংকা অপেক্ষা অমার্জিত, কিন্তু কাত্কার মত অতি সাধারণ নয়। সে সেলাই করে, ঘর পরিষ্কার করে, খড়ি দিয়ে মূর্তির ধাতব আধারগুলি পালিশ করে, আরও ছোটখাট কাজ করে, এবং কখনও কখনও বসে বসে মহিলাদের পড়েও শোনায়।

একাধিক বিয়ের প্রস্তাব এসেছে, কিন্তু সে বিয়ে করবে না। সহজ সুখের জীবন যাপন করে তার মাথা বিগড়ে গেছে। সে ভাবে, যে সব মজুর তাকে বিয়ে করতে চায় তাদের স্ত্রী হয়ে জীবন কাটানো তার পক্ষে খুবই কষ্টকর হবে।

তার ষোল বছর বয়স পর্যন্ত এইভাবে কাটল। এই সময় বৃদ্ধ মহিলাদের ভাই-পো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এক ধনী যুবক রাজকুমার পিসীদের বাড়িতে কিছুদিন কাটাতে এল; আর কাত্যুশা কোন কিছু না বুঝেই তার প্রেমে পড়ে গেল।

দু'বছর পরে সেই ভাই-পোটি সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে যাবার আগে পিসীদের সঙ্গে চারটি দিন কাটিয়ে গেল; যাবার আগের রাতে সে কাত্যুশাকে ভুলিয়ে পাপের পথে নিয়ে গেল এবং তার হাতে একখানি একশ' রুবলের নোট

দিয়ে চলে গেল। পাঁচ মাস পরে মেয়েটি নিশ্চিত বুঝতে পারল যে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। তারপর থেকেই সে সব কিছুর উপর বিরক্ত হয়ে উঠল, কেমন করে আসন্ন লজ্জা থেকে মুক্তি পাবে সেটাই হল তার একমাত্র চিন্তা; মহিলাদের সেবায় আর তেমন মন নেই, সবকিছুতেই অবহেলার ভাব; একবার তো সে তাদের প্রতি রুষ্ট ব্যবহারই করে বসল; অবশ্য এটা যে কেমন করে ঘটল তা সে নিজেই বুঝতে পারে নি এবং পরে সেজন্য অনুতাপ প্রকাশ করে তাকে ছেড়ে দিতে বলল। খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে মহিলারা তাকে ছেড়ে দিল। তারপর সে এক পুলিশ-অফিসারের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ পেল, কিন্তু সেখানেও মাত্র তিনটি মাস কাটাতে পারল, কারণ পুলিশ-অফিসারটির বয়স পঞ্চাশ হলেও সে তাকে জ্বালাতন করতে শুরু করল, এবং একদিন সে যখন খুবই বাড়াবাড়ি করে বসল তখন মেয়েটিও ক্ষেপে গিয়ে 'বোকা' ও 'বুড়ো শয়তান' বলে গালাগালি দিয়ে এমন জোরে তাকে ধাক্কা দিল যে অফিসারটি মাটিতে পড়ে গেল। এই কঠোর আচরণের জন্য তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। আর চাকরির খোঁজ করা বৃথা, কারণ তার প্রসবের সময় আসন্ন; কাজেই সে এক বেআইনী মদের কারবারী গ্রাম্য ধাত্রীর বাড়ি আশ্রয় নিল। ভালভাবেই প্রসব হয়ে গেল; কিন্তু ধাত্রীর হাতে গ্রামের একটি জ্বরের রোগী ছিল; ফলে তার ছোঁয়াচ লেগে কাত্যুশা অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং পুত্রসন্তানটিকে বেওয়ারিশ ছেলেমেয়েদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে হল। যে বুড়িটা তাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল সে এসে জানাল যে ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে। কাত্যুশা যখন ধাত্রীর কাছে গিয়েছিল তখন তার কাছে ছিল মোট একশ' সাতাশ রুবল; সে রোজগার করেছিল সাতাশটি আর যে তাকে ভুলিয়েছিল সে দিয়েছিল একশ'। কিন্তু সেখান থেকে চলে যাবার সময় তার কাছে ছিল মাত্র ছ' রুবল; সে টাকা রাখতে জানত না; নিজেও খরচ করেছে, আবার যে চেয়েছে তাকেও দিয়েছে। দু'মাসের খাওয়া-পরা ও পরিচর্যার জন্য ধাত্রী নিয়েছিল চল্লিশ রুবল, বাচ্চাটাকে বেওয়ারিশদের হাসপাতালে ভর্তি করতে গেল পঁচিশ, আর একটা গরু কিনবার জন্য ধাত্রী কর্জ নিয়েছিল চল্লিশ। কুড়ি রুবলের মত খরচ হল কাপড়-চোপড়, মিষ্টি ও অন্যান্য খাতে। বেঁচে থাকবার মত কিছুই যখন রইল না তখন কাত্যুশা আবার চাকরির খোঁজ করতে লাগল এবং এক বনরক্ষকের বাড়ি কাজ পেয়ে গেল। বনরক্ষক বিবাহিত লোক, তবু সে প্রথম দিন থেকেই তার পিছনে ঘুর ঘুর করতে শুরু করল। কাত্যুশা তাকে অপছন্দ করত এবং এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করত। কিন্তু লোকটা তার মনিব, কাজেই তাকে যেখানে খুশি পাঠাতে পারত। তাছাড়া সে ছিল অভিজ্ঞ ও ধূর্ত, কাজেই তাকে বলাৎকার করার ব্যবস্থা করে ফেলল। কিন্তু তার স্ত্রী ব্যাপারটা ধরে ফেলল এবং কাত্যুশা ও তার স্বামীকে একই ঘরে এক সঙ্গে পেয়ে কাত্যুশাকে পিটতে শুরু করল। কাত্যুশাও নিজেকে বাঁচাবার

চেষ্টা করল, ফলে লড়াই বেঁধে গেল এবং মাইনে না দিয়েই তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। তখন সে শহরে তার এক খুড়ির কাছে গিয়ে রইল। তার খুড়ো একজন বই বাঁধার দপ্তরি। একসময় তার অবস্থা ভালই ছিল, কিন্তু সব খদ্দেরপত্তর হারিয়ে সে মদ ধরেছে এবং হাতের কাছে যা কিছু পেয়েছে সবই মদের দোকানে উড়িয়েছে।

খুড়ি একটা ছোট ধোবিখানা চালিয়ে কোন মতে নিজের ছেলেমেয়েদের ও দুর্ভাগা স্বামীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করত। সে কাত্যুশাকে ধোবার কাজ করতে বলল; কিন্তু খুড়ির অন্য ধোবাদের দুঃখ ও কষ্টের জীবন নিজের চোখে দেখে সে ইতস্তত করতে লাগল এবং একটা রেজিস্ট্রি আপিসে আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিল। যে মহিলার কাছে তার চাকরির ব্যবস্থা হল তার দুটি ছেলে ব্যায়ামাগারের ছাত্র। সে বাড়িতে ঢুকবার সাতদিন পরেই গোঁফওয়ালা বাড়ন্ত গড়নের বড় ছেলেটা পড়াশুনা শিকেয় তুলে সারাক্ষণ কাত্যুশার পিছনেই ঘুর ঘুর করতে লাগল। মা সব দোষ কাত্যুশার ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে নোটিশ দিল।

এই ভাবে একটা চাকরি জোগাড় করবার চেষ্টায় বার বার ব্যর্থ হয়ে আবার সে রেজিস্ট্রি আপিসেই হাজির হল, আর সেখানেই একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে তার দেখা হল। তার মোটাসোটা খোলা হাতে ব্রেসলেট পরানো, এবং প্রায় সবগুলো আঙুলে একটা করে আংটি। কাত্যুশার একটা কাজের খুব প্রয়োজন শুনে সে তাকে নিজের ঠিকানা দিয়ে বাড়িতে দেখা করতে বলল। কাত্যুশা গেল। স্ত্রীলোকটি তাকে সাদরে গ্রহণ করল, কেক ও মিষ্টি মদ সামনে ধরে দিল এবং একটা চিরকুট লিখে চাকরের হাত দিয়ে কাকে যেন পাঠিয়ে দিল। সন্ধ্যাবেলা একটি দীর্ঘকায় লোক ঘরে ঢুকল। লম্বা পাকা চুল, সাদা দাড়ি। কাত্যুশার পাশে বসে সে হাসতে লাগল আর চকচকে চোখ মেলে তাকে দেখতে লাগল। তার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টাও করল। গৃহকর্ত্রী তাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলে কাত্যুশা শুনতে পেল সে বলছে, 'গ্রাম থেকে আনকোরা আনা হয়েছে।' তখন গৃহকর্ত্রী কাত্যুশাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বলল, লোকটি একজন লেখক, তার অনেক টাকা, আর মনে ধরলে সে কাত্যুশাকে সব কিছু দিতে পারে। তার মনে ঠিকই ধরেছে; তার হাতে পঁচিশ রুবল দিয়ে বলে গেল, মাঝে মাঝেই আসবে। পঁচিশ রুবল দেখতে দেখতে খরচ হয়ে গেল; কিছুটা দিল খুড়িকে থাকা-খাওয়া বাবদ, আর বাকিটা দিয়ে কিনল একটা পোশাক, টুপি আর ফিতে। কয়েকদিন পরে লেখক তাকে ডেকে পাঠাল। সে গেল। সে তাকে আরও পঁচিশ রুবল দিল এবং একটা আলাদা বাসার ব্যবস্থা করে দিল।

লেখক যে বাসাটা ভাড়া করে দিয়েছিল তার পাশেই একটি হাসিখুশি যুবক দোকান-কর্মচারি থাকত। শীঘ্রই কাত্যুশা তার প্রেমে পড়ে গেল। সব কথা লেখককে বলে সে নিজের একটা ছোট বাসায় চলে গেল। দোকান-

কর্মচারিটি কথা দিয়েছিল তাকে বিয়ে করবে; কিন্তু তাকে কিছু না জানিয়েই সে কাজ উপলক্ষ্যে নিঝনি নভ্‌গরদ চলে গেল; স্পষ্টতই সে তাকে ত্যাগ করল, আর কাতয়ুশা আবার একলা হয়ে পড়ল। নিজের চেষ্টাতেই সে ঐ বাসায় থাকতে চাইল, কিন্তু পুলিশ জানাল যে সে ক্ষেত্রে তাকে হলুদ (পতিতাবৃত্তির) পাশপোর্ট জোগাড় করতে হবে এবং ডাক্তারী পরীক্ষা করাতে হবে। অগত্যা সে খুড়ির কাছে ফিরে গেল। তার ভাল পোশাক, টুপি আর আলখাল্লা দেখে খুড়ি এবার আর তাকে ধোবার কাজ করতে বলল না। সে বুঝতে পারল যে মেয়েটা সে কাজের উপরে উঠে গেছে। ধোবার কাজ করতে হবে কি হবে না সে প্রশ্ন কাতয়ুশার মনেও এল না। সে করুণার চোখে সেই সব শুকনো, কঠোর পরিশ্রমী ধোবানীদের দেখতে লাগল যাদের মধ্যে কেউ কেউ এরই মধ্যে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হয়েছে; তারা সাবানের বাষ্পে-ভরা সর্বদা ভিজে থাকা ভয়ংকর গরম সামনের ঘরটায় সরু সরু হাত দিয়ে কাপড় ধোলাই করছে অথবা ইস্ত্রি চালাচ্ছে। তার কপালেও এই কাজ জুটতে পারত এ কথা ভাবতেই সে শিউরে উঠল।

ঠিক এই সময়ে যখন কাতয়ুশা খুবই মুশকিলে পড়েছে, যখন কোন 'রক্ষাকর্তা'-রই আবিষ্কার ঘটছে না, তখন জনৈকা কুটনি তাকে খুঁজে বের করল।

কিছুদিন থেকেই কাতয়ুশা ধূমপান করতে শুরু করেছে, আর দোকান-কর্মচারি ছোকরা তাকে ছেড়ে যাবার পর থেকে সে ক্রমেই বেশী করে মদ খেতেও শিখেছে। মদের স্বাদ যে তাকে টানত তা ঠিক নয়, তবে মদ খেলে সে নিজের দুঃখকে ভুলে থাকতে পারত, মদ তাকে আরও স্বাধীন, আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলত, যে অনুভূতি স্বাভাবিক অবস্থায় তার হত না: মদ না খেলে সে বিষণ্ণ ও লজ্জিত বোধ করত।

কুটনি ভাল ভাল খাবার এনে খুড়িকে দিল, আর কাতয়ুশাকে এনে দিল মদ। সে মদ খেতে লাগল, আর সেই ফাঁকে কুটনি প্রস্তাব করল যে সে তাকে শহরের একটা মস্তবড় পতিতালয়ে কাজ জুটিয়ে দিতে পারে। সেখানকার অনেক রকম সুখ-সুবিধার কথাও সবিস্তারে ব্যাখ্যা করল। কাতয়ুশার সামনে তখন দুটো পথ খোলা—হয় চাকরি করতে গিয়ে অপমানিত হওয়া, পুরুষের অত্যধিক মনোযোগে বিব্রত হওয়া এবং মাঝে-মধ্যে গোপন যৌন মিলনে সঙ্গিনী হওয়া; অথবা আইনসম্মত, সহজ, নিরাপদ অবস্থাকে মেনে নিয়ে মোটা টাকার বিনিময়ে প্রকাশ্যে নিয়মিত যৌনমিলনকে স্বীকার করা;—সে পরেরটাই বেছে নিল। তাছাড়া, তার মনে হল যেন এই পথে গেলেই সে তার পতনের প্রথম সঙ্গী, আর সেই দোকান-কর্মচারি এবং যে যেখানে তার ক্ষতি করেছে তাদের প্রত্যেকের উপর প্রতিশোধ নিতে পারবে। আরও একটা বিষয় তাকে প্রলুব্ধ করল, তার সিদ্ধান্তকে

প্রভাবিত করল ; কুটনি তাকে বলেছে যে, তার নিজের পোশাকের অর্ডার সে নিজেই দিতে পারবে : ভেলভেট, রেশম, শাটিন, নীচু-গলা নাচের পোশাক—যা তার ইচ্ছা। কালো ভেলভেটের পাড়-বসানো উজ্জ্বল হলুদ রেশমের নীচু-গলা ও ছোট আস্তিনের পোশাকে সুসজ্জিত নিজের ছবিটা মনের চোখে দেখে সে সব ভুলে গেল ; পাসপোর্টখানা দিয়ে দিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলায়ই কুটনি একখানি 'ইজভজচিক' গাড়ি নিয়ে এল এবং তাতে চড়িয়ে কাতয়ুশাকে নিয়ে গেল মাদাম কিতায়েভার কুখ্যাত ভবনে।

সেদিন থেকেই কাতয়ুশা মাসলভার পক্ষে শুরু হল মানুষের এবং ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট আইনের বিরোধী এক দীর্ঘ-প্রচলিত পাপের জীবন, হাজার হাজার নারী যে জীবন যাপন করে, মানুষের কল্যাণ-কামনায় উৎকণ্ঠ সরকার যে জীবনকে শুধু সহ্যই করে না, সমর্থনও করে, প্রতি দশটির মধ্যে ন'টি নারীর পক্ষেই যে জীবনের পরিণাম যন্ত্রণাদীর্ণ রোগ, অকাল বার্ধক্য ও মৃত্যু।

সারা রাতের সুখ-সম্ভোগের পরে বিকেল পর্যন্ত গভীর ঘুম। তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত চলে নোংরা বিছানা থেকে ক্লান্ত জাগরণ, সোডার জল, কফি, বেড-গাউন ও ড্রেসিং-জ্যাকেট পরে ঘরের মধ্যে উদাস পায়চারি, ঝোলানো পর্দার পিছন থেকে জানালা দিয়ে অলস দৃষ্টিপাত, নিজেদের মধ্যে অনর্থক ঝগড়াঝাটি ; তারপর হাত-মুখ ধোয়া, শরীর ও চুলকে সুগন্ধি করা, পোশাক পরা, তা নিয়ে আবার বাড়িউলির সঙ্গে ঝগড়া, আয়নায় নিজেকে দেখা, মুখে রং মাখা ও ভুরুতে টান দেওয়া ; ভাল ভাল দামী খাবার ; তারপর শরীরের অনেকখানি খোলা রেখে ঝকমকে রেশমের পোশাক পরে সুসজ্জিত ও উজ্জ্বল-আলোকিত ড্রয়িং-রুমে নেমে যাওয়া ; তারপর দর্শনার্থীর আগমন, গান, নাচ এবং বৃদ্ধ, যুবক ও মাঝবয়সী, ছোকরা ও অথর্ব বৃদ্ধ, অবিবাহিত, বিবাহিত, ব্যবসায়ী, কেরাণী, আর্মেনীয়, ইহুদি, তাতার ; ধনী ও দরিদ্র, রুগ্ন ও স্বাস্থ্যবান, মাতাল ও স্থিরবুদ্ধি, কর্কশ ও নরম, সামরিক ও অসামরিক, ছাত্র ও নেহাৎ স্কুলের ছেলে—সব শ্রেণীর, সব বয়সের, সব চরিত্রের পুরুষের সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়া। চীৎকার-চেঁচামেচি ও হাসি-তামাসা, কোন্দল, আর গান, তামাক ও মদ এবং তামাক ও গান, সন্ধ্যা থেকে দিনের আলো পর্যন্ত, সকালের আগে বিশ্রাম নেই, আর তারপরে আবার গভীর ঘুম ; প্রতিটি দিন, প্রতিটি সপ্তাহ—একই অবস্থা। তারপর সপ্তাহের শেষে যেতে হয় সরকার প্রতিষ্ঠিত থানায়, সেখানে ডাক্তাররা—তারাও সরকারী চাকুরে—কখনও কঠোরভাবে গুরুত্বের সঙ্গে, কখনও বা খেলা-খেলা হেলা ভরে, আত্মরক্ষার জন্য যে শ্লীলতায় শুধু মানুষের নয় পশুরও অধিকার আছে তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে এই সব মেয়েদের পরীক্ষা করে এবং যে পাপ তারা ও তাদের সহযোগীরা সপ্তাহভরে করেছে সেটাকে চালিয়ে যাবার লিখিত

অনুমতি দিয়ে দেয়। তারপর সেই একই ভাবের আর একটি সপ্তাহ কাটে : কি গ্রীষ্ম কি শীত, কাজের দিন কি ছুটির দিন, প্রতিটি রাতের একই রূপ।

আর এইভাবে কাতয়ুশা মাসলভার সাতটি বছর কেটে গেল। এর মধ্যে সে সামনে-পিছনে বার দুই বাড়ি বদল করেছে, ও একবার হাসপাতালে গেছে। পতিতালয়ের জীবনের সপ্তম বছরে, যখন তার বয়স ছাব্বিশ বছর, এমন কিছু ঘটল যার ফলে তাকে কারাগারে আটক করা হয় এবং তিন মাসাধিক কাল চোর ও খুনীদের সঙ্গে কারাগারের শ্বাসরোধকারী বাতাসে বন্দী থাকবার পর এখন তাকে বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

অধ্যায়—৩

দীর্ঘ পথ হেঁটে ক্লান্ত শরীরে মাসলভা যখন সৈনিক দুটির সঙ্গে বিচারালয়ে পৌঁছল, ওদিকে তখন প্রিন্স দিমিত্রি আইভানভিচ নেখ্‌লুয়ুদভ, যে তাকে একদিন ভুলিয়েছিল, সুউচ্চ পালংকের স্প্রিংয়ের গদীর উপর পালকের শয্যায় পরিষ্কার ধবধবে ইস্ত্রি-করা সুতির নাইট-শার্ট পরে শুয়েছিল, আর একটা সিগারেটে টান দিতে দিতে ভাবছিল, আজ তাকে কি কি করতে হবে এবং গতকাল কি কি ঘটেছিল।

গত সন্ধ্যাটা সে বিত্তবান অভিজাত পরিবার কর্চাগিনদের সঙ্গে কাটিয়েছিল। সকলেই আশা করে যে তাদের মেয়েকেই সে বিয়ে করবে। এ কথা মনে পড়তেই সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল এবং সিগারেটের শেষ অংশটুকু ফেলে দিয়ে রূপোর কেস থেকে আর একটা সিগারেট বের করতে গেল ; কিন্তু সে ইচ্ছা পরিবর্তন করে মসৃণ সাদা পা দুটি বিছানা থেকে নামিয়ে চটির ভিতর গলিয়ে দিল, মাংসল কাঁধের উপর রেশমের ড্রেসিং-গাউনটা চাপাল, এবং ভারী, দ্রুত পদক্ষেপে ড্রেসিং-রুমে প্রবেশ করল। ঘরটা ইউ ডি কোলোনের গন্ধে ভর্তি। সেখানে সে সযত্নে একটা বিশেষ দাঁতের মাজন দিয়ে দাঁতগুলি (তার অনেকগুলিই বন্ধ করা) পরিষ্কার করল এবং সুগন্ধি জল দিয়ে মুখটা ধুয়ে নিল। তারপর সুগন্ধি সাবানে হাত দুটি ধুয়ে বিশেষ যত্নসহকারে লম্বা নখগুলি পরিষ্কার করল, শ্বেত পাথরের ওয়াশস্ট্যাণ্ডে মুখ ও শক্ত গলাটা ধুয়ে ফেলল, এবং যে তৃতীয় কক্ষে স্নানের ধারাযন্ত্রটি ছিল সেখানে গেল। স্নানের ফলে মোটাসোটা সাদা, পেশীবহুল দেহটা ঝরঝরে হলে একটা খসখসে তোয়ালে দিয়ে জলটা মুছে নিয়ে সূক্ষ্ম তলবাস ও ঝকঝকে জুতো পরে নিল এবং ছোট কালো দাড়ি এবং কপালের কাছে পাতলা হয়ে আসা কোঁকড়ানো চুলটা ব্রাশ করবার জন্য আয়নার সামনে গিয়ে বসল।

যা কিছু সে ব্যবহার করে, তার সব রকম প্রসাধন-দ্রব্য—তার কাপড়, জুতো, নেক-টাই, পিন, বোতাম—সবই সেরা জিনিস, খুব শান্ত, সরল, দীর্ঘস্থায়ী ও দামী।

নানা রকমের দশটা টাই ও পিনের মধ্য থেকে যেটার উপর প্রথম হাত পড়ল সে সেটাই তুলে নিল। একসময় ছিল যখন এর সবগুলিই তার কাছে নতুন ও আকর্ষণীয় ছিল, কিন্তু এখন তার কাছে সবই সমান হয়ে উঠেছে।

যে পোশাকগুলি ব্রাশ করে চেয়ারের উপর রাখা ছিল নেখ্‌লয়ুদভ সেগুলিই পরল; তারপর খুব ঝরঝরে বোধ না করলেও পরিচ্ছন্ন ও সুরভিত হয়ে খাবার ঘরে গেল। সিংহের থাবার আকারে কুঁদে-তোলা চারটি পায়ার উপরে বসানো টেবিলটা দেখতে খুবই জমকালো। তার সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি একটা মস্তবড় পাশ-দেরাজও রয়েছে। গতকালই আয়তাকার ঘরের মেঝেটা তিনজন লোক পালিশ করে দিয়ে গেছে। একখানি সূক্ষ্ম ধপধপে-ধোয়া মনোগ্রাম-আঁকা চাদরে ঢাকা টেবিলটার উপরে সুগন্ধি কফিপূর্ণ রূপোর কফি-পাত্র, চিনির পাত্র, গরম মাখনভরা জগ, এবং তাজা রুটি, চাপাটি ও বিস্কুটে ভর্তি রুটির ঝুড়িটা সাজানো রয়েছে; আর প্লেটের পাশেই রয়েছে খবরের কাগজ **Revue des Deux Mondes**-এর সর্বশেষ সংখ্যাটি ও কিছু চিঠিপত্র।

নেখ্‌লয়ুদভ চিঠিগুলো খুলতে যাবে এমন সময় শোক-পোশাক পরিহিতা একটি শক্ত-সমর্থ মাঝবয়সী স্ত্রীলোক সিঁথির চুল-উঠে-যাওয়া অংশটাকে একটা লেসের টুপিতে ঢেকে যেন ঘরের ভিতর ভেসে এল। স্ত্রীলোকটি নেখ্‌লয়ুদভের মায়ের সখী আগ্রাফেনা প্রেত্রভ্‌না। সম্প্রতি এই বাড়িতেই তার কর্ত্রীঠাকরুণের মৃত্যু হওয়ায় সে ছেলের গৃহস্থালি দেখবার জন্য এখানেই রয়ে গেছে।

আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌না বিভিন্ন সময়ে প্রায় দশটা বছর নেখ্‌লয়ুদভের মায়ের সঙ্গে বাইরে বাইরে কাটিয়েছে। ফলে তার চেহারায় ও চাল-চলনে একটা মহিলাসুলভ ভঙ্গী এসেছে। শিশুকাল থেকেই সে নেখ্‌লয়ুদভদের পরিবারে আছে এবং দিমিত্রি আইভানভিচকে যখন মিতেংকা বলে ডাকা হত তখন থেকেই তাকে চেনে।

'শুভ সকাল, দিমিত্রি আইভানভিচ!'

'শুভ সকাল, আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌না! ব্যাপার কি?' নেখ্‌লয়ুদভ প্রশ্ন করল।

'প্রিন্সেসের চিঠি—হয় মা লিখেছেন, নয় তো মেয়ে। কিছুক্ষণ আগে দাসী চিঠিটা নিয়ে এসেছে। সে এখন আমার ঘরেই অপেক্ষা করছে,' অর্থপূর্ণ হাসি হেসে চিঠিটা তার হাতে দিয়ে আগ্রাফেনা প্রেত্রভ্‌না জবাব দিল।

নেখ্‌লয়ুদভ চিঠিটা নিল; আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌নার হাসি দেখে ভুরু কুঁচকে বলল, 'ঠিক আছে, এক সেকেণ্ড!'

সে হাসির অর্থ চিঠিটা লিখেছে তরুণী প্রিন্সেস কর্চাগিনা, আর আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌নার আশা তাকেই সে বিয়ে করবে। তার এই ধারণায় নেখ্‌লয়ুদভ বিব্রত বোধ করে।

'তাহলে তাকে অপেক্ষা করতে বলি গে', এই কথা বলে রুটি-ব্রাশটাকে

ঠিক জায়গায় তুলে রেখে আগ্রাফেনা পেত্রভ্না যেন ভাসতে ভাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নেখ্লয়ুদভ সুগন্ধি চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল।

পুরু ধূসর কাগজে বেশ ফাঁক ফাঁক করে কোণাকুণিভাবে চিঠিটা লেখা। তাতে আছে :

'তোমার স্মৃতির দায়িত্বভার গ্রহণ করে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে আজ এপ্রিলের ২৮ তারিখে তোমাকে জুরি হিসেবে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে; ফলে তোমার স্বভাবসিদ্ধ খামখেয়ালির বসে তুমি কাল কথা দিয়ে থাকলেও আজ কোন মতেই আমাদের এবং কলসভের সঙ্গে চিত্র প্রদর্শনীতে যেতে পারছ না; যথাসময়ে হাজির না হবার দরুণ **a´ moins que vous ne soyez dispose´a´ payer a' la cour d'assises les 300 roubles d'amende, que vous refusez pour votre cheval,** (তুমি যদি জরিমানা স্বরূপ ৩০০ রুবল, যেটা যে ঘোড়াটা তুমি কিনতে পার নি তার দামের সমান, দায়রা আদালতকে দিতে রাজী থাক তো স্বতন্ত্র কথা)। কাল রাতে তুমি চলে যাবার পরে কথাটা মনে পড়ল, কাজেই ভুলো না যেন।—প্রিন্সেস এম. কর্চাগিনা।'

অপরদিকে পুনশ্চ দিয়ে লেখা :

'Maman vous fait dire que votre couvert vous attendra jusqu'a´la nuit. Venez absolument a' quelle heure que cela soit. (মার কথামত জানাচ্ছি, রাত পর্যন্ত তোমার আসনটা তোমার জন্য রাখা থাকবে। যখনই হোক তুমি অবশ্য আসবে।)—এম. কে.

নেখ্লয়ুদভ মুখভঙ্গী করল। অদৃশ্য সুতোয় তাকে ক্রমাগত শক্ত করে বেঁধে ফেলবার জন্য প্রিন্সেস কর্চাগিনা দুটি মাস ধরে যে সুনিপুণ কৌশল-জাল বিস্তার করে চলেছে এই চিঠিটা তারই জের মাত্র। কিন্তু খুব বেশী প্রেমে না পড়লে যৌবনোত্তর পুরুষের পক্ষে বিয়ের ব্যাপারে যে স্বাভাবিক ইতস্তত ভাব থাকে তা ছাড়াও নেখ্লয়ুদভের দিক থেকে এমন কিছু কারণ ছিল যার জন্য বিয়েতে মনস্থির করে থাকলেও এই মুহূর্তে বিয়ের প্রস্তাব করতে সে পারছে না। দশ বছর আগে সে যে মাসলভাকে ফুসলিয়ে এনে তারপর পরিত্যাগ করেছিল সেটা কোন কারণই না; সে কথা সে বেমালুম ভুলে গেছে। আর সেটাকে সে বিয়ে না করার কারণ বলেও মনে করত না। না। আসল কারণ হল একটি বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটেছিল, এবং সে যদিও মনে করে যে সে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে, স্ত্রীলোকটি তা মনে করে না।

স্ত্রীলোকের ব্যাপারে নেখ্লয়ুদভ একটু লাজুক প্রকৃতির, আর তার এই লাজুকতাই নেখ্লয়ুদভের ভোট-কেন্দ্রের বিদেশী অভিজাত মার্শালের দুর্নীতিপরায়ণা বিবাহিত স্ত্রীর মনে তাকে পরাজিত করবার কামনা জাগিয়ে

তুলেছিল। এই নারী এমন ভাবে তাকে কাছে টানল যে ক্রমেই সে শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়তে লাগল, আর প্রতিটি দিনই তার পক্ষে অপ্রীতিকর হয়ে উঠল। লালসার কাছে হার মেনে নেখ্‌লুদভের মনে অপরাধবোধ জাগল। কিন্তু স্ত্রীলোকটির সম্মতি ছাড়া সে বন্ধন ছিন্ন করবার সাহস তার ছিল না। আর সেই কারণেই ইচ্ছা থাকলেও তরুণী প্রিন্সেস কর্চাগিনার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবার স্বাধীনতা তার ছিল না।

টেবিলের উপরকার চিঠিগুলির মধ্যে একখানা ছিল ঐ স্ত্রীলোকটির স্বামীর। তার হাতের লেখা ও ডাকঘরের ছাপ দেখেই নেখ্‌লুদভের মুখ লাল হয়ে উঠল, সে বুঝতে পারল তার ক্ষমতা জেগে উঠছে; কোন বিপদের সম্মুখীন হলেই এমনিভাবে তার ভিতরে শক্তির জাগরণ ঘটে।

কিন্তু তার উত্তেজনা সঙ্গে সঙ্গেই কেটে গেল। যে অঞ্চলে তার সব চাইতে বড় সম্পত্তি রয়েছে সেখানকার ঐ মার্শালটি নেখ্‌লুদভকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, মে মাসের শেষ নাগাদ একটা বিশেষ সভা হবে, এবং এখানে স্কুল ও রাস্তাঘাট সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক হবে নেখ্‌লুদভ যেন তাতে হাজির হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে না ভোলে, কারণ প্রতিক্রিয়াশীল দলের পক্ষ থেকে জোরালো প্রতিবাদ হবে বলে আশংকা হচ্ছে।

মার্শাল নিজে উদারপন্থী; তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে যে প্রতিক্রিয়ার ধারা প্রবহমান কিছু স্বমতের লোকের সহায়তায় সে তার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। এই লড়াইয়ে সে এতই মেতে আছে যে নিজের পারিবারিক দুর্ভাগ্য সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞান।

এই মানুষটার ব্যাপারে যে সব ভয়ংকর মুহূর্ত তাকে কাটাতে হয়েছে সব নেখ্‌লুদভের মনে পড়ে গেল: মনে পড়ল, একদিন তার মনে হয়েছিল যে স্বামীটি তাকে ধরে ফেলেছে এবং সেই মুহূর্তেই তাকে যুদ্ধে আহ্বান করবে, আর সেও মনস্থির করে ফেলেছিল যে বাতাসে ফাঁকা আওয়াজ করবে; মনে পড়ল সেই ভয়ংকর দৃশ্য যেখানে স্ত্রীলোকটি হতাশায় ডুবে মরবার জন্য পার্কের দিকে ছুটে গিয়েছিল আর সেও ছুটে গিয়েছিল তাকে খুঁজতে।

নেখ্‌লুদভ ভাবল, 'ঠিক আছে, স্ত্রীলোকটি কিছু না জানানো পর্যন্ত আমি তো এখন যেতে পারি না, বা কিছু করতেও পারি না।' এক সপ্তাহ আগেই সে স্ত্রীলোকটিকে একখানি চূড়ান্ত চিঠি লিখে নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে এবং তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবার ইচ্ছাও জানিয়েছে; সেই সঙ্গে আরও জানিয়েছে যে 'তার ভালর জন্যই' তাদের সম্পর্কেরও ইতি হয়ে গেছে। সে চিঠির কোন জবাব এখনও সে পায় নি। এটা ভাল লক্ষণও হতে পারে, কারণ স্ত্রীলোকটি যদি সম্পর্কচ্ছেদ করতে সম্মত না হত তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চিঠি দিত, অথবা—যেমন এর আগে করেছে—নিজেই চলে আসত। নেখ্‌লুদভ শুনেছে, জনৈক অফিসার এখন তার উপর বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে; এতে

তার মনে ঈর্ষার উদ্রেগ হয়ে সে কিছুটা যন্ত্রণা পেলেও যে মিথ্যাচারের জীবন সে যাপন করছিল তার কবল থেকে মুক্তিলাভের আশা তাকে উৎসাহিত করেছে।

পরের চিঠিটা লিখেছে তার প্রধান সরকার। সরকার জানিয়েছে, দখল নেবার জন্য নেখ্‌লয়ুদভকে অবশ্যই জমিদারি পরিদর্শনে যেতে হবে; তাছাড়া তার মা বেঁচে থাকতে জমিজমার যে বিলি-ব্যবস্থা ছিল তাই ভবিষ্যতে চলবে, না যেমন সে (সরকার) পরলোকগতা প্রিন্সেসকে জানিয়েছে এবং এখনও প্রিন্সকে পরামর্শ দিচ্ছে যে বরং গো-মহিষাদির সংখ্যা বৃদ্ধি করে যে সব জমি চাষীদের বিলি করা হয়েছে সে সবই প্রিন্স নিজে চাষবাস করুন, সে সম্পর্কেও একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। সরকার লিখেছে, এই ব্যবস্থায় জমিজমা পরিচালনা অনেক বেশী লাভজনক হবে; সেই সঙ্গে ১লা তারিখে খাজনার যে তিন হাজার রুবল পাঠাবার কথা সেটা না পাঠাবার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনাও করেছে। পরের ডাকেই টাকাটা পাঠানো হবে। চাষীরা এতটা অনির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেছে যে এ ব্যাপারে তাকে শাসন-কর্তৃপক্ষের শরণ নিতে হয়েছিল, আর সেই জন্য টাকাটা পেতে দেরী হওয়াই এই বিলম্বের হেতু। চিঠির খানিকটা খারাপ, খানিকটা ভাল। এত বিস্তর সম্পত্তির সে মালিক এ কথা ভাবতেও ভাল লাগে, আবার খারাপও লাগে, কারণ সে হার্বার্ট স্পেন্সারের একজন উৎসাহী সমর্থক। সে নিজের প্রকাণ্ড সম্পত্তির উত্তরাধিকারী; কাজেই 'সোস্যাল স্ট্যাটিক্‌স্' বইতে স্পেন্সার যখন প্রচার করে যে ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা নিষিদ্ধ তখন কার দ্বারা সে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় এবং সেই বয়সের একরোখা দৃঢ়তায় জমিকে যে কখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে গণ্য করা চলে না এ কথা শুধু মুখে বলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালে প্রবন্ধ লিখেই ক্ষান্ত হয় নি, সেই দৃঢ় বিশ্বাস অনুযায়ী কাজও করেছে; ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা অন্যায় বিবেচনা করে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ৫০০ একর জমি সে চাষীদের বিলিয়ে দিয়েছিল। এখন মায়ের প্রকাণ্ড সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবার পরে দুটোর যে কোন একটা তাকে বেছে নিতে হবে: দশ বছর আগে যেমন বাবার জমি ছেড়ে দিয়েছিল সেই রকম এখনও সব জমি ছেড়ে দেওয়া, অথবা নিঃশব্দে স্বীকার করে নেওয়া যে তার আগেকার চিন্তা-ভাবনাগুলি ছিল ভ্রান্ত ও মিথ্যা।

প্রথমটা সে বেছে নিতে পারে না, কারণ ভূসম্পত্তি ছাড়া তার আর কোন আয়ের পথ নেই (সরকারী চাকরির কথা সে কখনও ভাবে নি); তার উপর যে বিলাসবহুল অভ্যাস সে গড়ে তুলেছে সেগুলো সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। তাছাড়া, সে সব প্রেরণাও আর নেই; দৃঢ় প্রত্যয়, যৌবনের স্থিরসংকল্প, আর অসাধারণ কিছু করবার উচ্চাকাংখা—সে সব বিদায় নিয়েছে। আর দ্বিতীয় পথ, অর্থাৎ স্পেন্সারের 'সোস্যাল স্ট্যাটিক্‌স্' বই থেকে জমিদারী

প্রথার ন্যায়হীনতার যে সব স্পষ্ট ও প্রশ্নাতীত প্রমাণ সে আহরণ করেছিল, এবং পরবর্তীকালে হেনরি জর্জের লেখায় যার সার্থক সমর্থন সে খুঁজে পেয়েছিল, সে সব কিছু থেকে চোখ বুঁজে থাকা—সে পথে চলাও তার পক্ষে অসম্ভব।

আর সেই জন্যই সরকারের চিঠি তার ভাল লাগে নি।

অধ্যায়—৪

কফি শেষ করে নেখ্‌লয়ুদভ সমনটায় একবার চোখ বুলিয়ে কখন তাকে আদালতে হাজির হতে হবে সেটা দেখে নিতে এবং প্রিন্সেসের চিঠির জবাব লিখতে পড়ার ঘরে চলে গেল। স্টুডিওর ভিতর দিয়ে যেতে যেতে ইজেলের সামনে একখানা অসমাপ্ত ছবি এবং দেয়ালে ঝোলানো কয়েকটা রেখা-চিত্র দেখে শিল্প-সাধনায় এগিয়ে যাবার অক্ষমতা, শক্তির অভাবের একটা অনুভূতি তাকে ছেয়ে ফেলল। ইদানীংকালে এ ধরনের অনুভূতি তার প্রায়ই হয়, এবং সেটা তার সূক্ষ্ম উন্নত নান্দনিক রুচিবোধের জন্যই হয় বলে সে মনে করে। তথাপি অনুভূতিটা খুবই অস্বস্তিকর।

এর সাত বছর আগে সে সামরিক চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছিল। তখন তার নিশ্চিত ধারণা ছিল যে তার শিল্প-প্রতিভা আছে এবং সেই শৈল্পিক উচ্চতার আসন থেকে আর সব রকম কাজকে একটা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে সেরকম করবার কোন অধিকার তার ছিল না; কাজেই যে সব জিনিস তাকে সেদিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় সে সবই তার কাছে অপ্রীতিকর। ভারাক্রান্ত মনে সে স্টুডিওর বিলাসবহুল সাজসরঞ্জামগুলো দেখতে লাগল। কাজেই আরাম, সুবিধা ও দৃষ্টি-সৌন্দর্যের দিকে চোখ রেখে গড়ে তোলা মস্ত বড় উঁচু সিলিং-এর স্টাডি-রুমে যখন সে ঢুকল তখনও তার মনের অবস্থা খুব সুখকর নয়।

মস্তবড় লেখার টেবিলের 'জরুরী' লেবেল-মারা খোপের মধ্যে সে সমনটা দেখতে পেল। বেলা এগারোটায় তাকে আদালতে হাজির হতে হবে।

নেখ্‌লয়ুদভ প্রিন্সেসের চিঠির জবাব লিখতে বসে আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে খাবারের সময় উপস্থিত থাকতে চেষ্টা করবে বলে জানিয়ে দিল। একটা চিঠি লিখে ছিঁড়ে ফেলল, কারণ তার মনে হল চিঠিটায় বড় বেশী অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পেয়েছে। আর একটা লিখল, কিন্তু মনে হল সেটা বড় বেশী নিস্পৃহ; তার ভয় হল এতে প্রিন্সেস অসন্তুষ্ট হতে পারে, কাজেই সেটাও ছিঁড়ে ফেলল। বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতামটা টিপতেই একটি বয়স্ক বিষণ্ণ-দর্শন লোক ঘরে ঢুকল; তার মুখে গোঁফ আছে, কিন্তু থুতনি ও ঠোঁট কামানো পরনে একটা ধূসর রঙের সুতির এপ্রন।

'একটা ইস্‌ভজ্‌চিক ডাকুন তো।'

'দিচ্ছি স্যার।'

'আর কর্চাগিনদের বাড়ির যে দাসীটি অপেক্ষা করছে তাকে বলে দিন আমন্ত্রণের জন্য আমি বাধিত হয়েছি এবং সেখানে যেতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'এটা ভদ্রতাসম্মত নয়, কিন্তু আমি লিখে জানাতে পারছি না। যেমন করেই হোক, আজ তার সঙ্গে দেখা করব,' এই কথা ভাবতে ভাবতে নেখ্‌লয়ুদভ ওভারকোটটা আনতে গেল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখল, তার পরিচিত রবার-টায়ার লাগানো একটা ইজভজচিক দরজায় তার জন্য অপেক্ষা করছে। অর্ধেকটা ঘুরে লোকটা বলল, 'কাল আপনি প্রিন্স কর্চাগিনের বাড়ি থেকে চলে যাবার ঠিক পরমুহূর্তেই আমি সেখানে হাজির হয়েছিলাম ; দরোয়ান বলল, এই মাত্র চলে গেলেন।'

নেখ্‌লয়ুদভ ভাবল, 'দেখছি ইজভজচিকওয়ালারাও কর্চাগিনদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা জেনে গেছে।' সেই সঙ্গে প্রিন্সেস কচাগিনকে বিয়ে করবে কিনা সে প্রশ্নটা আবার তার মনে এল এবং তৎকালীন আরও অনেক প্রশ্নের মতই এটারও কোন নিষ্পত্তি করতে পারল না।

ঘর-গৃহস্থালির আরাম তো আছেই, তাছাড়াও বিয়ে করলে একটা সৎ জীবন যাপন করা সম্ভব হবে এবং সে আশা করে যে একটি পরিবার—তার ছেলেমেয়ে —সবাই তার বর্তমানের শূন্য জীবনে একটা দিশা এনে দেবে, সাধারণভাবে বিয়ের স্বপক্ষে এটাই বড় যুক্তি। আর সাধারণভাবে বিয়েব বিপক্ষে রয়েছে প্রথম যৌবনোত্তর অবিবাহিত পুরুষদের মনের স্বাধীনতা হারাবার ভীতি এবং স্ত্রীলোক নাম্নী রহস্যময়ী জীবটি সম্পর্কে একটা অচেতন আতংক।

এই বিশেষ ক্ষেত্রে, মিসি-কে (তার নাম মারিয়া, কিন্তু বিশেষ বিশেষ যুগলের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুসারে তাকেও একটা ডাক-নাম দেওয়া হয়েছে) বিয়ে করার স্বপক্ষে আরও একটা যুক্তি আছে ; সে ভাল বংশের মেয়ে, এবং চলন, বলন ও হাসির ভঙ্গী—সব ব্যাপারেই সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা (কোন অসাধারণ গুণের জন্য নয়, তার কারণ 'ভাল শিক্ষা-দীক্ষা'—এই গুণটার অন্য কোন নাম তার জানা নেই, যদিও এটাকে সে খুবই মূল্য দিয়ে থাকে), তাছাড়া মিসি অন্যের চেয়ে তার কথাই বেশী ভাবে, কাজেই তাকে ঠিক-ঠিক বোঝেও। এই যে তাকে ঠিক মত বোঝা, তার উচ্চতর মূল্যকে স্বীকার করা, নেখ্‌লয়ুদভের কাছে এটাই তার শুভবুদ্ধি ও নির্ভুল বিচার-শক্তির প্রমাণ। বিশেষ করে মিসিকে বিয়ের বিরুদ্ধে যুক্তি হল, তার চাইতে উচ্চতর গুণসম্পন্না কোন মেয়ে নিশ্চয়ই পাওয়া যায় ; তার বয়স সাতাশ হয়ে গেছে, আর সম্ভবত সেই তার প্রথম প্রেমিক না। এই শেষ কথাটা তার কাছে বড়ই বেদনাদায়ক। এমন কি অতীত জীবনেও সে অপর কাউকে ভালবেসেছে, এই চিন্তার সঙ্গে তার গর্ববোধকে সে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে

পারছে না। অবশ্য তার সঙ্গে মিসির হয় তো আর কোন দিন দেখা হবে না, কিন্তু সে যে আর কাউকে ভালবাসতে পারে এই চিন্তাই তার পক্ষে অসহ্য।

কাজেই বিয়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তার যুক্তির সংখ্যা সমান; অন্ততঃ নেখ্‌ল্‌-যুদভের কাছে দু'দিকই সমান ভারি; তাই সে নিজেই নিজেকে ঠাট্টা করে বলে —উপকথার গাধা যে কোন্ খড়ের গাদায় মুখ দেবে তাই ঠিক করতে পারে না।

সে নিজে নিজেই বলতে লাগল, 'যাই হোক না কেন, মারিয়া ভাসিলয়েভ্‌না (মার্সালের স্ত্রী)-র কাছ থেকে কোন চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত এবং তার পাট একেবারে চুকিয়ে না ফেলা পর্যন্ত আমি কিছুই করতে পারি না। আর সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করতে সে পারে, এমন কি দেরী তাকে করতেই হবে, এই বিশ্বাস তাকে অনেকটা স্বস্তি এনে দিল।

'দেখা যাক, এ সবই পরে ভেবে দেখব', সে যখন নিজের মনে এই সব বলছে ততক্ষণে গাড়িটা অ্যাসফল্ট বাঁধানো পথ ধরে নিঃশব্দে চলতে চলতে আদালতের দরজায় হাজির হল।

'এবার আমি সুবিবেচনার সঙ্গে আমার কর্তব্য পালন করব; সব সময়ই আমি তা করে থাকি, কারণ সেটাই উচিত বলে মনে করি।' দ্বার-রক্ষককে পার হয়ে সে আদালতের হলে প্রবেশ করল।

অধ্যায়—৫

আদালতের বারান্দাগুলি ইতিমধ্যেই কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে। পরিচারকরা হরেক রকম সংবাদ ও কাগজপত্র নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে সশব্দে আসা-যাওয়া করছে। হাজিরা-ঘোষণাকারী, অ্যাডভোকেট ও আইন-পরামর্শদাতারা ইতস্তত চলাফেরা করছে। ফরিয়াদীরা এবং হাজত-মুক্ত আসামীরা হয় বিষণ্ণ মনে হেঁটে বেড়াচ্ছে, নয়তো বসে বসে অপেক্ষা করছে।

'নেখ্‌ল্যুদভ জনৈক পরিচালককে জিজ্ঞাসা করল, 'আদালত-কক্ষটা কোন্ দিকে?'

'কোন্‌টা? দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুটো আদালত আছে।'

"আমি একজন জুরি।"

'তাহলে ফৌজদারী আদালত বলুন। ডানদিকে গিয়ে তারপর বাঁয়ে—দ্বিতীয় দরজা।'

নেখ্‌ল্যুদভ নির্দেশ মত এগিয়ে গেল।

উল্লেখিত দরজায় দুজন লোক দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন লম্বা, মোটা, দয়ালু-হৃদয় এক ব্যবসায়ী, দেখলেই বোঝা যায় বেশ খানা-পিনা করে এসেছে, তাই মন-মেজাজ বেশ শরিফ। অপরজন ইহুদিবংশীয় একটি

দোকান-কর্মচারী। তারা তুলোর দাম নিয়ে আলোচনা করছিল, এমন সময় নেখ্‌ল্যুদভ সেখানে এসে জানতে চাইল সেটাই জুরিদের ঘর কি না।

'হ্যা মশাই, এটাই। আপনিও আমাদেরই একজন তাহলে? জুরিতেই আছেন তো?' খুশিতে চোখ ঠেরে ব্যবসায়ীটি জিজ্ঞাসা করল।

নেখ্‌ল্যুদভ সম্মতিসূচক জবাব দিলে সে বলে উঠল, 'খুব ভাল, সবাই মিলে এক সঙ্গে কাজ করা যাবে।' তারপর চওড়া নরম হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমার নাম বাকলাশভ, দ্বিতীয় গিল্ডের একজন ব্যবসায়ী। আমাদের সাধ্যমত কাজ করব!......তাহলে কার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য আমার হল?'

নেখ্‌ল্যুদভ নিজের নামটা বলে জুরিদের ঘরে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে নানা ধরনের প্রায় দশজন লোক ছিল। সকলে সবেমাত্র পৌঁচেছে; কেউ বসে আছে, কেউ পায়চারি করতে করতে পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করছে, পরিচয়-বিনিময় করছে। একজন ইউনিফর্মধারী অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল, জনাকয়েকের পরনে ফ্রক-কোট, কারও বা মর্নিং-কোট, আর একজনের গায়ে চাষীর পোশাক।

একটা সরকারী কর্তব্য পালনের খুশির ভাব তাদের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে; অবশ্য অনেককেই কাজকর্ম ফেলে আসতে হয়েছে এবং অনেকেই তা নিয়ে অভিযোগও করছে।

আবহাওয়ার কথা, প্রথম বসন্তের কথা, আর ব্যবসার ভাল-মন্দ নিয়েই জুরিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে: অনেকের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হয়ে গেছে, অনেকে আবার পরস্পরের পরিচয় নিয়ে মনে মনে চিন্তা করছে। নেখ্‌ল্যুদভের সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই তারা তড়িঘড়ি পরিচয়টা সেরে নিল। কারণ তাদের কাছে এটা একটা মর্যাদার ব্যাপার; আর নেখ্‌ল্যুদভ এটাকে তার প্রাপ্য হিসাবেই গ্রহণ করল,—অপরিচিতদের মধ্যে এলে সে সব সময়ই তাই করে থাকে। অধিকাংশ মানুষের সঙ্গে তুলনায় সে নিজেকে বড় মনে করে কেন, এ প্রশ্ন করলে সে কোন জবাব দিতে পারবে না, কারণ তার জীবন বিশেষ প্রতিভার কোন স্বাক্ষর বহন করে না। সে ঠিক জায়গায় টান দিয়ে ইংরেজী, ফরাসি ও জার্মান ভাষা বলতে পারে, এবং ব্যয়বহুল দোকান থেকে কেনা সবসেরা পোশাক-পরিচ্ছদ, টাই ও বোতাম ব্যবহার করে, কিন্তু এ সব কারণে সে যে নিজেকে বড় বলে দাবী করতে পারে না সেটা সে ভালই জানে। অথচ সে দাবী সে করে থাকে, কেউ সম্মান দেখালে সেটাকে প্রাপ্য বলেই মনে করে, আর সেটা না পেলে আঘাতও পায়। এই ঘরেই একজনের শ্রদ্ধাহীন ব্যবহার তাকে ব্যথিত করেছে। এই জুরীদের মধ্যে একজনকে সে আগেই চিনত, তার দিদির ছেলেমেয়েদের প্রাক্তন গৃহ-শিক্ষক পিয়তর গেরাসিমভিচ। নেখ্‌ল্যুদভ তার পদবিটা জানে না। লোকটি এখন কোন সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তার সঙ্গে পূর্ব-পরিচয়, তার আত্ম-তুষ্ট

উচ্চ হাসি—এক কথায় তার স্থূলতাকে নেখ্‌ল্যুদভ মোটেই সহ্য করতে পারছিল না।

'আহা! আপনাকেও ফাঁদে জড়িয়েছে' হো-হো হাসির সঙ্গে এই কথাগুলি দিয়েই পিয়তর্ গেরাসিমভিচ নেখ্‌ল্যুদভকে সম্বর্ধনা জানাল। 'তাহলে আপনিও গলে বেরিয়ে যেতে পারেন নি?'

গম্ভীরভাবে কঠোর গলায় নেখ্‌ল্যুদভ জবাব দিল, 'গলে বেরোবার চেষ্টা আমি কখনও করি নি।'

'বটে, আরে একেই তো বলে জন-সেবার মনোভাব। তবে একটু অপেক্ষা করুন, খিদে পাক বা ঘুম আসুক, তখন আপনিই অন্য সুরে কথা বলবেন।'

'এই পুরুতের বাচ্চা এরপর আমার পিঠ চাপড়াতে শুরু করবে', এই কথা ভেবে নেখ্‌ল্যুদভ এমন একটা দুঃখের ভাব সারা মুখে ছড়িয়ে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল যে দেখে মনে হল, যেন এই মাত্র সে তার সব আত্মীয়ের মৃত্যু-সংবাদ শুনতে পেয়েছে। একজন পরিষ্কার করে দাড়ি-গোঁফ কামানো, দীর্ঘদেহ, মর্যাদাসম্পন্ন লোককে ঘিরে একদল লোক তার মুখ থেকে কি যেন শুনছিল। নেখ্‌ল্যুদভ সেখানে গিয়ে হাজির হল। লোকটির জানা যে মামলাটা তখন দেওয়ানী আদালতে চলছিল তার বিচারকদল ও একজন বিখ্যাত অ্যাডভোকেটের নাম বেশ রসিয়ে রসিয়ে উল্লেখ করে সে মামলাটার বিবরণ পেশ করছিল। সে বলছিল, উক্ত বিখ্যাত অ্যাডভোকেট সুকৌশলে সমস্ত ব্যাপারটায় এমনভাবে মোড় ঘুরিয়ে দিল যে ন্যায় তার পক্ষে থাকা সত্ত্বেও এক বৃদ্ধ মহিলাকে যে ভাবে প্রচুর টাকা তার বিরোধী পক্ষকে দিতে হল সেটাই আশ্চর্য।

সে বলল, 'অ্যাডভোকেটটি প্রতিভাবান লোক।'

শ্রোতারা সশ্রদ্ধ মনোযোগের সঙ্গে সব শুনছিল। দু'একজন কিছু বলতে চাইলেই সেই লোকটি তাতে এমনভাবে বাঁধা দিচ্ছিল যেন একমাত্র সেই সব কিছু জানে।

বেশ দেরী করে এলেও নেখ্‌ল্যুদভকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হল। আদালতের একজন সদস্য তখনও পৌছয়নি, কাজেই সকলকেই অপেক্ষা করতে হচ্ছিল।

অধ্যায়—৬

আদালতের প্রেসিডেন্ট অনেকক্ষণ এসেছে। লোকটি লম্বা, শক্তসমর্থ, মুখে লম্বা ধূসর গোঁফ। বিবাহিত হলেও সে উচ্ছৃংখল-চরিত্র, আর তার স্ত্রীও তাই, কাজেই কেউ কারও পথে বাধার সৃষ্টি করে না। আজ সকালেই একটি সুইস্

মেয়ের কাছ থেকে সে একখানা চিঠি পেয়েছে। মেয়েটি আগে তার বাড়িতে গভর্নেস ছিল, এখন সে দক্ষিণ রাশিয়া থেকে পিতাসবার্গ চলেছে। সে লিখেছে, হোতেল ইতালিয়াতে সে পাঁচটা থেকে ছ'টা পর্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করবে। কাজেই তার ইচ্ছা ছিল, সকাল-সকাল আদালতের কাজ শুরু করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে দেবে, যাতে ছ'টার আগেই সে লাল-চুল ছোট্ট ক্লারা ভাসিল্যেভ্নার সঙ্গে মিলতে পারে, কারণ গত গ্রীষ্মকালে একটা গ্রামে গিয়ে তার সঙ্গে একটা পূর্বরাগের সঞ্চার হয়েছে।

তার নিজস্ব ঘরে ঢুকে সে দরজায় খিল এঁটে দিল, তারপর ক্যাবার্ড থেকে এক জোড়া ডাম্বেল নিয়ে দুটো হাতকে বিশবার উপরে, নীচে, সামনে ও পাশে ঘোরাল এবং ডাম্বেলজোড়াকে মাথার উপরে তুলে ধরে আস্তে আস্তে দুটো হাঁটুকে তিনবার ভাঙল।

বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের বাইসেপটা চেপে ধরে বলল, 'সচল থাকবার পক্ষে ঠাণ্ডাজলে স্নান আর ব্যায়ামের মত কিছু নেই। তার বাঁ হাতের অনামিকায় একটা সোনার আংটি পরানো। মূল ব্যায়ামটা করা তখনও বাকি (কারণ আদালতের দীর্ঘ অধিবেশনের আগে সব সময় সে ঐ দুটো ব্যায়াম করে থাকে), এমন সময় কে যেন দরজায় টান দিল। সভাপতি তাড়াতাড়ি ডাম্বেল দুটো রেখে দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'আপনাদের অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্য আমি দুঃখিত।'

সোনার চশমা পরা, উঁচু-ঘাড়, খুঁৎখুঁতে চেহারার একজন আদালতের লোক ঘরে ঢুকল।

বিরক্ত গলায় সে বলল, 'মাৎভী নিকিতি আজও আসে নি।'

ইউনিফর্ম পরতে পরতে প্রেসিডেন্ট বলল, 'এখনও আসে নি? সে সব সময়ই দেরী করে।'

বসে পড়ে একটা সিগারেট বের করে লোকটি সক্রোধে বলে উঠল, 'সে যে নিজের ব্যবহারে কি করে লজ্জাবোধ না করে পারে আমি তো ভেবে পাই না।'

এই ন্যায়নিষ্ঠ লোকটির সঙ্গে সেদিন সকালেই তার স্ত্রীর একটা অপ্রীতিকর সংঘর্ষ হয়ে গেছে। মাস শেষ হবার আগেই স্ত্রী তার মাসোহারার টাকা খরচ করে ফেলে আরও কিছু টাকা আগাম চেয়েছিল; কিন্তু সে তা দিতে রাজী না হওয়ায় ঝগড়া বেঁধে যায়। স্ত্রী সাফ বলে দিয়েছে, সে যদি এ রকম ব্যবহার করে তাহলে যেন খাবার আশা ছেড়ে দেয়, বাড়িতে তার খাবার জুটবে না। এই পর্যন্ত শুনে সে চলে এসেছে; তার ভয়, সে মুখে যা বলেছে কাজেও হয় তো তাই করবে, তার পক্ষে সবই সম্ভব।

কতকগুলি দলিলপত্র নিয়ে সেক্রেটারি হাজির হল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রেসিডেন্ট বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। কোন্ মামলাটা প্রথম ধরা হবে?'

সেক্রেটারি উদাসীনভাবে জবাব দিল, 'আমি তো বলি, বিষ খাওয়ানোর মামলাটা।'

'ঠিক আছে, বিষ খাওয়ানোর মামলাই হোক,' সে মামলাটা চারটের মধ্যে শেষ করে চলে যাওয়া যাবে একথা ভেবেই প্রেসিডেন্ট কথাগুলি বলল। 'আর মাৎভী নিকিতিচ; সে কি এসেছে?'

'এখনও আসে নি?'

'আর ব্রেভে?'

'তিনি এসেছেন,' সেক্রেটারি জবাব দিল।

'তাহলে তার সঙ্গে দেখা হলে বলে দেবেন যে আমরা বিষ খাওয়ানোর মামলাটা ধরেছি।'

ব্রেভে এই মামলার সরকারী উকিল।

বারান্দায়ই ব্রেভের সঙ্গে সেক্রেটারির দেখা হয়ে গেল। ঘাড় উঁচু করে এক বগলে একটা পোর্ট ফোলিয়ো নিয়ে অন্য হাতটা ঝোলাতে ঝোলাতে জুতোর ধাতব শব্দ তুলে সে বারান্দা দিয়ে সবেগে চলে যাচ্ছিল।

সেক্রেটারি প্রশ্ন করল, 'মিখাইল পেত্রভিচ জানতে চাইছেন, আপনি তৈরি তো?'

সরকারী উকিল বলল, 'নিশ্চয়, আমি সব সময়ই তৈরি। কোন্ মামলাটা আগে উঠছে?'

'বিষ খাওয়ানোর মামলা।'

'খুব ভাল কথা', মুখে বলল বটে, কিন্তু মনে মনে তা মোটেই ভাবল না। এক বন্ধুর বিদায়-উৎসবে যোগ দিতে কাল সারা রাত সে একটা হোটেলে কাটিয়েছে। ভোর পাঁচটা পর্যন্ত তাস খেলেছে আর মদ খেয়েছে, কাজেই বিষ খাওয়ানোর মামলাটা দেখবার সময়ই পায় নি, হয় তো এইবার চোখ বুলিয়ে নেবে। সেক্রেটারি ব্যাপারটা জানত বলেই ঐ মামলাটা তুলতে প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিয়েছে। মতাদর্শের দিক থেকে সেক্রেটারি উদারপন্থী, এমন কি তাকে চরমপন্থীও বলা যায়। ব্রেভে রক্ষণশীল দলের লোক এবং রাশিয়ার সব জার্মান বাসিন্দার মতই গোড়ামির ভক্ত। সেক্রেটারি তাকে অপছন্দ করে, পদমর্যাদার জন্য তাকে ঈর্ষা করে।

সেক্রেটারি প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, স্কপৎসি (একটি ধর্মীয় গোষ্ঠি)-দের খবর কি?'

'আমি তো বলে দিয়েছি, সাক্ষী না হলে আমি মামলা লড়তে পারব না। আদালতেও তাই বলব।'

'আরে মশাই, তাতে কি যায় আসে?'

'আমি লড়তে পারব না', সজোরে হাত নাড়তে নাড়তে কথাগুলি বলে ব্রেভে সবেগে নিজের ঘরে চলে গেল।

একটি অতি সাধারণ সাক্ষীর অনুপস্থিতির দরুণ সে স্বপৎসিদের মামলাটা পিছিয়ে দিচ্ছিল, কারণ তার বিশ্বাস কোন শিক্ষিত জুরির সামনে বিচার হলে তারা হয় তো খালাস পেয়ে যাবে। তাই প্রেসিডেন্টের সম্মতিক্রমেই স্থির হয়েছে যে কোন প্রাদেশিক শহরে আগামী অধিবেশনে ঐ মামলাটার বিচার হবে, সেখানে চাষীরা অনেক বেশী সংখ্যায় হাজির থাকবে, আর সেই হেতু শাস্তি হবার সম্ভাবনাও বেশী হবে।

বারান্দার হট্টগোল বাড়তে লাগল। আদালতের ব্যাপারে বহু-অভিজ্ঞ এই ভদ্রলোক কর্তৃক উল্লেখিত মামলাটা যে আদালতে চলছিল সেই দেওয়ানী আদালতের দরজার সামনেই লোকের ভীড় সবচাইতে বেশী।

আদালতের কাজের সাময়িক বিরতি হল। আদালত-কক্ষ থেকে সেই বৃদ্ধা বেরিয়ে এল। তার সব সম্পত্তি অ্যাডভোকেটের কারসাজিতে তার সেই ব্যবসায়ী মক্কেলটি পেয়ে গেছে, অথচ তার কোন দাবীই ঐ সম্পত্তিতে থাকতে পারে না। কিন্তু মক্কেলটি যে তাকে দিয়েছে দশ হাজার রুবল, আর নিজে লাভ করল এক লাখ রুবল।

অধ্যায়—৭

অবশেষে মাৎভী নিকিতিচও হাজির হল, আর পরিচয়-ঘোষক কর্মচারীটিও জুরিদের ঘরে ঢুকল। কর্মচারীটির রোগা চেহারা, লম্বা গলা, কেমন একটু পাশ কাটিয়ে হাঁটে, নীচের ঠোঁটটা সব সময় একদিকে বেরিয়ে থাকে। লোকটি সৎ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত, কিন্তু মাতলামির জন্য কোন চাকরিই বেশী দিন রাখতে পারে না। তিন মাস আগে তার স্ত্রীর শুভার্থিনী জনৈকা কাউন্টেস তাকে এই চাকরিটি করে দিয়েছে, আর চাকরিটা এতদিন রাখতে পেরেছে বলে সে নিজেও খুব খুশি।

নাকের উপর পিঁস-নে চাপিয়ে চারদিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'শুনুন ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা সবাই হাজির তো?'

একটি স্ফূর্তিবাজ বণিক বলল, 'মনে হচ্ছে সবাই।'

'ঠিক আছে; এখনই দেখছি।' পকেট থেকে একটা তালিকা বের করে সে পর পর নামগুলি ডাকতে লাগল, আর কখনও পিঁস-নের ভিতর দিয়ে, কখনও বা তার উপর দিয়ে লোকগুলিকে দেখতে লাগল।

'কাউন্সিলর অব স্টেট আই. এম. নিকিফরভ?'

'আমি', আদালতের ব্যাপারে বহু-অভিজ্ঞ সেই মর্যাদাসম্পন্ন-দেখতে লোকটি বলল।

'আইভান সেমিয়োনভিচ আইভানভ, অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল।'

'এই যে।' ইউনিফর্মধারী অবসরপ্রাপ্ত অফিসার সেই সরু লোকটি বলল।

'সেকেণ্ড গিল্ডের ব্যবসায়ী পিওতর্ বাক্লাশভ।'

মুখ-ভরা হাসি ছড়িয়ে আমুদে ব্যবসায়ীটি বলল, 'এখানেই আছি, হাজির।'

'রক্ষীবাহিনীর লেফ্টেন্যাণ্ট প্রিন্স দিমিত্রি নেখ্ল্যুদভ।'

'আমি সেই লোক,' বলল নেখ্ল্যুদভ।

যেন তাকে অন্য লোক থেকে আলাদা করবার জন্যই পরিচয়-ঘোষক পিঁস-নের উপর দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বিনীতভাবে অভিবাদন জানাল।

'ক্যাপ্টেন য়ুরি দমিত্রিয়েভিচ দান্চেংকো; গ্রেগরি ইয়েফিমভিচ কুলেশভ, বণিক,' ইত্যাদি ইত্যাদি। দু'জন ছাড়া আর সকলেই উপস্থিত।

সাদরে হাত বাড়িয়ে দরজাটা দেখিয়ে পরিচয়-ঘোষক বলল, 'মশাইরা, এবার দয়া করে আদালতে চলুন।'

সকলেই দরজার দিকে এগোল, একে অন্যকে পথ করে দিল। বারান্দা পার হয়ে আদালতে প্রবেশ করল।

মস্ত লম্বা ঘরে আদালত বসে। একদিকে তিনটে সিঁড়ি বেয়ে উঠলে একটা উঁচু প্ল্যাটফর্ম। তার উপর একটা টেবিল। গাঢ় সবুজ পাড় বসানো সবুজ কাপড়ে ঢাকা। টেবিলের পিছনে তিনটে হাতল-ওয়ালা চেয়ার, পিছনটায় কারুকার্যকরা ওক-কাঠ লাগানো। সে সবের পিছনের দেয়ালে ফ্রেমে-বাঁধানো সম্রাটের একখানি উজ্জ্বল রঙে আঁকা পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি ঝুলছে; পরনে ইউনিফর্ম, একটা পা সামনের দিকে বাড়ানো, হাতে তরবারি। ডান দিকের কোণে কাঁটার মুকুট-পরা খৃস্টের একটা মূর্তি ঝোলানো রয়েছে, আর তারই নীচে একটি বক্তৃতা করার ছোট স্ট্যাণ্ড ও সরকারী উকিলের ডেস্ক। ডেস্কের বিপরীতে বাঁ দিকে রয়েছে সেক্রেটারির টেবিল; একেবারে জনতার দিকে আছে একটা ওক-কাঠের রেলিং আর তার পিছনের দিকে কয়েদীর কাঠগড়া। সেটা এখন খালি। প্ল্যাটফর্মের ডান দিকে রয়েছে জুরিদের উঁচু-পিঠওয়ালা একসারি চেয়ার, এবং নীচের মেঝেতে অ্যাডভোকেটদের টেবিল। এ সবই আদালতের সামনের দিকে অবস্থিত, একটা রেলিং দিয়ে পিছনের অংশ থেকে আলাদা করা।

পিছন দিকে উপর-নীচ করে সাজানো অনেকগুলি আসন। সামনের সারিতে চারজন স্ত্রীলোক—হয় দাসী নয়তো কারখানার মজুরণী এবং দুজন মজুর বসে আছে। ঘরের জাকজমক দেখে তারা সবাই হতভম্ব হয়ে গেছে, ফলে কথাবার্তা বলছে ফিসফিস করে।

একটু পরেই জুরিরা ঢুকল। পরিচয়-ঘোষক তার সেই কাত-হওয়া ভঙ্গীতে ঢুকে সামনে এগিয়ে গেল এবং যেন উপস্থিত সকলকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যই চড়া গলায় হাঁক দিল, 'আদালত আসছেন।'

সকলে উঠে দাঁড়াল। আদালতের সদস্যগণ সিঁড়ি বেয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে গেল। প্রথমে পেশীবহুল দেহ ও চমৎকার গোঁফ নিয়ে এল প্রেসিডেন্ট।

তারপর এল সেই বিষণ্ণ-বদন সদস্যটি যার স্ত্রী বাড়িতে খাবার জুটবে না বলে হুমকি দিয়েছে। সকলের শেষে এল আদালতের তৃতীয় সদস্য মাৎভী নিকিতিচ। সে তো সব সময়ই দেরী করে আসে। লোকটির মুখভরা দাড়ি, বড় বড় গোল গোল দুটি চোখে দয়ার আভাষ। লোকটি পাকস্থলীর ক্ষতে ভুগছে। চিকিৎসকের পরামর্শে আজ থেকেই তার একটা নতুন চিকিৎসা আরম্ভ হয়েছে বলেই আজ তাকে অন্য দিনের তুলনায় আরও বেশীক্ষণ বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। প্ল্যাটফর্মের দিকে যেতে যেতে সে মনে মনে প্রশ্ন করল, নতুন চিকিৎসাটা তার পক্ষে উপকারী হবে কিনা এবং মনে মনেই স্থির করল যে, দরজা থেকে তার চেয়ার পর্যন্ত যেতে যতবার পা ফেলতে হবে সেটা যদি তিন দিয়ে বিভাজ্য হয় তাহলে নতুন চিকিৎসায় তার ক্ষত নিরাময় হবে। ছাব্বিশবার পা ফেলবার পরে চেয়ারের কাছে গিয়ে কোন রকমে সাতাশ বার পা ফেলবার ব্যবস্থা করেও নিল।

সোনালী জরির কাজ-করা কলার বসানো পোশাকে প্রেসিডেন্ট ও অন্য সদস্যদের খুবই ভারিক্কী দেখাচ্ছিল। তারা ঝটপট যার যার আসনে বসে পড়ল। সামনের সবুজ কাপড়ে ঢাকা টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে ঈগল-বসানো একটা ত্রিভূজাকৃতি বস্তু, দুটো কাঁচের পাত্র,—যে ধরনের পাত্রে মিষ্টির দোকানে মিষ্টান্নাদি রাখা হয়ে থাকে—একটা দোয়াত, কলম, সাদা কাগজ, আর নতুন করে কাটা রকমারি পেন্সিল।

অধ্যায়—৮

কাগজপত্র দেখে নিয়ে পরিচয়-ঘোষক ও সেক্রেটারিকে কতকগুলি প্রশ্ন করে সম্মতিসূচক জবাব পেয়ে প্রেসিডেন্ট হুকুম দিল, কয়েদীদের আনা হোক।

সঙ্গে সঙ্গে রেলিংয়ের পিছনকার দরজাটা খুলে গেল। মাথায় টুপি, হাতে তলোয়ার দুজন সৈনিক ঘরে ঢুকল; তাদের পিছনে কয়েদীরা: একটি লাল-চুল, রোদে-পোড়া পুরুষ ও দুটি স্ত্রীলোক। লোকটির পরনে কয়েদীদের ঢিলে আলখাল্লা। তার পক্ষে সেটা যেমন লম্বায় তেমনি চওড়ায় বড়। সে বুড়ো আঙুল দুটোকে বের করে শরীরের সঙ্গে চেপে ধরেছে যাতে অত্যন্ত লম্বা আস্তিন দুটো তার হাতকে ঢেকে নীচে ঝুলে না পড়ে। বিচারকদের দিকে না তাকিয়ে সে একদৃষ্টিতে দেখতে লাগল বেঞ্চটাকে, তারপর বেঞ্চের অপর কোণায় গিয়ে একেবারে পাশ ঘেঁসে এমনভাবে বসল যাতে অন্যদের বসবার মত যথেষ্ট জায়গা থাকে। এবার প্রেসিডেন্টের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে তার গালের পেশীকে নাড়াতে লাগল, যেন ফিসফিস করে কিছু বলছে। তারপরে যে স্ত্রীলোকটি এল তারও পরনে কয়েদীর আলখাল্লা, আর মাথায় বাঁধা কয়েদীদের রুমাল। তার বয়স হয়েছে, মুখের রং পাঁশুটে, ভুরুতে বা চোখের পাতায় লোম

নেই, চোখ দুটো লাল। আলখাল্লাটা একটা কিছুতে আটকে গেলে সে তাড়াহুড়ো না করে সতর্কতার সঙ্গে সেটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসনে বসল।

তৃতীয় কয়েদীটিই মাসলভা।

সে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আদালতের সবগুলি চোখ তার দিকেই ঘুরে গেল; তার ফ্যাকাসে মুখ, উজ্জ্বল চকচকে একজোড়া কালো চোখ ও কয়েদীর আলখাল্লায় ঢাকা উদ্ধত বুকের উপর নিবদ্ধ হল সকলের চোখ। এমন কি যে সৈনিকটিকে পাশ কাটিয়ে সে তার আসনে গিয়ে বসল সেও একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর একসময় কাজটা ঠিক হচ্ছে না বুঝতে পেরে হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেকে একটা ঝাঁকুনি দিল এবং সামনের জানালাটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

কয়েদীরা আসন গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট চুপ করে রইল। মাসলভা আসনে বসলে সে সেক্রেটারির দিকে তাকাল।

তারপর যথারীতি কাজকর্ম শুরু হল: জুরিদের নাম ডাকা, যারা গর-হাজির তাদের সম্পর্কে মন্তব্য, তাদের কাছ থেকে কত জরিমানা আদায় করা হবে সেটা নির্দ্ধারণ, যারা জরিমানা মুকুবের দাবী জানিয়েছে তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত, এবং রিজার্ভ জুরি নিয়োগ।

কতকগুলি কাগজের টুকরোকে ভাঁজ করে সেগুলিকে কাঁচের পাত্রে ভরে প্রেসিডেন্ট তার পোশাকের জরির কাজ-করা আস্তিন খানিকটা গুটিয়ে তার লোমশ কব্জি বের করে যাদুকরের ভঙ্গীতে এক একটি কাগজের টুকরো বের করে খুলে দেখতে লাগল। তারপর আস্তিন নামিয়ে দিয়ে জুরিদের শপথ গ্রহণ করাতে পুরোহিতকে অনুরোধ করল।

বৃদ্ধ পুরোহিত ফোলা-ফোলা, হলদেটে বিবর্ণ মুখ, বাদামী গাউন, সোনার ক্রুশ চিহ্ন ও ছোট মেডেল নিয়ে জোব্বায় ঢাকা অনড় পা দুটোকে অনেক কষ্টে টানতে টানতে যীশুর মূর্তির নীচেকার ডেস্কের কাছে হাজির হল। জুরিরাও উঠে দাঁড়িয়ে তার সামনে ভীড় করল।

মোটা হাত দিয়ে বুকের উপরকার ক্রুশ-চিহ্নটাকে টেনে ধরে পুরোহিত বলতে লাগল, "দয়া করে এগিয়ে আসুন।" সকলে না আসা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে লাগল।

মঞ্চের সিঁড়ি বেয়ে সকলে উপরে উঠে আসবার পরে পুরোহিত তার টাক-পড়া মাথাটাকে আপাদলম্বিত আলখাল্লার তেলচিটে গলার ভিতর দিয়ে গলিয়ে দিল এবং মাথার বিরল সাদা চুলগুলোকে পরিপাটি করে গুছিয়ে নিয়ে আবার জুরিদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। কোঁচকানো মোটা হাতখানা তুলে যেন আঙুলের ফাঁকে কিছু ধরে আছে এমনি ভাবে বৃদ্ধা ও অন্য দুটি আঙুলকে একত্র করে কাঁপা-কাঁপা বুড়োটে গলায় সে বলতে লাগল, "এবার এইভাবে আপনাদের ডান হাত তুলুন এবং এই রকম করে আঙুলগুলোকে এক সঙ্গে ধরুন। এবার

আমার সঙ্গে সঙ্গে বলুন, "সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তাঁর পবিত্র কথামৃত, এবং জীবন-দায়ক ক্রুশ-চিহ্নের নামে শপথ লইয়া আমি বলিতেছি যে এই কাজ যাহা"—"আহা, আপনার হাত নামাবেন না। এইভাবে তুলে রাখুন" জনৈক যুবক হাত নামিয়ে ফেলায় পুরোহিত এই মন্তব্য করে পুনরায় শপথ গ্রহণ করাতে গিয়ে বলতে লাগল, "যে এই কাজ যাহা…"

গোঁফওয়ালা সম্ভ্রান্ত চেহারার লোকটি, কর্ণেল, ব্যবসায়ী ও আরো কয়েকজন পুরোহিতের নির্দেশ মতই হাত ও আঙুল বেশ উঁচু করে সঠিকভাবেই তুলে ধরে রাখল, যেন কাজটা তাদের বেশ পছন্দসই ; অনেকে আবার কাজটা করল অনিচ্ছায় হেলাফেলাভাবে। অনেকে কথাগুলো এত জোরে, এমন উদ্ধত ভঙ্গীতে উচ্চারণ করতে লাগল যেন তারা বলতে চায়, "যাই ঘটুক না কেন, আমি কথা বলবই।" অনেকে আবার খুব নীচু গলায় ধীরে ধীরে কথাগুলি বলতে বলতে যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে দ্রুতগতিতে পুরোহিতের সঙ্গে গলা মেলাতে চেষ্টা করতে লাগল। কেউ বা আঙুলগুলোকে বেশ শক্ত করে চেপে ধরে রইল পাছে আঙুলের ফাঁক দিয়ে অদৃশ্য কোন বস্তু গলে পড়ে যায় ; আবার কেউ বা আঙুলগুলোকে একবার খুলছে, আবার একত্র করছে। একমাত্র বুড়ো পুরোহিত ছাড়া আর সকলের কাছেই ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছিল ; পুরোহিত কিন্তু মনে করছে যে সে একটা খুব দরকারী ও গুরুত্বপূর্ণ কাজই করছে।

শপথ গ্রহণ শেষ হলে প্রেসিডেণ্ট জুরিদের একজন 'ফোরম্যান' মনোনীত করতে বলল। অমনি জুরিরা দরজার দিকে ভীড় করে তাদের আলোচনার ঘরে চলে গেল এবং সেখানে প্রায় সকলেই সিগারেট খেতে শুরু করে দিল। তাদের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার লোকটিকেই ফোরম্যান হতে প্রস্তাব করল এবং সর্বসম্মতিক্রমে সে প্রস্তাব গৃহীত হল। তখন জুরিরা সিগারেট নিভিয়ে ফেলে দিয়ে আদালতে চলে গেল। সম্ভ্রান্ত লোকটি প্রেসিডেণ্টকে জানাল যে সেই ফোরম্যান মনোনীত হয়েছে। তারপর সকলেই আবার উঁচু পিঠওয়ালা চেয়ারে বসল।

সবকিছুই সুচারুরূপে, দ্রুতগতিতে ও আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হল। এতে যারা অংশগ্রহণ করল তারা সকলেই বেশ খুশি। তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হল যে একটি গুরুতর মূল্যবান দায়িত্ব তারা পালন করছে। এ কথা নেখ্‌লয়ুদ-ভেরও মনে হল।

জুরিরা আসন গ্রহণ করতেই প্রেসিডেণ্ট তাদের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে একটি ভাষণ দিল। ভাষণ দেবার সময় সে অনবরতই তার শরীরের অবস্থানকে নানা ভাবে পরিবর্তিত করতে লাগল : কখন ডাইনে ঝুঁকছে, কখনও বাঁয়ে, কখনও চেয়ারের পিঠটাকে চেপে ধরছে, কখনও ভর দিচ্ছে হাতলের উপর, কখনও কাগজখানা সোজাসুজি ধরছে, কখনও পেন্সিলটা নাড়া-চাড়া করছে আবার কখনও বা কাগজ-কাটা ছুরিটা।

প্রেসিডেন্ট তাদের জানাল, তার মারফতে কয়েদীদের জিজ্ঞাসাবাদ করবার, কাগজপত্র ব্যবহার করবার, এবং প্রমাণ হিসাবে দাখিল করা জিনিসপত্র পরীক্ষা করে দেখবার অধিকার তাদের আছে। তাদের কর্তব্য ন্যায় বিচার করা, বিচারের ফাঁকি নয়। তাদের দায়িত্বের অর্থ হল, তাদের আলোচনার গোপনীয়তা যদি লঙ্ঘিত হয়, বাইরের লোক যদি সে সব জানতে পারে, তাহলে তারাও শাস্তিযোগ্য। সকলেই সশ্রদ্ধ মনোযোগের সঙ্গে কথাগুলি শুনতে লাগল। চারদিকে মদের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে এবং সশব্দ হিক্কাকে কোনভাবে সংযত রাখতে রাখতে ব্যবসায়ীটি প্রত্যেকটি বাক্যকেই মাথা নেড়ে সমর্থন জানাতে লাগল।

অধ্যায়—৯

ভাষণ শেষ করে প্রেসিডেন্ট কয়েদীদের দিকে তাকাল। "সাইমন কারতিংকিন, দাঁড়াও।"

সাইমন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তার ঠোঁটদুটি দ্রুত নড়ছে।

"তোমার নাম?"

"সাইমন পেত্রভিচ কারতিংকিন" চেঁরা গলায় হড়বড় করে বলল; স্পষ্টই বোঝা গেল জবাবটা বানানো।

"তুমি কোন্ শ্রেণীর লোক?"

"চাষী।"

"কোন্ গুবারনিয়া, কোন্ জেলা, কোন্ অঞ্চল?"

"কোন্ গুবারনিয়া, কোন্ জেলা, কোন্ অঞ্চল?"

"তুলা গুবারনিয়া, ক্রাপিভেন্স্কি জেলা, কুপিয়ানস্কি অঞ্চল, ও গ্রাম বর্কি।"

"তোমার বয়স কত?"

"তেত্রিশ; জন এক হাজার আট—"

"ধর্ম কি?"

"রুশ ধর্ম, গোঁড়া।"

"বিবাহিত?"

"না, ইয়োর অনার।"

"পেশা কি?"

"হোতেল মরিতানিয়াতে খানসামা ছিলাম।"

"আগে কখনও তোমার বিচার হয়েছে?"

"আগে কখনও বিচার হয় নি, কারণ, যেহেতু আগে আমরা থাকতাম—"

"তাহলে আগে কখনও তোমার বিচার হয় নি?"

"ঈশ্বর না করুন। কখনও না।"

"অভিযোগের একটা কপি কি তুমি পেয়েছ?"

"পেয়েছি।"

"বস।"

দ্বিতীয় কয়েদীর দিকে তাকিয়ে প্রেসিডেন্ট বলল,"এভ্‌ফিমিয়া আইভানভ্‌না বচ্‌কভা।"

কিন্তু সাইমন তখনও বচ্‌কভার সামনে দাঁড়িয়েই রয়েছে।

"কারতিংকিন, বসে পড়।"

কারতিংকিন দাঁড়িয়েই রইল।

"কারতিংকিন, বসে পড়।"

কিন্তু পরিচয়-ঘোষক তার কাত-করা মাথা ও অদ্ভুত রকমের বড় বড় চোখ নিয়ে দৌড়ে গিয়ে রাগত কণ্ঠে ফিসফিস করে "বসে পড়, বসে পড়!" বলতে তবেই কারতিংকিন বসল। যেমন তাড়াহুড়া করে সে উঠে দাঁড়িয়েছিল তেমনি করেই বসে পড়ল, এবং আলখাল্লাটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে নিঃশব্দে গাল নাড়াতে লাগল।

কয়েদীর দিকে না তাকিয়ে সামনের কাগজটার উপর চোখ রেখেই প্রেসিডেন্ট একটা শান্ত নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার নাম?" সভাপতি তার কাজে এতই অভ্যস্ত যে তাড়াতাড়ি কাজ সারবার জন্য সে এক সঙ্গে দুটো কাজ করে থাকে।

বচ্‌কভার বয়স তেতাল্লিশ বছর, এসেছে কলম্‌না শহর থেকে। সেও হোতেল মরিতানিয়াতে কাজ করত।

"আমার আগে কখনও বিচার হয় নি, এবং অভিযোগের একটা কপি আমি পেয়েছি।" সাহসের সঙ্গে এমন স্বরে সে জবাব দিল যে মনে হয় বুঝি প্রতিটি জবাবের সঙ্গে সে বাড়তি কিছু বলতে চায়। "হ্যাঁ, এভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কভা; আর অভিযোগপত্র পেয়েছি; আর কে কি জানে না জানে কেয়ার করি না, এবং বাজে কথার ধার ধারি না।"

শেষ প্রশ্নের জবাব দিয়েই কারও কথার অপেক্ষা না করে সে বসে পড়ল।

বিশেষ শিষ্টাচারের সঙ্গে তৃতীয় কয়েদীর দিকে ফিরে নারী-দরদী প্রেসিডেন্ট বলল, "তোমার নাম?" মাসলভা তখনও বসে আছে দেখে সে শান্ত ভদ্র কণ্ঠে বলল, "তোমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে।"

মাসলভা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। সুস্মিত কালো চোখ দুটিতে প্রস্তুতির বিশেষ ভঙ্গী এনে বুক ফুলিয়ে প্রেসিডেন্টের দিকে চোখ তুলে দাঁড়িয়ে রইল।

"তোমার নাম কি?"

"ল্যুবভ", সে দ্রুত জবাব দিল।

কয়েদীদের প্রশ্ন করার সময় নেখ্‌ল্যুদভ চোখে পিঁস-নে লাগিয়েছিল। এবার কয়েদীর উপর থেকে চোখ না ফিরিয়ে সে মনে মনে বলল, "না, এ অসম্ভব। "ল্যুবভ! তা কেমন করে হয়?" জবাব শুনে সে মনে মনে

বলল। প্রেসিডেন্ট আরও প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু চশমাধারী সদস্যটি বাধা দিল, রাগতঃ স্বরে কানে কানে কি যেন বলল। প্রেসিডেন্ট মাথা নেড়ে আবার কয়েদীর দিকে মুখ ফেরাল।

বলল, "এটা কি হল? তোমার নাম তো এখানে ল্যুবভ বলে লেখা নেই।"

কয়েদী চুপ করে রইল।

"আমি তোমার আসল নাম জানতে চাই।"

ক্রুদ্ধ সদস্যটি প্রশ্ন করল, "তোমার দীক্ষান্ত নাম কি?"

"আগে আমাকে কাতেরিনা বলে ডাকত।"

"না, এ হতে পারে না," নেখ্‌ল্যুদভ মনে মনে বলল। এতক্ষণে সে নিশ্চিত বুঝেছে যে এই সেই, সেই মেয়েটি, আধা-সন্তান, আধা-দাসী, একদিন যাকে সে ভালবেসেছিল, সত্যি ভালবেসেছিল, এবং এক উন্মত্ত বাসনার মুহূর্তে তাকে ভুলিয়ে পাপের পথে এনে তারপর পরিত্যাগ করেছিল, আর কখনও তার কথা মনেও করে নি—কারণ সে স্মৃতি বড়ই বেদনাদায়ক, সে স্মৃতি তাকে স্পষ্টতই দণ্ডিত করত, প্রমাণ করতে যে নিজের চারিত্রিক সংহতি সম্পর্কে গর্ব-বোধ করা সত্ত্বেও স্ত্রীলোকটির প্রতি সে ন্যাক্কারজনক কুৎসিত আচরণ করেছে।

হ্যাঁ, এই সেই। তার মুখে স্পষ্টভাবে সেই আশ্চর্য অবর্ণনীয় ব্যক্তিত্বের আভাষ সে দেখতে পাচ্ছে যা প্রতিটি মুখকে অন্য সব মুখ থেকে আলাদা করে রাখে; এমন একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। ঐ মুখের স্বাস্থ্যহীন বিবর্ণতা সত্ত্বেও সেই মধুর ব্যক্তিত্ব সেখানে ফুটে উঠেছে: ওই দুটি ঠোঁটে, চোখের ঈষৎ ভ্রূকুটিতে, কণ্ঠস্বরে, এবং বিশেষ করে তার মুখের সরল হাসিতে ও দেহের সদাপ্রস্তুত ভঙ্গিমায়।

প্রেসিডেন্ট পুনরায় নরম গলায় মন্তব্য করল, "সেটাই তোমার বলা উচিত ছিল। তোমার পৈত্রিক নাম?"

"আমি জারজ।"

"আচ্ছা তোমাকে কি ধর্ম-পিতার নামে ডাকা হত না?"

"হত। মিথাইলভ্‌না।"

নেখ্‌ল্যুদভ সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। সে মনে মনে বলল, "কি দোষ সে করেছে?"

প্রেসিডেন্ট বলেই চলেছে, "তোমার পারিবারিক নাম—মানে তোমার উপাধির কথা বলছি।"

"সকলে আমাকে আমার মায়ের উপাধিতেই ডাকত।"

"কোন্ শ্রেণী?"

"মেশ্‌চাংকা (নিম্ন মধ্যবিত্ত নাগরিক)।"

"ধর্ম গোঁড়া?"

"গোঁড়া।"

"পেশা? তোমার পেশা কি ছিল?"

মাসলভা চুপ করে রইল।

"তুমি কি কাজ করতে?"

"আমি একটা প্রতিষ্ঠানে ছিলাম।"

চশমাধারী সদস্য কড়া গলায় প্রশ্ন করল, "কি ধরনের প্রতিষ্ঠান?"

"আপনি নিজেই তো জানেন," বলেই সে হাসল। তারপর দ্রুত চারদিকে চোখ বুলিয়ে আবার প্রেসিডেন্টের দিকে চোখ ফেরাল।

তার মুখের ভঙ্গিতে এমন অসাধারণ কিছু ছিল, তার কথায়, তার হাসিতে ঘরের চতুর্দিকে দ্রুত দৃষ্টি-সঞ্চালনে এমন একটা ভয়ংকর ও করুণ অর্থ ফুটে উঠেছিল যে প্রেসিডেন্টও লজ্জাবোধ করল এবং আদালতে পরিপূর্ণ নৈঃশব্দ নেমে এল। সমবেত জনতার একজনের হাসিতে সে নৈঃশব্দ ভঙ্গ হল। তখন একজন বলে, "সশ্"। আর প্রেসিডেন্ট চোখ তুলে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করল:

"এর আগে কখনও তোমার বিচার হয়েছে?"

"কখনও না", নরম গলায় জবাব দিয়ে মাসলভা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

"অভিযোগের একটা কপি কি তুমি পেয়েছ?"

"পেয়েছি", সে জবাব দিল।

"বস।"

একজন ভদ্রমহিলা যে ভাবে পোশাক সামলায় সেই ভাবে পিছনে একটু হেলে সে তার স্কার্টটা তুলে বসে পড়ল। প্রেসিডেন্টের দিকে স্থিরদৃষ্টি রেখে আলখাল্লার আস্তিনের মধ্যে সাদা হাত দুখানি গুটিয়ে নিল।

সাক্ষীদের ডাকা হল। কেউ বা চলেই গেছে। যে ডাক্তারটি বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করবে তাকে ঠিক করে আদালতে ডাকা হল।

তখন সেক্রেটারি উঠে অভিযোগপত্রটি পড়তে লাগল। সে বেশ স্পষ্ট করে জোর গলায় পড়ল (যদিও 'এল্' এবং 'আর' অক্ষর দুটিকে একইভাবে উচ্চারণ করল), কিন্তু খুব দ্রুত পড়ার জন্য একটি শব্দ আর একটি শব্দের মধ্যে এমন ভাবে ঢুকে যেতে লাগল যে সব মিলিয়ে একটা অবিচ্ছিন্ন একঘেয়ে কলগুঞ্জনের সৃষ্টি হল।

বিচারকরা কখনও চেয়ারের এ-হাতলে কখনও ও-হাতলে ঝুঁকে বসল, কখনও বা টেবিলের উপর ঝুঁকল, কখনও বা সোজা হয়ে বসল, একবার চোখ বন্ধ করল। আবার চোখ বুজল, আর নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল। একজন রক্ষী-সৈনিক তো বার কয়েক একটা হাই চেপে রাখল।

কয়েদী কারতিংকা গাল নাড়ানো থামাল না। বচ্‌কভা চুপচাপ খাড়া হয়ে বসে রইল; শুধু মাঝে মাঝে রুমালের নীচ দিয়ে মাথাটা চুলকোতে লাগল;

পাঠকের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে মাসলভা নিশ্চল হয়ে বসে রইল; শুধু মাঝে মাঝে সামান্য নড়েচড়ে যেন কিছু বলতে চেয়েই লজ্জায় লাল হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল; তারপর হাত দুটোর স্থান পরিবর্তন করে চারদিকে একবার তাকিয়ে আবার পাঠকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

প্রথম সারির শেষ থেকে দ্বিতীয় আসনে উঁচু পিঠওয়ালা চেয়ারে বসে নেখ্‌লয়ুদভ পিঁস-নে-হীন চোখে মাসলভার দিকে তাকিয়ে বসেছিল; তার মনের মধ্যে তখন চলেছে জটিল এক বেদনার্ত সংগ্রাম।

অধ্যায়—১০

অভিযোগটি এই রকম :

"১৮৮- সালের ১৭ই জানুয়ারী সাইবেরিয়ার কুরগান শহর থেকে আগত ফেরাপন্ত স্মেলকভ নামক সেকেণ্ড গিল্ডের জনৈক বণিক হোতেল মরিতানিয়ায় হঠাৎ মারা যায়।

"চতুর্থ জেলার স্থানীয় পুলিশ-ডাক্তারের মতে অত্যধিক মদ্যপানের ফলে হৃদযন্ত্র ফেটে যাওয়ায় মৃত্যু ঘটেছে। উক্ত স্মেলকভের দেহ কবর দেওয়া হয়।

"কয়েকদিন পরে স্মেলকভের বন্ধু ও একই শহরবাসী সাইবেরিয়ার বণিক তিমোখিন পিতার্সবাগ-সফর শেষ করে ফিরে এসে স্মেলকভের মৃত্যুর পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা শুনে সন্দেহ প্রকাশ করে যে, তার সঙ্গে যে টাকা ছিল সেটা চুরি করার উদ্দেশ্যে তাকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে।

"যে প্রাথমিক তদন্তে তার এই সন্দেহ সমর্থিত হয় তার থেকে জানা গেছে :

"(১) যে মৃত্যুর ঠিক আগে স্মেলকভ তার ব্যাংক থেকে ৩,৮০০ রুবল তুলেছিল, কিন্তু মৃতের জিনিসপত্রের যে তালিকা করা হয়েছে তাতে মাত্র ৩১২ রুবল ১৬ কোপেকের উল্লেখ আছে।

"(২) যে মৃত্যুর পূর্বের সারাটা দিন ও রাত স্মেলকভ বেশ্যালয়ে এবং হোতেল মরিতানিয়াতে তার ঘরে ল্যুব্‌কা (কাতেরিনা মাসলভা) নাম্নী একটি বেশ্যার সঙ্গে কাটায় এবং তার অনুরোধে ও তার অনুপস্থিতিতে কাতেরিনা মাসলভা টাকা আনবার জন্য বেশ্যালয় থেকে ঐ ঘরে যায়। হোটেলের দুটি চাকর এভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কভা এবং সাইমন কারতিংকিনের সামনেই মাসলভা স্মেলকভের নিজের দেওয়া চাবির সাহায্যে যে পোর্টম্যাণ্টোতে টাকা ছিল সেটার তালা খোলে এবং বন্ধ করে। বচ্‌কভা ও কারতিংকিন তাদের সাক্ষ্যে বলেছে যে পোর্টম্যাণ্টোটা খোলা হলে তারা তার মধ্যে তাড়া তাড়া একশ' রুবলের ব্যাংকনোট দেখেছে।

"(৩) যে স্মেলকভ বেশ্যা ল্যুব্‌কাকে সঙ্গে নিয়ে বেশ্যালয় থেকে হোতেল মরিতানিয়াতে ফিরে গেলে ল্যুব্‌কা কারতিংকিনের পরামর্শ মত তারই দেওয়া

একটা সাদা গুঁড়ো এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডিতে ছড়িয়ে দেয় এবং সেটা স্মেলকভকে পান করতে দেওয়া হয়।

"(৪) যে পরদিন সকালে ল্যুব্‌কা (কাতেরিনা মাসলভা) তার বাড়িউলি (বেশ্যালয়ের মালকানি সাক্ষী কিতায়েভা)-কে একটা হীরের আংটি বিক্রি করে ; ভক্ত মাসলভা দাবী করে যে আংটিটা স্মেলকভ তাকে উপহার দিয়েছিল।

"(৫) যে স্মেলকভের মৃত্যুর পরদিন হোটেলের প্রধান পরিচারিকা এভ্‌ফিমিয়া ব্যাংকের কারেণ্ট অ্যাকাউণ্টে ১,৮০০ রুবল জমা দেয়।.

"স্মেলকভের মৃতদেহের ডাক্তারি পরীক্ষা, শব-ব্যবচ্ছেদ এবং স্মেলকভের পরিপাক-যন্ত্রে প্রাপ্ত পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণে বিষের উপস্থিতি প্রকাশ পায় আর তার থেকেই সিদ্ধান্ত করা হয় যে বিষ-প্রয়োগের ফলেই মৃত্যু হয়েছে।

"আসামী মাসলভা, বচ্‌কভা ও কারতিংকিন সকলেই নিজেকে নির্দোষ বলেছে। মাসলভা বলেছে, যে-বেশ্যালয়ে সে 'কাজ করে' (এই শব্দই সে ব্যবহার করেছে) বণিক স্মেলকভ যখন সেখানে ছিল তখন সেই তাকে টাকা আনতে হোতেল মরিতানিয়াতে পাঠায়, এবং বণিকের দেওয়া চাবি দিয়ে পোর্টম্যাণ্টোর তালা খুলে সে তার কথা মতই চল্লিশ রুবল বের করে নেয়, তার বেশী নয় ; সে আরও বলেছে যে বচ্‌কভা ও কারতিংকিন, যাদের সামনেই সে পোর্টম্যাণ্টোটা খুলেছিল ও বন্ধ করেছিল, তারাই তার কথার সত্যতা স্বীকার করবে।

"সে সাক্ষ্যে আরও বলেছে যে, দ্বিতীয়বার হোটেলে গিয়ে সে সাইমন কারতিংকিনের প্ররোচনায় এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে এক রকম গুঁড়ো মিশিয়ে স্মেলকভকে দেয় ; সে ভেবেছিল ওটা আফিমঘটিত কোন ওষুধ, আর তাই আশা করেছিল যে সে ওটা খেলেই ঘুমিয়ে পড়বে এবং সেও তার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পারবে। আংটি সম্পর্কে সে বলেছে, স্মেলকভ তাকে মারধোর করলে যখন সে কাঁদতে কাঁদতে চলে যাবে বলে ভয় দেখায় তখন সে নিজেই ওটা তাকে দিয়ে দেয়।

"জেরার সময় আসামী এভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কভা বলেছে যে খোয়া-যাওয়া টাকার কথা সে কিছুই জানে না, এমন কি সে স্মেলকভের ঘরেও যায় নি, বরং ল্যুব্‌কা একাই সেখানে খুব ব্যস্ত ছিল ; যদি কিছু চুরি গিয়ে থাকে তাহলে ল্যুব্‌কা যখন বণিকের চাবি নিয়ে টাকা নিতে এসেছিল তখন নির্ঘাৎ সেই ও কাজ করেছে।"

এই সময় মাসলভা চমকে উঠে মুখ খুলে বচ্‌কভার দিকে তাকাল।

সেক্রেটারী বলতে লাগল, "ব্যাংকের এক হাজার আটশ' রুবলের রসিদটা দেখিয়ে যখন বচ্‌কভাকে জিজ্ঞাসা করা হল, সে এত টাকা পেল কোথায়, তখন সে জানায় ওটা তার বারো বছরের উপার্জিত টাকা এবং সাইমনের উপার্জিত টাকা ; তাদের দুজনের শিগগিরই বিয়ে হবে।

"প্রথম জেরার সময় আসামী কারতিংকিন স্বীকার করে যে মাসলভার

প্ররোচনায়—সেই বেশ্যালয় থেকে চাবিটা নিয়ে এসেছিল—বচ্‌কভা ও সে টাকাটা চুরি করে এবং মাসলভাসহ নিজেদের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে নেয়।"

এই সময় মাসলভা আবার চমকে ওঠে, এমনকি লজ্জায় লাল হয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং কিছু বলতে শুরু করে, পরিচয়-ঘোষক তাকে থামিয়ে দেয়।

"অবশেষে", সেক্রেটারি পড়েই চলেছে, "কারতিংকিন স্বীকার করে যে স্মেলকভকে ঘুম পাড়াবার জন্য সে-ই গুঁড়োটা সরবরাহ করেছিল। দ্বিতীয় দফা জেরার সময় সে টাকাচুরির ব্যাপারে বা মাসলভাকে গুঁড়োটা দেবার ব্যাপারে তার যোগসাজস সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এবং অভিযোগ করে যে মাসলভা একাই কাজটা করেছে। বচ্‌কভা কর্তৃক ব্যাংকে টাকা রাখার ব্যাপারে বচ্‌কভা যা বলেছে সেও তাই বলল—অর্থাৎ বার বছর ধরে হোটেলের বাসিন্দারা টিপ্‌স্ হিসাবে টাকাটা তাদের দিয়েছে।"

তারপর শুরু হল কয়েদীদের মুখোমুখি জেরার বিবরণ, সাক্ষীদের প্রতিবেদন এবং বিশেষজ্ঞদের অভিমত। অভিযোগপত্রের উপসংহারে বলা হয়েছে :

"উপরি-উক্ত বিবরণের ফলে রবকি গ্রামের তেত্রিশ বছর বয়স্ক চাষী সাইমন কারতিংকিন; তেতাল্লিশ বছর বয়স্কা মেচশাংকা এভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কভা; এবং সাতাশ বছর বয়স্কা মেচ্‌শাংকা কাতেরিনা মাসলভাকে এই বলে অভিযুক্ত করা যাচ্ছে যে ১৮৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি তারা যুগ্মভাবে উক্ত বণিক স্মেলকভের টাকা ও দু হাজার পাঁচশ' রুবল মূল্যের হীরের আংটি চুরি করেছে, এবং তাদের অপরাধ গোপন করবার জন্য তার প্রাণনাশের উদ্দেশ্য নিয়ে উক্ত বণিক স্মেলকভকে বিষপান করতে দিয়েছে ও সেই ভাবে তার মৃত্যু ঘটিয়েছে।

"দণ্ডবিধির ১৪৫৩ ধারায় এই অপরাধের মোকাবিলার ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং ফৌজদারি আদালত বিধির ২০১ ধারা মতে চাষী সাইমন কারতিংকিন, মেচ্‌শাংকা এভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কভা ও মেচ্‌শাংকা কাতেরিনা মাসলভাকে জেলা আদালতে জুরির বিচারার্থে সোপর্দ করা হল।"

এই ভাবে সেক্রেটারি দীর্ঘ অভিযোগপত্র শেষ করল এবং কাগজপত্র ভাঁজ করে নিয়ে হাত দিয়ে লম্বা চুলগুলি ঠিকঠাক করে আসন গ্রহণ করল। সকলে এই কথা ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল যে এইবার তদন্ত শুরু হবে, এই সব গোলযোগ পরিষ্কার হয়ে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। এইমাত্র নেখ্‌লয়ুদভের মনে একথা জাগল না; যে মাসলভাকে সে দশ বছর আগে একটি নিরীহ মিষ্টি মেয়ে বলে জানত সেই মাসলভা কী এমন করতে পারে, সেই চিন্তার আতংকই তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলল।

অধ্যায়—১১

অভিযোগপত্র পড়া শেষ হলে কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রেসিডেন্ট এমনভাবে কারতিংকিনের দিকে তাকাল যেন পরিষ্কার বলছে, "এবার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণসহ আমরা পুরো সত্যটাই আবিষ্কার করব।"

বাঁদিকে ঝুঁকে সে বলল, "চাষী সাইমন কারতিংকিন।"

সাইমন কারতিংকিন উঠে দাঁড়াল, হাত দুটো দু' পাশে ঝুলিয়ে দিল এবং গোটা শরীরটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে রেখে নিঃশব্দে গাল নাড়তে লাগল।

ডান দিকে ঝুঁকে প্রেসিডেন্ট বলল, "তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ১৮৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি তুমি এভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কভা ও কাতেরিনা মাসলভার সঙ্গে যোগসাজসে বণিক স্মেলকভের পোর্টম্যান্টো থেকে টাকা চুরি করেছ, এবং তারপর সেঁকো বিষ সংগ্রহ করে এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে সেটা বণিক স্মেলকভকে খাওয়াতে কাতেরিনা মাসলভাকে প্ররোচিত করেছ ও স্মেলকভের মৃত্যু ঘটিয়েছ। তুমি অপরাধ স্বীকার করছ?"

"কখনও না, কারণ আমাদের কাজই হচ্ছে অতিথিদের সেবা করা এবং—"

"সে সব কথা পরে বলবে। তুমি কি অপরাধ স্বীকার করছ?" শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে প্রেসিডেন্ট শুধাল।

"এমন কাজ করতেই পারি না, কারণ তাহলে—"

পরিচয়-ঘোষক পুনরায় সাইমন কারতিংকিনের কাছে ছুটে গেল এবং গম্ভীর-ভাবে ফিসফিস করে তাকে থামিয়ে দিল।

যে হাতে কাগজখানা ছিল সেটা সরিয়ে প্রেসিডেন্ট কনুইটাকে এমনভাবে রাখল যেন সে বলতে চায় যে "কাজ শেষ হয়েছে", এবং তারপরই এভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কভার দিকে মুখ ফেরাল।

"এভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কভা, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ১৮৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি তুমি সাইমন কারতিংকিন ও কাতেরিনা মাসলভার সঙ্গে যোগসাজসে হোতেল মরিতানিয়াতে বণিক স্মেলকভের পোর্টম্যান্টো থেকে কিছু টাকা ও একটা আংটি চুরি করেছ, এবং টাকাটা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়ে বণিক স্মেলকভকে বিষ খাইয়েছ এবং সেইভাবে তার মৃত্যু ঘটিয়েছ। তুমি অপরাধ স্বীকার করছ?"

কয়েদী সাহসের সঙ্গে দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল, "আমি কোন দোষে দোষী নই। আমি সে ঘরের ধারে কাছেও যাই নি, কিন্তু এই ফিচ্‌কে মেয়েটা যখন ঘরে ঢুকেছিল তখন সব কিছু তারই কর্ম।"

প্রেসিডেন্ট পুনরায় শান্ত ও দৃঢ়স্বরে বলল, "সে কথা পরে বলবে। তাহলে তুমি অপরাধ স্বীকার করছ না?"

"আমি টাকা নেই নি, পানীয় দেই নি, বা ঘরের ভিতরে যাই নি। যদি যেতাম তাহলে ওকে লাথি মেরে বের করে দিতাম।"

"তাহলে তুমি অপরাধ স্বীকার করছ না?"

"কখনও না।"

"ঠিক আছে।"

তৃতীয় কয়েদীর দিকে ফিরে প্রেসিডেণ্ট শুরু করল, "কাতেরিনা মাসলভা, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, বণিক স্মেলকভের পোর্টম্যাণ্টোর চাবি নিয়ে বেশ্যালয় থেকে এসে তুমি তার পোর্টম্যাণ্টো থেকে কিছু টাকা ও একটা আংটি চুরি করেছ।" বাঁদিক থেকে একজন সদস্য তার কানে কানে বলল যে, জিনিসের তালিকায় উল্লেখিত একটা পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। তার দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রেসিডেণ্ট মুখস্ত-করা পড়ার মত কথাগুলি বলে যেতে লাগল। "তার পোর্ট-ম্যাণ্টো থেকে কিছু টাকা, ও একটা আংটি চুরি করেছ এবং ভাগাভাগি করে নিয়েছ। তারপর স্মেলকভের সঙ্গে হোটেলে ফিরে গিয়ে তার পানীয়ে বিষ মিশিয়ে খেতে দিয়েছ এবং এইভাবে তার মৃত্যু ঘটিয়েছ। তুমি অপরাধ স্বীকার করছ?"

সে দ্রুত জবাব দিতে লাগল, "আমি কোন দোষে দোষী নই। আগেও বলেছি, আবারও বলছি, আমি নেই নি—আমি নেই নি—আমি কিছুই নেই নি—আর আংটিটা সে নিজেই আমাকে দিয়েছিল।"

প্রেসিডেণ্ট প্রশ্ন করল, "দু হাজার পাঁচশ পাউণ্ড চুরির অপরাধ তুমি স্বীকার কর না?"

"বলেছি তো, চল্লিশ রুবলের বেশী কিছুই আমি নেই নি।"

"আচ্ছা, বণিক স্মেলকভের পানীয়ের সঙ্গে একটা গুঁড়ো মিশিয়ে দেবার অপরাধ কি তুমি স্বীকার করছ?"

"হ্যাঁ, তা আমি করেছি। তবে তাদের কথা আমি বিশ্বাস করেছি। তারা বলেছিল ওটা ঘুমের ওষুধ, ওতে কোন ক্ষতি হবে না। আমি কখনও ভাবি নি, কখনও চাই নি······ঈশ্বর আমার সাক্ষী, এ আমি কখনও চাই নি," সে বলল।

সভাপতি বলল, "তাহলে বণিক স্মেলকভের টাকা ও আংটি চুরির অভিযোগ তুমি স্বীকার করছ না; কিন্তু তুমি যে তাকে গুঁড়োটা দিয়েছিলে তা স্বীকার করছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা স্বীকার করছি; কিন্তু আমি ভেবেছিলাম ওটা ঘুমের ওষুধ। তাকে ঘুম পাড়াবার জন্যই ওটা দিয়েছিলাম; এ রকম খারাপ কিছু হোক আমি চাই নি, কখনও ভাবিও নি।"

"খুব ভাল কথা," ফলাফল যতটা পাওয়া গেল তাতে বেশ সন্তুষ্ট হয়েই প্রেসিডেণ্ট বলল। "এবার বলতো কি ভাবে সব ঘটনাটা ঘটল।" প্রেসিডেণ্ট চেয়ারে হেলান দিয়ে হাত দুটি টেবিলের উপর রাখল। "সব কথা খুলে বল। স্বাধীন ও পূর্ণ স্বীকারোক্তি দিলে তোমার সুবিধাই হবে।"

মাসলভা নীরবে প্রেসিডেণ্টের দিকে সোজা তাকিয়ে রইল।

"আমাদের বল কি ভাবে সব ঘটল।"

হঠাৎ মাসলভা দ্রুত কথা বলতে শুরু করল, "কিভাবে ঘটল! আমি হোটেলে এলাম। ঘরটা দেখিয়ে দেওয়া হল। সে সেখানেই ছিল, মদে একেবারে চুর।" বিস্ফারিত দুই চোখে আতংক ফুটিয়ে মাসলভা "সে" কথাটা উচ্চারণ করল। "আমি চলে যেতে চাইলাম, কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়বে না।" সে থামল, মনে হল কথার সূত্র হারিয়ে ফেলেছে, বা অন্য কোন কথা মনে পড়েছে।

"আচ্ছা; তারপর?"

"তারপর? কিছুক্ষণ থেকে আমি বাড়ি চলে গেলাম।"

এই সময়ে একটা কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে সরকারী উকিল নিজেকে একটুখানি তুলে ধরল।

প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি কোন প্রশ্ন করতে চান?" সম্মতি-সূচক জবাব পেয়ে সভাপতি ইঙ্গিতে সরকারী উকিলকে কিছু বলতে আহ্বান করল।

"আমি প্রশ্ন করতে চাই, কয়েদী কি আগে থেকেই সাইমন কারতিংকিনের সঙ্গে পরিচিত ছিল?" মাসলভার দিকে না তাকিয়েই সরকারী উকিল কথা-গুলি বলল এবং প্রশ্ন শেষ করে ঠোঁট দুটি চেপে ধরে ভুরু কুঞ্চিত করল।

প্রেসিডেন্ট প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করল। মাসলভা ভীত দৃষ্টিতে সরকারী উকিলের দিকে তাকাল।

"সাইমনের সঙ্গে? হ্যাঁ," সে বলল।

"আমি জানতে চাই, কারতিংকিনের সঙ্গে কয়েদীর কি ধরনের পরিচয় ছিল? তাদের কি প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হত?"

"কি ধরনের?——অতিথিদের জন্য সে আমাকে ডেকে আনত; আসলে সেটা কোন পরিচয়ই নয়," চোখের দৃষ্টিটা উদ্বেগের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট থেকে সরকারী উকিলের দিকে এবং আবার প্রেসিডেন্টের দিকে ফিরিয়ে মাসলভা জবাব দিল।

চোখ দুটো অর্ধেক বুজে, একটা ধূর্ত মেফিস্টোফেলিস-সুলভ হাসি হেসে সরকারী উকিল বলল, "আমি জানতে চাই, কারতিংকিন অন্য কোন মেয়েকে না ডেকে শুধু মাসলভাকেই বা ডাকত কেন?"

চারদিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য চোখ দুটো নেখ্‌লুদভের উপর নিবদ্ধ করে মাসলভা বলল, "আমি জানি না। কেমন করে জানব? তার যাকে খুশি তাকেই ডাকত।"

"এ কি সম্ভব যে ও আমাকে চিনতে পেরেছে?" এ কথা ভাবতেই সব রক্ত নেখ্‌লুদভের মুখে ছুটে এল। কিন্তু তাকে অন্য সকলের থেকে পৃথক না করে মাসলভা ঘুরে আবার সরকারী উকিলের দিকে উৎকণ্ঠার সঙ্গে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"অতএব কারতিংকিনের সঙ্গে কোন রকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা কয়েদী অস্বীকার করছে। খুব ভাল। আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার নেই।"

তখন প্রেসিডেন্ট আবার কথা বলল, "আচ্ছা, তারপর কি হল?"

প্রেসিডেন্টের দিকে অধিকতর সাহসের সঙ্গে তাকিয়ে মাসলভা বলল, "আমি বাসায় ফিরে এলাম এবং বাড়িউলিকে টাকাটা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। সবে ঘুম এসেছে এমন সময় বার্থা বলে একটি মেয়ে আমাকে ডেকে তুলল। "যাও, তোমার সেই বণিক আবার এসেছে।" আমি যেতে চাই নি, কিন্তু মাদাম আমাকে যেতে বলল। সে"—আবারও বেশ ভীতির সঙ্গেই "সে" শব্দটা উচ্চারণ করল—"সে মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি চালাতে লাগল এবং আরও মদ আনতে বলল; কিন্তু তখন তার সব টাকা ফুরিয়ে গেছে, আর মাদামও তাকে বিশ্বাস করে না, কাজেই সে আমাকে আস্তানায় পাঠাল, আর বলে দিল কোথায় টাকা আছে এবং কত টাকা আনতে হবে। কাজেই আমিও গেলাম।"

প্রেসিডেন্ট বাঁ দিকের সদস্যের সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছিল, কিন্তু যাতে সকলে বুঝতে পারে যে সব কথাই সে শুনছে তাই সে শেষের কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করল।

"তাহলে তুমি গেলে। বেশ, তারপর কি হল?"

"আমি গিয়ে তার কথামত কাজ করলাম; তার ঘরে গেলাম। আমি একা যাই নি, সাইমন কারতিংকিন ও ওকেও ডেকে নিলাম," সে বচ্‌কভাকে দেখিয়ে বলল।

"মিথ্যে কথা, আমি কখনও ঘরে ঢুকি নি," বচ্‌কভা বলতে শুরু করতেই তাকে থামিয়ে দেওয়া হল।

ভুরু কুঁচকে বচ্‌কভার দিকে না তাকিয়ে মাসলভা বলতে লাগল, "ওদের সামনেই চারখানা দশ-রুবলের নোট বের করলাম।"

উকিল আবার প্রশ্ন করল, "ঠিক কথা, কিন্তু চল্লিশ রুবল বের করার সময় কয়েদী কি লক্ষ্য করেছিল সেখানে কত টাকা ছিল?"

যখনই উকিল তাকে কিছু বলে তখনই মাসলভা কেঁপে ওঠে; কেন এ রকম হয় সে জানে না, কিন্তু এটা বুঝতে পারে যে সে তার ক্ষতি করতে চাইছে।

"আমি গুণে দেখি নি, শুধু কতকগুলি একশ' রুবলের নোট দেখেছিলাম।"

"আহা! কয়েদী একশ' রুবলের নোটগুলি দেখেছিল। ঠিক আছে।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রেসিডেন্ট বলল, "তাহলে তুমি টাকাটা নিয়ে এলে।"

"নিয়ে এলাম।"

"আচ্ছা, তারপর?"

"তখন সে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল," মাসলভা বলল।

"আচ্ছা, গুঁড়োটা তাকে কি ভাবে দিলে? পানীয়ের সঙ্গে?"

"কি ভাবে দিলাম? মিশিয়ে দিয়ে দিলাম।"

"কেন দিলে?"

সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না, একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বলল, "সে আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না, আর আমিও খুবই ক্লান্ত, তাই দালানে গিয়ে সাইমনকে বললাম: 'সে যদি আমাকে ছেড়ে দিত, আমি বড়ই ক্লান্ত।' তখন সে বলল, 'ওকে নিয়ে আমরাও আর পারছি না; ওকে একটা ঘুমের ওষুধ দেবার কথা ভাবছি; তাহলেই ও ঘুমিয়ে পড়বে আর তুমিও চলে যেতে পারবে।' তখন আমি বললাম, 'ঠিক আছে।' আমি ভাবলাম ওতে কোন ক্ষতি হবে না, আর সে-ই আমাকে প্যাকেটটা দিল। আমি ভিতরে গেলাম। সে বেড়ার ও-পাশে শুয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাণ্ডি চাইল। টেবিল থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতলটা নিয়ে দুটো গ্লাসে ঢাললাম; একটা তার জন্য আর একটা আমার; তার গ্লাসে গুঁড়োটা ঢেলে দিয়ে তাকে দিলাম। আগে জানলে কি তাকে সেটা দিতে পারতাম?"

"আচ্ছা, আংটিটা তোমার হাতে এল কি করে?" প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসা করল।

"সে নিজেই আমাকে দিয়েছিল।"

"কখন দিয়েছিল?"

"যখন তার আস্তানায় ফিরে গেলাম তখন। আমি চলে যেতে চাইলে সে আমার মাথায় আঘাত করে চিরুনিটা ভেঙে দিল। আমি রেগে গিয়ে বললাম যে চলে যাব, সে তখন আঙুল থেকে আংটিটা খুলে আমাকে দিল যাতে আমি না যাই," মাসলভা বলল।

সরকারী উকিল নিজেকে একটুখানি তুলে ধরে বলল, "আমি জানতে চাই, বণিক স্মেলকভের ঘরে কয়েদী কতক্ষণ ছিল?"

মাসলভা আবার ভয় পেল; উৎকণ্ঠিতভাবে সরকারী উকিলের উপর থেকে প্রেসিডেন্টের উপর দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে দ্রুত বলে উঠল:

"কতক্ষণ ছিলাম আমার মনে নেই।"

"বটে, কিন্তু কয়েদীর কি মনে পড়ে স্মেলকভের ঘর থেকে বেরিয়ে সে হোটেলের অন্য কোথাও গিয়েছিল কি না?"

মাসলভা একমুহূর্ত ভাবল। "হ্যাঁ, পাশের একটা খালি ঘরে গিয়েছিলাম।"

সরকারী উকিল নিজের কথা ভুলে মাসলভাকে সরাসরি প্রশ্ন করল, "ঠিক, কিন্তু সেখানে গিয়েছিলে কেন?"

"একটু বিশ্রাম নিতে এবং একটা ইজভজচিক ডেকে আনা পর্যন্ত অপেক্ষা করবার জন্য সেখানে গিয়েছিলাম।"

"আর সে ঘরে কারতিংকিন কয়েদীর সঙ্গে ছিল কি না?"

"সে এসেছিল।"

"কেন এসেছিল?"

"বণিকের ব্র্যাণ্ডি কিছুটা বেচে গিয়েছিল, দুজনে সেটা শেষ করেছিলাম।"

"ওহো, দুজনে একত্রে শেষ করেছিলে। খুব ভাল! আর কয়েদী কি কারতিংকিনের সঙ্গে কথা বলেছিল, এবং বলে থাকলে কি বিষয়ে কথা বলেছিল?"

মাসলভা হঠাৎ ভুরু কোঁচকাল, তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল; সে দ্রুত বলে উঠল:

"কি বিষয়ে? কোন বিষয়েই আমি কথা বলি নি; বাস্, আমি এইটুকুই জানি। আপনার যা খুশি করতে পারেন; আমি নির্দোষ, বাস।"

"আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই," এই কথা বলে একটু অস্বাভাবিকভাবে কাঁধ দুটোকে উঁচু করে সে তার বক্তৃতার নোটের মধ্যে লিখল, কয়েদীর নিজের সাক্ষ্যমোতাবেকই জানা যায় যে কারতিংকিনের সঙ্গে সে খালি ঘরটায় গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

"তোমার আর কিছু বলবার নেই?"

"সব কথাই বলেছি," দীর্ঘশ্বাস ফেলে কথাগুলি বলে সে বসে পড়ল।

তখন প্রেসিডেন্ট কি যেন নোট করল, এবং বাঁ দিককার সদস্যটি তার কানে কানে কি যেন বলায় দশ মিনিটের বিরতি ঘোষণা করে দ্রুত উঠে আদালত-কক্ষ ত্যাগ করল। সদয় চোখ দাড়িওয়ালা দীর্ঘকায় সদস্যটি তাকে জানিয়েছে যে হজমের গোলমালের জন্য তার কিছুটা 'ম্যাসাজ' করা ও ওষুধ খাওয়া দরকার। আর সেই জন্যই আদালতের কাজের বিরতি ঘোষণা করা হয়েছে।

বিচারকরা উঠে দাঁড়ালে অ্যাডভোকেট, জুরি ও সাক্ষীরাও উঠে দাঁড়াল, এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের একটা অংশ শেষ হয়েছে এই খুশির মনোভাব নিয়ে যে যার জায়গায় চলে গেল।

নেখ্‌লয়ুদভ জুরিদের ঘরে গিয়ে জানালার পাশে বসল।

অধ্যায়—১২

"হ্যাঁ, এই সেই কাতয়ুশা।"

নেখ্‌লয়ুদভ ও কাতয়ুশার সম্পর্কটা এইভাবে গড়ে উঠেছিল:

নেখ্‌লয়ুদভ যখন প্রথম কাতয়ুশাকে দেখে তখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র; গ্রীষ্মের ছুটিটা পিসীদের কাছে কাটাতে এসে ভূমি-স্বত্বের উপর একটা প্রবন্ধ রচনায় ব্যস্ত। এর আগে পর্যন্ত সে সব সময়ই গ্রীষ্মকালটা কাটিয়েছে তার মা ও দিদির সঙ্গে, মায়ের মস্কোর নিকটবর্তী মস্ত বড় জমিদারিতে। কিন্তু সে বছর তার দিদির বিয়ে হয়ে গেল, আর মাও চলে গেল বাইরে একটা স্বাস্থ্যপ্রদ স্নানের জায়গায়, কাজেই সে স্থির করল, প্রবন্ধটা

লিখবার জন্ম গ্রীষ্মকালটা পিসীদের বাড়িতেই কাটাবে। জায়গাটা খুবই চুপচাপ, আর তার মনোযোগ আকর্ষণ করার মতও কিছু সেখানে নেই ; পিসীরা এই ভাই-পো এবং উত্তরাধিকারীটিকে খুবই ভালবাসে, আর সেও তাদের দুজনকে এবং তাদের সরল সেকেলে জীবনযাত্রাকে পছন্দ করে।

পিসীদের বাড়িতে সে তার জীবনযাত্রাকে এই ভাবে ছকে নিল। খুব সকালে—অনেক দিন তিনটের সময়—ঘুম থেকে উঠে সূর্যোদয়ের আগেই ভোরের কুয়াসার ভিতর দিয়ে পাহাড়ের নীচেকার নদীতে স্নান করতে চলে যেত। যখন ফিরত তখনও ঘাসের উপরে ও ফুলের বুকে শিশির-বিন্দু চিকচিক করত। কখনও কফি খেয়ে প্রবন্ধটা লেখার জন্য বই ও কাগজপত্র নিয়ে বসত ; কিন্তু প্রায়ই লেখাপড়ার বদলে বাড়ি ছেড়ে মাঠে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। খাবার আগে বাগানেই কোন জায়গায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। খাবার সময় পিসীদের সঙ্গে খুব হাসি-ঠাট্টা করত, তারপর ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ত, নয়তো নদীতে যেত নৌকো চালাতে। আর সন্ধ্যায় কখনও পড়তে বসত, আবার কখনও বা পিসীদের সঙ্গে "পেশেন্স" খেলত।

অনেক রাতে, বিশেষ করে চাঁদনি রাতে, জীবনের আনন্দের আবেগে তার মন এমনভাবে ভরে উঠত যে সে ঘুমুতে পারত না ; না ঘুমিয়ে নিজের স্বপ্নে ও চিন্তায় বিভোর হয়ে সে বাগানে ঘুরে বেড়াত, কখনও কখনও রাত ভোর হয়ে যেত।

এইভাবে সুখে ও শান্তিতে পিসীদের বাড়িতে একটা মাস কেটে গেল। পিসীদের আধা-সন্তান আধা-দাসী কৃষ্ণাঙ্গী, দ্রুত-সঞ্চারিণী কাতয়ুশার দিকে তার কোনরকম নজরই পড়ল না। মায়ের পক্ষছায়ায় বড় হবার দরুন সেই সময় (উনিশ বছর বয়স) পর্যন্ত নেখ্‌লুদভ ছিল একান্তভাবে পবিত্র। কোন স্ত্রীলোক, যাদের সঙ্গে তার বিয়ে হতে পারে না, তারা তার কাছে স্ত্রীলোক নয়, মনুষ্যমাত্র।

কিন্তু সেই গ্রীষ্মকালের "পুনরুত্থান দিবসে" পিসীদের এক প্রতিবেশী সপরিবারে—দুটি তরুণী কন্যা ও একটি স্কুলে-পড়া পুত্রসহ—এবং তাদের সঙ্গে অবস্থানকারী চাষী পরিবারের এক তরুণ শিল্পীকে নিয়ে ঐ দিনটি তাদের বাড়িতে কাটাতে এল। চায়ের পরে সকলে বাড়ির সামনেকার সদ্য ঘাস-কাটা মাঠটায় খেলতে গেল। সেখানে তারা খেলা শুরু করল এবং কাতয়ুশাও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। ছুটতে ছুটতে ও বার কয়েক খেলার সঙ্গী বদল করতে করতে একবার নেখ্‌লুদভ কাতয়ুশাকে ধরে ফেলল এবং সে তার সঙ্গী হল। এতদিন পর্যন্ত কাতয়ুশার চোখের দৃষ্টি তার ভাল লাগত, কিন্তু তার সঙ্গে কোনরকম ঘনিষ্ট সম্পর্কের সম্ভাবনা কখনও তার মনে আসে নি।

তখন ফূর্তিবাজ তরুণ শিল্পীটির ধরবার পালা। ছোট, বাঁকা, কিন্তু শক্তিশালী

চাষীসুলভ পা দুটির জন্য সে খুব দ্রুত দৌড়তেও পারে। তবু সে বলে উঠল, "ওরা হোঁচট খেয়ে না পড়লে ও জুটিকে ধরা অসম্ভব।"

"তুমি!—আমাদের ধরতে পারছ না?" কাতয়ুশা বলল।

"এক, দুই, তিন," শিল্পী হাততালি দিল।

কাতয়ুশা হাসতে হাসতেই শিল্পীর পিছনে গিয়ে নেখ্‌লুয়ুদভের সঙ্গে জায়গা পরিবর্তন করে নিল এবং নিজের ছোট খসখসে হাত দিয়ে তার বড়সড় হাতটা চেপে ধরে মাড়-দেওয়া পেটিকোটের খস্‌খস্‌ শব্দ তুলে বাঁ দিকে দৌড়ে গেল।

শিল্পীর নাগালের বাইরে যাবার চেষ্টায় নেখ্‌লুয়ুদভ ছুট দিল ডান দিকে; কিন্তু পিছনে তাকিয়ে দেখতে পেল, শিল্পী কাতয়ুশার পিছনে ছুটছে, যদিও সে খুব জোর ছুটতে পারে বলে কাতয়ুশা বেশ কিছুটা এগিয়েই আছে। তাদের সামনে একটা লিলাক ফুলের ঝোঁপ ছিল। কাতয়ুশা মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানাল, নেখ্‌লুয়ুদভ যেন ঐ ঝোপের পিছনে তার সঙ্গে মিলিত হয়; কারণ আবার যদি তারা হাতে হাত ধরতে পারে তাহলেই তারা নিরাপদ—এটাই হল খেলার নিয়ম। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে সে ঝোঁপের আড়ালে আড়ালে দৌড় দিল; কিন্তু সে জানত না যে বিচুটির গাছে ভরা একটা ছোট খানা সেখানে ছিল, তাই সে হোঁচট খেয়ে শিশির-ভেজা বিচুটির জঙ্গলের মধ্যে পড়ে গেল; তার হাত চুলকোতে লাগল; তবু সে তৎক্ষণাৎ হাসতে হাসতে উঠে পড়ল।

কাতয়ুশাও কালো চোখ নাচিয়ে আনন্দে উজ্জ্বল মুখ নিয়ে তার দিকে ছুটে গেল এবং দুজন দুজনের হাত চেপে ধরল।

অন্য হাত দিয়ে চুল ঠিক করতে করতে স্মিত হাসিতে তার দিকে তাকিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস টানতে টানতে কাতয়ুশা বলল, "নির্ঘাৎ তোমার হাত চুলকোচ্ছে?"

কাতয়ুশার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে ধরে সেও হাসতে হাসতে বলল, "আমি জানতাম না যে ওখানে একটা খানা আছে।" মেয়েটি আরও কাছে এগিয়ে এল, আর ছেলেটিও কিসে কি হল না বুঝেই তার দিকে মাথা নীচু করল। মেয়েটি সরে গেল না, আর ছেলেটি তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটে চুম্বন করল।

"আরে! কী করলে!" বলেই তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে মেয়েটি ছেলেটির কাছ থেকে দৌড়ে চলে গেল।

দুটো ফুল-ঝরা লিলাকের ডাল ভেঙে নিয়ে মেয়েটি তার উত্তপ্ত মুখের উপর হাওয়া করতে লাগল; তারপর ঘাড় ফিরিয়ে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দুটি হাত দোলাতে দোলাতে এগিয়ে গেল এবং অন্য খেলুড়েদের দলে মিশে গেল।

এর পর থেকেই নেখ্‌লুয়ুদভ ও কাতয়ুশার মধ্যে সেই অদ্ভুত সম্পর্ক গড়ে উঠল যা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট দুটি পবিত্র তরুণ-তরুণীর মধ্যে প্রায়ই গড়ে ওঠে।

কাতয়ুশা যখন ঘরে আসে, অথবা তার সাদা এপ্রনটা যখন দূর থেকে দেখা

যায়, তখনই নেখ্‌লয়ুদভের চোখে সব কিছু উজ্জল হয়ে ওঠে; ঠিক যেমন সূর্য উঠলে সব কিছুই আকর্ষণীয় ও খুশিতে ভরা বলে মনে হয়। সমস্ত জীবনটাই যেন খুশিতে ভরে উঠল। কাতয়ুশার মনেও সেই একই ভাব। কিন্তু শুধু যে কাতয়ুশার উপস্থিতিতেই নেখ্‌লয়ুদভের মনে এ রকম ভাবান্তর দেখা দেয় তা নয়। কাতয়ুশা আছে এই চিন্তাই (ওদিকে কাতয়ুশার কাছেও নেখ্‌লয়ুদভ আছে এই চিন্তাই) মনে ওই ভাবান্তর এনে দেয়।

মায়ের কাছ থেকে কোন অপ্রীতিকর চিঠিই আসুক, আর প্রবন্ধ রচনায় বাধাই আসুক, অথবা যৌবনের অকারণ বিষণ্ণতা তার মনকেই ঘিরে ধরুক, তার একমাত্র স্বপ্ন কাতয়ুশা, একমাত্র কাজ তার দর্শন, আর সবই মিথ্যা মনে হয়।

কাতয়ুশাকে বাড়ির অনেক কাজ করতে হত, তবু সে পড়াশুনার জন্য একটু সময় করে নিত; নেখ্‌লয়ুদভ তাকে দস্তয়েভস্কি ও তুর্গেনিভ পড়তে দিয়েছে (বইগুলি সেও সবেমাত্র পড়েছে)। তার সব চাইতে ভাল লাগে তুর্গেনিভের **A Quiet Nook** (একটি শান্ত নীড়) দালানে বা বারান্দায় বা উঠোনে, বিশেষ করে পিসীদের বুড়ি দাসী মাতরিয়না পাভ্‌লভ্‌নার ঘরে, যেখানে যখনই তাদের দেখা হয়ে যায়, তখনই তারা কিছুটা কথাবার্তা বলে নেয়। মাতরিয়না পাভ্‌লভ্‌নার সামনে যে সব কথা হয় সেগুলিই তাদের সবচাইতে ভাল লাগে যখন তারা একা থাকে তখনই ব্যাপারটা কেমন যেন বাঁকা পথ ধরে। তারা মুখে যা বলে থাকে, চোখে চোখে তখন যেন তার থেকে আলাদা রকমের গুরুতর কিছু কথা ফুটে ওঠে। তখন তাদের ঠোঁট বেঁকে যায় এবং এমন একটা ভয়ের কিছু তাদের মনে উঁকি দেয় যে দ্রুতগতিতে তারা দু'দিকে চলে যায়।

প্রথমবার এসে পিসীদের কাছে বাকি যে ক'টা দিন সে ছিল তখন নেখ্‌লয়ুদভ ও কাতয়ুশার মধ্যে এই ধরনের মেলামেশাই চলতে লাগল। পিসীরা সব দেখে শুনে ভয় পেয়ে গেল, এমন কি তার মা প্রিন্সেস ইয়েলেনা আইভানভনাকে সে কথা লিখেও জানাল। পিসী মারিয়া আইভানভনার ভয় ছিল যে, দিমিত্রি হয়তো কাতয়ুশার সঙ্গে একটা অবৈধ ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়ে বসবে; কিন্তু তার এই ভয় ছিল ভিত্তিহীন, কারণ নিজে সচেতনভাবে না বুঝেই নেখ্‌লয়ুদভ কাতয়ুশাকে ভালবাসত, এমন ভালবাসত যা একমাত্র যারা পবিত্রহৃদয় তারাই বাসতে পারে, আর সেখানেই ছিল তাদের দুজনের নিরাপত্তা। শুধু যে তার দেহকে ভোগ করবার কোন বাসনা তার ছিল না তাই নয়, সে কথা চিন্তা করলেই তার মন আতংকে ভরে উঠত। বরং কাব্যময়ী সোফিয়া আইভানভনা যে ভয় করেছিল যে দিমিত্রি যে-রকম পুরোপুরি দৃঢ় চরিত্রের ছেলে তাতে একটি মেয়েকে ভালবাসলে সে হয়তো তার কুল, শীল ও মর্যাদার কথা না ভেবেই তাকে বিয়ে করে ফেলতে পারে, সেই ভয়টাই দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কিন্তু এ সব কথা পিসীরা কেউই নেখ্‌ল্যুদভকে বলে নি, ফলে সে যখন সেখান থেকে চলে গেল তখনও কাত্যুশার প্রতি তার ভালবাসা তার কাছে অজানাই রয়ে গেল।

সে ঠিক জানত, যে জীবনানন্দ তার সমগ্র সত্তাকে পূর্ণ করেছে কাত্যুশার প্রতি তার মনোভাব তারই একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র; আর এই মিষ্টি খুশি-খুশি মেয়েটিও তার সেই আনন্দের অংশীদার। তথাপি তার চলে যাবার সময় যখন পিসীদের সঙ্গে কাত্যুশাও ফটকে এসে দাঁড়াল, যখন সে ঈষৎ টেরা জলভরা কালো চোখে তাকে দেখতে লাগল, তখন নেখ্‌ল্যুদভের মনে হল, এমন সুন্দর ও মূল্যবান কিছু সে পিছনে ফেলে যাচ্ছে যা আর কোনদিন তার জীবনে ফিরে আসবে না। ফলে তার মন বিষণ্ণতায় ভরে উঠল।

গাড়িতে উঠতে উঠতে সোফিয়া আইভান্‌ভনার টুপির ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে সে বলল, "বিদায় কাত্যুশা, সব কিছুর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

চোখের জল চেপে রেখে মধুর নরম গলায় মেয়েটি বলল, "বিদায় দিমিত্রি আইভানভিচ"; পরক্ষণেই সে ছুটে হলে চলে গেল; সেখানে সে শান্তিতে কাঁদতে পারবে।

অধ্যায়—১৩

তারপর তিনটি বছর নেখ্‌ল্যুদভের সঙ্গে কাত্যুশার দেখা হয় নি। আবার যখন দেখা হল তখন সবেমাত্র অফিসার হিসাবে কমিশন পেয়ে সে রেজিমেণ্টে যোগ দিতে চলেছে। যাবার পথে কয়েকটা দিন পিসীদের সঙ্গে কাটাতে এসেছে। কিন্তু তিন বছর আগে যে যুবক গ্রীষ্মকালটা এখানে কাটিয়েছিল এখন তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেদিন সে ছিল সৎ, নিঃস্বার্থ একটি ছেলে, যে কোন ভাল কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত; এখন সে ভ্রষ্টচরিত্র, আত্মপরায়ণ, নিজের ভোগই তার একমাত্র চিন্তা। তখন ঈশ্বরের পৃথিবী ছিল একটা রহস্য, আর একান্ত উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে সে রহস্য-সমাধানের চেষ্টা সে করত; এখন জীবনের সব কিছুই স্পষ্ট ও সরল, তার নিজের জীবনযাত্রার অবস্থার দ্বারা বিধিবদ্ধ। তখন নিজের আত্মাকেই সে তার প্রকৃত আমি বলে মনে করত; এখন তার স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ বলবান জান্তব আমিকেই তার স্বরূপ বলে মনে করে।

তার মধ্যে এই ভয়ংকর পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল কারণ তখন সে নিজেকে বিশ্বাস না করে অপরকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। আর তাও করেছে কারণ নিজেকে বিশ্বাস করে বেঁচে থাকা বড় শক্ত; নিজেকে বিশ্বাস করলে নিজেকেই সব প্রশ্নের মীমাংসা করতে হয়, আর সে মীমাংসা আবার নিজের

জান্তব আমির স্বপক্ষে না গিয়ে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তার বিপক্ষেই যায়। আর অন্যকে বিশ্বাস করলে, নিজের মীমাংসা করবার কিছুই থাকে না; সব কিছুর মীমাংসা তো আগে থেকেই হয়ে আছে, হয়ে আছে আত্মার বিপক্ষে এবং জান্তব আমির স্বপক্ষে। শুধু তাই নয়। নিজেকে বিশ্বাস করলেই চারদিক থেকে আগত নিন্দার সম্মুখীন হতে হবে; আর অন্যকে বিশ্বাস করলেই মিলবে সকলের সমর্থন।

প্রথম প্রথম নেখ্‌লুদভ লড়াই করেছে: নিজের উপরে বিশ্বাস রেখে যা কিছু সে ভাল মনে করেছে তাকেই সকলে বলেছে মন্দ, আর যাকে সে মনে করেছে পাপ আশেপাশের সকলেই তাকেই বলেছে ভাল। ক্রমে সংগ্রাম তীব্রতর হয়েছে; শেষ পর্যন্ত নেখ্‌লুদভ হাল ছেড়ে দিয়েছে, অর্থাৎ নিজেকে বিশ্বাস করা ছেড়ে দিয়ে অন্যকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। প্রথম দিকে নিজের উপর বিশ্বাস হারানোটা খুবই খারাপ লেগেছে, কিন্তু ক্রমে সে ভাব কেটে গেছে। সেই সময়ে সে ধূমপান ও মদ্যপানের অভ্যাস করে ফেলেছে; ফলে শীঘ্রই মনের ভাবটা কাটিয়ে উঠে পরম স্বস্তিবোধ করতেও শিখেছে।

নেখ্‌লুদভের প্রকৃতিই আবেগপ্রধান। ফলে পারিপার্শ্বিক সকলের দ্বারা সমর্থিত নতুন জীবনযাত্রার কাছে সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিল, আর অন্তরের যে বাণী পৃথক কিছুর দাবী জানায় তার কণ্ঠকে সম্পূর্ণভাবে রোধ করে দিল। পিতাসবার্গ যাবার পর থেকেই এটা আরম্ভ হয়, আর চরমে ওঠে যখন সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়।

সামরিক জীবন সাধারণতই মানুষকে ভ্রষ্টচরিত্র করে থাকে। সে জীবন মানুষকে ঠেলে দেয় পরিপূর্ণ আলস্যের মধ্যে, অর্থাৎ সে জীবনে বুদ্ধিসঙ্গত উপকারধর্মী কোন কাজ থাকে না; সাধারণ মানবিক কর্তব্য থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় রেজিমেণ্টের প্রতি, ইউনিফর্মের প্রতি, পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একান্ত গতানুগতিক কর্তব্যভার, এবং একদিকে যেমন অপরের প্রতি প্রভুত্ব করবার নিরংকুশ ক্ষমতা তাদের হাতে তুলে দেয়, অন্যদিকে আবার উর্ধ্বতর মর্যাদায় আসীনদের প্রতি দাসসুলভ বশ্যতায় তাদের বেঁধে ফেলে।

সামরিক চাকরির এই সাধারণ চারিত্রিক ভ্রষ্টতার সঙ্গে যখন যুক্ত হয় প্রচুর অর্থ ও রাজপুরুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশাজনিত চরিত্রভ্রষ্টতা, তখন সে-চরিত্রভ্রষ্টতা রূপান্তরিত হয় আত্মকেন্দ্রিকতার এক বল্গাহীন নেশায়। যে মুহূর্তে নেখ্‌লুদভ সামরিক বাহিনীতে যোগদান করল এবং সঙ্গী-সাথীদের মত জীবনযাত্রা শুরু করল, তখন থেকেই এই আত্মকেন্দ্রিকতার নেশা তাকেও পেয়ে বসল। অপরের দ্বারা চমৎকারভাবে তৈরি ও সুন্দরভাবে ব্রাশ করা ইউনিফর্মে এবং অপরের দ্বারা তৈরি, পরিষ্কার করা ও হাতে তুলে দেওয়া অস্ত্রে নিজেকে সুসজ্জিত করা, আর অপরের দ্বারা লালিত-পালিত, পোষ মানানো

ঘোড়ার পিঠে চড়ে প্যারেড করা—এ ছাড়া আর কোন কাজ তার ছিল না। সেখানে তার মতই অন্য আরও অনেকের সঙ্গে তাকে তলোয়ার ঘোরাতে হত, বন্দুক ছুঁড়তে হত, এবং অন্যকেও সেই সব কাজ শেখাতে হত। আর কোন কাজ তার ছিল না। উচ্চপদস্থ যুবক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিরা, স্বয়ং জার ও তার আশে-পাশের লোকরা শুধু যে এ সব কাজকে মঞ্জুর করেছে তাই নয়, এ জন্য তাকে প্রশংসা করেছে, ধন্যবাদ দিয়েছে।

এ ছাড়া আর যে সব কাজকে গুরুত্ব দেওয়া হত, ভাল বলা হত, সেগুলো হল, অদৃশ্য সূত্র থেকে পাওয়া প্রচুর টাকা উড়িয়ে অফিসারদের ক্লাবে এবং সেরা রেস্টুরেণ্টে খাওয়া-দাওয়া করা, বিশেষ করে মদ্যপান করা; তারপর থিয়েটার, বলনাচ, মেয়েমানুষ; তারপর আবার ঘোড়ায় চড়া, তলোয়ার ঘোরানো, লাফঝাঁপ করা এবং আবার টাকা ওড়ানো—মদ, তাস, আর মেয়েমানুষ।

একজন সামরিক কর্মচারী এই ধরনের জীবন নিয়ে গর্ববোধ করে থাকে, বিশেষ করে যখন যুদ্ধ চলতে থাকে। নেখ্‌লুদভও সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিল তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণার ঠিক পরেই। "যুদ্ধে জীবন বলি দিতে আমরা প্রস্তুত, আর সেই জন্য স্ফূর্তিবাজ উচ্ছৃংখল জীবন শুধু ক্ষমাই নয়, আমাদের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন—আর তাই সেই জীবনই আমরা যাপন করি।"

জীবনের ঐ অধ্যায়ে নেখ্‌লুদভের মনেও এই ধরনের এলোমেলো চিন্তাই কাজ করছিল; এবং নৈতিক সংযমের যে আদর্শকে সে এক সময় গ্রহণ করেছিল তা থেকে মুক্তি পেয়ে পরম আনন্দে মশগুল হয়েই ছিল। আত্মকেন্দ্রিকতার এক সার্বিক নেশায় সেও তখন মজেছিল।

মনের এই অবস্থা নিয়েই প্রায় তিন বছর পরে আবার সে পিসীদের সঙ্গে দেখা করতে এল।

অধ্যায়—১৪

নেখ্‌লুদভ পিসীদের সঙ্গে দেখা করতে গেল, কারণ যে রাস্তা ধরে তাকে রেজিমেণ্টে যোগ দিতে যেতে হবে (রেজিমেণ্ট ইতিমধ্যেই সীমান্তে চলে গেছে) তার কাছেই পিসীদের বাড়ি ও জমিদারি, কারণ পিসীরা খুবই আদর করে তাকে যেতে লিখেছে, এবং বিশেষ কারণ কাতয়ুশার সঙ্গে দেখা করতে তার মন চেয়েছে। হয়তো তার বর্তমান অসংযত জান্তব সত্তার নির্দেশমত কাতয়ুশার বিরুদ্ধে একটা শয়তানী মতলব সে মনের অতলে ইতিমধ্যেই গড়ে তুলেছিল; অবশ্য সচেতনভাবে সে সব কথা সে ভাবে নি; সে শুধু চেয়েছিল সেই জায়গাটা আবার দেখতে যেখানে একদিন সে সুখে কাটিয়েছে, চেয়েছিল

তার স্নেহশীলা পিসীদের দেখতে যারা তাকে ভালবাসা ও প্রশংসা দিয়ে ঘিরে রেখেছে এবং চেয়েছিল সেই মিষ্টি কাতয়ুশাকে দেখতে যার মধুর স্মৃতি তার মনকে ছেয়ে আছে।

মার্চ মাসের শেষের দিকে গুডফ্রাইডের দিন সে পৌছল। তখন বরফ গলতে শুরু করেছে। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। জামা কাপড় সব ভিজে গেছে। বেশ শীতও করছে, তবু তার মন উৎসাহ ও উত্তেজনায় ভরপুর। নীচু ইটের দেয়াল দিয়ে খেরা বরফে-ঢাকা সেই চেনা সেকেলে ধরনের আঙিনায় ঢুকতে ঢুকতে সে ভাবল, "সে এখনও এখানে আছে তো?"

সে আশা করেছিল স্লেজের ঘণ্টা শুনেই কাতয়ুশা বাইরে আসবে, কিন্তু সে এল না। যে দুটি মেয়েমানুষ এতক্ষণ মেঝে পরিষ্কার করছিল তারাই খালি পায়ে বালতি হাতে স্কার্ট গুঁজে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। সদর দরজায়ও তাকে দেখা গেল না; শুধু চাকর তিখন ঝাড়পোছ ফেলে রেখে এপ্রনটা চাপিয়েই ফটকের সামনে হাজির হল। পাশের ঘরে পিসী সোফিয়া আইভানভনা একাই তার সঙ্গে দেখা করল; তার পরনে রেশমের পোশাক ও টুপি।

সোফিয়া আইভানভনা তাকে চুমো খেয়ে বলল, "আরে, কী ভাগ্যি তুমি এসেছ। মারিয়ার শরীরটা ভাল না; গীর্জায় খুব ক্লান্ত বোধ করছিল; আমরা দীক্ষা নিতে গিয়েছিলাম।"

সোফিয়া আইভানভনার হস্ত চুম্বন করে নেখ্‌লয়ুদভ বলল, "তোমাকে অভিনন্দন জানাই সোফিয়া পিসী। (যারা দীক্ষা গ্রহণ করে তাদের অভিনন্দন জানানো একটা রুশ প্রথা)। আহা, তোমাকে যে ভিজিয়ে দিলাম; আমাকে ক্ষমা কর।"

"আরে, তুমি যে ভিজে জল হয়ে গেছ। শিগ্‌গির তোমার ঘরে যাও। আরে বাস, তোমার দেখছি গোঁফ গঁজিয়েছে?......কাতয়ুশা! কাতয়ুশা! ওকে কফি দাও; জলদি।"

"এক মিনিটের মধ্যে," দালান থেকে ভেসে এল সুপরিচিত মধুর কণ্ঠ; নেখ্‌লদয়ুভের অন্তর যেন চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ঐ তো সে।" মনে হল, মেঘের আড়াল থেকে যেন সূর্য দেখা দিয়েছে।

তিখনের পিছনে পেছনে নেখ্‌লয়ুদভ পোশাক বদলাবার জন্য খুশি মনে তার পুরনো ঘরে ঢুকল। তিখনকে কাতয়ুশার কথা জিজ্ঞাসা করতে খুবই ইচ্ছা করছিল; সে কেমন আছে, কি করছে, তার কি শিগ্‌গিরই বিয়ে হবে? কিন্তু তিখন যেমন অনুগত তেমনি কড়া, তাছাড়া এমন মনোযোগ দিয়ে জগ থেকে তাকে জল ঢেলে দিতে লাগল যে নেখ্‌লয়ুদভ কাতয়ুশার কথা জিজ্ঞাসা করতে ভরসাই পেল না, বরং তিখনের নাতিদের কথা, বুড়ো ঘোড়াটার কথা, আর কুকুর পল্‌কানের কথা জিজ্ঞাসা করল। তারা সকলেই বেঁচে আছে, শুধু পল্‌কান গত গ্রীষ্মকালে পাগল হয়ে গেছে।

নেখ্‌লুদভ ভিজে পোশাক ছেড়ে সবে নতুন করে পোশাক পরতে শুরু করেছে এমন সময় দ্রুত পায়ের শব্দ ও দরজায় টোকা শুনতে পেল। সে পায়ের শব্দ ও টোকার আওয়াজ সে চেনে। একমাত্র সেই ও ভাবে হাঁটে, ও ভাবে দরজায় টোকা দেয়।

ভিজে গ্রেটকোটটা কাঁধের উপর ফেলে সে দরজা খুলে দিল।

"ভিতরে এস।" এই তো সে, সেই কাতয়ুশা, আগের থেকেও মিষ্টি দেখতে। ঈষৎ টেরা সরল কালো চোখ তুলে সেই চেনা ভঙ্গীতে সে তাকাল। তখনকার মতই পরনে একটা সাদা এপ্রন। পিসীদের দেওয়া সদ্য মোড়ক-খোলা একখণ্ড সুগন্ধি সাবান, আর দুখানা তোয়ালে সে নিয়ে এসেছে; একখানাতে রুশ কারুকার্য করা, অপরখানা স্নানের তোয়ালে। ছাপ-সমেত না-ব্যবহার-করা সাবান, তোয়ালে, আর মেয়েটি—সবই সমান পরিচ্ছন্ন, তাজা, অকলংক ও মধুর। তাকে দেখামাত্রই অপ্রতিরোধ্য আনন্দের হাসিতে মেয়েটির মিষ্টি দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট দুখানি আগেকার মতই একটু বেঁকে গেল।

মেয়েটির মুখ লজ্জায় গোলাপ-রাঙা হয়ে উঠল। অনেক কষ্টে সে বলল, "কেমন আছেন দিমিত্রি আইভানভিচ?"

ছেলেটিও আরক্তমুখে বলল, "গুড্‌মর্নিং, তুমি কেমন আছ? বেশ ভাল আছ তো?"

সাবানটা টেবিলে রেখে আর তোয়ালে দুখানা চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে রেখে মেয়েটি বলল, "প্রভুর কৃপায় ভালই আছি। এই আপনার প্রিয় গোলাপি সাবান আর তোয়ালে; পিসীরা পাঠিয়েছেন।"

নেখ্‌লুদভের ড্রেসিং-কেসটা খোলাই ছিল। তার মধ্যে ব্রাশ, আতর, চুলের ক্রিম, রূপোর ঢাকনাওলা অনেকগুলো বোতল এবং আরও নানা রকম প্রসাধন-দ্রব্যে সেটা ভরা ছিল। সেটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে অতিথির আত্মনির্ভরতার সপক্ষে তিখন বলে উঠল, "এখানে ও সব কিছুই রয়েছে।"

আগেকার মতই কোমলতায় ভরা অন্তরে নেখ্‌লুদভ বলল, "দয়া করে আমার পিসীদের ধন্যবাদ দিও। আহা, এখানে এসে কী ভালই যে লাগছে।"

কথাগুলোর জবাবে মেয়েটি শুধু হাসল, তারপর চলে গেল।

পিসীরা আগাগোড়াই নেখ্‌লুদভকে ভালবাসত; কিন্তু এবার তারা আরও বেশী সমাদরে তাকে অভ্যর্থনা করল। দিমিত্রি যুদ্ধে যাচ্ছে, সেখানে সে আহত হতে পারে, মারাও যেতে পারে, তাতেই দুই বৃদ্ধার মন গলেছে।

ঠিক ছিল শুধু একদিন ও একরাত নেখ্‌লুদভ পিসীদের কাছে থাকবে, কিন্তু কাতয়ুশাকে দেখে সে পুরো ইস্টারটাই কাটিয়ে যেতে রাজী হল, শেন্‌বক নামক যে বন্ধুর সঙ্গে তার ওডেসায় মিলিত হবার কথা তাকে টেলিগ্রাম করে দিল, সে যেন এসে পিসীদের বাড়িতেই তার সঙ্গে দেখা করে।

কাতয়ুশাকে দেখামাত্রই তার প্রতি আগেকার ভাব নেখ্‌লুদভের মনে জেগে উঠল। আগের মতই তার সাদা এপ্রনটা দেখলেই তার মনে ভাবের উদয় হয়; তার পায়ের শব্দ, তার কণ্ঠস্বর, তার হাসি শুনলেই তার মন আনন্দে ভরে ওঠে; তার দুটি কালো চোখ দেখলেই, বিশেষ করে সে চোখে যখন হাসি ঝিলিক দেয়, তার মনে মায়া জাগে; আর সব চাইতে বড় কথা, যখনই তাদের দেখা হয় তখনই মেয়েটি লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে, এটা লক্ষ্য করে সেও বিচলিত বোধ না করে পারে না। সে বুঝতে পেরেছে, সে ভালবেসেছে; কিন্তু এ ভালবাসা ঠিক আগের মত নয়। তখন ভালবাসা ছিল রহস্যময়, সে নিজেও সে সম্পর্কে সচেতন ছিল না। তখন সে জানত, মানুষ একবারই ভালবাসতে পারে। কিন্তু এখন সে ভালবেসে সুখবোধ করছে, আর নিজের কাছে গোপন রাখতে চাইলেও অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছে এ ভালবাসার অর্থ কি এবং এর পরিণতি কি হতে পারে।

অন্তরের গভীরে সে বুঝতে পারছে যে তার চলে যাওয়া উচিত, পিসীদের বাড়িতে আর তার থাকবার কোন সঙ্গত কারণ নেই, তার ফল ভাল হবে না; তবু ব্যাপারটা এত মধুর, এত আনন্দময় যে সব কিছু অস্বীকার করে সে থেকেই গেল।

ইস্টারের সন্ধ্যায় প্রার্থনা অনুষ্ঠানে এসে পুরোহিত ও যাজক জানাল যে গীর্জা থেকে এই বাড়ি পর্যন্ত তিন মাইলের বেশী কর্দমাক্ত মাটির রাস্তা স্লেজগাড়িতে আসতে তাদের খুবই কষ্ট হয়েছে। পিসী ও বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে নেখ্‌লুদভও অনুষ্ঠানে যোগ দিল। সেখানে কাতয়ুশা পুরোহিতদের জন্য ধুনোচি এনে দিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সারাক্ষণ নেখ্‌লুদভ তার দিকেই তাকিয়ে রইল।

অনেক রাতে শুতে যাবার আগে সে যখন শুনতে পেল, বুড়ি দাসী মাত্রিয়না পাভ্‌লভ্‌না ইস্টারের পিঠে ও মিষ্টান্ন ভোগ পাবার জন্য গীর্জায় যাচ্ছে, তখন তার মনে হল, "আমিও যাব।"

গীর্জায় যাবার রাস্তাটা এতই খারাপ যে স্লেজগাড়িতে বা অন্য কোন গাড়িতে যাওয়া সম্ভব না। তাই সে বুড়ো ঘোড়াটার পিঠে জিন পরাতে হুকুম দিল। তারপর বিছানায় না গিয়ে তার ইউনিফর্ম, আঁটো-সাঁটো রাইডিং-ব্রীচেস ও ওভারকোটটা পরে সেই বুড়ো, মোটকা, ভারি ঘোড়াটায় চেপে কাদা ও বরফ ভেঙে অন্ধকারের মধ্যে গীর্জার দিকে যাত্রা করল।

অধ্যায়—১৫

সেদিনের সেই প্রার্থনা-সভা চিরদিনের মত নেখ্‌লুদভের মনে তার জীবনের উজ্জ্বলতম ও সুস্পষ্টতম স্মৃতি হয়ে রইল।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সাদা বরফের ভিতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যখন সে অন্ধকার

পার হয়ে সারি সারি বাতির আলোক-মালায় সজ্জিত গীর্জার আঙিনায় পৌঁছল তখন প্রার্থনা-সভা শুরু হয়ে গেছে।

মারিয়া আইভানভনার ভাইপোকে চিনতে পেরে চাষীরা ঘোড়াটাকে ধরে তার নামবার সুবিধার জন্য একটা শুকনো জায়গায় দাঁড় করাল, তার হয়ে ঘোড়াটাকে যথাস্থানে রেখে দিল এবং পথ দেখিয়ে তাকে গীর্জার ভিতরে নিয়ে গেল। গীর্জা তখন লোক-সমাগমে পরিপূর্ণ।

ডানদিকে দাঁড়িয়েছে চাষীরা: বুড়োরা পরেছে ঘরে-কাটা সুতির কোট, পায়ে জড়িয়েছে পরিষ্কার সাদা সুতির পট্টি; যুবকরা পড়েছে নতুন সুতির কোট, কোমরে জড়িয়েছে উজ্জ্বল রঙের বেল্ট, পায়ে পরেছে টপ-বুট।

বাঁ দিকে দাঁড়িয়েছে তরুণীরা, মাথায় লাল রেশমের রুমাল, কালো ভেলভেটিনের হাত-কাটা জ্যাকেট, উজ্জ্বল লাল রঙের আস্তিনওয়ালা শার্ট, সবুজ, নীল, লাল—নানা রঙের স্কার্ট, আর লোহা-পরানো চামড়ার জুতো। বৃদ্ধারা আরও সাদাসিদে পোশাক পরে দাঁড়িয়েছে তাদের পিছনে; তাদের মাথায় সাদা রুমাল, গায়ে ঘরে-বোনা কোট ও পুরনো ধাঁচের স্কার্ট, পায়ে জুতো। ঝকঝকে পোশাক পরে মাথায় ভাল করে তেল মাখানো ছেলে-মেয়েরা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নেখ্‌লুদভ সকলের ভিতর দিয়ে একেবারে সামনে চলে গেল। গীর্জার মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ভদ্রজনরা: জনৈক জমিদার, তার স্ত্রী ও পুত্র (পুত্রের পরনে নাবিকের পোশাক), একজন পুলিশ অফিসার, টেলিগ্রাফের কেরাণী, টপ-বুট পরা জনৈক ব্যবসায়ী, আর বুকে মেডেল ঝোলানো গ্রাম্য প্রধান; বেদির ডান দিকে জমিদার-গৃহিণীর ঠিক পিছনে দাঁড়িয়েছে মাত্রিয়না পাভ্‌লভনা, পরনে লাইলাক রঙের পোশাক ও পাড়-বসানো শাল; আর তার পাশেই কাতয়ুশা, পরনে চুনটকরা সাদা বডিস ও নীল ওড়না, কালো চুলে একটা লাল বো বাঁধা।

চারদিকে উৎসবের আমেজ—গম্ভীর, উজ্জ্বল, সুন্দর: সোনার ক্রুশ-শোভিত রূপোলি জড়ির কাজ-করা জামা গায়ে পুরোহিত, ডিয়েকন, রূপোলি ও সোনালী জোব্বা-পরা কেরাণী ও মন্ত্র-পড়িয়েরা; ভাল পোশাক পরা, তেল-কুচকুচে মাথা শিক্ষানবীশ গায়কের দল; নাচের বাজনার মত শুনতে ছুটির দিনের চটুল যন্ত্র-সঙ্গীত, আর পুরোহিতের অবিরাম আশীর্বাদ বর্ষণ; ফুল দিয়ে সাজানো একটা মোটা মোমবাতি হাতে নিয়ে পুরোহিত বার বার উচ্চকণ্ঠে বলছে 'খৃস্টের অভ্যুত্থান হয়েছে। খৃস্টের অভ্যুত্থান হয়েছে।' সব কিছুই সুন্দর; কিন্তু সব চাইতে সুন্দর কাতয়ুশা—পরনে সাদা পোশাক, নীল ওড়না, কালো চুলে লাল বো, আর দুটি চোখ আনন্দে উজ্জ্বল।

নেখ্‌লুদভ জানত, তার দিকে না চাইলেও কাতয়ুশা তার উপস্থিতি টের পেয়েছে। তার পাশ দিয়ে বেদির দিকে এগিয়ে যাবার সময় এটা সে লক্ষ্য

করেছে। তাকে বলবার মত কোন কথাই ছিল না, তবু বলার মত একটা কিছু তৈরি করে নিয়ে পাশ কাটাবার সময় সে চুপি চুপি বলল, 'পিসী বলেছে প্রার্থনা-সভার পরে অনশন ভঙ্গ করবে।'

কাতয়ুশার মিষ্টি মুখে যৌবনের রক্ত উঠে এল; নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকালেই এ রকমটা হয়। পরিপূর্ণ আনন্দে হাস্যময় দুটি কালো চোখ তুলে সে সরলভাবে তাকাল; নেখ্‌ল্যুদভের মুখের উপর সে দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল।

সে হেসে বলল, 'আমি জানি।'

অনুষ্ঠানের বিরতির সময় নেখ্‌ল্যুদভ গীর্জা থেকে বেরিয়ে এল। সকলে এক-পাশে সরে গিয়ে তাকে পথ করে দিল ও অভিবাদন জানাল। অনেকেই তাকে চিনত: বাকিরা জানতে চাইল সে কে।

সে সিঁড়িতে দাঁড়াল। উপস্থিত ভিখারীরা তাকে ঘিরে হৈ-চৈ শুরু করে দিল; থলিতে খুচরো টাকা-পয়সা যা ছিল সব তাদের দিয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

ঊষা সমাগত; তখনও সূর্য ওঠে নি। লোকজনরা দলে দলে গীর্জার ভিতরকার কবর-স্থানে জটলা করচে। কাতয়ুশা তখনও ভিতরেই আছে। নেখ্‌ল্যুদভ তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

উৎসবের প্রথামত একটি চাষী যখন নেখ্‌ল্যুদভকে চুম্বন করে একটি বাদামী রং-করা ডিম তাকে উপহার দিচ্ছিল, সেই সময় মাত্রিয়না পাভ্‌লভ্‌নার লাইলাক-পোশাক এবং লাল বো-পরা প্রিয় কালো মাথাটি হাজির হল।

যারা সামনে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মাথার উপর দিয়ে কাতয়ুশা তাকে দেখতে পেল, আর দেখেই তার মুখখানি যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সেটাও নেখ্‌ল্যুদভের নজর এড়াল না।

মাত্রিয়না পাভ্‌লভ্‌নার সঙ্গে ফটকের কাছে পৌঁছে কাতয়ুশা ভিখারিদের ভিক্ষা দিতে লাগল। নাকের জায়গায় একটা লাল চামড়ি বসানো একটি ভিক্ষুক তার দিকে এগিয়ে এল। সে তাকেও কিছু দিল। তার দিকে এগিয়ে গেল, এবং কোন রকম বিরক্তির ভাব না দেখিয়ে আনন্দে উজ্জ্বল চোখে তাকে তিনবার চুম্বন করল। আর নেখ্‌ল্যুদভের দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন সে জিজ্ঞাসা করছে, 'কাজটা ঠিক করছি তো?' 'হ্যাঁ প্রিয়া, ঠিকই করছ; সব কিছুই ঠিক, সব কিছুই সুন্দর। আমি তোমাকে ভালবাসি।'

তারা ফটকের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল, আর সে সিঁড়ি বেয়ে তাদের কাছে উঠে গেল। সে কাতয়ুশাকে ইস্টারের চুম্বন দিতে চায় নি, শুধু চেয়েছিল তার কাছে যেতে।

মাত্রিয়না পাভ্‌লভ্‌না মাথা নীচু করে হেসে বলল, 'খৃস্টের অভ্যুত্থান হয়েছে।' কিন্তু তার গলার সুর বলল, 'আজ আমরা সকলেই সমান।' রুমালটাকে গলা প্যাকিয়ে তা দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে সে তার ঠোঁট দুটি নেখ্‌ল্যুদভের দিকে

বাড়িয়ে দিল।

নেখ্‌লুদভও তাকে চুম্বন করে জবাব দিল, 'সত্যি খৃস্টের অভ্যুত্থান হয়েছে।' তারপর সে কাতয়ুশার দিকে তাকাল; লজ্জায় লাল হয়ে সে কাছে এগিয়ে গেল। 'খৃস্টের অভ্যুত্থান হয়েছে দিমিত্রি আইভানভিচ'। নেখ্‌লুদভ জবাব দিল, 'সত্যি তাঁর অভ্যুত্থান হয়েছে'। দু'বার তারা চুম্বন করল, তৃতীয় চুম্বন দরকার কি না ভাববার জন্য একটুখানি থামল তারপর সেটার প্রয়োজন আছে স্থির করে তৃতীয় চুম্বন করে দুজনেই হাসল।

নেখ্‌লুদভ প্রশ্ন করল, 'তুমি কি পুরোহিতের কাছে যাবে না?'

'না দিমিত্রি আইভানভিচ, আমরা এখানে কিছুক্ষণ বসব', যেন একটা খুশির কাজ করে ফেলেছে এমনি ভাব দেখিয়ে অনেক কষ্টে কাতয়ুশা বলল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসে তার বুকটা ফুলে উঠল; ঈষৎ টেঁরা চোখে অনুরাগ, কুমারী পবিত্রতা ও ভালবাসা ফুটিয়ে সে সোজাসুজি তার মুখের দিকে তাকাল।

পুরুষ ও নারীর ভালবাসায় এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন সে ভালবাসা চরমে ওঠে—যখন সে ভালবাসা হয়ে ওঠে চেতনাহীন, বিবেচনাহীন ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্পর্শহীন। সেই ঈস্টারের রাতে সেই মুহূর্তটি এসেছে নেখ্‌লুদভের জীবনে। কাতয়ুশার কথা মনে হওয়া মাত্রই সব কিছু যেন ঢাকা পড়ে যায়: চকচকে কালো মাথাটি, সুন্দর কুমারী দেহকে ঘিরে থাকা চুনট-করা সাদা আটোসাটো পোশাকটি, তার অনুদ্ধত বুক, লজ্জারুণ গাল দুটি, নরম উজ্জ্বলতা-মাখা দুটি কালো চোখ, এবং তার সমস্ত সত্তাকে জুড়ে থাকা দুটি বিশেষ গুণ, পবিত্রতা ও অকলংক ভালবাসা—যে ভালবাসা শুধু তার জন্য নয় (তা সে জানে), সকলের জন্য এবং সব কিছুর জন্য, শুধু ভালর জন্য নয়, সংসারে যা কিছু আছে সকলের জন্য, এমন কি যে ভিক্ষুকটিকে সে এই মাত্র চুম্বন করেছে তার জন্যও।

সে জানত, কাতয়ুশার মধ্যে সে ভালবাসা আছে, কারণ সেই রাতে ও ভোরে সে নিজের মধ্যেই সেটা উপলব্ধি করেছে; আরও উপলব্ধি করেছে যে সেই ভালবাসায় সে কাতয়ুশার সঙ্গে এক হয়ে গেছে।

হায়! সব কিছু যদি সেখানেই থেমে যেত, ঠিক যেখানে সে রাতে পৌঁচেছিল। 'হ্যাঁ, সেই ঈস্টারের রাতেও সেই ভয়ংকর ব্যাপারটা ঘটে নি!' জুরিদের ঘরের জানালার পাশে বসে এই কথাগুলি সে ভাবতে লাগল।

অধ্যায়—১৬

গীর্জা থেকে ফিরে নেখ্‌লুদভ পিসীদের সঙ্গেই অনশন ভঙ্গ করল এবং কিছুটা মদও খেল। রেজিমেন্টে থাকার সময় থেকেই তার মদ খাবার অভ্যাস হয়েছে। তারপর ঘরে ঢুকে যে পোশাকে ছিল সেই পোশাকেই ঘুমিয়ে পড়ল।

দরজায় টোকার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। সে জানত কাতয়ুশাই টোকা দিয়েছে। বিছানায় বসে চোখ মুছতে মুছতে আড়মোড়া ভাঙল।

বলল, 'কাতয়ুশা তুমি? ভিতরে এস।'

কাতয়ুশা দরজা খুলল।

বলল, 'খাবার প্রস্তুত।' পরনে সেই সাদা পোশাক, শুধু চুলের 'বো'টা নেই। সে এমন ভাবে হেসে নেখ্লয়ুদভের দিকে তাকাল যেন একটা খুব ভাল সংবাদ তাকে জানিয়েছে।

বিছানা থেকে উঠে চুলটা ঠিক করবার জন্য চিরুনিটা হাতে নিয়ে সে বলল, 'আমি আসছি।'

কাতয়ুশা এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সেটা লক্ষ্য করে নেখ্লয়ুদভ চিরুনিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার দিকে এক পা এগিয়ে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্তে মেয়েটি সহসা মুখ ঘুরিয়ে লঘু পদক্ষেপে দ্রুত গতিতে দালানের কার্পেটের উপর দিয়ে চলে গেল।

'হায় রে, আমি কি বোকা,' নেখ্লয়ুদভ ভাবল। 'ওকে কেন যেতে দিলাম?' আর তখনই তাকে ধরবার জন্য ছুটে গেল।

তাকে যে কি জন্য দরকার তা সে নিজেই জানত না, কিন্তু তার কেবলই মনে হতে লাগল যে সে যখন ঘরে এসেছিল তখন একটা কিছু করা উচিত ছিল, এমন একটা কিছু যা এ রকম অবস্থায় সাধারণত করা হয়ে থাকে, কিন্তু সে করতে পারে নি।

'কাতয়ুশা, দাঁড়াও,' সে বলল।

মেয়েটি থেমে গিয়ে বলল, 'আপনি কি চান?'

'কিছু না, শুধু—' তার অবস্থায় মানুষ সাধারণত কি করে থাকে সে কথা মনে পড়ায় সে হাত বাড়িয়ে তার কোমরটা জড়িয়ে ধরল।

মেয়েটি চুপচাপ তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর দুই চোখ জলে ভরে শক্ত কঠিন হাতে তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল, 'না, না, দিমিত্রি আইভানভিচ, এ রকম করবেন না।'

নেখ্লয়ুদভ তাকে ছেড়ে দিল। মুহূর্তের জন্য সে যে শুধু বিচলিত ও লজ্জিত বোধ করল তাই নয়, নিজের উপরেই বিরক্ত হল। সে ভাবল, এটা তার বোকামি; এ অবস্থায় অন্য সকলে যা করে থাকে তারও তাই করা উচিত। সে এগিয়ে গিয়ে আবার তাকে ধরে ফেলল এবং তার গলার উপর চুমু খেল।

লাইলাক ঝোপের আড়ালে প্রথম আকস্মিক চুম্বন এবং আজ সকালে গীর্জার প্রাঙ্গণের চুম্বন থেকে এ চুম্বন একেবারেই আলাদা। এ চুম্বন ভয়ংকর, আর মেয়েটিও তা বুঝতে পারল

যেন অমূল্য কোন বস্তুকে সে ভেঙে খানখান করে ফেলেছে এমনি স্বরে সে চেঁচিয়ে বলল, 'আঃ, আপনি কি করছেন?' তারপরই ছুটে চলে গেল।

নেখ্‌লুয়ুদভ খাবার ঘরে গেল। সুসজ্জিত পিসীরা, পারিবারিক ডাক্তার ও জনৈক প্রতিবেশী সেখানে ছিল। সবই বেশ স্বাভাবিক, কিন্তু নেখ্‌লুয়ুদভের মনে তখন ঝড় বইছে। অন্যদের কথাবার্তা সে কিছুই বুঝতে পারছিল না, মাঝে মাঝে দু'একটা জবাব দিচ্ছিলমাত্র। তার মনে সারাক্ষণ শুধু কাত্যুশার চিন্তা। দালানের মাঝখানে তাকে যে তৃতীয় চুম্বনটি করেছিল তার কথাই বার বার মনে পড়তে লাগল, আর কোন কথা নয়। কাত্যুশা যখন ঘরে ঢুকল, তার দিকে না তাকিয়েই সে সমগ্র সত্তা দিয়ে তার উপস্থিতি অনুভব করল, তার দিকে না তাকিয়ে বসে থাকতে তাকে অনেক চেষ্টা করতে হল।

খাওয়া সেরেই সে নিজের ঘরে চলে গেল। ভীষণ উত্তেজিতভাবে অনেকক্ষণ পায়চারি করল; বাড়ির প্রতিটি শব্দ উৎকর্ণ হয়ে শুনতে শুনতে প্রতি মুহূর্তে তার পদশব্দের আশায় কান পেতে রইল। ভিতরকার পশুটা তখন শুধু মাথাই তোলে নি, প্রথম দেখার দিনগুলিতে, এমন কি সেদিন সকালেও তার মধ্যে যে দেব-মানব ছিল তাকে সম্পূর্ণভাবে পায়ের তলায় চেপে রেখেছে। ভিতরকার সেই পশু-মানবই এখন সর্বময় কর্তা।

সারাদিন অপেক্ষা করেও কাত্যুশার সঙ্গে একাকি দেখা করবার সুযোগ সে পেল না। হয় তো মেয়েটি তাকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছে। কিন্তু সন্ধ্যার সময় সে পাশের ঘরে যেতে বাধ্য হল। ডাক্তারকে রাতটা থেকে যেতে বলা হয়েছে, আর তার বিছানা তাকেই করে দিতে হবে। কাত্যুশার ঘরে ঢুকবার শব্দ শুনেই নেখ্‌লুয়ুদভ তাকে অনুসরণ করল। যেন একটা অপরাধ করতে যাচ্ছে এমনিভাবে পা টিপে টিপে রুদ্ধশ্বাসে ঘরে ঢুকল।

বালিশের ওড়ের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তার দুটো কোণ ধরে সে তখন বালিশের একটা ধোয়া ওড় পরাচ্ছিল। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসল; আগেকার মত খুশির, আনন্দের হাসি নয়, একটা ভীত, করুণ হাসি। সে হাসি যেন বলছে, তুমি যা করেছ সেটা খারাপ। নেখ্‌লুয়ুদভ এক মুহূর্ত দাঁড়াল। তখনও সংগ্রাম চলেছে। ক্ষীণ কণ্ঠে হলেও মেয়েটির প্রতি তার প্রকৃত ভালবাসা তখনও তাকে শোনাচ্ছে তারই কথা, তার মন ও তার জীবনের কথা; আর একটি কণ্ঠ বলছে, 'সাবধান! নিজের সুখ, নিজের সম্ভোগের এ সুযোগ ছেড়ে দিও না।' আর সেই দ্বিতীয় কণ্ঠ প্রথম কণ্ঠকে গলা টিপে মেরে ফেলল। দৃঢ় সংকল্পে সে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল; একটা ভয়ংকর অসংযত পাশবিক আবেগ তখন তাকে গ্রাস করেছে।

দুটি হাতে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে সে তাকে বিছানায় বসিয়ে দিল; তার মনে হল আরও কিছু করবার আছে; তাই সেও তার পাশে বসল।

করুণ গলায় মেয়েটি বলল, 'দিমিত্রি আইভানভিচ, প্রিয়। দয়া করে আমাকে যেতে দিন।' নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে সে কেঁদে বলল, 'মাত্রিয়না পাভ্‌লভ্‌না আসছে।' কে যেন সেই দিকেই আসছে।

নেখ্‌লুয়ুদভ ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'তাহলে, তাহলে আমি কবে তোমার কাছে আসব ; তখন একা থাকবে তো ?'

সে বলল, 'আপনি কি বলছেন ? কিছুতেই না। না, না!' কিন্তু সে শুধু মুখের কথা, তার সমগ্র সত্তার কম্পিত আবেগ বলছে অন্য কথা।

মাত্রিয়না পাভ্‌লভ্‌না ঘরে ঢুকল। তার হাতে একটা কম্বল। তিরস্কারের দৃষ্টিতে নেখ্‌লুয়ুদভের দিকে তাকিয়ে ভুল কম্বল নিয়ে আসার জন্য কাতয়ুশাকে বকতে লাগল।

নেখ্‌লুয়ুদভ নীরবে ঘর থেকে চলে গেল, কিন্তু একটুও লজ্জিত বোধ করল না। মাত্রিয়না পাভ্‌লভ্‌নার মুখ দেখেই সে বুঝতে পেরেছে যে সে তাকেই দোষী ভেবেছে ; সে জানে তাকে দোষী ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে ; সে বোঝে সে অন্যায় করছে ; কিন্তু এই নতুন, নীচ, জান্তব উত্তেজনা কাতয়ুশার প্রতি তার প্রকৃত ভালবাসার সেই পুরনো আবেগ থেকে মুক্তিলাভ করে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে ; সেখানে আর কোন কিছুর স্থান নেই। সে এখন শুধু জানে, এই কামনাকে পূর্ণ করতে কি করা দরকার ; তাই সে শুধু ভাবছে, কেমন করে সে কাজের সুযোগ পাওয়া যাবে।

সারা সন্ধ্যা সে পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল ; কখনও পিসীদের ঘরে, আবার নিজের ঘরে, আবার পরক্ষণেই বারান্দায়। সারাক্ষণ শুধু একই চিন্তা —কেমন করে তাকে একা পাবে ; কিন্তু মেয়েটি তাকে এড়িয়েই চলল ; আর মাত্রিয়না পাভ্‌লভ্‌না মেয়েটির উপর কড়া নজর রাখল।

অধ্যায়—১৭

সন্ধ্যা কেটে গেল। রাত হল। ডাক্তার শুয়ে পড়ল। পিসীরাও তাদের ঘরে চলে গেছে। নেখ্‌লুয়ুদভ জানে, মাত্রিয়না পাভ্‌লভ্‌না তখন তাদের কাছে শোবার ঘরেই আছে ; কাজেই কাতয়ুশা নিশ্চয় দাসীদের বসবার ঘরে একলা আছে। সে আবার বারান্দায় বেরিয়ে গেল। বাইরেটা অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, গরম। বসন্তকালের যে সাদা কুয়াশা শেষ বরফকে গলিয়ে দেয়, অথবা শেষ বরফ গলে যাওয়ার ফলে যে সাদা কুয়াশা সৃষ্টি হয়, তাতেই বাতাস আচ্ছন্ন। সদর দরজা থেকে একশো পা দূরের পাহাড়টার নীচেকার নদী থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ আসছে। বরফ ভাঙার শব্দ।

নেখ্‌লুয়ুদভ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল ; চকচকে বরফের উপর পা ফেলে ফেলে দাসীদের ঘরের জানালার কাছে গেল। বুকের ভিতর হৃদপিণ্ডটা এমন ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ শব্দ করছে যেন সে শুনতে পাচ্ছে ; সে বেশ কষ্ট করে টেনে টেনে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে লাগল। দাসীদের ঘরে একটা ছোট বাতি জ্বলছে ; টেবিলের পাশে কাতয়ুশা চিন্তিত মনে সামনের দিকে তাকিয়ে একলা বসে আছে।

নেখ্‌লুয়ুদভ অনেকক্ষণ নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইল; দেখতে লাগল, তাকে যে কেউ দেখছে সেটা না জেনে কাতয়ুশা কি করে। দু'এক মিনিট সেও চুপচাপ; তারপর চোখ তুলে হাসল, যেন নিজেকেই তিরস্কার করছে এমনিভাবে মাথা নাড়ল। পরক্ষণেই আবার দুটি হাত টেবিলের উপর রেখে সামনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

নেখ্‌লুয়ুদভ সেখানেই দাঁড়িয়ে কাতয়ুশার গম্ভীর যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখখানা দেখতে লাগল; সে মুখে তার আত্মার সংগ্রামের আভাষ প্রত্যক্ষ করে তার হৃদয় করুণায় ভরে গেল; কিন্তু কী আশ্চর্য, সে করুণা তার কামনাকেই বাড়িয়ে তুলল।

কামনা তখন তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছে।

সে জানালায় টোকা দিল। মেয়েটি যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল, তার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল, মুখে ফুটে উঠল ত্রাসের ছায়া। তারপরই এক লাফে জানালার কাছে গিয়ে সে মুখটাকে কাঁচের সঙ্গে লাগিয়ে দাঁড়াল। দুটি হাতকে গোল করে চোখের সামনে ধরে কাঁচের ভিতর দিয়ে দৃষ্টি ফেলে নেখ্‌ল্‌-য়ুদভকে চিনতে পেরেও ত্রাসের ছায়া তার মুখ থেকে গেল না। তার মুখ অসম্ভব গম্ভীর; এমনটি সে কখনও দেখে নি। ছেলেটির হাসির জবাবে মেয়েটিও হাসল, কিন্তু সে হাসি সমর্পণের হাসি; তার আত্মায় ছিল না কোন হাসি, ছিল শুধু ভয়। ছেলেটি হাতের ইসারায় তাকে আঙিনায় নেমে আসতে বলল। কিন্তু মেয়েটি মাথা নেড়ে জানালার ধারেই দাঁড়িয়ে রইল। ছেলেটি কাঁচের কাছে মুখ নিয়ে তাকে ডাকতে যাবে এমন সময় মেয়েটি দরজার কাছে গেল। নিশ্চয় ভিতর থেকে কেউ তাকে ডেকেছে। নেখ্‌লুয়ুদভ জানালা থেকে সরে গেল। কুয়াশা এত ঘন যে বাড়ির পাঁচ পা দূর থেকেও জানালাগুলো দেখা যায় না; কিন্তু সেই একাকার কালো অন্ধকারে বাতির লাল আলোটা জ্বলজ্বল্‌ করছে। নদীর বুকে সেই অদ্ভুত শব্দই হচ্ছে,—ফোঁপাচ্ছে, খসখস করছে, ঝনঝন করছে, ঝুরঝুর করছে। কাছেই কুয়াশার মধ্যে একটা কাক ডাকল; আর একটা কাক তাতে সাড়া দিল; তারপর দূরের গ্রাম থেকে অন্য সব কাক ডাকতে লাগল; ক্রমে সব কাকের ডাক একটা ধ্বনিতে মিলে গেল। একমাত্র নদীটি ছাড়া চারধারে আর সব নীরব। সে রাতে এই দ্বিতীয়বার কাক ডাকল।

নেখ্‌লুয়ুদভ বাড়ির এক কোণে পায়চারি করতে লাগল। দু'একবার জলের মধ্যেও পা ফেলল। তারপর আবার জানালার কাছে গেল। আলোটা তখনও জ্বলছে; সে তখনও টেবিলের পাশে একা বসে আছে, যেন কি করবে বুঝতে পারছে না। ছেলেটি জানালার কাছে যেতেই সে চোখ তুলে তাকাল। সে টোকা দিল। কে টোকা দিল না দেখেই মেয়েটি দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; খট্‌ করে বাইরের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। নেখ্‌লুয়ুদভ পাশের বারান্দায় অপেক্ষা করছিল, কোন কথা না বলে দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল।

মেয়েটিও তাকে জড়িয়ে ধরে মুখ তুলল, তার দুই ঠোঁটে চুম্বন নেমে এল। বারান্দার এককোণে যেখানে তারা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানকার সব বরফই গলে গিয়েছিল। কিন্তু তার সমস্ত দেহ-মন্ তখন অপূর্ণ কামনার যন্ত্রণায় জর্জরিত। এমন সময় ঠিক একই রকম ঠক্ করে শব্দ করে দরজাটা আবার খুলে গেল, আর মাত্রিয়না পাভ্লভ্না ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকল, 'কাতয়ুশা'।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মেয়েটি দাসীদের ঘরে গেল। ক্লিক করে ছিটকিনির শব্দ হল। তারপর সব চুপচাপ। লাল আলোটা নিভে গেল। শুধু কুয়াশা চারদিক ঘিরে রইল। নদীর বুকের শব্দ তেমনি শোনা যেতে লাগল।

নেখ্লয়ুদভ জানালার কাছে গেল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। দরজায় টোকা দিল, কোন সাড়া নেই। সদর দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতর ফিরে গেল, কিন্তু ঘুম এল না। বিছানা ছেড়ে উঠে সে খালি পায়ে দালান পার হয়ে মাত্রিয়না পাভ্লভ্নার ঘরের পার্শ্ববর্তী কাতয়ুশার দরজার দিকে যেতে লাগল। মাত্রিয়না পাভ্লভ্নার নাক ডাকছে শুনতে পেয়ে এগিয়ে যাবে এমন সময় সে কেশে উঠে সশব্দে পাশ ফিরতেই নেখ্লয়ুদভের হৃদপিণ্ড যেন থেমে গেল; পাঁচ মিনিট সময় সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ধীরে ধীরে আবার সব চুপচাপ হয়ে এল। সেও শান্তিতে নাক ডাকাতে লাগল। পাছে কোন রকম শব্দ হয় তাই অত্যন্ত সতর্কভাবে পা ফেলতে ফেলতে নেখ্লয়ুদভ কাতয়ুশার দরজার কাছে হাজির হল। কোন সাড়া শব্দ নেই। কাতয়ুশা হয়তো জেগেই আছে নইলে তার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যেত। কিন্তু অনুচ্চ কণ্ঠে 'কাতয়ুশা!' বলে ডাকতেই সে লাফ দিয়ে উঠল এবং যেন রাগ করেই তাকে ফিরে যেতে অনুরোধ করতে লাগল।

'এ সবের মানে কি? আপনি কি করছেন? আপনার পিসীরা শুনতে পাবেন যে।' মুখে সে এই কথাগুলি বললেও তার সমস্ত সত্তা তখন বলছে, 'আমার সব কিছুই তোমার।' আর নেখ্লয়ুদভও তাই বুঝল।

'দরজা খোল! এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ঘরে ঢুকতে দাও! তোমাকে মিনতি করছি!' সে যে কি বলছে তাও সে জানে না।

মেয়েটি চুপ। তারপর ছেলেটি শুনতে পেল, সে ছিটকিনিতে হাত দিয়েছে। ছিটকিনি খোলার শব্দ হল, আর সেও ঘরের ভিতরে ঢুকল। মেয়েটি যে অবস্থায় ছিল—পরনে মোটা শক্ত শেমিজ, হাত দুটো খোলা—সেই অবস্থায়ই তাকে তুলে নিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে গেল।

মেয়েটি ফিসফিস করে বলল, 'কি করছ প্রিয়তম?' কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে ছেলেটি তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল।

তাকে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে মেয়েটি বলল, 'না, না, এ কাজ করো না; আমাকে যেতে দাও!'

* * * * *

ছেলেটির কথার কোন জবাব না দিয়ে মেয়েটি যখন নিঃশব্দে কাঁপতে কাঁপতে চলে গেল, তখন ছেলেটি আবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল, যা ঘটে গেল আপন মনেই তার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করতে লাগল।

আঁধার ক্রমেই পাতলা হয়ে আসছে। নীচের নদীর বুক থেকে বরফ গলার ধ্বস্ ধ্বস্, ঝুরঝুর ও খসখস আওয়াজ ক্রমেই বাড়ছে; একটা কুলুকুলু ধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। কুয়াশা কাটতে শুরু করেছে, আর তার উপর দিয়ে বাঁকা চাঁদের অস্পষ্ট আলো এসে চারদিকে ভৌতিক পরিবেশকে ঈষৎ আলোকিত করে তুলেছে।

সে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল, 'এ সবের অর্থ কি? আমার জীবনে এ কি কোন বিরাট আনন্দ, না বিরাট দুর্ভাগ্য?'

'সকলের জীবনেই এটা ঘটে—সকলেই এ কাজ করে', নিজেকে এই কথা শুনিয়ে সে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

অধ্যায়—১৮

পরের দিন স্ফূর্তিবাজ, সুদর্শন ও খ্যাতিমান শেন্‌বক পিসীদের বাড়িতে এসে নেখ্‌লয়ুদভের সঙ্গে মিলিত হল। তার রুচিসম্পন্ন সহৃদয় ব্যবহার, আমুদে স্বভাব, উদারতা ও দিমিত্রির প্রতি ভালবাসার দ্বারা সে সকলেরই মন জয় করে নিল।

পিসীরা কিন্তু তার উদারতার প্রশংসা করলেও কিছুটা বিরক্ত বোধ করল। কারণ তার আচরণে কিছুটা বাড়াবাড়ি প্রকাশ পেতে লাগল। সদর দরজায় একটা অন্ধ ভিখারিকে সে এক রুবল দান করল, চাকরদের প্রত্যেককে পনেরো রুবল করে বকশিস দিল, আর সোফিয়া আইভানভনার পোষা কুকুরের পায়ের পাতা কেটে রক্ত বেরুলে সে তার হেম-করা ক্যাম্ব্রিকের রুমালখানাকে (সোফিয়া আইভানভনা জানে সে রুমালের দাম প্রতি ডজন অন্তত পনেরো রুবল) দু'ফালি করে ছিঁড়ে তাই দিয়ে কুকুরের পা ব্যাণ্ডেজ করে দিল। বৃদ্ধা দুটি এ ধরনের লোক এর আগে দেখে নি; তারা জানে না যে শেন্‌বকের দু'লাখ রুবল ধার আছে, সে ধার শোধ দেবার কোন গরজ তার নেই, আর তাই পঁচিশ রুবল বা তার বেশী অর্থ তার কাছে কিছুই নয়।

পিসীদের সঙ্গে কাটানো শেষ রাতটিতে—যখন আগের রাতের স্মৃতি তার মনে খুবই সতেজ—নেখ্‌লয়ুদভের মনের মধ্যে দুটি ভাবের দ্বন্দ্ব চলতে লাগল। এক দিকে পাশবিক ভালবাসার জলন্ত ইন্দ্রিয় সুখের স্মৃতি (যদিও তার প্রত্যাশা তাতে পূর্ণ হয় নি) ও তার সঙ্গে মিশ্রিত এই আত্মতুষ্টি যে তার ইচ্ছাটা পূর্ণ হয়েছে; অন্য দিকে সে যে একটা অন্যায় কাজ করেছে এবং মেয়েটির জন্য নয়, বরং তার নিজের জন্যই সে অন্যায়ের প্রতিকার হওয়া দরকার সেই চেতনা।

নেখ্‌লয়ুদভের আত্মসুখের নেশা তখন এমন পর্যায়ে পৌঁচেছে যে নিজের

কথা ছাড়া আর কিছুই সে ভাবতে পারে না। ভাবছিল, ধরা পড়লেও তার কাজকে কতটা নিন্দা করা হবে, মোটেও নিন্দা করা হবে কি না; কিন্তু সে একবারও ভাবল না তখন কাতয়ুশার মনের অবস্থা কি রকম হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তার কি হবে।

সে বুঝতে পারল যে শেন্‌বক কাতয়ুশার সঙ্গে তার সম্পর্কটা বুঝতে পেরেছে এবং তা নিয়ে বেশ গর্ববোধ হল।

কাতয়ুশাকে দেখে শেন্‌বক বলল, 'আহা, পিসীর বাড়িতে হঠাৎ প্রায় পুরো সপ্তাহ কেন কাটালে এখন সেটা বুঝতে পারছি। অবশ্য এতে আমি আশ্চর্য হই নি—আমি হলেও তাই করতাম। সে সত্যি মনোরমা।'

নেখ্‌লয়ুদভও ভাবছিল, মনের কামনা ভালভাবে পূর্ণ না হতেই এখান থেকে চলে যাওয়াটা দুঃখের হলেও এই অনিবার্য বিচ্ছেদের একটা সুবিধাও আছে, কারণ যে সম্পর্ক বজায় রেখে চলা তার পক্ষে কষ্টকর হত এর ফলে তাতে আপনা থেকেই ছেদ পড়ে যাবে। তারপরই তার মনে হল, কাতয়ুশাকে কিছু টাকা দেওয়া উচিত; তার জন্য নয় বা তার দরকার হতে পারে সেজন্যও নয়, টাকাটা দেওয়া তার কর্তব্য, কারণ তাকে ভোগ করবার পরে কিছু না দেওয়াটা তার নিজের পক্ষেই অসম্মানজনক হবে। কাজেই তার এবং কাতয়ুশার মর্যাদার কথা চিন্তা করে সে তাকে একটা মোটা টাকাই দিল।

যাত্রার দিন আহারাদির পরে নেখ্‌লয়ুদভ বাইরে গিয়ে পাশের দরজায় মেয়েটির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তাকে দেখেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠল; দাসীদের ঘরের খোলা দরজার দিকে চোখের ইঙ্গিতে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় মেয়েটি তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইল, কিন্তু ছেলেটি তাকে বাধা দিল।

তার হাতে একশ' রুবলের নোট-ভরা একখানা খাম গুঁজে দিয়ে সে বলল, 'তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি। আর এতে—'

তার বক্তব্য অনুমান করেই মেয়েটির ভুরু কুঁচকে উঠল; মাথা নেড়ে সে তার হাতটা সরিয়ে দিল।

'এটা নাও, তোমাকে নিতেই হবে।' থেমে থেমে কথাগুলো বলে এপ্রণের ফাঁকের মধ্যে খামটা গুঁজে দিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ যেন নিজেই নিজেকে আঘাত করেছে এমনিভাবে গোঙাতে গোঙাতে ছুটে নিজের ঘরে চলে গেল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াল; আর এই শেষ দৃশ্যটির কথা মনে হতেই সজোরে আর্তনাদ করে মাটিতে পা ঠুকতে লাগল।

'কিন্তু এ ছাড়া আর কি আমি করতে পারতাম? সকলেই কি এ কাজ করে নি? শেন্‌বক বলেছে, গভর্ণেসের সঙ্গে সে এ কাজ করেছে, খুড়ো গ্রীশা করেছে; এমন কি আমার বাবা যখন গ্রামাঞ্চলে ছিলেন তখন একটি চাষী মেয়ের গর্ভে মিত্তেংকা নামে তার যে জারজ ছেলে জন্মেছিল সে তো এখনও

বেঁচে আছে। আর সকলেই যখন এই একই কাজ করে তখন তো বোঝাই যায় যে এছাড়া পথ নেই।' এই সব ভেবে বৃথাই সে মনের শান্তি ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে লাগল। অতীতের স্মৃতি তার বিবেককে দংশন করতে লাগল।

অবশ্য ক্রমে সে বুঝতে পারল যে এ সমস্যার একটি মাত্র সমাধান আছে—সেটা হল এ নিয়ে মাথা না ঘামানো। তাই সে করল।

যে জীবনে সে পদার্পণ করতে চলেছে, তার নতুন পরিবেশ, নতুন বন্ধুবান্ধব, যুদ্ধ—সবই অতীতকে ভুলে থাকতে তাকে সাহায্য করল। যতই দিন যেতে লাগল ততই সে সব কিছু ভুলতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভুলে গেল।

শুধু একবার যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে সে যখন কাতয়ুশাকে দেখবার আশায় পিসীদের বাড়ি গিয়েছিল, তখন শুনেছিল যে শেষ বার সে যখন সেখানে গিয়েছিল তার পরেই কাতয়ুশা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে; পিসীরা শুনেছে সে নাকি কোথায় না কোথায় একটি সন্তান প্রসব করেছে এবং একেবারেই উচ্ছন্নে গেছে। কথাটা শুনে তার বুক ব্যথায় টনটন করে উঠেছিল। যে সময়ে সে সন্তান প্রসব করেছে তাতে সে সন্তান তার হতেও পারে, নাও হতে পারে। পিসীরা অবশ্য মেয়েটিকেই দোষী করে বলেছিল যে, সেও তার মায়ের বদস্বভাবই পেয়েছে। এতে সে একটু খুশিই হয়েছিল। মনে হল, সে যেন মুক্তি পেয়েছে। প্রথমে ভাবল, তাকে ও তার সন্তানকে খুঁজতে চেষ্টা করবে, কিন্তু তার কথা মনে হতেই অন্তরের অন্তঃস্থলে সে এতই লজ্জা ও বেদনা বোধ করতে লাগল যে তাকে খুঁজে বের করবার মত কোন চেষ্টাই সে করল না, বরং তার চিন্তাকে মন থেকে মুছে ফেলে আবার তাকে ভুলতে চেষ্টা করল।

এতদিন পরে এই আশ্চর্য যোগাযোগের ফলে সব কিছু নতুন করে তার মনে পড়ে গেল। যে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর কাপুরুষতার ফলে এতবড় একটা পাপকে স্বীয় বিবেকের উপর চাপিয়ে নিয়ে এই দশটি বছর বেঁচে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে, আজ বুঝি তাকে স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু তাতে সে কিছুতেই রাজী নয়; তার একমাত্র ভয়—মেয়েটি বা তার অ্যাডভোকেট হয়তো সমস্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে উপস্থিত সকলের সম্মুখে তাকে লজ্জায় ফেলতে পারে।

অধ্যায়—১৯

এই রকম মনের অবস্থা নিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ আদালত-কক্ষ ছেড়ে জুরিদের ঘরে গেল। জানালার পাশে বসে চারদিকের কথাবার্তা শুনতে শুনতে ধূমপান করতে লাগল।

পরিচয়-ঘোষণাকারী যখন সেই একই ভাবে কাৎ হয়ে ঘরে ঢুকে জুরিদের আদালতে ফিরে যেতে ডাকল তখন নেখ্‌লয়ুদভ খুব ভয় পেয়ে গেল, যেন

বিচারক হওয়ার পরিবর্তে তারই বিচার হতে চলেছে। অন্তরের অন্তঃস্তলে সে অনুভব করছিল যে সে একটি বদমাশ, লোকের মুখের দিকে চোখ তুলে চাইতে তার লজ্জিত হওয়া উচিত। তথাপি অভ্যাসবশতই সে তার আত্মম্ভরী ভাবেই মঞ্চের উপরে উঠে ফোরম্যানের ঠিক পাশে পায়ের উপর পা তুলে বসে পিঁস-নেটা নিয়ে খেলা করতে লাগল।

কয়েদীদেরও বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আবার তাদের ফিরিয়ে আনা হল।

আদালতে কিছু নতুন মুখ—সাক্ষীদের—দেখা গেল। নেখ্‌ল্যুদভ লক্ষ্য করল, মাসলভা একদৃষ্টিতে রেলিং-এর সামনের সারিতে উপবিষ্ট একটি স্থূলাঙ্গী স্ত্রীলোকের দিকে তাকিয়ে আছে। স্ত্রীলোকটির পরনে ঝকঝকে রেশম ও ভেলভেটের পোশাক, মাথায় মস্ত বড় বো-বাধা উঁচু-টুপি, এবং কনুই পর্যন্ত খোলা হাতে ঝোলানো একটি ছোট সুদৃশ্য থলি। সে পরে জানতে পেরেছিল সে একটি সাক্ষী, মাসলভা যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল তারই মালকানি।

একে একে সাক্ষীদের শপথ-বাক্য পাঠ করাবার পরে শুধুমাত্র বেশ্যালয়ের রক্ষিকা কিতায়েভা ছাড়া আর সকলকে আবার বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, এ ব্যাপারে সে কি জানে, প্রতিটি কথার পরে সে একবার করে মাথা ও টুপিটা নাড়তে লাগল এবং নকল হাসি হাসতে হাসতে কথার মধ্যে কড়া জার্মান টান দিয়ে একটি বিস্তারিত বুদ্ধিদীপ্ত বিবরণ পেশ করল।

প্রথমে তার পরিচিত হোটেলের চাকর সাইমন তার বাড়ি এল একজন ধনী সাইবেরীয় বণিকের জন্য একটি মেয়ে জোগার করতে। সে লিউবভকে পাঠাল। কিছু সময় পরে বণিককে সঙ্গে নিয়ে লিউবভ ফিরে এল। বণিকটির তখনই একটু 'মৌতাত' হয়েছে—কথাটা বলে সে একটুখানি হাসল—তবু সে যেমন মদ চালাতে লাগল তেমনি মেয়েদের নিয়েও মেতে উঠল। টাকা ফুরিয়ে যেতে ঐ লিউবভকেই তার আস্তানায় পাঠিয়েছিল। মেয়েটাকে দেখে সে 'মজে' গিয়েছিল। একথা বলবার সময় সে কয়েদীর দিকে তাকাল।

নেখ্‌ল্যুদভের মনে হল, এই সময়ে সে যেন মাসলভাকে হাসতে দেখল। এ তার খুব খারাপ লাগল।

বিচারক-পদপ্রার্থী মাসলভার পক্ষ সমর্থনকারী অ্যাডভোকেটটি সলজ্জ বিচলিত ভঙ্গীতে প্রশ্ন করল, 'মাসলভা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ছিল?'

কিতায়েভা জবাব দিল, 'ও তো খুব ভাল মাইয়া। ও নেকাপড়া জানে, দেমাক আছে। খুব বড় ঘরে মানুষ হইছে, ফরাসি ভাষা পইড়তে পারে। যহন-তহন কাঁদে, কুনো মতেই ভুলতে পারে না। খুবই ভাল মাইয়া।'

কাত্যুশা স্ত্রীলোকটির দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ জুরিদের দিকে চোখ ঘুরিয়ে নেখ্‌ল্যুদভের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ গম্ভীর ও

কঠিন হয়ে উঠল। একটা চোখ ঈষৎ কুঁচকে গেল, আর দুটি বিচিত্র চোখ অনেকক্ষণ নেখ্‌লয়ুদভের দিকে তাকিয়ে রইল। ভয় তাকে যতই পেয়ে বসুক তবুও ঐ দুটি টেরা উজ্জ্বল চোখের উপর থেকে নেখ্‌লয়ুদভ তার দৃষ্টিকে সরিয়ে নিতে পারল না।

সেই ভয়ংকর রাত, তার কুয়াসা, নীচে নদীতে বরফ ভাঙার শব্দ, বিশেষ করে শেষ রাতের দিকে ওঠা উপরের দিকে দুটো শিং তোলা বাঁকা চাঁদ—সব তার মনে পড়ে গেল। তার প্রতি নিবদ্ধ ওই দুটি কালো চোখ দেখে তার মনে পড়ে গেল সেদিনের চাঁদের আলোয় ধুসর হয়ে ওঠা চারদিকের কালো ভৌতিক অন্ধকার।

'ও আমাকে চিনতে পেরেছে', এ কথা ভাবতেই নেখ্‌লয়ুদভ কুঁকড়ে পিছনে সরে গেল, যেন কেউ তাকে আঘাত করতে এসেছে। কিন্তু কাতয়ুশা তাকে চিনতে পারে নি। সে নিঃশব্দে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার প্রেসিডেণ্টের দিকে তাকাল। নেখ্‌লয়ুদভও নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, 'আঃ তাড়াতাড়ি যদি কাজটা শেষ হয়ে যেত।'

শিকারে বেরিয়ে একটা আহত পাখিকে যখন মেরে ফেলতে হয় তখন তার মনে যে বিরক্তি ও করুণা দেখা দেয়, সেই একই মনোভাব তাকে পেয়ে বসল। আহত পাখিটা থলের মধ্যে ছটফট করতে থাকে। তা দেখে বিরক্তিও জাগে, আবার করুণাও হয়। যত তাড়াতাড়ি সেটাকে মেরে ফেলে সবকিছু ভুলে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

বুকের মধ্যে এই মিশ্র অনুভূতি নিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ বসে বসে সাক্ষীদের জেরা শুনতে লাগল।

অধ্যায়—২০

কিন্তু বুঝিবা তাকে কষ্ট দেবার জন্যই মামলাটা অনেক সময় ধরে চলতে লাগল। প্রতিটি সাক্ষীকে আলাদা করে জেরা করা হল, সকলের শেষে জেরা করা হল বিশেষজ্ঞকে; সরকারী উকিল এবং উভয় পক্ষের অ্যাডভোকেটরা যথারীতি গাম্ভীর্যের সঙ্গে অনেক অপ্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারপর যে সমস্ত জিনিস সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছিল সেগুলো পরীক্ষা করে দেখবার জন্য প্রেসিডেণ্ট জুরিদের আহ্বান করল। তার মধ্যে ছিল হীরের গোলাপ বসানো মস্ত বড় একটা আংটি; যতদূর মনে হয় সেটা তর্জনীতেই পরা হত; আর একটা টেস্ট টিউব যাতে বিষটা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এগুলির গায়ে লেবেল আঁটা ও সিলমোহর করা ছিল।

জুরিরা জিনিসগুলি দেখতে যাবে এমন সময় সরকারী উকিল উঠে দাঁড়িয়ে জানাল যে, তার আগে মৃতদেহের ডাক্তারী পরীক্ষার বিবরণটা পাঠ করা

উচিত।

প্রেসিডেন্ট চাইছিল তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে, যাতে সে তার সেই সুইশ মেয়েটির কাছে চলে যেতে পারে; তাছাড়া সে জানত যে, এ কাগজটা পড়ার ফলে শুধু ক্লান্তি বাড়বে, খাবার সময়টা পিছিয়ে যাবে, আর কোন ফলই হবে না; আর সরকারী উকিলও সেটা পড়তে চাইছে তার একমাত্র কারণ সেটা পড়ার অধিকার তার আছে; তবু সম্মতি দেওয়া ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না।

সেক্রেটারি ডাক্তারী রিপোর্টটা বের করে তার একঘেয়ে গলায় r এবং t-এর মধ্যে কোন পার্থক্য না করে সেটা পড়তে শুরু করল।

বাহ্যিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে:

(১) ফেরাপন্ত স্মেলকভের উচ্চতা ছ'ফুট পাঁচ ইঞ্চি।

বণিকটি সাগ্রহে নেখ্‌লয়ুদভের কানে কানে বলল, 'খুব খারাপ নয়। আকৃতি মোটামুটি ভালই।'

(২) তাকে দেখে মনে হয় বয়স চল্লিশ বছর।

(৩) শরীরটা ফুলো-ফুলো দেখতে।

(৪) মাংসের রং সবুজ, কয়েক জায়গায় কালো দাগ রয়েছে।

(৫) চামড়ায় নানা মাপের ফোস্কা পড়েছে এবং অনেক জায়গায় বড় বড় চামড়া উঠে গেছে।

(৬) চুল বাদামী; ঘন এবং হাত লাগালেই চামড়া থেকে উঠে আসছে।

(৭) চোখের তারা দুটো গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে, আর মণিটা আবছা হয়ে গেছে।

(৮) নাক, কান ও মুখ দিয়ে কিছু তরল পদার্থ গড়িয়ে পড়েছে; মুখটা অর্ধেক খোলা।

(৯) মুখ এবং বুক ফুলে ওঠায় গলাটা প্রায় ঢেকে গেছে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

রিপোর্ট পড়া শেষ হলে ব্যাপারটা শেষ হয়েছে মনে করে প্রেসিডেন্ট নিঃশ্বাস ছেড়ে মাথাটা তুলল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেক্রেটারি আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার বিবরণে চলে গেল।

প্রেসিডেন্ট আবার হাতের উপর মাথা রেখে চোখ বুজল। নেখ্‌লয়ুদভের পার্শ্ববর্তী বণিক ঘুমে ঢুলে পড়ায় তার শরীরটা সামনে-পিছনে দুলতে লাগল। কয়েদী ও প্রহরীরা চুপচাপ বসে রইল।

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় দেখা গেছে যে:

(১) খুলির হাড় থেকে চামড়াটা সহজেই খুলে যাচ্ছে, এবং জমাট রক্ত পাওয়া যায় নি।

(২) খুলির হাড়ের ঘনত্ব স্বাভাবিক এবং অবিকৃত অবস্থায় ছিল।

(৩) মস্তিষ্কের রং সাদা হলেও তার ঝিল্লিতে প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা দুটো বিবর্ণ দাগ পাওয়া গেছে।

এবং আরও তেরোটি অনুচ্ছেদব্যাপী এই রকম বিবরণ।

এই রিপোর্ট পড়তেই পাক্কা এক ঘণ্টা সময় লাগল; কিন্তু সরকারী উকিল তাতেও সন্তুষ্ট নয়, কারণ পড়া শেষ হলে প্রেসিডেণ্ট যখন তার দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, 'আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ পাঠ করার কি কোন দরকার আছে?' তখন সে সভাপতির দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলল, 'আমি চাই সেটাও পড়া হোক।'

পুনরায় রিপোর্ট পড়া শুরু হল :

সেক্রেটারি পুনরায় শুরু করল। উপস্থিত সকলের চোখে যে ঘুম নেমে এসেছিল বুঝি বা তাকে তাড়াতেই তার গলার স্বর বেশ চড়ে গেল। '১৮৮— সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী সরকারী চিকিৎসা বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে সহকারী মেডিক্যাল ইন্সপেক্টরের উপস্থিতিতে ৬৩৮ নং পরীক্ষা কার্যে নিম্নলিখিত আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করি :

(১) দক্ষিণ ফুসফুস ও হৃদ্‌পিণ্ড (একটি ৬ পাউণ্ড কাঁচের পাত্রে রক্ষিত)।

(২) পাকস্থলীতে প্রাপ্ত পদার্থ (৬ পাউণ্ড কাঁচের পাত্রে)।

(৩) পাকস্থলীটা (৬ পাউণ্ড কাঁচের পাত্রে)।

(৪) যকৃৎ, প্লীহা ও মূত্রাশয় (৯ পাউণ্ড কাঁচের পাত্রে)।

(৫) অন্ত্রসমূহ (৬ পাউণ্ড মাটির পাত্রে)।

এখানে প্রেসিডেণ্ট একজন সদস্যের কানে কানে কি যেন বলল, তারপর আর একজনের দিকে ঝুঁকল, এবং তাদের সম্মতি পেয়ে বলে উঠল, 'আদালত মনে করে যে এই রিপোর্ট পড়া অবাস্তর।'

সেক্রেটারি পড়া বন্ধ করে কাগজখানা ভাঁজ করে ফেলল, আর সরকারী উকিল রেগেমেগে কি যেন লিখতে লাগল।

প্রেসিডেণ্ট বলল, 'জুরিমহোদয়গণ এবার প্রদর্শিত বস্তুগুলি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।' ফোরম্যান ও অপর কয়েকজন উঠে টেবিলের কাছে গেল। তারা আংটি, কাঁচের পাত্র ও টেস্ট টিউবটা দেখল। বণিকটি তো আংটিটা পরবার চেষ্টাও করল।

সেটাকে যথাস্থানে রেখে সে বলল, 'আঃ একখানা আঙুল বটে, একটা কাঁকুড়ের মত।' মনে মনে নিহত বণিকের বিরাট দেহটা কল্পনা করে সে বেশ খুশি হয়ে উঠল।

অধ্যায়—২১

প্রদর্শিত জিনিসগুলি দেখা শেষ হয়ে গেলে প্রেসিডেন্ট সওয়ালের জন্য সরকারী উকিলকে ডাকল। তার আশা ছিল যে সরকারী উকিলও তো মানুষ, কাজেই তারও ধূমপানের বা আহারের গরজ থাকতে পারে এবং অপরের প্রতি কিছুটা করুণাও দেখাতে পারে। কিন্তু সরকারী উকিল কি নিজের কি অপরের কারও প্রতিই করুণা দেখাল না। সে স্বভাবতই অত্যন্ত অবিবেচক; তাছাড়া স্কুলের শেষ পরীক্ষায় একটা সোনার মেডেল পাওয়ায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে রোম্যান আইন পড়বার সময় 'ক্রীতদাস প্রথার' উপর একটা প্রবন্ধ লিখে পুরস্কার পাওয়ায় তার আত্মবিশ্বাস ও আত্মতুষ্টি অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল (মেয়েদের ব্যাপারে সাফল্যও তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে) এবং তারই ফলে তার অবিবেচনা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। প্রেসিডেন্টের ডাকে সাড়া দিয়ে সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, যাতে কারুকার্যকরা পরিচ্ছদে শোভিত তার সুঠাম দেহ সকলে ভালভাবে দেখতে পায়। ডেস্কের উপর হাত দুটি রেখে মাথাটা ঈষৎ নুইয়ে সে ঘরের চারদিকে তাকাল এবং কয়েদীর দৃষ্টি এড়িয়ে রিপোর্ট পড়ার ফাঁকে ফাঁকে তৈরি করা বক্তৃতাটা শুরু করল।

'জুরিমহোদয়গণ! আপনাদের সামনে যে মামলাটা উঠেছে, আমার ভাষায় সেটা খুবই উল্লেখযোগ্য।'

তার মতে সরকারী উকিলের বক্তব্যের সব সময়ই একটা নাগরিক গুরুত্ব থাকা উচিত, প্রথিতযশা অ্যাডভোকেটদের সব বিখ্যাত বক্তৃতাগুলির যেমন থাকে। এ কথা ঠিক যে সেখানে শ্রোতা মাত্র তিনটি স্ত্রীলোক—একটি দরজি, একটি রাঁধুনি ও সাইমনের বোন—এবং একটি কোচয়ান; কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। বিখ্যাত লোকরাও গোড়ায় এইভাবেই শুরু করেছিল।

'জুরিমহোদয়গণ, আপনাদের সম্মুখে যে অপরাধটি উপস্থিত করা হয়েছে সেটি—আমার ভাষায়—বর্তমান শতাব্দীর শেষ পাদের লক্ষণাক্রান্ত, এতে সেই বেদনাদায়ক ঘটনা, সেই নীতিহীনতার লক্ষণগুলি রয়েছে আমাদের বর্তমান সমাজের এই সব মানুষরা যার শিকার হয়েছে।'

সরকারী উকিল সবিস্তারে এমনভাবে বলতে লাগল যাতে মনে মনে ঠিক করে রাখা কোন উল্লেখযোগ্য শব্দ বাদ না পড়ে এবং এইভাবে কোথাও না থেমে একটানা এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট বক্তৃতা চালিয়ে গেল।

শুধু একটিবার সে থেমেছিল যখন তার মুখে খানিকটা থুথু জমেছিল, কিন্তু অচিরেই সেটা গিলে ফেলে নতুন উদ্যমে আরও জোর গলায় বক্তৃতা শুরু করে দিল।

তার মতে, বণিক স্মেলকভ সেই শক্তিমান সরল রুশদের একজন যে একেবারে অতলে নেমে-যাওয়া মানুষদের হাতে পড়ে তার উদার, বিশ্বাসপ্রবণ

প্রকৃতির ফলে বিনষ্ট হয়েছে।

সাইমন কার্তিংকিন দাসত্বপ্রথার কুসন্তান, একটি নির্বোধ, অজ্ঞান, নীতি-বিহীন মানুষ যার কোন ধর্মবোধ পর্যন্ত নেই। এভ্‌ফিমিয়া তারই মনিব, বংশধারার শিকার; অধঃপতনের সব লক্ষণই তার মধ্যে পরিস্ফুট। এ ব্যাপারে প্রধান কলকাঠি-নাড়া মানুষ হল মাসলভা, এই অধঃপতিত যুগের সর্বনিম্ন স্তরের জীব সে।

তার দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগল, 'এই আদালতে তার মালকিনের কাছ থেকে আজ আমরা শুনেছি যে এই স্ত্রীলোকটি লেখাপড়া শিখেছে, শুধু যে লিখতে-পড়তে জানে তাই নয়, ফরাসীও জানে। সে মাতৃপিতৃহীন, ফলে অপরাধের বীজাণু তার মধ্যেই রয়েছে। একটি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারে সে শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছিল, কাজেই সৎ পথে থেকে সে জীবন কাটাতে পারত; কিন্তু উপকারীদের আশ্রয় ছেড়ে এসে সে উচ্ছৃংখলতার পথে নেমে গেল, এমন কি বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য বেশ্যালয়ে ঢুকল; আর সেখানে স্বীয় শিক্ষার গুণে এবং—জুরিমহোদয়গণ, তার মালকিনের কাছ থেকে আপনারাও শুনেছেন—যে রহস্যময় ক্ষমতার কথা বর্তমান বিজ্ঞান বিশেষ চারকটপন্থীরা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে এবং সম্মোহনী প্রভাব বলে অভিহিত করেছে সেই ক্ষমতার দ্বারা সমাগত অতিথিদের উপর প্রভাব বিস্তার করে নিজেকে অন্য সকলের থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। এই ভাবেই সে এই রুশ ভদ্রলোককে, এই দয়ালু-হৃদয় ধনী বণিক সাদকো-কে (নভ্‌গরদ অঞ্চলের প্রাচীন রুশ উপকথার নায়ক) নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসে এবং সেই বিশ্বাসের সুযোগে প্রথমে তার সর্বস্ব হরণ করে এবং তারপর তাকে নির্দয়ভাবে খুন করে।'

গম্ভীর সদস্যটির দিকে ঝুঁকে প্রেসিডেন্ট হেসে বলল, 'খুব চাপান দিচ্ছে, কি বলেন?'

সদস্যটি জবাব দিল, 'মারাত্মক বোকা লোকটা!'

ওদিকে সরকারী উকিল বক্তৃতা চালিয়েই যাচ্ছে।

শরীরটাকে সুন্দরভাবে দুলিয়ে বলল, 'জুরিমহোদয়গণ, আপনাদের হাতে শুধু যে এই সব লোকের ভাগ্য ন্যস্ত রয়েছে তাই নয়, কতকাংশে ন্যস্ত রয়েছে সমাজেরও ভাগ্য, কারণ আপনাদের রায় সমাজকেও প্রভাবিত করবে। এই অপরাধের সম্পূর্ণ অর্থ আপনারা হৃদয়ঙ্গম করুন। মাসলভার মত যাদের আমরা রোগাক্রান্ত বলে আখ্যা দিতে পারি তারা যে সমাজের পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক সেটাও আপনারা ভাল করে ভাবুন। সমাজকে এই সংক্রামক রোগীদের হাত থেকে রক্ষা করুন; সমাজের নির্দোষ ও শক্তিশালী অংশকে সংক্রমণ, এমন কি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন।'

প্রত্যাশিত রায়ের গুরুত্বে অভিভূত হয়ে সরকারী উকিল নিজের বক্তৃতায় নিজেই খুশি হয়ে তার চেয়ারে বসে পড়ল।

তারপর অ্যাডভোকেটদের বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াল একজন মাঝ-বয়সী লোক। পরনে চাতক পাখির লেজের মত কোট ও নীচু-কাটের ওয়েস্ট-কোট যার নীচে অর্ধবৃত্তাকার একটা ধপধপে ধোয়া শার্ট দেখা যাচ্ছে। লোকটি কারতিংকিন ও বচকভার পক্ষ সমর্থন করে বক্তৃতা করল। তিন শ' রুবল দিয়ে তাকে এ কাজে লাগানো হয়েছে। সে এদের দুজনকেই নির্দোষ ঘোষণা করে সব দোষ মাসলভার উপর চাপিয়ে দিল।

সে যখন টাকাটা নেয় তখন বচকভা ও কারতিংকিন তার সঙ্গে ছিল বলে মাসলভা যে বিবৃতি দিয়েছে তার সত্যতা অস্বীকার করে অ্যাডভোকেটটি জোর দিয়ে বলে যে, যেহেতু তার বিরুদ্ধে বিষ প্রয়োগের অভিযোগ রয়েছে সেই হেতু তার সাক্ষ্যকে গ্রহণ করা যায় না। সে আরও বলে, দুটি সৎ পরিশ্রমী মানুষ যারা হোটেলের অধিবাসীদের কাছ থেকে দৈনিক তিন থেকে পাঁচ রুবল বকশিস পেয়ে থাকে, তারা সহজেই এক হাজার আটশ' রুবল সঞ্চয় করতে পারে। বণিকের টাকাটা মাসলভাই চুরি করে এবং অন্য কাউকে চালান করে দেয়, অথবা হারিয়েই ফেলে, কারণ সে তখন স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। মাসলভা একাই বিষ-প্রয়োগ করে।

সুতরাং জুরিদের কাছে তার প্রার্থনা, কারতিংকিন ও বচকভাকে চুরির দায় থেকে মুক্তি দেওয়া হোক; অথবা তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত এটা স্বীকার করে নেওয়া হোক যে বিষ-প্রয়োগের সঙ্গে কোনভাবে জড়িত না থেকেই চুরিটা করা হয়েছিল।

শেষ করবার আগে সরকারী উকিলকে ঠেস দিয়ে অ্যাডভোকেটটি বলল, আমার পণ্ডিত বন্ধুটি বংশগত ধারা সম্পর্কে যে চমৎকার উক্তি করেছেন তাতে বংশগত সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও এক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য নয়, কারণ বচকভার পিতৃমাতৃ-পরিচয় অজ্ঞাত।

সরকারী উকিল ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন নোট করল এবং ঘৃণিত বিস্ময়ে কাঁধ দুটিতে ঝাঁকুনি দিল।

উঠে দাঁড়াল মাসলভার অ্যাডভোকেট। মাসলভার পক্ষ সমর্থন করে ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে তার বক্তব্য বলতে লাগল। সে যে চুরিতে অংশ গ্রহণ করেছিল সেটা অস্বীকার না করে সে জোর দিয়ে বলল যে, স্মেলকভকে বিষ দেবার কোন ইচ্ছা তার ছিল না, তাকে ঘুম পাড়াবার জন্যই গুঁড়োটা তাকে দিয়েছিল। তারপর একটুখানি বাগ্মিতা প্রদর্শনের চেষ্টায় কেমন করে যে লোকটির দ্বারা মাসলভা এই পাপ-জীবনে প্রথম নামতে বাধ্য হয়েছিল, সে আজও বিনা শাস্তিতেই বেঁচে আছে, আর অধঃপতনের সবটা বোঝা এই মেয়েটি একাকি বহন করছে তারই বিবরণ তুলে ধরল। কিন্তু মনস্তত্ত্বের রাজ্যে তার এই অনুপ্রবেশ এতই ব্যর্থ হয়ে গেল যে সকলেই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। যখন সে পুরুষের নিষ্ঠুরতা ও নারীর অসহায়তা নিয়ে মন্তব্য করতে গেল তখন

প্রেসিডেণ্ট মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কথা বলতে অনুরোধ জানিয়ে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল।

তার বক্তব্য শেষ হলে সরকারী উকিল পাল্টা জবাব দেবার জন্য উঠে দাঁড়াল। প্রথম অ্যাডভোকেটের বিরুদ্ধে নিজের পক্ষ সমর্থন করে সে বলল, বচকভার বাপ-মার পরিচয় অজ্ঞাত থাকলেও তাতে বংশগতির নিয়ম মিথ্যা প্রমাণিত হয় না, কারণ বিজ্ঞান বংশগতির নিয়মকে এতদূর প্রমাণ করেছে যে আমরা শুধু যে বংশগতি থেকে অপরাধকে অনুমান করতে পারি তাই নয়, অপরাধ থেকেও বংশগতিকে প্রমাণ করতে পারি। আবার মাসলভার পক্ষ সমর্থনে যখন বলা হয়েছে যে জনৈক কাল্পনিক (সরকারী উকিল বিশেষ করে "কাল্পনিক" কথাটার উপর প্রচণ্ড জোর দিয়ে কথা বলল) প্রলোভনকারী তাকে ভ্রষ্টচরিত্রা করেছে, সে প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে আমাদের সামনে যে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে তাতে মনে হয় যে এই নারীই আরও অনেক অনেক পুরুষকে হাতের মুঠোয় এনে পাপের পথে টেনে নামাবার কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই কথাগুলো বলে সে বিজয়ীর ভঙ্গীতে বসে পড়ল।

তখন কয়েদীদের যার যার পক্ষ সমর্থনে কথা বলবার অনুমতি দেওয়া হল।

এভফিমিয়া পুনরায় একই কথা বলল যে, এ ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। এবং কোন কিছু করেও নি। সব দোষ সে মাসলভার উপর চাপিয়ে দিল। সাইমন কারতিংকিন বারকয়েক একই কথা বলল, 'এ সব আপনাদের ব্যাপার কিন্তু আমি নির্দোষ ; এটা অন্যায়।'

মাসলভা আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছুই বলল না। প্রেসিডেণ্ট যখন তাকে কিছু বলতে বলল, তখন সে শুধু তার দিকে চোখ তুলে তাকাল, শিকারীতাড়িত জন্তুর মত ঘরের চারদিকে দৃষ্টি ফেরাল, আর তারপরই মাথা নীচু করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

নেখ্‌লুদভের মুখ থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ বের হওয়ায় বণিক প্রশ্ন করল, 'ব্যাপার কি ?' ওটা জোর করে একটা কান্নাকে চেপে রাখার শব্দ।

তার তৎকালীন পরিস্থিতির তাৎপর্য নেখ্‌লুদভ তখন পর্যন্তও বুঝে উঠতে পারে নি। যে কান্নাকে সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিল না, যে অশ্রু তার দুই চোখ ছাপিয়ে উঠেছে, সে সবই তার দুর্বল স্নায়ুর লক্ষণ বলে সে ভেবে নিল। চোখের জল ঢাকবার জন্য সে পিঁস-নেটা চোখে পরল, আর রুমাল বের করে নাক ঝাড়তে শুরু করল।

আদালতের সবাই তার অতীত কীর্তি জানতে পারলে যে অসম্মান তাকে ঘিরে ধরবে তারই ভয় তার আত্মার কণ্ঠকে রুদ্ধ করে দিল। তখনকার মত এই ভয়ই সব চাইতে বড় হয়ে তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

অধ্যায়—২২

কয়েদীদের শেষ কথা শোনবার পরে প্রশ্নগুলি জুরিদের কাছে কোন্ আকারে রাখা হবে সেটা স্থির হল, আর তাতেও কিছু সময় গেল। অবশেষে প্রশ্নগুলি সংকলিত হল এবং প্রেসিডেণ্ট সব কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করতে লাগল।

মামলাটা জুরিদের কাছে উপস্থিত করবার আগে প্রেসিডেণ্ট কিছু সময় ধরে তার মনোরম ঘরোয়া ভাষণে তাদের বোঝাতে লাগল যে, যেটা ছিঁচকে চুরি সেটা ছিঁচকে চুরিই, আর যেটা চুরি সেটা চুরিই; তালা-চাবিবন্ধ কোন জায়গা থেকে চুরি করাটা তালা-চাবিবন্ধ জায়গা থেকে চুরি করাই। আবার তালা-চাবি না দেওয়া জায়গা থেকে চুরি করাটা তালা-চাবি না দেওয়া জায়গা থেকে চুরি করাই। এই কথাগুলি ব্যাখ্যা করবার সময় বার বার সে নেখ্‌লু্যুদভের দিকে তাকাচ্ছিল, যেন তার মনের আশা যে নেখ্‌লু্যুদভ এ সব গুরুত্বপূর্ণ সত্যগুলি স্বয়ং উপলব্ধি করে সহকর্মী জুরিদের সেগুলো বোঝাতে পারবে। যখন সে মনে করল যে জুরিরা এ সব সত্যই যথেষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছে তখন সে আর একটি সত্যকে ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হল—অর্থাৎ হত্যা এমন একটি কাজ যার ফলে একজন মানুষের মৃত্যু ঘটে; সুতরাং বিষ-প্রয়োগকেও হত্যা বলা যেতে পারে। তার যখন মনে হল যে জুরিরা সে সত্যকেও বুঝতে পেরেছে তখন সে বোঝাতে শুরু করল যে, চুরি এবং হত্যা যদি একই সঙ্গে সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে দুটি অপরাধের মিলিত ফল হবে হত্যাসহ চুরি।

যদিও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা শেষ করতে সে নিজেই ব্যগ্র, যদিও সে জানে যে সুইশ মেয়েটি তার জন্য অপেক্ষা করে আছে, তবু নিজের কর্তব্যে সে এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে আর সে থামতে পারে না; কাজেই সে বিস্তারিতভাবে জুরিদের বোঝাতে লাগল যে, যদি তারা বুঝতে পারে যে কয়েদীরা দোষী, তাহলে দোষী রায় দেবার অধিকার তাদের আছে; যদি তারা বোঝে তারা দোষী নয়, তাহলে নির্দোষ রায় দেবার অধিকারও তাদের আছে; আবার যদি তারা বোঝে যে কয়েদীরা এক অপরাধে দোষী, কিন্তু অন্য অপরাধের বেলায় নয়, তাহলে এক অপরাধের ক্ষেত্রে দোষী এবং অন্য অপরাধের ক্ষেত্রে নির্দোষ রায়ও তারা দিতে পারে। সে আরও ব্যাখ্যা করে বলল যে, এই সব অধিকার তাদের দেওয়া থাকলেও সে অধিকারকে যুক্তি সহকারে প্রয়োগ করাই তাদের কর্তব্য। সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঘড়ির উপর চোখ পড়ায় যখন দেখল যে তিনটে বাজতে মাত্র তিন মিনিট বাকি, তখন আর বিলম্ব না করে মামলার বিবরণ শেষ করাই স্থির করল।

'এই মামলার বিবরণ নিম্নরূপ', এই ভাবে শুরু করে প্রেসিডেণ্ট সেই সব

কথারই পুনরাবৃত্তি করল যেগুলি ইতিপূর্বেই অ্যাডভোকেটরা, সরকারী উকিল ও সাক্ষীরা বার কয়েক বলেছে।

প্রেসিডেন্ট বলে চলল, আর পার্শ্ববর্তী সদস্যরা মুখের উপর গভীর মনোযোগের ভাব ফুটিয়ে শুনলেও মাঝে মাঝেই ঘড়ির দিকে তাকাতে লাগল, কারণ তাদের মনে হতে লাগল যে বক্তৃতাটি খুব ভাল—অর্থাৎ যে রকমটা হওয়া উচিত—হলেও বড় বেশী দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। সরকারী উকিল, অন্য উকিলরা, আসলে আদালতের সকলের মনেই ওই এক কথা। অবশেষে প্রেসিডেন্ট মামলার বিবরণ শেষ করল।

যখন থেকে প্রেসিডেন্ট তার বক্তৃতা শুরু করেছে তখন থেকেই মাসলভা একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন তার মনে মনে ভয় পাছে কোন একটা শব্দ সে শুনতে না পায়। ফলে তার সঙ্গে চোখে-চোখে হবার ভয় না থাকায় নেখ্‌ল্যুদভও সারাক্ষণ তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। আর তার মন অতীতের অনেকগুলো অধ্যায়কে পরিক্রমা করে এল।

হ্যাঁ, ঠিক সেই। পরনে কয়েদীর আলখাল্লা, চেহারা অনেক বড় হয়েছে, বুক ও মুখের নীচটা অনেক বেশী ভরাট হয়েছে, কপালে ও মুখে বেশ কিছু ভাঁজ পড়েছে, চোখ দুটো ফুলেছে, তথাপি এ নিশ্চয় সেই কাতয়ুশা যে একদা এক ঈস্টারের রাতে কত সরল ভাবে ভালবেসে তার দিকে তাকিয়ে ছিল, আর তার দুটি হাসি-ভরা চোখ জীবনের আনন্দে ভরে উঠেছিল।

'কী আশ্চর্য যোগাযোগ যে এতগুলো বছর আমি তাকে একবারও না দেখলেও এই মামলায় আজ আমি বসেছি জুরির আসনে, আর তাকে দেখছি কয়েদীর কাঠগড়ায়! জানি না কোথায় এর পরিণতি! আঃ, ওরা যদি আরও দ্রুত সব কাজ শেষ করতে পারত!'

তথাপি যে অনুশোচনা তার ভিতর থেকে মাথা তুলতে চাইছে তার কাছে সে কিছুতেই নত হবে না। সে ভাবতে চেষ্টা করল যে এ সবই আকস্মিক ব্যাপার, তার প্রচলিত জীবনযাত্রায় কোনরকম ব্যাঘাত না ঘটিয়ে মিলিয়ে যাবে। তার মনে হল সে যেন একটা পোষা কুকুর; গলায় বাঁধা শেকল রয়েছে মনিবের হাতে, আর কুকুরটা নিজের ময়লার মধ্যেই নাক ঘসছে। কখনও ঘেউ কেউ করছে, কখনও পিছিয়ে যাচ্ছে, কখনও বা ময়লার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে চাইছে, কিন্তু নির্দয় মনিব যেতে দিচ্ছে না।

নেখ্‌ল্যুদভও নিজের কাজে নিজেই বিরক্তিবোধ করলেও সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর শক্তিমান হাতের টানও বোধ করছে; কিন্তু নিজের কাজের তাৎপর্য সে এখনও সম্পূর্ণ বুঝতে পারে নি, আর তাই প্রভুর হাতের টানকেও বুঝতে চাইছে না। তাই এখনও সে সাহসে ভর করে তার স্বাভাবিক ভঙ্গীতে পায়ের উপর পা রেখে সামনের সারিতে চেয়ারে বসে পিঁস্‌-নে নিয়ে খেলা করছে। তথাপি সর্বক্ষণই অন্তরের অন্তঃস্তলে শুধু মাত্র এই বিশেষ কাজটিই নয়, তার সমগ্র

স্বেচ্ছাচারী, অসংযত, নিষ্ঠুর, অলস জীবনযাত্রার নিষ্ঠুরতা, কাপুরুষতা ও নীচতাকে সে মর্মে মর্মে অনুভব করতে লাগল। আর যে ভয়ংকর যবনিকা একটা দুর্বোধ্য উপায়ে তার এই পাপকে, পরবর্তী দশ বছরব্যাপী সমগ্র জীবনকে তার কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছিল, আজ যেন সে যবনিকা কাঁপতে শুরু করেছে, আর তার আড়ালে এতদিন যা কিছু ঢাকা ছিল সব যেন সে দেখতে পাচ্ছে।

অধ্যায়—২৩

অবশেষে প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা শেষ হল। হাতের মনোরম ভঙ্গীতে প্রশ্ন-মালাকে তুলে নিয়ে সে ফোরম্যানের হাতে দিল। ফোরম্যান এগিয়ে এসে হাত পেতে সেটা নিল। এতক্ষণে নিজেদের আলোচনা-কক্ষে ফিরে যেতে পারায় খুশি হয়ে জুরিরা একে একে আদালত থেকে চলে গেল। তাদের পিছনে দরজাটা বন্ধ হওয়া মাত্রই একটি রক্ষীসৈনিক এগিয়ে এসে খাপ থেকে তলোয়ার খুলে সেটাকে কাঁধের উপর উঁচু করে ধরে দরজার পাশে দাঁড়াল। বিচারকেরা উঠে বেরিয়ে গেল। কয়েদীদেরও বাইরে নিয়ে যাওয়া হল।

আলোচনা-কক্ষে গিয়ে জুরিদের প্রথম কাজই হল আগেকার মত সিগারেট বের করে ধূমপান শুরু করা। এতক্ষণ আদালতে বসে থেকে সকলেই অল্প-বিস্তর নিজেদের কাজের অস্বাভাবিকতা ও অসারতা বোধ করছিল; আলোচনা-কক্ষে এসে ধূমপান করতে করতে সে মনোভাব দূর হয়ে গেল। একটা স্বস্তিবোধ করে সকলেই গুছিয়ে বসল এবং উত্তপ্ত আলোচনা শুরু করে দিল।

দয়ালু বণিক বলল, 'মেয়েটির দোষ নেই। সেই ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়েছিল। আমরা চাইব যে তাকে করুণা প্রদর্শন করা হোক।'

ফোরম্যান বলল, 'সেটাই আমাদের ভেবে দেখতে হবে। ব্যক্তিগত ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা চলতে পারি না।'

কর্ণেল মন্তব্য করল, 'প্রেসিডেন্টের সংক্ষিপ্ত-সারটি বেশ ভাল হয়েছিল।'

'ভাল? সেকি, আমার তো প্রায় ঘুম পেয়ে গিয়েছিল।'

ইহুদি-বংশোদ্ভূত কেরাণীটি বলল, 'আসল কথাই হল, মাসলভা তাদের সঙ্গে জড়িত না থাকলে চাকররা টাকার কথা জানতেই পারত না।'

একজন জুরি জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আপনারা কি মনে করেন মেয়েটিই চুরি করেছিল?'

দয়ালু বণিকটি চেঁচিয়ে বলল, 'সে কথা আমি কখনও বিশ্বাস করব না। সব ঐ লাল চোখ ডাইনিটার কাজ।'

কর্ণেল বলল, 'তারা সকলেই ভাল মানুষ।'

'কিন্তু সে তো বলছে ঘরের মধ্যে যায়ই নি।'

'আঃ। তাহলে তার কথাই বিশ্বাস করে বসে থাকুন।'

'পৃথিবীর সকলে বললেও আমি ওই ভ্রষ্টা নারীর কথা বিশ্বাস করব না।'

কেরাণী বলল, 'আপনি বিশ্বাস করুন আর না করুন তাতে তো ব্যাপারটার মীমাংসা হবে না।'

কর্ণেল বলল, 'মেয়েটির কাছে চাবি ছিল।'

বণিক পাল্টা প্রশ্ন করল, 'ছিল তো কি হয়েছে?'

'আর আংটিটা?'

বণিক আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'সে সম্পর্কে সব কিছু সে কি বলে নি? লোকটা মেজাজি ছিল, তার উপর পেটেও বেশ কিছু পড়েছিল, আর মেয়েটিকে আঘাতও করেছিল; এর চাইতে সহজ আর কি হতে পারে? তারপরই সে দুঃখিত বোধ করল—খুবই স্বাভাবিক। বলল, "কিছু মনে করো না। এটা নাও।" ওরা বলছিল, তার উচ্চতা ছ'ফুট পাঁচ ইঞ্চি; আমার তো মনে হয় তার ওজন হবে বিশ টোন।'

পিয়তর গেরাসিমভিচ বলল, 'সেটা তো কথা নয়। প্রশ্ন হল, সমস্ত ব্যাপারটা কার মাথায় এসেছিল, আর কেই বা প্রেরণা জুগিয়েছিল, মেয়েটা, না চাকররা?'

'চাকরদের নিজেদের পক্ষে এটা করা সম্ভবই ছিল না, কারণ চাবি ছিল মেয়েটির কাছে।'

বেশ কিছুক্ষণ ধরে এই রকম ইতস্তত আলোচনা চলতে লাগল।

শেষটায় ফোরম্যান বলল, 'মাফ করবেন মশাইরা, একসঙ্গে বসে ব্যাপারটা আলোচনা করা ঠিক নয় কি? আসুন বসা যাক।' বলেই সে একটা চেয়ারে বসল।

কেরাণী বলল, 'কিন্তু এ সব মেয়েরা সব পারে।' তার মতে মাসলভাই প্রধান অপরাধী, আর সে মতের সমর্থনে সে একটা ঘটনা বলল, কেমন করে একটা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক রাজপথ থেকে তার এক সহকর্মীর ঘড়ি চুরি করেছিল।

প্রসঙ্গক্রমে কর্ণেল আরও উল্লেখযোগ্য একটা ঘটনার কথা জানাল; একটা রূপোর সামোভার চুরির ঘটনা।

পেন্সিলটা টেবিলে ঠুকে ফোরম্যান বলল, 'মশাইরা, দয়া করে প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।'

প্রশ্নগুলি এইভাবে লেখা হয়েছিল:

(১) ১৮৮—সালের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে—শহরের আরও কিছু লোকের সঙ্গে সহযোগিতায় বণিক স্মেলকভের জিনিসপত্র ও টাকা-কড়ি অপহরণের উদ্দেশ্যে তার প্রাণনাশের চেষ্টায় বিষমিশ্রিত ব্র্যাণ্ডি খেতে দিয়ে তার মৃত্যু ঘটাবার, এবং তার কাছ থেকে নগদ দু'হাজার পাঁচশ' রুবল ও একটি হীরের আংটি চুরির অপরাধে গ্রাম বরকি, জেলা ক্রাপি ভেনস্কির অধিবাসী তেইশ

বছর বয়স্ক চাষী সাইমন পেত্রভিচ কারতিংকিন কি অপরাধী ?

(৩) উপরে বর্ণিত অপরাধে তেতাল্লিশ বছরের এভফিমিয়া আইভানভ্না বচকভা কি অপরাধী ?

(৩) প্রথম প্রশ্নে বর্ণিত অপরাধে সাতাশ বছরের কাতেরিনা মিখাইলভ্না মাসলভা কি অপরাধী ?

(৪) কয়েদী এভফিমিয়া বচকভা যদি প্রথম প্রশ্নে বর্ণিত অপরাধে অপরাধী না হয়ে থাকে, তাহলে ১৮৮—সালের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে হোতেল মরিতানিয়াতে কর্মনিযুক্ত অবস্থায় ঐ হোটেলের অধিবাসী বণিক স্মেলকভের ঘর থেকে তার তালাবদ্ধ পোর্টম্যাণ্টো থেকে দু হাজার পাঁচশ' রুবল চুরি করা, এবং সেই উদ্দেশ্যে একটা চাবি নিয়ে এসে তালায় লাগিয়ে পোর্টম্যাণ্টোটা খোলার অপরাধে সে কি অপরাধী ?"

ফোরম্যান প্রথম প্রশ্নটি পড়ল।

'বলুন মশাইরা, আপনারা কি মনে করেন ?'

প্রশ্নের জবাব তাড়াতাড়িই পাওয়া গেল। সকলেই একমত হয়ে বলল 'দোষী' এবং বিষপ্রয়োগ ও লুঠ উভয় ব্যাপারেই কারতিংকিন জড়িত। একজন বৃদ্ধ 'আর্টেল্‌শ্‌চিক (শ্রমিক সংগঠনের সদস্য) একমাত্র ব্যতিক্রম, কারণ সে মুক্তির স্বপক্ষে মত প্রকাশ করল।

ফোরম্যান ভাবল সে হয়ত ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি, তাই তাকে বোঝাতে চাইল যে সব কিছুই কারতিংকিনের অপরাধই প্রমাণ করছে। বৃদ্ধ জবাবে বলল যে সে সবই বুঝেছে, তবু সে এখনও মনে করে যে তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করাই ভাল, কারণ 'আমরা নিজেরাও কিছু সাধুসন্ত নই।'

বচকভা-সংক্রান্ত দ্বিতীয় প্রশ্ন নিয়ে অনেক বিতর্ক ও চেঁচামেচির পরে এক-বাক্যে বলা হল 'নির্দোষ', কারণ বিষপ্রয়োগে যে তার হাত ছিল সে বিষয়ে স্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

মাসলভাকে খালাস দেবার আগ্রহে বণিক বার বার বলতে লাগল যে, এ সব কিছুর প্রধান উদ্যোক্তাই বচকভা। জুরিদের অনেকেই এই মত সমর্থন করলেও আইনের পথে ঠিক ঠিক চলবার বাসনায় ফোরম্যান ঘোষণা করল যে বচকভাকে বিষ প্রয়োগের সঙ্গে জড়িত করবার মত কোন প্রমাণ তাদের হাতে নেই। অনেক বিতর্কের পরে ফোরম্যানের মতই বহাল থাকল।

বচকভা-সম্পর্কিত তৃতীয় প্রশ্নের জবাব হল 'দোষী'। কিন্তু আর্টেল্‌শ্‌চিকের পীড়াপীড়িতে তাকে করুণা প্রদর্শনের সুপারিশ করা হল।

মাসলভা-সম্পর্কিত তৃতীয় প্রশ্নে বিতর্কের তুমুল ঝড় উঠল। ফোরম্যানের মতে, বিষপ্রয়োগ ও চুরি—উভয় অপরাধেই সে অপরাধী, কিন্তু বণিক তাতে একমত নয়। কর্নেল, কেরাণী ও বৃদ্ধ আর্টেল্‌শ্‌চিক বণিকের পক্ষ সমর্থন করল, বাকিরা দোদুল্যমান, এবং ক্রমে ফোরম্যানের অভিমতই বলবৎ হয়ে

উঠল, কারণ জুরিরা সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আর তাই যে মতটা গ্রহণ করলে তারা তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে আসতে পারবে এবং এখান থেকে মুক্তি পাবে সেটাকে মেনে নেওয়াই তারা শ্রেয় বলে মনে করল।

যা কিছু ঘটেছে তা থেকে এবং মাসলভা সম্পর্কে তার পূর্ব-জ্ঞান থেকে নেখ্‌ল্যুদভ এ বিষয়ে নিশ্চিত যে চুরি ও বিষ প্রয়োগ এই দুই ব্যাপারেই সে নির্দোষ; তাই সে নিশ্চিত জানত যে অন্য সকলেই সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। কিন্তু যখন সে দেখল যে, বণিকের অদ্ভুত যুক্তি (মাসলভার দেহের প্রশংসাই যার ভিত্তি), ফোরম্যানের পীড়াপীড়ি, এবং বিশেষ করে সকলের ক্লান্তি—সব কিছুই তাকে দণ্ডিত করার দিকেই এগিয়ে চলেছে, তখন তার নিজের ইচ্ছাটা প্রকাশ করবার বাসনা হল, কিন্তু পাছে মাসলভার সঙ্গে তার সম্পর্কটা প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই সে ভয় পেল। তথাপি তার মনে হল, সব কিছুকে এ পথে চলতে দিতে সে পারে না, এবং পুনরায় লজ্জায় লাল হয়ে বিবর্ণ মুখে সে কিছু বলতে যাবে এমন সময় ফোরম্যানের হামবড়াই আচরণে বিরক্ত পিয়তর গেরা-সিমভিচ তার আপত্তি জানাতে শুরু করল এবং যে কথা নেখ্‌ল্যুদভ বলতে যাচ্ছিল ঠিক সেই কথাগুলিই বলল।

সে বলল, 'আমাকে এক মিনিট সময় দিন। আপনি মনে করছেন যে মেয়েটির কাছে চাবি থাকাই প্রমাণ করে যে সেই চুরির অপরাধে অপরাধী; কিন্তু সে চলে যাবার পরে চাকররা একটা নকল চাবি দিয়ে পোর্টম্যাণ্টো খুলেছে—এর চাইতে সহজ আর কি হতে পারে?'

বণিক বলল, 'অবশ্য, অবশ্য।'

'সে টাকাটা নিতেই পারে না, কারণ তার তখন যা অবস্থা তাতে টাকা নিয়ে সে কি করবে তাই তার পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন।'

বণিক মন্তব্য করল, 'আমিও ঠিক তাই বলি।'

'কিন্তু এটা তো খুবই সম্ভব যে তার ফিরে আসাতেই চাকরদের মাথায় মতলবটা ঢোকে এবং তারই সুযোগ নিয়ে সব দোষ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।'

পিয়তর্ গেরাসিমভিচ্ এমন বিরক্তির সঙ্গে কথাগুলি বলল যে ফোরম্যানও বিরক্ত হয়ে উঠল এবং একগুঁয়েভাবে বিপরীত মতটাই সমর্থন করতে লাগল। কিন্তু পিয়তর্ গেরাসিমভিচ্ এমন জোরের সঙ্গে তার বক্তব্য রাখল যে অধিকাংশ সদস্য তার সঙ্গে এক মত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে টাকা চুরির ব্যাপারে মাসলভা নির্দোষ আর আংটিটা তাকে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু যখন বিষপ্রয়োগের কথা উঠল তখন তার উগ্র সমর্থক বণিক বলল যে এ অভিযোগ থেকেও তাকে মুক্তি দিতে হবে কারণ বিষপ্রয়োগের কোন উদ্দেশ্যই তার থাকতে পারে না। অবশ্য ফোরম্যান বলল যে তাকে মুক্তি দেওয়া অসম্ভব যেহেতু সে স্বীকার করেছে যে গুঁড়োটা সেই দিয়েছিল।

'তা ঠিক, তবে আফিং মনে করে দিয়েছিল,' বণিক বলল।

বিষয়ান্তরে যেতে ভালবাসে বলে কর্ণেল বলল, 'আফিং খেয়েও মানুষের জীবন যেতে পারে।' তারপরই কেমন করে হাতের কাছে ডাক্তার না থাকলে বেশী মাত্রায় আফিং খাওয়ার ফলে তার শ্যালকের স্ত্রী মারাই যেত সেই গল্প ফেঁদে বসল। এতই আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে ও মর্যাদার সঙ্গে কর্ণেল তার গল্প বলতে লাগল যে কারও বাধা দেওয়ার সাহস হল না। শুধু কেরাণীটি তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আর একটা গল্প শুরু করে দিল: 'অনেকে আফিং-এ এতই অভ্যস্ত হয়ে যায় যে চল্লিশ ফোঁটাও খেতে পারে। আমার এক আত্মীয় আছে—' কিন্তু কর্ণেল তার নিজের গল্পের মধ্যে এই বাধা অস্বীকার করে তার শ্যালকের স্ত্রীর গল্পটাই বলতে শুরু করল।

জনৈক জুরি বলে উঠল, 'কিন্তু মশাইরা, আপনারা কি জানেন যে পাঁচটা বাজতে চলেছে?'

ফোরম্যান জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা তাহলে কি বলব বলুন তো? বলব কি যে চুরির অভিপ্রায় না থাকলেও মেয়েটি দোষী? এবং কোন কিছু চুরি না করেও? তাতে কি চলবে?'

নিজের জয়লাভে খুশি হয়ে পিয়তর্ গেরাসিমভিচ্ সম্মতি জানাল।

বণিক বল, 'তাকে যাতে করুণা করা হয় তার জন্য সুপারিশ করতে হবে।

সকলে একমত হল; শুধু বৃদ্ধ আর্টেল্শ্চিক বলল যে তাকে 'নির্দোষ' ঘোষণা করা উচিত।

ফোরম্যান বুঝিয়ে বলল, 'ও একই কথা; চুরির অভিপ্রায় ছিল না, এবং কোন কিছু চুরি করেও নি। সুতরাং নির্দোষ—সেটা তো খুবই স্পষ্ট।'

বণিক সানন্দে বলে উঠল, 'ঠিক আছে; ওতেই হবে। আমরা সুপারিশ করছি, তার প্রতি করুণা করা হোক।'

তখন সকলে এতই ক্লান্ত, দীর্ঘ আলোচনায় এতই বিচলিত যে, জীবননাশের অভিপ্রায় না থাকলেও কাতয়ুশা গুঁড়োটা দেবার অপরাধে অপরাধী—এই কথাগুলো যোগ করার কথা কারও মনে হল না।

নেখ্লয়ুদভ তখন এতই উত্তেজিত যে এই বাদ পড়াটা তারও নজরে পড়ল না। কাজেই সকলের সম্মতিমতই জবাবগুলো লিখে কাগজখানা আদালতে নিয়ে যাওয়া হল।

র‍্যাবেলেস এমন একজন উকিলের গল্প করেছে যে একটা মামলা পরিচালনার কালে সব রকম আইনের উদ্ধৃতি দিয়েছে, অর্থহীন লাতিন ভাষায় কুড়ি পাতা ভর্তি আইনের কথা পড়েছে, এবং তারপর বিচারকদের কাছে প্রস্তাব রেখেছে যে পাশার দান ফেলা হোক, যদি বিজোড় সংখ্যা হয় তাহলে আসামীর কথা ঠিক, আর জোড় সংখ্যা হলে ফরিয়াদীর কথা ঠিক।

এ ক্ষেত্রে ও অবস্থায় প্রায় সেই রকমই হল।

জুরিরা ঘণ্টা বাজাল। যে সৈনিকটি খোলা তলোয়ার হাতে দরজার

বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, সে তলোয়ার খাপে ভরে সরে দাঁড়াল। বিচারকরা আসন গ্রহণ করল, এবং জুরিরা একে একে বেরিয়ে এল।

ফোরম্যান গম্ভীরভাবে কাগজখানা নিয়ে প্রেসিডেণ্টের হাতে দিল। প্রেসিডেণ্ট তার উপর চোখ বুলিয়ে সবিস্ময়ে দুই হাত ছড়িয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল। তার বিস্ময়ের কারণ জুরিরা একটি উপবিধি—অপহরণের অভিপ্রায় না থাকলেও—যোগ করলেও দ্বিতীয় উপবিধি—প্রাণনাশের অভিপ্রায় না থাকলেও—যোগ করে নি। জুরিদের সিদ্ধান্তের ফল তাহলে এই দাঁড়ায় যে মাসলভা চুরিও করে নি, অপহরণও করে নি, অথচ কোন রকম আপাত কারণ ছাড়াই একটি মানুষকে বিষ খাইয়েছে।

সে বাঁ দিকের সদস্যের কানে কানে বলল, 'দেখুন কী অবাস্তব সিদ্ধান্তে তারা এসেছেন। এর অর্থ সাইবেরিয়ায় দণ্ডভোগ, অথচ সে নির্দোষ।'

সদস্যটি জবাব দিল, 'আপনি নিশ্চয়ই বলতে চান না যে সে নির্দোষ?'

'হ্যাঁ, সে নিশ্চয় নির্দোষ। আমি মনে করি, এ ক্ষেত্রে ৮১৭ ধারাকে কার্যকর করতে হবে।' (৮১৭ ধারায় বলা হয়েছে যে, আদালত যদি জুরির সিদ্ধান্তকে ন্যায়বিরোধী বলে মনে করে তাহলে তাকে বাতিল করে দিতে পারে।)

অপর সদস্যের দিকে ঘুরে প্রেসিডেণ্ট বলল, 'আপনি কি মনে করেন?'

দয়ালু সদস্যটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। সামনে রাখা কাগজের উপর লেখা সংখ্যাগুলোর দিকে তাকিয়ে সেগুলিকে যোগ করল; যোগফল তিন দিয়ে বিভাজ্য হল না। সে মনে মনে স্থির করেছিল, মোট সংখ্যাটা তিন দিয়ে বিভাজ্য হলে সে প্রেসিডেণ্টের প্রস্তাবে সম্মতি জানাবে; কিন্তু তা না হওয়া সত্ত্বেও দয়াপরবশ হয়ে সে সম্মতিই জানাল।

বলল, 'আমিও মনে করি, তাই করা উচিত।'

গম্ভীর সদস্যের দিকে ফিরে প্রেসিডেণ্ট প্রশ্ন করল, 'আর আপনি?'

সে দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল, 'কিছুতেই না। যা দেখা যাচ্ছে, কয়েদীদের খালাস দেওয়ায় দলিলপত্র জুরিদেরই অভিযুক্ত করছে। বিচারকরাও সে কাজ করলে লোকে কি বলবে? আমি কিছুতেই তাতে মত দেব না।'

প্রেসিডেণ্ট ঘড়ি দেখল। 'খুবই দুঃখের কথা, কিন্তু কি করা যাবে?' প্রশ্নগুলো পড়ে শোনাবার জন্য সে ফোরম্যানকে দিল।

সকলে উঠে দাঁড়াল। ফোরম্যান এক পা এক পা করে এগিয়ে একবার কেশে প্রশ্ন ও উত্তরগুলো পড়ল। সারা আদালত—সেক্রেটারি, অ্যাডভোকেট, এমন কি সরকারী উকিল—সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগল।

কয়েদীরা শান্ত হয়ে বসে রইল। প্রশ্নোত্তরের অর্থ তারা কিছুই বুঝল না। আবার সকলে বসে পড়ল। প্রেসিডেণ্ট সরকারী উকিলকে জিজ্ঞাসা করল, কয়েদীদের কি শাস্তি দেওয়া যায়।

মাসলভার শাস্তি হওয়ায় তার অপ্রত্যাশিত সাফল্যে সরকারী উকিল খুব

খুশি। সে ভাবল এ সবই তার বক্তৃতার ফল। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দেখে নিয়ে সে বলল :

'আমার মতে সাইমন কারতিংকিনের দণ্ড হওয়া উচিত ১৭৫২ ধারা এবং ১৪৫৩ ধারার অনুচ্ছেদ ৪ অনুসারে, ইউফিমিয়া বচকভার ১৬৮৯ ধারা মতে, আর কাতেরিনা মাসলভার ১৪৫৪ ধারা মতে।'

তিনটি ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ দণ্ডের বিধান রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট উঠতে উঠতে বলল, 'শাস্তি সম্পর্কে বিবেচনার জন্য আদালত মুলতুবি রাখা হল।'

তার পিছনে পিছনে সকলেই উঠে পড়ল, এবং সুষ্ঠুভাবে কর্তব্যপালনের খুশিতে ভরা মন নিয়ে কেউ বেরিয়ে গেল, কেউ বা ঘরের মধ্যেই চলাফেরা করতে লাগল।

ফোরম্যান নেখ্‌লয়ুদভকে কি যেন বলছিল, এমন সময় পিয়তর্‌ গেরাসিমভিচ্‌ এগিয়ে এসে বলল, 'আপনারা কি জানেন মশাইরা যে আমরা সব ব্যাপারটাকে জগা-খিচুড়ি পাকিয়ে ফেলেছি? আরে, আমরা যে মেয়েটাকে সাইবেরিয়াতে ঠেলে দিয়েছি।'

নেখ্‌লয়ুদভ চেঁচিয়ে উঠল, 'কি বলছেন?'

'কেন! আমাদের জবাবে আমরা যে 'প্রাণনাশের অভিপ্রায় না থাকলেও দোষী' এই কথাগুলো লিখি নি। সেক্রেটারি এইমাত্র আমাকে বলছিলেন যে সরকারী উকিল মেয়েটিকে পনেরো বছরের জন্য দণ্ডিত করার পক্ষপাতী।'

ফোরম্যান বলল, 'দেখুন, সিদ্ধান্তটা তো সেই রকমই নেওয়া হয়েছে।'

পিয়তর্‌ গেরাসিমভিচ্‌ আপত্তি জানিয়ে বলল, 'যেহেতু সে টাকাটা নেয় নি তার থেকেই তো বোঝা যায় যে হত্যার কোন অভিপ্রায়ই তার থাকতে পারে না।'

ফোরম্যান নিজেকে সমর্থন করে বলল, 'কিন্তু বেরিয়ে যাবার আগে জবাবটা আমি পড়ে শুনিয়েছিলাম, তখন তো কেউ আপত্তি করেন নি।'

পিয়তর্‌ গেরাসিমভিচ্‌ নেখ্‌লয়ুদভের দিকে ঘুরে বলল, 'ঠিক তখনই আমি বাইরে গিয়েছিলাম, আর আপনিও বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিলেন বলে খেয়ালই করেন নি।'

'আমি কখনও ভাবি নি—' নেখ্‌লয়ুদভ বলল।

'ওঃ, আপনি ভাবেন নি?'

'কিন্তু এখন তো ভুলটা সংশোধন করতে পারি,' নেখ্‌লয়ুদভ বলল।

'না, না; ও পাট চুকে গেছে।'

নেখ্‌লয়ুদভ কয়েদীদের দিকে তাকাল। ওদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল, আর ওরা এখনও রেলিংয়ের পিছনে সৈন্যদের সামনে চুপচাপ বসে আছে। মাসলভা হাসছে। একটা পাপ-বোধ নেখ্‌লয়ুদভের আত্মাকে আলোড়িত করে

তুলল। এতক্ষণ পর্যন্ত সে আশা করেছিল যে মাসলভা মুক্তি পাবে, হয়তো এই শহরেই থাকবে, তাই তার প্রতি কি রকম ব্যবহার করবে সেটা বুঝে উঠতে পারে নি। তার সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক রাখা কত কঠিন। কিন্তু সাইবেরিয়া এবং দণ্ডাদেশ মিলে তার সঙ্গে কোন রকম সম্পর্কের সম্ভাবনাকেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। শিকারের ব্যাগে আহত পাখিটা আর ছটফট করবে না, আর কোন-দিন তার অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে না।

অধ্যায়—২৪

পিয়তর্ গেরাসিমভিচের ধারণাই সত্য হল।

প্রেসিডেণ্ট পরামর্শ-কক্ষ থেকে একখানা কাগজ নিয়ে এসে পড়তে লাগল:

'মহামান্য সম্রাটের অনুজ্ঞায় এবং জুরিদের সিদ্ধান্তের বলে ফৌজদারী আদালত দণ্ডবিধির ৭৭১ ধারার ৩ উপধারা এবং ৭৭৬ ও ৭৭৭ ধারার ৩ উপধারা মতে ফৌজদারি আদালত ১৮৮ সালের ২৮শে এপ্রিল তারিখে এই রায় ঘোষণা করছে যে, তেত্রিশ বছর বয়স্ক চাষী সাইমন কারতিংকিন এবং সাতাশ বছর বয়স্কা মেশ্‌চাংকা কাতেরিনা মাসলভাকে সব রকম সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে এবং ক্রীতদাসের জীবনযাপনের দণ্ডভোগ করতে কারতিংকিনকে আট বছরের জন্য এবং মাসলভাকে চার বছরের জন্য সাই-বেরিয়ায় প্রেরণ করা হবে; সেই সঙ্গে দণ্ডবিধির ২৮ ধারায় বর্ণিত ফলাফলও প্রযুক্ত হবে। তেতাল্লিশ বছর বয়স্কা মেশ্‌চাংকা বচকভাকে সব রকম বিশেষ ব্যক্তিগত ও অর্জিত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে এবং দণ্ডবিধির ৪৯ ধারায় বর্ণিত ফলাফলসহ তিন বছরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। এই মামলার ব্যয় কয়েদীরা সমান অংশে বহন করবে; যদি তাদের যথেষ্ট সম্পত্তি না থাকে তা হলে মামলার ব্যয় রাজকোষের উপর বর্তাবে। সাক্ষ্য হিসাবে প্রদর্শিত জিনিস-গুলি বিক্রি করা হবে, আংটিটা ফেরৎ দেওয়া হবে, কাঁচের পাত্রগুলি ভেঙে ফেলা হবে।'

কারতিংকিন হাত দুটো দুই পাশে চেপে ধরে ঠোঁট নাড়তে লাগল। বচকভা সম্পূর্ণ চুপচাপ। দণ্ডাদেশ শুনে মাসলভার মুখ লাল হয়ে গেল, হঠাৎ সে 'আমি দোষী নই, আমি দোষী নই!' বলে এমনভাবে চীৎকার করে উঠল যে সমস্ত ঘরটায় তার প্রতিধ্বনি হতে লাগল। 'এটা পাপ। আমি দোষী নই। আমি কখনও চাই নি—কখনও ভাবি নি—যা সত্য তাই বলছি—যা সত্য।' বেঞ্চিতে বসে পড়ে সে সজোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কারতিংকিন ও বচকভা বাইরে চলে গেল। সে তখনও বসে বসে কাঁদছে। একজন সৈনিক এসে তার আলখাল্লার আস্তিন ধরল।

নিজের পাপ-চিন্তা ভুলে নেখ্‌ল্যুদভ মনে মনে ভাবল, 'না, এভাবে ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব।' দ্রুতপায়ে তার খোঁজে সে দালানে চলে গেল। অকারণেই তাকে আর একবার দেখার ইচ্ছা হল। দরজায় বেশ ভীড় জমেছে। কাজ শেষ হওয়ায় অ্যাডভোকেট ও জুরিরা খুশি মনে বেরিয়ে যাচ্ছে। কাজেই তাকে কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করতে হল। যখন সে দালানে পৌঁছল মাসলভা ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে। সকলে যে তাকে দেখছে সেটা উপেক্ষা করেই সে দালান ধরে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল ও তাকে পার হয়ে থেমে দাঁড়াল। তার কান্না থেমেছে, কিন্তু তখনও ফোঁপাচ্ছে, রক্তিম মুখটা বার বার রুমালে মুচছে। তাকে লক্ষ্য না করেই মাসলভা এগিয়ে গেল। তখন নেখ্‌ল্যুদভ ফিরে গিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে গেল। প্রেসিডেন্ট তখন আদালত ত্যাগ করে লবিতে চলে গেছে নেখ্‌ল্যুদভ যখন তার কাছে উপস্থিত হল তখন সে সবেমাত্র হাল্কা ধূসর রঙের ওভারকোটটা পরে চাকরের কাছ থেকে রূপো-বাঁধানো লাঠিঠা হাতে নিয়েছে।

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'স্যার, যে মামলাটার এইমাত্র বিচার হয়ে গেল সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই। আমি একজন জুরি।'

প্রেসিডেন্ট নেখ্‌ল্যুদভের হাতটা চেপে ধরল ; যে সন্ধ্যায় তাদের প্রথম দেখা হয়েছিল এবং উপস্থিত সব যুবকদের চাইতে সে ভাল নেচেছিল, আনন্দের সঙ্গে সেই কথা স্মরণ করে বলে উঠল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয় প্রিন্স নেখ্‌ল্যুদভ। এ তো আনন্দের কথা। মনে হচ্ছে এর আগেও আমাদের দেখা হয়েছে। বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি?'

অন্যমনস্ক ও বিষণ্ণ ভঙ্গীতে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'মাসলভা-সংক্রান্ত জবাবে একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। বিষপ্রয়োগের দোষে সে দোষী নয়, অথচ তাকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হয়েছে।'

সামনের ফটকের দিকে এগোতে এগোতে প্রেসিডেন্ট বলল, 'আপনারা যে জবাব দিয়েছেন তদনুসারেই আদালত দণ্ডাদেশ দিয়েছে ; যদিও আপনাদের জবাবগুলো সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।'

'তা ঠিক, কিন্তু সে ভুল কি সংশোধন করা যেত না?'

টুপিটাকে একদিকে একটু নামিয়ে দরজার দিকে এগোতে এগোতেই প্রেসিডেন্ট বলল, 'আপিলের উপযুক্ত কারণ সব সময়ই খুঁজলে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আপনাকে কোন অ্যাডভোকেটের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'কিন্তু এ যে ভয়ংকর।'

নেখ্‌ল্যুদভের প্রতি যথাসম্ভব বিনয় প্রকাশ করে প্রেসিডেন্ট বলল, 'দেখুন, মাসলভার সামনে দুটো পথই খোলা ছিল।' তারপর গোঁফ জোড়াকে পরিপাটি করে নিয়ে নেখ্‌ল্যুদভের কনুইয়ের নীচে আলতোভাবে হাতটা রেখে সামনের ফটকের দিকে এগোতে এগোতেই বলল, 'আপনিও যাচ্ছেন তো?'

তাড়াতাড়ি কোটটা গায়ে চড়িয়ে তার পিছনে হাঁটতে হাঁটতে নেখ্‌লুদভ বলল, 'হ্যাঁ।'

তারা বাইরের উজ্জ্বল রোদে বেরিয়ে এল। পথে গাড়ির চাকার ঘর্ঘর শব্দের জন্য তারা উঁচু গলায় কথা বলতে লাগল।

প্রেসিডেন্ট বলল, 'দেখুন, পরিস্থিতিটা একটু অদ্ভুত। মাসলভার সামনে দুটোর একটা পথ খোলা ছিল ঃ হয় প্রায় খালাস এবং খুব অল্প সময়ের কারাদণ্ড, অথবা সাইবেরিয়া। মাঝামাঝি কিছু নেই। আপনারা যদি 'হত্যার অভিপ্রায় ছিল না' এই কথাগুলি যোগ করতেন তাহলে খালাস পেয়ে যেত।'

নেখ্‌লুদভ বলল, 'ঠিক, ওটা বাদ দেওয়া আমার পক্ষে অমার্জনীয় ত্রুটি।'

'সমস্ত ব্যাপারটাই তার উপর নির্ভর করছে,' প্রেসিডেন্ট হেসে কথাগুলি বলে ঘড়ির দিকে তাকাল।

ক্লারার সঙ্গে দেখা করার সময় পার হতে আর মাত্র পৌনে এক ঘণ্টা বাকি আছে।

'কাজেই আপনি ইচ্ছা করলে একজন অ্যাডভোকেটের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আপিলের স্বপক্ষে একটা যুক্তি আপনাকে বের করতে হবে ; তবে সেটা অনায়াসেই পাওয়া যাবে।' তারপর একটা ইজভজচিকের দিকে ঘুরে হেঁকে বলল, 'দ্‌ভরিয়ানস্কায়া-য় চল। তিরিশ কোপেক পাবে। তার বেশী আমি কখনও দেই না।'

'তাই হবে হুজুর ; চলুন, নিয়ে যাচ্ছি।'

'শুভ অপরাহ্ন। যদি কখনও দরকার হয়, আমার ঠিকানা দ্‌ভরিয়ানস্কায়াতে দ্ভরনিকভ হাউস ; মনে রাখা খুবই সহজ।' বন্ধুত্বপূর্ণভাবে অভিবাদন জানিয়ে সে গাড়িতে উঠে চলে গেল।

অধ্যায়—২৫

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথাবার্তায় ও বাইরের খোলা বাতাসে নেখ্‌লুদভের মন কিছুটা শান্ত হল। এবার তার মনে হল, সারাটা সকাল যে অস্বাভাবিক পরিবেশে কেটেছে তার ফলেই তার মানসিক চাঞ্চল্য এতটা বেড়েছিল।

দু'জন খ্যাতনামা অ্যাডভোকেটের নাম মনে পড়তে সে ভাবল, 'অবশ্য এ যোগাযোগ খুবই বিস্ময়কর ও উল্লেখযোগ্য। তার ভাগ্যকে লাঘব করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন, আর সেটা যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি করতে হবে। হ্যাঁ, এক্ষুণি। এই আদালতেই আমাকে খুঁজে বের করতে হবে ফানারিন বা মিকিশিন কোথায় থাকে।'

আদালতে ফিরে গিয়ে কোটটা রেখে সে দোতলায় উঠে গেল। প্রথমেই দেখা হয়ে গেল ফানারিনের সঙ্গে। তাকে থামিয়ে বলল, বিশেষ কাজে সে

তাকেই খুঁজতে যাচ্ছিল।

ফানারিন নেখ্‌ল্যুদভের নাম শুনেছে, তাকে চোখেও দেখেছে। সে বলল, তার কোন কাজে লাগতে পারলে সে খুশি হবে। নেখ্‌ল্যুদভকে নিয়ে সে একটা ঘরে ঢুকল। ঘরটা সম্ভবত কোন বিচারকের। দুজনে টেবিলে গিয়ে বসল।

'বলুন, কি ব্যাপার?'

'প্রথমত, আমি চাই ব্যাপারটা আপনি গোপন রাখবেন। এ ব্যাপারে আমি যে আগ্রহ দেখাচ্ছি সেটা কাউকে জানতে দিতে চাই না।'

'নিশ্চয়। নিশ্চয়! তারপর?'

'আজ আমি জুরি ছিলাম, এবং একটি নির্দোষ স্ত্রীলোককে কঠোর শাস্তি দিয়েছি। এতে আমি খুব কষ্ট বোধ করছি।'

নিজেই লজ্জিত ও বিচলিত হয়ে পড়েছে দেখে নেখ্‌ল্যুদভ বিস্মিত হল। ফানারিন দ্রুত একবার তার দিকে তাকিয়ে পুনরায় চোখ নামিয়ে শুনতে লাগল।

বলল, 'তারপর?'

'একটি নির্দোষ স্ত্রীলোককে আমরা শাস্তি দিয়েছি, তাই আমি উচ্চতর আদালতে আপিল করতে চাই।'

ফানারিন শুধরে দিয়ে বলল, 'আপনি নিশ্চয় সিনেট-এর কথা বলছেন।'

'হ্যাঁ। আমার ইচ্ছা আপনি মামলাটা হাতে নিন।'

সব চাইতে শক্ত কথাটা শেষ করে ফেলবার জন্য নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'এ মামলায় যতই খরচ হোক সব আমি করব।'

এ সব ব্যাপারে নেখ্‌ল্যুদভের অনভিজ্ঞতায় একটুখানি হেসে অ্যাডভোকেট বলল, 'ওসব পরে ঠিক করা যাবে।'

'মামলাটা কি?'

নেখ্‌ল্যুদভ সব ঘটনা খুলে বলল।

'ঠিক আছে। আগামীকাল কাজ শুরু করে মামলাটা আগাগোড়া বুঝে নেব। অতএব আপনি তার পরের দিন—না—বরং বৃহস্পতিবারে আসুন। ছ'টার পরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, তখন কথা হবে। আচ্ছা, এখন তাহলে চলি; কিছু খোঁজ-খবর নেবার আছে।'

তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অ্যাডভোকেটের সঙ্গে আলোচনা এবং সে যে মাসলভার জন্য কিছু করেছে তার ফলে তার মন আরও শান্ত হয়েছে। সে রাজপথে নামল। চমৎকার আবহাওয়া। নিঃশ্বাসের সঙ্গে অনেকখানি বসন্ত-বাতাসে টেনে নিয়ে তার খুব ভাল লাগল। অনেকগুলো ইজ্‌ভজচিক তাকে ঘিরে ধরল, কিন্তু সে হেঁটেই চলতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে কাতয়ুশার নানা ছবি ও স্মৃতি এবং তার প্রতি তার নিজের আচরণ ঝাঁক বেঁধে তার মাথার মধ্যে ঘুরতে শুরু করল; আর অমনি

তার মন খারাপ হয়ে গেল, চারদিকের সব কিছু বিষণ্ণ মনে হতে লাগল। মনে মনে বলল, 'না, এসব কথা পরে ভাবব; আপাতত এসব অবাঞ্ছিত ধারণার হাত থেকে মুক্তি চাই।'

করচাগিনদের নৈশভোজের নিমন্ত্রণের কথা মনে পড়তেই সে ঘড়ি দেখল। এখনও সময় আছে। একটা ট্রামগাড়ির চলার শব্দ শুনে সে দৌড়ে সেটা ধরে লাফিয়ে উঠল। বাজারের কাছে পৌঁছে আবার লাফিয়ে নেমে একটা ভাল ইজভজচিক ধরে দশ মিনিট পরেই করচাগিনদের বিরাট বাড়িটার ফটকে উপস্থিত হল।

অধ্যায়—২৬

ইংরেজি কব্জা লাগানো দরজাটাকে নিঃশব্দে খুলে দিয়ে করচাগিনদের বিরাট বাড়ির মোটাসোটা দ্বার-রক্ষী সাদরে বলল, 'দয়া করে ভিতরে আসুন হুজুর; সকলে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। তারা আহারে বসে গেছেন, তবে আমার উপর আপনাকে ভিতরে নিয়ে যাবার হুকুম আছে।'

দ্বার-রক্ষী সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘণ্টা বাজাল।

ওভারকোটটা খুলে নেখ্‌লয়ুদভ জিজ্ঞাসা করল, 'নবাগত কেউ আছেন কি?'

'পরিবারের লোকজন ছাড়া শুধু এম, কলসভ ও মিখাইল সেরগেভিচ।'

চাতক পাখির লেজের মত কোট ও সাদা দস্তানা পরা অত্যন্ত সুদর্শন পোশাকধারী সিঁড়ির উপর থেকেই নীচে তাকাল।

বলল, 'দয়া করে উঠে আসুন হুজুর, সকলেই আপনাকে আশা করছেন।'

নেখ্‌লয়ুদভ উপরে উঠে গেল এবং সুপরিচিত মস্ত বড় চমৎকার নাচ-ঘরের ভিতর দিয়ে খাবার ঘরে ঢুকল। করচাগিন পরিবারের সকলেই টেবিলের চারধারে গোল হয়ে বসেছে। শুধু মা সোফিয়া ভাসিলয়েভনা নেই, সে কখনও শোবার ঘর থেকে বের হয় না। টেবিলের মাথায় বসেছে বুড়ো করচাগিন, তার বাঁয়ে ডাক্তার, আর তার ডাইনে প্রাক্তন মার্শাল ও বর্তমানে ব্যাংক-ডিরেক্টর অতিথি আইভান আইভানভিচ কলসভ। বাঁ দিকে তার পরে বসেছে মিসির ছোট বোনের শিক্ষয়িত্রী মিস রেদার ও চার বছরের মেয়েটি স্বয়ং। তাদের উল্টো দিকে বসেছে করচাগিনদের একমাত্র ছেলে মিসির ভাই পেতয়া, সে জিমনাসিয়ামে ষষ্ঠ মানের ছাত্র। তার পরীক্ষার জন্যই সমস্ত পরিবারটি এখন শহরে আছে। তার পাশেই বসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র। সেই তাকে পড়ায়, তার পাশে মিসির জ্ঞাতি-ভাই মিখাইল সেরগেভিচ তেলেগিন, ডাক নাম মিশা! তার উল্টো দিকে চল্লিশ বছর বয়স্কা কুমারী কাতেরিনা এলেকসয়েভনা; আর টেবিলের পায়ের কাছে বসেছে মিসি নিজে, তার পাশে একটা আসন খালি পড়ে আছে।

'আরে! ঠিক আছে! বসে পড়। আমরা সবে মাছ ধরেছি।' নকল দাঁত দিয়ে সযত্নে চিবুতে চিবুতে রক্ত-রাঙা চোখ দুটি (সে চোখের পাতা দেখা যায় না) তুলে বুড়ো করচাগিন অনেক কষ্টে কথাগুলি বলল।

'স্তে পান', বুড়ো করচাগিন খাবার-ভর্তি মুখে শক্ত-সমর্থ মর্যাদাসম্পন্ন চেহারার খানসামাটিকে ডেকে শূন্য আসনটি দেখিয়ে দিল।

নেখ্‌লুয়ুদভ করচাগিনকে ভালই চেনে, অনেকবারই নৈশ ভোজনে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু আজ তার লাল মুখ, সশব্দ কামুক ঠোঁট, ওয়েস্ট-কোটের ভিতর গুঁজে-দেওয়া তোয়ালের উপরকার মোটা গলা, আর অতি-ভোজনে বাড়ন্ত সামরিক চেহারা—সব কিছুই তার কাছে বড় খারাপ লাগল। এই মানুষটার নিষ্ঠুরতা, সেনাপতি থাকাকালে লোককে কারণে-অকারণে চাবুক মারা, এমন কি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া—অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে সব তার মনে পড়ে গেল।

'এক্ষুণি হুজুর,' বলে স্তে পান সাইড বোর্ড থেকে অনেকগুলো রূপোর বাটি সাজানো একটি বড় পাত্র তুলে নিল এবং পোশাকধারী চাকরটিকে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করতেই সে ছুরি, কাঁটা, তোয়ালে সব কিছু মিসির পাশের খালি জায়গাটায় সাজিয়ে রাখতে লাগল।

নেখ্‌লুয়ুদভ ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে কর-মর্দন করল। বুড়ো করচাগিন ও মহিলারা ছাড়া আর সকলেই একে একে উঠে দাঁড়াল। সকলের কাছে—বিশেষ করে যাদের সঙ্গে কোনদিন একটা কথাও বলে নি—ঘুরে ঘুরে, এইভাবে করমর্দন করতে তার খুবই বাজে লাগছিল। দেরীতে আসার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে সে মিসি ও কাতেরিনা এলেকস্‌য়েভনার মাঝখানে বসতে যাবে এমন সময় বুড়ো করচাগিন বার বার বলতে লাগল যে সে যদি এক গ্লাস ভদকা পান নাও করে অন্তত টেবিলের কিছু খাদ্য গ্রহণ করে তাকে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেই হবে। টেবিলে ছোট ছোট ডিসে সাজানো ছিল চিংড়ি, হরিণের মাংস, পনির ও নোনা হেরিং। খেতে আরম্ভ করার আগে নেখ্‌লুয়ুদভ বুঝতেই পারে নি সে কতখানি ক্ষুধার্ত হয়েছিল। এখন কিছুটা রুটি ও পনির খাওয়া সেরেই সে উৎসাহের সঙ্গে খেতে শুরু করে দিল।

জুরির দ্বারা বিচার-পদ্ধতিকে আক্রমণ করে একখানি প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রে যে মন্তব্য করা হয়েছে ঠাট্টা করে সেটা উদ্ধৃত করে কলসভ প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, সমাজের ভিতটা কি কাঁপিয়ে দিতে পেরেছেন? অপরাধীদের খালাস আর নির্দোষদের সাজা, কি বলেন?'

'সমাজের ভিত কাঁপিয়ে দিতে—সমাজের ভিত কাঁপিয়ে দিতে,'—প্রিন্স করচাগিন হাসতে হাসতে বার বার কথাগুলি বলতে লাগল।

কিছুটা রূঢ় দেখালেও নেখ্‌লুয়ুদভ কলসভের প্রশ্নের কোন জবাব দিল না, ধূমায়মান সুপের বাটিটা টেনে নিয়ে খেয়েই চলল।

মিসি হেসে বলল, 'ওকে খেতে দিন তো।' নেখ্‌লুয়ুদভের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাটা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই সে সর্বনামটা ব্যবহার করল। তারপর নেখ্‌লুয়ুদভ মুখের খাবারটা গিলে ফেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করে বলল, 'তুমি নিশ্চয় খুব ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত।'

'খুব বেশী না। আর তুমি? ছবি দেখতে গিয়েছিলে কি?' সে প্রশ্ন করল।

'না, সেটা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। সালামাতভদের ওখানে টেনিস খেলছিলাম। সত্যি, মিঃ ক্রুকস চমৎকার খেলেন।'

তারপর আরম্ভ হল আলোচনা। শিক্ষয়িত্রী, ছাত্রটি ও ছেলেমেয়েরা ছাড়া মিখাইল সেরগেভিচ, কাতেরিনা ও অন্য সকলেই তাতে যোগ দিল।

'আঃ, সেই অন্তবিহীন তর্ক!' বলে হাসতে হাসতে বুড়ো করচাগিন ওয়েস্ট-কোটের ভিতর থেকে তোয়ালেটা টেনে বার করে চেয়ারটাকে সশব্দে পিছনে ঠেলে দিয়ে (চাকরটা সঙ্গে সঙ্গে সেটা ধরে নিল) টেবিল থেকে উঠে পড়ল।

অন্য সকলেও উঠে পড়ল এবং অন্য একটা টেবিলের সামনে গেল। সেখানে গ্লাসে গ্লাসে সুগন্ধি গরম জল সাজানো ছিল। সকলে মুখ ধুয়ে নিল; তারপর আবার আলোচনা শুরু হল, অথচ কারুরই তাতে কোন আগ্রহ নেই।

নেখ্‌লুয়ুদভের চোখে-মুখে দুশ্চিন্তা ও বিরক্তির ছাপ দেখে মিসি তার কারণ জানতে চাইল।

নেখ্‌লুয়ুদভ জবাব দিল, 'সত্যি আমি বলতে পারছি না; কখনও ভেবে দেখি নি।'

মিসি প্রশ্ন করল, 'মার সঙ্গে দেখা করতে যাবে কি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' এমনভাবে কথাটা বলল যাতে পরিষ্কার বোঝা গেল যে তার যাবার ইচ্ছা নেই। সে একটা সিগারেট বের করল।

মিসি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। তাতে নেখ্‌ল্‌যুদভ ভারি লজ্জা পেল। কোন রকমে জানাল যে, প্রিন্সেস যদি দেখা করতে চান সে সানন্দে তার কাছে যাবে।

'নিশ্চয়! মা খুব খুশি হবে। তুমি সেখানেই সিগারেট খেতে পারবে। আইভান আইভানোভিচও সেখানে আছে।'

বাড়ির কর্ত্রী প্রিন্সেস সোফিয়া ভাসিলয়েভনা প্রায় শয্যাশায়ী। আজ আট বছর হল লেস ও ফিতে লাগানো পোশাক পরে, ভেলভেট, হাতির দাঁত, কাঁসা, গালা ও ফুলে পরিবৃত হয়ে সে শয্যায় শুয়ে আছে। কখনও বাইরে যায় না, ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবী যারা দেখা করতে আসে সেখানেই তাদের অভ্যর্থনা করে।

সেই বন্ধু-বান্ধবীদের মধ্যে নেখ্‌লুয়ুদভও একজন, কারণ সে খুব চটপটে, তার মা ছিল এই পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এবং তার সঙ্গে মিসির বিয়ে হোক

এটা সকলেই চায়।

মিসি বলল, 'মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়েছে; তোমার কি হয়েছে আমাকে বল।'

আদালতের ঘটনাগুলো মনে পড়ে গেল। তার ভুরু কুঁচকে উঠল, মুখ লজ্জায় লাল হল।

সত্য কথা বলার ইচ্ছায় সে বলল, 'হ্যাঁ, একটা কিছু হয়েছে; একটা খুবই অসাধারণ ও গুরুতর ঘটনা।'

'সেটা কি? আমাকেও কি বলতে পার না?'

'এখন নয়। দয়া করে জানতে চেয়ো না। এখনও সব কিছু ভেবে দেখবার সময় পাই নি।' তার মুখ আরও লাল হয়ে উঠল।

'তার মানে আমাকে বলবে না?' তার মুখের মাংসপেশী সংকুচিত হয়ে উঠল। যে চেয়ারটা ধরে ছিল সেটাকে পিছনে ঠেলে দিল।

'না, বলতে পারি না,' সে জবাব দিল।

'ঠিক আছে, তাহলে এস!'

যেন অযথা চিন্তাকে সরিয়ে দেবার জন্যই সে মাথাটা নাড়ল। তারপর বড় বড় পা ফেলে তার আগে আগে চলতে লাগল।

নেখ্‌লুদভের মনে হল, চোখের জল আটকাবার জন্য মিসি তার মুখটাকে অস্বাভাবিকভাবে চেপে রেখেছে। তাকে আঘাত দিয়েছে বলে তার লজ্জা হল, কিন্তু সে তো জানে, তখন সামান্যমাত্র দুর্বলতাও তার পক্ষে বিপজ্জনক, কারণ সেই দুর্বলতাই তাকে মিসির সঙ্গে একসূত্রে বেঁধে ফেলবে। আর আজ সেটাকেই সে সবচাইতে বেশী ভয় করে। নিঃশব্দে মিসিকে অনুসরণ করে সে প্রিন্সেসের শোবার ঘরের দিকে গেল।

অধ্যায়—২৭

মিসির মা প্রিন্সেস সোফিয়া ভাসিলয়েভনা তার নানাবিধ পুষ্টিকর খাদ্যের নৈশভোজন সবে শেষ করেছে। (যাতে এই অকাব্যিক কাজটা আর কেউ দেখতে না পায় সেজন্য এটা সে একাকীই সমাধা করে থাকে।) তার কোচের পাশে ছোট টেবিলে কফি রাখা আছে, আর সেই অবস্থায়ই তার ধূমপান চলছে। প্রিন্সেস সোফিয়া ভাসিলয়েভ্‌না দীঘল ও কৃষতনু, কালো চুল, বড় বড় কালো চোখ, লম্বা দাঁত, এই বয়সেও যুবতী থাকার চেষ্টা সুস্পষ্ট।

ডাক্তারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে আলোচনা শোনা যায়। নেখ্‌লুদভ কিছুদিন থেকেই সেটা জানে; কিন্তু আজ দেখল ডাক্তার তার কোচের পাশেই বসে আছে; তার তৈল-নিষিক্ত চকচকে দাড়ি দুই ভাগ করে আঁচড়ানো; তখন সেই সব গুজবের কথাই শুধু মনে পড়ল না, সে অত্যন্ত বিরক্তিও বোধ করল।

টেবিলের পাশে একটা নীচু, নরম আরাম কেদারায় বসে কলসভ তার কফিটা নাড়তে লাগল। টেবিলের উপর এক গ্লাস মদও রাখা ছিল।

নেখ্‌ল্যুদভকে নিয়ে মিসি ঘরে ঢুকল, কিন্তু থাকল না।

কলসভ ও নেখ্‌ল্যুদভের দিকে ফিরে বলল, 'মা যখন ক্লান্ত হয়ে তোমাদের তাড়িয়ে দেবে, তখন আমার কাছে এস।' তারপরই সানন্দে হাসতে হাসতে কার্পেটের উপর নিঃশব্দে পা ফেলে চলে গেল।

প্রিন্সেস সোফিয়া ভাসিল্যেভ্‌না হাসল। সে হাসি দেখতে কৃত্রিম ও কপট কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিক। হাসলেই তার সুন্দর লম্বা দাঁতগুলো দেখা যায়—যে দাঁত তার একদা নিজের দাঁতের অবিকল নকল। হাসতে হাসতে সে বলল, 'কেমন আছ প্রিয় বন্ধু ? বস, কথা বল। শুনলাম আদালত থেকে খুব ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এসেছ। আমি মনে করি যার হৃদয় আছে এ সব কাজ তার পক্ষে খুবই কষ্টকর।' শেষের কথাগুলি সে ফরাসিতে বলল।

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। এতে অনেক সময়ই নিজের দোষ মনে হয় বুঝি বিচার করবার কোন অধিকারই তার নেই।'

'Comme c'est Vrai', নেখ্‌ল্যুদভের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল। কারও সঙ্গে কথা বলতে বলতে কৌশলে তার স্তাবকতা করা তার স্বভাব।

মহিলাটি বলল, 'ভাল কথা, তোমার ছবির খবর কি ? তোমার ছবিতে আমার খুব আগ্রহ। আমি যদি এ রকম পঙ্গু না হতাম তাহলে অনেক আগেই তোমার ছবি দেখতে যেতাম।'

নেখ্‌ল্যুদভ শুকনো গলায় বলল, 'ও সব আমি প্রায় ছেড়ে দিয়েছি।'

'সে কি ! কী দুঃখের কথা !···জান, শিল্পের ক্ষেত্রে ও একজন প্রকৃত প্রতিভার অধিকারী। রেপিন নিজের মুখে আমাকে এ কথা বলেছে,' শেষের কথাগুলি সে কলসভের দিকে ফিরে বলল।

নেখ্‌ল্যুদভ ভাবল, 'এ ধরনের মিথ্যা বলতেও কি মহিলার লজ্জা করে না ?'

সে লক্ষ্য করল, মহিলাটি বার বার অস্বস্তির সঙ্গে জানালাটার দিকে তাকাচ্ছে। জানালা-পথে সূর্যের একটা তির্যক রশ্মি ক্রমেই তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে রশ্মির আলোয় তার কালজীর্ণ মুখ বড় বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

মহিলা কোচের পাশের বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতামে হাত রাখল।

ঘণ্টার শব্দ শুনে সুদর্শন চাকরটি ঘরে ঢুকলে সে জানালাটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ফিলিপ, দয়া করে পর্দাগুলো নামিয়ে দাও।'

ইতিমধ্যে ডাক্তার ঘর থেকে চলে গিয়েছে। মহিলা ও কলসব একটা নাটকের আলোচনায় মেতে উঠেছে।

'না, তুমি যাই বল, তার মধ্যে কিছুটা ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি আছে। কারণ

ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি ছাড়া কাব্য হয় না,' কথাগুলি বলবার সময় তার একটি কালো চোখ ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে চাকরটির গতিবিধি অনুসরণ করছিল।

'কাব্য ছাড়া ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি কুসংস্কার মাত্র; আবার ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি ছাড়া কাব্য—গদ্যমাত্র,' মুখে বিষাদের হাসি ফুটিয়ে মহিলা কথাগুলি বলল, কিন্তু সারাক্ষণ তার দৃষ্টি রইল চাকর ও পর্দার উপরে।

'ফিলিপ, ও পর্দাটা নয়, বড় জানালার ঐ পর্দাটা,' মহিলা বেদনার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল। এই কথাগুলি বলতে হচ্ছে বলে সোফিয়া ভাসিলয়েভনা নিজেই নিজেকে করুণা করছিল যেন। সেই মনোভাবকে প্রশমিত করতে সে রত্ন-খচিত আঙুল দিয়ে একটা সুগন্ধি সিগারেট ঠোঁটে তুলে নিল।

প্রশস্ত বক্ষ, পেশীবহুল, সুঠাম ফিলিপ ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গীতে মাথাটা একটু নোয়াল। কার্পেটের উপর দিয়ে ডিম সমন্বিত শক্ত পা ফেলে সে বিশ্বস্ত-ভাবে নীরবে অপর জানালাটার কাছে চলে গেল, এবং প্রিন্সেসের দিকে তাকিয়ে সতর্কতার সঙ্গে এমনভাবে পর্দাটা ফেলবার ব্যবস্থা করল যাতে একটা রশ্মিও তার মুখে পড়তে না পারে। কিন্তু মহিলাটি তাতেও তুষ্ট হল না, আবার সে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি প্রসঙ্গ বন্ধ রেখে নির্যাতিতের ভঙ্গীতে নির্বোধ ফিলিপের কাজের ভুল সংশোধন করতে সচেষ্ট হল। মুহূর্তের জন্য ফিলিপের চোখে একটা আলোর ঝলকানি খেলে গেল।

নেখ্‌লয়ুদভ সব কিছুই লক্ষ্য করছিল। তার মনে হল ফিলিপ বলতে চাইছে 'শয়তান তোমাকে ভর করেছে! তুমি কি চাও?' কিন্তু শক্তিমান সুঠাম ফিলিপ তৎক্ষণাৎ তার অধৈর্যকে মনের মধ্যে চেপে রেখে নীরবে জীর্ণ, দুর্বল, কপট সোফিয়া ভাসিল্‌য়েভনার আদেশ পালন করতে লেগে গেল।

নীচু চেয়ারটায় দোল খেতে খেতে ঘুম-ঘুম চোখে সোফিয়া ভাসিল্‌য়েভনার দিকে তাকিয়ে কলসভ বলল, 'ডারুইনের বক্তব্যের মধ্যে অনেকটা সত্য অবশ্যই আছে, কিন্তু তিনি মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন। হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

নেখ্‌লয়ুদভকে চুপ করে থাকতে দেখে তার দিকে ফিরে সোফিয়া ভাসিল্‌য়েভনা বলল, 'আর তুমি? তুমি কি বংশগতিতে বিশ্বাস কর?'

'বংশগতিতে? না, করি না।' সেই মুহূর্তে তার কল্পনায় কোন অনির্দেশ্য কারণে যে সব বিচিত্র মূর্তি ফুটে উঠেছিল তাই নিয়েই তার সারা মন ভরে ছিল। তার মনে হল, এই মুহূর্তে শিল্পীর মডেলের মত শক্তিমান, সুদর্শন ফিলিপের পাশে সে যেন কলসভের উলঙ্গ মূর্তি দেখতে পাচ্ছে: তার পেট ফুটির মত, মাথা জোড়া টাক, হাত দুটো মুষলের মত পেশীহীন। সেই একই অস্পষ্টভাবে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল আপাতত রেশম ও ভেলভেটে ঢাকা সোফিয়া ভাসিল্‌য়েভনার আসল কাঁধ দুটি। কিন্তু সে সব মানস ছবি বড়ই ভয়ংকর, তাই সেগুলোকে মন থেকে তাড়াতে সে সচেষ্ট হয়ে উঠল।

সোফিয়া ভাসিলয়েভনার চোখ তাকে ভাল করে মেপে মেপে দেখল।

তারপর বলল, 'আরে, তুমি তো জান মিসি তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। যাও, তার খোঁজ কর। শুমান-এর একটা নতুন গৎ বাজিয়ে সে তোমাকে শোনাতে চেয়েছে; গৎটি খুব ভাল।'

মহিলাটির স্বচ্ছ হাড়-বের করা আংটি-পরা হাতের উপর চাপ দিয়ে উঠতে উঠতে নেখ্‌ল্যুদভ ভাবল, 'সে কিছুই বাজাতে চায় নি; যে কারণেই হোক, মহিলাটি স্রেফ মিথ্যা বলছে।'

ড্রয়িং-রুমে মিসির সঙ্গে দেখা হলে তার বাড়ি ফেরা একান্ত দরকার এই ওজুহাতে সে বিদায় নিতে চাইল।

মিসি বলল, 'মনে রেখ, তোমার কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ তোমার বন্ধুদের কাছেও সেটা গুরুত্বপূর্ণ। কাল আসছ তো?'

'সম্ভবত না,' নেখ্‌ল্যুদভ বলল। তারপর মিসির জন্য কি নিজের জন্য সেটা না বুঝেই সে লজ্জিত বোধ করল, তার মুখ লাল হয়ে উঠল। পরক্ষণেই সে চলে গেল।

মিসি ভাবতে লাগল, 'এ কি সম্ভব যে সেও আমাকে প্রতারণা করবে?'

তাদের মধ্যে কখনও কোন স্পষ্ট কথা হয় নি—শুধুই দৃষ্টি-বিনিময়, শুধু হাসি আর ইঙ্গিত। তথাপি মিসি তাকে আপনজন মনে করে; তাকে হারানো তার পক্ষে বড় কঠিন।

অধ্যায়—২৮

পরিচিত রাজপথ ধরে হেঁটে বাড়ি ফিরবার সময় নেখ্‌ল্যুদভ বার বার নিজেই নিজেকে বলতে লাগল, 'লজ্জাকর ও ভয়ংকর, ভয়ংকর ও লজ্জাকর।' মিসির সঙ্গে কথা বলবার সময় যে অবসাদ তাকে ঘিরে ধরেছিল তা কিছুতেই যাচ্ছে না। সে জানে, বাইরে থেকে দেখলে সে ঠিকই করেছে, কারণ আজ পর্যন্ত তাকে সে এমন কিছু বলে নি যাকে কথা দেওয়া বলা যেতে পারে, কখনও বিয়ের প্রস্তাবও করে নি; কিন্তু সে এও জানে যে আসলে তার সঙ্গে সে নিজেকে জড়িয়েছে, তার মনে আশার সঞ্চার করেছে। তথাপি আজ সমস্ত সত্তা দিয়ে সে বুঝতে পারছে যে, তাকে সে বিয়ে করতে পারে না।

'লজ্জাকর ও ভয়ংকর, ভয়ংকর ও লজ্জাকর! শুধু মিসির সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারই নয়, সব কিছু সম্পর্কেই সে বার বার ঐ একই কথা বলতে লাগল। বাড়ির ফটকে পা দিয়েও সে অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠল, 'সবকিছুই ভয়ংকর ও লজ্জাকর।'

খাবার ঘরে নৈশাহার ও চায়ের জন্য চাদর পাতাই ছিল। চাকর করনেই সে ঘরে ঢুকতেই নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'রাতের খাবার চাই না। তুমি যেতে পার।'

'যাচ্ছি স্যার,' মুখে বলল বটে, কিন্তু কয়নেই গেল না, টেবিলের উপর থেকে খাবার জিনিসপত্র তুলে রাখতে লাগল। নেখ্‌লুয়ুদভ অসন্তুষ্ট হয়ে তার দিকে তাকাল। সে একটু একা থাকতে চায়, কিন্তু সবাই যেন তাকে কষ্ট দিতেই চাইছে। কয়নেই জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেলে নেখ্‌লুয়ুদভ সামোভারের কাছে এগিয়ে গিয়ে একটু চা করতে যাবে এমন সময় আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌নার পায়ের শব্দ শুনে পাছে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এই ভয়ে ছুটে ড্রয়িং-রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। তিন মাস আগে এই ঘরেই তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। ঘরের মধ্যে রিফ্লেক্টরসহ তুটো বাতি জ্বলছিল ; একটা আলো পড়েছে তার বাবার ছবির উপর, অন্যটার আলো পড়েছে মায়ের ছবির উপর। ঘরে ঢুকতেই মায়ের সঙ্গে বাবার শেষ সম্পর্ক কেমন ছিল সেটা তার মনে পড়ে গেল। তুজনকেই অস্বাভাবিক ও বিরক্তিকর বলে মনে হল। তাদের সম্পর্কটাও লজ্জাকর ও ভয়ংকর। তার মনে পড়ে গেল, অসুখের শেষের দিকে বাবা চাইত যে মায়ের মৃত্যু হোক। বাবা বলত, মা যাতে এই কষ্টের হাত থেকে মুক্তি পায় সেই জন্যই তার ভালর জন্যই সে মায়ের মৃত্যু কামনা করত। কিন্তু আসলে বাবা তার নিজের জন্যই এটা চাইত, মায়ের যন্ত্রণা চোখে দেখার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যই চাইত।

মায়ের মধুর স্মৃতিকে স্মরণ করবার চেষ্টায় সে তার ছবির দিকে এগিয়ে গেল। পাঁচ হাজার রুবল ব্যয়ে একজন বিখ্যাত শিল্পীকে দিয়ে ছবিখানি আঁকানো হয়েছিল। নীচু-গলা কাল ভেলভেটের পোশাকে তাকে আঁকা হয়েছে, শিল্পী বিশেষ যত্ন করে তুটি স্তন, তাদের ভিতরকার ফাঁকটা এবং উজ্জ্বল সুন্দর কাঁধ ও গলা এঁকেছে। ছবিটা পুরোপুরি রুচিবিগর্হিত ও ভয়ংকর। তার মাকে যে অর্ধ-নগ্ন সুন্দরীরূপে আঁকা হয়েছে সেটা যেমন রুচিবিগর্হিত তেমনি নিন্দনীয়। এটা আরও বেশী বিরক্তিকর কারণ তিন মাস আগে ঠিক এইঘরে ঠিক এই নারীই শুকিয়ে মমি হয়ে বিছানায় পড়েছিল, অথচ শুধু এই ঘরটাই নয়, সারা বাড়িটাই এমন একটা অসহ্য বদ গন্ধে ভরে তুলেছিল যা কিছুতেই দূর করা যায় নি। তার মনে হল, যেন এখনও সে গন্ধ তার নাকে লাগছে। তার আরও মনে পড়ল, মৃত্যুর কয়েকদিন আগে হাড় বের-হওয়া বিবর্ণ আঙুলগুলো দিয়ে তার হাতটা চেপে ধরে চোখের দিকে তাকিয়ে মা বলেছিল, 'মিত্‌য়া, আমার যা করা উচিত ছিল তা যদি না করে থাকি, সে জন্য আমাকে দোষী করো না,' আর তার পরেই তার তুটি যন্ত্রণা-মলিন চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা নেমে এসেছিল।

'আঃ, কী ভয়ংকর!' ঐ অর্ধ-নগ্ন নারী, তার শ্বেতপাথরের মত কাঁধ ও গলা, ঠোঁটের উপরকার বিজয়িনীর হাসি,—সব কিছুর দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই সে কথাগুলি বলল। ঐ ছবির আধ-খোলা বুক আরেকটি যুবতীর কথা তাকে মনে করিয়ে দিল,—কয়েকদিন আগে ঐ একই ভাবে বুক-খোলা অবস্থায় সে

তাকে দেখেছে। সে মিসি। বল-নাচে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নিজেকে ঐ বল-নাচের সাজে দেখাবার জন্যই একটা মিথ্যা অজুহাতে সে তাকে তারই ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিল। বিরক্তির সঙ্গেই তার সুন্দর কাঁধ ও বাহুর কথা সে স্মরণ করল। 'তার ঐ স্থূল জন্তুসদৃশ বাবা ও তার সন্দেহজনক অতীত এবং নিষ্ঠুরতা, আর তার প্রতিভাময়ী মা ও তার কুখ্যাতি!' সে সবই তার বিরক্তির কারণ, লজ্জার কারণ। 'লজ্জাকর ও ভয়ংকর; ভয়ংকর ও লজ্জাকর!'

সে ভাবল, 'না, না, মুক্তি আমার চাই: করচাগিনদের সঙ্গে ও মারিয়া ভাসিলয়েভনার সঙ্গে মিথ্যা সম্পর্ক থেকে মুক্তি, উত্তরাধিকার থেকে মুক্তি, সব কিছু থেকে মুক্তি। আঃ, স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস নিতে চাই—বহু দূরে, রোমে, আবার আমার ছবি আঁকার কাজে ফিরে যেতে চাই।' নিজের শিল্প-প্রতিভা সম্পর্কে তার মনে সন্দেহ জাগল। 'বেশ, তাহলে—স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস নিতে চাই। প্রথমে কনস্তান্তিনোপল, তারপর রোম। তার আগে এই জুরির ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাই, অ্যাডভোকেটের সঙ্গে সব বিলি-ব্যবস্থা করতে চাই।'

তখন সহসা তার মনের সামনে ভেসে উঠল সেই কয়েদীটির একটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছবি যার কালো চোখ ঈষৎ টেঁরা আর শেষ কথাগুলি বলবার সময় যে কেঁদে উঠেছিল! সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটটা নিভিয়ে ছাই-দানিতে চেপে রেখে সে আর একটা সিগারেট ধরাল এবং ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। তার সঙ্গে অতীতে যে জীবন সে কাটিয়েছে একের পর এক তারই সব ছবি তার মনে ফুটে উঠল। মনে পড়ল, তার সঙ্গে শেষ দেখার ক্ষণটি, যে পাশবিক বাসনা তাকে পেয়ে বসেছিল তার কথা, আর সে বাসনা চরিতার্থ করবার পর তার মনে যে নৈরাশ্য নেমে এসেছিল তার কথা। মনে পড়ল সাদা পোশাক আর নীল ওড়না, ও ভোরের উপাসনার কথা। 'আমি তো তাকে ভালবাসতাম, সে রাতে একটি সৎ, পবিত্র ভালবাসা দিয়ে তো সত্যি তাকে ভালবেসেছিলাম; তার আগেও তাকে ভালবেসেছি; হঁ্যা প্রথমবার যখন পিসীদের বাড়ি গিয়েছিলাম, যখন আমার প্রবন্ধটা লিখছিলাম, তখনও তাকে ভালবেসেছি।' তখন সে কি ছিল তাও মনে পড়ল। সেই জীবনের সরসতা, যৌবন ও পূর্ণতার হাওয়া তাকে যেন স্পর্শ করল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা যন্ত্রণাকাতর দুঃখ তাকে ঘিরে ধরল।

সে তখন যা ছিল আর আজ যা হয়েছে, এ দুইয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান; সে রাতে গীর্জায় গিয়েছিল যে কাতয়ুশা, আর যে স্বৈরিণী বণিকের সঙ্গে প্রমোদে মত্ত হয়েছিল, আজই সকালে যাকে দণ্ডিত করা হয়েছে—এ দুইয়ের মধ্যে যে ব্যবধান তার নিজের দুটি সত্তার ব্যবধান বুঝি তার চাইতেও বেশী। তখন সে ছিল মুক্ত, নির্ভীক, অসংখ্য পথ খোলা ছিল তার সামনে! আজ এমন একটা অর্থশূন্য, ফাঁকা, মূল্যহীন, অকিঞ্চিৎকর জীবনের জালে সে জড়িয়ে পড়েছে শত

চেষ্টায়ও যার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করবার কোন পথই সে দেখতে পাচ্ছে না। যতদূর দৃষ্টি চলে, এই মিথ্যা জীবন থেকে মুক্তির কোন উপায় চোখে পড়ে না। সে আজ কাদায় ডুবে গেছে, তাতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, তাতেই গড়াগড়ি খাচ্ছে।

কাতয়ুশার প্রতি তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে কেমন করে? একদিন যাকে ভালবেসেছিল তাকে তো পরিত্যাগ করতে পারে না। সাইবেরিয়ায় কঠোর পরিশ্রমের হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য অ্যাডভোকেটের হাতে কিছু অর্থ গুঁজে দিয়েই তো সে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তার তো কঠোর দণ্ডভোগ করবার কথা নয়। টাকা দিয়ে কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়? যখন তাকে টাকা দিয়েছিল তখন সে কি ভাবে নি যে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে?

সেই মুহূর্তটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে তার মনে ফুটে উঠল যখন দালানের মাঝখানে তাকে থামিয়ে তার এপ্রণের তোয়ালের মধ্যে টাকাটা ছুঁড়ে দিয়ে সে পালিয়ে গিয়েছিল। 'হায়, সেই টাকা!' ভীত ও বিরক্তির সঙ্গে সে ভাবল। সেই সময়ের মতই উচ্চকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'হায় প্রিয়! হায় প্রিয়! কী বিরক্তিকর। এ কাজ তো শুধু ইতর, পাষণ্ডরাই করতে পারে। আর আমি—আমি সেই পাষণ্ড, সেই ইতর! কিন্তু'—সে চুপ করে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল—'কিন্তু এও কি সম্ভব যে আমি সত্যি একটি ইতর?—নিশ্চয়, আমি ছাড়া আর কে?' নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিল। তারপর নিজেকে পরপর অভিযুক্ত করতে লাগল। 'আর, এই কি সব? মারিয়া ভাসিল্‌য়েভনা ও তার স্বামীর প্রতি আমার আচরণও কি নীচ ও বিরক্তিকর নয়? আর টাকা-কড়ির ব্যাপারে আমার মনোভাব? মা আমাকে দিয়েছে এই অজুহাতে সেই সব বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করা যাকে আমি বে-আইনী বলে মনে করি? আর আমার সমস্ত অলস, ঘৃণ্য জীবন? আর সকলের উপরে কাতয়ুশার প্রতি আমার আচরণ? একটা ইতর, একটা পাষণ্ড! তারা আমাকে যা খুশি ভাবুক, আমি তাদের ঠকাতে পারি, কিন্তু নিজেকে তো ঠকাতে পারি না।'

দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভঙ্গীতে সে বলে উঠল, 'যেমন করে হোক এই মিথ্যার বাঁধন আমাকে ছিঁড়তেই হবে; যা সত্য সকলকে তা খুলে বলব, সত্য পথে চলব। মিসিকেও সত্য কথা বলব; তাকে বলব, আমি একটি লম্পট, তাই তাকে বিয়ে করতে পারি না, আর অকারণেই তাকে বিচলিত করেছি। মারিয়া ভাসিল্‌য়েভনাকেও বলব···হায়, তাকে তো বলার কিছু নেই। তার স্বামীকে বলব, আমি একটা পাষণ্ড, তাই তাকে ঠকিয়েছি। সব সম্পত্তির এমন ব্যবস্থা করব যাতে প্রকৃত সত্য স্বীকৃতিলাভ করে। কাতয়ুশাকে বলব, আমি একটা পাষণ্ড, তার প্রতি অন্যায় করেছি, তার ভাগ্যের উন্নতি বিধানের জন্য সাধ্যমত সব কিছু করব। হ্যাঁ, আমি তার সঙ্গে দেখা করব, আমাকে ক্ষমা করতে বলব···।

'হ্যাঁ, শিশুরা যেমন করে তেমনিভাবে তার কাছে ক্ষমা চাইব।'—সে একটু থামল—'দরকার হলে তাকে বিয়ে করব।'

আবার থামল। ছোটবেলায় যেমন করত তেমনি ভাবে ছুটি হাত বুকের কাছে জোর করে চোখ তুলে তাকাল এবং কাকে যেন আহ্বান করে বলল: 'প্রভু, আমার সহায় হও, আমাকে শিক্ষা দাও; এস, আমার অন্তরে প্রবেশ কর, এই ঘৃণ্য অবস্থা থেকে মুক্ত করে আমাকে পবিত্র কর।'

সে প্রার্থনা করল, ঈশ্বরকে বলল তাকে সাহায্য করতে, তার মধ্যে প্রবেশ করতে, তার সব ময়লা পরিষ্কার করতে। যা সে প্রার্থনা করল তাতো ইতিমধ্যেই ঘটেছে; তার অন্তরশায়ী ঈশ্বর জেগেছে তার চৈতন্যের মধ্যে। নিজেকে তাঁর সঙ্গে একাত্মবোধ করল, সুতরাং শুধু মুক্তি, পূর্ণতা ও জীবনের আনন্দই নয়, সত্যের সমস্ত শক্তিকে সে নিজের মধ্যে অনুভব করল। তার মনে হল, যত কিছু শ্রেষ্ঠ কাজ মানুষ করতে পারে সে সব করতে সে সক্ষম।

নিজেকে এই সব কথা বলতে বলতে তার দুই চোখ জলে ভরে উঠল; ভাল ও মন্দ দুটি অশ্রু: ভাল যেহেতু যে আত্মিক সত্তা এতগুলি বছর ধরে তার মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল তার জাগরণের জন্যেই এই আনন্দের অশ্রু; আর মন্দ যেহেতু নিজের সততার জন্য নিজের প্রতি করুণায় এই অশ্রু বর্ষণ।

তার খুব গরম লাগতে লাগল। জানালার কাছে গিয়ে সেটা খুলে দিল। জানালার নীচেই বাগান। চন্দ্রালোকিত শান্ত, নতুন রাত। কি যেন শব্দ করে চলে গেল। তারপর সব নিস্তব্ধ। জানালার উল্টো দিকের মাঠে একটা লম্বা পপলার গাছের ছায়া পড়েছে; পরিষ্কার ঝাঁট-দেওয়া কাঁকর-বিছানো পথের উপর তার ছড়ানো ডালপালা যেন একটি অতি সূক্ষ্ম আলপনা এঁকে দিয়েছে। বাঁ-দিকে একটা বাড়ির ছাদে চাঁদের আলো পড়ে চকচক করছে—সম্মুখে গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাগানের দেওয়ালের কালো ছায়াটা দেখা যাচ্ছে। সেই ছাদ, সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বাগান, আর পপলার গাছের ছায়ার দিকে নেখ্‌লুদভ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল; বাইরের তাজা প্রাণশক্তিতে ভরা বাতাসে নিঃশ্বাস নিল।

'কী আনন্দময়, কী আনন্দময়; হে ঈশ্বর, কী আনন্দময়!' নিজের মনের ভাবনাকেই যেন সে কথায় প্রকাশ করল।

অধ্যায়—২৯

সেদিন পাথরের রাস্তা ধরে দশ মাইল হেঁটে সন্ধ্যা ছ'টায় মাসলভা জেলখানায় পৌঁছল। এতটা পথ হাঁটতে সে অভ্যস্ত নয়; তাই তার পা কেটে গেছে, শরীর ক্লান্তিতে অবসন্ন। তার উপর অপ্রত্যাশিত কঠোর দণ্ডে সে একেবারেই ভেঙে পড়েছে; ক্ষুধার যন্ত্রণাও অসহ্য হয়ে উঠেছে।

বিচারের প্রথম বিরতির সময় সৈন্যরা যখন তার পাশে বসে রুটি ও সিদ্ধ-ডিম খাচ্ছিল, তখন তার মুখে জল এসেছিল, সে ক্ষিধে বোধ করেছিল। কিন্তু তাদের কাছে খাবার ভিক্ষা করতে মর্যাদায় বাধল। তিন ঘণ্টা পরে কিন্তু তার খাবার ইচ্ছাটা চলে গেল। শুধু একটা দুর্বলতা বোধ করতে লাগল। সেই সময়ই দণ্ডাদেশ ঘোষণা করা হল। প্রথমে ভাবল, সে ভুল শুনেছে: সাইবেরিয়ার কয়েদীরূপে নিজেকে সে ভাবতেই পারল না; যা শুনেছে সেটা বিশ্বাস করতে পারল না। কিন্তু বিচারক ও জুরিদের শান্ত নির্বিকার মুখ দেখে সে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, সমস্ত আদালতের কাছে সজোরে ঘোষণা করল যে সে দোষী নয়। কিন্তু যখন দেখল যে তার সে আর্তনাদকেও সকলে স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত বলেই ধরে নিল, সুতরাং তার ফলে অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটল না, তখন সে হতাশ হয়ে কাঁদতে লাগল. ধরেই নিল তার প্রতি যে নিষ্ঠুর বিস্ময়কর অন্যায় করা হয়েছে তাকে মেনে নিতেই হবে। কিছুক্ষণ কাঁদবার পরে সে অভিভূতের মত চুপচাপ কয়েদীদের ঘরে অপেক্ষা করতে লাগল, কখন তাকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন মাত্র একটি জিনিসই তার চাই—ধূমপান। তার মনের যখন এই অবস্থা তখন বচকভা ও কারতিংকিনকেও সেই ঘরেই ঢুকিয়ে দেওয়া হল। বচকভা সঙ্গে সঙ্গেই তাকে 'কয়েদী' বলে বকতে শুরু করে দিল।

'হল তো! বলি লাভটা কি হল? নিজেকে বাঁচাতে পারলি? নোংরা মাগি! যেমন কর্ম, তেমনি ফল। ভয় নেই; সাইবেরিয়ায় গেলে গয়না-গাটি সবই যাবে!'

আস্তিনের মধ্যে দুই হাত ঢুকিয়ে মাথা নীচু করে সামনের নোংরা দরজাটার দিকে তাকিয়ে মাসলভা চুপচাপ বসে রইল। শুধু বলল, 'আমি তোমাদের ঘাটাতে যাই নি, তোমরাও আমাকে ঘাটিও না...আমি কি তোমাদের ঘাটিয়েছি?' বার কয়েক কথাগুলি বলে সে চুপ করল। পরে যখন বচকভা ও কারতিংকিনকে সেখান থেকে নিয়ে গেল, আর একটা লোক এসে তাকে তিনটে রুবল দিল তখন তার মুখ একটুখানি উজ্জ্বল হল।

'তুমি কি মাসলভা,' সে জিজ্ঞাসা করল; তারপর রুবলগুলি দিয়ে বলল, 'এই নাও' একটি মহিলা তোমাকে দিয়েছেন।'

'মহিলা—কে মহিলা?'

'এটা নাও বাস। তোমার সঙ্গে বকতে পারবনা।'

টাকাটা পাঠিয়েছে বেশ্যালয়ের বাড়িউলি কিতায়েভা। আদালত থেকে যাবার আগে সে পরিচয়-ঘোষণাকারীর কাছে জানতে চেয়েছিল, মাসলভাকে কিছু টাকা দিতে পারে কি না। ঘোষণাকারী জানাল, পারে। অনুমতি পেয়ে সে তার মোটা মোটা সাদা হাত থেকে সোয়েডের চামড়ার তিন-বোতামওয়ালা দস্তানাটা খুলে রেশমের স্কার্টের ভাঁজের ভিতর থেকে একটা সুদৃশ্য থলি বের করল, তার ভিতর থেকে এক গোছা সুদি-কাগজের কুপন

বের করে তুই রুবল পঞ্চাশ কোপেকের একখানা কুপন বেছে নিল এবং তার সঙ্গে তুটো কুড়ি কোপেকের ও একটা দশ কোপেকের মুদ্রা যোগ করে সবটাই ঘোষণাকারীর হাতে দিল। সেও একজন চাকরকে ডেকে কিতায়েভের সামনেই টাকাটা তার হাতে দিল।

কারোলিনা আলবার্তভ্‌না কিতায়েভা বলল, ঠিক মানুষটাকেই দিওগো বাপু।'

তার এই অবিশ্বাসে চাকরটা ক্ষুব্ধ হল আর সেই জন্যই মাসলভার সঙ্গে ওরকম কর্কশ ব্যবহার করেছিল।

টাকাটা পেয়ে মাসলভা খুশি হল, কারণ এর দ্বারা তার একমাত্র অভিপ্রেত জিনিসটা পেতে পারবে।

নিজের মনেই বলে উঠল, 'একটা সিগারেটে যদি টান দিতে পারতাম!' তার সকল চিন্তা যেন এই একটি ইচ্ছাকেই ঘিরে ধরল। তার ধূমপানের ইচ্ছাটা এতই প্রবল হয়ে উঠল যে করিডরের দিকে খোলা অন্য একটা ঘরের দরজা দিয়ে তামাকের ধোঁয়া যখন তার ঘরে ঢুকল তখন সে লোভীর মত সেই বাতাসটাকেই নিঃশ্বাসের সঙ্গে টানতে লাগল। কিন্তু তাকে অনেকক্ষণ সেখানেই অপেক্ষা করতে হল, কারণ যে সেক্রেটারি যাবার আদেশ দেবে কয়েকটি নিষিদ্ধ বস্তু নিয়ে জনৈক অ্যাডভোকেটের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতে করতে কয়েদীদের কথা সে ভুলেই গিয়েছিল।

অবশেষে পাঁচটা নাগাদ তার যাবার অনুমতি হল। নিঝ্‌নি নভ্‌গরদবাসী রক্ষী ও চুভাশ তাকে পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে নিয়ে চলল। আদালতের ভিতরে থাকতেই সে তাদের কুড়ি কোপেক দিয়ে তুখানা রুটি ও সিগারেট এনে দিতে বলল। চুভাশ হেসে টাকাটা নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, এনে দিচ্ছি।' সত্যি জিনিসগুলো সে এনে দিল এবং ঠিক ঠিক ভাঙানিও ফেরৎ দিল।

কিন্তু পথের মধ্যে তাকে ধূমপান করতে দেওয়া হল না। মনের ইচ্ছা মনেই চেপে রেখে সে কারাগারের পথে হাঁটতে লাগল। যখন তারা কারাগারের দরজায় পৌঁছল, তখন ট্রেনে-চেপে আসা একশো কয়েদীকে ভিতরে ঢোকানো হচ্ছে।

নানা ধরনের কয়েদী—দাড়িওয়ালা, দাড়ি-কামানো, বৃদ্ধ, যুবক, রুশ, অ-রুশ, কারও বা মাথা কামানো, সকলেরই পায়ের শিকল ঝন্‌ঝন্‌ করে বাজছে। তাদের উপস্থিতিতে সমস্ত ঘরটা ধুলো, হট্টগোল আর ঘামের গন্ধে ভরে উঠেছে। মাসলভার পাশ দিয়ে যাবার সময় সবাই তার দিকে তাকাতে লাগল; কেউ কেউ আবার তার গা ঘেঁসেই চলে গেল।

একজন বলল, 'এই, একটা মেয়ে রে—খাসা দেখতে।'

তার দিকে চোখ ঠেরে আর একজন বলল, 'গড় করি মিস্‌।'

একটি গোঁফওয়ালা কালো লোকের মুখের বাকি অংশ ঘাড় পর্যন্ত কামানো। শিকলের উপর পা রেখে লাফিয়ে উঠে সে মাসলভাকে জড়িয়ে ধরল।

'সে কি। তোমার স্যাঙাৎকে চিনতে পারছ না? এস, এস, বাতেলা করো না মাইরি,' লোকটা দাঁত বের করে বলে উঠল। মাসলভা যখন তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল তখন তার চোখ চকচক করতে লাগল।

পিছন থেকে ছুটে এসে ইন্সপেক্টরের সহকারী চেঁচিয়ে বলল, 'এই রাস্কেল! এটা কি হচ্ছে?'

কয়েদীটা লাফ দিয়ে সরে গেল। সহকারী মাসলভার কাছে গেল।

'তুমি এখানে কেন?'

মাসলভা বলতে যাচ্ছিল তাকে আদালত থেকে আনা হয়েছে, কিন্তু সে তখন এতই শ্রান্ত যে কথা বলতেও তার ইচ্ছা হল না।

একটি সৈনিক এগিয়ে এসে টুপিতে আঙুল রেখে বলল, 'ও আদালত থেকে ফেরৎ এসেছে স্যার।'

'ওকে প্রধান কারারক্ষীর হেপাজতে তুলে দাও। এ সব মাল আমি নেব না।'

'ঠিক আছে স্যার।'

সহকারী ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে বলল, 'সকলভ, একে ভিতরে নিয়ে যাও!'

প্রধান কারারক্ষী এগিয়ে এসে রেগেমেগে মাসলভার ঘাড়ে একটা ধাক্কা দিয়ে মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করতে বলে মাসলভাকে মেয়েদের ওয়ার্ডের দালানের দিকে নিয়ে চলল। সেখানে তাকে তল্লাসি করা হল; কিন্তু নিষিদ্ধ বস্তু কিছু না পাওয়ায় (সিগারেটের বাক্সটা সে একটা রুটির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল) তাকে সেই একই সেলে নিয়ে যাওয়া হল যেখান থেকে সকালে সে আদালতে গিয়েছিল।

অধ্যায়—৩০

যে সেলে মাসলভাকে রাখা হল সে ঘরটা বেশ লম্বা—একুশ ফুট লম্বা ও ষোল ফুট চওড়া; ঘরে দুটো জানালা ও একটা ভাঙা স্টোভ। ঘরের দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে একটার উপরে একটা করে সাজানো কাঠের বিছানা। কাঠগুলো বেঁকে দুমড়ে গেছে। দরজার উল্টো দিকে একটা কালো রঙের মূর্তি, তাতে মোমবাতি বসানো, আর একঝাড় শুকনো ফুল ঝোলানো। বাঁ দিকে দরজার পিছনে কালো মেঝের উপর একটা নোংরা পিপে। তল্লাসী শেষ হয়ে গেলে সকলকে রাতের মত তালাবন্ধ করে রাখা হল।

ঘরে পনেরো জন বাসিন্দা, তার মধ্যে তিনটি শিশু।

তখনও বেশ আলো ছিল। শুধু দুটি স্ত্রীলোক বিছানা নিয়েছে: চুরির

ন্যায়ে দণ্ডিত একটা ক্ষয়কাশের রোগিনী, অপরটি জড়বুদ্ধি, পাসপোর্ট না থাকায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

কয়েদীদের প্রায় সকলেরই পরনে একটিমাত্র মোটা ধূসর রঙের শেমিজ। অনেকেই জানালা দিয়ে উঠোনের কয়েদীদের দেখছিল। তিনজন বসে সেলাই করছিল। তাদের মধ্যে একজন হল কোরাব্‌লয়ভা, যে সকালে মাসলভাকে বিদায় দিয়েছিল। সে সাইবেরিয়ায় সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। কারণ তার মেয়ের কাছে কুপ্রস্তাব করার জন্য সে তার স্বামীকে কুড়ুল দিয়ে খুন করেছিল। সেলের মধ্যে সে প্রধান কয়েদী, সেখানে মদের কারবারও করে। দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি রেলের পাহারাদারের বউ; ট্রেন যাবার সময় ফ্ল্যাগ নিয়ে ঠিক মত উপস্থিত না থাকায় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলে তার তিন বছর কারা-দণ্ড হয়েছে। তৃতীয় স্ত্রীলোকটির নাম ফেদসিয়া। অল্পবয়সী মেয়ে, গোলাপি রং, ভারি সুন্দর দেখতে, শিশুর মত উজ্জল চোখ, সুন্দর লম্বা চুল। স্বামীকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টার অপরাধে তার কারাদণ্ড হয়েছে। বিয়ের ঠিক পরেই এই কাণ্ডটি সে করেছিল (ষোল বছর বয়সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল), কিন্তু যে আট মাস সে জামিনে খালাস ছিল তার মধ্যেই সে যে তার স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে তাই নয়, তাকে ও ভালবেসেও ফেলেছে; ফলে যখন মামলা উঠল তখন তাদের মধ্যে একেবারে প্রাণ-প্রাণে ভাব। তার স্বামী, শ্বশুর এবং বিশেষ করে শাশুড়ি তাকে খালাস করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার সাইবেরিয়ায় সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। অপর দুজন কাঠের বিছানায় চুপচাপ বসে আছে। একজনের কোলে শিশু। তার অপরাধ, সৈন্যদলভুক্ত একটি ছেলেকে যখন (চাষীদের মতে) বে-আইনীভাবে তাদের গ্রাম থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং গ্রামের লোক পুলিশ-অফিসারকে বাধা দিয়ে ছেলেটাকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল তখন সেই (ছেলেটার কাকি) প্রথম ঘোড়ার লাগামটা টেনে ধরেছিল। অপর স্ত্রীলোকটি বুড়ি, মাথায় পাকা চুল, পিঠ বেঁকে গেছে। সে তার চার বছরের মোটাসোটা ছেলেটার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। তাদের বিরুদ্ধে অগ্নিকাণ্ডের অভিযোগ। তার কারাদণ্ডকে সে হাসিমুখেই গ্রহণ করেছে; তার যত চিন্তা ছেলেকে নিয়ে, আর বিশেষ করে তার 'বুড়োলোকটাকে' নিয়ে।

এই সাতটি স্ত্রীলোক ছাড়া আরও চারজন একটা খোলা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে লোহার শিক ধরে উঠোনের কয়েদীদের দেখে নানা রকম ইঙ্গিত ও চেঁচামেচি করছিল। তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে রয়েছে তার ছোট ছেলে ও সাত বছরের মেয়ে। মায়ের সঙ্গে তারাও কারাগারে এসেছে কারণ বাড়িতে এমন কেউ নেই যাদের কাছে তাদের রেখে আসা যায়। এদের সকলেরই বিরুদ্ধে হয় চুরি, নয় আগুন-লাগানো, আর না হয় তো মদ-বিক্রির অভিযোগ। দ্বাদশ কয়েদী জনৈক পুরোহিতের মেয়ে। বেশ দীঘল ও সুদর্শনা। অবৈধ

সন্তানকে সে কুয়োর মধ্যে ডুবিয়ে মেরেছে। একটি মাত্র ময়লা শেমিজ পরে সে খালি পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারও দিকে তার নজর নেই; সেলের খালি জায়গায় সে একবার এদিকে একবার ওদিকে পায়চারি করছে, আর প্রতিবারই দেওয়ালের কাছে পৌছেই হঠাৎ ঘুরে যাচ্ছে।

অধ্যায়—৩১

তালাটা সশব্দে খোলা হল। খোলা দরজা দিয়ে সেলে ঢুকল মাসলভা। সকলেই তার দিকে চোখ ফেরাল। এমন কি পুরোহিতের মেয়েটিও মুহূর্তের জন্য থেমে ভুলে মাসলভার দিকে তাকালে; কিন্তু একটি কথাও না বলে আবার তার চলা শুরু করে দিল।

করাব্‌ল্যভা হাতের স্ুঁচটা রেখে চশমার ভিতর দিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মাসলভার দিকে তাকাল

প্রায় পুরুষের মত মোটা গলায় বলে উঠল, 'হা ভগবান! ফিরে এসেছ? আমি আরও ভেবেছিলাম তোমাকে ছেড়ে দেবে। সাজা তাহলে হল?'

রেলের পাহারাদারের স্ত্রী বলল, 'আর এখানে বুড়ো খুড়ি আর আমি বলাবলি করছিলাম, "এমনও হতে পারে যে ওকে এখুনি ছেড়ে দেবে।" সে রকমও তো ঘটে শুনেছি। এমন কি কেউ আবার এক কাড়ি টাকাও পায়। সবই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। এর বেলায়ই দেখ না। আমাদের সব ধারণাই ভুল হয়ে গেল। প্রভুর ইচ্ছাই যে অন্য রকম।'

ঈষৎ নীল শিশুর মত চোখ মেলে মাসলভার দিকে তাকিয়ে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে ফেদসিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'এও কি সম্ভব? ওরা তোমাকে শাস্তি দিয়েছে?'

মাসলভা জবাব দিল না; তার শেষ থেকে দ্বিতীয় জায়গাটায় গিয়ে কবাব্‌ল্যভার পাশে বসে পড়ল।

মাসলভার কাছে গিয়ে ফেদসিয়া বলল, 'কিছু খেয়েছ কি?'

সে কোন জবাব দিল না। কাগজটা বিছানার উপর রেখে ধুলোভরা আলখাল্লাটা খুলে ফেলল; কোঁকড়া কালো চুল থেকে রুমালটাও খুলল।

যে বুড়িটা ছেলের সঙ্গে খেলা করছিল সেও এসে মাসলভার সামনে দাঁড়িয়ে করুণভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে ঠোঁট দিয়ে 'চুক, চুক, চুক,' শব্দ করল। ছেলেটাও এসে সেখানে দাঁড়াল এবং উপরের ঠোঁটটা তুলে মাসলভার রুটির দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

সারা দিনের ঘটনার পর এই সব সহানুভূতি-ভরা মুখগুলি দেখে মাসলভার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, তার কান্না পেয়ে গেল। নিজেকে সংযত রাখবার অনেক চেষ্টা করেও পারল না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কৱাব্‌ল্যয়ভা বলল, 'একজন ভাল অ্যাডভোকেট দিতে বলেছিলাম না? তা-কি হল? নির্বাসন?'

মাসলভা জবাব দিতে পারল না। কাগজের ভিতর থেকে সিগারেটের বাক্সটা বের করে কৱাব্‌ল্যয়ভার দিকে এগিয়ে দিল। এধনের বাজে খরচ পছন্দ না করলেও সে একটা সিগারেট নিয়ে বাতির আলোয় ধরিয়ে একটা সুখটান দিল, তারপর সিগারেটটা মাসলভাকে ফিরিয়ে দিল। মাসলভা তখনও কাঁদছে। সেই অবস্থায়ই লোভীর মত তামাকের ধোঁয়া টানতে লাগল।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আর কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, 'সশ্রম কারাদণ্ড।'

কৱাব্‌ল্যয়ভা বলে উঠল, 'অভিশপ্ত খুনীর দল, ওরা কি প্রভুকে ভয় করে না? মেয়েটাকে বিনা দোষে সাজা দিল। তা—ক'বছর?'

'চার,' মাসলভা বলল। তার গাল বেয়ে চোখের জল এমনভাবে ঝরতে লাগল যে এক ফোঁটা সিগারেটের উপরেও পড়ল। রেগে সেটাকে দলা পাকিয়ে ফেলে দিয়ে আর একটা সিগারেট নিল।

পাহারাদারের স্ত্রী ধূমপান করে না, তবু ফেলে-দেওয়া সিগারেটটা তুলে নিয়ে সেটাকে সোজা করতে করতে অনবরত বকতে লাগল।

শুনতে শুনতে মাসলভার তেষ্টা পেয়ে গেল।

আস্তিনে চোখ মুছে অল্প অল্প ফোঁপাতে ফোঁপাতে কৱাব্‌ল্যয়ভাকে বলল, 'একটু ভদকা পেলে বাঁচতাম।'

কৱাব্‌ল্যয়ভা বলল, 'ঠিক আছে, কিছু ছাড়।'

অধ্যায়—৩২

মাসলভা রুটির ভিতর লুকিয়ে রাখা টাকা বের করে একটা কুপন কৱাব্‌ল্যয়ভাকে দিল। কৱাব্‌ল্যয়ভা ভেন্টিলেটারে উঠে সেখানে লুকিয়ে-রাখা ছোট এক বোতল ভদকা পেড়ে আনল। তা দেখে দূরের মেয়েরা যে যার জায়গায় চলে গেল। ইতিমধ্যে আলখাল্লা ও রুমাল থেকে ধুলো ঝেড়ে মাসলভা বিছানায় উঠে একটা রুটি খেতে শুরু করল।

তাকের উপর থেকে কম্বলে জড়ানো একটা মগ ও টিনের টি-পট নামিয়ে এনে ফেদসিয়া বলল, 'তোমার জন্য চা রেখেছিলাম, কিন্তু সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বলে ভয় হচ্ছে।'

চাটা সত্যি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, আর তাতে চা অপেক্ষা টিনের স্বাদই বেশী, তবু মাসলভা মগটা ভরে নিয়ে রুটির সঙ্গে চাটাও খেতে লাগল।

ছেলেটা তার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। একটুকরো রুটি ছিঁড়ে তাকে দিয়ে সে বলল, 'ফিনাস্‌কা, এই নে।' এদিকে কৱাব্‌ল্যয়ভা ভদকার বোতল ও মগটা মাসলভাকে দিল। সে আবার তার থেকে কিছুটা

করাব্লুয়ভাকে এবং কিছুটা খরশাভ্কাকে দিল। সেলের মধ্যে এই তিনজন কয়েদীকে অভিজাত বলে মনে করা হত, কারণ তাদের হাতে কিছু টাকা থাকত, এবং সব কিছুই তারা অন্যের সঙ্গে ভাগকরে খেত।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাসলভা চাঙ্গা হয়ে উঠল এবং আদালতে যা যা ঘটেছিল সব হুবহু বর্ণনা করতে লাগল। সরকারী উকিলের হাবভাব নকল করে দেখাল, আর সব পুরুষ মানুষই যে তার পিছনে পিছনে ঘুরেছে সে কথাও বলল। আদালতে সকলেই তার দিকে তাকিয়ে ছিল, আর যতক্ষণ সে কয়েদীদের ঘরে ছিল ততক্ষণই তারা সেখানে ঘুর-ঘুর করছিল।

'একজন রক্ষী তো বলেই ফেলল, "তোমাকে দেখতেই ওরা আসে।" কেউ হয় তো ঘরে ঢুকেই বলল, "সে কাগজটা কোথায় গেল?" বা ঐ রকম আর কিছু, কিন্তু কাগজের দিকে তার মোটেই নজর ছিল না, দুই চোখ দিয়ে সে যেন আমাকেই গিলে খাচ্ছিল। ঠিক যেন পাকা শিল্পী।'

পাহারাদারের বউ বলল, 'যা বলেছ। তারা সব যেন চিনির খোঁজে মাছির ঝাঁক। আর কিছু না হলেও তাদের চলে, রুটি ছাড়া হয় তো ওরা বাঁচতে পারে, কিন্তু এ সব সুযোগ কোন মতেই ছাড়তে পারে না।'

মাসলভা তার কথার মধ্যেই বলে উঠল, 'আর এখানেও দেখ, সেই একই অবস্থা। ওরা আমাকে নিয়ে সবে পৌঁচেছে, এমন সময় রেলগাড়ি করে একদল এসে হাজির। তারা আমাকে এমন ভাবে ঘিরে ধরল যে পালাবার পথ পাই না। সরকারী ইন্সপেক্টরকে ধন্যবাদ—সেই সবাইকে তাড়িয়ে দিল। একজন তো এমন কাণ্ড করল যে কোনক্রমে নিজেকে বাঁচালাম।'

'লোকটা দেখতে কেমন?' খরশাভ্কা জিজ্ঞাসা করল।

'ময়লা, গোঁফ আছে।'

'তাহলে নির্ঘাৎ সে।'

'সে—কে?'

'কেন, শেগ্লভ।'

'শেগ্লভ কে?'

খরশাভ্কা বলল, 'সে কি, শেগ্লভকে জান না! সেই তো দুবার সাইবেরিয়া থেকে পালিয়েছে। এবার তাকে ধরেছে, কিন্তু আবার হাওয়া হবে। রক্ষীরা পর্যন্ত তাকে ভয় করে। পালিয়ে সে যাবেই, সোজা কথা।'

মাসলভার দিকে ফিরে করাব্লুয়ভা বলল, 'আরে, সে পালালে আমাদের তো আর সঙ্গে নিয়ে যাবে না। ও কথা থাক। তুমি বরং বল, আপিল করার ব্যাপারে অ্যাডভোকেট কি বলেছে। সেটা তো এখনি করা দরকার।'

মাসলভা জবাবে বলল, সে বিষয়ে কিছুই সে জানে না।

ক্রমে চারদিক শান্ত হয়ে এল। প্রায় সকলেই শুয়ে পড়ল। কেউ কেউ

নাক ডাকাতে লাগল। শুধু বুড়িটা মূর্তির সামনে বার বার মাথা নীচু করতে থাকল, আর পুরোহিতের মেয়েটি ঘরময় হেঁটে বেড়াতে লাগল।

মাসলভা শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, কঠোর সশ্রম দণ্ডে সে দণ্ডিত হয়েছে, কিন্তু এটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না।

পাশের বিছানায় করাব্‌ল্য়ভা পাশ ফিরল।

মাসলভা নীচু গলায় বলল, 'এ কথা কে ভেবেছিল? অথচ অন্যরা কত কিছু করেও শাস্তি পায় না।'

করাব্‌ল্য়ভা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'কিছু ভেব না মেয়ে। সাইবেরিয়াতেও মানুষ বেঁচে থাকে। তুমিও সেখানে গিয়ে মরে যাবে না।'

'মরে যাব না তা জানি; কিন্তু সে বড় কষ্টের। এমন কপাল তো আমি চাই না—আমি যে অনেক আরামে বাঁচতে অভ্যস্ত।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে করাব্‌ল্য়ভা বলল, 'হায় রে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তো কেউ যেতে পারে না। কেউ পারে না মা।'

'আমি জানি গো। তবু, এ যে বড় কষ্ট।'

তারপর দুজনই চুপচাপ।

অধ্যায়—৩৩

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই নেখ্‌ল্যুদভের মনে হল, তার একটা কিছু ঘটেছে; সেটা যে কি তা মনে করবার আগেই সে বুঝতে পারল, একটা গুরুতর ও ভাল কিছুই ঘটেছে।

'কাত্যুশা—বিচার!' হ্যাঁ, আর মিথ্যা নয়, এবার তাকে সত্য কথাই বলতে হবে।

আশ্চর্য এক যোগাযোগে ঠিক সেদিন সকালেই মার্শালের স্ত্রী মারিয়া ভাসিল্যেভনার কাছ থেকে দীর্ঘ প্রত্যাশিত চিঠিখানা সে পেয়েছে—ঐ চিঠিটার তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সে তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে, এবং তার অভিপ্রেত বিয়েতে শুভ কামনা জানিয়েছে।

'বিয়ে!' বিদ্রূপের সঙ্গে সে কথাটার পুনরাবৃত্তি করল। 'বর্তমানে সে সব থেকে আমি কত দূরে।'

একদিন আগে সে যা মনস্থ করেছিল সেটা মনে পড়ে গেল: স্বামীকে সব কথা বলবে, খোলাখুলি সব কিছু স্বীকার করবে, তাকে জানাবে যে তার মনস্তুষ্টির জন্য সব কিছু করতে সে প্রস্তুত। আজ কিন্তু সে সব আগের দিনের মত ততটা সহজ হচ্ছে না। তাছাড়া, যা সে জানে না সে কথা বলে একটা লোককে অসুখী করবেই বা কেন? হ্যাঁ, সে যদি নিজে এসে জিজ্ঞাসা করে, তাহলে সবই তাকে বলবে, কিন্তু নিজের থেকে গিয়ে বলা—না! তার

কোন দরকার নেই।

মিসিকে সব কথা বলাও আজ সকালে বেশ কঠিন মনে হচ্ছে। বলতে গেলেই তো মনোমালিন্যের সৃষ্টি হবে। আসলে সংসারের আরও অনেক ব্যাপারই কিছু না কিছু গোপন রাখতেই হয়। শুধু একটা বিষয়ে সে দৃঢ়-সংকল্প : সেখানে যাবে না, এবং জানতে চাইলে সত্য কথাই বলবে।

কিন্তু কাত্যুশার ব্যাপারে কিছুই গোপন রাখা চলবে না।

'আমি কারাগারে যাব, তাকে সব কথা জানাব, তার কাছে ক্ষমা চাইব। আর দরকার হলে···হ্যাঁ, দরকার হলে তাকে বিয়ে করব,' এই কথাই সে ভাবতে লাগল।

নীতিগ· কারণেই সে যে সব কিছু ত্যাগ করে তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত এই চিন্তায়ই কাত্যুশার প্রতি সহানুভূতিতে আবার তার মন ভরে উঠল।

অনেক দিন পরে তার মন যেন নতুন শক্তিতে জেগে উঠেছে। আগ্রাফেনা পেত্রভনা এলে তাকে সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই জানিয়েছিল যে, এ বাড়ির এবং পেত্রভনার সেবার তার কোন প্রয়োজন নেই। এটা প্রায় সকলেই জানত যে সে বিয়ের কথা ভাবছে বলেই এত বড় ও ব্যয়বহুল একটা বাড়ি সে নিয়েছে। কাজেই বাড়ি ছেড়ে দেবার একটা বিশেষ তাৎপর্য ছিল। আগ্রাফেনা পেত্রভনা সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল।

'তুমি আমার যে যত্ন নিয়েছ সেজন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আগ্রাফেনা পেত্রভনা, কিন্তু এত বড় বাড়ি ও এত কাজের লোকের আমার আর কোন প্রয়োজন নেই। তুমি যদি আমাকে সাহায্য করতে চাও তাহলে মায়ের আমলে যে রকম ছিল জিনিসপত্রের সেই রকম বিলি-ব্যবস্থা কর। তারপর নাতাশা এসে সব ঠিক করবে।' নাতাশা নেখ্‌ল্যুদভের বোন।

আগ্রাফেনা পেত্রভনা মাথা নাড়ল। বলল, 'জিনিসপত্রের বিলি-ব্যবস্থা? সে কি? ওগুলো তো আবার লাগবে।'

তার মাথা নাড়ার জবাবেই নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'না, লাগবে না আগ্রাফেনা পেত্রভনা; আমি বলছি, ওগুলো লাগবে না। দয়া করে করনেইকেও বলে দিয়ো যে তাকে দু মাসের মাইনে দিয়ে দেব, কিন্তু তাকে আমার আর দরকার হবে না।'

সে বলল, 'দিমিত্রি আইভানোভিচ, বড়ই দুঃখের কথা যে এসব তুমি ভাবছ। তুমি যদি বিদেশেই যাও, তাহলেও তো আবার তোমার একটা বাসস্থান লাগবে।'

'তোমার চিন্তাটাই ভুল আগ্রাফেনা পেত্রভনা; আমি বিদেশে যাচ্ছি না। যদি কোথাও যাই তবে সেটা সম্পূর্ণ অন্য পথে।' হঠাৎ সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। মনে মনে ভাবল, 'হ্যাঁ তাকে বলতেই হবে। কোন লুকোচুরি নয়; প্রত্যেককে বলতে হবে।'

'গতকাল একটা খুব আশ্চর্য ও গুরুতর ঘটনা ঘটেছে। পিসী মারিয়া আইভানভনার ধর্ম-মেয়ে কাতয়ুশাকে তোমার মনে পড়ে?'

'নিশ্চয়। আমিই তো তাকে সেলাই শিখিয়েছিলাম।'

'দেখ, গতকাল আদালতে সেই কাতয়ুশার বিচার হয়েছে, আর আমিই ছিলাম জুরিদের একজন।'

'হে প্রভু! কী দুঃখের কথা!' আগ্রাফেনা পেত্রভনা চেঁচিয়ে উঠল। 'কি জন্য তার বিচার হচ্ছিল?'

'খুনের জন্য; আর এ সবই আমার কাজ।'

আগ্রাফেনা পেত্রভনার বার্ধক্যজীর্ণ চোখ দুটি ঝকমক করে উঠল। বলল, 'খুব আশ্চর্য তো; সব তোমার কাজ কেমন করে হতে পারে?'

কাতয়ুশার সঙ্গে তার ব্যাপারটা সে জানত।

'হ্যাঁ, এ সব কিছুর কারণ আমি; আর এর ফলেই আমার সব কিছু পাল্টে গেছে।'

একটা হাসি চেপে আগ্রাফেনা পেত্রভনা বলল, 'এতে তোমার কি যায় আসে?'

'এই যায় আসে যে, তার এ পথে যাবার কারণ যখন আমি, তখন তাকে সাহায্য করতে আমার সাধ্যমত সব কিছু করা উচিত।'

আগ্রাফেনা পেত্রভনা কঠোর ভাষায় বলে উঠল, 'তোমার যা খুশি তা তুমি অবশ্য করতে পার। তবে এ ব্যাপারে তোমার তো বিশেষভাবে কোন দোষ নেই। এ রকম তো প্রত্যেকেরই হয়ে থাকে। আর বুদ্ধি-বিবেচনা থাকলে সব কিছুই ঠিক হয়ে যায়, লোকে সব ভুলেও যায়। তুমি কেন সব বোঝা নিজের ঘাড়ে নেবে? তার তো কোন প্রয়োজন নেই। শুনেছিলাম, সে নিজেই সৎপথ থেকে সরে গিয়েছিল। তাহলে সেটা কার দোষ?'

'আমার! দোষ আমার বলেই আমি তার প্রতিকার করতে চাই।'

'প্রতিকার করা শক্ত।'

'সেটা আমার ব্যাপার। তোমার নিজের কথা যদি বল, তাহলে বলব—যেহেতু আমার মার ইচ্ছা ছিল—'

'নিজের কথা আমি ভাবছি না। তোমার মা আমাকে এত কিছু দিয়েছেন যে আমি আর কিছুই চাই না। লিজাংকা (তার বিবাহিতা বোন-ঝি) তো আমাকে ডাকছে, এখানে দরকার না থাকলেই আমি তার কাছে চলে যাব। শুধু এটাই দুঃখের যে এ ব্যাপারটাকে তুমি এতটা বড় করে দেখছ। এ রকম তো প্রত্যেকেরই হয়ে থাকে।'

'কিন্তু আমি তা মনে করি না। আবারও বলছি, এই বাড়ি ভাড়া দিয়ে সব জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলতে তুমি আমাকে সাহায্য কর। আর দয়া করে আমার উপর রাগ করো না। আমার জন্য যা করেছ সে জন্য তোমার কাছে

আমি খুব কৃতজ্ঞ।'

বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার, যে মুহূর্তে নেখ্‌ল্যুদভ বুঝতে পারল যে সে নিজেই খারাপ, নিজেই বিরক্তিকর, তখন থেকেই অন্য কাউতে আর সে বিরক্তিকর বলে মনে করত না; বরং আগ্রাফেনা পেত্রভনা ও করনেইর জন্য তার মনে শ্রদ্ধা জাগল।

সে হয় তো নিজেই গিয়ে করনেইকেও সব কথা বলত, কিন্তু করনেইর আচরণ এতদূর বিনম্র ভক্তিতে আপ্লুত যে সেটা করা কিছুতেই সম্ভব হল না।

আদালতে যাবার পথে! আগের দিনের মত সেই একই রাস্তা দিয়ে একই ইজভজচিকে চড়ে যেতে যেতে নিজের পরিবর্তন উপলব্ধি করে সে নিজেই বিস্মিত হয়ে গেল।

মিসির সঙ্গে যে বিয়ে গতকালও ছিল সম্ভাবনার পর্যায়ে আজ সেটা একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। গতকালও সে ভাবত যে তার উপরই সব কিছু নির্ভর করছে এবং তাকে বিয়ে করে মিসি যে সুখী হবে সে বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না! কিন্তু আজ সে বুঝতে পারছে সে যে তাকে বিয়ে করবার পক্ষে অনুপযুক্ত তাই নয়, তার সঙ্গে কোন রকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখারও সে অনুপযুক্ত। 'আমি যে কি তা যদি মিসি জানতে পারে তাহলে কোন প্রলোভনেই সে আমাকে গ্রহণ করবে না। অথচ গতকালই সেই লোকটার সঙ্গে মেলামেশার জন্য আমি তার দোষ ধরেছিলাম। কিন্তু না, সে যদি আমাকে গ্রহণ করেও তবু আর একটা মানুষ রয়েছে কারাগারে এবং আজ হোক কাল হোক তাকে পাঠানো হবে সাইবেরিয়ায়, এ কথা জেনেও কেমন করে আমি শান্তিতে কাটাব, সুখের কথা তো ওঠেই না। যে মেয়েটিকে আমিই নষ্ট করেছি সে যাবে কঠোর দণ্ড ভোগ করতে, আর আমি কুড়িয়ে বেড়াব অভিনন্দন, স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাব নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে, অথবা স্থানীয় স্কুলের তদন্ত প্রভৃতি প্রস্তাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে সব ভোট পড়বে, মার্শালের সঙ্গে একত্রে (যাকে আমি লজ্জাজনকভাবে ঠকিয়েছি) সেগুলি গণনা করব এবং তারপরই লুকিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব (জঘন্য চিন্তা!); অথবা আমার ছবি আঁকার কাজে হাত দেব, অথচ যে ছবি কোন দিন শেষ হবে না, কারণ ঐ সব কাজে সময় নষ্ট করা আমার পোষাবে না। এখন এ সবের কোনটাই আমি করতে পারি না,' নিজের মধ্যে এই পরিবর্তনের ফলে উৎফুল্ল হয়ে সে এসব ভাবতে লাগল।

'এখন প্রথম কাজই হচ্ছে অ্যাডভোকেটের সঙ্গে দেখা করে তার সিদ্ধান্ত জানা, এবং তারপর · তারপর গতকালের কয়েদীর সঙ্গে দেখা করে তাকে সব কথা বলা।'

কেমন করে তার সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলবে, তার প্রতি নিজের পাপকে স্বীকার করবে, কেমন করে তাকে জানাবে যে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত

করতে সে সাধ্যায়ত্ত সব কিছু করবে, এমন কি তাকে বিয়ে করবে,—নিজের মনে সেই সব ছবি কল্পনা করতে করতে তার ভিতরে একটা বিশেষ আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল; তার দুই চোখে নেমে এল জলের ধারা।

অধ্যায়—৩৪

আদালতে পৌঁছে নেখ্‌ল্‌য়ুদভ দালানেই গতকালের ঘোষণাকারীর সঙ্গে দেখা করে তাকে জিজ্ঞাসা করল, দণ্ডিত কয়েদীদের কোথায় রাখা হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতির জন্য কার কাছে আবেদন করতে হবে। ঘোষক জানাল, দণ্ডিত কয়েদীদের নানা জায়গায় রাখা হয়েছে; যতক্ষণ তাদের দণ্ডাদেশ চূড়ান্তভাবে স্থির না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি ন্যায়াধীশের উপর নির্ভর করে।

বিচার শেষ হবার পরে আমি নিজে এসে আপনাকে ন্যায়াধীশের কাছে নিয়ে যাব। এখনও তিনি আসেন নি। বিচারের পরে। এখন ভিতরে চলুন; আমরা এখনই শুরু করব।'

নেখ্‌ল্‌য়ুদভ ঘোষককে তার সহৃদয় ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে জুরিদের ঘরে চলে গেল।

সে যখন ঘরে ঢুকছে অন্য জুরিরা তখন ঘর থেকে আদালতে যাচ্ছে। বণিকটি কিছু জলখাবার খেয়ে আগের দিনের মতই খোশমেজাজে আছে; পুরনো বন্ধুর মতই সে নেখ্‌ল্‌য়ুদভকে স্বাগত জানাল। পিয়ত্‌র্ গেরাসিমভিচ কিন্তু তার ঘনিষ্ঠতা ও উচ্চ হাসি সত্ত্বেও আজ আর নেখ্‌ল্‌য়ুদভের মনে কোন অপ্রীতিকর ভাব জাগাল না।

নেখ্‌ল্‌য়ুদভের ইচ্ছা ছিল, কালকের কয়েদীর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা জুরিদের বলবে। সে ভাবল, 'গতকালই উঠে দাঁড়িয়ে নিজের দোষ খুলে বলা আমার উচিত ছিল।' কিন্তু অন্য জুরিদের সঙ্গে আদালতে ঢুকে সে যখন কালকের মত সেই একই ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হতে দেখল—আবারও ঘোষণা করা হল 'আদালত আসছেন', কারুকার্যকরা কলার পরিহিত তিনজন লোক পুনরায় মঞ্চে আরোহণ করল, সেই একই জুরি উঁচু পিঠওয়ালা চেয়ারে বসল। সেই একই রক্ষী, একই ছবি, একই পুরোহিত—তখন নেখ্‌ল্‌য়ুদভের মনে হল যে তার পক্ষে উচিত যাই হোক না কেন, কালকের মত আজও এই সব গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে সে অক্ষম।

আদালতের সামনে আজ ছিল একটা চুরির মামলা। খোলা তলোয়ার হাতে দুজন সৈনিকের প্রহরাধীন কয়েদী কুড়ি বছরের একটি সরু-বুকওয়ালা ছেলে। তার মুখটা রক্তহীন ফ্যাকাসে, পরনে একটা ধূসর আলখাল্লা। একাকী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যারাই আদালতে ঢুকছিল তাদেরই সে ভুরু নামিয়ে

হাঁ করে দেখছিল। ছেলেটির বিরুদ্ধে অভিযোগ, একজন সঙ্গীর যোগসাজসে একটি চালাঘরের তালা ভেঙে তিন রুবল সাতষট্টি কোপেক মূল্যের কয়েকটা পুরনো মাদুর সে চুরি করেছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সঙ্গীর সঙ্গে পথ দিয়ে যাবার সময় পুলিশ ছেলেটিকে থামায়। তার সঙ্গীর মাথায় মাদুরগুলো ছিল। দুজনই সঙ্গে সঙ্গে দোষ স্বীকার করে এবং দুজনকেই হাজতে পাঠানো হয়। সঙ্গী তালা মেরামতকারীটি কারাগারে মারা যায়, কাজেই শুধু ছেলেটিরই বিচার চলে। ঘটনার সাক্ষীস্বরূপ পুরনো মাদুরগুলি টেবিলের উপরেই পড়ে ছিল।

মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, এই ছেলেটির বাবা তাকে একটা তামাকের কারখানায় শিক্ষানবিশ করে পাঠায় এবং সেখানেই পাঁচ বছর থাকে। এ বছর একটা ধর্মঘটের পরে মালিক তাকে ছাঁটাই করে ; চাকরি হারিয়ে সে শহরের পথে ঘুরে বেড়াতে থাকে এবং যৎসামান্য সঞ্চয় যা ছিল মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয়। সেই সময় একটা হোটেলে তার মতই আর একটা ছেলের সঙ্গে তার দেখা হয়। সে পেশায় তালা-মিস্ত্রি, মাতাল। তারও অনেক আগেই চাকরি গিয়েছিল। একদিন রাতে দুজনই মাতাল অবস্থায় একটা চালাঘরের তালা ভাঙে এবং হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়ে সরে পড়ে। তারা সব কথা খুলে বললেও তাদের কারাগারে পাঠানো হয়। বিচারাধীন অবস্থায়ই তালা-মিস্ত্রিটা মারা যায়। একটা বিপজ্জনক জীব হিসাবে এখন ছেলেটির বিচার চলছে ; তার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতেই হবে।

সব কিছু শুনে নেখ্‌ল্‌যুদভ ভাবল, 'কালকের অপরাধীর মতই সমান জীব। ওরা বিপজ্জনক ; আর আমরা যারা ওদের বিচার করি তারা বিপজ্জনক নয়? আমি—একটা লম্পট, প্রতারক—আর আমরা, সেই সব লোক যারা আমার স্বরূপ জানে অথচ আমাকে ঘৃণা তো করেই না বরং শ্রদ্ধা করে, তারা কি? এই ঘরে যারা জমায়েত হয়েছে তাদের সকলের চাইতে ঐ ছেলেটি যদি সমাজের পক্ষে বেশী বিপজ্জনক হয়েই থাকে, তাহলে ছেলেটি ধরা পড়লে সাধারণ বুদ্ধিমতে তাকে কি করা উচিত?

'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সে কোন অসাধারণ অন্যায়কারী নয়—একটি অতি সাধারণ ছেলে—সেটা তো সকলেই বোঝে—আর সে যে আজ এই অবস্থায় পৌঁচেছে তার একমাত্র কারণ যে পরিবেশে এই ধরনের চরিত্র গড়ে ওঠে সেও ঘটনাচক্রে তার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং এ সব ছেলেকে যদি অন্যায়ের হাত থেকে বাঁচাতে হয় তাহলে যে পরিবেশ এই সব হতভাগ্যদের সৃষ্টি করে তাকে দূর করতে হবে।

'কিন্তু আমরা কি করি? ওর মত আরও হাজার হাজার জীব বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে জেনেও এই একটি ছেলে ভাগ্যদোষে আমাদের হাতে ধরা পড়েছে বলে আমরা তার উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ি, তাকে জেলে পাঠাই, সেখানে হয়

সে সম্পূর্ণ নিকর্মা বনে যায়, নয় তো ওরই মত দুর্বল, অধঃপতিত লোকদের সঙ্গে কতকগুলি অদরকারী ও অস্বাস্থ্যকর কাজ করে; তারপর একদিন সরকারী খরচে তাকে ফেরৎ পাঠাই এবং আবার সে মস্কো থেকে ইরখুতস্ক পর্যন্ত বিস্তৃত ভ্রষ্টচরিত্রদের দলে মিশে যায়।

'আর আমরা যে অবস্থায় এই সব লোকের সৃষ্টি হয় তাকে দূর করতে কিছু তো করিই না, উপরন্তু এই অবস্থা যারা তৈরি করে সেই সব প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ দিয়ে থাকি। সে সব প্রতিষ্ঠান আমাদের খুবই পরিচিত: সেগুলি হল শিল্প-কেন্দ্র, দোকানপাট, কারখানা, মদের দোকান, হোটেল ও বেশ্যালয়। এ সব প্রতিষ্ঠানকে আমরা বহাল তবিয়তে থাকতে তো দেয়ই, এমন কি অনিবার্য বিবেচনায় তাদের উৎসাহিত করি, নিয়ন্ত্রিত করি।

'এই ভাবে আমরা শুধু একটি নয়, এরকম লক্ষ লক্ষ লোকের জন্ম দেই এবং তারপর তাদের একজনকে পাকড়াও করে মনে করি যে খুব কাজ করলাম, আমাদের আর কিছু করবার নেই। আর এই ফাঁকিবাজীকে জিইয়ে রাখতে কী প্রচণ্ড প্রচেষ্টাই না আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।' কথাগুলি ভাবতে ভাবতে নেখ্‌লুদভ চারদিকে তাকিয়ে সব কিছু দেখতে লাগল: প্রকাণ্ড ঘর, ছবি, বাতি, চেয়ার, সাজ-পোশাক, পুরু দেওয়াল, জানালা; সঙ্গে সঙ্গে তার আরও মনে পড়ে গেল এই মস্ত বড় বাড়ি ও ততোধিক বড় বিচার ব্যবস্থার কথা: একদল পদস্থ কর্মচারি, করণিক, পাহারাদার, সংবাদ-আদান-প্রদানকারী,—শুধু এখানে নয়, সারা রুশিয়া জুড়ে; আর মোটা মাইনের বিনিময়ে তারা এমন একটা প্রহসনের নানা চরিত্রে অভিনয় করে যার দ্বারা কারও তিলমাত্র কল্যাণ সাধিত হয় না। সে মনে মনে বলল, 'এতে যে প্রচেষ্টার অপব্যয় হচ্ছে তার একশ' ভাগের এক ভাগও যদি এই সব সমাজ-পরিত্যক্ত মানুষগুলির জন্য ব্যয় করা হত, তাহলে কী না হতে পারত?

ছেলেটির রুগ্ন ত্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সে আরও ভাবতে লাগল, 'দারিদ্র্যের চাপে ছেলেটিকে যখন শহরে পাঠানো হয়েছিল তখন যদি কেউ করুণাপরবশ হয়ে তাকে কিছুটা সাহায্য করত, হয় তো তাহলেই যথেষ্ট করা হত। অথবা আরও পরবর্তীকালে কারখানায় বারো ঘণ্টা কাজের পরে সে যখন বড়দের দলে ভিড়ে গিয়ে মদের দোকানের পথ ধরত, তখন যদি কেউ এসে বলত, যেয়ো না সোনা; এটা ঠিক নয়, তাহলে হয় তো সে যেত না, পথভ্রষ্ট হত না, এবং খারাপ কাজ করত না।

'কিন্তু না; এই শিক্ষানবিশ ছেলেটি যখন বছরের পর বছর একটা অসহায় জন্তুর মত শহরে বাস করেছে, উকুন হবার ভয়ে ছোট করে চুল ছেঁটেছে, মজুরদের খবরাখবর পৌঁছে দিয়েছে, তখন করুণার হাত বাড়িয়ে কেউ তার কাছে আসে নি। উপরন্তু শহরে আসার পর থেকে বয়স্ক মজুর ও সঙ্গীদের কাছ থেকে শুধু একটা কথাই শুনেছে, এই জিনিসই দেখেছে যে, যে ঠকায়,

মদ খায়, গালাগালি করে, অন্যকে ধোলাই দেয়, বিপথে চলে, সেই ভাল মানুষ।

'অস্বাস্থ্যকর পরিশ্রম, মদ্যপান ও লাম্পট্যের ফলে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে ছেলেটি স্বপ্নের মত বিমূঢ় অবস্থায় শহরের পথে পথে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন একটা চালামত ঘরে ঢুকে পড়ে এবং কারও কোন কাজে লাগবে না এ রকম কয়েকটা পুরনো মাদুর হাতিয়ে নেয়; আর এখানে আমরা, সম্পদশালী শিক্ষিত মানুষেরা, যে সব কারণে ছেলেটি আজ এই অবস্থায় পৌঁচেছে তার প্রতিকারের কথা চিন্তা না করে ভাবছি যে তাকে শাস্তি দিলেই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে!

'ভয়ংকর! কে বলতে পারে এখানে কোন্‌টা বড়—নিষ্ঠুরতা না নির্বুদ্ধিতা। মনে হচ্ছে, এ দুটোই সবচেয়ে উঁচুতে মাথা তুলেছে।'

অন্য কিছুতে মনোযোগ না দিয়ে নেখ্‌লুদভ এই সবই ভাবতে লাগল। সত্যকে প্রকাশিত হতে দেখে সে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সে বুঝতেই পারল না, এসব এতদিন তার চোখে পড়ে নি কেন, আর অন্য সকলেই বা এসব দেখতে পায় নি কেন।

অধ্যায়—৩৫

আদালতের বিরতির সময় নেখ্‌লুদভ বাইরে চলে গেল। আর ফিরবার ইচ্ছা নেই। ওদের যা ইচ্ছা করুক, এই ভয়ংকর বোকা কাজের মধ্যে সে আর নেই।

ন্যায়াধীশের আপিসের খোঁজ করে সে সোজা তার কাছে চলে গেল। ন্যায়াধীশ ব্যস্ত আছেন এই অজুহাতে চাকর তাকে ঢুকতে দিতে চাইল না। কিন্তু নেখ্‌লুদভ তার কথায় কান না দিয়ে দরজার কাছে যেতেই একজন কর্মচারির সঙ্গে দেখা হল। সে একজন জুরি এবং তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে তার জরুরী কথা আছে এই বলে সে তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে দেখা করতে চাইল।

তার পদবী ও ভাল পোশাক তার সহায়ক হোল। কর্মচারিটি তাকে তত্ত্বাবধায়কের কাছে নিয়ে গেল। নেখ্‌লুদভ যেভাবে ভিতরে ঢুকবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল তাতে বিরক্ত হয়ে তত্ত্বাবধায়ক দাঁড়িয়েই তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

ন্যায়াধীশ কড়া গলায় বলল, 'আপনি কি চান?'

'আমি একজন জুরি, আমার নাম নেখ্‌লুদভ; কয়েদী মাসলভার সঙ্গে দেখা করা আমার একান্ত দরকার।' নেখ্‌লুদভ দৃঢ়তার সঙ্গে দ্রুতগতিতে কথাগুলি বলল। তার মনে হল, এমন একটা পথে সে পা ফেলতে যাচ্ছে যা তার সমস্ত জীবনের উপর চরম প্রভাব বিস্তার করবে।

ন্যায়াধীশ লোকটি ছোটখাট, রং ময়লা, ছোট কোঁকড়ানো চুল, উজ্জ্বল চোখ, বেরিয়ে আসা নীচের চোয়ালের উপর ঘন ছাঁটা দাড়ি।

সে শান্ত গলায় বলল, 'মাসলভা? হ্যাঁ, মনে পড়ছে। বিষপ্রয়োগের অভিযোগে অভিযুক্ত। কিন্তু তাকে আপনি দেখতে চান কেন?' পরে প্রশ্নটাকে একটু নরম করবার জন্য বলল, 'আপনার কি দরকার সেটা না জেনে তো অনুমতি দিতে পারি না।'

নেখ্‌ল্যুদভ সলজ্জ ভঙ্গীতে বলল, 'একটা বিশেষ গুরুতর কারণে তার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।'

চোখ তুলে নেখ্‌ল্যুদভকে ভাল করে দেখে নিয়ে ন্যায়াধীশ বলল, 'বটে? তার মামলার শুনানী কি হয়ে গেছে?'

'গতকাল তার বিচার হয়ে গেছে; অন্যায়ভাবে সে চার মাস কঠোর সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। সে নির্দোষ।'

মাসলভার নির্দোষিতা সম্পর্কে নেখ্‌ল্যুদভের বক্তব্যে কান না দিয়েই ন্যায়াধীশ বলে উঠল, 'বটে? যদি কালই তার শাস্তি হয়ে থাকে, তাহলে তো সে কারাগারের প্রাথমিক হাজতে আছে—শাস্তি চূড়ান্তভাবে ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকতে হবে। মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনেই সেখানে দেখা করতে দেওয়া হয়। আপনি বরং সেখানে খোঁজ করুন।'

'কিন্তু যত শীঘ্র সম্ভব আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতেই হবে', কথা বলবার সময় নেখ্‌ল্যুদভের চোয়াল কাঁপতে লাগল; সে বুঝতে পারল, চরম মুহূর্ত এগিয়ে আসছে।

কিছুটা অধৈর্য হয়ে ন্যায়াধীশ ভুরু তুলে বলল, 'করতেই হবে কেন?'

'কারণ সে নির্দোষ হলেও তাকে কঠোর দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে, আর সে দোষ আমার।' নেখ্‌ল্যুদভের গলার স্বর কাঁপতে লাগল; সে বুঝল, সে যা বলছে তা তার বলা ঠিক নয়।

'কেমন করে?' ন্যায়াধীশ প্রশ্ন করল।

'আমিই তাকে ভুলিয়ে পাপের পথে নামিয়ে তার আজকের এই দশা করেছি। আমারই জন্য সে যা হয়েছে তা না হলে আজ তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আসত না।'

'সে যাই হোক, তার সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের কি সম্পর্ক আমি তো বুঝতে পারছি না।'

'সম্পর্ক এই: আমি তার সঙ্গে যেতে চাই, এবং··· ···তাকে বিয়ে করতে চাই', নেখ্‌ল্যুদভ কোন রকমে জবাব দিল; তার চোখে তখন জল এসে গিয়েছে।

'সত্যি! বলেন কি মশাই!' ন্যায়াধীশ বলে উঠল। 'এ তো এক বিচিত্র মামলা। আচ্ছা, আপনি তো ক্রাস্‌নপারস্ক পল্লী পরিচালন সংস্থার একজন সদস্য?' নেখ্‌ল্যুদভের নাম আগেও শুনেছে স্মরণ হওয়ায় ন্যায়াধীশ প্রশ্ন করল।

রাগে লাল হয়ে নেখ্‌ল্যুদভ জবাবে বলল, 'মাপ করবেন, তার সঙ্গে আমার অনুরোধের কোন সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না।'

প্রায়-অদৃশ্য একটুখানি মুচকি হেসে সপ্রতিভভাবেই ন্যায়াধীশ বলল, 'নিশ্চয় না। শুধু আপনার ইচ্ছাটা খুবই অসাধারণ, আর তাই সচরাচর দেখাও যায় না।'

'দেখুন, আমি অনুমতিটা পেতে পারি কি?'

'অনুমতি? হ্যাঁ, এখনই আপনাকে একখানা প্রবেশ-পত্র দিচ্ছি। আপনি বসুন।'

সে উঠে টেবিলের কাছে গিয়ে একখানা চিঠি লিখতে বসল। 'দয়া করে বসুন।'

নেখ্‌ল্যুদভ দাঁড়িয়েই রইল।

প্রবেশের অনুমতি-পত্র লিখে নেখ্‌ল্যুদভের হাতে দিয়ে ন্যায়াধীশ সকৌতূহলে তার দিকে তাকাল।

'আমি আরও জানাচ্ছি, দায়রা বিচারে আমি আর অংশগ্রহণ করতে পারব না।'

'সেক্ষেত্রে, আপনি তো জানেন, আদালতকে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হবে।'

'আমার কারণ হল, সব বিচারকেই আমি শুধু অদরকারীই মনে করি না, নীতিবির্গহিত বলেও মনে করি।'

'হ্যাঁ', ন্যায়াধীশ বলল; তার মুখে সেই একই প্রায়-অদৃশ্য হাসি; সে হাসি যেন বলতে চায়, এ ধরনের ঘোষণা অনেক শুনেছি, এতে আমি মজাই পেয়ে থাকি। 'কিন্তু আপনি নিশ্চয় বোঝেন, ন্যায়াধীশ হিসাবে এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারি না। সুতরাং আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, আদালতে আবেদন করুন; সে আবেদন সঙ্গত কি অসঙ্গত তা আদালতই স্থির করবে; আর যদি অসঙ্গত বিবেচিত হয় তাহলে একটা জরিমানা ধার্য হবে। কাজেই আদালতে আবেদন করুন।'

নেখ্‌ল্যুদভ রেগে বলল, 'আমার ঘোষণা আমি করেছি, আর কোথাও আবেদন করব না।'

'ঠিক আছে। তাহলে শুভ অপরাহ্ন', যেন এই বিচিত্র আগন্তুকের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই ন্যায়াধীশ মাথা নেড়ে কথাগুলি বলল।

নেখ্‌ল্যুদভ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরেই আদালতের জনৈক সদস্য ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার ঘরে কে এসেছিল?'

'নেখ্‌ল্যুদভ; আপনি তো জানেন, সেই যে লোকটা ক্রাস্‌নপারস্ক পল্লী সভাতে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা বলত, ভাবুন ব্যাপারটা! সে একজন জুরি আর কয়েদীদের মধ্যে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত একটি স্ত্রীলোক বা মেয়ে আছে যাকে সে নাকি ফুসলিয়ে ঘর থেকে বের করেছিল, আবার এখন তাকেই

বিয়ে করতে চায়।'

'কী যে বলেন!'

'সে তো সেই কথাই বলে গেল। আর সে কী উত্তেজনা তার।'

'আজকালকার যুবকদের মধ্যে কিছুটা অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়েছে।'

'আরে, সে তো আর সে রকম যুবক নয়।'

'তা নয়। কিন্তু আপনাদের সেই বিখ্যাত ইভাশেংকভ কি রকম ক্লান্তিকর ছিল ভাবুন। লোককে পরিশ্রান্ত করেই সে জিতে যেত। অনবরত বকর বকরের যেন আর শেষ নেই।'

'আঃ, এ ধরনের লোকের মুখ বন্ধ করা উচিত, নইলে তারা পদে পদে বাধার সৃষ্টি করে।'

অধ্যায়—৩৬

ন্যায়াধীশের কাছ থেকে নেখ্‌লয়ুদভ সোজা চলে গেল প্রাথমিক হাজতে। কিন্তু সেখানে মাসলভা বলে কেউ নেই। ইন্সপেক্টর জানাল, পুরনো অস্থায়ী কারাগারে থাকতে পারে। কাজেই নেখ্‌লয়ুদভ সেখানেই চলল। দুটো কারাগারের মাঝখানে দূরত্ব অনেকটা। পুরনো কারাগারে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বিষাদ-ঢাকা প্রকাণ্ড বাড়িটার দরজায় পৌঁছতেই শান্ত্রী বাধা দিয়ে ঘণ্টা বাজাল। জেলর বেরিয়ে এলে নেখ্‌লয়ুদভ অনুমতি-পত্রটা তাকে দেখাল। কিন্তু সে বলল, ইন্সপেক্টরের অনুমতি ছাড়া ঢুকতে দেওয়া হবে না। নেখ্‌লয়ুদভ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনতে পেল, অনেকটা দূরে কে যেন পিয়ানোতে একটা জটিল সুর জোর করে বাজাচ্ছে। চোখে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা একটা দো-আসলা চাকরানি দরজাটা খুলতেই শব্দটা হারিয়ে গেল বটে, কিন্তু তার কানে বাজতে লাগল। লিস্‌জ্‌তের একটা সুর; শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে; তবে কিছুটা দূর পর্যন্ত বেশ ভালই বাজাচ্ছে। সে পর্যন্ত গিয়েই আবার গোড়া থেকে শুরু করেছে। নেখ্‌লয়ুদভ জানতে চাইল, ইন্সপেক্টর আছে কিনা। চাকরানি জানাল, নেই।

'কখন ফিরবেন?'

বাজনাটা থেমে গিয়ে আবার শুরু হল; এবার আরও জোরে, আর বেশ ভাল হলেও সেই একই জায়গা পর্যন্ত।

'আমি জিজ্ঞেস করে আসছি,' মেয়েটা চলে গেল।

পুরোদমে চলতে চলতে বাজনাটা হঠাৎ থেমে গেল; তার বদলে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল:

'বলে দাও, বাপি বাড়ি নেই, আজ ফিরবে না; বাইরে গেছে। কেন যে সব আসে?' দরজার ওপাশ থেকে মেয়েলি গলা শোনা গেল। আবার

বাজনাটা সশব্দে থেমে গেল। চেয়ারটা ঠেলে পিছনে সরিয়ে দেবার শব্দ শোনা গেল। স্পষ্টই বোঝা গেল, বিরক্ত পিয়ানো-বাদিকা অসময়ের অতিথিকে বকুনি দিতেই আসছে।

'বাপি বাড়ি নেই,' ঘরে ঢুকে কড়া গলায় কথা বলল একটি ফ্যাকাসে রোগীর মত দেখতে মেয়ে। পরিপাটি করে চুল বাঁধা, চোখের নীচে কালির ছাপ। কিন্তু একটি সুসজ্জিত যুবককে দেখে স্বর নরম করল।

'দয়া করে ভিতরে আসুন।····· আপনার কি দরকার?'

'এই কারাগারের একজন কয়েদীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'নিশ্চয় কোন রাজনৈতিক বন্দী?'

'না, তা নয়। আমার সঙ্গে ন্যায়াধীশের অনুমতি-পত্র আছে।'

'দেখুন, আমি তো জানি না! আর বাপিও বাড়ি নেই। কিন্তু আপনি ভিতরে আসুন, অথবা সহকারীর সঙ্গে কথা বলুন। তিনি এখন আপিসেই আছেন। সেখানে দরখাস্ত করতে পারেন। আপনার নাম?'

'ধন্যবাদ,' প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে শুধু এই কথাটি বলেই নেখ্‌ল্যুদভ চলে গেল।

দরজা বন্ধ হতে না হতেই সেই সজীব সুর আবার বেজে উঠল; স্থান এবং পাত্র—দুইয়ের পক্ষেই সুরটা বেমানান।

উঠোনেই কুঁচির মত গোঁকওয়ালা একজন অফিসারের সঙ্গে দেখা হতে সে সহকারী ইন্সপেক্টরের খোঁজ করল। লোকটিই সহকারী। অনুমতি-পত্রটা দেখে সে জানাল, প্রাথমিক কারাগারের অনুমতি-পত্র বলে সে তাকে ঢুকতে দিতে পারবে না। তাছাড়া, তখন অনেক দেরীও হয়ে গেছে।

'দয়া করে কাল আবার আসুন। কাল দশটায় সকলকেই ঢুকতে দেওয়া হবে। তখন আসুন। ইন্সপেক্টরও থাকবেন। তখন সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট ঘরেও দেখা করতে পারেন। অথবা ইন্সপেক্টর অনুমতি দিলে আপিসেও দেখা করতে পারেন।'

কাজেই সেদিন দেখা না করেই নেখ্‌ল্যুদভ বাড়ি ফিরে গেল। মাসলভার সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় সে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে রাজপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে আদালতের কথা একবারও তার মনে হল না, ন্যায়াধীশের সঙ্গে ও সহকারী ইন্সপেক্টরের সঙ্গে যে কথাগুলি হয়েছিল তাই বার বার মনে পড়তে লাগল।

সে যে মাসলভার সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করেছে, ন্যায়াধীশকে সব কথা খুলে বলেছে, তাকে দেখতে ছুটে কারাগারে গেছে, এই চিন্তা তাকে এতই উত্তেজিত করে তুলেছিল যে শান্ত হতে অনেকক্ষণ সময় লাগল। বাড়ি পৌঁছে সে তৎক্ষণাৎ দিন-পঞ্জীটা বের করল। সেটা অনেকদিন ছোঁয়া হয় নি। কয়েকটি পংক্তি পড়ে সে লিখতে শুরু করল:

'দু বছর আমি দিন-পঞ্জীতে কিছু লিখি নি ; ভেবেছিলাম এ ছেলেমানুষি আর কখনও করব না ; কিন্তু এ তো ছেলেমানুষি নয়, এ হল নিজের সঙ্গে কথা বলা, প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে প্রকৃত দেবসত্তা থাকে তার সঙ্গে কথা বলা। এতদিন সে সত্তা ঘুমিয়ে ছিল, তাই কথা বলারও কেউ ছিল না। আদালতে জুরি হয়ে উপস্থিত হবার পর ২৮শে এপ্রিলের একটি অসাধারণ ঘটনা আমাকে জাগিয়ে তুলেছে। কয়েদীর কাঠগড়ায় তাকে দেখলাম, যে কাত্যুশাকে আমি পাপের পথে নিয়ে গিয়েছিলাম তাকে দেখলাম কয়েদীর পোশাকে। একটা অদ্ভুত ভুলে এবং আমার নিজের দোষে তার কঠোর দণ্ডের বিধান হয়েছে। এই মাত্র ন্যায়াধীশের কাছে এবং কারাগারে গিয়েছিলাম, কিন্তু ঢুকতে পারি নি। কিন্তু আমি সংকল্প করেছি, তার সঙ্গে দেখা করতে সাধ্যমত চেষ্টা করব, তার কাছে সব কথা খুলে বলব, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব—দরকার হলে তাকে বিয়ে করব। ঈশ্বর আমার সহায় হোন। আমার আত্মা শান্তিলাভ করেছে ; আমার মন আনন্দে ভরে উঠেছে।'

অধ্যায়—৩৭

সেদিন রাতে মাসলভা খোলা চোখে অনেকক্ষণ জেগে রইল। পুরোহিতের মেয়েটি দরজার কাছে পায়চারি করে চলেছে। সেদিকে তাকিয়ে মাসলভা গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

সে ভাবতে লাগল, সাখালিনে গিয়ে কোন মতেই কোন কয়েদীকে সে বিয়ে করবে না, বরং কারা-অফিসার, বা করণিক, বা রক্ষী, এমন কি তার কোন সহকারীর সঙ্গে যেমন করেই হোক একটা ব্যবস্থা করে নেবে। 'সকলেই কি সে রকম করে না ? শুধু শুকিয়ে গেলে চলবে না, তাহলেই মরণ।'

অনেকের কথাই তার মনে পড়ল। অ্যাডভোকেট, প্রেসিডেণ্ট, আরও যাদের যাদের সঙ্গে আদালতে তার দেখা হয়েছিল সকলকেই মনে পড়ল। সঙ্গিনী বার্থা কারাগারে দেখা করতে এসে সেই ছাত্রটির কথা বলে গেছে যে কিতায়েভার কাছে থাকার সময় তাকে 'ভালবাসত' ; সে নাকি তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছে। কত দুঃখ করেছে। অনেকের কথাই তার মনে পড়ল, শুধু মনে পড়ল না নেখ্‌লুদভের কথা। শৈশব ও যৌবনের কথা, নেখ্‌লুদভের জন্য ভালবাসার কথা—সে সব কিছুই সে আর মনে করতে চায় না। সে স্মৃতি বড় বেদনাদায়ক। সে স্মৃতি রয়েছে তার অন্তরের গভীরে, সব ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাকে সে ভুলে গেছে, কখনও তাকে স্মরণ করে না, স্বপ্নেও দেখে না। আজ আদালতেও সে তাকে চিনতে পারে নি ; যখন তাকে শেষবারের মত দেখেছিল তখনা তার পরনে ছিল সামরিক পোশাক, দাড়ি ছিল না, একটি ছোট গোঁফ ছিল শুধু, মাথার চুল ছিল ঘন, কোঁকড়ানো, ছোট করে ছাটা ;

আর এখন তার অনেক বয়স বেড়েছে, মুখে দাড়ি গজিয়েছে। কিন্তু চিনতে না পারার আসল কারণ সে কখনও তার কথা ভাবে না। যে ভয়ংকর কালো রাতে সেনাবাহিনী থেকে ফিরে যাবার পথে এই রেলপথ দিয়ে গেলেও সে পিসীদের সঙ্গে দেখা করতে আসে নি, সেই রাতেই তার স্মৃতিকে সে কবরে ঢেকে দিয়েছে।

তখন কাত্যুশা জানত সে অন্তঃস্বত্বা। যতদিন তার আশা ছিল নেখ্‌ল্যুদভ ফিরে আসবে ততদিন গর্ভের সন্তানকে তার বোঝা মনে হয় নি, বরং সে যখন তার ভিতরে নড়াচড়া করত তখন সে বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে পড়ত। কিন্তু সেই রাতে সব কিছু বদলে গেল ; শিশুটি হয়ে উঠল শুধুই বোঝা।

পিসীরা আশা করেছিল নেখ্‌ল্যুদভ আসবে। ফিরে যাবার পথে সে যেন তাদের দেখে যায় সে কথাও জানিয়েছিল ; কিন্তু সে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিল যে একটা নির্দিষ্ট দিনে পিতাসবার্গে উপস্থিত থাকতে হবে বলে তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না। এ খবর শুনে কাত্যুশা স্থির করল, স্টেশনে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবে। রাত দু'টোয় ট্রেনটা যাবে। দুই বৃদ্ধাকে বিছানায় শুইয়ে রেখে রাঁধুনির ছোট মেয়ে মাশ্‌কাকে তার সঙ্গে যেতে রাজী করিয়ে একজোড়া পুরনো বুট পরে, মাথায় একটা শাল জড়িয়ে কোনমতে পোশাক পরে স্টেশনে ছুটল।

হেমন্তের অন্ধকার বৃষ্টি-ঝরা ঝড়ো রাত। একবার বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে, আবার থেমে যাচ্ছে। মাঠের ভিতরকার পথ তবু নজরে আসে, কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে ঘন অন্ধকার। রাস্তাটা কাত্যুশার পরিচিত, তবু সে পথ হারিয়ে ফেলল। ট্রেনটা স্টেশনে তিন মিনিট থামে। সে আশা করেছিল তার আগেই স্টেশনে পৌছতে পারবে। কিন্তু যখন সে স্টেশনে পৌছল তখন গাড়ি ছাড়বার দ্বিতীয় ঘণ্টাও বেজে গেছে। ছুটতে ছুটতে প্লাটফর্মে ঢুকে একটা প্রথম শ্রেণীর কামরার জানালা দিয়ে কাত্যুশা তাকে দেখতে পেল। কামরাটা বেশ আলোকিত। ভেলভেট-মোড়া আসনে মুখোমুখি বসে দুজন অফিসার তাস খেলছে, মাঝখানের টেবিলে দুটো মোমবাতি জ্বলছে। আটো ব্রীচেস ও সাদা শার্ট গায়ে একটা আসনের হাতলের উপর হেলান দিয়ে বসে কি নিয়ে যেন সে হাসাহাসি করছে। তাকে চিনতে পেরেই কাত্যুশা তার অবশ হাত দিয়ে কামরার জানালায় টোকা দিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই তৃতীয় ঘণ্টা বেজে উঠল ; পিছন দিকে একটা ধাক্কা দিয়ে কামরাগুলো একের পর এক সামনের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করল। একজন খেলুড়ে তাস হাতে নিয়ে উঠে বাইরে তাকাল। কাত্যুশা আবার টোকা দিয়ে জানালার গায়ে মুখটা চেপে ধরল। গাড়িটা তখন চলছে, সেও ভিতরে চোখ রেখে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। অফিসারটি জানালাটা নামিয়ে দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। নেখ্‌ল্যুদভ তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই সেটা নামাতে

লাগল। ট্রেনের গতি বাড়তে থাকায় সেও দ্রুততর হাঁটতে লাগল। ট্রেনের গতি আরও বাড়ল, জানালাটাও নামানো হল, আর সেই মুহূর্তে গার্ড তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠল। কাতয়ুশা প্লাটফর্মের ভিজে তক্তার উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে প্লাটফর্মের শেষ প্রান্তে এসে সিঁড়িতে পা লাগতেই পড়ে গেল। আবার উঠেই ছুটতে লাগল। প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলো তাকে পেরিয়ে গেছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলোও দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে, এবং শেষ পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর কামরাগুলোও দ্রুততর গতিতে পার হয়ে গেল। সে তবু ছুটছে। পিছনে আলো লাগানো শেষ কামরাটাও যখন তাকে পেরিয়ে গেল তখন সে ইঞ্জিনের জল-নেবার জলাধারটার কাছে পৌঁছে গেছে। প্রকাণ্ড খোলা হাওয়ায় তার শালটা উড়ছে, স্কার্টটা পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। এক সময়ে শালটা মাথা থেকে উড়ে গেল, কিন্তু সে তবু ছুটতে লাগল।

পিছন পিছন ছুটতে ছুটতে ছোট মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠল, 'কাতেরিনা মিখাইলভ্না তোমার শাল উড়ে গেল!'

কাতয়ুশা থামল, পিছন ফিরে দুই হাত দিয়ে শালটাকে চেপে ধরে হু-হু করে কেঁদে উঠল।

'চলে গেল!' সে আর্তনাদ করে উঠল।

'ভেলভেটের হাতল-লাগানো চেয়ারে আলোয় উদ্ভাসিত কামরার মধ্যে বসে সে হাসি-ঠাট্টা করছে আর মদ খাচ্ছে, আর আমি এখানে কাদায়, অন্ধকারে, বাতাসে, বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কাঁদছি।' নিজের মনেই সে কথাগুলি বলল। তারপর মাটিতে বসে পড়ে এমন ভাবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল যে মেয়েটা ভয় পেয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'বাড়ি চল'।

তার কথায় কান না দিয়ে কাতয়ুশা নিজের ভাবনাই ভাবতে লাগল; ট্রেন যখন চলে তখন তার নীচে—তাহলেই তো সব শেষ।'

ঐ পথই বেছে নেবে বলে মনস্থির করে ফেলেছে এমন সময়—চরম উত্তেজনার পরে শান্ত হয়ে এলে সচরাচর যেমন ঘটে থাকে—সে, তার ভিতরকার সন্তান—তার নিজের সন্তান কাঁপতে কাঁপতে একটু ঠেলা দিল, ধীরে ধীরে হাত-পা ছড়ালো, তারপর আবার যেন সরু, নরম, ধারালো কিছু দিয়ে তাকে ঠেলা দিল। অকস্মাৎ একমুহূর্ত আগে যে যন্ত্রণায় বেঁচে থাকাটাই তার কাছে অসম্ভব মনে হয়েছিল, নেখ্ল্যুদভের প্রতি যত কিছু তিক্ততা, আর মৃত্যুর ভিতর দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনা—সব চলে গেল। সে ধীরে ধীরে শান্ত হল, উঠে দাঁড়াল, শালটা মাথায় জড়িয়ে বাড়ির পথ ধরল।

জলে ভিজে, কাদা মেখে, পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরল। যে পরিবর্তন তাকে আজকের অবস্থায় নিয়ে এসেছে তার মনের মধ্যে সেদিন থেকেই তা কাজ করতে শুরু করল। সেই ভয়ংকর রাত থেকেই সে সৎ বৃত্তিতে বিশ্বাস

হারাল। এতদিন সে তো সৎ বৃত্তিতে বিশ্বাস করত আর ভাবত যে অন্যরাও তাতে বিশ্বাস করে। কিন্তু সেই রাতের পর থেকে তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে কেউ বিশ্বাস করে না, ঈশ্বর ও তাঁর বিধান সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়ে থাকে সব ফাঁকি, সব অসত্য। যাকে সে ভালবাসত আর যে তাকেও ভালবাসত—হ্যাঁ, সে তা জানত—সে আজ তাকে ভোগ করে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, তার ভালবাসাকে অসম্মান করেছে। অথচ যত লোককে সে চিনত তাদের মধ্যে সেই ছিল শ্রেষ্ঠ। আর সবাই তো তার চেয়েও খারাপ। তার পর থেকে যা কিছু ঘটল প্রতিটি পদক্ষেপে তাতে তার এই বিশ্বাসই দৃঢ়তর হতে থাকল। তার পিসীদের, সেই ধর্মাত্মা বৃদ্ধ মহিলাদের সে যখন আর আগের মত সেবাযত্ন করতে পারত না তখন তারা তাকে তাড়িয়ে দিল। তারপর থেকে যাদের সঙ্গেই তার দেখা হয়েছে তার মধ্যে স্ত্রীলোকেরা তাকে ব্যবহার করেছে উপার্জনের যন্ত্র হিসাবে, আর বৃদ্ধ পুলিশ অফিসার হতে শুরু করে কারাগারের রক্ষী পর্যন্ত সব পুরুষই তাকে ভোগের সামগ্রী বলে মনে করেছে। পৃথিবীতে কেউই সুখ ছাড়া আর কোন কিছুর তোয়াক্কা করে না। যে বৃদ্ধ লেখকের সঙ্গে সে স্বাধীন জীবনের দ্বিতীয় বছরটা কাটিয়েছিল সেই তার এই বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করেছে। সে তাকে সরাসরিই বলেছে যে এতেই জীবনের সুখ; একেই সে বলেছে কাব্য ও নন্দনতত্ত্ব।

প্রত্যেকেই নিজের জন্য, নিজের সুখের জন্য বেঁচে থাকে; ঈশ্বর ও সততা নিয়ে যত কথা সব ফাঁকি। মাঝে মাঝে যখনই তার মনে সন্দেহ জেগেছে, যখনই সে অবাক হয়ে ভেবেছে যে পৃথিবীটা এত খারাপভাবে সৃষ্টি হয়েছে কেন—যেখানে সকলেই পরস্পরকে আঘাত করে এবং দুঃখ দেয়, তখনই তার মনে হয়েছে এসব কথা না ভাবাই ভাল। মন খারাপ হলেই সে ধূমপান করতে বা মদ খেতে পারে, বা কোন পুরুষের সঙ্গে ভালবাসা জমাতে পারে, বাস, তাহলেই সে ভাব কেটে যাবে।

অধ্যায়—৩৮

রবিবার ভোর পাঁচটায় কারাগারের মেয়েদের ওয়ার্ডের করিডরে হুইস্‌ল বেজে উঠল। করাব্‌ল্‌য়ভা আগেই জেগেছিল। মাসলভাকেও ডেকে তুলল।

দালানে পায়ের শব্দ শোনা গেল। দুজন কয়েদী ঘরে ঢুকল। তাদের পরনে কুর্তা ও ধূসর ট্রাউজার। তাও গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছে নি। বেজার মুখে তারা দুটো দুর্গন্ধভরা পিপে তুলে সেলের বাইরে নিয়ে গেল। মেয়েরা সব করিডরের কলে হাত মুখ ধুতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে হৈ-হল্লা, চেঁচামেচি, গালিগালাজ শুরু হয়ে গেল।

একটা মেয়ের পিঠে থাপ্পড় কসিয়ে বুড়ো কারারক্ষী চেঁচিয়ে বলল, 'তোরা

কি সব নির্জন সেলে যেতে চাস? নে, তাড়াতাড়ি কর। প্রার্থনা-সভায় যাবার জন্য তৈরি হয়ে নে।'

মাসলভা কোন রকমে চুল বেঁধে পোশাক পরতেই ইন্সপেক্টর তার সহকারীদের নিয়ে ঘরে ঢুকল।

একজন কারারক্ষী চেঁচিয়ে বলল, 'সবাই পরিদর্শনের জন্য বেরিয়ে পড়।'

সব কয়েদীরা সেল থেকে বেরিয়ে এসে দুই সারিতে করিডরে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকেই তার সামনের কয়েদীর কাঁধে হাত রাখল। সবাইকে গুণতি করা হল।

পরিদর্শনের পরে নারী-রক্ষী কয়েদীদের গীর্জায় নিয়ে চলল। বিভিন্ন সেল থেকে আসা শতাধিক কয়েদীর এক সারির মাঝামাঝি জায়গায় ছিল মাসলভা ও ফেদসিয়া। সকলেরই পরনে সাদা স্কার্ট, সাদা কুর্তা, মাথায় সাদা রুমাল বাঁধা। শুধু কয়েকজনের পরনে তাদের নিজেদের রঙিন পোশাক। যে সব কয়েদী সাইবেরিয়ায় দণ্ডাদেশ ভোগ করতে যাচ্ছে এরা হল তাদেরই স্ত্রী; ছেলেমেয়েদের নিয়ে এরাও স্বামীর সঙ্গে যাবে। সিঁড়ির সবগুলো ধাপ জুড়ে চলেছে কয়েদীদের শোভাযাত্রা। সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এ মোড় ঘুরে মাসলভা দেখতে পেল, তার শত্রু বচকভা তারই সামনে চলেছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতেই মেয়েরা কথা বলা বন্ধ করল। ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে মাথা নুইয়ে তারা ফাঁকা গীর্জাটায় প্রবেশ করল। সোনালী রং করা গীর্জাটা ঝকঝক করছে। তাদের জায়গা ডান দিকে। পরস্পরকে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করে ওরা ভীড় করে ভিতরে ঢুকল।

মেয়েদের পরে এল ধূসর আলখাল্লা পরা পুরুষরা: যারা সাইবেরিয়া নির্বাসন দণ্ডের অপেক্ষায় আছে, যারা কারাগারে বন্দী-জীবন কাটাচ্ছে, আর যারা কম্যুন থেকে নির্বাসিত হয়েছে। তারা ভীড় করল গীর্জার বাঁ দিকে ও মাঝখানে।

যারা সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে তাদের আগেই গীর্জায় আনা হয়েছিল। তারা দাঁড়িয়ে আছে উপরের গ্যালারির এক পাশে। প্রত্যেকেরই অর্ধেকটা মাথা কামানো। পায়ের শিকলের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দই তাদের উপস্থিতি ঘোষণা করছে। প্রাথমিক হাজতে যারা রয়েছে তারা দাঁড়িয়ে আছে গ্যালারির অপর পাশে। তাদের পায়ে শিকল নেই, মাথাও কামানো নয়।

জনৈক ধনী ব্যবসায়ী কয়েক লক্ষ রুবল খরচ করে কারাগারের গীর্জাটাকে নতুন করে তৈরি করিয়ে দিয়েছে, নানাভাবে সুসজ্জিত করেছে। উজ্জ্বল রঙে ও সোনালী কারুকার্যে গীর্জাটা ঝলমল করছে।

অধ্যায়—৩৯

প্রার্থনা-সভা শুরু হল।

সভার কর্ম-পদ্ধতি নিম্নরূপ। সোনালী কাপড়ের বিচিত্র এক অস্বস্তিকর জোব্বা পরে পুরোহিত একখণ্ড রুটিকে টুকরো টুকরো করে কেটে একটা পাত্রে সাজিয়ে রাখে এবং নানা রকম নাম ও প্রার্থনা উচ্চারণ করতে করতে সেগুলোকে এক পেয়ালা মদে ডুবিয়ে দেয়।

এই অনুষ্ঠানের মূল কথাটি হল: পুরোহিত যে রুটির টুকরোগুলোকে কেটে মদে ডুবিয়ে রাখে, একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রার্থনা ও ব্যবস্থাপনার ফলে সেগুলি ঈশ্বরের মাংস ও রক্তে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

ব্যবস্থাপনাটা আবার অনেকটা এই রকম: সোনালী কাপড়ের জোব্বা পরিহিত পুরোহিত নিয়মিতভাবে তার দুটি হাত ঊর্ধ্বে তুলে ধরবে এবং হাঁটু ভেঙে বসে টেবিলটাকে ও তার উপরে যা আছে সব কিছুকে চুম্বন করবে; কিন্তু তার প্রধান কাজ হল, একখণ্ড কাপড়ের দুটো কোণ ধরে সেটাকে রূপোর পাত্র ও সোনার পেয়ালার উপর ধীরে ধীরে ছন্দময় ভঙ্গীতে দোলাতে থাকবে। সকলেই বিশ্বাস করে, এই অবস্থায় রুটি, মদ মাংসও রক্তে পরিণত হয়ে যায়; কাজেই অনুষ্ঠানের এই অংশটাকেই যথাসাধ্য গাম্ভীর্যের সঙ্গে পালন করা হয়।

একটা সোনালী পর্দা দিয়ে গীর্জার এক অংশকে বাকি জায়গা থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। এবার পুরোহিত পর্দার অন্তরাল থেকে চীৎকার করে বলল, 'এবার ভাগ্যবতী, অতি পবিত্র, পরমারাধ্যা ঈশ্বর-জননীর স্তব-গান।' অমনি সমবেত গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হল, যিনি কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে খৃস্টকে জন্ম দিয়েছেন, আর সেই হেতু যিনি বিদ্যাধরদের চাইতে অধিক সম্মান এবং দেবদূতদের চাইতে অধিক গৌরবের অধিকারিণী, সেই কুমারী মেরির জয় হোক। তার পরেই রূপান্তর-পর্ব সমাধা হল বলে ধরে নেওয়া হল এবং পুরোহিত পাত্রের উপর থেকে তোয়ালেটা সরিয়ে নিয়ে মাঝখানের রুটির টুকরোটাকে চার ভাগে কেটে সেটাকে প্রথমে মদের মধ্যে এবং পরে নিজের মুখে ফেলে দিল। ধরে নেওয়া হল যে, সে ঈশ্বরের মাংসের একটি টুকরো খেল এবং তাঁর রক্তের খানিকটা পান করল। তারপর সে পর্দার মাঝখানের দরজাটা খুলে সোনার পেয়ালাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল এবং যারা যারা ঈশ্বরের মাংস ও রক্তের স্বাদ পেতে চায় তাদের আমন্ত্রণ জানাল।

কয়েকটি ছেলেমেয়ে সে ইচ্ছা প্রকাশ করল।

তাদের নাম জিজ্ঞাসা করবার পরে পুরোহিত একখানি চামচের সাহায্যে খুব সাবধানে একটুকরো মদে ভেজানো রুটি পেয়ালা থেকে বের করে একটা ছেলের মুখের ভিতর পুরে দিল। একে একে সব শিশুর বেলায়ই তাই করল,

আর ডিয়েকন নিজে শিশুদের মুখ মুছিয়ে দিয়ে এই মর্মে গান করতে লাগল যে শিশুরা ঈশ্বরের মাংস খেয়েছে এবং রক্ত পান করেছে। তারপর পুরোহিত পেয়ালাটা নিয়ে পুনরায় পর্দার আড়ালে চলে গেল। সেখানে বাকি সবটা রক্ত পান করে এবং ঈশ্বরের মাংসের বাকি টুকরোগুলি খেয়ে জিভ দিয়ে সযত্নে গোঁফটা চেটে, মুখ ও পেয়ালাটা ধুয়ে খুশি মনে বাছুরের চামড়ার জুতোর তলায় শব্দ তুলে পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

খৃষ্টীয় অনুষ্ঠানের প্রধান অংশ এখানেই শেষ হল; কিন্তু হতভাগ্য কয়েদীদের কল্যাণ কামনায় পুরোহিতের সঙ্গে আরও একটু যোগ করল। যে ঈশ্বরকে সে এইমাত্র ভক্ষণ করেছে তারই প্রতীকস্বরূপ, একডজন মোমবাতির আলোয় উদ্ভাসিত একটি খোদাই-করা সোনালী মূর্তির (তার মুখ ও হাত কৃষ্ণবর্ণ) সামনে উপস্থিত হয়ে পুরোহিত বিচিত্র বেসুরো গলায় নিম্নলিখিত কথাগুলি আবৃত্তি করতে বা গাইতে লাগল:

'মধুরতম যীশু, শহীদদের দ্বারা বন্দিত যীশু, সর্বশক্তিমান সম্রাট: হে আমার পরিত্রাতা যীশু, আমাকে রক্ষা কর। সর্বসুন্দর যীশু, যে তোমাকে পরিত্রাতা যীশু বলে ডাকে তার প্রতি করুণা কর। মানবদরদী যীশু, সব সন্তদের, সব ভক্তদের তুমি রক্ষা কর, তাদের স্বর্গের আনন্দ-আস্বাদনের উপযুক্ত করে তোল।'

তারপর সে থামল, নিঃশ্বাস টেনে নিল, বুকের উপর ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল, এবং আভূমি প্রণত হল; অমনি সকলেই—ইন্সপেক্টর, কারারক্ষীরা এবং কয়েদীরা—তাই করল; উপর থেকে তাদের শিকলের ঝনঝন শব্দ অবিরাম ধ্বনিত হতে লাগল।

যে ভাইরা বিপথগামী হয়েছে তাদের কল্যাণ ও উন্নতি বিধানের জন্য আয়োজিত খৃষ্টীয় অনুষ্ঠান এইভাবে শেষ হল।

অধ্যায়—৪০

পুরোহিত ও ইন্সপেক্টর থেকে আরম্ভ করে মাসলভা পর্যন্ত কেউই কিন্তু এই সত্যটা উপলব্ধি করল না যে, যে যীশুর নাম পুরোহিত আজ বহুবার উচ্চারণ করল, এই সব বিচিত্র ভাষায় যার প্রশংসা সে করল, সেই যীশু যে সব কাজকে নিষিদ্ধ করে গেছে, এখানে আজ তাই করা হল: এই অর্থহীন বাগাড়ম্বর, রুটি ও মদকে কেন্দ্র করে এই নিন্দনীয় মন্ত্রোচ্চারণ—এসব যীশু যে শুধু নিষেধ করে গেছেন তাই নয়, যীশু স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, কোন মানুষ অন্য মানুষকে প্রভু বলে মানবে না, গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করবে না; যীশু সকলকে বলেছেন নির্জনে প্রার্থনা করতে; মন্দির নির্মাণ করতে নিষেধ করে বলেছেন যে মন্দির ধ্বংস করতেই তাঁর আবির্ভাব; মানুষ প্রার্থনা করবে মন্দিরে নয়, অন্তরের মধ্যে,

আর সবচেয়ে বড় কথা, যীশু যে শুধু মানুষকে বিচার করতে, কারারুদ্ধ করতে যন্ত্রণা দিতে, দণ্ড দিতে নিষেধ করেছেন তাই নয়, সর্বপ্রকার হিংসাকে নিষিদ্ধ করে যীশু বলেছেন যে, বন্দীদের মুক্তি বিধান করতেই তাঁর আগমন।

অধিকাংশ কয়েদী বিশ্বাস করে, এই সব সোনালী মূর্তি, এই সব জামা, মোমবাতি, পেয়ালা, ক্রুশ-চিহ্ন, 'মধুরতম যীশু' ও 'করুণা কর' প্রভৃতি দুর্বোধ্য শব্দের পুনরাবৃত্তি—এদের মধ্যে এমন একটা রহস্যময় শক্তি আছে যার সাহায্যে এ জন্মে এবং পরজন্মে অনেক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। এই বিশ্বাসকে যারা আঁকরে ধরে আছে তাদের প্রতি কতদূর প্রতারণা করা হচ্ছে সেটা স্পষ্ট করে বুঝতে পারে খুবই অল্প কয়েকটি লোক, আর বুঝতে পারে বলেই তারা প্রাণ খুলে হাসে ; কিন্তু অধিকাংশ লোকই প্রার্থনা, জমায়েত ও মোমবাতির সাহায্যে বাঞ্ছিত ফল লাভের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলে প্রত্যেকেই মনে করে যে তার অসাফল্য একান্তই আকস্মিক, শিক্ষিত লোক ও আর্কবিশপ-দের দ্বারা সমর্থিত এই সংগঠন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়— জীবনের জন্য যদি নাও হয়, পরবর্তী জীবনের জন্যও বটে।

মাসলভাও তাই বিশ্বাস করে। অন্য সকলের মতই তার মনে জাগে অনুরাগ ও অস্পষ্টতার একটা মিশ্র অনুভূতি। প্রথমে সে রেলিংকয়ের পিছনে ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। পরে সে ও ফেদসিয়া সামনের দিকে এগিয়ে গেলে তারা ইন্সপেক্টরের পিছনে রক্ষীদের মাঝখানে একটি ছোটখাট চাষীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। তার মুখে হাল্কা দাড়ি, মাথায় বেশ চুল। সে ফেদসিয়ার স্বামী, একদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকেই তাকিয়ে ছিল। অনুষ্ঠানের সময় মাসলভা তাকেই খুটিয়ে খুটিয়ে দেখল, আর ফেদসিয়ার সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলতে লাগল। অন্য সবাই যখন মাথা নুইয়ে ক্রুশ-চিহ্ন করল, একমাত্র তখনই সেও মাথা নুইয়ে ক্রুশ-চিহ্ন করতে লাগল।

অধ্যায়—৪১

নেখ্‌ল্যুদভ খুব ভোরে বাড়ি থেকে বের হল। গ্রাম থেকে একটি চাষী পাশের পথ দিয়ে যেতে যেতে তার ব্যবসায়সুলভ ভঙ্গীতে হাঁক দিচ্ছিল—'দুধ! দুধ! দুধ!'

আগের দিন বসন্তের প্রথম বৃষ্টি পড়েছিল ; তাই যেখানে রাস্তা বাঁধানো নয়—সেখানেই সবুজ ঘাস গজিয়েছে। বাগানের বার্চ-গাছগুলিকে সবুজ তুলোয় ছাওয়া বলে মনে হচ্ছে, বার্চ-চেরি ও পপলার গাছগুলি লম্বা সুগন্ধি পাতা মেলেছে, আর দোকান-ঘর এবং বাসভবনের জানালার ডবল পাল্লাগুলো সরিয়ে ঝাড়পোছ করা হচ্ছে।

দিনটা রবিবার। কল-কারখানার ছুটি। তাই নানা ধরনের লোকজন

নানারকম পোশাক পরে পথে বেরিয়ে পড়েছে। পথে গাড়ি, ঘোড়া, ট্রাম গাড়ির চলাচলের বিরাম নেই। গীর্জায় ঘণ্টা বাজছে। লোকজন সব ভাল পোশাক পরে বিভিন্ন গীর্জার দিকে চলেছে।

ইজ্‌ভজ্‌চিকখানা নেখ্‌ল্যুদভকে কারাগার পর্যন্ত পৌঁছে দিল না; কারাগারে যাবার শেষ মোড়টায় নামিয়ে দিল।

কারাগার থেকে প্রায় একশ' পা দূরের এই মোড়েই স্ত্রী-পুরুষ মিলে অনেক লোক ছোট ছোট পুঁটুলি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের কাউকেই কারাগারের কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। সামনে একটি শান্ত্রী এদিক-ওদিক হেঁটে বেড়াচ্ছে। কেউ তাকে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলেই সে চেঁচিয়ে উঠছে।

মস্ত বড় ইটের বাড়িটাই কারাগার। শান্ত্রীর উল্টো দিকে ডান পাশের কাঠের বাড়িগুলোর দরজায় বেঞ্চির উপর একজন কারারক্ষী বসে আছে। তার পরনে সোনালী দড়ি লাগানো পোশাক, হাতে নোটবই। সাক্ষাৎ প্রার্থীরা তার কাছে গিয়ে যার সঙ্গে দেখা করতে চায় তাদের নাম বলছে, আর সে টুকে নিচ্ছে। নেখ্‌ল্যুদভ এগিয়ে গিয়ে কাতেরিনা মাসলভার নাম বলল। কারারক্ষী নামটা লিখে নিল।

'আমাদের ঢুকতে দিচ্ছে না কেন?' নেখ্‌ল্যুদভ জিজ্ঞাসা করল।

'প্রার্থনা-অনুষ্ঠান চলছে। সেটা শেষ হলেই ঢুকতে দেওয়া হবে।'

নেখ্‌ল্যুদভ অপেক্ষমান জনতার দিকে ফিরে তাকাল। একটি লোক—তার খালি পা, ছেঁড়া পোশাক, দুমড়ানো টুপি; সারা মুখে লাল দাগ—ভীড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে কারাগারের দিকে এগিয়ে গেল।

রাইফেলধারী শান্ত্রী চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, কোথায় যাচ্ছ?'

ভবঘুরে লোকটি শান্ত্রীর কথায় মোটেই ঘাবড়ালো না, তবু একটু পিছনে সরে জবাব দিল, 'তুমি চুপ কর তো বাপু। বেশ তো, যেতে না দাও যাব না। তাই বলে অমন চেঁচাচ্ছ কেন? ঠিক যেন এক সেনাপতিমশায়।'

জনতা হো-হো করে হেসে উঠল।

এমন সময় জানালাযুক্ত বড় লোহার দরজাটা খুলে গেল। সরকারী পোশাকে সজ্জিত একজন অফিসার অপর একজন কারারক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল। নোটবই হাতে কারারক্ষীটি ঘোষণা করল যে এবার সাক্ষাৎকার শুরু হবে। শান্ত্রী একপাশে সরে দাঁড়াল এবং পাছে দেরী হয়ে যায় এই আশংকায় সাক্ষাৎপ্রার্থীরা সকলেই দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একজন কারারক্ষী দরজার মুখে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎপ্রার্থীরা যেমন যেমন ঢুকছে তেমন তেমন তাদের উচ্চৈস্বরে গুণতে লাগল—ষোল, সতেরো, ইত্যাদি। আর একজন কারারক্ষী ভিতরে দাঁড়িয়ে তারা যেই দ্বিতীয় দরজা দিয়ে ঢুকছে অমনি হাত বাড়িয়ে প্রত্যেককে স্পর্শ করছে; ফলে যখন তারা আবার ফিরে যাবে তখন একটিও দর্শনার্থী ভিতরে থাকবে না এবং একটিও কয়েদী বাইরে

যেতে পারবে না। কার গায়ে হাত লাগাচ্ছে না দেখেই কারারক্ষী নেখ্‌ল্‌য়ুদভের পিঠে একটা চড় কসিয়ে বসল। নেখ্‌ল্‌য়ুদভ তার হাতের ছোঁয়ায় ক্ষুব্ধ হলেও যে কাজে সে এসেছে সেটা স্মরণ করে তার এই বিরক্তি ও ক্ষোভের জন্য লজ্জিত হল।

ঢুকবার দরজার পরেই একটা বড় ঘর ; তার ছোট ছোট জানালায় লোহার শিক বসানো। সেটা সভা-কক্ষ। সেই ঘরে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর একখানা বড় ছবি দেখে নেখ্‌ল্‌য়ুদভ চমকে উঠল।

'এ ছবি এখানে কেন ?' সে ভাবল ; আপনা থেকেই তার মনে হল, এ ছবি মুক্তির প্রতীক, বন্দীদশার নয়।

দ্রুত ধাবমান দর্শনার্থীদের পথ ছেড়ে দিয়ে নেখ্‌ল্‌য়ুদভ ধীরে ধীরে এগোতে লাগল এবং সকলের শেষে দর্শনার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ শতকণ্ঠের কর্ণপটাহ ভেদকারী চীৎকারে সে যেন হকচকিয়ে গেল। প্রথমে এই গর্জনের কারণও বুঝতে পারল না। কিন্তু লোকগুলির আরও কাছে গিয়ে দেখল, চিনির উপর ঝাঁক-বেঁধে বসা মাছির মত তারা সকলেই যে তারের জালের উপর চেপে দাঁড়িয়েছে সেই জাল দিয়ে ঘরটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর অর্থও সে বুঝতে পারল। ঘরের দুটো অংশকে আলাদা করা হয়েছে, একটি জাল দিয়ে নয়, মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত উঁচু সাত ফুট অন্তর অন্তর দুটো তারের জাল দিয়ে, আর সেই দুটো জালের মাঝখানের স্থানটুকুতে কারারক্ষীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। জালের শেষ প্রান্তে রয়েছে কয়েদীরা, আর নিকট প্রান্তে রয়েছে দর্শনার্থীরা। তাদের মাঝখানে রয়েছে দুটো তারের জাল আর সাত ফুট জায়গা ; ফলে হাত বাড়িয়ে কেউ কাউকে কিছু দিতে পারবে না, এবং কেউ যদি ক্ষীণ-দৃষ্টি হয় তাহলে অপর প্রান্তের লোকের মুখ দেখে চিনতেও পারবে না। কথা বলাও শক্ত ; কথা শোনাতে হলেই চেঁচাতে হবে।

দুই প্রান্তেই অনেক মুখ জালের উপর চেপে বসেছে—স্ত্রী, স্বামী, বাবা, মা, সন্তানদের মুখ ; সকলেই চেষ্টা করছে বাঞ্ছিত জনকে দেখতে এবং সে যাতে শুনতে পায় এমন ভাবে কথা বলতে।

একজন যেমন তার কথা শোনাতে চেষ্টা করছে, তার পার্শ্ববর্তীও সেই একই চেষ্টা করছে ; ফলে একে অন্যের কণ্ঠস্বরকে চাপা দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করছে, আর তার ফলে যে সম্মিলিত হৈ-হট্টগোল শুরু হয়েছে, নেখ্‌ল্‌য়ুদভ প্রথম ঘরে ঢুকে সেই শব্দ শুনেই হকচকিয়ে গিয়েছিল। কোন কিছু শোনা অসম্ভব। শুধু মুখ দেখেই বুঝতে হবে কে কি বলছে, বা এক-জনের সঙ্গে অপর জনের সম্পর্ক কি।

নেখ্‌ল্‌য়ুদভ যখন বুঝতে পারল তাকেও এই অবস্থাতেই কথা বলতে হবে, তখনই যারা এই অবস্থা সৃষ্টি করেছে, মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, তাদের

বিরুদ্ধে একটা বিক্ষোভের অনুভূতি তার মনে জাগল। এই ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে পড়েও মানুষের হৃদয়-বৃত্তির উপর এই অত্যাচারে কেউ ক্ষুব্ধ হচ্ছে না দেখে তার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। এমন কি সৈন্যরা, ইন্সপেক্টর এবং কয়েদীরাও এমন ব্যবহার করছে যেন এটাকেই তারা প্রয়োজন বলে স্বীকার করে নিয়েছে।

মিনিট পাঁচেক সময় নেখ্‌ল্যুদভ সে ঘরে অপেক্ষা করল। সে যে কত অসহায়, এই পৃথিবী হতে সে কত বিচ্ছিন্ন এ কথা ভেবে সে অত্যন্ত বিষণ্ণ বোধ করতে লাগল। সমুদ্র-পীড়ার সঙ্গে তুলনীয় এক বিচিত্র নৈতিক বিবমিষা যেন তাকে আক্রমণ করেছে।

অধ্যায়—৪২

সাহস অর্জনের চেষ্টায় সে নিজেকেই বলল, 'কিন্তু যে জন্য এখানে এসেছি তা তো করতেই হবে। এখন কি করি?'

একজন সরকারী কর্মচারির খোঁজে সে চারদিকে তাকাল। সরকারী পোশাক পরিহিত একজন অফিসারকে ভীড়ের পিছনে পায়চারি করতে দেখে সে তার দিকে এগিয়ে গেল।

জোর করে ভদ্রতার ভাব এনে সে বলল, 'আপনি কি বলতে পারেন কোথায় মেয়েদের রাখা হয় এবং কোথায় তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয়?'

'আপনি কি মেয়েদের বিভাগে যেতে চান?'

সেই একই বিনয়ের সঙ্গে সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি একটি মেয়ে-কয়েদীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'হলে থাকতেই আপনার সে কথা বলা উচিত ছিল। আচ্ছা, আপনি কার সঙ্গে দেখা করতে চান?'

'আমি দেখা করতে চাই কাতেরিনা মাসলভা নাম্নী একটি কয়েদীর সঙ্গে।'

'তিনি কি রাজনৈতিক বন্দী?'

'না, সে সাধারণ অপরাধ—'

'ওঃ, তার কি দণ্ডাদেশ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, গতকালের আগের দিনই তার দণ্ডাদেশ হয়েছে।' ইন্সপেক্টরটি ভাল মেজাজে আছে; পাছে তার মেজাজ বিগড়ে যায় সেই ভয়ে নেখ্‌ল্যুদভ নরম গলায় জবাব দিল।

চেহারা দেখেই অফিসারটি বুঝতে পেরেছে তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। তাই সে বলল, 'মেয়েদের বিভাগে যদি যেতে চান, তাহলে দয়া করে এই দিকে যান।' বুকে মেডেল ঝোলানো একজন গোঁফওয়ালা

কর্পোর‍্যালের দিকে ঘুরে বলল, 'সিদরভ, ভদ্রলোককে মেয়েদের বিভাগে নিয়ে যাও।'

ঠিক সেই মুহূর্তে জালের কাছ থেকে কার যেন হৃদয়-বিদারক কান্না ভেসে এল।

নেখ্‌ল্যুদভের কাছে এখানকার সব কিছুই বিস্ময়কর; কিন্তু এটাই সব চাইতে বিস্ময়কর যে, তাকে এই ইন্সপেক্টর ও প্রধান কারারক্ষীদের ধন্যবাদ দিতে হবে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করতে হবে—অথচ এরাই সেই মানুষের দল যারা এই অট্টালিকার ঘরে এই সব নিষ্ঠুর কাজ করে চলেছে।

কর্পোর‍্যাল নেখ্‌ল্যুদভকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে একটা করিডরে পড়ল এবং সেটা পার হয়ে বিপরীত দিকের দরজা দিয়ে সোজা ঢুকে গেল মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে।

পুরুষদের ঘরের মতই এ ঘরটাও দুটো তারের জাল দিয়ে ভাগ করা; তবে ঘরটা আরও ছোট। এখানে দর্শনার্থীর সংখ্যাও কম, কয়েদীর সংখ্যাও কম, কিন্তু হৈ-চৈ হট্টগোল একই রকম। সেই একই ভাবে দুই জালের মাঝখান দিয়ে কর্তৃপক্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছে, তবে এখানে কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি একজন কারারক্ষিনী; তার পরিধানে নীল পাড়ের জ্যাকেট, আস্তিনে সোনালী দড়ি বসানো, কোমড়ে নীল বন্ধনী। পুরুষদের ঘরের মতই এখানেও দুই দিকের তারের জালের উপরেই মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে: এ পাশে নানা সাজে সজ্জিত শহরের লোক, আর ওপাশে কয়েদীরা,—তাদের কারও পরনে কারাগারের সাদা পোশাক, কারও বা নিজেদের রঙিন পোশাক। সারা জালটা জুড়েই মানুষের ভীড়। কেউ পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে অন্যের মাথার উপর দিয়ে কথা বলছে, কেউ বা বলছে মেঝের উপর বসে।

কয়েদীদের পিছনে জানালার পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। নেখ্‌ল্যুদভ তাকে চিনল। তার হৃৎপিণ্ড দ্রুতগতি হল, তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। চরম মুহূর্ত এগিয়ে আসছে। জালের কাছে গিয়ে সে তাকে ভাল করে দেখল। নীল-নয়না ফেদসিয়ার পিছনে দাঁড়িয়ে সে তার কথা শুনে হাসছে। এখন তার গায়ে কারাগারের আলখাল্লা নেই, একটা সাদা পোশাক পরেছে। রুমালের ফাঁক দিয়ে কয়েক গুচ্ছ কালো কোঁকড়ানো চুল দেখা যাচ্ছে, ঠিক আদালতে যেমনটি ছিল।

নেখ্‌ল্যুদভ ভাবল, 'আর একটি মুহূর্তের মধ্যেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। ওকে কি ডাকব? না কি ও নিজেই আসবে?'

মাসলভা ক্লারাকে আশা করছিল; এই লোকটি যে তাকে দেখতে এসেছে এটা তার মাথায়ই আসে নি।

যে কারারক্ষিনী তারের জালের মাঝখানে হাঁটছিল সে নেখ্‌ল্যুদভের কাছে গিয়ে বলল, 'আপনি কাকে চান?'

'কাতেরিনা মাসলভা,' নেখ্‌লয়ুদভ অতি কষ্টে উচ্চারণ করল।

রক্ষিনী চেঁচিয়ে বলল, 'মাসলভা, তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে।'

অধ্যায়—৪৩

মাসলভা চারদিক তাকাল। মাথাটা পিছনে ঠেলে দিয়ে বুক ফুলিয়ে সদা-প্রস্তুত ভঙ্গীতে জালের কাছে এগিয়ে এল। এ ভঙ্গী নেখ্‌ল্‌য়ুদভের চেনা। দুজন কয়েদীকে সরিয়ে সে বিস্মিত ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নেখ্‌লয়ুদভের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাল।

কিন্তু পোশাক দেখে তাকে ধনী লোক মনে করে একটু হাসল।

চোখ দুটি ঈষৎ টেঁরা। হাসি মুখটা জালের আরও আছে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি আমাকে খুঁজছেন?'

'আমি······আমি······আমি দেখা করতে চাই······আমি তোমার সঙ্গেই দেখা করতে চাই···আমি···।' সে স্বাভাবিক স্বরেই কথাগুলি বলল।

নেখ্‌ল্‌য়ুদভের কথাগুলি মাসলভা শুনতে পেল না, কিন্তু কথা বলার সময় তার মুখে যে ভাব ফুটে উঠছে তাতে তার এমন কিছু মনে পড়ল যা সে মনে করতে চায় না।

ভুরু কুঁচকে কপালে অনেকগুলো রেখা ফুটিয়ে জোর গলায় বলল, 'আপনার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না।'

'আমি এসেছি···' নেখ্‌লয়ুদভ বলল।

মনে মনে ভাবল, 'আমার কর্তব্য আমি করছি,—সব দোষ স্বীকার করছি! এ কথা ভাবতেই তার চোখে জল এসে গেল, তার মনে হল গলাটা আটকে যাবে; দুই হাতে জালটা চেপে ধরে উদ্গত চোখের জল চাপতে চেষ্টা করল।

তার উত্তেজিত অবস্থা দেখে মালসভা তাকে চিনতে পারল।

'আপনি যেন···কিন্তু না, আমার মনে নেই,' তার দিকে না তাকিয়েই সে চেঁচিয়ে উঠল; তার লজ্জারক্তিম মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে উঠল।

পড়া মুখস্থ বলার মত করে জোরালো অথচ একঘেয়ে গলায় নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'আমি এসেছি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে।'

এই কথা বলে খুবই বিচলিত হয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, সে যদি লজ্জা পেয়ে থাকে সে তো ভালই—এ লজ্জা তাকে সইতে হবে; তখন আরও জোরালো গলায় বলল:

'আমাকে ক্ষমা কর; তোমার প্রতি আমি ভয়ঙ্কর অন্যায় করেছি।'

তার উপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে মাসলভা নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল।

নেখ্‌ল্‌য়ুদভ আর কথা বলতে পারল না। জাল থেকে সরে এসে কান্না

চাপবার চেষ্টা করতে লাগল।

যে ইন্সপেক্টর আগ্রহ সহকারে তাকে মেয়েদের বিভাগে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল সে ঘরে ঢুকে নেখ্‌লয়ুদভকে জালের কাছে না দেখে জানতে চাইল, যে মেয়েটির সঙ্গে সে দেখা করতে এসেছে তার সঙ্গে কথা বলছে না কেন। নেখ্‌লয়ুদভ নাকটা ঝাড়ল, শরীরটাকে একটু নাড়া দিল, তারপর বলল : 'এই জালের ভিতর দিয়ে কথা বলা ভারি অসুবিধা; কিছুই শোনা যায় না।'

ইন্সপেক্টর একমুহূর্ত কি যেন ভাবল। 'ওঃ, আচ্ছা, তাকে কিছু সময়ের জন্য এখানে আনা যেতে পারে।' তারপর কারারক্ষিনীকে বলল, 'মারিয়া কারলভনা, মাসলভাকে বাইরে নিয়ে এস।'

এক মিনিট পরে পাশের দরজা দিয়ে মাসলভা বেরিয়ে এল। ধীর পায়ে নেখ্‌ল্‌য়ুদভের কাছে এগিয়ে গিয়ে থামল। তারপর চোখ তুলে তাকাল। দুদিন আগে যেমন ছিল, মাথার কালো চুল তেমনি কপালের উপর এসে পড়েছে; মুখটা রোগা ও ফুলো দেখালেও বেশ আকর্ষণীয় ও শান্ত; কিন্তু চকচকে দুটি কালো চোখ ফোলা পাতার নীচ থেকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে।

'আপনারা এখানে কথা বলুন,' এই কথা বলে ইন্সপেক্টর সরে গেল।

নেখ্‌ল্‌য়ুদভ দেয়ালের পাশে একটা আসনের দিকে এগিয়ে গেল।

মাসলভা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাল, তারপর বিস্ময়ে কাঁধ দুটিকে ঝাঁকুনি দিয়ে নেখ্‌ল্‌য়ুদভের পিছন পিছন বেঞ্চির দিকে এগিয়ে গেল এবং স্কার্টটা ঠিক করে পাশে বসল।

'আমি জানি আমাকে ক্ষমা করা তোমার পক্ষে কঠিন', কথা বলতে শুরু করেই সে থেমে গেল। চোখের জলে গলা আটকে আসছে। 'অতীতকে মুছে ফেলতে আমি পারব না, কিন্তু এখন আমার যা সাধ্য সব করব। আমাকে বল—'

মাসলভা টেঁরা চোখ দুটি তার উপর থেকে সরিয়েও নিল না, আবার ঠিক তার দিকে রাখলও না। তার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে শুধু বলল, 'আমাকে খুঁজে পেলেন কেমন করে?'

তার মুখটা বদলে গেল। খুশির ভাবটা কেটে গেল। তা দেখে নেখ্‌ল্‌য়ুদভ মনে মনে বলল, 'হে ঈশ্বর, আমার সহায় হও! বলে দাও আমি কি করব।'

মুখে বলল, 'গত পরশু আমি জুরিতে ছিলাম। তুমি আমাকে চিনতে পার নি?'

'না, পারি নি; চেনার সময় ছিল না। আমি চোখ তুলে তাকাইও নি,' সে বলল।

'একটি শিশুও তো ছিল, নয় কি?' কথাটা বলে সেও লজ্জিত বোধ করল।

তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ঘৃণার সঙ্গে সে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে।'

'কি বলছ তুমি? কেন?'

চোখ না তুলেই সে বলল, 'আমি নিজেই তখন খুব অসুস্থ, প্রায় মরতে বসেছিলাম।'

'পিসীরা তোমাকে ছেড়ে দিল কেমন করে?'

'কোলে সন্তান থাকলে সে দাসীকে কে রাখে? টের পেয়েই তারা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সে কথা বলে কি লাভ? আমার কিছুই মনে নেই। ও পাট একেবারেই চুকে গেছে।'

'না, চুকে যায় নি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করব।'

'প্রায়শ্চিত্ত করবার তো কিছু নেই। সে সব তো অতীতের কথা,' মাসলভা বলল। তারপর যা নেখ্‌লয়ুদভ কখনও আশা করে নি, সে তার দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিকর প্রলোভনের ভঙ্গীতে অথচ করুণভাবে হাসল।

তাকে আবার দেখতে পাবে, এ আশা মাসলভা কখনও করে নি, বিশেষ করে এখানে, এই সময়ে তো নয়ই। তাই প্রথম যখন তাকে চিনল তখন সেই সব স্মৃতি তার মনের মধ্যে ফিরে এল যাকে সে কোন দিন মনে করতে চায় নি। প্রথম মুহূর্তেই এলোমেলোভাবে তার মনে পড়ল অনুভব ও চিন্তার সেই আশ্চর্য নতুন জগৎকে যে জগতের দুয়ার তার সামনে খুলে দিয়েছিল এই মনোহর যুবক, যে তাকে ভালবাসত আর যাকে সেও ভালবাসত। আর তারপরেই মনে পড়ল তার দুর্বোধ্য নিষ্ঠুরতার কথা; মনে পড়ল সেই যাদুভরা আনন্দের পরবর্তীকালের সব অসম্মান ও দুঃখভোগের বিচিত্র কাহিনী। অন্তরটা ব্যথায় টনটনিয়ে উঠল। কিন্তু সেটা বুঝতে না পেরে সে এমন একটা কাজ করে বসল যা সে সাধারণত করে থাকে; একটা ঘৃণিত জীবনের কুয়াশা দিয়ে সে এইসব স্মৃতিকে ঢেকে দিতে চাইল। প্রথম মুহূর্তে তার পাশে বসা এই লোকটির মধ্যে সে দেখতে পেল সেই ছেলেটিকে যাকে সে ভালবেসেছিল; কিন্তু সে চিন্তায় দুঃখ পেয়ে সে আবার তাকে দূরে সরিয়ে দিল। মুখে সুগন্ধি দাড়ি এই সুসজ্জিত সুবেশ ভদ্রলোক আজ আর সে নেখ্‌লয়ুদভ নয় যাকে সে ভালবাসত, এ তো সেই সব মানুষেরই একজন যারা তার মত জীবকে প্রয়োজন মত কাজে লাগায়, আর সুযোগ এলে তাদেরও লাভজনকভাবে কাজ লাগানোই তার মত জীবদেরও উচিত। আর সেই জন্যই সে এখন তার দিকে চেয়ে প্রলোভনের ভঙ্গীতে হাসল। নীরবে সে ভাবতে লাগল, কেমন করে তাকে নিজের সুবিধার জন্য কাজে লাগাবে।

বলল, 'সে সব শেষ হয়ে গেছে। আমি এখন কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত।' এই ভয়ংকর কথাগুলি বলতে তার ঠোঁট কেঁপে উঠল।

'আমি জানতাম, আমি নিশ্চিত ছিলাম, তুমি দোষী নও', নেখ্‌লয়ুদভ

বলল।

'দোষী। নিশ্চয় নই। আমি কি চোর, না ডাকাত? ওরা তো বলে এখানে সব কিছুই নির্ভর করে অ্যাডভোকেটের উপর।' সে আরও বলল, 'একটা আপিল করা উচিত, তবে সেটা ব্যয়সাপেক্ষ।'

নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়। ইতিমধ্যেই অ্যাডভোকেটের সঙ্গে কথা বলেছি।'

'টাকার জন্য ভাবলে চলবে না! ভাল অ্যাডভোকেট হওয়া চাই।'

'সম্ভবপর সবকিছু করব।'

দুজনেই চুপ। একটু পরে সে আবার সেই হাসি হাসল।

'আর আপনার কাছে হাত পাততে চাই···যদি পারেন কিছু টাকা···বেশী নয়···দশ রুবল,' হঠাৎ সে বলে ফেলল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বিচলিতভাবে কথাগুলি বলে নেখ্‌লয়ুদভ ব্যাগে হাত দিল। ইন্সপেক্টর ঘরের মধ্যেই পায়চারি করছিল। মাসলভা চকিতে তার দিকে তাকাল।

'ওর সামনে দেবেন না; সব নিয়ে নেবে।'

ইন্সপেক্টর পিছন ফিরতেই নেখ্‌লয়ুদভ ব্যাগটা বের করল, কিন্তু নোটটা মাসলভার হাতে দেবার আগেই সে আবার মুখ ফেরাল; কাজেই সে নোটটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে দলা পাকিয়ে নিল।

যে মুখ একদা সুন্দর ছিল, কিন্তু এখন কলংকিত ও স্ফীত হয়ে গেছে, দুটি কালো টেঁরা চোখের অশুভ ঝলকানিতে যে মুখ এখন আলোকিত, সেই মুখের দিকে তাকিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ ভাবল, 'এ নারী তো মৃত।' মাসলভার চোখ দুটি তখনও একবার তাকাচ্ছে নোটশুদ্ধ হাতের দিকে, একবার তাকাচ্ছে ইন্সপেক্টরের চলাফেরার দিকে। মুহূর্তের জন্য নেখ্‌লয়ুদভ ইতস্তত করল।

তার ভিতর থেকে কে যেন চুপি চুপি বলে উঠল, 'এই নারী তোমার কোন কাজেই লাগবে না। এ তো তোমার গলায় একটা পাথর হয়ে ঝুলে থাকবে, তোমাকে ডুবিয়ে মারবে, তোমার দ্বারা অপর কারও কোন উপকার হবে না! তার চাইতে তোমার যত টাকা আছে সব তাকে দিয়ে দাও, তাকে বিদায় করে দাও, তার সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্ক চিরদিনের মত শেষ কর। সেটাই কি ভাল নয়? তবু সে বুঝতে পারল, এখন, ঠিক এই মুহূর্তে, তার মনের মধ্যে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটছে—যেন তার অন্তরাত্মা তুলাদণ্ডে দুলছে, ফলে সামান্যমাত্র চেষ্টাতেই যে কোন একদিকে ঝুঁকে পড়বে। আগের দিন নিজের অন্তরের মধ্যে যে ঈশ্বরের উপস্থিতি সে অনুভব করেছে তাঁর সহায়তা প্রার্থনা করে সেই চেষ্টাই সে করল। স্থির করল, এখন এই মুহূর্তেই তাকে সব কিছু খুলে বলবে।

'কাতয়ুশা, তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে আমিএসেছি, কিন্তু তুমি কোন জবাব দাও নি। তুমি কি আমাকে ক্ষমা করেছ? কোন দিন ক্ষমা করবে?' সে প্রশ্ন

করল।

মাসলভা তার কথায় কান দিল না; তার হাতের দিকে ও ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাতে লাগল। ইন্সপেক্টর মুখ ফেরাতেই সে হাত বাড়িয়ে নোটটা নিয়ে কোমড়-বন্ধনীর নীচে লুকিয়ে ফেলল।

মুখে ঘৃণার হাসি ফুটিয়ে বলল, 'আপনি যা বলছেন সব বাজে কথা।'

নেখ্‌ল্যুদভ বুঝতে পারল, মাসলভার অন্তরের মধ্যে এমন একজন আছে যে তার প্রতি বিরূপ, যে আজকের মাসলভাকে সমর্থন করছে, মাসলভার অন্তরে প্রবেশ করতে তাকে বাধা দিচ্ছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য সে বোধ তাকে দূরে সরিয়ে না দিয়ে বরং এক আশ্চর্য নতুন শক্তিতে তাকে মাসলভার আরও কাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে বুঝল, মাসলভার অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে তুলতে হবে; কাজটা ভীষণ কঠিন, তবু সেই ভীষণতাই তাকে আকর্ষণ করতে লাগল। মাসলভার প্রতি আজ তার যে অনুভূতি এমনটি সে আগে কখনও তার প্রতি বা অন্য কারও প্রতি বোধ করে নি। তার মনোবৃত্তিতে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কোন স্পর্শ নেই—তার কাছে নিজের জন্য সে কিছুই চায় না—সে শুধু চায় মাসলভা যেন এই অবস্থার মধ্যে আর পড়ে না থাকে, সে যেন আবার জেগে ওঠে, এবং একদিন যা ছিল তাই হতে পারে।

'কাত্যুশা, তুমি এভাবে কথা বলছ কেন? আমি তোমাকে জানি; তোমার সব কথা—পানোভা-র সেই পুরনো দিনগুলির কথা—সব আমার মনে আছে।'

সে শুকনো গলায় বলল, 'যা অতীত তাকে মনে রেখে লাভ কি?'

'মনে রেখেছি সব অন্যায় দূর করবার জন্য, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য; কাত্যুশা—' সে বলতে যাচ্ছিল সে তাকে বিয়ে করবে, কিন্তু তার চোখে চোখ পড়তে নেখ্‌ল্যুদভ সেখানে এমন ভয়ংকর রূঢ়, বিরূপ কিছু দেখতে পেল যে সে কথা আর বলা হল না।

এই সময়ে দর্শনার্থীরা যেতে শুরু করল। ইন্সপেক্টর নেখ্‌ল্যুদভের কাছে গিয়ে জানাল যে সময় হয়ে গেছে। ছাড়া পাবার অপেক্ষায় মাসলভা উঠে দাঁড়াল।

'বিদায়; তোমাকে অনেক কথা আমার বলার আছে; কিন্তু বুঝতেই পারছ এখনই তা সম্ভব হচ্ছে না।' এই কথা বলে নেখ্‌ল্যুদভ হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি আবার আসব।'

'আমার তো মনে হয় আপনি সব কথাই বলেছেন।'

মাসলভা তার বাড়ানো হাতখানা ধরল, কিন্তু চাপ দিল না।

'না; এমন কোন জায়গায় তোমার সঙ্গে আবার দেখা করতে চেষ্টা করব যেখানে দুজনে কথা বলতে পারব; আমার যা বলার আছে তখন তোমাকে

বলব—খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা।'

'ঠিক আছে, তাহলে আসুন; কি বলেন?' মাসলভা সেই হাসি হাসল যা দিয়ে সে মানুষকে খুশি করে থাকে।

'তুমি আমার কাছে বোনের চেয়েও বড়', নেখ্‌লুদভ বলল।

'বাজে কথা', মাসলভা আবারও বলল; তারপর মাথা নেড়ে জালের পিছনে চলে গেল।

অধ্যায়—৪৪

দেখা হবার আগে নেখ্‌লুদভ ভেবেছিল, কাতয়ুশা যখন দেখবে সে কতদূর অনুতপ্ত হয়েছে এবং সব রকমে তার সেবা করতে ইচ্ছুক, তখন সে খুশি হবে, অভিভূত হবে এবং আবার কাতয়ুশা হয়ে উঠবে; কিন্তু এখন সে এই জেনে আতংকিত হয়েছে যে কাতয়ুশার কোন অস্তিত্বই নেই, তার স্থান দখল করেছে মাসলভা। এতে তার বিস্ময় ও আতংকের শেষ নেই।

তাকে সব চাইতে বিস্মিত করেছে এই সত্য যে, কয়েদী হওয়া নয় (সে জন্য সে লজ্জিত), কিন্তু বেশ্যা হওয়ার জন্য সে মোটেই লজ্জিত নয়, বরং সে-অবস্থা নিয়ে সে সন্তুষ্ট, এমন কি গর্বিত। হয় তো সেটাই স্বাভাবিক। কাজ করতে হলে প্রত্যেককেই নিজ নিজ জীবিকাকে গুরুত্বপূর্ণ ও ভাল বলে মনে করতে হয়। তাই মানুষ যে অবস্থায়ই থাকুক তাকে মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে এমন একটা ধারণা অবশ্য করে নিতে হবে যাতে তার নিজস্ব জীবনযাত্রাকে গুরুত্বপূর্ণ ও ভাল বলে মনে হয়।

সাধারণতই ধরে নেওয়া হয় যে, একটি চোর, খুনী, গুপ্তচর, বা বেশ্যা সকলেই নিজ নিজ জীবিকাকে খারাপ মনে করে বলেই লজ্জিত বোধ করে। কিন্তু তার উল্টোটাই সত্যি। নিয়তি ও পাপের ভুল যখন মানুষকে একটা বিশেষ অবস্থায় নিয়ে যায়, তখন সে অবস্থাটা যতই নীচ ও মেকি হোক না কেন, সেই মানুষ সাধারণভাবে জীবন সম্পর্কে এমন একটা ধারণা গড়ে তোলে যাতে তার নিজের অবস্থাটাকে ভাল ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। জীবন সম্পর্কে এই ধারণাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য এই সব লোক স্বাভাবিক প্রবৃত্তির তাড়ণাতেই সমধর্মী মানুষের সঙ্গেই মেলামেশা করে, চলাফেরা করে। তাই যখন দেখি চোর তার কর্মকুশলতা নিয়ে গর্বপ্রকাশ করছে, বেশ্যা তার অধঃপতিত জীবনের জৌলুষ দেখাচ্ছে, খুনী তার নিষ্ঠুরতা নিয়ে দম্ভ প্রকাশ করছে, তখন আমরা বিস্মিত হই। কিন্তু আমাদের এই বিস্ময়ের আসল কারণ, যে সমাজে, যে পরিবেশে এই সব লোক বাস করে সেটা খুবই সীমিত এবং আমরা তার বাইরে বাস করি। কিন্তু ওই একই ঘটনা কি আমরা দেখতে পাই না, যখন ধনীরা তাদের সম্পদ নিয়ে—অর্থাৎ তাদের দস্যুতা নিয়ে গর্ব প্রকাশ করে; যখন সেনাবাহিনীর

অধিনায়করা তাদের বিজয়—অর্থাৎ হত্যা নিয়ে গর্ব প্রকাশ করে; এবং উচ্চপদে যারা অধিষ্ঠিত তারা যখন তাদের ক্ষমতা—অর্থাৎ হিংসার জৌলুস লোককে দেখায়? এই সব লোকের বিকৃত জীবন-ধারণা আমাদের চোখে পড়ে না কারণ এদের সমাজ অনেক বড়, আর আমরা নিজেরাও সেই সমাজের লোক।

মাসলভাও এইভাবেই তার জীবন-ধারণা ও অবস্থার মূল্যায়ন করে নিয়েছে। সে একটি বেশ্যা, কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত; তথাপি তার জীবন-ধারণাই তাকে নিজেকে নিয়ে খুশি থাকতে এবং স্বীয় অবস্থা নিয়ে গর্ববোধ করতে শিখিয়েছে।

তার ধারণা অনুসারে সব মানুষের—বৃদ্ধ, যুবক, ছাত্র, সেনাপতি, শিক্ষিত, অশিক্ষিত—সব মানুষেরই শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনোরমা নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা: সুতরাং সব মানুষই বাইরে অন্য কিছু নিয়ে ব্যাপৃত থাকার ভান করলেও আসলে আর কিছুই চায় না। সে একজন মনোরমা নারী, এই কামনা চরিতার্থ করা না করা তার ইচ্ছাধীন, আর সে জন্যই সে সমাজে একজন গুরুত্বপূর্ণ বাঞ্ছিত ব্যক্তি। তার সমস্ত অতীত ও বর্তমান জীবনই এই ধারণার সাক্ষী।

জীবনের বিগত দশটি বছর ধরে সে যেখানে গিয়েছে সেখানেই দেখেছে, নেখ্‌লয়ুদভ ও বৃদ্ধ পুলিশ-অফিসার থেকে কারাগারের রক্ষী পর্যন্ত সব পুরুষই তাকে চায়; যে সব পুরুষের তাকে দিয়ে কোন প্রয়োজন নেই তাদের সে কখনও লক্ষ্যও করে নি, তাদের কোন হিসাবও রাখে নি। সুতরাং তার মনে হয়েছে যে সমগ্র পৃথিবীটাই কামনাতাড়িত মানুষে ভর্তি। প্রতারণা, গায়ের জোর, টাকার জোর, বা চালাকি,—যে কোন উপায়ে তাকে লাভ করতে সকলেই সচেষ্ট।

মাসলভা জীবনটাকে এইভাবেই বুঝেছে; আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সে নীচ তো নয়ই বরং বেশ একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। মাসলভা এই দৃষ্টিকোণকেই বেশী মূল্যবান বলে মনে করে; মনে না করে উপায় নেই, কারণ এ জীবন-ধারণা হারিয়ে ফেললে তার নিজের গুরুত্বও হারিয়ে যাবে। তার নিজের জীবনের অর্থ যাতে হারিয়ে না যায়, সেই জন্য আর যারা তার মত দৃষ্টি দিয়েই জীবনটাকে দেখে স্বভাবতই সে তাদের দলেই ভিড়ে গেছে। নেখ্‌ল্‌-য়ুদভ তাকে অন্য এক জগতে নিয়ে যেতে চাইছে, সেখানে গেলে বর্তমান জীবনের গুরুত্বপূর্ণ আসন থেকে সে বিচ্যুত হয়ে পড়বে, এই আশংকায়ই সে নেখ্‌লয়ুদভকে বাধা দিয়েছে। সেই একই কারণে প্রথম যৌবনের স্মৃতিকে নেখ্‌লয়ুদভের সঙ্গে তার সম্পর্কের স্মৃতিকে সে মুছে ফেলেছে। ঐ সব স্মৃতি তার বর্তমান জীবন-ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না, তাই তাকে সে স্মৃতির পাতা থেকে সম্পূর্ণ কেটে দিয়েছে; অথবা হয় তো কোথাও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চাপা দেওয়া রয়েছে। আর যাতে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে সে জন্য পলস্তরা লাগিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ঠিক মৌমাছিরা যে ভাবে তাদের পরিশ্রমের

ফসলকে রক্ষা করবার জন্য মোমে-গড়া মৌচাককে পলস্তরা দিয়ে ঢেকে রাখে। কাজেই আজকের নেখ্‌লয়ুদভ সেই লোক নয় যাকে সে একদিন পবিত্র প্রেমে ভালবেসেছিল; আজ সে একজন ধনী ভদ্রলোকমাত্র; তাকে সে নিজের প্রয়োজনমত কাজে লাগাবে এবং সাধারণভাবে পুরুষের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তার সঙ্গেও সেই সম্পর্ক বজায় রেখে চলবে।

অন্য দর্শনার্থীদের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে যেতে নেখ্‌লয়ুদভ ভাবল, 'না, প্রধান কথাটাই তাকে বলা হল না; বলা হল না যে আমি তাকে বিয়ে করতে চাই; তাকে সে কথা বলি নি, কিন্তু আমাকে তা বলতেই হবে।'

দরজায় দুজন রক্ষী দর্শনার্থীরা বেরিয়ে যাবার সময় আবার তাদের গুণতে লাগল এবং প্রত্যেকের গায়ে একবার করে হাত লাগাল যাতে বাড়তি কোন লোক বাইরে যেতে না পারে বা ভিতরে না থাকতে পারে। কাঁধের উপর থাপ্পড় পড়লেও এবার কিন্তু নেখ্‌লয়ুদভের রাগ হল না; ব্যাপারটা সে খেয়ালই করল না।

অধ্যায়—৪৫

নেখ্‌লয়ুদভ চেয়েছিল তার বাহ্যিক জীবনের সব ব্যবস্থাকে নতুন করে সাজাতে: চাকরদের ছাড়িয়ে দেবে, বড় বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দেবে এবং একটা বাসা-বাড়িতে চলে যাবে; কিন্তু আগ্রাফেনা পেত্রভনা জানাল, শীতকালের আগে এসব পরিবর্তনের কোন অর্থ হয় না। গ্রীষ্মকালে শহরের বাড়ি কেউ ভাড়া নেবে না; তাছাড়া তাকেও তো বাস করতে হবে, জিনিসপত্র রাখতে হবে। কাজেই জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সব চেষ্টাই (সে চেয়েছিল ছাত্রদের মত আরও সাদাসিদেভাবে থাকতে) বিফল হল। শুধু যে যেমনটি ছিল তেমনই রইল তাই নয়, বরং সারা বাড়িটা যেন হঠাৎ নতুন কাজকর্মে ভরে উঠল। পশম ও ফারের তৈরি যা কিছু ছিল সব বাইরে বাতাসে দিয়ে পেটাই করা হল। দরোয়ান, ছোকরা-চাকর, রাঁধুনি, এমন কি করনেই পর্যন্ত তাতে যোগ দিল। নানা রকম অব্যবহৃত অদ্ভুত ফারের পোশাক আর নানা রকম সরকারী পোশাক বের করে সার বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল; কার্পেট ও আসবাবপত্র বের করা হল; দরোয়ান ও ছোকরা-চাকররা তাদের পেশীবহুল হাতের আস্তিন গুটিয়ে তালে তালে সেগুলিকে পিটতে লাগল। আর সমস্ত ঘর ন্যাপথলিনের গন্ধে ভরে উঠল।

নেখ্‌লয়ুদভ যখনই উঠোন পার হচ্ছে বা জানালা দিয়ে তাকাচ্ছে, তখনই এই সব কাণ্ডকারখানা তার চোখে পড়ছে। আর এত সব অদরকারী জিনিস বাড়িতে আছে দেখে বিস্মিত হচ্ছে। তার মনে হল, আগ্রাফেনা পেত্রভনা, করনেই, দরোয়ান, ছোকরা-চাকর ও রাঁধুনিকে শরীর চালনার সুযোগ করে

দেওয়াই বুঝি এ সব জিনিসের একমাত্র কাজ।

নির্দিষ্ট দিনে নেখ্‌লয়ুদভ অ্যাডভোকেট ফানারিনের মস্তবড় বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। বাড়িটা বড় বড় পাম ও অন্যান্য গাছ দিয়ে সাজানো; চমৎকার সব পর্দা ঝুলছে: অর্থাৎ সেই সব ব্যয়বহুল জাকজমক দিয়ে সাজানো যা অনেক সঞ্চিত অর্থের সাক্ষ্য বহন করে (বিনা শ্রমে অর্জিত অর্থ) এবং যে ধরনের জাকজমক শুধু হঠাৎ বড়লোকরাই দেখিয়ে থাকে। ডাক্তারদের বসবার ঘরে যেমন থাকে, এখানেও তেমনি বসবার ঘরে অনেক মন-মরা লোক টেবিলটা ঘিরে বসে আছে। তাদের খুশি করবার জন্য টেবিলের উপর অনেকগুলি সচিত্র পত্রিকা রাখা হয়েছে। কখন তাদের অ্যাডভোকেটের ঘরে ডাক পড়বে তারই অপেক্ষায় সকলে বসে আছে। অ্যাডভোকেটের সহকারী একটা উঁচু ডেস্কে বসেছিল। নেখ্‌লয়ুদভকে চিনতে পেরে সে এগিয়ে এসে বলল, এখনই তার নাম ডাকা হবে। সহকারী দরজা পর্যন্ত যাবার আগেই দরজা খুলে অ্যাডভোকেট বেরিয়ে এল।

'আরে, প্রিন্স নেখ্‌লয়ুদভ! দয়া করে ভিতরে আসুন', তাকে চিনতে পেরে এই কথাগুলি বলে ফানারিন তাকে নিয়ে নিজের সেরেস্তায় ঢুকল।

নেখ্‌লয়ুদভের বিপরীত দিকে বসে অ্যাডভোকেট বলল, 'ধূমপান করুন না?'

'ধন্যবাদ; আমি মাসলভার কেসের ব্যাপারে এসেছি।'

'দেখুন কেসটা আমি মনোযোগ দিয়ে পড়েছি এবং তুর্গেনিভের ভাষায় বলি, "তার বক্তব্য আমি সমর্থন করি না।" আমি বলতে চাই, কাঁচা অ্যাডভোকেটটি আপিল করার কোন সঙ্গত যুক্তিই রাখে নি।'

'তাহলে কি করা যায়?'

'এক মিনিট।' সহকারীটি এইমাত্র ঘরে ঢুকলে তার দিকে ফিরে বলল, 'ওকে বলে দাও, আমি যা বলেছি তাই হবে। যদি সে দিতে পারে, ভাল কথা; যদি না পারে, কোন কথা নেই।'

'কিন্তু সে রাজী হবে না।'

'বেশ তো, কোন কথা নেই।' তার প্রশান্ত ফুর্তিবাজ মুখখানি হঠাৎ গম্ভীর ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

'এই দেখুন!—ওদিকে সবাই বলে আমরা অ্যাডভোকেটরা না খেটে পয়সা নেই,' একটু পরে মুখের ভাবে পূর্বেকার প্রসন্নতা ফিরিয়ে এনে সে বলতে লাগল। 'একজন দেউলে লোককে মিথ্যা মামলা থেকে খালাস করার পর থেকেই সবাই আমার কাছে এসে ভীড় করছে। অথচ এ ধরনের প্রতিটি মামলায় কত খাটুনি খাটতে হয়। কে একজন লেখক বলেন নি যে, আমরাও "দোয়াত-দানিতে মাংস দিয়ে থাকি?"

'হ্যাঁ, আপনার কেসের কথা, মানে যে কেসটাতে আপনি আগ্রহী। মামলাটা অত্যন্ত বাজে ভাবে করা হয়েছে। আপিলের কোন সঙ্গত কারণই

নেই। তবুও দণ্ডাদেশ বাতিলের চেষ্টা আমরা অবশ্য করতে পারি। সেই কথাই আমি নোটে লিখেছি।'

লেখায় ভর্তি কয়েক তা কাগজ তুলে নিয়ে সে দ্রুত পড়তে লাগল। পড়ার সময় একঘেয়ে আইনের শব্দগুলো বাদ দিয়ে কতকগুলো দণ্ডাদেশের উপরেই বিশেষ জোর দিল।

'আপিল আদালত, ফৌজদারি বিভাগ সমীপেষু, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সিদ্ধান্ত অনুসারে ইত্যাদি, ইত্যাদি, রায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে বিষ-প্রয়োগের দ্বারা বণিক স্মেলকভের মৃত্যু ঘটাবার দায়ে মাসলভাকে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে এবং দণ্ডবিধির ১৪৫৪ ধারা মতে তাহাকে সশ্রম নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।'

সে পড়া বন্ধ করল। শুনতে অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও এখন নিজের সৃষ্ট এই সব দলিল শুনে এখনও সে আনন্দ পায়।

বেশ জোরের সঙ্গে সে আবার পড়তে শুরু করল। 'অত্যন্ত স্পষ্ট বিচার-বিভাগীয় ত্রুটি ও ভ্রান্তির প্রত্যক্ষ ফল এই দণ্ডাদেশ এবং এ আদেশ প্রত্যাহার করিয়া লওয়ার পক্ষে যুক্তি রহিয়াছে। প্রথমতঃ, স্মেলকভের অন্ত্র-পরীক্ষার ডাক্তারি প্রতিবেদন পাঠের গোড়াতেই প্রেসিডেন্ট বাধার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই হল পয়লা নম্বর পয়েণ্ট।'

নেখ্‌লয়ুদভ সবিস্ময়ে বলল, 'কিন্তু সরকার পক্ষই তো প্রতিবেদন পাঠের দাবি জানিয়েছিল।'

'তাতে কিছু যায় আসে না। আসামী পক্ষ থেকেও এ দাবী জানাবার যথেষ্ট কারণ থাকতে পারত।'

'আহা, তার তো কোন কারণই থাকতে পারে না।'

'তবু আপিলের স্বপক্ষে এটা একটা কারণ। তারপর, সে আবার পড়তে শুরু করল, "দ্বিতীয়তঃ মাসলভার অ্যাডভোকেট যখন আসামী পক্ষের সমর্থনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মাসলভার ব্যক্তিত্বকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করিয়া তুলিবার আশায় তাহার পতনের কারণ উল্লেখ করিতেছিলেন, তখনও প্রেসিডেন্ট মূল বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাইবার অভিযোগে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অথচ সেনেট বার বার বলিয়াছিলেন যে, ফৌজদারি মামলায় অপরাধীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অথবা তার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নির্ধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" এই হল দু'নম্বর পয়েণ্ট।' এ কথা বলে সে নেখ্‌লয়ুদভের দিকে তাকাল।

নেখ্‌লয়ুদভ অধিকতর বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, 'কিন্তু তার ভাষণ এতই খারাপ হয়েছিল যে তার মাথামুণ্ডু কেউ কিছু বুঝতেই পারে নি।'

ফানারিন হেসে বলল, 'লোকটা খুবই বোকা আছে, তাই এর চাইতে অর্থ-পূর্ণ কথা তার কাছে আশাও করা যায় না। কিন্তু সে যাই হোক, আপিলের যুক্তি হিসাবে বেশ চলে যাবে। "তৃতীয়তঃ, সমাপ্তি-ভাষণের সময় ফৌজদারি

দণ্ডবিধির ৮০১ ধারার ১নং উপধারার প্রত্যক্ষ অর্থকে উপেক্ষা করিয়া প্রেসিডেণ্ট এই অপরাধের আইনগত পয়েণ্টগুলি জুরিকে জানাইতেই ভুলিয়া গেলেন; এবং একথাও উল্লেখ করিলেন না যে, মাসলভা যে স্মেলকভকে বিষ খাইতে দিয়াছে সে কথা স্বীকার করিয়াও তাহার উপর খুনের অপরাধ না চাপাইবার অধিকার জুরির ছিল, কারণ ইচ্ছাকৃত ভাবে স্মেলকভের জীবননাশের কোন প্রমাণই ছিল না, জুরির এ কথা ঘোষণা করিবার অধিকার ছিল যে বণিকের মৃত্যু ঘটাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার অপরাধ এই যে তাহার অসাবধানতার জন্যই মৃত্যু ঘটিয়াছে।" এটাই আসল পয়েণ্ট।'

'তা ঠিক; কিন্তু একথা তো আমাদেরই জানা উচিত ছিল। এটা তো আমাদেরই ভুল।'

অ্যাডভোকেট থামল না। 'এবার চতুর্থ পয়েণ্ট। "যে আকারে জুরি তাহাদের রায় দিয়াছে তাহা আত্মবিরোধী। অর্থলোভের তাড়নায় ইচ্ছাকৃত ভাবে স্মেলকভকে বিষপ্রয়োগের অভিযোগে মাসলভাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে; খুনের ব্যাপারে সেইটেই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। জুরিরা তাহাদের রায়ে টাকা চুরির ইচ্ছা বা মূল্যবান দ্রব্যাদি চুরির সঙ্গে যুক্ত থাকিবার দায় হইতে তাহাকে অব্যাহতি দিয়াছে; ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে খুনের দায় হইতেও তাহাকে অব্যাহতি দেওয়ার ইচ্ছা তাহাদের ছিল, কিন্তু প্রেসিডেণ্টের সমাপ্তি-ভাষণের অসম্পূর্ণতার দরুণ ভুল বোঝাবুঝির ফলে জুরি তাহাদের রায়ে এই কথাটি যথাযথভাবে উল্লেখ করে নাই। সুতরাং জুরির এই ধরনের রায়ের ফলে ফৌজদারি আদালত কর্মবিধির ৮১৬ এবং ৮০৮ ধারার প্রয়োগ অর্থাৎ প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক জুরির কাছে তাহাদের ভুলের কৈফিৎ দাবী এবং বন্দিনীর অপরাধের প্রশ্নে নূতন করিয়া বিতর্ক ও রায় ঘোষণার দাবী অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে।"

'তাহলে প্রেসিডেণ্ট তা করলেন না কেন?'

ফানারিন হাসতে হাসতে বলল, 'আমিও তো তাই জানতে চাই, কেন।'

'তাহলে সেনেট নিশ্চয় তার ভুল সংশোধন করবে?'

'সেটা নির্ভর করছে তখনকার সভায় কে সভাপতিত্ব করবেন তার উপর।' বলেই সে আবার দ্রুতগতিতে পড়তে শুরু করল। "এই ধরনের রায়ের বলে মাসলভাকে অপরাধী হিসাবে শাস্তি দিবার এবং তার ক্ষেত্রে ফৌজদারি আদালত কর্মবিধির ৭৭১ ধারার ৩নং উপধারা প্রয়োগ করিবার কোন অধিকার আদালতের নাই। ইহাতে আমাদের ফৌজদারি আইনের মৌলিক নীতি-সমূহকে চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘন করা হইয়াছে। উল্লিখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে মহামান্য ইত্যাদি, ইত্যাদি-র নিকট আমি আবেদন করিতেছি যে ফৌজদারি আদালত কর্মবিধির ৯০৯, ৯১০, ৯১২ ধারা এবং ২নং ও ৯২৮ নং উপধারা মতে উক্ত রায় বাতিল করা হউক ইত্যাদি, ইত্যাদি····এবং আরও শুনানীর জন্য ঐ

একই আদালতের অন্য কোন বিভাগে মামলাটি প্রত্যর্পণ করা হউক।” হল তো। যা কিছু করা সম্ভব তা করা হল, কিন্তু খোলাখুলি বলছি, সাফল্য সম্পর্কে আমার আশা খুব কম, অবশ্য সবই নির্ভর করে সেনেটের উপস্থিত সদস্যদের উপর। সেখানে যদি কোন প্রতিপত্তি থাকে তো চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

'কাউকে কাউকে আমি জানি।'

'ঠিক আছে; তবে খুব তাড়াতাড়ি করবেন। নইলে সবাই হয়তো অর্শ সারাতে চলে যাবে, তখন কিন্তু তাদের ফিরে আসার জন্য তিনটি মাস অপেক্ষা করতে হবে। তারপরেও যদি হার হয়, বেশ তো, মহামান্য জারের কাছে আবেদন করা যাবে। সেখানেও পর্দার আড়ালে কিছু ঘোরাঘুরি চালাতে হবে। অবশ্য সে ক্ষেত্রেও আপনার সেবার জন্য আমি প্রস্তুত আছি—মানে আবেদনটা মুসাবিদা করে দেব, তবে আড়ালের ব্যাপারে আমি নেই।'

'ধন্যবাদ। আপনার ফি কত?'

'আমার সহকারী আপনাকে দরখাস্তটা দেবার সময়ই বলে দেবে।'

'আর একটা কথা। এই কয়েদির সঙ্গে কারাগারে দেখা করার জন্য ন্যায়াধীশ আমাকে একখানি অনুমতি-পত্র দিয়েছেন। কিন্তু ওরা বলছে, অন্য কোন সময়ে এবং অন্য কোন ঘরে দেখা করতে হলে গভর্ণরের অনুমতি নিতে হবে। সেটা কি সত্যি দরকার?'

'হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয়। কিন্তু এখন তো গভর্ণর বাইরে আছেন; তার জায়গায় একজন ভাইস-গভর্ণর আছেন। কিন্তু লোকটি এমনই আকাট বোকা যে তাকে দিয়ে কোন কাজই হবে না।'

'লোকটি কি মাস্‌লেনিকভ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তাকে চিনি,' বলে নেখ্‌লুদভ উঠে দাঁড়াল।

বাইরের ঘরে সহকারী তার হাতে লিখিত দরখাস্তখানা দিয়ে বলল যে তার ফি একহাজার রুবল। সে আরও জানাল, মিঃ ফানারিন সাধারণত এসব কাজ করেন না, শুধু নেখ্‌লুদভের খাতিরেই করেছেন।

'এ দরখাস্তটা কে সই করবে?'

'কয়েদী নিজেই করতে পারে, অথবা তাতে অসুবিধা থাকলে মিঃ ফানারিনও করতে পারেন।'

নেখ্‌লুদভ বলল, 'না, না, আমিই দরখাস্তটা তার কাছে নিয়ে যাব, সেই সই করে দেবে।' নির্দিষ্ট দিনের আগেই মাসলভার সঙ্গে দেখা করার একটা ছুতো পেয়ে সে খুশি হয়ে উঠল।

অধ্যায়—৪৬

যথাসময়ে কারারক্ষীর বাঁশি কারাগারের করিডরে-করিডরে ধ্বনিত হল, সেলের লোহার দরজাগুলি সশব্দে খুলে গেল। অনেক খালি পায়ের শব্দ শোনা গেল, অনেক গোড়ালির খটখট শব্দ উঠল, আর যে সব কয়েদী ঝাড়ুদারের কাজ করে তারা দুর্গন্ধে বাতাস ভারি করে করিডর দিয়ে চলে গেল। কয়েদীরা হাতমুখ ধুয়ে পোশাক পরে, পরিদর্শকের জন্য বাইরে এসে দাঁড়াল এবং তারপর চায়ের জন্য গরম জল আনতে গেল।

প্রাতরাশের সময় প্রতিটি সেল আলোচনায় সরগরম হয়ে উঠল। সেদিন যে দুজন কয়েদীকে চাবুক মারা হবে তাদের নিয়েই আলোচনা। তাদের একজন ভাসিল্য়েভ। লেখাপড়া জানা যুবক, করণিক, ঈর্ষার বশে প্রণয়িনীকে খুন করেছে। অন্য সব কয়েদী তাকে পছন্দ করে, কারণ সে হাসিখুশি ও উদার, এবং কারা-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবহারে খুব শক্ত। সে আইন-কানুন জানে এবং সেগুলো যাতে পালিত হয় তাই চায়। সুতরাং কারা-কর্তৃপক্ষ তাকে পছন্দ করে না।

তিন সপ্তাহ আগে একটা ঝাড়ুদার তার নতুন পোশাকে খানিকটা ঝোল ঢেলে ফেলেছিল বলে কারারক্ষী তাকে মেরেছিল। ভাসিল্য়েভ ঝাড়ুদারের পক্ষ নিয়ে বলেছিল, একজন কয়েদীকে মারধোর করা বেআইনী।

'তোকে আইন শিখিয়ে দেব,' বলে কারারক্ষী রেগে ভাসিল্য়েভকে গালাগালি করে। ভাসিল্য়েভও সমানে জবাব দেয়। ফলে কারারক্ষী তাকে মারতে উঠলে ভাসিল্য়েভ সজোরে তার হাত চেপে ধরে দু'তিন মিনিট পরে তাকে ধাক্কা মেরে ঘর থেকে বের করে দেয়। কারারক্ষী ইন্সপেক্টরের কাছে নালিশ করলে ভাসিল্য়েভকে নির্জন সেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

নির্জন সেল হচ্ছে বাইরে থেকে তালাবন্ধ এক-সার অন্ধকার খুপড়ি। তাতে খাটিয়া নেই, চেয়ার নেই, টেবিল নেই; কাজেই বাসিন্দাদের শুতে-বসতে হয় নোংরা মেঝেতে, আর সেলের প্রচুরসংখ্যক ইঁদুর তাদের গায়ের উপর দিয়েই চলাফেরা করে। ইঁদুরগুলি এতদূর সাহসী যে কয়েদীদের রুটি চুরি করে নেয় এবং তারা চুপচাপ থাকলেই আক্রমণ করেও থাকে। ভাসিল্য়েভ বলল, সে কোন অন্যায় করে নি, কাজেই নির্জন সেলে যাবে না। কিন্তু তারা গায়ের জোর খাটাতে লাগল। সেও বাধা দিল, আর দুজন কয়েদী তাকে রক্ষীদের হাত থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে গেল। রক্ষীরা সব ছুটে এল। তাদের মধ্যে একজন ছিল খুব শক্তিশালী। তার নাম পেত্রভ্। কয়েদীদের ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে নির্জন সেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণরকে খবর পাঠানো হল যে, বিদ্রোহের মত একটা ব্যাপার ঘটে গেছে; সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণর হুকুম পাঠাল, দুজন প্রধান অপরাধী ভাসিল্য়েভ ও ভবঘুরে নেপম্‌নামাস্কিকে

বার্চ কাঠের লাঠি দিয়ে ত্রিশ ঘা করে মারা হোক।

এই মারধোরের ব্যাপারটা হবে মেয়েদের ভিজিটিং-রুমে।

রাত থেকেই কারাগারের সর্বত্র কথাটা প্রচার হয়ে গিয়েছিল ; প্রতিটি সেলে সাড়ম্বরে সেই আলোচনাই চলছিল।

কোরাব্‌ল্য়ভা, খরশাভকা, ফেদসিয়া ও মাসলভা এক কোণে বসে চা খাচ্ছিল। ভদকা খেয়ে সকলেই বেশ চুর হয়ে আছে। মাসলভা ইদানিং প্রচুর ভদকা আনাচ্ছে আর সঙ্গিনীদের বিনা পয়সায় খাওয়াচ্ছে।

এমন সময় একটি কারারক্ষিনী এসে জানাল, একজন লোক মাসলভার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

মাসলভা চোখ টিপে বলল, 'আর এক ফোঁটা পেলে হত, মনটাকে চাঙ্গা করতে হবে তো।' করাব্‌ল্য়ভা আধ কাপ ভকদা ঢেলে দিল, মাসলভা খেয়ে নিল। তারপর মুখ মুছে 'মনটাকে চাঙ্গা করতে হবে তো' বলতে বলতে মাথাটা দুলিয়ে হাসতে হাসতে রক্ষিনীর পিছন পিছন করিডর দিয়ে চলে গেল।

অধ্যায়—৪৭

নেখ্‌ল্য়ুদভ অনেকক্ষণ যাবৎ হলে অপেক্ষা করছিল। কারাগারে পৌঁছেই সে প্রধান ফটকের ঘণ্টা বাজায় এবং কর্তব্যরত কারারক্ষীকে ন্যায়াধীশের দেওয়া অনুমতি-পত্রটা দেখায়।

'আপনি কার সঙ্গে দেখা করতে চান?'

'কয়েদী মাসলভা।'

'এখন তো হবে না ; ইন্সপেক্টর ব্যস্ত আছেন।'

'তিনি কি আপিসে আছেন?' নেখ্‌ল্য়ুদভ জিজ্ঞাসা করল।

রক্ষী একটু অপ্রস্তুতভাবে বলল, 'না, এই ভিজিটিং রুমে আছেন।'

'সে কি? আজ কি সাক্ষাতের দিন?'

'না, তবে একটা বিশেষ কাজ আছে।'

'আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। কি করতে হবে?' নেখ্‌ল্য়ুদভ বলল।

'ইন্সপেক্টর বেরিয়ে এলে তাকে বলবেন—একটু অপেক্ষা করুন' রক্ষী বলল।

ঠিক সেই সময় একজন সার্জেণ্ট-মেজর পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। তার পরিচ্ছন্ন চকচকে মুখে তামাকের ধোঁয়ার বিবর্ণ একজোড়া গোঁফ ; তার পোশাকের সোনালী দড়ি ঝকঝক করছে। কড়া গলায় সে রক্ষীকে বলল, 'যাকে-তাকে এখানে ঢুকতে দিয়েছ কেন? আপিসে—'

সার্জেণ্ট-মেজরের আচরণে একটা উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করে নেখ্‌ল্য়ুদভ বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমি শুনলাম যে ইন্সপেক্টর এখানেই আছেন।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ভিতরের দরজাটা খুলে গেল, আর উত্তপ্ত ঘর্মাক্ত দেহে বেরিয়ে এল পেত্রভ।

সার্জেন্ট-মেজরের দিকে ফিরে সে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'মনে রাখবেন।'

সার্জেন্ট-মেজর নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকাল। পেত্রভ ভুরু কুঁচকে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

নেখ্‌ল্যুদভ ভাবতে লাগল, 'কে মনে রাখবে? সবাইকে এত বিচলিত দেখাচ্ছে কেন? সার্জেন্ট-মেজর তার দিকেই বা তাকাল কেন?'

সার্জেন্ট-মেজর নেখ্‌ল্যুদভকে বলল, 'এখানে তো দেখা হবে না; দয়া করে আপিসে চলুন।'

এমন সময় পিছনের দরজা দিয়ে ইন্সপেক্টর বেরিয়ে এল। সে অনবরত নিঃশ্বাস টানছে। অধীনস্থ লোকদের চাইতেও তাকে বেশী বিচলিত দেখাচ্ছে। নেখ্‌ল্যুদভকে দেখে সে রক্ষীর দিকে তাকাল।

'ফেদতভ, মেয়েদের ওয়ার্ডের ৫নং সেলের মাসলভাকে আপিসে পাঠিয়ে দাও।'

তারপর নেখ্‌ল্যুদভের দিকে ফিরে বলল, 'অনুগ্রহ করে এদিকে আসবেন কি?' একটা খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে তারা একটা ছোট ঘরে ঢুকল। ঘরে একটিমাত্র জানালা। ইন্সপেক্টর বসল।

একটা সিগারেট বের করে বলল, 'ভারী শক্ত কাজ করতে হয়।'

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'বোঝাই যাচ্ছে, আপনি খুব ক্লান্ত।'

'এ চাকরিটাই ক্লান্তিকর—কাজও খুব কঠিন। ওদের যতই ভাল করতে চেষ্টা করা যায় ততই আরও খারাপ হয়। আমার একমাত্র চিন্তা কেমন করে এখান থেকে চলে যাব। বেশী কাজ, বড় বেশী কাজ।'

ইন্সপেক্টরের বিশেষ কষ্টটা যে কি নেখ্‌ল্যুদভ তা জানে না। কিন্তু আজ সে এতই বিষণ্ণ ও অসহায় অবস্থায় আছে যে দেখলে করুণা হয়।

বলল, 'হ্যাঁ, কাজটা কঠিন বলেই মনে হয়। তাহলে এ কাজ করছেন কেন?'

'পরিবার আছে, কিন্তু সঙ্গতি নেই।'

'কিন্তু কাজটা যদি এতই শক্ত হয়—'

'দেখুন, যতই হোক, কিছুটা কাজ তো করা যায়; যতটা পারি নরম ব্যবহার করতেই চেষ্টা করি। আমার জায়গায় অন্য কেউ এলে অবস্থাটা অন্য রকম দাঁড়াত। এখানে দু' হাজারেরও বেশী লোক আছে। আর সে যে কি সব লোক। কিন্তু তাদের নিয়েই চলতে হবে। যতই হোক, তারাও তো মানুষ; তাদের করুণা না করে কি পারা যায়। আবার তাদের হাতের মুঠোয়ও রাখা চাই।'

সম্প্রতি যে কয়েদীদের মধ্যে লড়াই বেধে গিয়েছিল এবং তাতে একজন

মারা গিয়েছিল, ইন্সপেক্টর সেই গল্প বলতে আরম্ভ করল।

একজন রক্ষীসহ মাসলভা ঘরে ঢোকায় গল্পে বাধা পড়ল।

মাসলভা ইন্সপেক্টরকে দেখবার আগেই নেখ্‌লুদভ দরজায় তাকে দেখতে পেয়েছিল। তার চোখ-মুখ লাল, টলতে টলতে হাঁটছে, মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসছে। ইন্সপেক্টরকে দেখেই সে বদলে গেল, ভয়ার্ত চোখে তার দিকে তাকাল; কিন্তু সে ভাব কাটিয়ে খুশি মনে সাহসের সঙ্গে নেখ্‌লুদভের সঙ্গে কথা বলল।

একটুখানি হেসে তার হাত ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে টেনে টেনে বলল, 'কেমন আছেন?'

যে রকম সাহসের সঙ্গে মাসলভা আজ তাকে সম্ভাষণ জানাল তাতে বিস্মিত হয়ে নেখ্‌লুদভ বলল, একটা দরখাস্ত এনেছি, তোমাকে সই করতে হবে। অ্যাডভোকেট দরখাস্তটা লিখে দিয়েছে। তুমি সই করবে, তারপর সেটাকে পিতার্সবার্গে পাঠিয়ে দেব।'

চোখটা টিপে সে হেসে বলল, 'আমার আপত্তি নেই। আপনার যেমন খুশি।'

পকেট থেকে একখানা ভাঁজ-করা কাগজ বের করে নেখ্‌লুদভ টেবিলের কাছে গেল।

ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে এসে সইটা করতে পারে কি?'

ইন্সপেক্টর বলল, 'হ্যাঁ, এখানে বস। কলম নাও। তুমি লিখতে পার তো?'

'এককালে পারতাম', সে বলল; স্কার্ট ও জ্যাকেটের আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে সে হেসে টেবিলের পাশে গিয়ে বসল, ছোট হাতটা বাড়িয়ে অদ্ভুতভাবে কলমটা নিল, তারপর নেখ্‌লুদভের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

কোথায় সই করতে হবে নেখ্‌লুদভ দেখিয়ে দিল।

মাসলভা দোয়াতে কলম ডুবিয়ে সযত্নে কয়েক ফোঁটা কালি ঝেড়ে ফেলে নিজের নামটা লিখল।

প্রথমে নেখ্‌লুদভের দিকে এবং তারপরে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে, কলমটা একবার দোয়াত-দানিতে, একবার কাগজের উপর রাখতে রাখতে প্রশ্ন করল, 'সব হল তো?'

তার হাত থেকে কলমটা নিয়ে নেখ্‌লুদভ বলল, 'তোমাকে কয়েকটা কথা বলবার আছে।'

সে বলল, 'ঠিক আছে; বলুন।' তারপরই হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় অথবা ঘুম পাওয়ায় সে খুব গম্ভীর হয়ে গেল।

ইন্সপেক্টর উঠে ঘর থেকে চলে গেল। রইল শুধু নেখ্‌লুদভ ও মাসলভা।

অধ্যায়—৪৮

যে রক্ষী মাসলভাকে নিয়ে এসেছিল সে তাদের থেকে কিছুটা দূরে জানালার বাজুতে বসে ছিল।

নেখ্‌লয়ুদভের সামনে চরম মুহূর্ত সমাগত। প্রথম সাক্ষাতেই আসল কথাটা না বলার জন্য সে অনবরত নিজেকেই দোষ দিচ্ছিল, তাই সে যে তাকে বিয়ে করতে চায় সে কথা বলতে আজ সে দৃঢ়সংকল্প। টেবিলের এক কোণে মাসলভা বসে আছে। তার উল্টো দিকে বসেছে নেখ্‌লয়ুদভ। ঘরে বেশ আলো আছে। নেখ্‌লয়ুদভ এই প্রথম খুব কাছে থেকে তার মুখ দেখতে পেল। সে স্পষ্ট দেখতে পেল, মাসলভার চোখের নীচে কালি পড়েছে, মুখখানা বলি-রেখায় ভর্তি, চোখের পাতা ফুলো-ফুলো। তার মন করুণায় ভরে উঠল।

ধুসর গোঁফওয়ালা ইহুদী জাতীয় রক্ষীটি যাতে শুনতে না পায় সেজন্য টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে নেখ্‌লয়ুদভ বলল :

'এ দরখাস্তে যদি ফল না হয় আমরা সম্রাটের কাছে আবেদন জানাব। যা কিছু সম্ভব সবই করা হবে।'

মাসলভা বাধা দিল, 'তবেই দেখুন, প্রথম থেকেই যদি একজন ভাল অ্যাডভোকেট থাকত। আমার কৌসুলিটা তো একেবারেই বোকা। সে আমার প্রশংসা করা ছাড়া আর কিছুই করল না,' এই কথা বলে সে হাসতে লাগল। 'তখন যদি জানতাম যে আমি আপনার পরিচিত তাহলে তো ব্যাপারটা অন্যরকম হত। তারা তো মনে করে সকলেই চোর।

'আজ সে কত বদলে গেছে,' এই কথা ভেবে নেখ্‌লয়ুদভ তার মনের কথা বলতে শুরু করল, 'আগের বারে তোমাকে কি বলেছিলাম মনে আছে?'

মাথাটা এ-পাশ ও-পাশ দোলাতে দোলাতে হেসে হেসে সে বলল, 'সেদিন তো আপনি অনেক কথাই বলেছেন। কি বলেছিলেন বলুন তো?'

'বলেছিলাম, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

'তাতে কি লাভ? ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, তাতে হবেটা কি? বরং ভাল হত যদি—'

'শুধু কথা নয়, কাজের ভিতর দিয়ে আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। আমি স্থির করেছি, তোমাকে বিয়ে করব।'

হঠাৎ তার সারা মুখে আতংক ফুটে উঠল। তার টেঁরা চোখ দুটি তার উপরেই স্থিরনিবদ্ধ হয়ে রইল, অথচ মনে হল, সে যেন তাকে দেখছে না।

সক্রোধে ভ্রূকুটি করে সে বলে উঠল, 'তাতে কি হবে?'

'আমি মনে করি, একাজ করা ঈশ্বরের প্রতি আমার কর্তব্য।'

'এতদিনে কোন ঈশ্বরকে খুঁজে পেলেন? আপনার কথাগুলি অর্থহীন।

ঈশ্বর বটে! কোন্ ঈশ্বর? ঈশ্বরকে স্মরণ করা উচিত ছিল সেদিন,' কথাগুলি শেষ করেও মাসলভা হাঁ করে রইল।

এতক্ষণে নেখ্‌ল্যুদভ বুঝতে পারল যে তার নিঃশ্বাসে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে; মাসলভার উত্তেজনার কারণ সে বুঝতে পারল।

'শান্ত হতে চেষ্টা কর,' সে বলল।

'কেন শান্ত হব? ভাবছেন মাতাল হয়েছি? হ্যাঁ। আমি মাতাল, কিন্তু আমি কি বলছি তা জানি!' অতি দ্রুত সে কথাগুলি বলতে লাগল। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। 'আমি কয়েদী, আমি বেশ্যা, আর আপনি ভদ্রলোক, আপনি প্রিন্স। আমাকে ছুঁয়ে আপনাকে নোংরা হতে হবে না। আপনার রাজকুমারীর কাছে চলে যান, আমার দাম তো একখানা দশ রুবলের নোট।'

'যতই নিষ্ঠুরভাবে কথা বল, আমার মনের ভাব তুমি প্রকাশ করতে পারবে না।' কথা বলবার সময় তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। 'তোমার প্রতি অন্যায় করেছি এ বোধ যে আমার মনে কত গভীর তা তুমি কল্পনাও করতে পার না।'

নেখ্‌ল্যুদভের কথার নকল করে মাসলভা রেগে বলল, 'কত অন্যায় করেছেন! সেদিন তো তা মনে করেন নি, বরং আমাকে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন একশ' রুবল। সেটাই তো···আপনার দাম!'

'আমি জানি, আমি জানি; কিন্তু এখন কি কর্তব্য? আমি স্থির করেছি, তোমাকে ছেড়ে যাব না, যা বললাম তাই করব।'

'আর আমি বলি, তা করবেন না,' বলেই সে হো-হো করে হেসে উঠল।

'কাত্যুশা!' তার হাতখানি ধরে সে ডাকল।

'আপনি চলে যান। আমি কয়েদী আর আপনি প্রিন্স। এখানে আপনার কিছুই করবার নেই।' সে চীৎকার করে বলল। ক্রোধে তার সমস্ত চেহারাটাই বদলে গেছে। হাতটাও সে টেনে নিল।

কি মনে করে সে আবার বলে উঠল, 'আমাকে দিয়ে আপনি নিজেকে বাঁচাতে চাইছেন। এ জন্মে আমাকে দিয়ে মজা লুটেছেন, আর পরজন্মে আমাকে দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চাইছেন। আপনাকে আমি ঘৃণা করি—আপনার চশমা, আপনার ঐ নোংরা মুখ, সব কিছু। চলে যান, চলে যান।' আর্তনাদ করে সে উঠে দাঁড়াল।

রক্ষী এগিয়ে এল।

'কী হৈ চৈ শুরু করেছেন আপনারা? এ চলবে না—'

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'ওর কথায় কান দিও না।'

রক্ষী বলল, 'তাই বলে নিজেকে ভুললে তো চলবে না।'

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'আর একটু অপেক্ষা কর ভাই।' রক্ষী আবার জানালায় ফিরে গেল।

'মাসলভা আবার বসে পড়ল। চোখ নামিয়ে দুখানি ছোট ছোট হাত আঁকড়ে ধরল। কি করবে বুঝতে না পেরে নেখ্লয়ুদভ তার উপরে ঝুঁকে দাঁড়াল।

'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করছ না?'

'আপনি আমাকে বিয়ে করতে চান এই কথা? সে কোন দিন হবে না। তার আগে আমি ফাঁসিতে ঝুলব। চলে যান।'

'যাই বল, আমি তোমাকে সেবা করে যাব।'

'সেটা আপনার ব্যাপার, কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে কিছুই চাই না। এই হল খাঁটি কথা।'

'হায়, তখন কেন আমার মৃত্যু হল না,' একটু পরেই এই কথা বলে মাসলভা করুণভাবে কাঁদতে লাগল।

নেখ্লয়ুদভ কোন কথা বলতে পারল না। ওর চোখের জল তাকে বিহ্বল করেছে।

মাসলভা চোখ তুলে অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগল। হাতের রুমাল দিয়ে চোখ মুছল।

রক্ষী আবার এগিয়ে এসে জানাল, সময় হয়ে গেছে। মাসলভা উঠে দাঁড়াল।

'তুমি আজ খুব উত্তেজিত। সম্ভব হলে আমি কাল আবার আসব—কথাটা ভেবে দেখ,' নেখ্লয়ুদভ বলল।

মাসলভা কোন জবাব দিল না। চোখ না তুলেই রক্ষীর পিছন পিছন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেলে ফিরে সে সঙ্গিনীদের কোন কথার জবাব দিল না। তক্তার উপর শুয়ে ট্যারা চোখ দুটিকে ঘরের এক কোণে নিবদ্ধ রেখে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটিয়ে দিল।

তার মনের মধ্যে একটি বেদনার্ত সংগ্রাম চলছে। নেখ্লয়ুদভের কথায় সেই জগতের কথা তার মনে পড়ে গেল যেখানে অনেক যন্ত্রণা সে সহ্য করেছে, যে জগৎকে সে ঘৃণায় ত্যাগ করে এসেছে। যে মোহগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে এতদিন সে বেঁচেছিল, আজ সে মোহ ভেঙে সে জেগে উঠেছে। কিন্তু সে স্মৃতিকে মনের মধ্যে পুষে রেখে বেঁচে থাকাও যে অসম্ভব। সে যে বড় কষ্টের কাজ। তাই রাত হতেই সে আরও খানিকটা ভদকা কিনে এনে সঙ্গিনীদের সঙ্গে খেতে বসে গেল।

অধ্যায়—৪৯

কারাগার থেকে যেতে যেতে নেখ্‌লুয়ুদভ ভাবতে লাগল, 'এই তাহলে এর অর্থ—এই।' যেন এতদিনে নিজের অপরাধের গুরুত্ব সে বুঝতে পেরেছে। প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা না করলে নিজের দোষের গুরুত্ব সে কোন দিনই বুঝতে পারত না। শুধু তাই নয়, মাসলভাও বুঝতে পারত না তার প্রতি কী অন্যায় করা হয়েছে। সে অন্যায় যেন এতদিনে তার সমস্ত ভয়াবহতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এতদিনে নেখ্‌লুয়ুদভ যেমন বুঝতে পেরেছে এই নারীর আত্মার প্রতি কী অপরাধ সে করেছে, তেমনি মাসলভাও বুঝতে পেরেছে কতখানি অন্যায় তার প্রতি করা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত নেখ্‌লুয়ুদভ একরকম আত্ম-স্তুতিতে মগ্ন ছিল, খুশি ছিল নিজের বিষাদকে নিয়ে; কিন্তু এখন তার সারা মন আতংকে ভরে উঠেছে। সে জানে, মাসলভাকে আর সে ত্যাগ করতে পারে না, অথচ তাদের সম্পর্কের পরিণতি যে কি তাও সে কল্পনা করতে পারে না।

ঠিক বের হবার মুখে বুকের উপর ক্রশ ও মেডেল ঝোলানো একটি কারারক্ষী রহস্যের মত এসে হাজির হয়ে তার হাতে একটা চিরকুট দিল।

খামটা নেখ্‌লুয়ুদভের হাতে দিয়ে বলল, 'মাননীয় মহাশয়, একজন লোক এই চিঠিটা দিয়েছে।'

'কে লোক?'

'পড়লেই জানতে পারবেন। একজন রাজনৈতিক বন্দী। আমি সেই ওয়ার্ডে আছি, তাই আমাকেই দিতে বললেন; যদিও এটা আইনবিরুদ্ধ, তবু মানবতার খাতিরে…' কারারক্ষী অস্বাভাবিকভাবে কথাগুলি বলল।

রাজনৈতিক বন্দীদের ওয়ার্ডের কোন রক্ষী কারা-প্রাচীরের ভিতরেই চিঠি চালাচালি করছে, আর তাও সকলের প্রায় চোখের সামনে, এতে নেখ্‌লুয়ুদভ বিস্মিত হল। সে তখন জানত না যে লোকটি রক্ষী এবং গুপ্তচর দুই-ই। যা হোক, চিরকুটটা হাতে নিয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে সেটা সে পড়ল।

মোটা মোটা অক্ষরে লেখা আছে: 'আপনি এ কারাগারে আসেন এবং কোন ফৌজদারী আসামীর ব্যাপারে আপনি আগ্রহী, এ কথা জেনে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করবার ইচ্ছা আমার মনে জেগেছে। আমার সঙ্গে দেখা করার একটা অনুমতি-পত্রের জন্য আবেদন করুন। অনুমতি আপনি পাবেন। আপনার অনুগৃহীত ব্যক্তির তথা আমাদের দলের সম্পর্কে আপনার প্রয়োজনীয় অনেক কথাই আমি বলতে পারি।—আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতাসহ ভেরা দুখোভা।'

ভেরা দুখোভা ছিল নভগরদ জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামের একজন স্কুল-

শিক্ষয়িত্রী। একসময় নেখ্‌ল্যুদভ ও তার কয়েকজন বন্ধু ভালুক-শিকার উপলক্ষ্যে সেই গ্রামে কিছুদিন ছিল, সেই সময় একটা পাঠ-ক্রমে যোগ দেবার জন্য মেয়েটি নেখ্‌ল্যুদভের কাছে কিছু অর্থ চেয়েছিল। টাকাটা সে দিয়েছিল এবং তারপর সে কথা ভুলেও গিয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, সেই মেয়েটি এই কারাগারেই একজন রাজনৈতিক বন্দী এবং তাকে সাহায্য করতে আগ্রহী।

তখন সব কিছুই কেমন সহজ ও সরল ছিল, আর আজ সব কিছুই কেমন কঠিন ও জটিল হয়ে উঠেছে।

সেই দিনগুলির কথা, দুখোভার সঙ্গে তার পরিচয়ের কথা খুব স্পষ্টভাবেই নেখ্‌ল্যুদভের মনে পড়ে গেল। স্থানটা ছিল লেণ্ট-এর কাজে রেলস্টেশন থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। শিকার বেশ ভালই হয়েছিল—দুটো ভালুক মারা হয়েছিল আর ফিরতি যাত্রার প্রাক্কালে তারা সদলে খাবার খাচ্ছিল, এমন সময় বাড়ির মালিক এসে জানাল, পুরোহিতের মেয়ে প্রিন্স নেখ্‌ল্যুদভের সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়।

কে একজন বলে উঠল, 'দেখতে সুন্দরী তো?'

'দয়া করে ও সব কথা বলো না,' এই কথা বলে নেখ্‌ল্যুদভ গম্ভীর মুখে উঠে গেল। মুখটা ধুয়ে পুরোহিতের মেয়ের তার কাছে কি দরকার থাকতে পারে ভাবতে ভাবতে বাড়ির মালিকের অংশে গিয়ে হাজির হল।

সেখানে পশমি টুপি ও গরম জোব্বা পরা একটি মেয়েকে দেখতে পেল। পেশীবহুল কুৎসিত চেহারা; শুধু বাঁকা ভুরুসমন্বিত চোখ দুটি সুন্দর।

মালিকের বৃদ্ধা স্ত্রী বলল, 'এই যে মেয়ে, কথা বল; ইনিই প্রিন্স। আমি বাইরে যাচ্ছি।'

'আমি কি ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি? নেখ্‌ল্যুদভ জিজ্ঞাসা করল।

খুবই অপ্রস্তুত হয়ে মেয়েটি বলল, 'আমি…আমি…আমি দেখছি আপনি খুব ধনী; এই সব বাজে কাজ— শিকারের পিছনে অনেক টাকা খরচ করেন। আমি জানি….একটি মাত্র জিনিস আমি চাই….যাতে আমি লোকের কোন কাজে লাগতে পারি; আমি তো কিছুই জানি না, তাই কিছু করতেও পারি না।'

তার চোখ দুটি এত সহজ, এত করুণ, তার মুখের দৃঢ় অথচ লাজুক ভঙ্গী এতই মনোরম যে নেখ্‌ল্যুদভ যেন হঠাৎ নিজেকে তার জায়গায় বসিয়ে তাকে বুঝতে পারল, তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল।

'আপনার জন্য কি করতে পারি?'

'আমি একজন শিক্ষিকা, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার আমার খুব ইচ্ছা, কিন্তু পড়তে পারছি না। মানে, আমার পড়ায় কেউ বাধা দিচ্ছে তা নয়; অনুমতি ওরা দেবে, কিন্তু আমার সামর্থ্য নেই। আপনি আমাকে সেই টাকাটা দিন,

পাঠক্রম শেষ করে সে টাকা আমি শোধ করে দেব। আমি ভাবছিলাম, ধনীরা ভালুক মারে, চাষীদের মদ খাওয়ায়, এ সবই তো বাজে কাজ। কেন তারা ভাল কাজ করবে না? আমি আপনার কাছে আশি রুবল মাত্র চাই ....অবশ্য যদি আপনি দিতে না চান তো কোন কথা নেই,' শেষের কথাগুলি সে হঠাৎ বলে ফেলল।

'ঠিক উল্টো; এই সুযোগটা দেবার জন্য আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এখনই টাকাটা এনে দিচ্ছি,' বলল নেখ্‌ল্যুদভ।

বাইরে বেরিয়ে দালানেই জনৈক সঙ্গীর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। তার কোন কথায় কান না দিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ টাকাটা বের করে নিয়ে মেয়েটিকে দিল।

বলল, 'না, না, ধন্যবাদ দেবেন না। আমারই উচিত আপনাকে ধন্যবাদ জানানো।'

সেদিনের কথা মনে করে আজ কী ভালই লাগছে। মনে পড়ছে, একজন অফিসার এই নিয়ে আপত্তিকর ঠাট্টা করাতে তার সঙ্গে প্রায় ঝগড়াই হয়ে গিয়েছিল; আবার এ ব্যাপারে অপর এক বন্ধু তার পক্ষ সমর্থন করায় তার সঙ্গে বন্ধুত্ব আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। সেবারকার শিকার-অভিযান কী সফলই না হয়েছিল! সে রাতে রেলওয়ে স্টেশনে ফিরবার পথে সে কী সুখীই বোধ করেছিল।

দুই ঘোড়ায় টানা স্লেজগুলি সংকীর্ণ বনের পথ ধরে সার বেঁধে দ্রুত ছুটে চলেছে, কখনও বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়ে, কখনও বা শাখায় শাখায় জমে থাকা বড় বড় বরফের চাঁইয়ের চাপে নুয়ে পড়া নীচু ফার গাছের ভিতর দিয়ে। অন্ধকারে হঠাৎ একটা লাল আলো ঝলসে উঠছে; কে যেন একটা সুগন্ধি সিগারেট ধরাল। ভালুক-চালক অসিফ এক হাঁটু বরফ ভেঙে একটা স্লেজ থেকে আর একটা স্লেজ-এ যাচ্ছে; সব ঠিকঠাক করে দিয়ে কখনও হরিণের গল্প বলছে, পুরু বরফের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে তারা অ্যাসপেন গাছের বাকলে গা ঘসছে; কখনও বা ভালুকের গল্প বলছে: লুকনো গাছের মধ্যে তারা ঘুমিয়ে আছে, গর্তের ফাঁক দিয়ে তাদের গরম নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছে।

সব কথাই নেখ্‌ল্যুদভের মনে পড়ছে, বিশেষ করে মনে পড়ছে স্বাস্থ্য, শক্তি ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের আনন্দের কথা। বরফ-গলা বাতাসে সে নিঃশ্বাস নিচ্ছে; গাছের নীচু ডাল থেকে ছোট ছোট বরফের টুকরো মুখের উপর ঝরে পড়ছে; তার শরীর উষ্ণ, মুখ সতেজ, তার আত্মা দুশ্চিন্তা, অনুশোচনা, ভয় বা বাসনা থেকে মুক্ত—কী সুন্দর সে দিনগুলি। আর এখন, হে ঈশ্বর! কী যন্ত্রণা, কী ঝঞ্ঝাট!

বোঝাই যাচ্ছে, ভেরা দুখোভা একজন বিপ্লবী, আর সেই জন্যই বন্দী

হয়েছে। তার সঙ্গে দেখা করতেই হবে, বিশেষ করে সে যখন মাসলভার ব্যাপারে পরামর্শ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

অধ্যায়—৫০

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আগের দিন সে কি কি করেছে সে কথা মনে পড়তেই নেখ্‌ল্যুদভ ভীত হয়ে পড়ল।

কিন্তু সে ভয় সত্ত্বেও সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যে কাজ শুরু করেছে তাকে শেষ করবেই।

কর্তব্যবুদ্ধিতে সচেতন হয়ে সে মাসলেনিকভের সঙ্গে দেখা করতে গেল। তার কাছ থেকে মাসলভার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি সংগ্রহ করতে হবে। তাছাড়া, তুখোভার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতিও সে চাইবে, কারণ মাসলভার ব্যাপারে তার কাছ থেকে সহায়তা পাওয়া যেতে পারে।

মাসলেনিকভের সঙ্গে নেখ্‌ল্যুদভের পরিচয় অনেক দিনের। সেনাবাহিনীতে তুজন একসঙ্গেই ছিল। সে সময় মাসলেনিকভ ছিল সেনাদলের বেতন দেবার কর্তা। সে ছিল দয়ালু-হৃদয় উচ্চাকাংখী অফিসার, সেনাবাহিনী ও রাজ-পরিবারের বাইরে সে কিছুই জানত না, জানতে চাইতও না। এখন সে সেনাবাহিনী থেকে শাসন বিভাগে চলে এসেছে। সে একটি ধনী উদ্যমশীলা মহিলাকে বিয়ে করেছে, আর সেই তাকে জোর করে এ বিভাগে আনিয়েছে।

নেখ্‌ল্যুদভকে দেখেই মাসলেনিকভের সারা মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। লোকটি এক রকমই আছে। সেই চর্বি, সেই লাল মুখ, আর সামরিক দিনগুলির মতই স্থূলকায় ও পরিপাটি পোশাক। বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও (মাসলেনিকভের বয়স ছিল চল্লিশ) তুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় গড়ে উঠেছিল।

'হ্যাল্লো বন্ধু! কী সৌভাগ্য তুমি এসেছ! চল, আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে। সভা আরম্ভ হবার আগে দশ মিনিট সময় আমার হাতে আছে। জান, আমার উপরওয়ালা এখন বাইরে, কাজেই আমিই এখন জেলার শাসন বিভাগের প্রধান,' সে এমনভাবে কথাগুলি বলল যেন নিজের খুশিটাকে চেপে রাখতে পারছে না।

'আমি একটা কাজে এসেছি।'

হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেল মাসলেনিকভ, একটু কড়া গলায় প্রশ্ন করল, 'কি কাজ?'

'আমি বিশেষভাবে জড়িত এমন একজন কারাগারে রয়েছে ('কারাগার' শব্দটা শুনেই মাসলেনিকভের মুখ আরও শক্ত হয়ে উঠল); তার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই, সাধারণ ভিজিটিং-রুমে নয়, আপিসে, আর নির্দিষ্ট দিনেও নয়। আমি শুনেছি, ব্যাপারটা তোমার উপর নির্ভর করে।'

'নিশ্চয় প্রিয় বন্ধু, তোমার জন্য আমি সব করব,' নেখ্‌লুদভের হাঁটুর উপর দুটো হাত রেখে মাসলেনিকভ বলল, 'কিন্তু মনে রেখ, আমি এক ঘণ্টার বাদশা।'

'তাহলে এমন একটা আদেশ-নামা আমাকে দাও যাতে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারি।'

'কোন স্ত্রীলোক কি?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে এসেছে কেন?'

'বিষ খাওয়ানোর অভিযোগে, কিন্তু তাকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।'

'ঠিক, ঠিকই ধরেছ, এই তো তোমাদের ন্যায়নিষ্ঠ জুরি প্রথা, **ils n'en font point d'autres** (তারা অন্য কিছু করতে পারে না)' কোন অজ্ঞাত কারণে সে ফরাসিতে কথাগুলি বলল। 'আমি জানি তুমি আমার সঙ্গে একমত হবে না, কিন্তু কোন উপায় নেই, **c'est mon opinion bien arretee** (এটা আমার একান্ত স্থির বিশ্বাস),' সে আরও বলল। গত বারো মাস যাবৎ একটা প্রতিক্রিয়াপন্থী রক্ষণশীল সংবাদপত্রে যে মতবাদটা সে পড়ে আসছে তারই পুনরাবৃত্তি সে করল। 'আমি জানি তুমি একজন উদারপন্থী।'

নেখ্‌লুদভ হেসে বলল, 'আমি উদারপন্থী কি না জানি না।' সে বিশ্বাস করে যে, বিচারের আগে প্রত্যেকটি লোককে তার কথা বলতে দেওয়া উচিত, দণ্ডদানের আগে পর্যন্ত আইনের চোখে সব মানুষই সমান; কোন মানুষের সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করা বা তাকে মারধোর করা উচিত নয়, বিশেষ করে যারা এখনও দণ্ডিত হয় নি। যখনই সে মুখে এই সব কথা বলেছে তখনই তাকে একটি রাজনৈতিক দলভুক্ত করে তাকে উদারপন্থী আখ্যা দেওয়া হয়েছে দেখে নেখ্‌লুদভ বারবারই বিস্ময় বোধ করেছে। 'আমি উদারপন্থী কি না জানি না; তবে এটা জানি যে বর্তমান ব্যবস্থা যতই খারাপ হোক, এটা পুরনো ব্যবস্থা অপেক্ষা ভাল।'

'অ্যাডভোকেট হিসাবে কাকে ধরেছ?'

'ফানারিনের সঙ্গে কথা বলেছি।'

'হায়রে, ফানারিন!' মুখ বেঁকিয়ে মাসলেনিকভ বলে উঠল। তার মনে পড়ল, বছরখানেক আগে একটা মামলার সাক্ষী হিসাবে জেরা করার সময় প্রায় আধঘণ্টা ধরে খুবই ভদ্রভাবে সে তাকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল।

'আমার পরামর্শ হল, তার সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ রাখবে না। ফানারিন **est sin homme tare'** (লোকটা অত্যন্ত খারাপ)।'

সে কথার জবাব না দিয়ে নেখ্‌লুদভ বলল, 'আমার আর একটা অনুরোধ

আছে। একটি তরুণীকে আমি অনেকদিন আগে চিনতাম, একটি শিক্ষিকা—বেচারির জন্য দুঃখ হয়—এখন সেও বন্দী। আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তার জন্যও একটা অনুমতি-পত্র কি দিতে পারবে?'

মাসলেনিকভ ঘাড়টা একদিকে কাত করে একটু ভাবল।

'রাজনৈতিক বন্দী কি?'

'হ্যাঁ, সেই রকমই শুনেছি।'

'দেখ, শুধু আত্মীয়-স্বজনদেরই রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়। তবু আমি তোমাকে খোলা হুকুমনামা দেব। **Je sais que vous n' abusers z pas** (আমি জানি, তুমি এটার অপব্যবহার করবে না)। তোমার অনুগৃহিতার নাম কি? দুখোভা? **Elle est jolie** (সে খুব ভাল মেয়ে)।'

মাসলেনিকভ ঘাড় নাড়তে নাড়তে টেবিলের কাছে গেল এবং একটা ছাপানো চিঠির কাগজে লিখল:

'এই পত্রবাহক প্রিন্স দিমিত্রি আইভানভিচ নেখ্‌ল্যুদভকে কয়েদী মাসলভা এবং সরকারী চিকিৎসক দুখোভার সঙ্গে কারা-আপিসে দেখা করতে দেওয়া হোক।' যথারীতি শুভ-সম্ভাষ যোগ করে চিঠিখানি শেষ করল।

এবার নিজের চোখেই দেখতে পাবে সেখানে আমরা কী রকম শৃংখলা বজায় রেখেছি; সেখানে এত লোকের ভীড় যে শৃংখলা রক্ষা করা খুবই শক্ত, বিশেষ করে নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিতদের নিয়েই সমস্যা। কিন্তু আমি খুব কড়া নজর রাখি, আর কাজটাকে ভালও বাসি। গেলেই দেখতে পাবে, তারা কেমন আরামে আছে, সুখে আছে। আসলে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করতে জানা চাই। এই তো কয়েক দিন আগেই একটা ছোটখাট গোলমাল হয়েছিল—অবাধ্যতার ব্যাপার আর কি; অন্য কেউ হলে একেই বিদ্রোহ বলে উল্লেখ করে অনেকেরই কষ্টের একশেষ করে ছাড়ত, কিন্তু আমরা সবকিছুই শান্তভাবে মিটিয়ে দিলাম। একদিকে যেমন চাই ক্ষমা, অপর দিকে তেমনি চাই দৃঢ়তা ও শক্তি। সোনার বোতাম লাগানো কড়া ইস্তিরির আস্তিনের ভিতর থেকে সে তার স্থূল, সাদা, পীরোজা-বসানো আংটিওয়ালা আঙুলগুলির মুষ্টিবদ্ধ হাতখানা বের করল। 'ক্ষমা আর দৃঢ় ক্ষমতা।'

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'আমি অবশ্য এ বিষয়ে কিছুই জানি না। তবে দুদিন সেখানে গিয়েছি, আমার খুব খারাপ লেগেছে।'

যাহোক, আর কথা না বাড়িয়ে নেখ্‌ল্যুদভ প্রাক্তন সহকর্মীর হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিল

'কিন্তু ভিতরে গিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে না?'

'ক্ষমা কর; এখন একেবারেই সময় নেই।'

'আরে বাবা, সে যে আমাকে মেরে ফেলবে,' বলতে বলতে মাসলেনিকভ

পুরনো বন্ধুর সঙ্গে প্রথম ল্যাণ্ডিং পর্যন্ত নেমে গেল ; প্রথম সারির নয় অথচ দ্বিতীয় সারির লোক যারা—নেখ্‌লয়ুদভকে সে এই শ্রেণীতেই ফেলেছে—তাদের বেলায় সে এতটা নামতেই অভ্যস্ত। সে আবার বলল, 'একটুখানির জন্য হলেও একবার ভিতরে চল না।'

কিন্তু নেখ্‌লয়ুদভ অবিচলিত। পিওন ও দরোয়ান তার লাঠি ও ওভারকোট নিতে ছুটে এসে দরজা খুলে দিল। দরজার বাইরে একজন পুলিশও দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু নেখ্‌লয়ুদভ পুনরায় জানাল যে সে আর অপেক্ষা করতে পারবে না।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই মাসলেনিকভ বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে বৃহস্পতিবারে এস। সেদিন ওর একটা পার্টি আছে। আমি ওকে বলব যে তুমি আসছ।'

অধ্যায়—৫১

মাসলেনিকভের আপিস থেকে নেখ্‌লয়ুদভ সোজা চলে গেল কারাগারে এবং পূর্ব-পরিচিত ইন্সপেক্টরের বাসভবনে হাজির হল। আবারও তার কানে এল নীচু মানের পিয়ানোর বাজনা ; অবশ্য এবারে কোন অসংলগ্ন বাজনা নয়, পূর্বেকার মত সেই একই উদ্দীপনা, পরিচ্ছন্নতা ও দ্রুতলয়ের সঙ্গে ক্লিমেন্তির গৎগুলি বাজানো হচ্ছিল। চোখ-বাঁধা চাকর এসে জানাল ইন্সপেক্টর বাড়িতেই আছে এবং নেখ্‌লয়ুদভকে একটা ছোট ড্রয়িং-রুমে নিয়ে বসাল। ঘরে একটা সোফা, তার সামনে একটা টেবিল, ক্রোচেটের কাজ-করা ঢাকনার উপরে একটা বড় বাতি, তার লালচে রঙের কাগজের আবরণের একটা পাশ পুড়ে গেছে। যথারীতি সেই একই বিষণ্ণ শ্রান্ত মুখে ইন্সপেক্টর ঘরে ঢুকল।

ইউনিফর্মের মাঝের বোতামটা আঁটতে আঁটতে সে বলল, 'দয়া করে আসন গ্রহণ করুন। বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি?'

'আমি এই মাত্র ভাইস-গভর্ণরের কাছে গিয়েছিলাম। তার কাছ থেকে এই অনুমতি-পত্র এনেছি। বন্দী মাসলভার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

পিয়ানোর শব্দের জন্য স্পষ্ট শুনতে না পেয়ে ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করল, 'মারকভা?'

'মাসলভা!'

'ও, আচ্ছা।' ইন্সপেক্টর উঠে দরজার কাছে গেল। সেই ঘর থেকেই ক্লিমেন্তির গৎ ভেসে আসছিল।

'মারিয়া, তুমি কি এক মিনিটের জন্যও বাজনা থামাতে পার না?' সে এমন ভাবে কথাগুলি বলল যেন এই বাজনাই তার জীবনের কাল হয়েছে। 'একটা কথাও যদি শোনা যায়।'

পিয়ানো থামল। ভেসে এল অনিচ্ছুক পায়ের শব্দ। কে যেন দরজায়

উঁকি দিল।

বাজনা থেমে যাওয়ায় স্বস্তি বোধ করে ইন্সপেক্টর নরম তামাকের একটা মোটা সিগারেট ধরাল এবং নেখ্‌লয়ুদভকে একটা দিতে গেল।

নেখ্‌লয়ুদভ নিল না।

'আমি মাসলভার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'মাসলভা! আজ তো মাসলভার সঙ্গে দেখা করার সুবিধা হবে না,' ইন্সপেক্টর বলল।

'কেন বলুন তো?'

একটু হেসে ইন্সপেক্টর বলল, 'দেখুন, সে আপনারই ত্রুটি। প্রিন্স, তার হাতে টাকা পয়সা দেবেন না। যদি দিতেই হয়, আমাকে দেবেন। আমি তার জন্য রেখে দেব। দেখুন, মনে হচ্ছে গতকাল আপনি তাকে কিছু টাকা দিয়েছিলেন; তাই দিয়ে সে মদ আনিয়েছিল (এ আপদ আমরা কিছুতেই দূর করতে পারছি না), আর তাই খেয়ে সে আজ মাতাল, এমন কি উচ্ছৃংখল হয়ে উঠেছে।'

'এও কি সম্ভব?'

'হ্যাঁ, তাই হয়েছে। আমিও কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছি, তাকে একটা আলাদা সেল-এ রাখা হয়েছে। এমনিতে সে বেশ শান্ত মেয়ে। তাই দয়া করে তাকে টাকা দেবেন না। এই সব মানুষ—'

গতকালের সব কথা নেখ্‌লয়ুদভের মনে পড়ে গেল। একটা আতংক তাকে ঘিরে ধরল।

'আর তুখোভা, একটি রাজনৈতিক বন্দিনী: তার সঙ্গে দেখা করতে পারি কি?'

'হ্যাঁ, তা পারেন' ইন্সপেক্টর বলল। 'আরে, তুমি কি চাও?' পাঁচ ছয় বছরের একটি মেয়ে ঘরে ঢুকে নেখ্‌লয়ুদভের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তার উপর চোখ রেখে বাবার দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতেই একটা কম্বলে তার পা আটকে গেল। তাই দেখে ইন্সপেক্টর হেসে বলল, 'আরে, পড়ে যাবে যে।'

'দেখুন, যদি অনুমতি করেন তো আমি যেতে পারি।'

'তা পারেন।'

মেয়েটি তখনও একদৃষ্টিতে নেখ্‌লয়ুদভকে দেখছে। ইন্সপেক্টর মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে উঠে দাঁড়াল এবং তাকে ইঙ্গিতে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল।

পরিচারিকার সাহায্যে সবে সে ওভারকোটটা চাপিয়ে দরজার কাছে এসেছে অমনি আবার ক্লিমেন্তি-র গৎ ভেসে এল।

দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ইন্সপেক্টর বলল, 'ও কন্‌জারভেতয়ের-এ ছিল, কিন্তু সেখানে এমন যোগাযোগ যে কী বলব। মেয়েটার অনেক গুণ

আছে। ওর ইচ্ছা কনসার্টে বাজাবে।'

ইন্সপেক্টর ও নেখ্‌ল্যুদভ কারাগারে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। রক্ষীরা টুপি পর্যন্ত আঙুল তুলে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে রইল। আধ-কামানো মাথা চারটে লোক নোংরা-ভর্তি বালতি নিয়ে যাবার সময় তাকে দেখে জড়সড় হয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন সক্রোধে চোখ কোঁচকাল, তার কালো চোখের দৃষ্টিতে আগুন।

কয়েদীদের প্রতি কোনরকম নজর না দিয়ে ইন্সপেক্টর তার নিজের কথাই বলতে লাগল, 'অবশ্য এ ধরনের প্রতিভার যাতে বিকাশ হয় তাই করা উচিত, একে নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন, এ ধরনের ছোট বাড়িতে এ সব বড়ই ক্লান্তিকর লাগে।'

শ্রান্ত পা ফেলে ফেলে সে নেখ্‌ল্যুদভকে নিয়ে হলঘরে পৌঁছল।

'কার সঙ্গে দেখা করতে চান?'

'দুখোভা।'

'ও হো, সে তো টাওয়ার-এ আছে। আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে,' সে বলল।

'ততক্ষণ আমি কি মা ও ছেলে এই দুটি মেনশভ কয়েদীর সঙ্গে দেখা করতে পারি? তাদের বিরুদ্ধে ঘরে আগুন লাগাবার অভিযোগ আছে।'

'হ্যাঁ, তা পারেন। ২১ নং সেল। তাদের ডেকে পাঠাতে পারি।'

'কিন্তু তাদের সেল-এ গিয়ে কি দেখা করতে পারি না?'

'মিটিং-রুম কিন্তু অনেক বেশী আরামদায়ক।'

'না। আমি সেলেই দেখা করতে চাই। সেটা অনেক বেশী ইণ্টারেস্টিং।'

'যা হোক, আপনি তাহলে সেখানেও মনের মত কিছু পেয়েছেন।'

এই সময় একটি সুসজ্জিত সহকারী অফিসার পাশের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল।

ইন্সপেক্টর তাকে বলল, 'শোন, প্রিন্সকে মেনশভদের ২১নং সেল-এ নিয়ে যাও। তারপর আপিসে নিয়ে এস। আর আমি নিজে গিয়ে তাকে ডেকে আনছি—হ্যাঁ, কি যেন নামটা?'

'ভেরা দুখোভা।'

ইন্সপেক্টরের সহকারী একটি সুদর্শন যুবক, মোমে-পাকানো গোঁফ, গায়ে ইউ ডি কোলোনের সুগন্ধ।

স্মিতহাস্যে সে নেখ্‌ল্যুদভকে বলল, 'এদিক দিয়ে আসুন। আমাদের ব্যবস্থাদি তাহলে আপনার ভাল লেগেছে?'

'তা লেগেছে। তাছাড়া আমি যতদূর জেনেছি, একটি নির্দোষ লোক এখানে বন্দী হয়ে আছে; তাকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য বলে মনে করি।'

সহকারীটি কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

নোংরা করিডরে অতিথিকে প্রথম ঢুকতে দেবার জন্য সসম্ভ্রমে নিজে এক-পাশে সরে দাঁড়িয়ে সে শান্ত গলায় বলল, 'হ্যাঁ, তাও ঘটে। তবে তারাও যে মিথ্যা কথা বলে এমনও ঘটে। দয়া করে এদিকে আসুন।'

সেলের দরজাগুলো সব খুলে গেছে। কিছু কিছু কয়েদী করিডরে জমা হয়েছে। সরকারী রক্ষীদের দিকে ঈষৎ ঘাড় কাত করল, বাঁকা চোখে কয়েদীদের দিকে তাকাল। এতক্ষণ তারা সৈন্যদের মত দুই পাশে হাত ঝুলিয়ে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে সরকারী কর্মচারিটিকে 'দেখছিল। এবার তারা গুঁড়ি মেরে সেলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। করিডর ধরে এগিয়ে সহকারী নেখ্‌লয়ুদভকে বাঁদিকে আর একটা করিডরে নিয়ে গেল। এ করিডরটা লোহার দরজা দিয়ে প্রথমটা থেকে আলাদা করা।

করিডরটা আরও সংকীর্ণ, আরও অন্ধকার, প্রথমটার চাইতেও দুর্গন্ধময়। করিডরের দু'দিকেই দরজা, তাতে এক ইঞ্চি পরিধির ছোট ছোট গর্ত। সেখানে একটিমাত্র বুড়ো রক্ষী পাহারায় আছে; তার মুখ বিষণ্ণ, বলিরেখাংকিত।

ইন্সপেক্টরের সহকারী জিজ্ঞাসা করল, 'মেনশভ কোথায় আছে?'

'বাঁদিকের অষ্টম সেল।'

অধ্যায়—৫২

'ভিতরে গিয়ে দেখতে পারি?' নেখ্‌লয়ুদভ প্রশ্ন করল।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' সহকারীটি হেসে জবাব দিয়ে রক্ষীর সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

২১ নং সেলের সামনে গিয়ে রক্ষী তালায় চাবি ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে দিল। একটি যুবক তাড়াতাড়ি জোব্বাটা পরে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে সন্ত্রস্ত মুখে নবাগতদের দেখতে লাগল। তার গলাটা লম্বা, দেহ পেশীবহুল, সামান্য গোঁফের রেখা, আর সুন্দর দুটি গোল গোল চোখ। ভীত সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে সে পর পর নেখ্‌লয়ুদভ, রক্ষী ও সহকারীকে দেখতে লাগল। নেখ্‌লয়ুদভের বিশেষ করে ভাল লাগল যুবকের সুন্দর দুটি গোল চোখ।

'তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিতে একজন ভদ্রলোক এসেছেন।'

'আপনার অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ।'

সেলটা পার হয়ে গরাদ-দেওয়া নোংরা জানালার কাছে গিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'হ্যাঁ, তোমাদের কথা আমি শুনেছি। তবু তোমার মুখ থেকেই আমি সব শুনতে চাই।'

মেনশভও দরজার কাছে এগিয়ে গেল এবং তার কাহিনী বলতে শুরু করল। ইন্সপেক্টরের সহকারী উপস্থিত থাকায় প্রথম দিকে সে কিছুটা লজ্জিত বোধ করছিল। কিন্তু ক্রমেই তার সাহস বাড়তে লাগল। একটি সাধারণ সৎ চাষীর

ছেলের পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই সে তার কাহিনী বলতে লাগল। কারাগারের ভিতরে বাজে পোশাকপরিহিত একটি কয়েদীর মুখ থেকে সে কাহিনী শুনতে নেখ্‌লয়ুদভের খুবই আশ্চর্য লাগছিল। মনোযোগ দিয়ে শোনার ফাঁকে ফাঁকে নেখ্‌লয়ুদভ চারদিকে চোখ ফেলে সব কিছু দেখতে লাগল: খড়ের গদিওয়ালা নীচু তক্তপোষ, পুরু লোহার জাল-লাগানো জানালা, নোংরা স্যাঁতসেঁতে দেওয়াল আর কারাগারের জোব্বা ও জুতো পরা এই সব হতভাগ্য বিকৃত-মূর্তি চাষীদের করুণ মুখ ও আকৃতি; যত দেখে ততই তার মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে; এই সরল প্রকৃতির যুবকটি যা বলছে তা বিশ্বাস না করতে পারলেই যেন সে খুশি হত। সে নিজেও আঘাত পেয়েছে শুধুমাত্র এই কারণেই একটি লোককে কয়েদীর পোশাক পরিয়ে এমন একটা ভয়ংকর জায়গায় আটকে রাখা যায়, একথা ভাবতেও কষ্ট হয়। অথচ এই আপাতদৃষ্টিতে সত্য বলে প্রতিভাত যে কাহিনীটিকে এমন স্বাভাবিক ভঙ্গীতে বলা হয়েছে তাকে কল্পনাপ্রসূত ও মিথ্যা বলে ভাবা যে ততোধিক বেদনাদায়ক। গল্পটা এই রকম। বিয়ের পরেই গ্রামের সরাইওয়ালা এই যুবকটির স্ত্রীকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়। সুবিচারের আশায় সে সব জায়গায় ঘুরেছে, কিন্তু সর্বত্রই সরাইওয়ালা ঘুষের জোরে খালাস পেয়েছে। একদিন সে জোর করে স্ত্রীকে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরদিনই সে পালিয়ে চলে যায়। তখন সে তাকে ফিরিয়ে আনতে আবার সরাইওয়ালার বাড়ি যায়; স্ত্রীকে সেখানে দেখতে পাওয়া সত্ত্বেও সরাইওয়ালা জানায় যে সে সেখানে নেই এবং যুবকটিকে সেখান থেকে চলে যেতে বলে। সেও কিছুতেই যাবে না। তখন সরাইওয়ালা ও তার চাকর মিলে যুবকটিকে মেরে রক্ত বের করে দেয়। পরদিন সরাইখানায় আগুন লাগে এবং যুবক ও তার মায়ের বিরুদ্ধে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ করা হয়। সে ঘরে আগুন দেয় নি, বরং সেই সময় একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

'এটা কি সত্য যে তুমি আগুন লাগাও নি?'

'না স্যার, এ কাজ করার কথা কখনও আমার মাথায়ই আসে নি। নিশ্চয় আমার শত্রু নিজেই এ কাজ করেছে। শুনেছি, অগ্নিকাণ্ডের ঠিক আগেই সে ওটা বীমা করেছিল। তারা বলছে, মা ও আমি এ কাজ করেছি, এবং তাদের আমরা শাসিয়েও ছিলাম। এটা ঠিক যে একদিন আমি তার কাছে গিয়েছিলাম—আমার মন এ কষ্ট আর সইতে পারছিল না—কিন্তু ঘরে আগুন আমি লাগাই নি। সে নিজেই ঘরে আগুন দিয়ে আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে। আগুন যখন লাগে তখন আমি সেখানে ছিলাম না, কিন্তু সে এমনভাবে সব কিছু ব্যবস্থা করেছিল যাতে মনে হয় যে মা ও আমি সেখানে যাবার পরেই ব্যাপারটা ঘটে।'

'একি সত্য?'

'ঈশ্বর সাক্ষী এটা সত্যি। স্যার, দয়া করুন...' সে তার পায়ের উপরে

উপুর হয়ে পড়তে যাচ্ছিল, নেখ্‌লয়ুদভ অনেক কষ্টে তাকে বাধা দিল। 'দয়া করুন...দেখতেই তো পাচ্ছেন, বিনা দোষে আমি মারা যাচ্ছি।'

হঠাৎ তার মুখটা কাঁপতে লাগল। জোব্বার আস্তিন গুটিয়ে সে কাঁদতে লাগল আর নোংরা শার্টের আস্তিন দিয়ে চোখ মুছতে লাগল।

'আপনার কাজ হল?' সহকারী প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ।...দেখ, মনে সাহস আন। যতদূর যা পারি আমরা করব,' এই কথা বলে নেখ্‌লয়ুদভ চলে গেল। মেনশভ দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। রক্ষী দরজা বন্ধ করতে গিয়ে তাকে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিল। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ সে দরজার গর্তের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে রইল।

অধ্যায়—৫৩

চওড়া করিডর দিয়ে ফিরবার সময় দুপাশের যে সব হাল্কা হলুদ রঙের আলখাল্লা, ছোট ঢোলা ট্রাউজার ও কারা-জুতো পরা লোক সাগ্রহে তার দিকে তাকিয়ে ছিল (তখন খাবার সময় বলে সেলের দরজাগুলি খোলা ছিল) তাদের দেখে নেখ্‌লয়ুদভ যুগপৎ তাদের প্রতি সহানুভূতি এবং যারা তাদের এখানে এইভাবে আটকে রেখেছে তাদের আচরণে আতংকিত ও বিচলিত বোধ করতে লাগল; তাছাড়া, কারণ জানলেও এরকম ঠাণ্ডা মাথায় সব কিছু পরিদর্শন করতে পারায় সে নিজেও লজ্জিত বোধ করল।

একটা করিডরে কে যেন জুতোর খট্‌খট্‌ শব্দ করে সেলের দরজার কাছে দৌড়ে এল। আরও কিছু লোক সেল থেকে বেরিয়ে এসে নেখ্‌লয়ুদভকে অভিবাদন জানিয়ে তার পথ আটকে দাঁড়াল।

'দয়া করুন, মহামান্য—আপনাকে কি বলে সম্বোধন করব জানি না—যেমন করে হোক আমাদের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন।'

'আমি সরকারের লোক নই। এ ব্যাপারে কিছুই জানি না।'

'তা হোক, আপনি তো বাইরে থেকে এসেছেন, যাকে হোক বলুন—দরকার হলে কর্তৃপক্ষস্থানীয় কাউকে। বিনা দোষে দু'মাস যাবৎ আমরা এখানে কষ্টভোগ করছি।'

'কি বলছ তুমি? কেন?' নেখ্‌লয়ুদভ বলল।

'কেন? আমরা নিজেরাই জানিনা কেন; প্রায় দু'মাস হল আমাদের এখানে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।'

সহকারীটি বলল, 'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক, এটা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা। পাশপোর্ট না থাকায় এই লোকগুলোকে আটক করা হয়েছিল; এতদিনে তাদের যার যার দেশে পাঠিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল; কিন্তু সেখানকার কারাগারটি আগুনে পুড়ে গেছে, আর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের লিখে জানিয়েছে, এদের

যেন ফেরৎ পাঠানো না হয়। কাজেই পাসপোর্টবিহীন অন্য সবাইকে যার যার দেশে পাঠিয়ে দিলেও এদের আটকে রেখেছি।'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নেখ্‌ল্যুদভ চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'কি? শুধু এই কারণে?'

কারাগারের পোশাক-পরা প্রায় জনাচল্লিশেক লোক তাকে ও সহকারীকে ঘিরে ধরে সকলেই কিছু না কিছু বলতে লাগল। সহকারী তাদের থামিয়ে দিল।

'যে কোন একজন কথা বল।'

তাদের ভিতর থেকে বছর পঞ্চাশ বয়সের একটি লম্বা সম্ভ্রান্ত গোছের চেহারার লোক এগিয়ে এল। নিজেদের অবস্থার মোটামুটি একটা বিবরণ দিয়ে সে বলল, 'আমরা সবাই পাথরের মিস্ত্রি, একই সমবায় সমিতির লোক। আমাদের বলা হচ্ছে, আমাদের দেশের কারাগার পুড়ে গেছে। কিন্তু সেটা তো আমাদের দোষ নয়। আমাদের সাহায্য করুন।'

সহকারীর দিকে ফিরে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'এরা কি বলছে? শুধু এই কারণে কি এরকমটা হতে পারে?'

সহকারী শান্ত গলায় বলল, 'হ্যাঁ, তাদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এদের কথা বুঝি তারা ভুলেই গেছে।'

করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেটা পার হয়ে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'এও কি সম্ভব যে কতকগুলি সম্পূর্ণ নির্দোষ লোককে এখানে আটকে রাখা হয়েছে।'

ইন্সপেক্টরের সহকারী বলল, 'আপনি আমাদের কি করতে বলেন? ওরা ওরকম অনেক মিথ্যে কথা বলে। অবশ্য এমনটাও ঘটে যে অকারণেই কিছু লোককে বন্দী করা হয়।'

'কিন্তু এরা তো কিছুই করে নি।'

'হ্যাঁ, তা স্বীকার করি। তবে লোকগুলো সব জাহান্নামে গেছে। এমন অনেক বেপরোয়া লোক আছে যাদের উপর কড়া নজর রাখতে হয়। এই তো গতকালই সেরকম দুজনকে শাস্তি দিতে হয়েছে।'

'শাস্তি? কেমন করে?'

'উপরওয়ালার আদেশে বার্চের লাঠি দিয়ে পেটানো হয়েছে।'

'কিন্তু দৈহিক নির্যাতন তো তুলে দেওয়া হয়েছে।'

'কিন্তু যারা অধিকারবঞ্চিত তাদের জন্য তুলে দেওয়া হয় নি। এখনও ওটা তাদের অবশ্য প্রাপ্য।'

গতকাল হলে অপেক্ষা করার সময় সে যা দেখেছিল সেটা মনে পড়তেই নেখ্‌ল্যুদভ বুঝতে পারল যে, সেই সময়ই শাস্তিটা দেওয়া হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহল, অবসাদ, বিচলিত-বোধ ও নৈতিক বিবমিষা শারীরিক বিবমিষায় রূপান্তরিত হয়ে তাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

ইন্সপেক্টরের সহকারীর কোন কথায় কান না দিয়ে, কোন দিকে না তাকিয়ে দ্রুত করিডর পার হয়ে সে সোজা আপিসে গিয়ে হাজির হল। ইন্সপেক্টর আপিসেই ছিল। কিন্তু অন্য কাজের চাপে দুখোভাকে ডেকে পাঠাতে ভুলে গিয়েছিল। নেখ্‌লুদভ ঘরে ঢুকতেই কথাটা তার মনে পড়ল।

বলল, 'দয়া করে বসুন। আমি এখনই তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।'

অধ্যায়—৫৪

দু'খানা ঘর নিয়ে আপিস। প্রথম ঘরে একটা বড় ভাঙা স্টোভ, দুটো নোংরা জানালা, এক কোণে কয়েদীদের উচ্চতা মাপবার একটা কালো দণ্ড, অপর কোণে খৃস্টের একখানা বড় ছবি। বুঝিবা খৃস্টের বাণীকে ব্যঙ্গ করবার জন্য যেখানে মানুষকে যন্ত্রণা দেওয়া হয় সেখানেই তাঁর একখানা ছবি রাখাই রীতি। ঘরে কয়েকটি রক্ষীও দাঁড়িয়ে ছিল। পাশের ঘরে জনকুড়ি স্ত্রী-পুরুষ দলে দলে, জোড়ায় জোড়ায় নীচু গলায় কথাবার্তা বলছিল। জানালার পাশে একটা লেখার টেবিল।

ইন্সপেক্টর সেই টেবিলেই বসেছিল। পাশের চেয়ারটায় নেখ্‌লুদভকে বসতে বলল। নেখ্‌লুদভ বসে পড়ে চারদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল।

মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা একটি ছোট্ট ছেলে তার কাছে এসে সরু গলায় বলল, 'আপনি কার জন্য সে অপেক্ষা করছেন?'

প্রশ্ন শুনে নেখ্‌লুদভ বিস্মিত হল। কিন্তু ছেলেটিকে দেখে, তার ছোট্ট গম্ভীর মুখ ও দুটি উজ্জ্বল মনোযোগী চোখ দেখে সে জানাল যে, পরিচিত একটি স্ত্রীলোকের জন্য অপেক্ষা করছে।

ছেলেটি প্রশ্ন করল, 'তিনি কি আপনার বোন?'

নেখ্‌লুদভ সবিস্ময়ে জবাব দিল, 'না, আমার বোন নয়। কিন্তু তুমি, তুমি এখানে কার কাছে থাক?'

সে জবাব দিল, 'আমি? মার কাছে থাকি; মা একজন রাজনৈতিক বন্দী।'

ইন্সপেক্টর বলে উঠল, 'মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না, কল্‌য়াকে নিয়ে যাও।'

লোকজনের ভিতর থেকে একটি সুন্দরী মেয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল। প্রায় পুরুষের মত দৃঢ় পদক্ষেপে নেখ্‌লুদভও ছেলেটির কাছে এগিয়ে গেল।

'ও আপনাকে কি বলছিল—আপনি কে?' ভাসা-ভাসা চোখে নেখ্‌লুদভের মুখের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসির সঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করল। তার চোখের চাউনি এমনই সরল যে সকল পুরুষের সঙ্গেই যে তার ভাই-বোনের সম্পর্ক সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

'ও সবকিছু জানতে চায়,' কথাগুলি বলবার সময় ছেলেটির দিকে তাকিয়ে

সে এমন মিষ্টি করে হাসল যে ছেলেটি ও নেখ্‌লয়ুদভ দুজনেই হেসে ফেলল।

'ও আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, আমি কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

এমন সময় ইন্সপেক্টর বলে উঠল, মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না, এখানে অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলা আইনবিরুদ্ধ। তুমি তো তা জান।'

'ঠিক আছে,' বলে কল্‌য়ার ছোট্ট হাতখানি ধরে সে চলে গেল।

নেখ্‌লয়ুদভ ইন্সপেক্টরকে জিজ্ঞাসা করল, 'এই ছোট ছেলেটি কে?'

'ওর মা একজন রাজনৈতিক বন্দী, আর এই কারাগারেই ও জন্মেছে!' খুশির স্বরে ইন্সপেক্টর কথাগুলি বলল। যেন তার প্রশাসন কতদূর অসাধারণ জানাতে পেরে সে খুবই খুশি হয়েছে।

'তাও কি সম্ভব?'

'হ্যাঁ। এখন ছেলেটি মায়ের সঙ্গেই সাইবেরিয়াতে যাচ্ছে। আরে, ঐ তো দুখোভা এসে গেছে।'

অধ্যায়—৫৫

পিছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল ভেরা দুখোভা। একটু এঁকে-বেঁকে চলে, সরু হল্‌দেটে চেহারা, চোখ দুটি বড় বড়।

নেখ্‌লয়ুদভের হাত চেপে ধরে সে বলল, 'আপনি যে এসেছেন সেজন্য ধন্যবাদ। আমার কথা তাহলে আপনার মনে আছে? আসুন। বসা যাক।'

'তোমাকে এভাবে দেখব আশা করি নি।'

'আমি তো সুখেই আছি। এত সুখে আছি যে আর কিছুই চাই না।' বড় বড় গোল-গোল চোখ দুটিকে নেখ্‌লয়ুদভের উপর নিবদ্ধ রেখে বডিসের ময়লা, কোঁচকানো, নোংরা কলারে ঘেরা সরু পেশীবহুল ঘাড়টাকে ভীষণভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে ভেরা দুখোভা কথাগুলি বলল।

নেখ্‌লয়ুদভ জানতে চাইল, সে কেমন করে কারাগারে এসেছে।

জবাবে মহা উৎসাহে সে তার সব কথা বলতে শুরু করল। কথার ফাঁকে ফাঁকে প্রচার, সংগঠনের অভাব, গোষ্ঠি, দল, উপদল, প্রভৃতি এমন সব বিশেষ বিশেষ শব্দ সে ব্যবহার করতে লাগল যা সকলেই বোঝে বলেই তার ধারণা থাকলেও নেখ্‌লয়ুদভ কখনও শোনে নি।

'**Narodovolstvo** (আক্ষরিক অর্থ 'গণ-কামনা,' গত শতাব্দীর আশির দশকের একটি বৈপ্লবিক আন্দোলন)-এর সব কথা সে তাকে বলল। দুখোভার বিশ্বাস, সে সব শুনে নেখ্‌লয়ুদভ খুশিই হবে। তার সরু ছোট গলা, তার উঠে-যাওয়া যৎসামান্য এলোমেলো চুলের দিকে তাকিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ সবিস্ময়ে ভাবতে লাগল, এ সব কাজ সে কেন করেছে, আর কেনই বা তাকে সে সব কথা বলছে। তার মনে করুণা হল। বিনা দোষে দুর্গন্ধময় কারাগারে আটকে রাখবার জন্য

চাষী মেনশভ-এর প্রতি যে ধরনের করুণা হয়েছিল এ সে রকম করুণা নয়। তার মনের অস্পষ্টতার জন্যই সে করুণার পাত্র। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আদর্শকে সফল করতে নিজের জীবন দান করতে প্রস্তুত একজন বীরাঙ্গনা বলে সে আজ নিজেকে মনে করে, অথচ সে আদর্শ যে কি বা কি ভাবে তা সফল হবে তা সে জানে না।

যে কাজের জন্য ভেরা ডুখোভা নেখ্লুদভের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল তা এই : শুস্তভালামে তার একটি বান্ধবীকে প্রায় পাঁচ মাস আগে তারই সঙ্গে গ্রেপ্তার করে 'পিতার ও পল দুর্গে' বন্দী করে রাখা হয়েছে, অথচ মেয়েটি তাদের 'উপদল'-এর সঙ্গে পর্যন্ত জড়িত নয়, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, কিছু নিষিদ্ধ বই ও কাগজপত্র (অন্যকে দেবার জন্য তার কাছে ছিল) তার কাছে পাওয়া গিয়েছিল। বান্ধবীর গ্রেপ্তারের জন্য ভেরা ডুখোভা নিজেকে কিছুটা দায়ী মনে করে বলেই নেখ্লুদভের কাছে তার অনুরোধ, তার তো উপরের মহলে অনেক জানাশোনা আছে, তাই তিনি যেন তার বান্ধবীর মুক্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

তাছাড়া, সে আরও অনুরোধ করল, গুর্কেভিচ নামে তার আর একটি বন্ধুও, 'পিতার ও পল দুর্গে' বন্দী হয়ে আছে; সে যাতে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে পারে, এবং পড়াশুনার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বই পেতে পারে তার জন্য যেন তিনি চেষ্টা করেন।

নেখ্লুদভ কথা দিল, পিতার্সবার্গ গেলে সে সাধ্যমত চেষ্টা করবে।

এবার ডুখোভার নিজের কথা, মানে সে যা বলেছে। ধাত্রীবিদ্যার পাঠ শেষ করে সে 'নারদভলস্ত্ভো'র একটি গোষ্ঠির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। প্রথম দিকে কাজকর্ম বেশ ভালভাবেই চলতে লাগল। তারা প্রচার-পত্র লেখে, কারখানাগুলোতে প্রচার-কার্য করে; তারপর গোষ্ঠির একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য গ্রেপ্তার হওয়ায় সব কাগজপত্র ধরা পড়ে এবং গোষ্ঠির সকলকেই গ্রেপ্তার করা হয়।

'আমিও গ্রেপ্তার হলাম; শীঘ্রই নির্বাসনে যাব। কিন্তু তাতে কি হল? আমি খুব সুখী।' করুণ হাসির সঙ্গে সে তার গল্প শেষ করল।

ভেরা ডুখোভার তিন নম্বর কাজ মাসলভাকে নিয়ে। মাসলভার জীবনের কথা, তার সঙ্গে নেখ্লুদভের যোগাযোগের কথা সে জানে,—কারাগারে এ ধরনের খবর সকলেই রাখে। সে পরামর্শ দিল, এমন ব্যবস্থা করুন যাতে হয় তাকে রাজনৈতিক বন্দীদের ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হোক, আর না হয় তো নার্সের কাজ দিয়ে তাকে হাসপাতালে পাঠানো হোক; হাসপাতালে তখন অনেক রোগী, কাজেই বাড়তি নার্সের খুবই দরকার।

এই পরামর্শের জন্য নেখ্লুদভ তাকে ধন্যবাদ দিল এবং তদনুসারে কাজ করতে চেষ্টা করবে বলে জানাল।

অধ্যায়—৫৬

তাদের আলোচনায় বাধা পড়ল। ইন্সপেক্টর উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, সময় হয়ে গেছে, এবার কয়েদীদের কাছ থেকে সবাইকে চলে যেতে হবে। নেখ্‌লুদভ ভেরা দুখোভার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি দেখবার জন্য হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

ইন্সপেক্টর কখনও দাঁড়িয়ে, কখনও বসে হাঁকতে লাগল, 'মশাইরা, সময় হয়ে গেছে, সময় হয়ে গেছে।'

ইন্সপেক্টরের কথায় ঘরের কয়েদীদের মধ্যে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেল, কেউ ঘর ছেড়ে গেল না। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গল্প করতে লাগল, কেউ বা যেমন ছিল তেমনই গল্প করে চলল। কেউ বা কাঁদতে কাঁদতে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল। একজোড়া তরুণ-তরুণী—তারা প্রেমিক-প্রেমিকা—হাতে হাত ধরে পরস্পরের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল।

নেখ্‌লুদভের পাশেই দাঁড়িয়েছিল একটি যুবক। তাদের দুজনকে দেখিয়ে সে বলে উঠল, 'এখানে একমাত্র ওরাই খুশিতে মশগুল। এই কারাগারেই আজ রাতে ওদের বিয়ে হবে, আর মেয়েটিও ছেলেটির সঙ্গে সাইবেরিয়ায় চলে যাবে।

'আসলে সে কি?'

'একজন আসামী, নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত। ওরা অন্তত একটু হাসিখুশি থাকুক; নইলে আর সব কিছুই তো অত্যন্ত বেদনাদায়ক।' যুবকটি বলল।

'এবার, ভালমানুষরা সব! দয়া করে আমাকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করবেন না।' কথাগুলি ইন্সপেক্টর বার বার বলতে লাগল। 'দয়া করে চলে যান। অনেকক্ষণ সময় হয়ে গেছে। আপনারা ভেবেছেন কি? এ ভাবে চলতে পারে না।·········এই শেষ বারের মত আপনাদের বলছি,' শান্ত গলায় বার বার কথাগুলি বলে ইন্সপেক্টর একটা সিগারেট বের করে ধরাল।

অবশেষে কয়েদী ও দর্শনার্থীরা বিদায় নিতে শুরু করল—কতক বাইরের দরজা দিয়ে। আর কতক ভিতরের দরজা দিয়ে।

নেখ্‌লুদভও সিঁড়ি দিয়ে নেমে হলে পৌঁছল। শ্রান্ত পদক্ষেপে ইন্সপেক্টরও সেখানে হাজির হল।

নেখ্‌লুদভের প্রতি বিনীত ভাব দেখিয়ে বলল, 'যদি মাসলভার সঙ্গে দেখা করতে চান, তাহলে দয়া করে কাল আসুন।'

'তাই হবে', বলে নেখ্‌লুদভ দ্রুতপায়ে সেখান থেকে চলে গেল।

'এ সব কিছুর অর্থ কি? এতে কি লাভ হবে?' নেখ্‌লুদভ নিজেকেই প্রশ্ন করল। সঙ্গে সঙ্গে আবার তার মনের সেই নৈতিক বিবমিষা শারীরিক বমিষায় পরিণত হল। যখনই সে কারাগারে আসে তখনই তার এই অবস্থা তার কিন্তু তার প্রশ্নের কোন জবাব মেলে না।

অধ্যায়—৫৭

পরদিন নেখ্‌ল্যুদভ অ্যাডভোকেটের সঙ্গে দেখা করে মেনশভের ব্যাপারটা তাকে বলল; তাকে অনুরোধ জানাল মামলাটা নিতে। অ্যাডভোকেট কথা দিল, মামলাটা সম্পর্কে সে খোঁজ-খবর করবে এবং নেখ্‌ল্যুদভ যা বলেছে তাই যদি ঠিক হয়—হবে বলেই মনে হয়—তাহলে সে বিনা ফি-তে তার পক্ষ সমর্থন করবে। তখন নেখ্‌ল্যুদভ সেই একশ' ত্রিশজন লোকের কথা বলল যাদের একটা ভুলের জন্য কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে। 'ওটা কাদের কাজ? দোষটা কার?'

সম্ভবত সঠিক উত্তরটা ভেবে নেবার জন্য অ্যাডভোকেট একমুহূর্ত চুপ করে রইল।

তারপর অসংকোচে বলল, 'কার দোষ? কারও না। ন্যায়াধীশকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি বলবেন গভর্ণরের দোষ, গভর্ণরকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি বলবেন ন্যায়াধীশের দোষ। দোষ কারও না।'

'আমি ভাইস-গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তাকে সব কথা বলব।'

অ্যাডভোকেট হেসে বলল, 'ও হো! তাতে কোন কাজ হবে না। লোকটা—সে আপনার আত্মীয় বা বন্ধু নয় তো?—যেমন মাথামোটা, তেমনই ধূর্ত একটি জীব!'

এই অ্যাডভোকেটটি সম্পর্কে মাসলেনিকভ কি বলেছিল সে কথা নেখ্‌ল্যুদভের মনে পড়ে গেল। কোন কথা না বলে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে মাসলেনিকভের উদ্দেশে যাত্রা করল।

তাকে দুটো কথা বলবার আছে: মাসলভাকে কারা-হাসপাতালে পাঠাবার কথা, আর একশ' ত্রিশজন পাসপোর্টবিহীন লোকের কথা যারা নির্দোষ হয়েও বন্দী হয়ে আছে। যাকে শ্রদ্ধা করে না তার কাছে কোন অনুগ্রহ ভিক্ষা করা খুবই শক্ত কাজ; কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির সেই তো একমাত্র উপায় আর সে উপায় তাকে গ্রহণ করতেই হবে।

মাসলেনিকভের বাড়ির সামনে পৌঁছে নেখ্‌ল্যুদভ দেখল, সদর দরজার সামনে অনেকগুলি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার মনে পড়ল, ভাইস-গভর্ণরের স্ত্রী আজ একটা মিলন-সভার আয়োজন করেছে আর তাতে সেও আমন্ত্রিত। গাড়িগুলির মধ্যে একখানি ঢাকা-দেওয়া ল্যাণ্ডো-গাড়িও আছে। সে জানে, গাড়িটা করচাগিনদের। তাদের পাকা-চুল, লাল-মুখ কোচয়ান টুপিটা খুলে নেখ্‌ল্যুদভকে সশ্রদ্ধ অথচ বন্ধুর মত অভিবাদন করল। এমন সময় একজন মহামান্য অতিথিকে বিদায় দিতে তাকে সঙ্গে নিয়ে কার্পেট-পাতা সিঁড়ি বেয়ে মাসলেনিকভ নীচে নেমে এল,—শুধু প্রথম ল্যাণ্ডিং পর্যন্ত নয়, সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপ পর্যন্ত।

সামরিক বিভাগের এই মহামান্য অতিথিটি নেখ্‌ল্যুদভকে দেখে সাদরে বলে উঠল, 'আরে নেখ্‌ল্যুদভ যে। কেমন আছ? আজকাল তোমার দেখাই পাওয়া যায় না কেন? Allez presenter vos devoirs a Madame (ভিতরে গিয়ে মাদামকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এস)। করচাগিনরা এবং নাদিন বুকশেভদেনরাও ভিতরে আছে। Toutes les jolies femmes de la ville (শহরের সব সুন্দরীরাই জমা হয়েছে)। Au revoir, mon cher (বিদায়, প্রিয় বন্ধু)', মাসলেনিকভের হাতটা চেপে ধরে সে বিদায় নিল।

তারপর মাসলেনিকভ নেখ্‌ল্যুদভের হাত ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তেজিত-ভাবে বলল, 'এস, উপরে এস; ভারি খুশি হয়েছি।' মোটা শরীর নিয়েও সে দ্রুত পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল।

নাচ-ঘরের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে সে বলল, 'কাজের কথা পরে হবে। তুমি যা চাও সব করে দেব।' একজন পিওনকে আসতে দেখে না থেমেই বলল, 'ঘোষণা করে দাও, প্রিয় নেখ্‌ল্যুদভ এসেছেন।'

'Vous n'avez qua ordonner (বল কি আদেশ)। কিন্তু প্রথমেই আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে চল। তার সঙ্গে দেখা না করেই আগের বার তোমাকে ছেড়ে দেবার জন্য আমাকে কথা শুনতে হয়েছে।'

তারা ড্রয়িং-রুমে পৌঁছবার আগেই পরিচারক নেখ্‌ল্যুদভের আগমন ঘোষণা করে দিল এবং নানান টুপি ও মাথার ফাঁক দিয়ে ভাইস-গভর্ণরের স্ত্রী আন্না ইগনাত্‌য়েভ্‌নার স্মিত হাসিভরা মুখ নেখ্‌ল্যুদভের উপর পড়ল।

'Enfin (এককথায় বলি)! আমরা তো ভেবেছিলাম, আপনি আমাদের ভুলেই গেছেন। আমরা কি অপরাধ করেছি?'

এই কথা বলে আন্না ইগনাত্‌য়েভ্‌না নবাগতকে স্বাগত জানাল। কথাগুলির মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতার আমেজ আছে তা কিন্তু তাদের দুজনের মধ্যে কোনকালেই ছিল না।

মিসিকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার মাথায় টুপি, গাঢ় ডোরা-টানা এমন একটা পোশাক সে পরেছে যেটা চামড়ার মতই তার শরীরের সঙ্গে মিশে গেছে। নেখ্‌ল্যুদভকে দেখে সে রক্তিম হয়ে উঠল।

বলল, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি চলে গেছ।'

'আমি যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছি। কাজের জন্যই আমি শহরে আটকে আছি, আর কাজের তাগিদেই এখানেও এসেছি।'

'তুমি কি মা-মণির সঙ্গে দেখা করতে আসবে না? তোমাকে দেখলে সে খুশি হবে।' সে জানে এ কথাগুলি সত্য নয়, আর নেখ্‌ল্যুদভও তা জানে; তাই তার মুখটা লজ্জায় আরও লাল হয়ে উঠল।

যেন তার লজ্জারুণ ভাবটা সে লক্ষ্যই করে নি এমন ভাব দেখিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ গম্ভীরভাবে বলল, 'আশংকা করছি, সময় করেই উঠতে পারব না।'

মিসি রেগে গিয়ে চোখ পাকিয়ে তাকাল, কাঁধ দুটি ঝাঁকুনি দিল, তারপর একজন সুসজ্জিত অফিসারের দিকে এগিয়ে গেল। অফিসারটিও তার হাত থেকে চায়ের শূন্য কাপটা দুদিকের চেয়ারে কোমড়ের তলোয়ারখানা ঠুকতে ঠুকতে অন্য একটা টেবিলে রেখে দিল।

নেখ্‌ল্যুদভ উঠে মাসলেনিকভের কাছে গেল।

'তুমি কি আমাকে মিনিট কয়েক সময় দিতে পারবে?'

'ও: নিশ্চয়। বল, বল কি ব্যাপার? চল, ও ঘরে যাই।'

তারা একটা ছোট জাপানী বসবার ঘরে ঢুকে জানালাটার নীচে গিয়ে বসল।

অধ্যায়—৫৮

ধুমপান করবে কি? একটু অপেক্ষা কর; এ জায়গাটাকে নোংরা করলে চলবে না,' এই কথা বলে মাসলেনিকভ একটা ছাই-দানি নিয়ে এল। 'তারপর।'

'তোমাকে দুটো কথা বলতে চাই।'

'বল ভাই।'

সেই স্ত্রীলোকটির ব্যাপারেই আমি আবার এসেছি। নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

'হ্যাঁ আমি জানি। সেই যে নির্দোষ হয়েও যার শাস্তি হয়েছে।'

'আমি চাই তাকে কারা-হাসপাতালে নার্সের কাজে লাগানো হোক। আমি শুনেছি যে এরকম ব্যবস্থা করা যায়।'

মাসলেনিকভ ঠোঁট চাটতে চাটতে কথাটা ভাবতে লাগল।

বলল, 'সেটা বোধ হয় সম্ভব হবে না। যা হোক, আমি দেখব কি করা যায়, আর কালই সে কথা তার করে তোমাকে জানিয়ে দেব।'

'আমি শুনেছি সেখানে অনেক রোগী আছে, আর তাদের পরিচর্যার জন্য লোকও দরকার।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। যাই হোক আমি তোমাকে জানিয়ে দেব।'

'দয়া করে কাজটা করে দিও। দ্বিতীয় কথা তোমাকে বলতে চাই যে, পাসপোর্টের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার দরুণ একশ' ত্রিশজনকে এক মাসের উপর হল কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছে।'

সব ঘটনাটা সে খুলে বলল।

মাসলেনিকভ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, অসন্তুষ্টও হল। বলল, 'তুমি এ কথা জানলে কেমন করে?'

'একটি কয়েদীর সঙ্গে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম। তখনই এই লোক-

গুলো করিডরের মধ্যে আমাকে ঘিরে ধরে বলে যে—'

'তুমি কোন্ কয়েদীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে ?'

'একটি চাষী যাকে বিনা দোষে আটকে রাখা হয়েছে। তার ব্যাপারটা আমি একজন উকিলের হাতে তুলে দিয়েছি। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। যে সব লোক কোন অপরাধ করে নি, শুধুমাত্র পাসপোর্টের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে বলেই কি তাদের কয়েদ করা যায় ? আর—'

মাসলেনিকভ সক্রোধে বাধা দিল, 'ওটা...ন্যায়াধীশের এক্তিয়ার। কি জান, তোমরা যাকে দ্রুত ন্যায়বিচার বল, এটা তারই ফল। কারাগার পরিদর্শন করা এবং কয়েদীদের আইনানুসারে কয়েদ করা হয়েছে কিনা এ সব দেখার ভার সরকারী উকিলের উপর। কিন্তু তারা তো শুধু তাস খেলেন, আর কিছুই করেন না।'

'তাহলে কি আমি এই বুঝব যে তুমি কিছুই করতে পারবে না ?' হতাশ হয়ে নেখ্‌লুদভ কথাগুলি বলল। তার মনে পড়ল, অ্যাডভোকেট আগেই বলেছিল যে ভাইস-গভর্ণর ন্যায়াধীশের ঘাড়ে দোষটা চাপাবে।

'হ্যাঁ, নিশ্চয় করতে পারি। আমি এখনই দেখছি। ঠিক আছে, তুমি যা যা বললে সবই করে দেব।' কথাগুলি বলে মাসলেনিকভ তার আংটি-পরা আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলল। 'এবার চল, মহিলাদের ওখানে যাই।'

তাকে ড্রয়িং-রুমের দরজার কাছে বাধা দিয়ে নেখ্‌লুদভ বলল, 'এক মিনিট। শুনলাম, কাল নাকি কারাগারের মধ্যে কয়েকজনকে দৈহিক নির্যাতন করা হয়েছে। কথাটা কি সত্য ?'

মাসলেনিকভের মুখ লাল হয়ে উঠল।

'ওঃ, সেই কথা! না, প্রিয় বন্ধু, সেখানেও তোমার মাথা গলানো চলবে না। তুমি যে সব ব্যাপারেই মাথা ঘামাতে চাও। চল—চল, আন্না আমাদের ডাকছে,' বলে সে নেখ্‌লুদভকে হাত ধরে টানল।

নেখ্‌লুদভ হাতটা ছাড়িয়ে নিল। তারপর কারও কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে একটি কথাও না বলে বিষণ্ণ চোখে ড্রয়িং-রুম পার হয়ে হলটা অতিক্রম করে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

মাসলেনিকভের সঙ্গে দেখা করার পরদিনই নেখ্‌লুদভ তার কাছ থেকে একখানি চিঠি পেল। মোটা চকচকে কাগজে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা, গালা দিয়ে সিল করা। মাসলেনিকভ জানিয়েছে, মাসলভাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যাপারটা সে ডাক্তারকে লিখেছে এবং আশা করছে এ ব্যাপারে নেখ্‌লুদভ যা চাইছে সেটা মনোযোগের সঙ্গেই বিবেচিত হবে। চিঠিতে স্বাক্ষরের আগে লেখা আছে 'তোমার স্নেহশীল বড় কমরেড' আর স্বাক্ষরের শেষে আছে একটি

শিল্পকর্মের নিদর্শন। 'গাধা!' নেখ্‌ল্যুদভ কথাটা উচ্চারণ না করে পারল না, কারণ সে বুঝতে পেরেছে যে 'কমরেড' কথাটার ভিতর দিয়ে মাসলেনিকভ তাকে করুণা করতে চেয়েছে, অর্থাৎ সে বুঝতে পেরেছে যে নৈতিক বিচারে এমন একটা নোংরা লজ্জাজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও মাসলেনিকভ নিজেকে একজন গণ্যমান্য লোক বলে মনে করে এবং নেখ্‌ল্যুদভকে ঠিক খোসামোদ করতে না চাইলেও দেখাতে চায় যে তাকে কমরেড বলে না ডাকবার মত ততটা গর্বিত সে নয়।

অধ্যায়—৫৯

এটা একটা অতিপ্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা যে প্রত্যেক মানুষেরই একটা বিশেষ গুণ থাকে; কেউ দয়ালু, কেউ নিষ্ঠুর, আবার কেউ বা জ্ঞানী বা নির্বোধ বা উৎসাহী বা উদাসীন। কিন্তু মানুষ ঠিক সে রকম হয় না। বরং একটা মানুষ সম্পর্কে আমরা বলতে পারি, সে যতটা নিষ্ঠুর তার চাইতে বেশী দয়ালু, যতটা নির্বোধ তার চাইতে বেশী জ্ঞানী, যতটা উদাসীন তার চাইতে বেশী উৎসাহী; অথবা তার বিপরীৎক্রমও হতে পারে। কিন্তু একথা বলা ঠিক হবে না যে একটা লোক দয়ালু ও জ্ঞানী, এবং আর একটা লোক খারাপ ও বোকা। অথচ আমরা সব সময় মানুষকে এই ভাবেই ভাগ করে থাকি। কিন্তু এটা ভুল। মানুষ হল নদীর মত: সব নদীতে একই জল কিন্তু প্রতিটি নদীই এখানে সরু, ওখানে অধিক দ্রুতগতি, এখানে ধীর গতি, ওখানে চওড়া, কখনও স্বচ্ছ, কখনও ঘোলা, কখনও ঠাণ্ডা, কখনও গরম। মানুষের বেলায়ও তাই। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই প্রত্যেকটি মানবিক গুণের বীজ নিহিত রয়েছে; তবে কখনও একটা গুণ প্রকাশ পায়, কখনও অন্য গুণ; ফলে অনেক সময়ই একটা মানুষ অন্য রকম হয়ে ওঠে, যদিও তখনও সে সেই একই মানুষই থাকে।

কোন কোন মানুষের মধ্যে এই পরিবর্তন খুব চূড়ান্ত রূপ নেয়, আর নেখ্‌ল্যুদভ সেই রকম একটি মানুষ। দৈহিক এবং আত্মিক দুই রকম কারণেই তার মধ্যে এই পরিবর্তন এসেছিল। এখনও তার মধ্যে সেই পরিবর্তনই ঘটেছে।

বিচারের পরে এবং কাতয়ুশার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পরে নবজন্ম লাভের জয় ও আনন্দের যে অনুভূতি তার হয়েছিল, সেটা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আর শেষ সাক্ষাতের পরে সে আনন্দের পরিবর্তে দেখা দিয়েছে আতংক ও বিকর্ষণ। সে সংকল্প নিয়েছিল তাকে পরিত্যাগ করবে না, সে চাইলে তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন করবে না; কিন্তু সে কাজ এখন বড় কঠিন, বড় যন্ত্রণাদায়ক মনে হচ্ছে।

মাসলেনিকভের সঙ্গে দেখা করার একদিন পরেই আবার সে কারাগারে

মাসলভার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

ইন্সপেক্টর সাক্ষাতের অনুমতি দিল, আপিসে নয়, অ্যাডভোকেটের ঘরে নয়, একেবারে মেয়েদের ভিজিটিং-রুমে।

ব্যবহারে সদয় হলেও ইন্সপেক্টরকে নেখ্‌লয়ুদভ সম্পর্কে আগের চাইতে একটু বেশী গম্ভীর বলে মনে হল। মাসলেনিকভের সঙ্গে তার কথাবার্তার ফলে নিশ্চয় অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনের কোন নির্দেশ এসেছে।

ইন্সপেক্টর বলল, 'আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে পারেন। কিন্তু দয়া করে টাকা-পয়সা সম্পর্কে যা বলেছি সেটা মনে রাখবেন। আর তাকে হাসপাতালে পাঠানো সম্পর্কে মহামান্য ভাইস-গভর্ণর আমাকে যা লিখেছেন সেটা করা যাবে; ডাক্তার সম্মত হবেন বলেই মনে হয়। কিন্তু সে নিজে সেটা চাইছে না। সে বলছে; "দাদ-কাউরের রোগী ওই সব ভিক্ষুকদের নোংরা জল আমাকে কি অবশ্য বইতে হবে।" দেখুন প্রিন্স, এই সব লোকদের আপনি চেনেন না।"

নেখ্‌লয়ুদভ কোন জবাব দিল না, শুধু দেখা করতে চাইল। ইন্সপেক্টর একটি রক্ষীকে ডাকল; তার সঙ্গে নেখ্‌লয়ুদভ মেয়েদের ভিজিটিং-রুমে গেল; সেখানে মাসলভা একা তার জন্য অপেক্ষা করছিল। তারের জালের পিছন থেকে শান্ত ত্রস্তভাবে বেরিয়ে তার খুব কাছে এসে চোখ না তুলেই বলল:

'আমাকে ক্ষমা করুন দিমিত্রি আইভানভিচ, গত পরশু আমি অনেক কিছুই ভুল বলেছিলাম।'

'আমার তো ক্ষমা করার কথা নয়', নেখ্‌লয়ুদভ বলতে শুরু করল।

'সে যাই হোক, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন,' মাসলভা তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল। যে রকম ভয়ঙ্কর বাঁকা চোখে সে নেখ্‌লয়ুদভের দিকে তাকাল তাতে সে যেন পূর্বেকার সেই বিরক্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিই দেখতে পেল।

'কেন তোমাকে ছেড়ে দেব?"

'ছাড়তেই হবে।'

'কিন্তু কেন?'

তার মনে হল সেই একই ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মাসলভা তার দিকে আবার তাকাল।

বলল, 'দেখুন, তাই হবে। আমাকে ছাড়তেই হবে। আমি যা বলছি ঠিকই বলছি—আমি আর পারছি না। এ সব আপনাকে ছেড়ে দিতেই হবে।' তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। একমুহূর্ত সে চুপ করে রইল। 'সত্যি বলছি। আমি বরং ফাঁসিতে ঝুলব।'

নেখ্‌লয়ুদভের মনে হল, এই অস্বীকৃতির মূলে ঘৃণা ও ক্ষমাহীন ক্ষোভ থাকলেও ভাল কিছুও আছে। সে যেরকম শান্তভাবে তার আগেকার অস্বীকৃতিকে নতুন করে ঘোষণা করছে তাতে নেখ্‌লয়ুদভের মনের সব সন্দেহ

দূর হয়ে গেল, কাতয়ুশার সম্পর্কে যে জয়ের অনুভূতি তার মনে ছিল সেটা আবার জেগে উঠল।

সে গম্ভীরভাবে বলল, 'কাতয়ুশা, আমি যা বলেছি সেটাই আবার বলছি। আমি চাই তুমি আমাকে বিয়ে কর। যদি বিয়ে করতে না চাও, তাহলে যতদিন তুমি বিয়ে করতে না চাইবে ততদিন আমি তোমাকেই অনুসরণ করে চলব, তোমাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাব।'

'সেটা আপনার ব্যাপার, আমি আর কিছু বলব না।' আবার কাতয়ুশার ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল।

নেখ্‌লয়ুদভও চুপ করে রইল। তার মুখে কোন ভাষা জোগাল না।

একটু শান্ত হয়ে আবার বলল, 'এখন আমি গ্রামে ফিরে যাব; সেখান থেকে পিতার্সবার্গ যাব। যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমার·······মানে আমাদের মামলাটা যাতে পুনর্বিবেচিত হয় এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় শাস্তিটা রদ হয়েও যেতে পারে।'

'যদি রদ নাই হয় তাতেই বা কি। এ মামলায় না হোক, আরও নানা কারণেই তো এ শাস্তি আমার প্রাপ্য,' মাসলভা বলল। নেখ্‌লয়ুদভ বুঝতে পারল, কত কষ্টে সে তার চোখের জল আটকে রেখেছে।

নিজের আবেগকে চাপা দেবার জন্য মাসলভা সহসা বলে উঠল, 'আচ্ছা, আপনি কি মেনশভের সঙ্গে দেখা করেছেন? তারা সত্যি নির্দোষ, নয় কি?'

'হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি।'

'বৃদ্ধাটি আশ্চর্য মানুষ,' মাসলভা বলল।

মেনশভদের ব্যাপার সবই খুলে বলে সে জানতে চাইল, মাসলভার আর কিছু চাই কি না।

মাসলভা জবাব দিল, তার কিছু চাই না।

তারপর দুজনই চুপ।

টেঁরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে মাসলভা হঠাৎ বলল, 'দেখুন, হাসপাতালের ব্যাপারে আপনি যদি চান তো আমি যাব, এবং কখনও মদ খাব না।'

নেখ্‌লয়ুদভ তার চোখের দিকে তাকাল। দুটি চোখই হাসছে।

'খুব ভাল কথা', শুধু এইটুকু বলেই সে তার কাছ থেকে বিদায় নিল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে সম্পূর্ণ বদলে গেছে,' নেখ্‌লয়ুদভ ভাবল। আগেকার সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল, আর তার মনে জাগল একটা অপূর্ব অনুভূতি যা এর আগে সে কখনও উপলব্ধি করে নি—সে নিশ্চিত জানল যে প্রেম অপরাজেয়।

সাক্ষাতের পরে হট্টগোল-ভরা সেলে ফিরে গিয়ে মাসলভা আলখাল্লাটা ছেড়ে ফেলল; তারপর হাত দুটি কোলের উপর ভাঁজ করে তার নিজের তক্তার উপর গিয়ে বসল। সেলের মধ্যে তখন ছিল শুধু একটি যক্ষ্মারোগগ্রস্তা

স্ত্রীলোক ও তার শিশু, মেনশভের বুড়ি মা, আর পাহারাদারের স্ত্রী। পুরোহিতের মেয়েটির মাথা খারাপ হওয়ায় আগের দিন তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য সব মেয়েরা হাত-মুখ ধুতে বাইরে গেছে।

একে একে সেলের বাসিন্দারা ঘরে ঢুকল। তাদের পায়ে কারো-জুতো, কিন্তু মোজা নেই। প্রত্যেকের হাতে একটা করে রুটি, কারও বা দুটো।

ফেদসিয়া মালসভার কাছে এগিয়ে গেল।

পরিষ্কার দুটি নীল চোখে মাসলভার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'ব্যাপার কি? কোন খারাপ খবর কি?' রুটিগুলো তাকের উপর রেখে বলল, 'এগুলো আমাদের চায়ের জন্য।'

কোরাব্‌ল্যভা বলল, 'কি হল? নিশ্চয় সে বিয়ের মতলব পাল্টায় নি?'

মাসলভা বলল, 'না, তিনি পাল্টান নি, কিন্তু আমি তা চাই না, আর সে কথা তাকে বলে দিয়েছি।'

গম্ভীর গলায় কোরাব্‌ল্যভা বলল, 'তুমি বোকার হদ্দ।'

ফেদসিয়া বলল, 'এক সঙ্গে যদি না থাকতে পারে, তাহলে বিয়ে করে লাভ কি?'

পাহারাদারের স্ত্রী বলল, 'তোমারও তো সাথী আছে—সে তো তোমার সঙ্গেই যাচ্ছে।'

ফেদসিয়া বলল, 'কিন্তু আমাদের বিয়ে তো আগেই হয়ে গেছে। কিন্তু সে যদি মাসলভার সঙ্গে থাকতেই না পারে তাহলে বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যে যাবে কেন?'

'কেন যাবে! বোকার মত কথা বলো না। তুমি তো জান সে যদি ওকে বিয়ে করে তাহলে তো ও টাকার মধ্যে গড়াগড়ি দেবে।'

মাসলভা বলল, 'তিনি বলেছেন, "তোমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, আমি সেখানেই যাব।" যদি যান, ভাল কথা; যদি না যান সেও ভাল। আমি তাকে কিছু বলব না। সমস্ত ব্যাপারটার ফয়সালা করতে এখন তিনি পিতার্সবার্গ যাবেন। সেখানে সব মন্ত্রীর সঙ্গে তার জানাশোনা আছে। কিন্তু সে যাই হোক, তাকে দিয়ে আমার কোন দরকার নেই।'

থলির ভিতর কি আছে দেখতে দেখতে কোরাব্‌ল্যভা অন্যমনস্কভাবে বলে উঠল, 'তা তো নেইই। ঠিক আছে। একফোঁটা হবে নাকি?'

মাসলভা জবাব দিল, 'তোমরা খাও। আমি খাব না।'

———

দ্বিতীয় খণ্ড

অধ্যায়—১

একপক্ষকালের মধ্যেই সেনেটে মাসলভার শুনানী শুরু হবার কথা। নেখ্‌ল্যুদভের ইচ্ছা সেই সময় পিতার্সবার্গে উপস্থিত থাকবে এবং সেনেট যদি আপীল অগ্রাহ্য করে তাহলে (যে অ্যাডভোকেট আপীলের খসড়া তৈরি করেছিল তার পরামর্শ মত) সম্রাটের কাছে আবেদন করবে। সে ক্ষেত্রে—এবং অ্যাডভোকেটের অভিমত, যেহেতু আপীলের কারণ খুবই তুচ্ছ সেই হেতু সম্রাটের কাছে আবেদন করার জন্য তৈরি থাকাই ভাল—যে কয়েদী-দলের মধ্যে মাসলভা রয়েছে তারা হয় তো জুন মাসের গোড়ায়ই রওনা হবে; সুতরাং তার সঙ্গে সাইবেরিয়ায় যেতে হলে, আর যেতে সে সংকল্পবদ্ধ, বিভিন্ন জমিদারিতে গিয়ে সেখানকার বিলি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা নেখ্‌ল্যুদভের পক্ষে একান্ত দরকার।

সে প্রথমেই গেল সব চাইতে কাছের জমিদারি কুজমিন্‌স্কোয়ে-তে। কালো মাটির দেশের ঐ জমিদারি থেকেই তার মোটা টাকা আসে।

শৈশবে ও যৌবনে নেখ্‌ল্যুদভ অনেকবার সে জমিদারি দেখতে গেছে। তারপরেও দু'বার গেছে। প্রথমবার মায়ের অনুরোধে একজন জার্মান সরকারকে সঙ্গে নিয়েছিল; সেই সঙ্গে থেকে সব হিসাবপত্র পরীক্ষা করেছিল। কাজেই সেখানকার অবস্থা এবং কৃষকদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের (অর্থাৎ মালিকের) সম্পর্কটা সে অনেকদিন থেকেই জানে। মালিকের সঙ্গে কৃষকদের সম্পর্কটা ছিল—মোলায়েম করে বলতে গেলে কৃষকরা ছিল কর্তৃপক্ষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। আর সোজাসুজি বলতে গেলে তারা ছিল কর্তৃপক্ষের ক্রীতদাস স্বরূপ। ১৮৬১ সালে যে ক্রীতদাসপ্রথা রদ করা হয়েছে, যেটা ছিল মনিবের কাছে ব্যক্তিবিশেষের ক্রীতদাসত্ব, এটা সে ধরনের ক্রীতদাসত্ব নয়; এটা হল যে কৃষক-সমাজের কোন জমি নেই বা যাদের জমির পরিমাণ নগণ্য তাদের সামগ্রিক ক্রীতদাসত্ব সমগ্র বৃহৎ জমিদার শ্রেণীর কাছে, অথবা যে সব বড় জমিদারদের মধ্যে তারা বাস করে তাদের কাছে। নেখ্‌ল্যুদভ সে কথা জানে; আসলে না জেনে উপায় নেই, কারণ এই ধরনের ক্রীতদাস-ব্যবস্থার উপরেই তার জমিদারি নির্ভর করে, এবং জমিদারি পরিচালনার এই ব্যবস্থাকে সে নিজেও সমর্থন করে। শুধু তাই নয়, সে আরও জানে যে, এ ব্যবস্থা নিষ্ঠুর ও অন্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা কালে সে যখন হেনরি জর্জের মতবাদে বিশ্বাস করত এ সেই মতবাদ প্রচার করত, যার ভিত্তিতে সে পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া সব

জমি কৃষকদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিল, তখন থেকেই সে এসব জানত। একথা সত্য যে, সেনাবাহিনীতে কাজ করবার পরে যখন সে বাৎসরিক বিশ হাজার রুবল খরচ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল, তখন থেকে এই পূর্বতন মতবাদকে সে আর অবশ্যপালনীয় বলে মনে করে না, এমন কি সে সব কথা ভুলেও গিয়েছে। তার মায়ের দরুণ যে টাকাটা সে পায় সেটা কোথা থেকে আসে সে কথা চিন্তা করাও সে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু মায়ের মৃত্যু, সম্পত্তি হাতে আসা এবং তার পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা—এই সব মিলে জমির ব্যক্তিগত মালিকানার প্রশ্নটি নতুন করে তার সামনে দেখা দিল। এক মাস আগে হলে নেখ্‌ল্যুদভ জবাব দিত যে প্রচলিত ব্যবস্থা রদ করার শক্তি তার নেই, আর সে নিজে জমিদারি পরিচালনাও করে না; যেমন করেই হোক, জমিদারি থেকে অনেকদূরে বাস করে এবং সেখান থেকে পাঠানো টাকাটা নিয়েই সে বিবেকের তাড়ণা থেকে মুক্ত হয়ে সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু এখন সে স্থির করেছে, যদিও কারা-জগৎ সংক্রান্ত এইসব জটিল ও কঠিন সমস্যাগুলির জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন এবং সাইবেরিয়াতে যাবার একটা সম্ভাবনাও তার সামনে রয়েছে, তবু এভাবে আর চলতে পারে না এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে এমনভাবে বদলাতে হবে যাতে তার ক্ষতিই হবে। সুতরাং সে স্থির করেছে, জমি নিজে চাষ না করে অল্প খাজনায় কৃষকদের হাতে দিয়ে দেবে যাতে তারা জমিদারের উপর নির্ভর না করে নিজেরাই সে জমি চাষ করতে পারে। একজন জমিদারের সঙ্গে একজন ভূমিদাস-মালিকের অবস্থার তুলনাপ্রসঙ্গে নেখ্‌ল্যুদভ একাধিকবার ভাড়াটে শ্রমিক দিয়ে জমি চাষ করার পরিবর্তে জমিটা কৃষককে খাজনা-বিলি করার সঙ্গে পুরনো কালে ভূমিদাস-মালিকরা যেভাবে শ্রমের বিনিময়ে ভূমিদাসদের কাছ থেকে টাকা আদায় করত সেই ব্যবস্থার তুলনা করেছে। সেটা সমস্যার কোন সমাধান নয়, তবে সমাধানের পথে একটা ধাপ বটে; অপেক্ষাকৃত অল্প কঠোর একটা দাসত্বের দিকে কিছুটা অগ্রগতি মাত্র। আর সেই পথেই সে অগ্রসর হতে চাইছে।

দুপুর নাগাদ সে কুজমিন্‌স্কোয়ে-তে পৌঁছল। জীবনকে সব দিক থেকেই সরল করবার উদ্দেশ্যে আসার আগে সে টেলিগ্রাম করে নি; স্টেশন থেকেই একটা দুই-ঘোড়ার চাষীদের গাড়ি ভাড়া করল। যুবক কোচয়ানের পরনে একটা সুতীর কোট, বেল্টটা কোমরের অনেকটা নীচে আটকানো। দুজনে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলল।

সে যে 'মনিব'কেই গাড়িতে নিয়ে চলেছে সেটা না বুঝে কোচয়ান সরকার-মশাই সম্পর্কে অনেক কথা বলতে লাগল। নেখ্‌ল্যুদভ ইচ্ছা করেই নিজের পরিচয় দেয় নি।

কোচয়ানটি এক সময়ে শহরে ছিল এবং কিছু কিছু উপন্যাস পড়েছে। গাড়ির 'বক্স'-এ বসে তার লম্বা চাবুকটার আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত হাত

চালিয়ে নিজের কায়দা-কৌশল দেখাতে দেখাতে সে বলতে লাগল, 'ওই জমকালো জার্মান ভদ্রলোক তিনটে হালকা হলুদ রঙের ঘোড়া কিনেছে, আর সে যখন তার বৌকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়—আরে বাস। বড়দিনের সময় বড় বাড়িতে সে একটা খৃস্টমাস-গাছও বানিয়েছিল। বেশ কয়েকজন অতিথিকে তো আমিই গাড়ি করে পৌঁছে দিয়েছিলাম। বাড়িতে বিজলি আলোও আছে। সারা জেলায় আর কোথাও আপনি এ রকমটা পাবেন না। সে টাকার পাহাড় জমিয়ে ফেলেছে। আর জমাবেই বা না কেন? তাকে বাধা দেবার তো কেউ নেই। শুনেছি সে নাকি একটা ভাল জমিদারিও কিনেছে।'

নেখ্‌লয়ুদভ জানে, সরকার কি ভাবে জমিদারি চালায় তার কোন খবরই সে রাখে না বলে সরকার অনেক কিছু সুখ-সুবিধা ভোগ করে থাকে। তবু লম্বা কোমরওয়ালা কোচয়ানের কথাগুলি শুনে তার ভাল লাগল না।

দিনটা ভারি সুন্দর। ঘন কালো মেঘ মাঝে মাঝেই সূর্যকে ঢেকে ফেলছে; মাঠে মাঠে চাষীরা কোদাল দিয়ে যইশস্য বুনছে; গাছে গাছে নতুন সবুজ পাতা গজিয়েছে; প্রান্তর জুড়ে গরু-মোষ চরে বেড়াচ্ছে; দূরে দূরে সব মাঠে চাষ হচ্ছে—কিন্তু মাঝে মাঝেই একটা খারাপ কিছু তার মনে পড়ছে। যখন সে নিজেকেই প্রশ্ন করল সেটা কি, তখনই তার মনে পড়ে গেল কোচয়ানের মুখে শোনা কুজমিন্‌স্কোয়ে-র জার্মান সরকারের কীর্তিকলাপের কথা।

জমিদারিতে পৌঁছে কাজকর্মে হাত দেবার পরে অবশ্য মনের ও অস্বস্তিটা কেটে গেল।

খাতাপত্র সব দেখা হল। কথাপ্রসঙ্গে সরকার পরিষ্কার জানাল যে, চাষীদের হাতে সামান্যই জমি আছে, আর যেটুকু বা আছে তাও সবই মালিকের জমির মধ্যেই অবস্থিত, কাজেই খুব সহজেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। নেখ্‌লয়ুদভ কিন্তু মনে মনে স্থির করল, চাষবাস তুলে দিয়ে সব জমি চাষীদের ইজারা দিয়ে দেবে।

আপিসের খাতাপত্র থেকে এবং সরকারের সঙ্গে কথা বলে নেখ্‌লয়ুদভ বুঝতে পারল, সব চাইতে ভাল চাষের জমির তিন ভাগের দুভাগ চাষ করা হচ্ছে নির্দিষ্ট মাইনেতে নিযুক্ত মজুরদের দিয়ে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে, আর বাকি এক অংশ চাষ করছে চাষীরা দেসাতিনা, (পৌনে তিন একরের মত) প্রতি পাঁচ রুবল মজুরিতে। অর্থাৎ চাষীরা প্রতি 'দেসাতিনা' জমিতে তিনবার লাঙল দেবে, তিনবার মই দেবে, ফসল বুনবে ও কাটবে, এবং আঁটি বেঁধে খামারে পৌঁছে দেবে, আর তার বিনিময়ে পাবে পাঁচ রুবল, অথচ মাইনে-করা লোকরা সেই একই কাজ করে পাবে ন্যূনতম দশ রুবল। জমিদারি থেকে চাষীরা যা কিছু সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে তার জন্যও তাদের চড়া দাম দিতে হয়। তারা পতিত জমি ব্যবহার করে, জঙ্গলের কাঠ কাটে, বা আলুর মাথাগুলো নেয়; কিন্তু তার জন্য তাদের দাম দিতে হয়। ফলে তাদের

প্রায় সকলেরই কাছারিতে অনেক ঋণ। এইভাবে চাষের জমির বাইরে দূরে দূরে যে সব জমি চাষীরা ইজারা নিয়েছে তার জন্য শতকরা পাঁচ ভাগ হিসাবে লগ্নি করলে ঐ জমি থেকে যা পাওয়া যেত চাষীদের দিতে হয় তার চার গুণ।

এসব কথা নেখ্‌লুয়ুদভ আগেও জানত। কিন্তু এখন সে নতুন আলোয় সব কিছু দেখতে পেল, আর এই ভেবে বিস্ময় বোধ করতে লাগল যে এ ধরনের একটা অস্বাভাবিক অবস্থাকে সে বা তার সমপর্যায়ের অন্য লোকরা এতদিন দেখতে পায় নি কেন। সরকার যুক্তি দেখাল যে, সব জমি যদি চাষীদের মধ্যে বিলি-বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়, তাহলে চাষের যন্ত্রপাতি থেকে প্রায় কিছুই আয় হবে না, সেগুলোর যা দাম তার সিকিও তাদের কাছ থেকে আদায় হবে না; চাষীরা জমিগুলো নষ্ট করে ফেলবে এবং নেখ্‌লুয়ুদভের ভয়ানক ক্ষতি হবে। কিন্তু ফল হল বিপরীত। নেখ্‌লুয়ুদভের মনে আরও বদ্ধমূল ধারণা হল যে, চাষীদের মধ্যে জমি বন্দোবস্ত করে দিয়ে নিজেকে আয়ের একটা বড় অংশ থেকে বঞ্চিত করে সে ভাল কাজই করতে যাচ্ছে। তাই সে স্থির করল, সেখানে থাকতে থাকতেই সব বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলবে। ফসল কাটা ও বিক্রি করা, চাষের যন্ত্রপাতি ও অকেজো বাড়িঘরগুলো বেচে দেওয়ার কাজ সরকার নিজেই যথাসময়ে করতে পারবে। সে সরকারকে বলল, কুজমিন্‌স্কোয়ে জমিদারির তিনটি কাছাকাছি গ্রামের চাষীদের যেন একটা সভায় আসতে বলা হয়। তার নিজের অভিপ্রায় এবং কি কি শর্তে তাদের মধ্যে জমি বিলি করা হবে, সবই সেই সভায় জানিয়ে দেওয়া হবে।

সরকারের সঙ্গে বিতর্কে মনের যে দৃঢ়তা সে দেখিয়েছে এবং এত বড় একটা ত্যাগ স্বীকার করতে যে সে প্রস্তুত হয়েছে, তার ফলে মনে একটা খুশির ভাব নিয়ে নেখ্‌লুয়ুদভ কাছারি থেকে বেড়িয়ে গেল। আসন্ন কাজের কথা ভাবতে ভাবতে সে বাড়ির চারধারে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পরিচর্যাহীন ফুলের বাগানের—সরকারের বাড়ির সামনে এ বছরই ফুলের গাছগুলি লাগানো হয়েছিল—ভিতর দিয়ে, চিকোরি-গাছে ভর্তি টেনিস-মাঠের উপর দিয়ে, যে লেবু-বীথিতে সে সিগারেট খেতে যেত এবং যেখানে সে তার মায়ের অতিথি সুন্দরী কিরিমভার সঙ্গে প্রেম করত, সেই সব জায়গায় সে ঘুরতে লাগল। চাষীদের কাছে যে ভাষণটি দেবে মনে মনে সেটাকে ঠিক করে সে আর একবার সরকার মশায়ের সঙ্গে আলোচনা করল এবং চা খাবার পরে মস্ত বড় বাড়িটার মধ্যে তার জন্য সাজানো ঘরটাতে চলে গেল। আগেকার দিনে সেটাকে বাড়তি শোবার ঘর হিসাবে ব্যবহার করা হত।

সেই ছোট পরিচ্ছন্ন ঘরটার দেওয়ালে ভেনিসের ছবি ঝুলছে, দুটো জানালার মাঝখানে রয়েছে একটা আয়না, স্প্রিং-এর গদি-আঁটা একটা পরিষ্কার বিছানা, তার পাশে একটা ছোট টেবিলের উপর জলের পাত্র, দেশলাই, এবং একটা বাতি-নেভানোর যন্ত্র। আয়নার পাশে আর একটা টেবিলে রাখা হয়েছে তার

খোলা পোর্টম্যান্টোটা, তার মধ্যে রয়েছে তার ড্রেসিং-কেস ও কয়েকখানা বই ; একখানা রুশ ভাষার বই, **An Investigation of the Laws of Criminality** (ফৌজদারি আইন সমীক্ষা), এবং ঐ একই বিষয়ের উপর লেখা একখানি জার্মান ও একখানি ইংরেজি ভাষার বই ; গ্রামে বেড়াতে এসে বইগুলো পড়ে ফেলবে ভেবে সঙ্গে এনেছে। আজ অনেক দেরী হয়ে গেছে ; চাষীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য তৈরি হতে যাতে সকালে উঠতে পারে সে জন্য সে তাড়াতাড়ি শুতে গেল।

ঘরের এক কোণে সাবেকি ফ্যাশনের কারুকাজকরা মেহগেনি কাঠের একখানা হাতল-কেদারা পাতা রয়েছে। নেখ্‌ল্যুদভের মনে পড়ল, এই কেদারাটা তার মায়ের শোবার ঘরে থাকত। তাই সেখানা দেখামাত্রই হঠাৎ তার মনের মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত অনুভূতি জেগে উঠল। এই বাড়ি ভেঙে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে, এই বাগান আগাছায় ভরে যাবে, জঙ্গল কেটে ফেলা হবে, আর ওই খামার-বাড়ি, আস্তাবল, চালা, যন্ত্রপাতি, ঘোড়া, গরু—সে তো জানে, এসব সঞ্চয় করতে, রক্ষণাবেক্ষণ করতে কত মানুষের কত শ্রম ব্যয় হয়েছে—সব কিছু চলে যাবে। আগে মনে হয়েছিল, এ সব কিছু ছেড়ে যাওয়া খুবই সহজ, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে কাজটা কত কঠিন ; শুধু ছেড়ে যাওয়া নয়, সব জমি বন্দোবস্ত করে দিয়ে অর্ধেক আয় হারানোও কত কঠিন। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, এইভাবে সব জমি চাষীদের হাতে তুলে দিয়ে নিজের সম্পত্তিকে নষ্ট করা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

'সম্পত্তি দখলে রাখা উচিত নয়। কিন্তু সম্পত্তি যদি না রাখতে পারি, তাহলে তো এই বাড়ি ও খামারও রাখা চলে না।—কিন্তু আমি তো তখন সাইবেরিয়ায় চলে যাব, কাজেই বাড়ি বা জমিদারি কোনটারই আমার দরকার থাকবে না,' এই হল একটি কণ্ঠস্বর। অপর কণ্ঠস্বর বলল, 'সবই ঠিক, কিন্তু তুমি তো সারাটা জীবন সাইবেরিয়াতে কাটাচ্ছ না। একদিন তুমি বিয়ে করবে, ছেলেমেয়ে হবে, আর যে অবস্থায় এই বিষয়-সম্পত্তি তুমি পেয়েছিলে সেই অবস্থায়ই সেটা তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। জমির প্রতিও তো একটা কর্তব্য আছে। সেটাকে বিলিয়ে দিয়ে সব কিছু নষ্ট করা খুবই সহজ ; কিন্তু অর্জ্জন করা বড়ই শক্ত। সর্বোপরি, তোমার নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভাবতে হবে, আর তদনুসারেই তোমার বিষয়-সম্পত্তির বন্দোবস্ত করতে হবে। তারপর, তুমি সত্যসত্যই তোমার বিবেকের নির্দেশে কাজ করছ, না কি এ সবই লোক-দেখানো ব্যাপার। নেখ্‌ল্যুদভ নিজেকে এই সব প্রশ্ন করতে লাগল ; সে স্বীকার করল, তার সম্পর্কে লোকে কি ভাববে এই চিন্তার দ্বারাই সে প্রভাবিত হয়েছে। যতই ভাবতে থাকে ততই নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়, আর ততই সেগুলিকে সমাধানের অতীত বলে মনে হয়।

—— ... ... এই সব চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য এবং

সকালে তাজা মন নিয়ে সমস্যার সমাধানের আশায় সে পরিষ্কার বিছানায় শুয়ে পড়ল। খোলা হাওয়া ও চাঁদের আলোয় ব্যাঙের ডাক কানে আসছে। তার সঙ্গে মিশেছে পার্কের একজোড়া নাইটিঙ্গেল পাখি ও জানালার নীচে ফুটন্ত লিলাক-ঝোপের একটি নাইটিঙ্গেল পাখির ডাক। পাখি ও ব্যাঙের ডাক শুনতে শুনতে নেখ্‌ল্যুদভের মনে পড়ে গেল ইন্সপেক্টরের মেয়ের বাজনা ও ইন্সপেক্টরের কথা। সেই সঙ্গে মাসলভাকে মনে পড়ে গেল: 'এ সব আপনাকে ছেড়ে দিতেই হবে,' এই কথাগুলি বলবার সময় তার কণ্ঠস্বরও ব্যাঙের ডাকের মতই কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। তখন জার্মান সরকারমশায় ব্যাঙের কাছে যেতে চাইলে তাকে বাধা দেওয়া হল; কিন্তু সে নেমে তো গেলই, উপরন্তু মাসলভায় রূপান্তরিত হয়ে নেখ্‌ল্যুদভকে ভৎ র্সনা করে বলে উঠল, 'আপনি প্রিন্স, আর আমি কয়েদী।' 'না, আমি হার মানব না,' নেখ্‌ল্যুদভ মনে মনে ভাবল; তারপর নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা আমি কি ন্যায় করছি, না অন্যায় করছি? আমি জানি না, জানতে চাইও না। আমার কাছে সবই সমান; আমাকে ঘুমুতেই হবে।' তারপর সরকারমশায় ও মাসলভাকে যেখানে নেমে যেতে দেখেছিল সে নিজেও সেখানেই নেমে যেতে লাগল, আর সেখানেই সব শেষ হয়ে গেল।

অধ্যায়—২

সকাল ন'টায় নেখ্‌ল্যুদভের ঘুম ভাঙল। তার উঠবার শব্দ শুনেই কাছারির মহুরিটি চকচকে পালিশ করা জুতো জোড়া এনে দিল, ঝর্ণার পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল এনে দিল, আর জানাল যে চাষীরা জমায়েত হতে আরম্ভ করেছে। নেখ্‌ল্যুদভ লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠল, তার সব কথা মনে পড়ল। সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করে সেটাকে নষ্ট করার জন্য যে অনুশোচনা কাল মনের মধ্যে জেগেছিল, আজ তার চিহ্নমাত্রও নেই। বরং সে কথা মনে হতে সে বিস্মিত বোধ করল, এবং আসন্ন কর্তব্য পালনের সম্ভাবনায় খুশি হয়ে উঠল, বুঝি বা নিজের অজান্তে গর্ববোধও করল।

জানালা দিয়ে দেখতে পেল, চিকোরি-লতায় ঢাকা পুরনো টেনিস-মাঠে চাষীরা জমা হতে শুরু করেছে। গত রাতে ব্যাঙগুলো বৃথাই ডাকে নি; দিনটা মেঘলা। বাতাস নেই; সকালবেলা একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে; বৃষ্টির ফোঁটা-গুলো এখনও গাছের শাখায়, পাতায় ও ঘাসের ডগায় ঝুলছে। তাজা গাছ-গাছালির গন্ধ ছাড়াও আরও বৃষ্টির প্রার্থনায় মাটির একটা সোঁদা গন্ধও জানালা-পথে ভেসে আসছে।

পোশাক পরতে পরতে নেখ্‌ল্যুদভ বার বার টেনিস-মাঠে সমবেত চাষীদের দেখতে লাগল। তারা একে একে আসছে, টুপি খুলছে, পরস্পরকে অভিবাদন

করছে, এবং লাঠিতে ভর দিয়ে গোল হয়ে বসে কথাবার্তা বলছে। সবুজ খাড়া কলার ও অজস্র বোতাম লাগানো নাবিকদের মত আটো কুর্তা পরিহিত পেশী-বহুল দেহ, শক্ত-সমর্থ সরকারমশায় এসে খবর দিল, সকলেই হাজির হয়েছে। তবে নেখ্‌ল্যুদভের প্রাতরাশ—চা বা কফি যা তার ইচ্ছে, শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করবে।

চাষীদের সঙ্গে একটু পরেই যে সব কথা হবে তা ভেবে একটা অপ্রত্যাশিত লাজুকতা ও অপমান বোধ করে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'না, আমার মনে হয় এখনই তাদের সঙ্গে দেখা করা উচিত।'

চাষীদের যে কামনা সে পূর্ণ করতে চলেছে সেটা চাষীরা আশা করতেও সাহস পায় নি; অল্প মূল্যে তাদের জমি দেওয়া হবে—অর্থাৎ একটা মস্ত বড় দান করা হবে। অথচ তার মনে কিসের যেন একটা লজ্জাকর অনুভূতি। সে যখন চাষীদের সামনে হাজির হল, তখন কালো চুল, কোঁকড়া চুল, টাক মাথা, পাকা চুলে ভর্তি মাথা, সবাই টুপি খুলে তার সামনে দাঁড়াল। তাদের দেখে সে এতই বিচলিত হয়ে পড়ল যে কোন কথাই বলতে পারল না। ছোট ছোট ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল, লোকগুলোর চুলে, দাড়িতে, মোটা কোটের ভাঁজে জমতে লাগল। সকলেই 'মনিব'-এর কথা শুনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল, কিন্তু লজ্জায় সে মুখ খুলতেই পারল না। গম্ভীর আত্মবিশ্বাসী জার্মান সরকারমশায় নিজেকে একজন রুশ চাষী-বিশেষজ্ঞ বলে মনে করে। রুশ ভাষাও সে বেশ ভাল বলতে পারে। সেই প্রথম এই অস্বস্তিকর নৈঃশব্দকে ভঙ্গ করল।

সে বলল, 'প্রিন্স তোমাদের একটা উপকার করতে চান—তিনি তোমাদের কাছে জমি ইজারা দেবেন; অবশ্য তোমরা তার উপযুক্ত নও।'

একটি লাল-চুল, বক্‌বক্‌-স্বভাবের চাষী বলে উঠল, 'আমরা কেন উপযুক্ত নই ভাসিলি কারলভিচ? আমরা কি আপনার জন্য কাজ করি না? স্বর্গতা কর্ত্রী—ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন।—আমাদের খুব ভালবাসতেন, প্রিন্স নিশ্চয় আমাদের ত্যাগ করবেন না। তাকে আমাদের ধন্যবাদ জানাই।'

'হ্যাঁ, সেই জন্যই তোমাদের সবাইকে ডেকে পাঠিয়েছি। তোমরা চাইলে সব জমি তোমাদের বন্দোবস্ত করে দেব।'

চাষীরা কিছুই বলল না; হয় তারা বুঝতে পারল না, নয়তো কথাগুলি বিশ্বাস করতে পারছিল না।

একজন মাঝ-বয়সী লোক জিজ্ঞাসা করল, 'একটু বুঝতে দিন। আমাদের জমি দেবেন? আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'তোমাদের বন্দোবস্ত করে দেব, যাতে কম খাজনায় তোমরা জমি ব্যবহার করতে পার।'

একজন বৃদ্ধ বলল, 'খুব ভাল কথা।'

আরেকজন বলল, 'অবশ্য খাজনাটা যদি আমাদের সাধ্যের মধ্যে হয়।'

'খাজনায় জমি না নেবার তো কোন কারণ নেই।'

'জমি চাষ করে বেঁচে থাকতেই আমরা অভ্যস্ত।'

'আর সেটা আপনার পক্ষেও ভাল। শুধু খাজনা নেওয়া ছাড়া আপনাকে আর কিছুই করতে হবে না। ভাবুন তো, এখন কত অন্যায়, কত দুশ্চিন্তা করতে হয়।'

জনাকয়েক একসঙ্গে কথা বলে উঠল।

জার্মান লোকটি মন্তব্য করল, 'সব অন্যায় তো তোমাদের। তোমরা যদি ঠিকমত কাজ করতে, নিয়ম-কানুন মেনে চলতে—'

উঁচু নাকওয়ালা একজন বুড়ো বলে উঠল, 'আমাদের মত লোকের পক্ষে সেটা অসম্ভব। আপনি বলবেন, "ঘোড়াটাকে ফসলের মাঠে ঢুকতে দিলি কেন?" যেন আমিই ঘোড়াটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আরে মশায়, সারাদিন কাস্তে চালিয়েছি বা ওই রকমই কিছু করেছি, শেষ পর্যন্ত একটা দিনকে মনে হয়েছে যেন একটা বছর; তারপর রাতের বেলায় ঘোড়ার পালের উপর নজর রাখতে রাখতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছি, আর সেই ফাঁকে ঘোড়াটা মাঠের ক্ষেতে ঢুকে পড়েছে; আর সেজন্য এখন আপনি আমার চামড়া তুলতে চাইছেন।'

'কিন্তু নিয়ম তো মানতে হবে।'

'আপনার পক্ষে নিয়মের কথা সোজা, কিন্তু আমাদের শক্তিতে না কুলোলে কি করা যাবে।'

'একটা বেড়া দিতে বলেছিলাম না?'

সাদাসিদে চেহারার একজন ছোটখাট লোক বলল, 'তাহলে বেড়া দেবার মত কাঠ দিন। গত বছর বেড়া দেবার জন্য একটা ছোট গাছ কেটেছিলাম, আর অমনি আপনি আমাকে তিন মাসের জন্য কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন। বেড়ার সেখানেই ইতি হয়ে গেল।'

সরকারমশায়ের দিকে ঘুরে নেখ্‌লুদভ জিজ্ঞাসা করল, 'লোকটি কি বলছে?'

সরকারমশায় জার্মান ভাষায় জবাব দিল, 'Der erste Dieb im Dorfe (লোকটা এ গাঁয়ের সেরা চোর)। প্রত্যেক বছরই ওকে জঙ্গল থেকে কাঠ চুরির অপরাধে ধরা হয়।' তারপর চাষীর দিকে ফিরে বলল, 'তোমাকে তো অন্যের সম্পত্তি মেনে চলতে হবে।'

বৃদ্ধ লোকটি বলল, 'দেখুন, আপনাকে কি আমরা মেনে চলি না? আপনাকে মেনে চলতে তো আমরা বাধ্য। আরে, আপনি তো আমাদের পাকিয়ে দড়ি বানাতে পারেন; আমরা তো আপনার হাতের মুঠোয়।'

জার্মানটি বলল, 'ওঃ, বন্ধু, তোমাদের কিছু করা তো অসম্ভব। তোমরাই

বরং আমাদের শিক্ষা দিতে পার।'

'আপনাদের শিক্ষা দেব, সত্যি! আপনি কি আমার চোয়ালটা ভেঙে দেন নি, অথচ তার বদলে আমি কিছু পেলাম কি? জানেনই তো, ধনী লোকের সঙ্গে মামলা করে কোন লাভ নেই।'

'নিজেরা তো আইন মেনে চলবে।'

বাক-বিতণ্ডা চলতেই লাগল; অথচ এর কারণ কেউই জানে না। তবে একটা জিনিস লক্ষণীয় যে, এক পক্ষে রয়েছে ভয়ে সংযত তিক্ততা, আর অন্য পক্ষে রয়েছে গুরুত্ব ও ক্ষমতার সচেতনতা। এসব কথা শুনতে নেখ্‌লয়ুদভের খুবই খারাপ লাগছিল; তাই সে খাজনার পরিমাণ ও শর্তাবলী নির্ধারণের প্রশ্ন উত্থাপন করল।

'এবার বল, জমির ব্যাপারে কি হবে? তোমরা কি নিতে ইচ্ছুক? আর আমি যদি সব জমি তোমাদের দেই তাহলেই বা তোমরা কি দাম দেবে?'

'সম্পত্তি আপনার; আপনিই দাম স্থির করুন।'

নেখ্‌লয়ুদভ একটা অংক বলল। আশেপাশে চলতি খাজনা থেকে সেটা অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী চাষীরা সেটাকে অনেক চড়া দাম মনে করে দর-কষাকষি শুরু করে দিল। নেখ্‌লয়ুদভ ভেবেছিল, তার প্রস্তাবকে ওরা খুশিমনে মেনে নেবে, কিন্তু খুশির চিহ্নমাত্র দেখা গেল না।

নেখ্‌লয়ুদভ শুধু একটা জিনিস বুঝল যে, তার প্রস্তাবে চাষীদের সুবিধাই হবে। প্রশ্ন তোলা হল: কে জমিটা নেবে—সমগ্র কম্যুন, না কোন বিশেষ সমিতি; ফলে দুই দলের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া বেধে গেল: একদল যারা চাইল সেই সব দুর্বল চাষীদের বাদ দিতে যারা নিয়মিত খাজনা দিতে পারবে না, আর একদল যারা এর ফলে বাদ পড়বে। অবশেষে সরকারমশায়ের চেষ্টায় খাজনার পরিমাণ ও শর্তাবলী স্থির হল; চাষীরাও সশব্দে কথা বলতে বলতে পাহাড় বেয়ে তাদের গ্রামে ফিরে গেল; আর নেখ্‌লয়ুদভ ও সরকারমশায় কাছারিতে ঢুকল চুক্তি-নামার মুসাবিদা করবার জন্য।

নেখ্‌লয়ুদভ যেমনটি চেয়েছিল ও আশা করেছিল সেই রকম ব্যবস্থাই হল। জেলার অন্য যে কোন জায়গার তুলনায় শতকরা ত্রিশ ভাগ সস্তায় চাষীরা জমি পেল। জমির খাজনা অর্ধেক করে দেওয়া হল, তবু নেখ্‌লয়ুদভের পক্ষে সেটাই যথেষ্ট, বিশেষ করে সে যখন জঙ্গল বিক্রির টাকাটাও পেয়ে যাচ্ছে, এবং চাষের যন্ত্রপাতি বেচেও বেশ কিছু টাকা পাবে। সব কিছুরই সুব্যবস্থা হয়ে গেল, তবু কিসের একটা লজ্জা তাকে পেয়ে বসল। সে বুঝতে পারল, ধন্যবাদ জানিয়ে গেলেও চাষীরা খুশি হয় নি, তারা বুঝি আরও বেশী আশা করেছিল। তার ফল এই দাঁড়াল যে, সে অনেক কিছু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করল, অথচ চাষীদের আশাকে পূর্ণ করতে পারল না।

পরদিন চুক্তিনামায় সই-সাবুদ হয়ে গেল; চাষীদের প্রতিনিধিস্থানীয়

কয়েকজন বুড়ো চাষীকে নিয়ে অনেক কিছু করা হল না এমন একটা অস্বস্তি মনের মধ্যে নিয়ে নেখ্‌লু্যুদভ কাছারি থেকে সরকারমশায়ের সুদৃশ্য গাড়িতে (যার কথা স্টেশন থেকে আসবার সময় কোচয়ান বলেছিল) চেপে বসল। যে সব চাষী অসন্তোষ ও হতাশার ভঙ্গীতে মাথা নাড়ছিল তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে স্টেশনের দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। নেখ্‌লু্যুদভ নিজেও নিজের কাছে অখুশি ; কারণ না জেনেও সারাক্ষণ সে কেন যেন বিষণ্ণ ও লজ্জিত বোধ করতে লাগল।

অধ্যায়—৩

কুজমিন্‌স্কোয়ে থেকে নেখ্‌লু্যুদভ পিসীদের কাছ থেকে পাওয়া জমিদারিতে গেল। সেখানেই কাতয়ুশার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল। তার ইচ্ছা ছিল, কুজমিন্‌স্কোয়ে-তে যেমন করেছে সেখানকার জমিরও সেই একই ব্যবস্থা করবে। তাছাড়াও তার ইচ্ছা ছিল, কাতয়ুশার সম্পর্কে এবং তাদের দুজনের সন্তানের সম্পর্কে যতদূর সম্ভব খোঁজখবর করবে ; সে সন্তান সত্যি মারা গেছে কিনা এবং গিয়ে থাকলে কি ভাবে মারা গেছে সে সবই জানতে চেষ্টা করবে।

খুব সকালে সে পানোভা পৌঁছিল। সেখানে পৌঁছেই যেটা তার প্রথম চোখে পড়ল তা হল বাড়ি-ঘরের বিশেষ করে বসত-বাড়ির ভগ্নদশা। লোহার সবুজ ছাদটা অনেকদিন রং না করার ফলে মরচে ধরে লাল হয়ে গেছে ; লোহার কয়েকটা পাত সম্ভবত ঝড়ের ধাক্কায় বেঁকে উল্টে গেছে। বাড়ির কাঠের বেড়া অনেক জায়গায়ই ভেঙে গেছে ; টানলেই সেগুলি মরচে-ধরা লোহা থেকে অনায়াসেই খুলে আসবে। দুটো ফটকই, বিশেষ করে পাশের যে ফটকটার কথা তার ভালই মনে আছে, ভেঙে পড়েছে, শুধু বরগাগুলি আছে। কতকগুলি জানালা আটকে দেওয়া হয়েছে। যে বাড়িটায় গোমস্তা থাকে, রান্নাঘর, আস্তাবল—সব হলদেটে বিবর্ণ হয়ে ভগ্নপ্রায় হয়ে রয়েছে। শুধু নষ্ট হয় নি বাগানটা, বরং আরও ঘন হয়েছে, অনেক ফুল ফুটেছে ; চেরি, আপেল ও কুলগাছগুলি ফুলে ফুলে সাদা মেঘের মত দেখাচ্ছে। যে লিলাকের ঝোপ দিয়ে বেড়া তৈরি করা হয়েছিল তাতেও ফুল ফুটেছে ; বারো বছর আগে যখন ষোড়শী কাতয়ুশার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে ওরই একটা লিলাক ঝোপের পিছনে পড়ে গিয়ে তার হাতে বিছুটি লেগেছিল, ঠিক তখনকার মতই ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে গাছগুলি। বাড়ির কাছে সোফিয়া পিসীর লাগানো ঝাউ-গাছগুলি তখন এক-একটা ছোট লাঠির মত ছিল ; এখন সেগুলি বেড়ে এক একটা মস্ত বড় গাছ হয়েছে ; তার ডাল দিয়ে বাড়ির কড়ি-বরগা তৈরি হতে পারে ; তার শাখা-প্রশাখা হলদে-সবুজ রঙের ফুলে ছেয়ে আছে। কারখানার বাঁধের উপর দিয়ে নদীর জলধারা সশব্দে ছুটে চলেছে। মাঠের বুকে চাষীদের

গরু-মোষ চরে বেড়াচ্ছে।

গোমস্তাটি একটি ছাত্র। পড়া শেষ না করেই বিদ্যালয় ছেড়ে চলে এসেছে। হাসিমুখে সে নেখ্‌ল্যুদভকে অভ্যর্থনা করল। তেমনি হাসিমুখেই তাকে কাছারিতে ঢুকতে বলে সে বেড়ার ও-পাশে চলে গেল। সামান্য কিছু ফিস ফিস কথাবার্তা শোনা গেল, আর তারপরেই যে ইজভজচিকখানা নেখ্‌ল্যুদভকে স্টেশন থেকে নিয়ে এসেছিল কিছু বকশিস পেয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে সেখানাও চলে গেল। তারপর চারদিকে সব চুপচাপ। তখন কাজ-করা চাষীদের ব্লাউজপরা, কানে রেশমের ঝোপ্পা ঝোলানো একটি মেয়ে খালি পায়ে জানালার পাশ দিয়ে দৌড়ে চলে গেল, আর নাল-লাগানো বুটের শব্দ করতে করতে একটা লোকও হেঁটে চলে গেল।

ছোট জানালাটার পাশে বসে বাগানের দিকে চেয়ে সে কান পেতে রইল। একটা মৃদুমন্দ বসন্ত বাতাস নতুন কাটা মাটির গন্ধ নিয়ে জানালা দিয়ে এসে তার ভিজে কপালের চুলগুলিকে নিয়ে খেলা করতে লাগল আর ছুরি দিয়ে কেটে জানালার গোবরাটে রাখা কাগজগুলিকে উড়িয়ে দিতে লাগল।

'থপ্‌-আ-থপ্‌, থপ্‌-আ-থপ্‌',—নদী থেকে একটা শব্দ আসছে। নদীতে কাপড় কাঁচতে গিয়ে মেয়েরা কাঠের মুগুর দিয়ে তালে তালে কাপড়কে ধোলাই করছে। সে শব্দ কলের পুকুরের ঝিলমিল জলের উপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে: কলের উপচে-পরা জল বাজনার তালে তালে বয়ে চলেছে; আর একটা ভয়ার্ত মাছি হঠাৎ সশব্দে গুনগুন করতে করতে তার কানের পাশ দিয়ে উড়ে গেল।

'আপনি কখন কিছু মুখে দিতে চান?' হাসিমুখে গোমস্তাটি জিজ্ঞাসা করল।

'তোমার যখন ইচ্ছা; আমি ক্ষুধার্ত নই। প্রথমে গ্রামের মধ্যে একটু বেড়িয়ে আসব।'

'আপনি কি বাড়ির ভিতরে যাবেন না? ভিতরে সব কিছুই সাজানো আছে। দয়া করে একবার ভিতরে চলুন, বাইরেটা যদিও—'

'ধন্যবাদ। এখন নয়, পরে যাব। আচ্ছা, বলতে পার, মাত্রিয়না খারিনা (কাতয়ুশার পিসীর নাম) নামে কোন স্ত্রীলোক কি এখানে থাকে?'

'হ্যাঁ, থাকে। গ্রামের মধ্যে। সে গোপনে একটা শুঁড়িখানা চালায়। আমি জানি, এ কাজ সে করে, আর এ জন্য তাকে অনেক বকুনিও দিয়েছি। কিন্তু এ জন্য তাকে যদি আটক করা হয় তাহলে বড়ই দুঃখের ব্যাপার হবে। কি জানেন, বুড়ি মানুষ, অনেকগুলি নাতি-নাতনি আছে,' গোমস্তাটি সেই একইভাবে হাসতে হাসতে বলল। তার সে হাসিতে একই সঙ্গে ফুটে উঠছে 'মনিব'কে খুশি করার ইচ্ছা এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস যে এ সব কাজকে সে যে চোখে দেখে নেখ্‌ল্যুদভও সেই চোখেই দেখে।

'সে কোথায় থাকে? আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

'গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে; শেষ থেকে তৃতীয় কুঁড়ে। বাঁ দিকে একটা ইটের বাড়ি আছে, তার ঠিক পরেই বুড়ির ঘর। বরং আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যাই,' গোমস্তা মিষ্টি হেসে বলল।

'না, ধন্যবাদ, আমি ঠিক খুঁজে নিতে পারব। তুমি বরং দয়া করে চাষীদের একটা জমায়েত ডাকার ব্যবস্থা কর; তাদের বলে দাও যে জমির ব্যাপারে আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।' কুজমিন্স্কোয়-তে চাষীদের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে এখানকার চাষীদের সঙ্গেও সেই একই চুক্তি করবার আশায় এবং সম্ভব হলে সেদিন রাতেই সেটা পাকা করে ফেলবার আশায়ই নেখ্‌লুদভ কথাগুলি বলল।

অধ্যায়—৪

গেট থেকে বেরিয়েই নেখ্‌লুদভের সঙ্গে সেই কানে রেশমি ঝোপ্পা পরা মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আগাছা ও কলাগাছে ভর্তি গোচারণ মাঠের ভিতরকার পায়ে-চলা পথ ধরে সে ফিরছিল। তার পরনে উজ্জ্বল রঙের একটা লম্বা এপ্রন। মোটা খালি পা ফেলে লাফাতে লাফাতে সে তার বাঁ হাতটা অনবরত সামনের দিকে দোলাচ্ছিল। ডান হাত দিয়ে একটা মুরগিকে কোলের মধ্যে ধরে রেখেছে। মুরগিটা লাল ঝুঁটি নাড়তে নাড়তে চুপচাপ আছে। শুধু চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে, আর একটা কালো ঠ্যাং বের করে নখ দিয়ে মেয়েটির এপ্রনটা চেপে ধরেছে। 'মনিব'-এর কাছাকাছি আসতেই মেয়েটি ধীরে চলতে চলতে এক সময় প্রায় হাঁটতে শুরু করল। তার একেবারে সামনে এসে মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল এবং মাথাটা পিছন দিকে ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করল। তারপর তাকে পার হয়েই আবার বাড়ির দিকে ছুট দিল। কুয়োর কাছে পৌঁছে নেখ্‌লুদভ সুতীর নোংরা ব্লাউজ-পরা এক বুড়িকে দেখতে পেল। একটা বাঁকে করে দু বালতি জল নিয়ে সে চলেছে। বুড়ি খুব সতর্কভাবে বালতি দুটো নামিয়ে মাথাটা পিছন দিকে ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করল।

কুয়ো পার হয়ে নেখ্‌লুদভ গ্রামের মধ্যে ঢুকল। দিনটা ঝকঝকে ও গরম। বেলা দশটা বাজতেই রোদের তাপ বেশ কষ্টকর হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝেই সূর্য মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ছে। গোবরের দুর্গন্ধে রাস্তার বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। যে সব গাড়ি পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে দুর্গন্ধটা সেদিক থেকে এলেও প্রধানত আসছে বাড়িগুলোর উঠোনে জমা-করা গোবরের গাদা থেকে। সেই সব বাড়ির খোলা দরজার পাশ দিয়েই তাকে চলতে হচ্ছে। গোবরের দাগে নোংরা মাটি ও ট্রাউজার পরা খালি পা চাষীরা এই দীর্ঘকায় মজবুত চেহারার ভদ্রলোকটিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখছে। তার টুপিতে চকচকে রেশমের ফিতে বাঁধা; হাতের ঝকঝকে বাঁধানো লাঠিটা

মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে সে গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে।

চতুর্থ দরজাটা পার হবার পরে একটি বুড়ো এগিয়ে এসে অভিবাদন করল।

'আপনি আমাদের কর্ত্রী ঠাকরুণদের ভাই-পো, নয় কি ?'

'হ্যাঁ, আমি তাদের ভাই-পো।'

বুড়োটার বেশী কথা বলা স্বভাব। সে বলল, 'আপনি আমাদের দেখাশুনা করতে এসেছেন, নয় ?'

'হ্যাঁ, তাই। আচ্ছা, তোমরা সব কেমন আছ ?' কি বলবে বুঝতে না পেরে নেখ্‌লয়ুদভ প্রশ্ন করল।

'কেমন আছি ? খুব খারাপ আছি।'

দরজা পেরিয়ে ভিতরে পা দিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ প্রশ্ন করল, 'খুব খারাপ কেন ?'

উঠোনের একটা চালার নীচে গিয়ে বুড়ো বলল, 'আমাদের কাছে বাঁচা মানেই তো অত্যন্ত দুঃখে বাঁচা। এই তো—সবশুদ্ধ আমরা বারোটি মনিষ্যি। মাস গেলেই আমাকে ছ 'পুড' (১ পুড—৩৬ পাউণ্ড) গম কিনতে হয়। কোত্থেকে সে টাকাটা আসে বলুন তো ?'

'যথেষ্ট যব কি তোমার নিজের জমিতে হয় না ?'

অবজ্ঞার হাসি হেসে বুড়ো বলল, 'আমার জমি ? জমি তো আছে মোটে তিনজনের মত। গত বছর যা ফসল পেয়েছিলাম তাতে বড়দিন পর্যন্তও চলে নি।'

'তাহলে কি করে চালাও ?'

'কি করে চালাই ? কেন, একটা ছেলেকে মজুরি খাটতে পাঠালাম, আর আপনার কাছারি থেকে নিজে কিছু ধার করেছিলাম। কিন্তু লেণ্ট-উৎসবের আগেই সব খরচ হয়ে গেল, খাজনা আর দেওয়া হল না।'

'কত খাজনা দিতে হয় ?'

'কেন ? আমার পরিবারকে দিতে হয় সতেরো রুবল করে বছরে তিনবার। হায় ঈশ্বর, এই তো জীবন। কি ভাবে বেঁচে আছি তা নিজেই জানি না।'

গোবর-নিকনো উঠোন পার হতে হতে নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'তোমার ঘরের ভিতরে যেতে পারি কি ?'

'কেন পারবেন না ? আসুন—আসুন।' বলতে বলতে বুড়ো খালি পায়ে গোবরের উপর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল; তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গোবর উপছে বেরুতে লাগল। নেখ্‌লয়ুদভকে পাশ কাটিয়ে সে ঘরের দরজা খুলে দিল।

শুধুমাত্র মোটা সেমিজ-পরা দুটি মেয়ে ছুটে কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে গেল। টুপি খুলে নীচু দরজার কাছে মাথা নুইয়ে নেখ্‌লয়ুদভ ভিতরে ঢুকল। ভিতর থেকে বাসি ভাতের গন্ধ আসছে। দুটো তাঁত ঘরের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। কুঁড়ের মধ্যে স্টোভের ধারে একটি বুড়ি দাঁড়িয়েছিল। তার সরু

পেশী-বের-করা বাদামী হাতের আস্তিন গোটানো।

বুড়ো বলল, 'এই আমাদের মালিক এসেছেন আমাদের দেখতে।'

আস্তিন খুলতে খুলতে বুড়ি সদয় গলায় বলল, 'কী সৌভাগ্য আমাদের!'

'তোমরা সব কেমন আছ তাই দেখতে এলাম।'

'কেমন আছি সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। কুঁড়েটা ভেঙে পড়ছে, যে কোনদিন একজন খুন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বুড়ো বলে, এই তো বেশ আছে। কাজেই আমরা তো রাজার হালে আছি। আমিই রান্নাবান্না করি, মজুরদের খাওয়াই।'

'আজ কি কি খাবার আছে?'

'আমাদের খাবার? সে খুব চমৎকার। প্রথম পদ, রুটি ও ক্বাস (গম থেকে তৈরি একরকম টক পানীয় যাতে নেশা হয় না); দ্বিতীয় পদ, ক্বাস ও রুটি,' আধ-খাওয়া দাঁত বের করে বুড়ি জবাব দিল।

'না, না, সত্যি বলছি, তোমরা কি খাও আমি দেখব।'

বুড়ো হেসে বলল, 'কি খাব? খুব মজাদার খাবার নয়। বৌ, ওকে দেখাও।'

বুড়ি মাথা নাড়ল।

'চাষীদের খাবার দেখতে চান? এতক্ষণে বুঝেছি, আপনি সব কিছু জানতে এসেছেন, রুটি আর ক্বাসের কথা আগেই বলেছি না? তার সঙ্গে স্যুপও থাকবে। একটি মেয়ে কিছু মাছ এনেছিল, তাই দিয়ে 'স্যুপ' করা হয়েছে; আর তারপরে আছে আলু।'

'আর কিছুই না?'

দরজার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'আর বেশী কি চান? একটু দুধও পাব।'

দরজাটা খোলা, বাইরের দালানে একগাদা লোক—ছেলে, মেয়ে, স্ত্রীলোক, শিশু—জমা হয়েছে, চাষীদের খাওয়া দেখতে আসা এই বিচিত্র ভদ্রলোকটিকে তারা দেখতে চায়। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারায় বুড়িকে খুব খুশি মনে হল।

বুড়ো বলল, 'হ্যাঁগো, আমাদের জীবন বড়ই কষ্টের; সে কথা তো বলাই বাহুল্য।' যারা দালানে জড় হয়েছিল তাদের দিকে চেঁচিয়ে বলল, 'হেই, তোরা ওখানে কি করছিস?'

নেখ্‌ল্যুদভ কেমন যেন লজ্জা ও অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সে বলে উঠল, 'আচ্ছা, তাহলে চলি।'

বুড়ো বলল, 'দয়া করে আমাদের দেখতে এসেছেন বলে ধন্যবাদ।'

দালানের ছেলেমেয়েরা এক পাশে সরে গিয়ে নেখ্‌ল্যুদভকে পথ করে দিল সে বাইরে বেরিয়ে পথ ধরে হাঁটতে লাগল। খালি পায়ে দুটো ছেলে তার

পিছু নিল—বড়টির একটা শার্ট গায়ে, তার রং একসময় সাদা ছিল, আর ছোটটির ছেঁড়া মলিন লাল রঙের জামা। নেখ্‌লয়ুদভ তাদের দিকে ফিরে তাকাল।

'আপনি এখন কোথায় যাবেন ?' সাদা শার্ট পরা ছেলেটি প্রশ্ন করল।

নেখ্‌লয়ুদভ জবাব দিল, 'মাত্রিয়না খারিনার বাড়ি। তোমরা চেন ?'

কি ভেবে লাল শার্ট পরা ছেলেটি হেসে উঠল। কিন্তু বড়টি গম্ভীর গলায় জবাব দিল।

'কোন্ মাত্রিয়নার কথা বলছেন ? সে কি বুড়ি ?'

'হ্যাঁ, সে বুড়ি।'

'ও হো,' ছেলেটি সোৎসাহে বলে উঠল, 'সেই। সে তো থাকে গাঁয়ের শেষ প্রান্তে। আমরাই দেখিয়ে দিচ্ছি। চলরে ফেদ্‌কা, ওর সঙ্গে যাই।'

'চল, কিন্তু ঘোড়াগুলো ?'

'ওরা ঠিক থাকবে, আমি বলছি।'

ফেদ্‌কা রাজী হল। তিনজন পথ দিয়ে এগিয়ে চলল।

অধ্যায়—৫

বড়দের অপেক্ষা ছোটদের কাছে নেখ্‌লয়ুদভ বেশী স্বচ্ছন্দ বোধ করে। যেতে যেতেই সে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগল। লাল শার্ট-পরা ছোট ছেলেটি আর হাসছে না ; সেও বড়টির মতই গম্ভীরভাবে ঠিক ঠিক কথা বলতে লাগল।

নেখ্‌লয়ুদভ জিজ্ঞাসা করল, 'বলতে পার, তোমাদের মধ্যে সবচাইতে গরীব কে ?'

'সবচাইতে গরীব ? মিখাইল গরীব, সেম্য়ন মাখারভ আর মারকা— মারকা খুব গরীব।'

ছোট ফেদ্‌কা বলল, 'আর এনিসিয়া, সে তো আরও গরীব ; একটা গরু পর্যন্ত নেই। ওরা তো ভিক্ষে করে খায়।'

বড় ছেলেটি বাধা দিয়ে বলল, 'তার গরু নেই বটে, কিন্তু তারা লোক মাত্র তিনজন, আর মারকারা পাঁচজন।'

এনিসিয়ার পক্ষ নিয়ে লাল-কোর্তা ছেলেটি বলল, 'কিন্তু ও তো বিধবা।'

বড়টি বলল, 'তুই বলছিস্ এনিসিয়া বিধবা, কিন্তু মারকাও তো বিধবার মতই—তারও তো স্বামী নেই।'

'তার স্বামী কোথায় গেছে ?' নেখ্‌লয়ুদভ প্রশ্ন করল।

'কারাগারে ঘাস খাচ্ছে,' চাষীদের প্রচলিত কথাগুলিই সে ব্যবহার করল। লালা-কোর্তা ছেলেটি তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে বলতে লাগল, 'একবছর আগে

সে জমিদারের জঙ্গল থেকে দুটো বার্চ গাছ কেটেছিল; তাই তার কয়েদ হয়ে গেল। ছ'মাস হল সে সেখানে আছে আর বৌটা ভিক্ষে করছে। বাড়িতে তিনটে ছেলেমেয়ে আর তাদের রুগ্ন ঠাকমা।'

'সে কোথায় থাকে?' নেখ্‌ল্যুদভ জিজ্ঞাসা করল।

'এই তো, এই বাড়িতে,' সামনের কুঁড়েটা দেখিয়ে সে বলল। কুঁড়ের সামনে একটা শুঁটকো ছেলে তার কাঠির মত পায়ের উপর অনেক কষ্টে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাথায় শোনের নুড়ির মত চুল।

'ভাস্কা। বিচ্ছুটা কোথায় যে যায়?' বলতে বলতে নোংরা ব্লাউজ পড়া একটি স্ত্রীলোক ঘর থেকে বেরিয়ে এল। নেখ্‌ল্যুদভ পৌঁছবার আগেই সে ভীত চোখে ছুটে গিয়ে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিল; মনে হল তার ভয় হয়েছে পাছে নেখ্‌ল্যুদভ ছেলেটাকে মেরে বসে।

এই স্ত্রীলোকটির স্বামীকেই নেখ্‌ল্যুদভের বার্চ-গাছ কাটার অপরাধে কয়েদ করা হয়েছে।

মাত্রিয়নার বাড়ির সামনে পৌঁছে নেখ্‌ল্যুদভ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, এই মাত্রিয়না, এও কি গরীব?'

লিকলিকে লাল-কোর্তা ছেলেটি জবাব দিল, 'সে গরীব? না। কেন, সে ত মদ বেচে।'

ছেলে দুটোকে বাইরে রেখে নেখ্‌ল্যুদভ দালান পার হয়ে কুড়েতে ঢুকল। ঘরটা চোদ্দ ফুট লম্বা। স্টোভের পিছনে যে বিছানাটা রয়েছে তাতে একজন লম্বা লোক পা ছড়িয়ে শুতে পারে না। নেখ্‌ল্যুদভ ভাবল, 'ঠিক এই বিছানাতেই কাতয়ুশা সন্তান প্রসব করেছিল এবং রুগ্ন অবস্থায় শুত।' ঘরের বেশীর ভাগ জায়গাই দখল করে আছে এক তাঁত। বড় নাতনিকে নিয়ে বুড়ি তাঁতের টানাটা বসাচ্ছিল। ঘরের ভিতরে ঢুকতে গিয়ে নীচু দরজায় নেখ্‌ল্যুদভের মাথা ঠুকে গেল। আরও দুটি নাতি-নাতনি নেখ্‌ল্যুদভের পিছন পিছন ছুটে এসে চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

'আপনি কাকে চান?' বুড়ি বিরক্ত গলায় প্রশ্ন করল। টানাটা ঠিক মত হচ্ছিল না বলে বুড়ির মেজাজটা ভাল ছিল না। তাছাড়া মদের চোরাই কারবার করে বলে যে কোন নতুন লোক দেখলেই তার ভয় হয়।

'এই জমিদারির আমি মালিক। তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

বুড়ি চুপ করে গেল। ভালভাবে তার দিকে তাকিয়ে বুড়ির মুখটা হঠাৎ বদলে গেল।

'আরে বাস! তাই তো, এ যে আপনি, আমার বাছাধন! আর এমনি বোকা আমি, ভাবলাম বুঝি কোন পথের লোক। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে ক্ষমা করুন,' গলায় নরম স্বর এনে বুড়ি বলে উঠল।

'আমি তোমার সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই,' দরজার দিকে তাকিয়ে

নেখ্‌লুদভ বলল। সেখানে ছেলেমেয়েগুলোর পিছনে একটি স্ত্রীলোক হাড়-জিরজিরে একটা শিশুকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

'তোরা সব হাঁ করে কি দেখছিস? দেব রে দেব। এখন আমার লাঠিটা দে তো।' দরজায় যারা ভীড় করেছিল তাদের দিকে তাকিয়ে বুড়ি চেঁচিয়ে বলল। 'দরজাটা বন্ধ করে দে না।'

ছেলেমেয়েগুলো চলে গেল। সন্তান কোলে মেয়েটি দরজা টেনে দিল।

বুড়ি বলতে লাগল, 'আমি ভাবছি, কে না কে এল? আর এ কি না স্বয়ং মনিব আমার সোনা-মানিক। আর নিজে এখানে এসেছেন।' এপ্রন দিয়ে আসনটা মুছে দিয়ে বুড়ি আবার বলতে লাগল, 'এখানে বসুন, বাবা আমার। আমি আরও ভাবছি, কোন্ শয়তান আবার হাজির হলেন? আর এ কি না স্বয়ং মনিব, আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আমি বুড়ো মানুষ, ভাল চোখে দেখি না, আমাকে ক্ষমা করুন।'

নেখ্‌লুদভ বসল। বাঁ হাতে ডান হাতের কনুইটা তুলে ধরে ডান হাতের উপর গালটা রেখে বুড়ি তার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

সুরেলা গলায় বলল:

'বাবা আমার, কত বড়টি হয়েছেন। আগে তো ডেইজি ফুলটির মত ছিলেন। আর এখন! অবশ্য চিন্তা-ভাবনা তো আছেই, কি বলেন?'

'সেইজন্যই আমি এসেছি। কাতয়ুশা মাসলভার কথা তোমার মনে আছে?'

'কাতেরিনা। সে তো আমার ভাই-ঝি। তাকে কি ভুলতে পারি? তার জন্য কত চোখের জল ফেলেছি। আমি সব জানি। দেখুন স্যার, ঈশ্বরের কাছে কে অপরাধী নয়? জারের কাছে কে অপরাধী নয়? যৌবন যে কি জিনিস তা তো জানি। দুজন একসঙ্গে চা-কফি খেতেন, আর সেই সুযোগে শয়তান ঘাড়ে চাপল। অনেক সময়ই তার সঙ্গে এটে ওঠা যায় না। কি আর করা যাবে? আপনি যদি তাকে ত্যাগ করতেন, কিন্তু না, আপনি তো তাকে পুরস্কারই দিয়েছিলেন, একশ' রুবল দিয়েছিলেন। আর সে? সে কি করল? কোন কথা শুনল না। আমার কথা শুনলে ভালভাবেই থাকতে পারত। আমার ভাই-ঝি হলেও হক কথাই বলব; মেয়েটা ভাল না। কেমন ভাল কাজ জুটিয়ে দিলাম! কিন্তু সে কাউকে মানবে না, উল্টে মনিবকেই বকাবকি। ভদ্রলোকদের গালাগালি করা কি আমাদের সাজে? সেখান থেকে চলে গেল। গেল একজন বনবিভাগের বাবুর বাড়ি। সেখানেও থাকতে পারত, কিন্তু টিকল না।'

'আমি তার সন্তানের কথা জানতে চাই। তোমার বাড়িতেই তার প্রসব হয়েছিল, তাই নয় কি? সে সন্তান কোথায়?'

'সন্তানের ব্যাপারে তখন অনেক ভাবনা-চিন্তা করতে হয়েছিল। মেয়েটার

তখন এমন অবস্থা যে আবার যে উঠে দাঁড়াতে পারবে তা ভাবি নি। দেখুন, যথারীতি শিশুর জাত-কর্ম সেরে তাকে অনাথ-আশ্রমে পাঠিয়ে দিলাম। প্রসূতি যেখানে মরবার মুখে সেখানে একটা নিষ্পাপ শিশুকে কে রাখে? অন্যরা কি করে? তারা শিশুটিকে ফেলে রাখে, খেতে দেয় না, সেটা শুকিয়ে মরে যায়। কিন্তু আমি ভাবলাম, না, বরং কষ্ট করে ওকে অনাথ-আশ্রমেই পাঠিয়ে দিই। হাতে টাকাও ছিল, দিলাম পাঠিয়ে।'

'অনাথ হাসপাতাল থেকে একটা নথি-ভুক্তি সংখ্যা কি পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, পেয়েছিলাম; কিন্তু বাচ্চাটা মারা গেল। মেয়েমানুষটা তাকে সেখানে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল।'

'কে মেয়েমানুষ?'

'সেই যে মেয়েমানুষটা স্করদন্-এ থাকত। তার তো এটাই ছিল ব্যবসা। নাম মালানিয়া। মরে গেছে। খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে কি করত জানেন? কেউ কোন বাচ্চাকে তার কাছে নিয়ে গেলেই সে তাকে রাখত, খাওয়াত, তার পর বেশ তিন-চারটি বাচ্চা জমলে সব ক'টাকে অনাথ-আশ্রমে নিয়ে যেত। তার ব্যবস্থাও ছিল খুব ভাল: একটা বড় দোলনা—ডবল দোলনা ছিল, তাতেই সব ক'টাকে শুইয়ে রাখত। পায়ে পায়ে লাগিয়ে মাথাগুলো দূরে রেখে বাচ্চাগুলোকে এমনভাবে রাখত যাতে ঠোকাঠুকি না হয়। তারপর চারটেকেই একসঙ্গে নিয়ে যেত। সঙ্গে কিছু খাবার দিয়ে দিত, বাস, বাচ্চাগুলো বেড়াল-ছানার মত চুপচাপ থাকত।'

'তারপর, বলে যাও।'

'একপক্ষকাল কাছে রেখে সে কাতেরিনার বাচ্চাকেও সেখানে দিয়ে এল। তার বাড়িতেই বাচ্চাটা অসুখে পড়ে।'

'বাচ্চাটা দেখতে সুন্দর হয়েছিল?' নেখ্‌লুদভ জিজ্ঞাসা করল।

'কী সুন্দর, তার চাইতে সুন্দর বাচ্চা আপনি খুঁজেও পাবেন না। ঠিক আপনার মত দেখতে,' বুড়ি চোখ কুঁচকে বলল।

'রোগে পড়ল কেন? খারাপ খাবারের জন্য?'

'খারাপ আবার কোথায়? ও তো লোক-দেখানো কাজ। নিজের বাচ্চা না হলে যা হয় আর কি। কোনরকমে জানে বাঁচিয়ে রাখা। সে বলেছিল, কোনরকমে মস্কো পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল, তারপরই মারা যায়। সে একটা সার্টিফিকেটও নিয়ে এসেছিল—সব ব্যবস্থা পাকা। মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী।'

তার সন্তান সম্পর্কে এইটুকু খবরই নেখ্‌লুদভ যোগাড় করতে পারল।

অধ্যায়—৬

দুটো দরজায় দু'বার মাথা ঠুকে নেখ্‌লয়ুদভ বাইরে এসে পথে নামল। সাদা ও লাল-কোর্তা ছেলে দুটি তখনও অপেক্ষা করে আছে। কয়েকজন নবাগতও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। বাচ্চা-কোলে করে কয়েকটি স্ত্রীলোকও ছিল। একটা বাচ্চার একেবারেই রক্তশূন্য চেহারা। ছোট কোঁচকানো মুখে একটা অদ্ভুত হাসি। বাঁকা বুড়ো আঙুলটা অনবরত নাড়ছে।

নেখ্‌লয়ুদভ জানত, এ হাসি যন্ত্রণার হাসি। সে মেয়েটির পরিচয় জানতে চাইল।

বড় ছেলেটি জানাল, 'এই সেই এনিসিয়া যার কথা আপনাকে বলছিলাম।'

নেখ্‌লয়ুদভ এনিসিয়ার দিকে ঘুরে বলল, 'তুমি কি কর? খাওয়া-পরার জন্য কি কাজ কর?'

'কি করি, ভিক্ষে করি,' বলে এনিসিয়া কাঁদতে লাগল।

বাচ্চাটার কুঞ্চিত মুখে আবার হাসি দেখা দিল, ফড়িংএর মত সরু ঠ্যাং দুটো নাড়তে লাগল।

নেখ্‌লয়ুদভ টাকার থলি বের করে তাকে একটা দশ-রুবলের নোট দিল। দুই পা এগোবার আগেই বাচ্চা-কোলে আরেকটি স্ত্রীলোক তাকে ধরল, তারপর একটি বুড়ি, তারপর একটি যুবতী। সবাই দারিদ্র্যের কথা জানিয়ে সাহায্য চাইতে লাগল। ছোট নোটে যে ষাট রুবল তার কাছে ছিল সব সে বিলিয়ে দিল। তারপর বিষণ্ণ চিত্তে গোমস্তার বাড়ির পথ ধরল।

গোমস্তাটি হাসিমুখে নেখ্‌লয়ুদভের সঙ্গে দেখা করে জানাল, চাষীরা সন্ধ্যার পরে জমায়েত হবে। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ একটু বেড়াবার জন্য সোজা বাগানে চলে গেল। পথের দুধারে আগাছা জন্মেছে; তার ভিতর দিয়ে আপেল ফুলের পাপড়ি ছড়ানো পথের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে আজ যা দেখে এসেছে তাই নিয়েই ভাবতে লাগল।

নেখ্‌লয়ুদভ বাড়ি ফিরলে গোমস্তা বিশেষ স্মিত হাসির সঙ্গে জানতে চাইল, সে তখন খেতে বসবে কি না; তার ভয়, কানে ঝোপ্পা-পরা মেয়েটির সহ-যোগিতায় তার স্ত্রী রান্নাবান্না যা করেছে বেশী দেরী করলে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

টেবিলের উপর একটা মোটা মাড়হীন চাদর পাতা হয়েছে। হাত-ভাঙা একটা সুদৃশ্য ঝোলের গামলায় আলু-মুরগির ঝোল রাখা হয়েছে। ঝোলের পর দেওয়া হল ঝলসানো মুরগির মাংস আর অনেক তেল আর চিনি দিয়ে ঠাসা দই-বড়া। কোনটাই সুখাদ্য না হলেও অন্যমনস্ক নেখ্‌লয়ুদভ তাই খেয়ে নিল।

খাওয়া শেষ করে নেখ্‌লয়ুদভ অনেক কষ্টে তাকে আসনে বসাতে পারল। তখন সে চাষীদের মধ্যে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যাপারটা গোমস্তাকে বুঝিয়ে

বলে তার মতামত জানতে চাইল। কিন্তু সারাক্ষণ হাসলেও গোমস্তা কিছুই বুঝতে পারল না। নেখ্‌লয়ুদভ সব কথা পরিষ্কার করে বলতে না পারার দরুণ যে সে বুঝতে পারে নি তা নয়; আসলে নেখ্‌লয়ুদভের প্রকল্পের ফলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াবে যে অন্যের লাভের জন্য নেখ্‌লয়ুদভ তার নিজের লাভটা ছেড়ে দিচ্ছে; কিন্তু সকলেই চায় নিজের লাভ ও অন্যের ক্ষতি, এই ধারণাটা গোমস্তার মনে এতই বদ্ধমূল যে, নেখ্‌লয়ুদভ যখন বলল, জমির যা আয় হবে তা চাষীদের সমবায়-ভাণ্ডারেই জমা পড়বে তখন গোমস্তা সে কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না।

হঠাৎ সে বলে উঠল, 'ও হো, বুঝতে পেরেছি; মূলধনের একটা অংশ তাহলে আপনি পাবেন।'

'না হে, না! তুমি কি বুঝতে পারছ না যে জমি কোন ব্যক্তি-বিশেষের মালিকানা সম্পত্তি হতে পারে না?'

'তা বটে।'

'কাজেই জমি থেকে যা পাওয়া যাবে সেটা সকলেই পাবে।'

এবার আর গোমস্তার মুখে হাসি নেই। সে বলল, 'কিন্তু তাহলে তো আপনার কোন আয়ই থাকছে না।'

'না, আমার আয়টা আমি ছেড়ে দিচ্ছি।'

গোমস্তা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল; তারপরই আবার হাসতে শুরু করল। এবার সে বুঝেছে যে, নেখ্‌লয়ুদভের মাথার ঠিক নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবতে শুরু করল, নেখ্‌লয়ুদভের এই পরিকল্পনা থেকে কি ভাবে সে নিজে কিছু মুনাফা লুটতে পারে।

কিন্তু যখন বুঝল যে তাও সম্ভব নয়, তখন তার মন খারাপ হয়ে গেল, নতুন পরিকল্পনার ব্যাপারে আর কোনরকম আগ্রহই রইল না; তখনও যে সে হাসতে লাগল সে শুধু 'মনিব'কে খুশি করবার জন্য।

যখন বুঝতে পারল যে গোমস্তা তার কথা কিছুই বুঝতে পারছে না, তখন তাকে বিদায় দিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ টেবিলে বসে তার প্রকল্পের একটা খসড়া কাগজে-কলমে তৈরি করতে লাগল।

নতুন পাতা-গজানো লেবু-বাগানের আড়ালে সূর্য অস্ত গেল। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এসে নেখ্‌লয়ুদভকে কামরাতে লাগল। লেখা শেষ হলে সে গরু-বাছুরের ডাক শুনতে পেল; গ্রামের ভিতর থেকে দরজা খোলার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ এবং চাষীদের জমায়েতের কলরবও কানে এল। সে গোমস্তাকে বলেই দিয়েছিল, চাষীদের জমায়েত যেন কাছারিতে ডাকা না হয়; তার ইচ্ছা গ্রামের ভিতরে গিয়েই তাদের সঙ্গে মিলিত হবে। কোনরকমে গোমস্তার দেওয়া এক পাত্র চা খেয়েই নেখ্‌লয়ুদভ গ্রামের দিকে পা বাড়াল।

অধ্যায়—৭

গ্রাম-প্রধানের বাড়ির সামনে সমবেত জনতার কোলাহল ভেসে আসছে ; নেখ্‌লয়ুদভ সেখানে উপস্থিত হতেই সকলে চুপ করল, এবং কুজ্‌মিন্‌স্কোয়ের চাষীদের মতই মাথার টুপি খুলে ফেলল। এখানকার চাষীরা কুজ্‌মিন্‌স্কোয়ের চাষীদের চাইতেও গরীব। সকলেরই পরনে বাকলের জুতো, আর হাতে-বোনা মোটা কাপড়ের শার্ট ও ট্রাউজার। অনেকেরই খালি পা, পরনে শার্ট, ঠিক যেভাবে কাজ থেকে ফিরেছে।

নেখ্‌লয়ুদভ বেশ কষ্ট করে তাদের বোঝাতে চাইল যে সে তাদের মধ্যে জমি বিলি করে দিতে চায়। চাষীরা চুপচাপ বসে রইল, তাদের মুখের ভাবের কোন পরিবর্তনই হল না।

নেখ্‌লয়ুদভ লাজুক ভঙ্গীতে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি যে, জমিতে যে কাজ করে না জমির উপর তার কোন অধিকারও থাকতে পারে না। এবং জমিকে কাজে লাগাবার অধিকার সকলেরই আছে।'

'ঠিক, ঠিক কথা,' কয়েকজন বলে উঠল।

নেখ্‌লয়ুদভ বলতে লাগল, জমি থেকে যা আয় হবে সেটা সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়াই উচিত ; কাজেই তার প্রস্তাব, তারা নিজেরাই জমির খাজনার হার স্থির করুক এবং সেই খাজনার টাকায় একটা সমবায়-তহবিল গড়া হোক যেটা সকলেই ব্যবহার করতে পারবে। সম্মতি ও অসম্মতি দুই রকম কথাই শোনা গেল ; তবে চাষীদের গম্ভীর মুখ গম্ভীরতর হয়ে উঠল ; আর যে চোখগুলি এতক্ষণ ঐ ভদ্রলোকটির উপর নিবদ্ধ ছিল সে সব চোখ নেমে গেল ; দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন ভদ্রলোকটির চালাকি ধরে ফেলেছে এবং তিনি যে তাদের আর ঠকাতে পারবেন না, এটা তাকে জানতে দিয়ে তারা তাকে লজ্জায় ফেলতে চাইছে না।

নেখলয়ুদভ বেশ খোলাখুলিই সব কথা বলেছে, আর চাষীরাও বুদ্ধিমান। তথাপি যে কারণে গোমস্তাটি তার কথা বুঝতে পারে নি, সেই কারণেই তারাও তার কথা বুঝতে পারে নি এবং বুঝতে চায় নি।

তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, নিজের স্বার্থটা দেখা সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় তারা জেনেছে, চাষীদের ক্ষতি করেই জমিদাররা তাদের স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলে। সুতরাং আজ যদি কোন জমিদার এসে নিজের থেকে তাদের ডেকে নতুন কিছু বলে, তবে তার একমাত্র অর্থ—আগের থেকে আরও চালাকির সঙ্গে তাদের পকেট কাটার ব্যবস্থা করা।

নেখ্‌লয়ুদভ প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, তাহলে জমির কি খাজনা তোমরা ধার্য করবে?'

ভীড়ের ভিতর থেকে কয়েকজন জবাব দিল, 'আমরা কি করে দর ঠিক

করব? আমরা সেটা করতে পারি না। জমি আপনার, তাই ক্ষমতাও আপনারই হাতে।'

'আহা, তা মোটেই নয়। সমবায়ের কাজে সে টাকা তো তোমরাই খাটাবে।'

'তা আমরা করতে পারি না। 'কম্যুন' এক জিনিস, আর এটা অন্য জিনিস।'

গোমস্তা হেসে বলল, (নেখ্‌লয়ুদভের সঙ্গে সেও সভায় এসেছে) 'তোমরা বুঝতে পারছ না। টাকার বিনিময়ে প্রিন্স তোমাদের জমি বন্দোবস্ত করে দিচ্ছেন এবং সেই টাকাটাই 'কম্যুন'-এর তহবিল গড়বার জন্য তোমাদের ফেরৎ দিচ্ছেন।'

চোখ না তুলেই একটি দন্তহীন বৃদ্ধ বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমরা খুব ভালই বুঝতে পেরেছি। অনেকটা ব্যাংকের মত; একটা নির্দিষ্ট সময়ে টাকাটা ফেরৎ দিতে হবে। সে আমরা চাই না; যে ব্যবস্থা চলছে সেটা কষ্টকর, কিন্তু ওটা আমাদের একেবারেই শেষ করে ফেলবে।'

জনাকয়েক অসন্তুষ্ট রুক্ষ গলায় বলে উঠল, 'ওটা ভাল পথ নয়। আমরা সাবেক ব্যবস্থায়ই চলতে চাই।'

এর পরে নেখ্‌লয়ুদভ যখন বলল যে সে একটা চুক্তি-নামার খসড়া প্রস্তুত করবে আর সে নিজে ও অন্য সকলকেই তাতে সই করতে হবে, তখন আপত্তি আরও সপ্তমে চড়ল।

'সই আবার কেন? এতদিন যেমন করে এসেছি, আমরা সেইভাবেই কাজ করব। এ সব দিয়ে কি হবে? আমরা বোকা-সোকা লোক।'

'আমরা এতে মত দিতে পারি না, কারণ ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুবই নতুন রকমের। যেমন চলছিল তেমনই চলুক। শুধু বীজের ব্যাপারটায় আমরা হাত গোটাতে চাই।'

এ কথার অর্থ হল, চলতি ব্যবস্থায় চাষীকেই বীজ দিতে হয়, কিন্তু চাষীরা চায় যে বীজটা জমিদারই দিক।

একটি মাঝ-বয়েসী খালি-পা চাষীকে নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'তাহলে আমি কি এই বুঝব যে তোমরা জমি নিতে চাও না?' লোকটির চোখ-মুখ বেশ উজ্জ্বল। গায়ে ছেঁড়া কোট, বাঁ হাতে জীর্ণ টুপিটাকে এমন ভঙ্গীতে ধরেছে যেমন সেনাপতির নির্দেশে সৈনিকরা সাধারণত করে থাকে।

লোকটি একসময়ে সেনাদলে ছিল। সামরিক জীবনের মোহ তার এখনও কাটে নি। সে বলল, 'ঠিক তাই।'

'তার মানে যথেষ্ট জমি তোমাদের আছে?' নেখ্‌লয়ুদভ প্রশ্ন করল।

প্রাক্তন সৈন্যটি জবাব দিল, 'না, স্যার, তা নেই।'

'আচ্ছা; তবু আমার কথাগুলি আর একবার ভেবে দেখো।'

বিস্মিত হলেও নেখ্‌ল্যুদভ তার প্রস্তাবটা পুনরায় রাখল।

বিষণ্ণ দন্তহীন বুড়োটি রেগে বলল, 'আমাদের ভাববার কিছু নেই; যা বলেছি, তাই হবে।'

'কাল পর্যন্ত আমি এখানে আছি। যদি তোমাদের মত পাল্টায়, লোক মারফৎ আমাকে জানিয়ে দিও।'

চাষীরা কোন জবাব দিল না।

সকলের সঙ্গে দেখা করে নেখ্‌ল্যুদভের কোন ফল হল না।

বাড়ি ফিরে গোমস্তাটি বলল, 'আমি বলছি প্রিন্স, ওদের সঙ্গে কোন চুক্তিতে আপনি যেতে পারবেন না; ওরা ভয়ানক একগুঁয়ে। ওরা সব সময় একটা কথাকেই আঁকড়ে ধরে থাকে, কিছুতেই তা থেকে ওদের নড়ানো যায় না। এর কারণ সব কিছুতেই ওদের ভয়। ওই তো, ওই চাষীদেরই কথা ধরুন না—ওই পাকা চুল আর কাঁচা চুল যেই হোক না—যারা একবাক্যে আপত্তি জানাল, ওরা কিন্তু খুব বুদ্ধিমান লোক। যখন ওদের একজন কেউ কাছারিতে আসে, বা এক সঙ্গে বসে চা খায়, তখন সে যেন জ্ঞান-মন্দিরের বাসিন্দা—তার মনটা একেবারে পাকা রাজনীতিকের—সব কিছু সে ঠিক ওজন করে বিচার করে। কিন্তু সভায় বসলে সে সম্পূর্ণ অন্য লোক,—একই কথা বার বার বলতে থাকে—'

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'আচ্ছা, ওদের মধ্যে কয়েকজন সত্যিকারের বুদ্ধিমান লোককে এখানে ডাকা যায় না? সব ব্যাপারটা তাঁদের ভাল করে বুঝিয়ে বলতাম।'

'তা ডাকা যেতে পারে,' হাসিমুখ গোমস্তাটি বলল।

'তাহলে, দয়া করে তাদের কালই ডাক।'

'নিশ্চয় ডাকব', বলে গোমস্তাটি আরও খোসমেজাজে হাসতে লাগল। 'কালই তাদের ডেকে পাঠাব।'

ফিরে যেতে যেতে একজন চাষী বলে উঠল, 'সই করবে। বটে, সই কর আর তিনি তোমাকে জ্যান্ত গিলে খান।'

একটি বুড়ো বলল, 'ঠিক কথা।' তারপর তারা চুপচাপ। বড় রাস্তা থেকে শুধু ঘোড়ার পায়ের শব্দ ভেসে আসছে।

অধ্যায়—৮

নেখ্‌ল্যুদভ ফিরে গিয়ে দেখল; কাছারি-ঘরেই তার শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘরে একটা উঁচু খাট পাতা হয়েছে; তাতে পালকের গদি ও দুটো বড় বড় বালিশ। একটা গাঢ় লাল রেশমের চমৎকার লেপ দিয়ে বিছানাটা ঢাকা। এটা নিশ্চয় গোমস্তার স্ত্রীর বিয়ের যৌতুক। গোমস্তা নেখ্‌ল্যুদভকে

আবার খেতে অনুরোধ করলে নেখ্‌লুদভ আপত্তি জানাল। তখন থাকা-খাওয়ার অব্যবস্থার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে গোমস্তা নেখ্‌লুদভকে একা রেখে চলে গেল।

চাষীদের আপত্তিতে নেখ্‌লুদভের কোনরকম মন খারাপ হয় নি। উপরন্তু কুজমিন্‌স্কোয়ে-তে তার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তারা তাকে ধন্যবাদও দিয়েছে। আর এখানে সে পেয়েছে শুধু সন্দেহ আর বিরূপতা, তবু তার মন খুশি ও আনন্দে ভরে উঠেছে।

অপরিচ্ছন্ন কাছারির কাছেই বাগান। নেখ্‌লুদভ উঠোনে নেমে বাগানের দিকেই যাচ্ছিল, এমন সময় সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল: দাসীদের ঘর, পাশের ফটক—মন খারাপ হয়ে গেল, পাপ স্মৃতিতে অপবিত্র করা সেই জায়গাটিতে যেতে তার মন চাইল না। দোরগোড়াতেই বসে পড়ল, বার্চ গাছের নতুন পাতার তীব্র গন্ধে আমোদিত উষ্ণ বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। কলের শব্দ ও পাশের ঝোপ থেকে ভেসে-আসা নাইটিঙ্গেল ও অন্য কোন পাখির একঘেয়ে ডাক শুনতে শুনতে সামনের অন্ধকার বাগানের দিকে তাকিয়ে সে অনেকক্ষণ বসে রইল। গোমস্তার জানালায় আলো নিভে গেল; পূব দিকে গোলাবাড়ির পিছন থেকে চাঁদের আলো ফুটে উঠল। আর সেই আলোয় ধ্বংসপ্রায় বাড়িটা এবং ফুলে ও আগাছায় ভর্তি বাগানটা ক্রমেই বেশী করে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। দূরে মেঘের ডাক শোনা গেল। আকাশের এক-তৃতীয়াংশ কালো মেঘে ঢেকে গেল। নাইটিঙ্গেল ও অন্য সব পাখিরা চুপচাপ। কল থেকে আসা জলের শব্দকে চাপিয়ে ভেসে এল হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক শব্দ; তারপরই গ্রামের ভিতর থেকে এবং গোমস্তার উঠোন থেকে প্রথম মোরগের ডাক শোনা গেল; ঝড়ের রাতে সাধারণত সে ডাকটা একটু আগেই শোনা যায়। একটা কথা আছে যে, প্রথম রাতে যদি মোরগ ডাকে তাহলে রাতটা ভাল কাটে। নেখ্‌লুদভের পক্ষে রাতটা তো ভালই কাটছে। সুখ ও আনন্দে ভরা একটি রাত। একটি নিষ্পাপ ছেলে হিসাবে যে বসন্তকালটা সে এখানে সুখে কাটিয়েছিল, কল্পনায় সেদিনটা নতুন হয়ে তার কাছে ফিরে এসেছে।

তার মনে পড়ল, কুজমিন্‌স্কোয়ে-তে তার মনে প্রলোভন জেগেছিল; বাড়ি; জঙ্গল, খামার ও জমির জন্য তার মনে ক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। সে নিজেকে প্রশ্ন করল, সে ক্ষোভ কি এখনও আছে? একসময় যে তার মনে ক্ষোভ জন্মেছিল তা ভেবেই সে আশ্চর্য বোধ করল। আজ সে যা কিছু দেখেছে সব মনে পড়তে লাগল: ছেলেমেয়ে সহ সেই স্ত্রীলোকটিকে মনে পড়ল যার স্বামী তার (নেখ্‌লুদভের) জঙ্গলের গাছ কেটেছিল বলে কারাগারে গেছে; ভয়ংকরী মাত্রিয়নাকে মনে পড়ল; সে তো মনে করে, তার মত অবস্থার মেয়েদের ভদ্রলোকদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সঙ্গে সঙ্গে তার

মনে ভেসে উঠল কারাগার, কামানো মাথা, সেল, দুর্গন্ধ, শিকল, এবং তারই পাশাপাশি ধনীদের (তাকে নিয়ে) প্রাচুর্যে ভরা নাগরিক জীবন। সব কিছুই তার কাছে সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ততক্ষণে গোলাবাড়ির মাথার উপর প্রায় ভরা চাঁদ উঠেছে। উঠোনের উপর কালো কালো ছায়া পড়েছে, আর ভেঙে-পড়া বাড়ির লোহার ছাদের উপর চাঁদের আলো পড়ে চকচক করছে।

যেন এ রাত যাতে বৃথা না যায় সেই জন্যই নাইটিঙ্গেল পাখিরা আবার গান শুরু করে দিল।

কালো মেঘে সারা আকাশটা ছেয়ে গেছে ; মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর তার আলোয় উঠোন ও ভাঙা ফটক সমেত পুরনো বাড়িটা দেখা যাচ্ছে ; মাথার উপর বজ্রের হুংকার উঠছে। পাখিরা সব চুপচাপ ; শুধু পাতাগুলি খসখস শব্দ করছে, আর বাতাস এসে নেখ্‌লুদভের চুল নিয়ে খেলা করছে। একটা বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল, আর একটা, তারপর গাছের পাতায় ও লোহার ছাদে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল, আর একটা বিদ্যুতের ঝলকানিতে বাতাস ভরে গেল। নেখ্‌লুদভ তিন পর্যন্ত গুণবার আগেই মাথার উপরে একটা বাজ গর্জে উঠে সমস্ত আকাশকে প্রতিধ্বনিত করে তুলল।

সে ঘরের ভিতর চলে গেল।

সে ভাবতে লাগল, 'ঠিক, ঠিক। আমরা যা কিছু করি, সারা জীবনে সব কাজ, তার অর্থ, কোন কিছুই আমার কাছে বোধগম্য নয়। আমার পিসীদের কাজ কি ছিল? কাতয়ুশারই বা কি কাজ? আর আমার সেই উন্মাদনা? সেই যুদ্ধ কেন হল? পরবর্তীকালের আমার উচ্ছৃংখল জীবনেরই বা অর্থ কি? এ সব বুঝতে পারা, প্রভুর সর্বাত্মক ইচ্ছাকে বুঝতে পারা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা আমার বিবেকের মধ্যে প্রতিফলিত, তাকে পূর্ণ করা আমার সাধ্যায়ত্ত—আর সেটা যে কি তা আমি ভালই জানি। সে কর্তব্য পালন করলেই আমি পাব নিশ্চিত শান্তি।'

মুষলধারে বৃষ্টি নামল। জল হু হু শব্দে ছাদ থেকে নীচের একটা টবের মধ্যে পড়ছে। তখনও মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। নেখ্‌লুদভ ঘরে গিয়ে পোশাক ছেড়ে শুয়ে পড়ল। তার ভয় হল, দেওয়ালের নোংরা ছেঁড়া কাগজের ভিতর নিশ্চয় ছারপোকা আছে।

'নিজেকে প্রভু না মনে করে ভৃত্য মনে করতে হবে', এই চিন্তায় তার মন উল্লসিত হয়ে উঠল।

তার আশংকা অমূলক নয়। মোমবাতি নেভানোর সঙ্গে সঙ্গেই ছারপোকাদের কামড় শুরু হল।

'সব কিছু ছেড়ে সাইবেরিয়ায় যাব—সেখানে তো পিসু-কীট, ছারপোকা, নোংরা সবই আছে। তাতে কি আসে যায়? যদি থাকেই, সব সহ্য করব।'

কিন্তু মনে যাই ভাবুক, কার্যক্ষেত্রে সে ছারপোকার কামড় সহ্য করতে পারল না। জানালার নীচে বসে অপসৃয়মান মেঘের ফাঁকে চাঁদের আবির্ভাবের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

অধ্যায়—৯

নেখ্‌লুদভের ঘুমুতে অনেক দেরী হল। ফলে তার ঘুম বেশ দেরীতেই ভাঙল।

দুপুরে গোমস্তার দ্বারা মনোনীত ও আমন্ত্রিত সাতজন চাষী ফল-বাগানে হাজির হল। সেখানেই মাটিতে খুঁটি পুঁতে তার উপর তক্তা পেতে গোমস্তা টেবিল ও বেঞ্চ বানিয়ে রেখেছিল। টুপি মাথায় রেখে সেখানে বসাতে চাষীদের অনেক সাধ্য-সাধনা করতে হল। বিশেষ করে প্রাক্তন সৈনিকটি তো কিছুতেই বসবে না। সে আজ বাকলের জুতো পরে এসেছে। শবযাত্রার সামরিক কানুন অনুসারে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে টুপিটা ধরে আছে। মাইকেল্যাঞ্জেলোর আঁকা মোজেসের ছবির মত দেখতে দাড়িতে গিঁট দেওয়া এবং টাক মাথা ঘিরে কোঁকড়ানো পাকা চুলওয়ালা একটি চওড়া-কাঁধ সম্ভ্রান্ত চেহারার চাষী যখন তার বড় টুপিটা মাথায় দিয়ে কোটটা গায়ে চাপিয়ে বেঞ্চিতে বসল, তখন অন্য সবাই তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল।

সকলে আসন গ্রহণ করলে নেখ্‌লুদভ তাদের উল্টো দিকে বসল এবং টেবিলের উপর রাখা তার প্রকল্পের খসড়া কাগজখানার উপর ঝুঁকে পড়ে কথা বলতে শুরু করল।

প্রথমেই সে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কে তার মতামত ব্যক্ত করল।

'আমার মতে জমির কেনা-বেচা চলতে পারে না। কারণ তা যদি চলত তাহলে যে লোকের যথেষ্ট টাকা আছে সে সব জমি কিনে নিয়ে যাদের কিছু জমিও নেই তাদের কাছ থেকে যা খুশি তাই আদায় করতে পারত।' স্পেন্সারের যুক্তিটা ব্যবহার করে সে আরও বলল, 'শেষ পর্যন্ত জমির উপর পা রাখবার জন্যও টাকা দাবী করতে পারত।'

সাদা দাড়ি ও চকচকে চোখওয়ালা বুড়োটি বলে উঠল, 'ওড়া বন্ধ করার একমাত্র ওষুধ—পাখাটা কেটে দাও।'

ভরাট গলায় দীর্ঘনাসা লোকটি বলল, 'ঠিক কথা।'

সাদা দাড়িওয়ালা খোঁড়া লোকটি বলল, 'একটা মেয়েছেলে তার গরুটার জন্য একটু ঘাস নিল; দাও তাকে ধরে কারাগারে পাঠিয়ে।'

'আমাদের নিজেদের জমি পাঁচ 'ভার্স্ট' (প্রায় ৩/৪ মাইল) দূরে, আর নতুন জমি খাজনায় নেওয়াও অসম্ভব; দর এত চড়া যে মজুরি পোষাবে না। তারা আমাদের দড়ির মত পাকাচ্ছে; আমরা ক্রীতদাসেরও অধম।' দন্তহীন

লোকটি বলল।

'আমি তোমাদের সঙ্গে একমত; জমি রাখাকে আমিও পাপ বলে মনে করি। তাই আমি জমি দিয়ে দিতে চাইছি', নেখ্‌লুদভ বলল।

মাইকেল্যাঞ্জেলোর মোজেসের মত দেখতে বুড়ো লোকটি ভাবল, নেখ্‌লুদভ খাজনায় জমি-বিলির কথাই বলছে। তাই সে বলল, 'বেশ তো, সে তো ভাল কথা।'

'আমি এখানে এসেছি কারণ আমি আর কোন জমিই দখলে রাখতে চাই না। এখন আমাদের ভাবতে হবে, কিভাবে জমি ভাগ করতে হবে।'

বিরক্ত দন্তহীন বুড়োটি বলল, 'চাষীদের সব দিয়ে দিন, তাহলেই তো হল।'

নেখ্‌লুদভ মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। তার মনে হল, এ কথাগুলির ভিতর দিয়ে তার সততার প্রতি সন্দেহই প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে ফিরে পেল এবং মনের কথা সজোরে প্রকাশ করে বলল, 'আমি তো তাদের দিতেই চাই। কিন্তু কাকে দেব? কেমন করে দেব? দয়মিন্‌স্কয়ের কম্যুনকে না দিয়ে তোমাদের কম্যুনকেই বা দেব কেন?' (দয়মিন্‌স্কয়ে পার্শ্ববর্তী একটা গ্রামের নাম; সেখানকার অধিবাসীদের কোন জমি নেই বললেই হয়।)

সকলেই চুপচাপ। প্রাক্তন সৈনিকটি শুধু বলল, 'ঠিক কথা।'

নেখ্‌লুদভ বলতে লাগল, 'তারপর ধরো, জার যদি বলেন যে জমিদারদের কাছ থেকে সব জমি কেড়ে নিয়ে চাষীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে..'

'এরকম কোন গুজব রটেছে নাকি?' বুড়ো লোকটি প্রশ্ন করল।

'না; জারের কাছ থেকে এরকম কোন নির্দেশ আসে নি। আমি কথার কথাই বলছি। জার যদি আদেশ জারি করেন যে সব জমি জমিদারদের কাছ থেকে নিয়ে চাষীদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে, তাহলে তোমরা কিভাবে ভাগ করবে?'

একজন উনুন-তৈরিকারক ভুরু নাচাতে নাচাতে বলে উঠল, 'কিভাবে? সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেব, প্রতিটি মানুষ, চাষী, জমিদার সমানভাবে এতটা করে জমি পাবে।'

পায়ে ডোরা-কাটা পট্টি লাগানো ভাল মানুষ খোঁড়া লোকটি বলল, 'আবার কি? প্রত্যেকের জন্য এতটা করে জমি।'

ব্যবস্থাটাকে সন্তোষজনক বিবেচনা করে সকলেই তাতে সায় দিল।

'জনপ্রতি এতটা জমি, এই তো? তাহলে বাড়ির চাকররাও একটা অংশ পাবে তো?' নেখ্‌লুদভ প্রশ্ন করল।

প্রাক্তন সৈনিকটি সাহস দেখিয়ে বলে উঠল, 'না স্যার।'

কিন্তু লম্বা বিবেচক লোকটি তার সঙ্গে একমত হল না।

সে বলল, 'ভাগ যদি করতেই হয়, সকলেই সমান অংশ পাবে।'

এর জবাব নেখ্‌লুদভের তৈরি করা ছিল। সে বলল, 'সেটা করা যাবে

না। সকলেই যদি সমান অংশ পায়, তাহলে যারা নিজেরা জমিতে কাজ করে না, জমি চাষ করে না—মনিব ও ভৃত্য, রাঁধুনি, পদস্থ কর্মচারী, করণিক, শহরের লোকেরা—তারা তো ধনীদের কাছে তাদের অংশ বিক্রি করে দেবে। জমি আবার ধনীদের হাতে গিয়ে উঠবে। যারা জমিতে কাজ করে খায় তাদের সংখ্যা বাড়বে, আর জমি আবার দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠবে। তাহলে জমি যারা চায় তারা আবার ধনীদের খপ্পরে গিয়ে পড়বে।'

প্রাক্তন সৈনিকটি বলে উঠল, 'ঠিক তাই।'

উনুন তৈরিকারক রেগে বাধা দিল, 'জমি বিক্রি বন্ধ করে দিন; যাতে যে জমি চাষ করবে সেই শুধু জমি পায়।'

নেখ্‌লয়ুদভ জবাবে বলল, কে নিজের জন্য চাষ করছে আর কে পরের জন্য চাষ করছে সেটা জানা অসম্ভব।

লম্বা বিবেচক লোকটি প্রস্তাব করল, এমন একটা ব্যবস্থা করা হোক যাতে সকলকেই একসঙ্গে চাষের কাজ করতে হবে এবং যারা চাষ করবে তারা ফসলের ভাগ পাবে, যারা করবে না তারা কিছুই পাবে না।

এই সাম্যবাদী প্রকল্পের জবাবও নেখ্‌লয়ুদভের হাতে তৈরিই ছিল। সে বলল, এরকম ব্যবস্থা করতে হলে প্রত্যেকের লাঙল থাকতে হবে ও সমান সংখ্যক ঘোড়া থাকতে হবে, যাতে কাউকে বসে যেতে না হয়; তাছাড়া লাঙল, ঘোড়া, ঝাড়াই-যন্ত্র এবং অন্য সব যন্ত্রপাতি সকলের সম্পত্তি হওয়া চাই, আর তা করতে হলে সকলের তাতে সম্মতি থাকা চাই।

বিরক্ত বুড়োটি বলে উঠল, 'আমাদের লোকজনরা সারা জীবনেও এবিষয়ে একমত হতে পারবে না।'

আর একজন বলল, 'আমাদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাবে। মেয়েরা এ-ওর চোখ উপড়ে নেবে।'

নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'তাছাড়া জমির ভাল-মন্দের কি হবে? একজন ভাল জমি পাবে, আর একজন শুধু কাদা আর বালি পাবে কেন?'

উনুন-তৈরিকারক বলল, 'সব জমিই ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করে প্রত্যেককে এক ভাগ করে দিয়ে দিলেই হবে।'

তার জবাবে নেখ্‌লয়ুদভ জানাল, 'শুধু একটা কম্যুনের জমি ভাগের প্রশ্ন তো নয়, আমাদের ভাবতে হবে বিভিন্ন জেলার সব জমি-বণ্টনের কথা। চাষীদের যদি বিনামূল্যেই জমি দেওয়া হয়, তাহলে কেউ ভাল জমি আর কেউ মন্দ জমি পাবে কেন? সকলেই তো ভাল জমি চাইবে।'

প্রাক্তন সৈনিকটি বলল, 'ঠিক কথা।'

অন্য সকলেই চুপচাপ।

নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'কাজেই ব্যাপারটাকে যত সহজ মনে হয় আসলে তা নয়। শুধু আমরা নই, আরও অনেকেই এবিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন। একজন

আমেরিকান ভদ্রলোক আছেন তার নাম হেনরি জর্জ; তিনি এইভাবেই ব্যাপারটাকে দেখেছেন, আর তার সঙ্গে আমি একমত......'

বিরক্ত বুড়োটি বলে উঠল, 'আপনি মনিব, আপনি যেমন ইচ্ছা করতে পারেন। আপনাকে কে ঠেকাচ্ছে? ক্ষমতা আপনার হাতে।'

নেখ্‌ল্যুদভ বিচলিত হল; তবে এই দেখে সে খুশি হল যে লোকটির কথা বলায় শুধু যে সেই অসন্তুষ্ট হয়েছে তা নয়।

বিবেচক লোকটিও গম্ভীর গলায় বলল 'তুমি একটু থামো তো সেম্যন খুড়ো! ওকে কথা বলতে দাও।'

এ-কথায় উৎসাহিত হয়ে নেখ্‌ল্যুদভ হেনরি জর্জের একক-করনীতির ব্যাখ্যা শুরু করল।

'পৃথিবীটা মানুষের নয়; এটা ঈশ্বরের', এই বলে সে শুরু করল।

কয়েকজন সমস্বরে বলল, 'ঠিক তাই, ঠিক তাই।'

জমি সকলের। সকলেরই তাতে সমান অধিকার। কিন্তু জমির ভাল-মন্দ আছে। আর সকলেই ভাল জমিটা পেতে চাইবে। ঠিক ঠিক ভাগ কি ভাবে করা যায়? এইভাবে: যে ভাল জমি পেয়েছে সে অন্যকে তার দাম ধরে দেবে। এইভাবে নেখ্‌ল্যুদভ তার নিজের প্রশ্নেরই জবাব দিতে লাগল। 'যেহেতু কে কাকে দামটা দেবে সেটা বলা খুব শক্ত, এবং যেহেতু কম্যুনেরও টাকার প্রয়োজন সেইজন্য ব্যবস্থা থাকা দরকার যে, ভাল জমি যে ব্যবহার করবে সে তার দামটা কম্যুনের প্রয়োজনে দিয়ে দেবে। তাহলে সকলেই সমানভাবে তার ভাগ পাবে। তুমি যদি জমি চাও, দাম দাও—ভাল জমি হলে বেশী দাম; মন্দ জমি হলে অল্প দাম। যদি তুমি জমি না চাও, টাকা দিও না; সেক্ষেত্রে যারা জমি ব্যবহার করবে তারাই তোমার হয়ে কর ও কম্যুনের অন্য ব্যয়ভার বহন করবে।'

ভুরু নাচাতে নাচাতে উনুন-তৈরিকারক বলল, 'ঠিক কথা। যে ভাল জমি নেবে সে বেশী দাম দেবে।'

দড়িতে গিঁট-দেওয়া গ্রাম্য-বৃদ্ধ বলল, 'দেখছি, জর্জ লোকটার মাথা আছে!'

প্রকল্পের অর্থ বুঝতে পেরে লম্বা লোকটি গম্ভীর গলায় বলল, 'অবশ্য টাকাটা যদি আমাদের সাধ্যের মধ্যে হয়।'

নেখ্‌ল্যুদভ জবাবে বলল, 'টাকাটা খুব বেশী হওয়াও উচিত নয়, খুব অল্প হওয়াও উচিত নয়। খুব বেশী হলে সেটা আদায় হবে না, ফলে লোকসান হবে; খুব অল্প হলে জমির বেচা-কেনা শুরু হয়ে যাবে। জমির ব্যবসা চালু হয়ে যাবে। দেখ, তোমাদের জন্য এই ব্যবস্থাই আমি করতে চাই।'

চাষীরা উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, 'এটাই ন্যায়, এটাই ঠিক; হ্যাঁ, এতেই হবে।'

কোঁকড়া-চুল, চওড়া-কাঁধ বুড়োটি বলল, 'এই জর্জ লোকটির মাথা ছিল। দেখ না, কী একখানা বানিয়েছে।'

সদাহাস্যময় গোমস্তাটি বলল, 'আচ্ছা, ধরুন আমি কিছু জমি নিতে চাই, তখন?'

'যদি দেবার মত জমি তখন থাকে, তাহলে নেবে, চাষ করবে', নেখ্‌লয়ুদভ বলল।

যাহোক, এইভাবে সভা শেষ হয়ে গেল।

নেখ্‌লয়ুদভ পুনরায় তার প্রস্তাবটা রেখে জানাল, এখনই জবাব দেবার দরকার নেই, কম্যুনের অন্য লোকদের সঙ্গে আলোচনা করে তারা যেন ফলাফল তাকে জানায়।

আলোচনা করে জবাব দেবে বলে চাষীরা খুবই উত্তেজিতভাবে সেখান থেকে চলে গেল। পথে যেতে যেতে তাদের জোরালো কথাবার্তা কানে আসছিল, আর অনেক রাতে তাদের কণ্ঠস্বর গ্রামের নদীর স্রোতে ভেসে আসছিল।

চাষীরা পরদিন কাজে গেল না; জমিদারের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করে কাটাল। কম্যুন দুই দলে ভাগ হয়ে গেল—একদল রায় দিল, প্রস্তাবটা লাভজনক এবং গ্রহণ করায় কোন বিপদ নেই, আর দ্বিতীয় দল প্রস্তাবটা না বুঝেই ভয়ে নানারকম সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগল। যাহোক, তৃতীয় দিনে সকলে একমত হল এবং নেখ্‌লয়ুদভের কাছে লোক পাঠিয়ে প্রস্তাব গ্রহণের কথা জানিয়ে দিল।

'মনিব' সকলকে টাকা-পয়সা দান করছে একথা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় দলে দলে লোক, বিশেষ করে মেয়েরা, তার কাছে ভিড় করতে লাগল। কি করে দিতে হবে, কত দিতে হবে, কাকে দিতে হবে—এসব কিছুই নেখ্‌লয়ুদভ জানে না। তার শুধু একটি কথাই মনে হল, তার যখন অনেক টাকা আছে তখন এই সব গরীব মানুষের টাকা দিতে অস্বীকার করা অসম্ভব; আবার যে এসে চাইবে তাকেই যখন-তখন টাকা দেওয়াও সঙ্গত নয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের একটিমাত্র পথই তার চোখে পড়ল—সেটা হল এখান থেকে চলে যাওয়া, আর তাই সে করল।

পানোভো থেকে যাবার শেষ দিনটিতে নেখ্‌লয়ুদভ পিসীদের বাড়ির জিনিসপত্রগুলি ঘুরে ঘুরে দেখল। মেহগেনি কাঠের পোশাকের আলমারির নীচের দেরাজটার গায়ে আংটা-পরানো একটা পিতলের সিংহের মাথা লাগানো ছিল। তার মধ্যে সে কিছু চিঠিপত্র পেল, আর পেল একখানা গ্রুপ-ফটোগ্রাফ, তাতে রয়েছে দুই পিসী সোফিয়া আইভানভ্‌না ও মারিয়া আইভানভ্‌না, ছাত্রবেশে সে নিজে, আর পবিত্র প্রিয়দর্শিনী, আনন্দময়ী কাতয়ুশা। চিঠিগুলি ও ফটোগ্রাফখানা সে নিল। বাকি সবকিছু সে

কলওয়ালাকে দিয়ে গেল। সদাহাস্যময় গোমস্তার পরামর্শে সবকিছু সমেত বাড়িটাকে সে কলওয়ালার কাছেই বিক্রি করে দিয়েছে প্রকৃত দামের দশ ভাগের এক ভাগ দামে। গাড়ি বোঝাই করে সব জিনিস সেই নিয়ে যাবে।

কুজমিন্স্কোয়ে-তে সম্পত্তি হারিয়ে সে কেন অনুতপ্ত হয়েছিল সেকথা মনে পড়ায় নেখ্লুদভ বিস্ময় বোধ করতে লাগল। আজ কিন্তু মুক্তির অবিরাম আনন্দ ছাড়া তার মনে আর কোন অনুভূতি নেই; কোন পথিক যখন নতুন দেশ আবিষ্কার করে তখন তার মনে নতুনত্বের যে স্বাদ জাগে সেই স্বাদ তার মনকেও জুড়ে রইল।

অধ্যায়—১০

ফিরে এসে নেখ্লুদভ শহরটাকে যেন নতুন চোখে দেখল। সন্ধ্যায় সে যখন পৌঁছল তখন আলো জ্বলেছে। গাড়ি চেপে স্টেশন থেকে বাড়ি পৌঁছে দেখল, তখনও ঘরময় ন্যাপথালিনের গন্ধ; যেসব জিনিসপত্র শুধু ঝুলিয়ে রাখা, বাতাসে দেওয়া এবং বাক্সবন্দী করে রাখার জন্যই সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে মনে হয়, তা নিয়ে আগ্রাফেনা পেত্রভ্না ও করনেই দুজনেই ক্লান্ত ও বিরক্ত; এমন কি তা নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়াও হয়ে গেছে। নেখ্লুদভের ঘরটা খালি, কিন্তু গোছানো নয়, ঘরে ঢুকবার পথটা পর্যন্ত ট্রাংক দিয়ে ঠাসা। বোঝাই যাচ্ছে, তার আসার জন্যই কাজটা মাঝপথে থেমে গেছে। চাষীদের জীবনের যে দুঃখ সে দেখেছে তাতে এইসব কাজের বোকামি তার কাছে এতই স্পষ্ট হয়ে তার চোখে পড়ল যে, নেখ্লুদভ পরদিনই কোন বোর্ডিংএ চলে যাওয়া স্থির করল। এদিকে আগ্রাফেনা পেত্রভ্না তার বুদ্ধিমত জিনিসপত্রের যে ব্যবস্থা হয় করুক, পরে তার দিদি এসে বাড়ির চূড়ান্ত বিলি-বন্দোবস্ত করবে।

খুব সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নেখ্লুদভ কারাগারের কাছাকাছি একটা মোটামুটি ধরনের লজিং-হাউসের দুটো ঘর পছন্দ করল, এবং তার কিছু কিছু জিনিসপত্র সেখানে পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে অ্যাডভোকেটের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেল।

বাইরে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। ঝড়-বৃষ্টির পরেই ঠাণ্ডা পড়েছে, বসন্তকালে যেমন সাধারণত হয়ে থাকে। বাইরে এত ঠাণ্ডা আর বাতাস এত তীব্র যে হালকা ওভারকোট পরেও তার বেশ শীত করছিল। তাই গরম হবার আশায় সে জোরে হাঁটতে লাগল।

একটা রাস্তায় লোহা-বোঝাই একসার গাড়ি তার সামনে পড়ে গেল। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় সেই লোহার এমন কর্কশ শব্দ হতে লাগল যে তার কান ও মাথা ধরার মত অবস্থা। গাড়িগুলোকে পার হয়ে যাবার জন্য সে

আরও জোরে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ সেই ঝন্-ঝন্ শব্দকে ছাপিয়ে কে যেন তার নাম ধরে ডাক দিল। সে দাঁড়াল। দেখতে পেল, একখানি বড় ইজভজচিকে বসে একজন অফিসার বন্ধুর মত হাত নাড়ছে। তার চকচকে মুখে মোমে-মাজা সুঁচলো গোঁফ: হাসতে গিয়ে দুপাটি অস্বাভাবিক সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।

'নেখ্লয়ুদভ, তুমি?'

নেখ্লয়ুদভ বেশ খুশি বোধ করল।

সানন্দে চেঁচিয়ে বলল, 'আবে শেনবক!' কিন্তু পরমুহূর্তেই সে বুঝতে পারল, খুশি হবার কোন কারণ নেই।

অনেকদিন আগে নেখ্লয়ুদভের পিসীদের বাড়িতে যে গিয়েছিল এ সেই শেনবক। নেখ্লয়ুদভের সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি, কিন্তু সে শুনেছে, অনেক ধার-দেনা সত্ত্বেও সে এখনও অশ্বারোহী বাহিনীতেই আছে, এবং যেকরেই হোক বেশ ধনীদের দলেই চলাফেরা করছে। তার প্রফুল্ল সুখী চেহারা সেই সংবাদকেই সমর্থন করছে।

গাড়ি থেকে নেমে গলা বাড়িয়ে সে বলল, 'কী ভাগ্যি, তোমার দেখা পেলাম। শহরে তো জানাশোনা কেউ নেই। আরে ভাই, তুমি তো বেশ বুড়িয়ে গেছ। শুধু তোমার হাঁটার চলন দেখেই আমি চিনতে পেরেছি। দেখ, আজ একসঙ্গে খাব। বেশ ভাল খাওয়ার এমন কোন জায়গা জানা আছে কি?'

সঙ্গীকে কোনরকম আঘাত না দিয়েও কি করে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় সেকথা ভেবেই নেখ্লয়ুদভ বলল, 'আমার তো সময় হবে না। তা, তুমি এখানে কেন?'

'কাজ রে ভাই, কাজ। অভিভাবকের কাজ। আমি এখন একজন অভিভাবক। কোটিপতি সামানভ্দের নাম শুনেছ তো, আমিই তাদের সবকিছু দেখাশুনা করি। তার মাথার ঘিলু নরম হলে কি হবে, চুয়ান্ন হাজার 'দেসতিন' জমির সে মালিক', এমন গর্বভরে সে কথা বলল যেন এসব জমি সেই সংগ্রহ করেছে। 'তার জমিদারির হাল খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। সব জমি চাষীদের খাজনা-বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, আর তারা এক পয়সাও দিত না, ফলে আশি হাজার রুবলেরও বেশী দেনা হয়েছিল। এক বছরে আমি চেহারা পাল্টে দিয়েছি; জমিদারীর আয় শতকরা সত্তর ভাগ বাড়িয়ে দিয়েছি। তুমি কি মনে কর?' বেশ গর্বভরেই সে প্রশ্ন করল।

নেখ্লয়ুদভের মনে পড়ল এ সবই সে শুনেছে। নিজের সবকিছু খুইয়ে ঋণের পর ঋণের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে যেকোন ফিকিরেই হোক শেনবক এমন একটি ধনী বৃদ্ধের অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছে যার বিষয়-সম্পত্তি তচনচ হয়ে যাচ্ছিল; এখন সেই অভিভাবকত্বই শেনবকের জীবিকা।

লোকটির মোমে-মাজা গোঁফ ও চকচকে ফোলা-ফোলা মুখের দিকে তাকিয়ে, তার বন্ধুর মত সরস আলাপ ও ভাল খাবারের সন্ধান এবং অভিভাবক হিসাবে তার কাজকর্মের সগর্ব বর্ণনা শুনে নেখ্‌ল্যুদভ ভাবল, 'ওকে আঘাত না দিয়েও কেমন করে ওর হাত থেকে উদ্ধার পাই?'

'তাহলে কোথায় খাওয়া যায় বল?'

ঘড়ি দেখে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'সত্যি বলছি, আমার সময় নেই।'

'ঠিক আছে। আচ্ছা, আজ রাতে ঘোড়দৌড়ের মাঠে যেতে পারবে?'

'না, তাও পারব না।'

'আরে, একবার এস না। আমার তো এখন নিজের ঘোড়া নেই, আমি গ্রীশার ঘোড়ার উপরে বাজী রাখি। মনে আছে তো, তার একটা চমৎকার ঘোড়া আছে। তাহলে তুমি আসছ? রাতে একসঙ্গে খাওয়া যাবে।'

নেখ্‌ল্যুদভ হেসে বলল, 'না ভাই, তোমার সঙ্গে খেতে যেতেও পারব না।'

'দেখ এটা কিন্তু খুব খারাপ হচ্ছে। এখন চলেছ কোথায়? তোমাকে পৌঁছে দেব কি?'

'একজন অ্যাডভোকেটের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, কাছে—মোড়টা ঘুরলেই।'

'ঠিক আছে। তুমি কারাগার নিয়ে মেতে উঠেছ—কয়েদীদের হয়ে লড়ছ, এরকমটা শুনেছি,' শেনবক হাসতে হাসতে বলল। 'করচাগিনরা আমাকে বলেছে। তারাও তো শহর ছেড়ে চলে গেছে। ব্যাপার কি বল তো?'

নেখ্‌ল্যুদভ জবাব দিল, 'ঠিকই শুনেছ। কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো এসব কথা হয় না।'

'তা বটে, তা বটে; তোমার মাথার স্ক্রু সব সময়েই একটু ঢিলে। যাক গে, তা ঘোড়দৌড়ে আসছ তো?'

'না, যেতে পারব না; আসলে আমার যাবার ইচ্ছাই নেই। দয়া করে আমার উপর রাগ করো না।'

'রাগ? আরে, না না। আচ্ছা, তাহলে চলি। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব খুশি হলাম।' নেখ্‌ল্যুদভের হাতখানাকে সাদরে চাপ দিয়ে সে লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে বসল এবং চকচকে মুখের সামনে সাদা দস্তানা পরা হাতটা নাড়তে লাগল, মুখের স্বভাবসিদ্ধ হাসির ফলে অস্বাভাবিক সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল।

অ্যাডভোকেটের বাড়ির দিকে যেতে যেতে নেখ্‌ল্যুদভ ভাবতে লাগল, 'আমিও কি ঐরকমই হতাম? হ্যাঁ, ঠিক ওরকম আমি নই, তবু ওইরকমই হতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, ঐভাবেই জীবন-যাপন করব।'

অধ্যায়—১১

নেখ্‌লুদভের সময় হবার আগেই অ্যাডভোকেট তাকে ডেকে পাঠাল এবং মেনশভদের মামলা নিয়ে কথা শুরু করে দিল।

সে বলল, 'মামলাটা অত্যন্ত আপত্তিকর। বাড়িটার দরুণ বীমার টাকাটা পাবার জন্য মালিক নিজেই বাড়িতে আগুন দিয়েছে, এটা তো হতেই পারে। কিন্তু আসল কথা হল, মেনশভদের অপরাধ একেবারেই প্রমাণ হয় নি। ম্যাজিস্ট্রেটের উদাসীনতা এবং সরকারী উকিলের অতিরিক্ত উৎসাহই এর কারণ। প্রাদেশিক আদালতে না হয়ে যদি এখানে তাদের বিচার হয়, তাহলে আমি নিশ্চয় করে বলছি তারা খালাস পাবে, আর আমি একটি পয়সাও নেব না।'

পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে নেখ্‌লুদভ বলল, 'আমার কাছে একটা চিঠি এসেছে। তারা যা লিখেছে তা যদি সত্য হয় তাহলে কেসটা খুবই ইন্টারেস্টিং। আজ আমি নিজে তাদের সঙ্গে দেখা করে সব কথা জানতে চেষ্টা করব।'

অ্যাডভোকেট হেসে বলল, 'আপনি দেখছি একটা ফানেল হয়ে উঠেছেন, আর তার ভিতর দিয়ে কারাগারে যত অভিযোগ সব ঢালা হচ্ছে। কিন্তু বড়ই বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে ; এতটা সামলাতে পারবেন না।'

'তা পারব না। কিন্তু ঘটনাটি খুবই উল্লেখযোগ্য', বলে নেখ্‌লুদভ নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল : বাইবেল পাঠ করবার জন্য কিছু চাষী তাদের গ্রামে সমবেত হয় এবং কর্তৃপক্ষ এসে তাদের হটিয়ে দেয়। পরবর্তী রবিবারে তারা আবার একত্র হয় এবং একজন পুলিশের লোক এসে তাদের গ্রেপ্তার করে ও আদালতে হাজির করে। ম্যাজিস্ট্রেট তাদের জেরা করে, সরকারী উকিল চার্জশিট দেয় এবং বিচারকরা তাদের দায়রায় সোপর্দ করে। সরকারী উকিল তাদের অপরাধের প্রমাণস্বরূপ কয়েকখানি বাইবেল দাখিল করে এবং তাদের নির্বাসনদণ্ড হয়। 'কী সাংঘাতিক কথা! এও কি সত্য হতে পারে?'

'আপনি কিসে অবাক হচ্ছেন?'

'কেন, সব কিছুতে। পুলিশ-অফিসারকে আমি বুঝতে পারি, কারণ তার কাজ হুকুম তামিল করা। কিন্তু সরকারী উকিল এ ধরনের একটা মামলা খাড়া করতে পারলেন? একজন শিক্ষিত লোক হয়ে—'

'এখানেই ভুল করেন। সরকারী উকিল ও বিচারকদের আমরা উদারদৃষ্টি-সম্পন্ন লোক বলেই ভাবতে অভ্যস্ত। একসময়ে তারা তাই ছিলেন, কিন্তু এখন দিনকাল পাল্টে গেছে। তারা এখন শুধুই কর্মচারি, তাদের একমাত্র লক্ষ্য মাইনের দিনটি। তারা মাইনে পান, আরও বেশী মাইনে চান, বাস, সেখানেই ন্যায়-নীতির ইতি। আপনি যাকে চান তারা তাকেই অভিযুক্ত

করবে, তার বিচার করবে, তাকে শাস্তি দেবে।'

'ঠিক ; কিন্তু অপরের সঙ্গে একত্র হয়ে বাইবেল পড়লেই একটা লোককে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনদণ্ড দেবার কোন আইন তো সত্যি নেই।'

'আছে, নির্বাসনদণ্ডের ব্যবস্থা আছে, শুধু যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে, বাইবেল পাঠ করতে গিয়ে সে নির্দেশ-বহির্ভূতভাবে অন্যের কাছে বাইবেলের অপব্যাখ্যা করেছে এবং গীর্জা-কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে নিন্দা করেছে। প্রকাশ্যে গ্রীক গোড়া ধর্মমতের নিন্দা করার অর্থই হল ১৯৬ ধারা মতে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন।'

'অসম্ভব!'

'আমি বলছি, ঠিক তাই। এইসব বিচারক ভদ্রলোকদের আমি তো সব সময়ই বলি, তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই ; কারণ আমি, আপনি ও অন্য সবাই যে কারাগারে যাই নি সেটা তো তাদের অনুগ্রহে। সব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে সাইবেরিয়ার অপেক্ষাকৃত স্বল্প দূরবর্তী অঞ্চলে আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া তো তাদের কাছে খুব সোজা ব্যাপার।'

'দেখুন, তাই যদি হয়, সবকিছু যদি ন্যায়াধীশ ও অন্যদের উপরেই নির্ভর করে, তাই যদি ইচ্ছামত আইন প্রয়োগ করতে বা না করতে পারেন, তাহলে এইসব বিচার-ব্যবস্থার দরকার কি ?'

অ্যাডভোকেট প্রাণ খুলে হেসে উঠল। 'আপনি অদ্ভুত সব প্রশ্ন করেন! প্রিয় মহাশয়, এসব তো দর্শনের কথা। তা সেবিষয়েও কথা হতে পারে। আপনি কি শনিবারে আসতে পারবেন ? আমার বাড়িতে বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের একটা বৈঠক বসবে ; সেখানে এইসব অমূর্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে।' কথাগুলি বলবার সময় অ্যাডভোকেট 'বিমূর্ত বিষয়' শব্দ দুটির উপর ব্যঙ্গাত্মকভাবে জোর দিল। 'আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে কি ? তাহলে চলে আসুন।'

'ধন্যবাদ, চেষ্টা করব', নেখ্‌ল্যুদভ বলল। সে জানে সে মিথ্যা বলছে। এই মুহূর্তে সে যদি কোন কিছু করতে সচেষ্ট হয়, তাহলে সেটা হবে অ্যাডভোকেটের সেই সান্ধ্য বৈঠক এবং তার বিজ্ঞানী, শিল্পী ও সাহিত্যিক-চক্র থেকে দূরে থাকা।

নেখ্‌ল্যুদভ যখন বলল যে বিচারকরা যদি তাদের ইচ্ছামতই আইন প্রয়োগ করতে বা না করতে পারে তাহলে তো বিচারের কোন অর্থই হয় না, তখন অ্যাডভোকেট যেভাবে হেসে উঠল এবং যে সুরে সে 'দর্শন' ও 'অমূর্ত বিষয়' কথাগুলি উচ্চারণ করল, তাতেই নেখ্‌ল্যুদভ পরিষ্কার বুঝতে পারল, সে এবং অ্যাডভোকেট, সম্ভবত তার বন্ধুরাও, কতখানি ভিন্ন দৃষ্টিতে সবকিছুকে দেখে ; সে আরও বুঝল, তার বন্ধু শেনবক প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য যত বেশীই হোক, তার এবং অ্যাডভোকেট ও তার বন্ধুমহলের পার্থক্য আরও অনেক বেশী।

অধ্যায়—১২

কারাগার অনেকটা পথ। দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে নেখ্‌লুদভ একটা ইজভজচিক ভাড়া করল। ইজভজচিক লোকটি মাঝ-বয়সী, বুদ্ধিমান, দয়ালু। একটা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সে নেখ্‌লুদভের দিকে ফিরে একটা নির্মীয়মান প্রকাণ্ড বাড়ি তাকে দেখাল।

'দেখুন, কী প্রকাণ্ড একটা বাড়ি তুলছে,' এমনভাবে কথাটা বলল যেন সে নিজেও ঐ বাড়ি তৈরির সঙ্গে জড়িত এবং সেজন্য গর্বিত।

বাড়িটা সত্যি প্রকাণ্ড; গঠনভঙ্গী জটিল ও মৌলিক। লোহা দিয়ে বাঁধা বিরাট সব পাইনের খুঁটি দিয়ে বাড়িটার চারদিকে ভারা বাঁধা হয়েছে। একটা সাইনবোর্ড দিয়ে বাড়িটাকে রাস্তা থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। ভারার তক্তার উপরে সারা গায়ে মশলা-মাখা মজুররা পিঁপড়ের মত এদিক-ওদিক চলাফেরা করছে। কেউ ইঁট বসাচ্ছে, কেউ ইঁট কাটছে, কেউ বা ভারী ভারী হাতওয়ালা পাত্র ও বালতি তুলছে আর সেগুলিকে খালি করে নামাচ্ছে।

একজন স্থূলকায় সুবেশ ভদ্রলোক—সম্ভবত স্থপতি—ভারার পাশে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে দেখিয়ে কণ্ট্রাক্টরকে কি যেন বোঝাচ্ছে। কণ্ট্রাক্টরটি ভ্লাদিমির জেলার একটি চাষী। সে সসম্ভ্রমে সবকিছু শুনছে। সব মাল-বোঝাই গাড়ি গেট দিয়ে ঢুকছে এবং খালি হয়ে বেরিয়ে স্থপতি ও কণ্ট্রাক্টরের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে।

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে নেখ্‌লুদভ ভাবতে লাগল, 'যারা এখানে কাজ করছে আর যারা কাজ করাচ্ছে সকলেই কত নিশ্চিত। বাড়িতে তাদের স্ত্রীরা সাধ্যের অতীত পরিশ্রম করছে, তালি-মারা, টুপি-পরা সন্তানরা অনাহারে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, কচি মুখে বুড়োদের মত হাসতে হাসতে তাদের ছোট ছোট ঠ্যাংগুলি বেঁকে যাচ্ছে, আর এখানে তারা এই অর্থহীন অদরকারী প্রাসাদ তৈরি করে চলেছে এমন কোন অর্থহীন অদরকারী লোকের জন্য যে তাদেরই একজন যারা তাদের সর্বস্ব হরণ করেছে, তাদের ধ্বংস করেছে।'

চিন্তাকে ভাষা দিয়ে সে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, একটা অর্থহীন বাড়ি।'

অসন্তুষ্ট গলায় ইজভজচিক* বলল, 'অর্থহীন কেন? বাড়িটা উঠছে তাই লোকে কাজ পাচ্ছে; এটা অর্থহীন নয়।'

'কিন্তু কাজটা তো অদরকারী।'

'অদরকারী হতে পারে না; তাহলে কাজটা করা হবে কেন? এর দ্বারা

* গাড়ি ও চালক উভয়কে ইজভজচিক বলা হয়

লোকের রুজি-রোজগার হচ্ছে।'

নেখ্‌লয়ুদভ চুপ করল, কারণ চাকার শব্দকে ছাপিয়ে কথা বলা শক্ত।

কারাগারের কাছে পৌঁছে ইজভজচিক যখন পাথরের রাস্তা থেকে বাঁধানো রাস্তায় পড়ল, তখন কথা বলা সহজসাধ্য হওয়ায় সে আবার নেখ্‌লয়ুদভের দিকে ঘাড় ফেরাল।

ভেড়ার চামড়ার কোট পরে কাঁধে বোঁচকা বেঁধে করাত-কুড়ুল হাতে একদল চাষী-মজুর এগিয়ে আসছিল। তাদের দেখিয়ে ইজভজচিক বলল, কত লোক যে আজকাল শহরে এসে ভীড় করছে; ভয়ংকর অবস্থা।'

'অন্যান্য বছর থেকে বেশী কি?' নেখ্‌লয়ুদভ জিজ্ঞাসা করল।

'অনেক বেশী। এ বছর সব জায়গায় লোক গিজগিজ করছে। অবস্থা ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। মালিকরা তাদের তুষের মত ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে। একটা কাজও জুটছে না।'

'এরকম হল কেন?'

'অনেক বেশী লোক এসেছে। তত লোকের জায়গা নেই।'

'তা তো হল, কিন্তু এত লোক এসেছে কেন? তারা গ্রামে থাকছে না কেন?'

'গ্রামেও তো কোন কাজ নেই। জমি মিলছে না।'

ক্ষতস্থানে আঘাত লাগলে যেমন হয় নেখ্‌লয়ুদভের মনের অবস্থা তেমনি। লোকে মনে করে, ঘায়ের জায়গায়ই বুঝি আঘাত লাগে; আসলে ঘা আছে বলে আঘাত লাগে।

'এও কি সম্ভব যে সর্বত্র একই জিনিস ঘটছে?' এই কথা ভেবে নেখ্‌লয়ুদভ ইজভজচিককে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল—তার গাঁয়ের জমি কেমন, তার নিজের কতটা জমি আছে, সে কেন গাঁ ছেড়ে এসেছে।

ইজভজচিক স্বেচ্ছায় বলতে লাগল, 'জনপ্রতি আমাদের এক "দেসাতিন" করে জমি আছে স্যার, আর আমার পরিবারের আছে তিনজনের অংশ। আমার বাবা ও এক ভাই বাড়িতে থাকে জমি-জমা দেখে, আর এক ভাই ফৌজীতে কাজ করে। কিন্তু বাড়িতে কাজকর্ম কিছু নেই। তাই ভাইও ভাবছে মস্কোতে চলে আসবে।'

'আরও জমি কি খাজনায় পাওয়া যায় না?'

'কি করে আর পাওয়া যাবে? ভদ্রলোকরা তাদের জমি-জমা সব উড়িয়ে দিয়েছে, সব গিয়ে ঢুকেছে ব্যবসায়ীদের হাতের মধ্যে। তাদের কাছ থেকে খাজনায় জমি পাওয়া যায় না—তারা নিজেরাই চাষ-আবাদ করে। আমাদের অঞ্চলে একজন ফরাসী এসেছে; আমাদের সাবেক জমিদারের কাছ থেকে সে সব জমি কিনে নিয়েছে; এখন আর খাজনায় বিলি করে না। আর জমি তো অফুরন্ত নয়।'

'ফরাসী লোকটির নাম কি?'

'ফরাসীর নাম দুফোর। তার নাম হয় তো শুনেছেন। বড় বড় থিয়েটারের অভিনেতাদের জন্য পরচুলা বানায়। খুব ভাল ব্যবসা, লোকটা অনেক টাকা করেছে। আমাদের জমিদারনীর কাছ থেকে সে সবটা জমিদারি কিনে নিয়েছে; এখন আমরা তার পায়ের তলায় পড়েছি; সে যেমন খুশি আমাদের উপর দিয়ে ঘোড়া চালাচ্ছে। প্রভুকে ধন্যবাদ, সে নিজে লোক ভাল, কিন্তু তার বৌ—সে রুশ মহিলা একটি জন্তুবিশেষ—ঈশ্বর আমাদের প্রতি করুণা করুন। সে লোকের একেবারে পকেট কাটছে। অবস্থা শোচনীয়। এই যে, কারাগারে এসে গেছি। ফটক পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে যাব নাকি? সেখান পর্যন্ত যেতে দেবে বলে তো মনে হয় না।'

অধ্যায়—১৩

সামনের ফটকের ঘণ্টাটা বাজিয়েই নেখ্‌লয়ুদভের বুক শুকিয়ে গেল; না জানি মাসলভাকে আজ কি অবস্থায় দেখবে; মাসলভা এবং কারাগারের সবাইকে ঘিরে একটা রহস্য যেন ঘনিয়ে উঠেছে। রক্ষী দরজা খুলে দিতেই সে মাসলভার কথা জিজ্ঞাসা করল। একটু খোঁজ-খবর নিয়ে রক্ষী জানাল, সে হাসপাতালে আছে। সেখানে হাসপাতালের দারোয়ান দয়ালু বুড়ো লোকটি তাকে সঙ্গে সঙ্গে ঢুকতে দিল। তাকে মাসলভার কথা বলায় সে ছোটদের ওয়ার্ডটা দেখিয়ে দিল।

দালানেই কার্বলিক অ্যাসিডের গন্ধে ভরা একটি তরুণ ডাক্তার বেরিয়ে এসে কড়া গলায় নেখ্‌লয়ুদভকে জিজ্ঞাসা করল, সে কি চায়। ডাক্তারটি সদাসর্বদাই কয়েদীদের ভাল করবার চেষ্টা করায় কারা-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এবং প্রধান ডাক্তারের সঙ্গে প্রায়ই তার খিটিমিটি লাগে। নেখ্‌লয়ুদভ হয়তো বেআইনী কোন সুযোগ নিতে চাইবে এই আশংকা করে এবং সে যে কাউকে বিশেষ কোন খাতির করেন না সেটা বোঝাবার জন্যও ডাক্তারটি রাগের ভান করল।

সে বলল, 'এখানে মেয়েছেলে থাকে না; এটা শিশুদের ওয়ার্ড।'

'আমি জানি; কিন্তু এখানে একটি মেয়ে-কয়েদীকে সহকারী নার্স হিসাবে নেওয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ, সেরকম দুজন আছে। আপনি কাকে চান?'

নেখ্‌লয়ুদভ জবাব দিল, 'তাদের মধ্যে যার নাম মাসলভা সে আমার নিকট আত্মীয়, আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। তার মামলার ব্যাপারে সেনেটের কাছে আপীল করতে আমি পিতার্সবার্গ যাব, তাই তাকে এটা দিতে চাই। এটা একটা ফটোগ্রাফ মাত্র।' নেখ্‌লয়ুদভ পকেট থেকে একখানা খাম বের করল।

'ঠিক আছে, এতে কোন আপত্তি নেই।' সাদা এপ্রন-পরিহিতা একটি বুড়ির দিকে ফিরে তাকে বলল, কয়েদী মাসলভাকে ডেকে দিতে। 'আপনি কি এখানেই বসবেন, না ওয়েটিং-রুমে যাবেন?' সে প্রশ্ন করল।

নেখ্‌লয়ুদভ ধন্যবাদ জানাল। ডাক্তারের এরকম সহযোগিতার মনোভাবে সাহস পেয়ে সে আরও জানতে চাইল, হাসপাতালে মাসলভার কাজ কেমন চলছে।

'তা, ভালই। তার পূর্বেকার জীবনের কথা মনে করে বলা যায় যে, কাজকর্ম সে মোটামুটি ভালই করছে। ঐ তো সে এসে পড়েছে।'

একটা দরজায় বুড়ি নার্সকে দেখা গেল। তার পিছনে মাসলভা। পরনে ডোরা-কাটা পোশাক, সাদা এপ্রন, আর একটা রুমাল দিয়ে মাথাটা প্রায় ঢাকা। নেখ্‌লয়ুদভকে দেখেই তার মুখ লাল হয়ে উঠল। প্রথমে সে ইতস্তত করে থেমে গেল, তারপর ভুরু দুটো কুঁচকে গেল; চোখ নামিয়ে দালানের মাঝখানের কার্পেটের উপর দিয়ে দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেল। নেখ্‌লয়ুদভের কাছে পৌঁছে হাত বাড়াতে না চেয়েও শেষ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিল; তার মুখখানি আরও লাল হয়ে উঠল।

নেখ্‌লয়ুদভ যেদিন তার অসংযত ইন্দ্রিয়াবেগের জন্য তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিল, তারপর আর মাসলভার সঙ্গে তার দেখা হয় নি। সে ভেবেছিল, মাসলভা সেইরকমই আছে। কিন্তু আজ সে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তার মুখের ভঙ্গীতে একটা নতুন কিছু—সংযত ও লাজুক একটা ভাব ছিল। নেখ্‌লয়ুদভের মনে হল, সে যেন তার প্রতি কিছুটা বিরূপও বটে। সে পিতার্সবার্গ যাচ্ছে এই মর্মে ডাক্তারকে যা বলেছিল তাকেও তাই বলল এবং পানোভো থেকে আনা ফটোগ্রাফসমেত খামখানা তার হাতে দিল।

'পানোভা-তে এটা পেয়েছি—একখানা পুরনো ফটো; হয়তো তোমার ভাল লাগবে। এটা নাও।'

কালো ভুরু তুলে ঈষৎ টেঁরা চোখে সে সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল; যেন বলতে চাইল, 'এ দিয়ে কি হবে।' তারপর কোন কথা না বলে ফটোগ্রাফখানা নিয়ে এপ্রনের মধ্যে রেখে দিল।

'সেখানে তোমার পিসীর সঙ্গে আমি দেখা করেছি।' নেখ্‌লয়ুদভ বলল।

নিরাসক্তভাবে সে বলল, 'তাই বুঝি?'

'তুমি এখানে ভাল আছ তো?' নেখ্‌লয়ুদভ জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, ভাল আছি', সে জবাব দিল।

'খুব কঠিন কাজ কি?'

'না, না। তবে একাজ করতে অভ্যস্ত নই তো।'

'তোমার এই ব্যবস্থায় আমি খুশি হয়েছি। অন্তত সেখানকার থেকে তো ভাল।'

'সেখানকার থেকে—কোথাকার ?' তার মুখ আবার লাল হয়ে উঠল।

'সেখানে—মানে কারাগারে,' নেখ্‌লয়ুদভ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল।

'ভাল কেন ?' সে জিজ্ঞাসা করল।

'মনে হয় এখানকার লোকজনরা ভাল। ওখানকার অনেকের মত নয়।'

'সেখানেও অনেক ভাল লোক আছে।' সে বলল।

'মেনশভদের ব্যাপারটা আমি দেখছি; আশা করি তারা ছাড়া পেয়ে যাবে,' নেখ্‌লয়ুদভ বলল।

'ঈশ্বর করুন তাই যেন হয়। বৃদ্ধাটি কী চমৎকার মানুষ', ঈষৎ হেসে সে বলল।

'আজই আমি পিতার্সবার্গ যাচ্ছি। শীঘ্রই তোমার মামলাটা উঠবে। আশা করি দণ্ডাদেশ মকুব হবে।'

'মকুব হোক আর নাই হোক, এখন সবই সমান', সে বলল।

'এখন বলছ কেন ?'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নেখ্‌লয়ুদভের দিকে তাকিয়ে মাসলভা বলল, 'দেখুন।'

কথাটা ও তার চাউনির অর্থ নেখ্‌লয়ুদভ বুঝতে পারল। সে জানতে চাইছে, নেখ্‌লয়ুদভ এখনও তার সিদ্ধান্তে অবিচল আছে, না তার প্রত্যাখ্যান-কেই মেনে নিয়েছে।

সে বলল, 'তোমার কাছে সবই এক কেন আমি জানি না। আমার কথা বলতে পারি, তুমি ছাড়া পাও আর নাই পাও আমার কাছে সবই সমান। যেকোন অবস্থাতেই আমি যা বলেছি তা করতে আমি প্রস্তুত।' স্থির সংকল্পের স্বরে সে কথাগুলি বলল।

মাসলভা মাথা তুলে ঈষৎ টেঁরা কালো চোখের স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে, বুঝি বা তার থেকে দূরের দিকে তাকাল। তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু তার মুখের ভাষা চোখের ভাষা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

সে বলল, 'একথা না বললেই পারতেন।'

'তোমার জানা দরকার বলেই বলছি।'

অনেক কষ্টে হাসি চেপে সে বলল, 'এবিষয়ে সব কথা বলা হয়েছে, আর কিছুই বলার নেই।'

হাসপাতাল ওয়ার্ডে একটা সোরগোল উঠল; একটি শিশুর কান্না শোনা গেল।

'মনে হচ্ছে তারা আমাকে ডাকছে,' অস্বস্তিকরভাবে চারদিকে তাকিয়ে সে বলল।

'আচ্ছা, তাহলে চলি', নেখ্‌লয়ুদভ বলল।

তার প্রসারিত হাতখানা মাসলভা ইচ্ছা করেই দেখল না। হাতখানা না ধরেই সে মুখ ঘুরিয়ে কার্পেটের উপর দিয়ে দ্রুত পায়ে চলে গেল। মনের

খুশিকে সে অনেক চেষ্টায় চেপে রাখল।

'মাসলভার মনের মধ্যে কি হচ্ছে? সে কি ভাবছে? কিসের অনুভূতি তার হচ্ছে? সে কি আমাকে পরীক্ষা করছে, নাকি আমাকে সত্যিসত্যি ক্ষমা করতে পারছে না? না কি তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারছে না, বা প্রকাশ করতে চাইছে না? সে কি আগের চাইতে নরম হয়েছে না আরও কঠিন হয়েছে?'

নিজেকে এইসব প্রশ্ন করে নেখ্‌ল্যুদভ কোন জবাব পেল না। সে শুধু এইটুকু বুঝল যে, মাসলভা বদলেছে, তার আত্মার গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে, আর সেই পরিবর্তনই তাকে যুক্ত করছে শুধু মাসলভার সঙ্গেই নয়, সেই ভগবানের সঙ্গেও যিনি এই পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এই যোগ তাকে অভিভূত করেছে, আনন্দে উল্লসিত করেছে।

আটটি বেডযুক্ত ওয়ার্ডে ফিরে গিয়ে নার্সের আদেশমত মাসলভা একটা বিছানা ঠিক করতে লাগল। চাদরটা হাতে নিয়ে অনেক বেশী উপুড় হতে গিয়ে হঠাৎ পা ফস্কে সে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল।

গলায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা একটি ছোট ছেলে তা দেখে হেসে উঠল। মাসলভা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, সশব্দে হেসে উঠল। সে হাসির ছোঁয়াচ লেগে আরও কয়েকটি ছেলে হো-হো করে হেসে উঠল। নার্স রেগে মাসলভাকে বকুনি দিল।

'হৈ-চৈ করছ কেন? তুমি কি ভেবেছ আগের জায়গায়ই আছ? যাও খাবার নিয়ে এস।'

মাসলভা চুপ করে থালা-বাটি নিয়ে চলে গেল। যেতে যেতে সেই ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ছেলেটির দিকে চোখ পড়তেই সে আরও চাপা হাসি হাসতে লাগল।

একটু ফাঁকা পেলেই মাসলভা বার বার ফটোগ্রাফখানা খাম থেকে একটু-খানি বের করে সপ্রশংস দৃষ্টিতে সেটাকে দেখছিল। তারপর সন্ধ্যার পরে কাজ শেষ হলে নিজের ঘরে গিয়ে খাম থেকে ফটোখানা বের করল; নিশ্চুপ হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল প্রতিটি জিনিস, মুখ ও পোশাক, বারান্দার ঝোপগুলি, তার নিজের, নেখ্‌ল্যুদভের ও তার পিসীদের মুখের পিছনকার ঝোপগুলি। বিবর্ণ হলদে ফটোগ্রাফখানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তার মন খুশিতে ভরে উঠল, বিশেষ করে তার সুন্দর তরুণ মুখ, আর কপাল ঘিরে কোঁকড়া চুলের রাশি তার ভারি ভাল লাগল। ছবি দেখতে সে এতই তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে নার্সের ঘরে ঢোকা সে টেরও পেল না।

ফটোর উপর ঝুঁকে পড়ে নার্স বলল, 'সে তোমাকে এটা কি দিয়ে গেল? এটা কে? তুমি?'

'আবার কে?' সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে সে হেসে জবাব দিল।

'আর এই বুঝি সে?—আর এটা তার মা বুঝি?'

'না, তার পিসী। তুমি কি ছবিতে আমাকে চিনতে পারতে না?'

'কখনও না। মুখটা তো বদলে গেছে। তা, এটা তো দশ বছর আগেকার হবে।'

'বছর নয়, একটা পুরো জীবন আগেকার', মাসলভা বলল। সঙ্গে সঙ্গে তার সব উৎসাহ নিভে গেল, মুখের উপর ছায়া নেমে এল, দুই ভুরুর মাঝখানে একটা গভীর রেখা ফুটে উঠল।

'তা কেন? তোমার জীবন তো বেশ স্বচ্ছন্দই ছিল।'

'স্বচ্ছন্দই বটে,' চোখ বুজে হাত নাড়তে নাড়তে মাসলভা কথাটা বারদুই বলল। 'নরকের চেয়ে খারাপ।'

'কেন? বল তো?'

'কেন? রাত আটটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত, আর প্রতিটি রাতেই সেই একই ব্যাপার।'

'তাহলে তারা একাজ ছেড়ে দেয় না কেন?'

'ইচ্ছা থাকলেও ছেড়ে দিতে পারে না। কিন্তু সেসব কথা বলে লাভ কি?' মাসলভা চেঁচিয়ে বলল। তারপর লাফ দিয়ে উঠে ফটোখানা দেরাজের ভিতর রেখে দিল। রাগে তার চোখে জল আসছিল। অনেক কষ্টে চোখের জল চেপে সে ছুটে দালানে চলে গেল। দরজাটাকে সশব্দে বন্ধ করে দিল।

গ্রুপ-ফটোর দিকে তাকিয়ে তার আগেকার দিনের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল; তার চোখে লেগেছিল সেদিনের স্বপ্ন আর নেখ্‌লুদভকে নিয়ে নতুন স্বপ্নের ছোঁয়া। কিন্তু সঙ্গিনীর কথায় তার মনে পড়ে গেল আজ সে কি হয়েছে আর সেদিন সে কি ছিল; সঙ্গে সঙ্গে সেই জীবনের সমস্ত আতংক তার মনকে চেপে ধরল।

হঠাৎ নেখ্‌লুদভের প্রতি তার আগেকার তিক্ততা আবার জেগে উঠল। তার ইচ্ছা হল তাকে নতুন করে ভর্ৎসনা করে। অনুশোচনা হতে লাগল কেন সে আজ আবার সুযোগ পেয়েও তাকে বলে নি তাকে সে ভাল করেই চেনে, তাই তার কাছে আর হার মানবে না—তার দেহ নিয়ে একদিন সে খেলা করেছে, কিন্তু তার মন নিয়ে তাকে সে খেলতে দেবে না। নিজের প্রতি করুণা আর নেখ্‌লুদভের প্রতি ভর্ৎসনার বিফল বাসনাকে চাপা দেবার জন্য তার মদ খাবার ইচ্ছা হল। কারাগারে থাকলে হয়তো তার প্রতিজ্ঞা সে ভাঙত; কিন্তু এখানে তো ডাক্তারের সহকারীর কাছে আবেদন না করে মদ পাবার উপায় নেই। দালানে কিছুক্ষণ বসে থেকে সে তার ছোট ঘরটায় ফিরে গেল। সঙ্গিনীর কোন কথায় কান না দিয়ে তার শোচনীয় জীবনের কথা ভেবে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল।

অধ্যায়—১৪

পিতার্সবার্গে নেখ্‌লুদভের হাতে চারটে কাজ : সেনেটে দরখাস্ত পেশ করা ; ফেদসিয়া বিবয়ুকভার মামলাটা দরখাস্ত-কমিটিতে তোলা ; আর ভেরা দুখোভার অনুরোধ—তার বান্ধবী শুস্তভাকে খালাসের চেষ্টা করা ও একটি মা যাতে কারাগারে তার ছেলের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পায় সেই চেষ্টা করা। শেষ দুটি অনুরোধ ভেরা দুখোভা তাকে চিঠিতে জানিয়েছিল। এ দুটোকে তাই সে একটি কাজ বলেই মনে করে।

চতুর্থ কাজটি হল সেই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিষয়ে যারা ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনার অপরাধে পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ককেসাসে নির্বাসিত হয়েছে। যতটা তাদের কাছে নয় তার চাইতেও বেশী করে সে নিজের কাছেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তাদের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে সে সাধ্যমত চেষ্টা করবে।

পিতার্সবার্গে এসে নেখ্‌লুদভ তার মাসি জনৈক প্রাক্তন মন্ত্রীর পত্নী কাউণ্টেস চারাস্কায়ার বাড়িতে উঠল। যে অভিজাত সমাজ তার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল এখানে এসে আবার সে সেই সমাজের একেবারে মাঝখানে ঢুকে পড়ল। অবস্থাটা অস্বস্তিকর সন্দেহ নেই, কিন্তু এ থেকে অব্যাহতি লাভেরও কোন সম্ভাবনা ছিল না। মাসির বাড়িতে না উঠে হোটেলে উঠলে মাসি অসন্তুষ্ট হত ; তাছাড়া, মাসির অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, ফলে অনেক কাজে তার সহায়তা পাওয়া যাবে।

'তোমার সম্বন্ধে এসব কি শুনছি ? যতসব আজগুবি ব্যাপার,' পৌঁছবার পরেই কফি দিতে দিতে কাউণ্টেস কাতেরিনা আইভানভ্‌না চারাস্কায়া বলল। **'Vous posez pour un Howard** (তুমি দেখছি হাওয়ার্ড হয়ে উঠেছ)— অপরাধীদের সাহায্য করছ, বারে বারে কারাগারে যাচ্ছ, অন্যায়ের প্রতিকার করছ।'

'না, না, সে রকম কিছু না।'

'নয় কেন ? ভাল কাজই তো করছ ; শুনেছি এর সঙ্গে একটা রোমাণ্টিক গল্প জড়িত আছে। আমাকে সব কথা বল।'

মাসলভার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা নেখ্‌লুদভ খোলাখুলিভাবেই সব বলল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে তোমার মা আমাকে কথাটা বলেছিল। সেই বুড়িদের সঙ্গে যখন তুমি থাকতে সেই সময়কার ব্যাপার। আমি তো ভেবে-ছিলাম, তারা তাদের পালিতাকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিল (কাউণ্টেস কাতেরিনা আইভানভ্‌না সব সময়ই নেখ্‌লুদভের পিসীদের ঘৃণা করত)। এই তাহলে সেই। **Elle est encore Jolie** (সে কি এখনও সুন্দরী আছে) ?'

কাতেরিনা আইভানভ্‌নার বয়স ষাট বছর ; শক্ত, উজ্জ্বল, উৎসাহী, বাকপটু

মহিলা। যেমন উঁচু-লম্বা, তেমনি মজবুত চেহারা। তার যে কালো গোঁফ আছে সেটা খুবই স্পষ্ট। নেখ্লয়ুদভ তাকে ভালবাসত, শিশুকাল থেকেই তার উৎসাহ ও উল্লাস তাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

'না গো মাসি, সে সব চুকে গেছে। আমি তাকে শুধু সাহায্য করতে চাই, কারণ নির্দোষ হয়েও সে শাস্তি পাচ্ছে। এ সবের কারণ আমি; আমার জন্যই তার এই পরিণতি। তার জন্য যথাসাধ্য কিছু করা আমার কর্তব্য বলে মনে করি।'

'কিন্তু আমি যে শুনেছি তুমি তাকে বিয়ে করতে চাও?'

'হ্যাঁ, আমি তাই চেয়েছিলাম, কিন্তু সে তা চায় না।'

নীরব বিস্ময়ে কাতেরিনা আইভানভ্না ভুরু তুলে চোখ নাচিয়ে বোনপোর দিকে তাকাল। হঠাৎ তার মুখের ভাব বদলে গেল। খুশি-খুশি চোখে সে বলল:

'দেখ, তোমার চাইতে সে বুদ্ধিমতী। বাবা আমার, তুমি একটি বোকা। তুমি কি সত্যি তাকে বিয়ে করতে?'

'নিশ্চয়।'

'তার সব কথা জেনেছ?'

'জানি বলেই তো; আমিই সে সব কিছুর কারণ।'

হাসি চেপে মাসি বলল, 'তুমি একটি গবেট—ভীষণ গবেট। আর সেই জন্যই তোমাকে আমি ভালবাসি। ভাল কথা, তুমি কি জান—ভাগ্যগুণে একটা ভাল সুযোগ এসেছে। এলিন-এর একটা চমৎকার আশ্রম আছে—বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনীদের আশ্রম। আমি একবার সেখানে গিয়েছিলাম। সেখানেই ওকে—মানে, তোমার লোককে রেখে দেব। যদি কেউ তাকে শোধরাতে পারে তো সে এলিন।'

'কিন্তু তার তো নির্বাসনদণ্ড হয়েছে। সে ব্যাপারে আপীল করতেই আমি এসেছি। তোমার কাছে আমার সেটাও একটা অনুরোধ।'

'তাই নাকি; কোথায় আপীল করবে?'

'সেনেটের কাছে।'

'ও হো, সেনেট! হ্যাঁ, আমার জ্ঞাতি-ভাই লিও সেনেটে আছে, সে অবশ্য উৎসব-অনুষ্ঠান বিভাগে আছে; আসল লোকদের কাউকে আমি চিনি না। তারা সবাই কোন না কোন শ্রেণীর জার্মান: গে, ফে, ডে—অথবা আইভানভ্, সেম্য়নভ্ নিকিতিন, অথবা আইভানেংকো, সাইমনেংকো, মিকিতেংকো, **pour varier** (যত বিচিত্র সব মানুষ)। **Des gens de L'autre monde** (যেন অন্য জগতের লোক)। সে যাই হোক, আমার স্বামীকে বলব, সে সকলকেই চেনে। সব রকম লোকের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। কিন্তু তোমাকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে হবে, কারণ আমার কথা সে বুঝতে

পারে না। আমি যা কিছু বলি, সে সব কথাতেই বলে বুঝতে পারছে না। **C'est un parti pris** (তার আর নড়চড় নেই)। সবাই বোঝে, শুধু সে বোঝে না।'

ঠিক সেই সময় হাঁটু পর্যন্ত আটো পাজামা পরা একটি পিয়ন রূপোর থালায় একটা চিঠি নিয়ে এল।

'এই তো, স্বয়ং এলিনের চিঠি। কিসেওয়েটার-এর কথা শুনবার সুযোগ তুমি পেয়ে যাচ্ছ।'

'কীসেওয়েটার কে?'

'কীসেওয়েটার? আজ সন্ধ্যায় এলেই দেখতে পাবে সে কে। সে এত সুন্দর বলতে পারে যে তার কথা শুনে হাড়-পাজি বদমাস পর্যন্ত অনুতাপের কান্নায় ভেঙে পড়ে।'

শুনতে যতই বিস্ময়কর লাগুক, আর তার চরিত্রের অন্য দিকগুলির সঙ্গে যতই বেমানান হোক, কাউণ্টেস কাতেরিনা আইভানভ্না মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে, খৃস্টধর্মের মূল কথাই হল মুক্তিতে বিশ্বাস। এই বাণী যেখানেই প্রচারিত হয় সেই সভায়ই সে যায়; নিজের বাড়িতেও ভক্ত-সমাবেশের ব্যবস্থা করে। যদিও এই শিক্ষায় সব রকম অনুষ্ঠান, বিগ্রহ ও পূজাদি নিষিদ্ধ, তথাপি কাতেরিনা আইভানভ্না সব ঘরে বিগ্রহ রেখেছে, তার বিছানার উপরকার দেওয়ালেও একটি আছে; তাছাড়া গীর্জার নির্দেশমত সব অনুষ্ঠানই সে পালন করে। এর মধ্যে সে কোন বিরোধ দেখতে পায় না।

কাউণ্টেস বলল, 'দেখে নিও, তোমার ম্যাগডোলেনও (সংশোধিত চরিত্র বেশ্যা) তার কথা শুনে বদলে যাবে। আজ সন্ধ্যায় বাড়িতে থেকো; তার কথা শুনতে পাবে। সে এক আশ্চর্য মানুষ।'

'এ সবে আমার কোন আগ্রহ নেই গো মাসি।'

'কিন্তু আমি বলছি ব্যাপারটা আকর্ষণীয়, আর তুমিও অবশ্য বাড়িতে থাকবে। আমার কাছে তোমার আর কি চাই? **Videz votre sac** (বস্তা ঝেড়ে ফেল, অর্থাৎ যা কিছু বলার আছে বলে ফেল)।

'পরের কথাটা দুর্গের ব্যাপার।'

'দুর্গে? সেজন্য ব্যারণ ক্রিগস্মাথ-এর কাছে একটা চিঠি তোমাকে দিয়ে দেব। **c'est un tres brave homme** (চমৎকার মানুষ তিনি)। আরে, তাকে তো তুমি চেন; তিনি তোমার বাবার বন্ধু ছিলেন। **I donne dans le spiritisme** (এখন তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে ঝুঁকেছেন) কিন্তু তাতে অসুবিধা হবে না, তিনি খুব ভাল মানুষ। সেখানে তোমার কি দরকার?'

'সেখানে কারারুদ্ধ একটি ছেলের সঙ্গে তার মা যাতে দেখা করতে পারে তার জন্য অনুমতি সংগ্রহ করতে চাই। কিন্তু আমি শুনেছি সেটা চেরভিয়ান্-

স্কির উপর নির্ভর করে, ক্রিগস্‌মাথের উপর নয়।'

'চেরভিয়ান্‌স্কিকে আমি পছন্দ করি না, কিন্তু সে মারিয়েতের স্বামী ; তাকে আমরা বলতে পারি। আমার জন্য এ কাজ সে করে দেবে। **Elle est tres gentille** (সে খুব ভাল মেয়ে)।'

'আর একটি মেয়ের দরখাস্তও নিয়ে এসেছি : সেও কারাগারে বন্দিনী, কিন্তু কেন তা সে জানে না।'

'কোন ভয় নেই ; সে ভালই জানে। তারা সবাই সব কিছু জানে। ওই সব ছোট-চুল মেয়েগুলোর উচিত সাজাই হয়েছে।'

'সাজাটা উচিত কিনা আমি জানি না। কিন্তু তারা কষ্ট পাচ্ছে। তুমি একজন খৃস্টান, ধর্মগ্রন্থের বাণীতে তুমি বিশ্বাস কর, অথচ তুমি এত নির্দয়।'

'তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মগ্রন্থ ধর্মগ্রন্থ, আর যা বিরক্তিকর তা সব সময়ই বিরক্তিকর। যে নৈরাজ্যবাদীদের (**Nihilists**) আমি সহ্য করতে পারি না, তাদের বিশেষ করে ছোট-চুল মেয়ে নৈরাজ্যবাদীদের প্রতি যদি আমি ভালবাসার ভান করতাম সেটা হত আরও খারাপ।'

'কেন তুমি তাদের সহ্য করতে পার না ?'

'কেন ? ১লা মার্চের পরেও তুমি জিজ্ঞাসা করছ কেন ? (১৮৮১-র ১লা মার্চ সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্দার খুন হয়েছিল)

'তারা সকলেই কিছু ১লা মার্চের ঘটনায় অংশগ্রহণ করে নি।'

'তা না হয় হল। যেটা তাদের কাজ নয় তাতে হাত ঢোকানো তাদের উচিত নয়। এটা তো মেয়েদের কাজ নয়।'

'অথচ তুমি মনে করছ যে মারিয়েৎ এ ব্যাপারে হাত দেবে।'

'মারিয়েৎ ? মারিয়েৎ হল মারিয়েৎ, আর এরা যে কি তা কেউ জানে না। তারা তো সবাইকেই শিক্ষা দিতে চায়।'

'শিক্ষা দিতে নয়, মানুষকে সাহায্য করতে চায়।'

'কাকে সাহায্য করতে হবে আর কাকে করতে হবে না, সেটা ওদের ছাড়াই আমরা জানি।'

'কিন্তু চাষীদের যে সাহায্যের বড়ই দরকার। এইমাত্র আমি গ্রাম থেকে এসেছি। এটা কি একান্তই প্রয়োজন যে শক্তির শেষ সীমা পর্যন্ত তারা খাটবে অথচ পেটভরে খেতে পাবে না, আর আমরা মহাসুখে প্রাচুর্যের মধ্যে দিন কাটাব ?' নেখ্‌লুদভ বলল। মাসির ভালমানষেমির সুযোগ নিয়ে নিজের অজান্তেই সে তাকে তার মনের কথাই বলে ফেলল।

'তাহলে তুমি কি চাও ? তুমি কি চাও যে আমি খাটব, কিন্তু কিছু খাব না ?'

নিজের অজ্ঞাতেই হেসে উঠে নেখ্‌লুদভ বলল, 'না, তুমি খাবে না তা আমি চাই না ; আমি শুধু চাই, আমরা সকলেই খাটব, সকলেই খাব।'

পুনরায় ভুরু তুলে চোখ নামিয়ে মাসি অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। বলল, **'Mon cher, vous finirez mal** (বাছা, তোমার পরিণাম খুব খারাপ।'

'কিন্তু কেন ?'

ঠিক সেই সময় কাউণ্টেস চারাস্কায়ার স্বামী ও প্রাক্তন মন্ত্রী জেনারেল ঘরে ঢুকল। লোকটি দীর্ঘকায়, বৃষস্কন্ধ।

সদ্য কামানো গাল চুম্বনের জন্য নেখ্‌লুদভের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, 'আরে দিমিত্রি, কেমন আছ ? কখন এলে ?' সে নিঃশব্দে স্ত্রীর কপালে চুম্বন করল।

'Non, il est impayable (ওঃ, তার তুলনা হয় না),' স্বামীর দিকে ঘুরে কাউণ্টেস বলল। 'সে চায় আমি নিজের হাতে কাপড়-চোপড় কাচি আর আলু খেয়ে বাঁচি। ছেলেটা ভয়ংকর বোকা। কিন্তু তাহলেও সে তোমাকে যা যা বলে তা করে দিও।'

তারপর বলল, 'তুমি কি শুনেছ, কামেন্‌স্কির মায়ের জীবন-সংশয়।' তোমার এখনই সেখানে যাওয়া উচিত।'

'তা ঠিক,' স্বামী বলল।

'তার আগে ওর সঙ্গে একটু কথা বল। আমাকে কয়েকটা চিঠি লিখতে হবে।'

নেখ্‌লুদভ ড্রয়িং-রুমের পাশের ঘরে পা দেওয়া মাত্রই মহিলাটি আবার তাকে ডেকে পাঠাল।

'তাহলে মারিয়েৎকে চিঠি লিখব কি ?'

'দয়া করে লেখ মাসি।'

'ছোট-চুলওয়ালি সম্পর্কে তুমি যা বলতে চাও সেজন্য আমি খানিকটা জায়গা ফাঁকা রেখে দেব ; তাহলেই সে তার স্বামীকে আদেশ করবে, আর সেও আদেশ পালন করবে। তুমি আমাকে খারাপ ভেব না ; তোমার ঐ সব লোকগুলো বড়ই বিরক্তিকর, কিন্তু **Jeneleur veux pas de mal** (আমি তাদের কোন ক্ষতি করতে চাই না)। আচ্ছা, যাও, কিন্তু খেয়াল থাকে যেন, আজ সন্ধ্যায় কীসেওয়েটারের বাণী শুনবার জন্য বাড়িতে থেকো। কিছু প্রার্থনার ব্যবস্থাও থাকবে। তুমি বাধা না দিলে **ca vous fera beaucoup de bien** (এতে তোমার অনেক উপকার হবে)। আমি জানি, তোমার মা এবং তোমরা সকলেই এ বিষয়ে চিরদিনই পিছিয়ে আছ। আপাতত বিদায়।'

অধ্যায়—১৫

কাউণ্ট আইভান মিখাইলভিচ এক সময়ে মন্ত্রী ছিল। কতকগুলি প্রত্যয়ে সে দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল।

তার প্রত্যয়গুলির অন্যতম হল এই বিশ্বাস যে, একটা পাখির পক্ষে যেমন কীট-পতঙ্গ খেয়ে বেঁচে থাকা, পাখনা-পালকে শরীর ঢেকে রাখা এবং আকাশে উড়ে বেড়ানোই স্বাভাবিক, তেমনি তার পক্ষেও বেশী মাইনের রাঁধুনির হাতে প্রস্তুত ভাল ভাল দামী খাবার খাওয়া, সব চাইতে আরামদায়ক দামী পোশাক পরা এবং সব চাইতে ভাল দ্রুততম ঘোড়ায় চড়াই স্বাভাবিক; সুতরাং এ সব কিছুই তার হাতের কাছে মজুদ থাকা চাই। এ ছাড়া, কাউণ্ট আইভান মিখাইলভিচ মনে করে যে, যে-কোন উপায়ে সরকারী তহবিল থেকে যত বেশী টাকা বাগানো যায় ততই মঙ্গল।

নেখ্‌ল্যুদভের সব কথা শুনে সে বলল, সে তাকে দুটো চিঠি লিখে দেবে; তার মধ্যে একটি আপীল বিভাগের সেনেটর উল্‌ফ্‌-কে, আর একটি চিঠি দরখাস্ত-কমিটির একজন গণমান্য সদস্যের কাছে।

এই দুখানি চিঠি এবং মাসির লেখা মারিয়েতের চিঠি হাতে পেয়েই নেখ্‌ল্যুদভ ঐ সব ঠিকানার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

প্রথমেই গেল মারিয়েতের কাছে। কিশোরী বয়সে সে তাকে চিনত। একটি অভিজাত পরিবারের মেয়ে সে; কিন্তু পরিবারটি বিত্তবান নয়। যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল সে একজন পদস্থ ব্যক্তি। তবে তার সম্পর্কে অনেক খারাপ কথা সে শুনেছে। সব চাইতে খারাপ যা শুনেছে সেটা হল, পদস্থ কর্মচারি হিসাবে তার কাজই হল রাজনৈতিক বন্দীদের নির্যাতন করা এবং হাজার হাজার রাজনৈতিক বন্দীকে নির্যাতন করার ব্যাপারে সে তাদের প্রতি এতটুকু করুণা করে না। অন্য সময়ের মতই এখনও নেখ্‌ল্যুদভের কাছে এটা অসহ্য মনে হতে লাগল যে, অত্যাচারীকে সাহায্য করতে গিয়ে তাকে অত্যাচারীদের পাশে গিয়েই দাঁড়াতে হচ্ছে; সেই অত্যাচারীরা যে নিষ্ঠুরতায় অভ্যস্ত, যে নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে হয় তো সচেতনও নয়, সেই নিষ্ঠুরতাকে কোন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে অন্তত কিছুটা হ্রাস করা হোক এই আবেদনের ভিতর দিয়ে সে তো তাদের কার্যকলাপকেই সমর্থন করছে। এ সব ক্ষেত্রে সে সব সময়ই নিজের ভিতরে একটি প্রতিবাদ ও অসন্তোষ অনুভব করে; সুবিধাটুকু চাইবে কি চাইবে না সে ব্যাপারে ইতস্তত করে এবং শেষ পর্যন্ত চাইতেই হয়।

অনেকদিন সে পিতার্সবার্গে আসে নি। তবু শহরটা তার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক উত্তেজনা ও নৈতিক বিষণ্ণতার প্রভাব তার মনে ছড়িয়ে দিল।

সব কিছুই এত পরিচ্ছন্ন, আরামদায়ক ও সুবিন্যস্ত, মানুষগুলি নৈতিক

ব্যাপারে এতই উদার যে জীবনযাত্রা বেশ সহজ বলেই মনে হল।

একজন সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, ভদ্র ইজভজচিক তাকে নিয়ে মারিয়েতের বাড়িতে যাবার পথে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, ভদ্র পুলিশকে পাশ কাটিয়ে, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, জলে-ধোয়া রাজপথ ধরে, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন সব বাড়ির পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল।

সদর দরজায় বিলিতি সাজ-পরানো একজোড়া বিলিতি ঘোড়া দাঁড়িয়েছিল, পোশাক-পরা একজন বিলিতি কোচয়ান একটা চাবুক হাতে নিয়ে সগর্বে বাক্সে বসে আছে। তার গোঁফ-জোড়া দুদিকেই গালের নীচে নেমে গেছে।

অদ্ভুত রকমের পরিচ্ছন্ন উর্দিপরা দরোয়ান হলের দরজাটা খুলে দিল। সেখানে আরও বেশী পরিচ্ছন্ন সোনালী দড়ি লাগানো উর্দি-পরা চমৎকার চিরুনি-চালানো গোঁফওয়ালা পিওন এবং নতুন ইউনিফর্মে সজ্জিত আর্দালি দাঁড়িয়েছিল।

'জেনারেল কারও সঙ্গে দেখা করবেন না, মাননীয়া মহাশয়াও কারও সঙ্গে দেখা করবেন না। তিনি এখনই বাইরে যাবেন।'

নেখ্‌লয়ুদভ কাতেরিনা আইভানভ্‌নার চিঠিখানা বের করে টেবিলটার কাছে গিয়ে তার কার্ডে লিখল, কারও দেখা না পাওয়ায় সে দুঃখিত। পিয়ন সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গেল, দরোয়ান বাইরে গিয়ে কোচয়ানকে হাঁক দিল, আর আর্দালি দুই হাত পাশে এলিয়ে দিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার ছোট ছোট চোখ দিয়ে দেখতে লাগল, পোশাকের জাঁকজমকের সঙ্গে একেবারেই বেমানান একটি ছোটখাট ক্ষীণকায়া মহিলা দ্রুত পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

মারিয়েতের মাথায় পালক-লাগানো বড় টুপি, কালো পোশাক, ও নতুন কালো দস্তানা। একটা ওড়নায় তার মুখ ঢাকা।

নেখ্‌লয়ুদভকে দেখতে পেয়ে সে ওড়নাটা তুলে দিল। সুন্দর মুখের দুটি উজ্জ্বল চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে সে তার দিকে তাকাল।

খুশি-ভরা মৃদু গলায় সে বলে উঠল, 'আরে, প্রিন্স দিমিত্রি আইভানভিচ। আমার আগেই চেনা উচিত ছিল—'

'সে কি! আমার নামটাও তোমার মনে আছে?'

মারিয়েৎ ফরাসিতে বলল, 'তাই তো মনে হয়।' আরে, আমার বোন আর আমি তো তোমার প্রেমেই পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি বদলে গেছ।.... আহা, কী দুঃখের কথা, আমাকে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। চল, আবার উপরেই যাই।' কথাটা বলে সে ইতস্তত করে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ঘড়িটার দিকে তাকাল। 'না, তা হবে না। মৃতের প্রার্থনা-সভায় যোগ দিতে কামেন্‌স্কিদের বাড়ি যাচ্ছি। তার মা খুবই ভেঙে পড়েছে।'

'কামেন্‌স্কিরা কারা?'

'তুমি শোন নি? তার ছেলে দ্বৈত-যুদ্ধে মারা গেছে। সে পোসেন-এর

সঙ্গে লড়েছিল। সেই একমাত্র ছেলে। কী ভয়ংকর! মা একেবারেই ভেঙে পড়েছে।'

'হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে।'

'না। আমি বরং চলেই যাই। আজ রাতে বা কাল তুমি অবশ্য আসবে,' এই কথা বলে সে দ্রুতপায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

একটু এগিয়ে নেখ্‌লুদভ বলল, 'আজ রাতে আমি আসতে পারব না। কিন্তু তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।' ঘোড়া দুটো তখন সদর দরজার আরও কাছে এগিয়ে এসেছে।

'কিসের অনুরোধ?'

'আমার মাসি এই চিঠিটা তোমাকে পাঠিয়েছে।' নেখ্‌লুদভ মস্ত বড় মোহরাংকিত একটা লম্বা খাম তার হাতে দিল। 'এতেই সব লেখা আছে।'

'আমি জানি, কাউণ্টেস কাতেরিনা আইভানভ্‌না মনে করেন যে আমার স্বামীর কাজকর্মে তার উপর আমার কিছুটা প্রভাব আছে। সেটা তার ভুল। আমি কিছুই করতে পারি না, এবং অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ করতেও চাই না। কিন্তু কাউণ্টেসের জন্য এবং তোমার জন্য আমি সে নীতি লংঘন করতে রাজী আছি। কাজটা কি বল তো?' কালো দস্তানা পরা হাত দিয়ে পকেটের ভিতর বৃথাই কি যেন খুঁজতে খুঁজতে সে বলল।

'দুর্গের মধ্যে একটি মেয়ে বন্দী হয়ে আছে, কিন্তু সে অসুস্থ ও নির্দোষ।'

'তার নাম কি?'

'শুস্তভা—লিডিয়া শুস্তভা। চিঠিতেই লেখা আছে।'

'ঠিক আছে; দেখব কি করতে পারি,' বলেই সে আস্তে লাফ দিয়ে তার নতুন গদি-আটা খোলা গাড়িতে উঠে ছোট ছাতাটা খুলল। গাড়ির বার্নিশ-করা উজ্জ্বল মাড-গার্ড রোদ্দুরে ঝকমক করতে লাগল। পিওন উঠে বক্সে বসেই কোচয়ানকে গাড়ি চালাতে বলল। গাড়ি চলতে শুরু করতেই মারিয়েৎ ছোট ছাতাটা দিয়ে কোচয়ানের গায়ে টোকা দিতেই ঘোড়া দুটি থেমে গেল; লাগামে টান পড়ায় তাদের ঘাড় দুটি ধনুকের মত বেঁকে গেল।

'তুমি কিন্তু অবশ্য আসবে: তবে দয়া করে কোন কাজ নিয়ে আসবে না,' নেখ্‌লুদভের দিকে তাকিয়ে সে হাসল; সে-হাসির ক্ষমতা সে ভালই জানে। তারপর যেন নাটক শেষ হয়ে যবনিকা নেমে আসছে এমনিভাবে ওড়নাটা আবার মুখের উপর নামিয়ে দিল। 'ঠিক আছে,' বলে আবার সে ছোট ছাতাটা দিয়ে কোচয়ানকে স্পর্শ করল।

নেখ্‌লুদভ মাথার টুপিটা তুলে ধরল। সুশিক্ষিত ঘোড়া দুটি সামান্য শব্দ করে ছুটতে শুরু করল; পাথরের রাস্তায় খুরের শব্দ উঠল; নতুন রবার-টায়ার লাগানো গাড়িটা নিঃশব্দে দ্রুত এগিয়ে চলল; শুধু রাস্তার কোন কোন উঁচু-নীচু জায়গায় মাঝে মাঝে একটু ঝাঁকুনি দিতে লাগল।

অধ্যায়—১৬

তার ও মারিয়েতের মধ্যে যে হাসি-বিনিময় হয়ে গেল সেটা মনে করে নেখ্‌লুদভ মাথা নাড়তে লাগল।

'এ-জীবনে ফিরে যাবার মত যথেষ্ট সময় তোমার হাতে নেই', যে মানুষকে সে শ্রদ্ধা করে না তার কাছে উপকার চাইতে গেলেই তার মনের উপর বিরোধ ও সন্দেহের যে চাপ পড়ে সেটা অনুভব করেই মনে মনে সে কথাগুলি বলল।

এবার কোথায় যাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে নেখ্‌লুদভ সেনেটের দিকে রওনা দিল। আপিসে ঢুকে সে চমৎকার একটা ঘরে অনেকগুলি ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন কর্মচারিকে কাজ করতে দেখল।

তারাই জানাল, মাসলভার দরখাস্ত পাওয়া গেছে এবং বিবেচনা ও মন্তব্যের জন্য সেনেটর উল্‌ফের কাছে পাঠানো হয়েছে। সেই উল্‌ফের কাছেই তার মেসোও চিঠি লিখে দিয়েছে।

একজন কর্মচারি বলল, 'এই সপ্তাহেই সেনেটের একটা সভা আছে, কিন্তু বিশেষ অনুরোধ না এলে মাসলভার ব্যাপারটা সে সভায় উঠবার সম্ভাবনা নেই। তবে যদি বিশেষ অনুরোধ আসে তাহলে বুধবারেই সেটা উঠতে পারে।'

সেখান থেকে নেখ্‌লুদভ দরখাস্ত কমিটির সদস্য ব্যারণ ভরভ্‌য়ভ্‌-এর চমৎকার সরকারী ভবনে গেল। দরোয়ান কড়া গলায় জানিয়ে দিল, একমাত্র সাক্ষাৎকারের দিন ছাড়া ব্যারণের সঙ্গে দেখা হবে না; আজ তিনি মহামান্য সম্রাটের সঙ্গে আছেন, আর কাল তাকে একটা প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। অগত্যা মেসোর চিঠিখানা দরোয়ানের হাতে দিয়ে সে সেনেটর উল্‌ফের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

উল্‌ফ্‌ সবে খাওয়া শেষ করেছে এমন সময় নেখ্‌লুদভ ঘরে ঢুকল। অভ্যাসমত উল্‌ফ্‌ তখন একটা সিগার টানতে টানতে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল।

পায়চারি থামিয়ে উল্‌ফ্‌ বন্ধুত্বপূর্ণ অথচ ঈষৎ বিদ্রূপের হাসির সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা করে নেখ্‌লুদভের দেওয়া চিঠিখানি পড়ল।

'দয়া করে আসন গ্রহণ করুন, আর আপনার অনুমতি নিয়ে আমি যদি একটু পায়চারি করি তাহলে সেটা ক্ষমা করবেন,' কোটের পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে প্রকাণ্ড সুসজ্জিত পড়ার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতেই সে কথাগুলি বলল।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভারি খুশি হলাম, আর কাউণ্ট আইভান মিখাইলভিচ যা চেয়েছেন সে কাজও সানন্দেই করব,' মুখ দিয়ে সুগন্ধি নীল নীল ধোঁয়া ছেড়ে ছাইটা যাতে ভেঙে না পড়ে সেজন্য সিগারটাকে খুব সতর্ক-ভাবে মুখ থেকে নামিয়ে সে বলল।

'আমি শুধু বলতে চাইছি কেসটা যেন তাড়াতাড়ি ওঠে, যাতে কয়েদীকে সাইবেরিয়ায় যেতে হলে সে শীঘ্রই যাত্রা করতে পারে', নেখ্‌লুদভ বলল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিঝ্‌নি নভগরদ থেকে প্রথম ষ্টিমারেই যেতে পারবে। আমি জানি।' যে যাই বলুক সে যে সেটা আগে থেকেই জানে এমনি মুরুব্বিয়ানা চালে উল্‌ফ্‌ কথাগুলি বলল। 'কয়েদীর নামটা কি?'

'মাসলভা।'

উল্‌ফ্‌ টেবিলের কাছে গিয়ে ফাইলের ভিতর থেকে খুঁজে নিয়ে একখানা কাগজে চোখ বুলিয়ে নিল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাসলভা। ঠিক আছে, অন্য সকলকেও বলে দেব। বুধবারেই এ কেসের শুনানি হবে।'

'তাহলে আমি কি অ্যাডভোকেটকে টেলিগ্রাম করতে পারি?'

'অ্যাডভোকেট! কিসের জন্য? অবশ্য আপনি যদি চান, আপত্তি কি?'

নেখ্‌লুদভ বলল, 'আপীলের যুক্তিগুলো হয়তো যথেষ্ট নয়, কিন্তু কেসটা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, একটা ভুল বোঝাবুঝির জন্যই শাস্তিটা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা হতে পারে; কিন্তু সেনেট তো কেসটাকে সে ভাবে দেখতে পারে না,' সিগারের ছাইয়ের দিকে চোখ রেখে উল্‌ফ্‌ কড়া স্বরে বলল। 'সেনেট শুধু বিবেচনা করবে আইনের সঠিক প্রয়োগ ও তার সঠিক ব্যাখ্যা।'

'কিন্তু আমার মনে হয় এ কেসটা একটু অন্য রকম।'

'জানি, জানি! সব কেসই অন্য রকম। আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করব। বাস।' ছাইটা তখনও ঠিক আছে, তবে একটা চিঁড় ধরেছে, ভেঙে পড়তে পারে।

ছাইটা যাতে না পড়ে সেই ভাবে সিগারটা ধরে উল্‌ফ্‌ বলল, 'আপনি কি প্রায়ই পিতার্সবার্গে আসেন?' পাছে ছাইটা পড়ে যায়, তাই সে সযত্নে সেটাকে ছাই-দানির কাছে নিয়ে ছাইটা ঝেড়ে ফেলল।

তারপর বলে উঠল, 'এই কামেন্‌স্কির ব্যাপারটা কী ভয়ংকর। চমৎকার ছেলেটি। একমাত্র ছেলে····বিশেষ করে মায়ের কথাটা ভাবুন,' সে সময় পিতার্সবার্গের প্রতিটি মানুষ কামেন্‌স্কি-প্রসঙ্গে যা যা বলেছিল সেই কথাগুলিই সে হুবহু বলে চলল।

কাউন্টেস কাতেরিনা আইভানভ্‌না ও নতুন ধর্ম-শিক্ষার ব্যাপারে তার উৎসাহের কথা কিছুটা উল্লেখ করে উল্‌ফ্‌ ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিল।

নেখ্‌লুদভ অভিবাদন করল।

হাত বাড়িয়ে উল্‌ফ্‌ বলল, 'সুবিধা হলে বুধবার এখানে এসে খাবেন; তখন আপনাকে চূড়ান্ত খবর দিতে পারব।'

বেশ দেরী হয়ে গেছে। নেখ্‌লুদভ মাসির বাড়ি ফিরে গেল।

অধ্যায়—১৭

কাউন্টেস কাতেরিনা আইভানভ্‌নার নৈশাহারের সময় সাড়ে সাতটা। যেভাবে খাবার পরিবেশন করা হল সেটাও নেখ্‌ল্যুদভের কাছে নতুন। টেবিলের উপর ডিসগুলি সাজিয়ে রেখে পিওনরা ঘর থেকে চলে গেল, আর আহারার্থীরা নিজেরাই সব ব্যবস্থা করতে লাগল। পুরুষরা মহিলাদের কোনরকম পরিশ্রম করতে দেবে না; তাই তারা পুরুষোচিতভাবেই মহিলাদের ও নিজেদের আহার্য ও পানীয় পরিবেশনের ভার নিল। একটা কোর্স শেষ হতেই কাউন্টেস বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতামটা টিপল আর সঙ্গে সঙ্গে লোকজনরা নিঃশব্দে এসে তাড়াতাড়ি ডিসগুলি সরিয়ে নিয়ে প্লেট পাল্টে দিল এবং পরবর্তী কোর্সটা এনে হাজির করল। খাবার-দাবার সবই বাছাই করা, মদও খুবই দামী। দুটি সাদা-পোশাকের সহকারীকে নিয়ে ফরাসী রাঁধুনিটি সব কাজ করছে। খাবার টেবিলে মোট ছ'জন উপস্থিত ছিল: কাউন্ট ও কাউন্টেস, তাদের ছেলে, (রক্ষী-বাহিনীর রুক্ষমেজারের অফিসার; টেবিলে কনুই রেখে বসেছে), নেখ্‌ল্যুদভ, একজন ফরাসী সঙ্গী ও গ্রাম থেকে আসা কাউন্টের প্রধান গোমস্তা।

এখানেও দ্বৈতযুদ্ধ নিয়েই আলোচনা শুরু হল। এ বিষয়ে সম্রাটের অভিমতের উপরেই নানা রকম মন্তব্য চলতে লাগল। মায়ের জন্য সম্রাট খুবই দুঃখিত—অন্য সবাই দুঃখিত; হত্যাকারীর প্রতি সম্রাট খুব কঠোর হবে না, কারণ সে তার সামরিক মর্যাদা রক্ষা করেছে,—ঐ একই কারণে সকলেই তার প্রতি উদার মনোভাবের পক্ষপাতী। একমাত্র কাউন্টেস কাতেরিনা আইভানভ্‌না স্বাধীন চিন্তাহীনতার বশে ভিন্নমত প্রকাশ করল।

'ওরা মদ খেয়ে সহজ সরল ছেলেগুলোকে খুন করে। আমি তাদের কোন মতেই ক্ষমা করব না।' সে বলল।

কাউন্ট বলল, 'দেখ, তোমার এ কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

কাউন্টেস বলল, 'আমি জানি, আমার কথা তুমি কোন দিনই বুঝতে পারবে না।' তারপর নেখ্‌ল্যুদভের দিকে ফিরে বলল, 'আমার স্বামী ছাড়া আর সকলেই বুঝতে পারে। আমি বলছি, মায়ের জন্য আমি দুঃখিত; আমি চাইনা যে সে লোকটা খুন করেও বহালতবিয়তে থাকবে।'

যাই হোক, এ নিয়ে অনেক কথাকাটাকাটি হল। তারপর খাওয়া শেষ হলে মস্ত বড় নাচ-ঘরে উঁচু পিঠওয়ালা কারুকার্যখচিত চেয়ারগুলোকে সভার মত করে সারি দিয়ে সাজানো হল; একদিকে ছোট টেবিলে বক্তার জন্য এক কুঁজো জল রাখা হল, আর তার পাশে রাখা হল একটা হাতল-ওয়ালা চেয়ার। ক্রমে বিদেশী প্রচারক কীসেওয়েটারের বাণী শুনবার জন্য লোক জমতে লাগল।

সদর দরজায় সুন্দর সুন্দর সব গাড়ি এসে থামল। মূল্যবান আসবাবে

সজ্জিত ঘরে রেশম, ভেলভেট ও লেস-এ মোড়া, মাথায় পরচুলা ও শরীরে প্যাড লাগানো মহিলারা বসল, তাদের সঙ্গে এল ইউনিফর্ম ও সান্ধ্য-পোশাকে সজ্জিত পুরুষরা, আর আধ ডজনখানেক সাধারণ মানুষ: দুজন চাকর, একজন দোকানি, একটি পিওন ও একটি কোচয়ান।

কীসেওয়েটারের শরীর মজবুত, গায়ের রং আধূসর। সে ইংরেজিতে বলতে লাগল, আর পিঁসনে-পরা একটি একহারা তরুণী সঙ্গে সঙ্গে প্রাঞ্জল রুশ ভাষায় সেটা অনুবাদ করতে লাগল।

সে বলতে লাগল, আমাদের পাপ এত বেশী, তার দরুন শাস্তি এত কঠোর ও অপরিহার্য যে সে শাস্তির আশংকা মনের মধ্যে নিয়ে বেঁচে থাকাই অসম্ভব।

'প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ, মুহূর্তের জন্য আমাদের ভেবে দেখতে হবে আমরা কি করছি: আমরা কি ভাবে জীবন চালাচ্ছি, সকলের প্রতি প্রেমময় প্রভুকে কি ভাবে আমরা আঘাত করছি, কি ভাবে খৃস্টকে যন্ত্রণা দিচ্ছি; তাহলেই আমরা বুঝতে পারব যে, আমাদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, পরিত্রাণ নেই, মুক্তি নেই: ধ্বংসই আমাদের সকলের অনিবার্য নিয়তি। একটা ভয়ংকর পরিণতি —শাশ্বত যন্ত্রণা—আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।' চোখের জলে কম্পিত কণ্ঠে সে কথা বলতে লাগল। 'আহা, কেমন করে আমরা রক্ষা পাব ভ্রাতৃগণ? এই ভীষণ চির-জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে কেমন করে আমরা রক্ষা পাব? সারা বাড়িতে আগুন লেগেছে; পালাবার পথ নেই।'

কিছু সময়ের জন্য সে চুপ করল। তার দুই গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। গত আট বছর ধরে যখনই সে ভাষণের ঠিক এই জায়গাটায় আসে (এই জায়গাটি সে নিজেও খুব পছন্দ করে) তখনই তার গলা আটকে আসে, নাক সুর্‌সুর্‌ করে এবং চোখে জল আসে; সেই চোখের জল তাকে আরও বিচলিত করে তোলে।

ঘরের মধ্যে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শোনা গেল। টেবিলের উপর কনুই রেখে দুই হাতের উপর মাথাটা রেখে কাউণ্টেস কাতেরিনা আইভানভ্‌না বসে ছিল। তার মোটা কাঁধ দুটি ফুলে ফুলে কাঁপছে। কোচয়ান ভয়ে ও বিস্ময়ে জার্মান লোকটির দিকে তাকিয়ে আছে; তার মনে হতে লাগল সে যেন লোকটিকে তার গাড়ির নীচে চাপা দিতে উদ্যত হয়েছে, কিন্তু বিদেশী লোকটি কিছুতেই সরে যাচ্ছে না। সকলেই কাতেরিনা আইভানভ্‌নার ভঙ্গীতেই বসে আছে। উল্‌ফের সুসজ্জিত একহারা মেয়েটি দুই হাতে মুখ ঢেকে হাঁটু গেড়ে বসেছে।

সহসা বক্তা মুখের ঢাকনাটা ফেলে দিয়ে যেমনভাবে অভিনেতারা মনের খুশির ভাবকে প্রকাশ করে থাকে তেমনিভাবে সত্যিকারের হাসি হাসল। এবং শান্ত মৃদু কণ্ঠে বলতে লাগল:

'তথাপি মুক্তির পথ অবশ্যই আছে। এই সেই পথ—আনন্দময় সহজ পথ।

ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র আমাদের জন্ম যে রক্ত দিয়েছেন, আমাদের জন্য সব যন্ত্রণা যিনি সহ্য করেছেন, সেই রক্তেই আছে আমাদের মুক্তি। তাঁর যন্ত্রণা, তাঁর রক্তই আমাদের রক্ষা করবে। ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ,' কান্না-ভেজা গলায় সে বলতে লাগল, 'জগতের মুক্তির জন্য যে প্রভু তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করেছেন, আসুন আমরা তাঁর গুণকীর্তন করি। তাঁর পবিত্র রক্ত—'

নেখ্‌ল্যুদভ বিরক্ত হয়ে নিঃশব্দে উঠে পড়ল; লজ্জাজনক আর্তনাদকে পিছনে ফেলে চোখে ভ্রূকুটি ফুটিয়ে তুলে নিঃশব্দ পায়ে সে নিজের ঘরে চলে গেল।

অধ্যায়—১৮

পরদিন নেখ্‌ল্যুদভ সবে পোশাক পরে নীচে নামতে যাচ্ছে এমন সময় পিওন মস্কোর অ্যাডভোকেটের কার্ড এনে দিল। নিজের কাজেই সে পিতার্সবার্গে এসেছে; তবে মাসলভার মামলার শুনানী যদি শীঘ্র শুরু হয় তাহলে সেনেটের সভায়ও সে উপস্থিত থাকতে পারবে। নেখ্‌ল্যুদভের টেলিগ্রাম পৌঁছবার আগেই সে চলে এসেছে। মামলার শুনানী করে হবে এবং কোন্ কোন্ সেনেটর তখন উপস্থিত থাকবে, এ সব কথা নেখ্‌ল্যুদভের মুখে শুনে সে হাসল।

বলল, 'ঠিক তিন প্রকৃতির সেনেটরই থাকছে। উল্‌ফ্ পিতার্সবার্গের একজন সরকারী কর্মচারি; স্কভরদ্‌নিকভ্ একজন তাত্ত্বিক আইনজ্ঞ; আর সে একজন আইন-ব্যবসায়ী, সুতরাং তিনজনের মধ্যে সেই সর্বাধিক উদ্যমশীল। তার জন্যই যা ভরসা। ভাল কথা, দরখাস্ত-কমিটির খবর কি?'

'আজই ব্যারণ ভরব্‌য়ভ্-এর কাছে যাব। গতকাল তার সঙ্গে দেখা হয় নি।'

একটা রুশ নামের বিদেশী উপাধির উপর নেখ্‌ল্যুদভ কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক জোর দিয়ে কথা বলায় অ্যাডভোকেট বলল, 'তিনি কেমন করে "ব্যারণ" ভরব্‌য়ভ্ হলেন তা জানেন কি? কারণ সম্রাট পল তার ঠাকুর্দাকে (মনে হয় তিনি দরবারের একজন পিওন ছিলেন)—ঐ উপাধি দান করেছিলেন। যে রকম করেই হোক তিনি সম্রাটকে খুশি করে ওটা পেয়েছিলেন। এই ভাবেই "ব্যারণ" ভরব্‌য়ভ্-এর সৃষ্টি হয়েছে, আর সে উপাধি নিয়ে তার গর্বের শেষ নেই। বুড়ো ভারি চালাক।'

'আচ্ছা, আমি তাহলে তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।' নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

'ভাল কথা; আমরা এক সঙ্গেই যেতে পারি। পথে আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাব।'

বেরুবার মুখে পাশের ঘরেই পিওন তার হাতে মারিয়েত্ত-এর একখানি চিঠি দিল:

'Pour vous faire plaisir, j'ai agi Tout a fair contre mes principes, et j'ai interceced aupres demon mari pour votre protegee. Il se trouve bue cette parsonne peut etre velachee immediatement. Mon mari a ecrit au commandant. Vanez donc disinterestedly. Je vous attends. M.' (তোমাকে খুশি করতে আমার নীতির বিরুদ্ধে কাজ করেছি; তোমার আশ্রিতার জন্য আমার স্বামীকে বলেছি। দেখে মনে হচ্ছে এই ব্যক্তিকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া যাবে। আমার স্বামী কম্যাণ্ডারকে লিখেছে। অতএব এস, বিনা কাজে এস। তোমার আশায় থাকব। এম।)

'কল্পনা করুন।' নেখ্‌লুদভ অ্যাডভোকেটকে বলল। 'ভয়ংকর কথা নয় কি? যে স্ত্রীলোকটিকে তারা সাত মাস ধরে নির্জন সেলে আটকে রেখেছে, দেখা যাচ্ছে সে সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং একটি কথাতেই তার মুক্তির ব্যবস্থা হয়ে গেল।'

'তাই হয়। যাই হোক, আপনার মনোবাঞ্ছা তো পূর্ণ হয়েছে।'

'তা হয়েছে, কিন্তু এই সাফল্যে আমি ব্যথা পাচ্ছি। ভেবে দেখুন ওখানে কি অবস্থা চলছে। কেন তারা ওকে আটকে রেখেছিল?'

'এ সব ব্যাপার নিয়ে বেশী মাথা না ঘামানোই ভাল। তাহলে আমার গাড়িতেই যাচ্ছেন তো?' বাড়ি থেকে বেরুতে বেরুতে অ্যাডভোকেট বলল। অ্যাডভোকেটের ভাড়া করা সুদৃশ্য গাড়িখানা দরজায় এসে দাঁড়াল।

অ্যাডভোকেট কোচয়ানকে গন্তব্যস্থানের কথা বলে দিতে ঘোড়া দুটি অতি দ্রুত নেখ্‌লুদভকে ব্যারণের ভবনে পৌঁছে দিল। ব্যারণ বাড়িতেই ছিল। ইউনিফর্মপরিহিত একটি যুবক কর্মচারি দুটি মহিলাসহ প্রথম ঘরেই বসে ছিল। যুবকটির গলা সরু ও লম্বা, গলার টুটিটা বেশ বড়, হাঁটে খুব ধীরে।

সাবলীল ভঙ্গীতে মহিলাদের কাছ থেকে নেখ্‌লুদভের কাছে এগিয়ে এসে যুবকটি জিজ্ঞাসা করল, 'দয়া করে আপনার নামটি বলুন।'

নেখ্‌লুদভ নাম বলল।

'ব্যারণ আপনার কথা বলে রেখেছেন। এক মিনিট,' বলেই একটা ভিতরের দরজা দিয়ে যুবকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। শোকের পোশাক পরা একটি ক্রন্দনরতা মহিলাকে নিয়ে সে ফিরে এল। চোখের জল ঢাকবার জন্য মহিলাটি শীর্ণ আঙুল দিয়ে ওড়নাটা মুখের উপর টেনে দেবার চেষ্টা করছে।

লঘু পায়ে পড়ার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে সেটা খুলে দিয়ে যুবকটি নেখ্‌লুদভকে বলল, 'আসুন।'

ঘরে ঢুকে নেখ্‌লুদভ দেখল, একটা বড় লেখার টেবিলের উল্টো দিকে হাতল-চেয়ারে বসে আছে একটি মাঝারি গড়নের লোক। তার চুল ছোট করে ছাঁটা, পরনে ফ্রক-কোট, মুখে হাসি।

তার গোলাপ-রাঙা মুখ, পাকা চুল, গোঁফ ও দাড়ি স্পষ্টতই চোখে পড়ে। নেখ্‌লুয়ুদভের দিকে ঘুরে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসির সঙ্গে সে বলল, 'তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম। তোমার মা আমার পরিচিতা ও বান্ধবী ছিলেন। ছেলেবেলায় তোমাকে দেখেছি; পরে অফিসার হিসাবেও দেখেছি। বল তোমার জন্য কি করতে পারি।' নেখ্‌লুয়ুদভ ফেদসিয়ার কথা বলতে শুরু করলে সে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলে যাও, বলে যাও। আমি ঠিক বুঝতে পারছি। খুবই দুঃখের কথা। তুমি দরখাস্তটা দিয়েছ কি?'

পকেট থেকে দরখাস্তটা বের করে নেখ্‌লুয়ুদভ বলল, 'দরখাস্ত নিয়েই এসেছি। ব্যাপারটা যাতে বিশেষ মনোযোগ পেতে পারে সেজন্য আপনার সঙ্গে আগে কথা বলে নিলেই সুবিধা হবে বলে আমার মনে হয়েছিল।'

'খুব ভাল করেছ। আমি নিজেই ব্যাপারটা তুলব,' খুশি-ভরা মুখে দুঃখের ভাব ফোটাবার বৃথা চেষ্টা করে ব্যারণ বলল, 'খুবই দুঃখের কথা! স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটা একেবারেই ছেলেমানুষ। স্বামীর খারাপ ব্যবহারে তার মন খিঁচড়ে যায়; পরে দুজন দুজনকে ভালবাসতে শুরু করে। হ্যাঁ, আমিই ব্যাপারটা তুলব।'

'কাউন্ট আইভান মিখাইলভিচও এ বিষয়ে কথা বলবেন।'

নেখ্‌লুয়ুদভ কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যারণের মুখটা বদলে গেল।

সে বলল, 'তুমি বরং আপিসেই দরখাস্তটা জমা দিয়ে যাও; আমি যা করার তা করব।'

সেই সময় যুবক কর্মচারিটি আবার ঘরে ঢুকল।

'সেই মহিলাটি আরও কয়েকটি কথা বলতে চান।'

'বেশ, পাঠিয়ে দাও।···দেখছ তো বাপু, কত না চোখের জল আমাদের দেখতে হয়! সে সব যদি মুছিয়ে দিতে পারতাম। যতটুকু সাধ্যে কুলোয় তাই করি।'

মহিলাটি ঘরে ঢুকল।

'আমি বলতে এলাম, তিনি যেন মেয়েকে ত্যাগ করতে না পারেন কারণ—'

'বলেছি তো আমার যা সাধ্য তা করব।'

'ব্যারণ, ঈশ্বরের দোহাই! একটি মাকে বাঁচান।'

মহিলাটি ব্যারণের হাতখানি চেপে ধরে তাতে চুম্বন করতে লাগল।

'যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে।'

মহিলাটি চলে গেলে নেখ্‌লুয়ুদভ উঠে দাঁড়াল।

'আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করব। আগে বিচারবিভাগীয় মন্ত্রিসভায় কথাটা তুলব, তারপর তাদের জবাব এলে আমাদের যা করবার ত' করব।'

নেখ্‌লুয়ুদভ আপিসে গেল। সেনেট-আপিসের মত এখানেও মস্ত বড় কামরা, ধোপ-দুরস্ত বহু কর্মচারি—পরিচ্ছন্ন, ভদ্র, নিখুঁত, চলনে-বলনে

কেন্তাঁহুরস্ত।

'এ রকম আরও কত আছে; এমন পেট-ভরে খাওয়া মানুষ আরও কত আছে। এদের শার্ট, এদের হাত কেমন পরিষ্কার; জুতোগুলো কী সুন্দর পালিশ-করা। কারা করে দেয়? শুধু কয়েদীদের তুলনায়ই নয়, চাষীদের সঙ্গে তুলনায়ও এরা সবাই কত আরামে আছে।' আপনা থেকেই কথাগুলি নেখ্‌লয়ুদভের মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল।

অধ্যায়—১৯

পিতার্সবার্গের কয়েদীদের ভাগ্য নির্ভর করে একজন সুখ্যাত বৃদ্ধ জেনারেলের উপর। লোকটি জার্মান বংশোদ্ভূত একজন ব্যারণ। অনেক সামরিক সম্মানে সে ভূষিত হয়েছে, কিন্তু পরে থাকে মাত্র একটি—অর্ডার অব্‌ দি হোয়াইট ক্রশ। এই সম্মান-নিদর্শনটি তার কাছে খুব মূল্যবান। ককেশাস অঞ্চলে সেনাবাহিনীতে থাকা কালে তারই নির্দেশে চুল-ছাঁটা, 'ইউনিফর্ম-পরা, বন্দুক ও সঙ্গীনধারী একদল রুশ চাষী সহস্রাধিক লোককে হত্যা করেছিল; তাদের অপরাধ তারা তাদের স্বাধীনতা, তাদের বাড়ি-ঘর ও তাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। সেই যুদ্ধজয়ের পুরস্কারস্বরূপই এই নিদর্শনটি সে পেয়েছিল। তারপর সে গিয়েছিল পোল্যাণ্ডে। সেখানেও তার নির্দেশে রুশ চাষীরা অনেক দুষ্কর্ম করেছে, আর সে লাভ করেছে অনেক সম্মান, অনেক নিদর্শক। আরও অনেক স্থানে সে কাজ করেছে। এখন বুড়ো বয়সে এই পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ভাল বাড়ি, মোটা আয় ও সম্মান ভোগ করছে। 'উপর থেকে' যে সব নির্দেশ আসে সেগুলি সে কঠোরভাবে পালন করে। সেই সব নির্দেশ পালনের ব্যাপারে সে অত্যন্ত উৎসাহী; সে মনে করে, পৃথিবীতে আর সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটতে পারে, শুধু 'উপর থেকে' আসা এই সব নির্দেশ অপরিবর্তনীয়। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক বন্দীকে নির্জন কারাবাসে আটক রাখাই তার কাজ। সে কাজ সে এমনভাবে করে যে গত দশ বছরে তাদের অর্ধেকের ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে: কেউ পাগল হয়ে গেছে, কেউ যক্ষ্মায় মরেছে, আর কেউবা অনশনে কাঁচের টুকরো দিয়ে শিরা কেটে, ফাঁসিতে ঝুলে অথবা আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করেছে।

বৃদ্ধ জেনারেল এ সম্পর্কে অনবহিত নয়, তার কারণ তার চোখের সামনেই এ সব ঘটনা ঘটেছে; কিন্তু এ সব ঘটনা ঝড়, বন্যা প্রভৃতি কারণে আকস্মিক মৃত্যুর চাইতে তার মনকে বেশী নাড়া দেয় না! 'উপর থেকে' মহামান্য সম্রাট যে সব নির্দেশ পাঠান, এ সব তো সেই নির্দেশ পালনেরই ফলশ্রুতি। নির্দেশ পালন তো অবশ্য কর্তব্য, সুতরাং তার পরিণতিতে কি ঘটছে সেটা ভাবা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

বৃদ্ধ জেনারেল সপ্তাহে একদিন সেলগুলি ঘুরে দেখে—এটা তার অন্যতম কর্তব্য—এবং কয়েদীদের কোন প্রার্থনা আছে কিনা জানতে চায়। কয়েদীদের কাছ থেকে হরেক রকম অনুরোধ আসে। দুর্ভেদ্য নৈঃশব্দ্যের সঙ্গে সে সবই সে শান্তভাবে শোনে, কিন্তু কখনও তার একটিও পূর্ণ করে না, কারণ সে সব অনুরোধই নির্দেশ-বিরোধী।

জেনারেল নেখ্‌লুদভ বলল, 'তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব খুশি হলাম। তুমি কি অনেকদিন পিতার্সবার্গে এসেছ?'

নেখ্‌লুদভ জানাল, সে সবেমাত্র এসেছে।

'তোমার মা প্রিন্সেস ভাল আছেন?'

'আমার মা মারা গেছেন।'

'ক্ষমা করো, আমি খুব দুঃখিত। আমার ছেলে বলেছে তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল।'

জেনারেলের ছেলে বাবার মতই চাকরিতে বেশ উন্নতি করে চলেছে। এখন সে গোয়েন্দা বিভাগে আছে, সেখানে তার কাজকর্ম নিয়ে সে বেশ গর্ববোধ করে। সরকারী গুপ্তচরদের পরিচালনা করাই তার কাজ।

'দেখ, তোমার বাবা আর আমি একসঙ্গে কাজ করেছি। আমরা ছিলাম বন্ধু—কমরেড। আর তুমি; তুমিও তো চাকরিতেই আছ?'

'না, আমি চাকরিতে নেই।'

জেনারেল অসম্মতিসূচক ভাবে মাথা নীচু করল।

'জেনারেল, আমার একটা অনুরোধ আছে।'

'খু—ব ভাল কথা। কি ভাবে তোমার কাজে লাগতে পারি?'

'আমার অনুরোধ যদি অসঙ্গত হয়, দয়া করে ক্ষমা করবেন। কিন্তু সে অনুরোধ জানাতে আমি বাধ্য।'

'কি বল?'

'এই দুর্গে গুর্কেভিচ নামে একজন বন্দী আছে। তার মা তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়, অথবা অন্ততপক্ষে তাকে কিছু বই পাঠাবার অনুমতি চায়।'

নেখ্‌লুদভের অনুরোধে জেনারেল সন্তোষ বা অসন্তোষ কিছুই প্রকাশ করল না, মাথাটা একদিকে কাত করে এমনভাবে চোখ বুজল যেন ব্যাপারটা ভেবে দেখছে। আসলে সে কিছুই ভাবছিল না, নেখ্‌লুদভের অনুরোধের ব্যাপারে তার কোন আগ্রহই নেই, কারণ সে যে আইন মোতেবেকই জবাব দেবে এটা সে ভালভাবেই জানে। তাই সে মোটেই কিছু ভাবছিল না, শুধু একটুখানি মানসিক বিশ্রাম নিচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত সে বলল, 'দেখ, এটা আমার উপর নির্ভর করে না। দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে মহামান্য সম্রাটের দ্বারা সমর্থিত একটা আইন আছে; আর

বইয়ের ব্যাপারে ভাল বইয়ের একটা লাইব্রেরি আমাদের আছে ! অনুমোদিত সব বইই তারা পেতে পারে।'

'তা ঠিক। তবে তার বিজ্ঞানের বই দরকার ; সে পড়াশুনা করতে চায়।'

'ও সব কথা বিশ্বাস করো না,' জেনারেল হুংকার দিয়ে উঠেই চুপ করে গেল। একটু পরে বলল, 'পড়াশুনা করতে চায় না হে ; ওটা হল একরকম অস্থিরতা।'

'তাহলে কি করা যাবে ? কঠোর পরিবেশের মধ্যে তাদের তো সময় কাটাতে হবে,' নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

জেনারেল বলল, 'ওদের স্বভাবই অভিযোগ করা। ওদের আমরা চিনি।'

তার কথায় মনে হল যেন বিশেষ খারাপ জাতের কোন লোক সম্পর্কে কথা বলছে।

'এখানে তারা যে সব সুবিধা পেয়ে থাকে আর কোথাও তা মেলে না,' জেনারেল বলল। 'এ কথা ঠিক, এক সময় অবস্থা খারাপ ছিল, কিন্তু এখন তাদের খুব ভালভাবে রাখা হয়। তারা তিন পদ খাবার পায়—তার একটা মাংস : কাটলেট অথবা ফ্রাই। রবিবারে আর একটা পদ বেশী—মিষ্টি। ঈশ্বর করুন, রাশিয়ার প্রতিটি মানুষ যেন তাদের মত ভালভাবে বাঁচার চেষ্টা করতে পারে।'

সব বুড়ো মানুষের মতই জেনারেলও একবার কোন বিষয়ে কথা শুরু করলে আর থামতে চায় না।

'ধর্ম-বিষয়ক বই তাদের দেওয়া হয়, পুরনো সাময়িকপত্র দেওয়া হয়। আমাদের একটা লাইব্রেরি আছে। কিন্তু তারা কদাচিত কিছু পড়ে। প্রথম প্রথম কিছুটা আগ্রহ থাকে, কিন্তু পরবর্তী কালে নতুন বইয়ের অর্ধেক পাতাও কাটা হয় না। আর পুরনো বইয়ের তো একটা পাতাও ওল্টানো হয় না। আমরা অনেক চেষ্টা করে দেখেছি। প্রথম দিকে তাদের মধ্যে চঞ্চলতা থাকে, কিন্তু পরে তারা মুটিয়ে যায় এবং খুব শান্ত হয়ে পড়ে।' জেনারেল এই ভাবে কথা বলে যায়, কিন্তু এ সব কথার অর্থ যে কত সাংঘাতিক ভুলেও তা বুঝতে পারে না।

নেখ্‌ল্যুদভ চুপচাপ সব কথা শুনে গেল। সে জানে, এই বুড়োর কথার জবাব দেওয়া বৃথা। সে শুধু নিজের কাজের কথাটাই আর একবার তুলল। শুস্তভার খালাসের যে হুকুম হয়েছে-সে কথা আজ সকালেই শুনেছে। তার কথাই সে জানতে চাইল।

'শুস্তভা—শুস্তভা ? এ রকম এত নাম আছে যে সে সব মনেও রাখতে পারি না।' সে ঘণ্টা বাজিয়ে সেক্রেটারিকে ডেকে দিতে বলল। সেক্রেটারি না আসা পর্যন্ত সে এই বলে নেখ্‌ল্যুদভকে সেনাদলে চাকরি নিতে প্ররোচিত লাগল যে, সৎ ও মহৎ লোকদের (তার মধ্যে সে নিজেও একজন)

জারের—এবং দেশের বড় প্রয়োজন।

'আমি আজ বৃদ্ধ হয়েছি, তবু যথাসাধ্য কাজ করে চলেছি।'

সেক্রেটারি ঘরে ঢুকে জানাল, শুস্তভাকে একটা দুর্ভেদ্য জায়গায় আটক রাখা হয়েছে, আর তার সম্পর্কে কোন নির্দেশ সে পায় নি।

'নির্দেশ পেলে সেই দিনই তাকে ছেড়ে দেব। তাকে রাখতে আমরা চাই না; তাদের উপস্থিতিকে খুব মূল্যবান বলেও মনে করি না,' হাল্কা হাসি হাসতে চেষ্টা করে জেনারেল কথাগুলি বলল, কিন্তু তাতে তার বার্ধক্যজীর্ণ মুখটা আরও বিকৃত দেখাল।

নেখ্‌ল্যুদভ উঠে দাঁড়াল।

'বিদায় বাবাজি, আমাকে ভুল বুঝো না। তোমাকে স্নেহ করি বলেই কথাগুলি বললাম। যে সব লোক এখানে থাকে তাদের সঙ্গে মেলামেশা রেখ না। তারা কেউ নির্দোষ নয়। তারা সব নচ্ছার। আমরা তাদের চিনি।' এমন ভাবে সে কথা বলল যেন এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

'সব চাইতে ভাল কাজ, সৈন্যদলে যোগ দাও; জার চান সৎ লোক—দেশও চায়। ধর, তোমার মত আমরা সবাই যদি সৈন্যদল ছেড়ে চলে আসি, তাহলে কি হবে? কে কাজ করবে? এখানে আমরা দোষ ধরে বেড়াচ্ছি, অথচ সরকারের হয়ে কাজ করতে কেউ চাই না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নেখ্‌ল্যুদভ অভিবাদন জানালা, তার দিকে দয়া করে বাড়ানো হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিল, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ইজভজচিক গাড়ি ছেড়ে দিল।

বলল, 'স্যার, এখানটা বড়ই গুমোট; আমি ভাবছিলাম আপনার জন্য আর অপেক্ষা না করে গাড়ি নিয়ে চলে যাব।'

নেখ্‌ল্যুদভ ঘাড় নাড়ল, 'সত্যি, জায়গাটা গুমোট।' একটা প্রশ্বাস টেনে আমাদের দিকে তাকাল। ধূসর মেঘের দল ভেসে চলেছে। দূরে নেভার বুকে নৌকো ও ষ্টিমার চলাচলের ফলে নদীর ঢেউগুলি ঝিকমিক করছে। নেখ্‌ল্যু-দভের মনে স্বস্তি ফিরে এল।

অধ্যায়—২০

পরদিন সেনেটে মাসলভার মামলার শুনানি হবার কথা। বাড়িটার প্রকাণ্ড ফটকে নেখ্‌ল্যুদভ ও অ্যাডভোকেটের দেখা হল। সেখানে অনেকগুলি গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। এখানের গলি-ঘুঁজি ফানারিনের জানা। দোতলার ঝকঝকে প্রকাণ্ড সিঁড়ি বেয়ে উঠে বাঁয়ে মোড় নিয়ে তারা একটা ঘরে ঢুকল। দরজার উপরে আইন প্রণয়নের তারিখটা উৎকীর্ণ রয়েছে।

চাপরাশি জানাল, সেনেটররা সকলেই হাজির হয়েছে।

সেদিন একটা মিথ্যা অপবাদের মামলারও শুনানীর দিন ছিল। কাজেই আদালতে প্রচুর ভীড় হয়েছে—বিশেষ করে সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত বহু লোক জমায়েত হয়েছে।

ঘোষক যথারীতি গম্ভীরভাবে ঘোষণা করল, 'আদালত আসছেন।' সকলেই যথারীতি উঠে দাঁড়াল। ইউনিফর্ম পরিহিত সেনেটরগণ ঘরে ঢুকে উঁচু পিঠওয়ালা চেয়ারে বসে টেবিলের উপর ঝুঁকে স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে সচেষ্ট হল।

চারজন সেনেটর উপস্থিত ছিল—নিকিতিন সভাপতি—দাড়ি-গোঁফ-কামানো সরু মুখ, ইস্পাত-নীল চোখ; চাপা ঠোঁট উল্‌ফ্‌, ছোট সাদা হাত দুটি দিয়ে দরকারী কাগজপত্র নাড়তে লাগল; মুখে ছুলির দাগ ভরা বিজ্ঞ আইনজ্ঞ স্থূলকায় স্কভরদ্‌নিকভ্‌; এবং সবশেষআগত মহামান্য-চেহারার বে।

সেনেটরদের সঙ্গেই ঘরে ঢুকল চিফ্‌ সেক্রেটারি ও সরকারী উকিল। তার পরনে অদ্ভুত ইউনিফর্ম। আজ ছ'বছর তার সঙ্গে দেখা নেই, তবু এক নজর দেখেই নেখ্‌ল্যুদভ তাকে চিনতে পারল। ছাত্রাবস্থায় সে ছিল নেখ্‌ল্যুদভের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

অ্যাডভোকেটের দিকে ঘুরে সে জিজ্ঞাসা করল, 'এই কি সরকারী উকিল সেলেনিন?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'আমি একে চিনি। খুব ভাল লোক।'

'ভাল উকিলও বটে—কর্মদক্ষ। এর সঙ্গেই আপনার যোগাযোগ করা উচিত।'

সেলেনিনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল তার পবিত্রতা, সততা ও সুশিক্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর কথা। সে বলল, 'সে নিশ্চয় তার বিবেকানুযায়ী কাজ করবে।'

মামলার প্রতিবেদন শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেদিকে কান রেখে ফানারিন ফিস ফিস করে বলল, 'তা বটে। তাছাড়া, এখন তো দেরীও হয়ে গেছে।'

একটি সংবাদপত্রকে নিয়ে মামলা। একটি লিমিটেড কোম্পানির ডিরেক্টরের জালিয়াতির ব্যাপার ঐ সংবাদপত্রে ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্বভাবতই মামলার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, ডিরেক্টরটি সত্যিসত্যি তার উপর ন্যস্ত বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে কি না, এবং করে থাকলে সে রকম কাজ থেকে তাকে বিরত করা। কিন্তু এখানে আলোচনা শুরু হয়ে গেল, উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের আইনগত অধিকার সম্পাদকের আছে কি না, এবং সেটা প্রকাশ করায় তার প্রকৃত অপরাধ কি—অপবাদ না কুৎসা রটনা—এবং অপবাদ কতদূর পর্যন্ত কুৎসা অথবা কুৎসা কতদূর পর্যন্ত অপবাদ; এককথায় এমন সব কথার কচকচি যা সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য।

ঘোষক ফানারিনের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোন্ মামলার জন্য এসেছেন ?'

'আপনাকে তো আগেই বলেছি : মাসলভার মামলা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। সে মামলার শুনানীও আজই হবে, কিন্তু—'

'কিন্তু কি ?'

'দেখুন, এ ব্যাপারে কোন রকম জেরা হবে ওরা আশা করেন নি। তাই আলোচ্য মামলার রায় ঘোষণা করে ওরা আর বেরিয়ে আসবেন না। তবে আমি তাঁদের বলব।'

'আপনি কি বলছেন ?'

'আমি তাঁদের বলব ; আমি তাঁদের বলব।' ঘোষক তার নোট-বইতে আবারও কি যেন লিখল।

আসলে সেনেটরদের ইচ্ছা ছিল, কুৎসার মামলার রায় ঘোষণার পরে তারা আর আলোচনা-সভা ছেড়ে উঠবে না ; সেখানেই চা ও সিগারেট খেতে খেতে মাসলভার মামলাসহ অন্য মামলার কাজ শেষ করবে।

অধ্যায়—২১

সেনেটরগণ বিতর্ক-সভায় টেবিলের চারধারে সমবেত হওয়া মাত্র উল্‌ফ্ প্রবল উৎসাহের সঙ্গে মামলা খারিজের পক্ষে সব রকম যুক্তি দেখাতে লাগল। যা হোক, প্রবল বিতর্ক ও উত্তেজনার মধ্যে শেষ পর্যন্ত আলোচনা শেষ হল। প্রেসিডেন্টের সম্মতিক্রমে আপিল খারিজ করার সিদ্ধান্ত হল। তখন সেনেটরগণ চায়ের হুকুম দিয়ে নানা বিষয়ের আলোচনায় মেতে উঠল।

এমন সময় ঘোষক এসে জানাল, অ্যাডভোকেট ও নেখ্‌ল্যুদভ মাসলভার মামলার সময় উপস্থিত থাকতে চায়।

উল্‌ফ্ বলল, 'মামলাটা বেশ রোম্যান্টিক।' মাসলভার সঙ্গে নেখ্‌ল্যুদভের সম্পর্কের কথা যা সে জানত সব খুলে বলল।

এই বিষয়ে যৎসামান্য আলোচনা সেরে সেনেটররা চা ও সিগারেটপর্ব সমাধা করে সেনেট-কক্ষে ফিরে এল এবং কুৎসার মামলার রায় ঘোষণা করে মাসলভার আপিলের শুনানী শুরু করল।

সরু গলায় উল্‌ফ্ মাসলভার আপিলের একটা পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন রাখল ; তার মূল সুরটা দণ্ডাদেশ রহিত করারই পক্ষে।

ফানারিনের দিকে ঘুরে চেয়ারম্যান বলল, 'আপনার আর কিছু বলার আছে ?'

ফানারিন উঠে দাঁড়াল। চাওড়া বুকটা ফুলিয়ে একটা একটা করে পয়েন্ট ধরে সে প্রমাণ করতে লাগল যে ছ' ছ'টা পয়েন্টে ফৌজদারি আদালত

আইনের প্রকৃত অর্থ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, সুতরাং এ দণ্ডাদেশ চূড়ান্ত অন্যায়েরই নামান্তর। তার সংক্ষিপ্ত অথচ জোড়ালো বক্তৃতার মূল সুর কিন্তু সেনেটরদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা : সেনেটরগণ তাদের তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি ও আইনের জ্ঞানের দ্বারা এ বিষয়ে তার চাইতে ভালই বুঝতে পারবেন ; তবু যে তাকে এই বক্তৃতা করতে হচ্ছে তার কারণ যে-কর্তব্য সে গ্রহণ করেছে তাকে পালন তো করতে হবেই।

ফানারিনের বক্তৃতার পরে সহজেই মনে হতে পারে যে সেনেট কর্তৃক আদালতের রায় বাতিল করার বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। বক্তৃতা শেষ করে ফানারিন জয়ের হাসি হেসে চারদিকে তাকাল। তা দেখে নেখ্‌ল্যুদভও ভাবল যে মামলায় তাদের জয় হবে। কিন্তু সেনেটরদের দিকে তাকিয়েই সে বুঝতে পারল যে সে হাসি ও জয় শুধু ফানারিনের একার। সিনেটরগণ ও সরকারী উকিলের মুখে হাসি নেই, জয়ের আনন্দও নেই। বরং দেখে মনে হল তারা চিন্তিত, যেন ভাবছে, 'তোমার মত লোকের কথা আমরা অনেক শুনেছি—কিন্তু সব বৃথা। ফানারিন যখন বক্তৃতা শেষ করে তাদের অকারণে আটকে রাখার হাত থেকে অব্যাহতি দিল তখন তারা খুশিই হল। অ্যাডভোকেটের বক্তৃতার পরেই প্রেসিডেণ্ট সরকারী উকিলের দিকে তাকাল। দণ্ডাদেশ পুনর্বিবেচনার সপক্ষে প্রদত্ত যুক্তিগুলো যথেষ্ট কার্যকরী নয় এই অভিমত ব্যক্ত করে সেলেনিন সংক্ষেপে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় আদালতের রায়কে অপরিবর্তিত রাখার স্বপক্ষে মত দিল। তারপর সেনেটররা আলোচনা-কক্ষে চলে গেল। তাদের মধ্যে মত-বিরোধ দেখা দিল। উল্‌ফ্‌ আপিল মঞ্জুরের পক্ষে মত দিল। বে উৎসাহের সঙ্গে তাকে সমর্থন করল। নিকিতিন সর্বদাই কঠোরতা ও চিরাচরিত প্রথার সমর্থক। সে ভিন্ন মত ব্যক্ত করল। তখন সব কিছু যখন স্কভরদ্‌নিকভের ভোটের উপর নির্ভরশীল তখন সে আপিল খারিজের সপক্ষে ভোট দিল, আর তার প্রধান কারণ হল, নেখ্‌ল্যুদভ যে নৈতিক কারণে স্ত্রীলোকটিকে বিয়ে করতে দৃঢ়সংকল্প এটা তার কাছে অত্যন্ত ন্যক্কারজনক বলে মনে হয়েছে।

স্কভরদ্‌নিকভ্‌ একজন বস্তুবাদী ও ডারুইনপন্থী ; বিমূর্ত নৈতিকতা এবং তার চাইতেও বেশী ধর্মবোধের যে কোন প্রকাশকেই ঘৃণার্হ নির্বুদ্ধিতা এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ বলে সে মনে করে। সেনেটে একজন খ্যাতনামা অ্যাড-ভোকেট ও নেখ্‌ল্যুদভের উপস্থিতি এবং একটা বেশ্যাকে নিয়ে এই মাতামাতি তার কাছে অসহ্য। সুতরাং আপিলের স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নেই এই অভিমত গ্রহণ করে সেও প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে একমত হল যে আদালতের রায় অপরি-বর্তিতই থাকবে।

কাজেই দণ্ডাদেশ যথাপূর্ব বহাল রইল।

অধ্যায়—২২

অ্যাডভোকেটের সঙ্গে ওয়েটিং-রুমে ঢুকে নেখ্‌ল্যুদভ বলে উঠল, 'কী ভয়ংকর! যেখানে ব্যাপারটা অত্যন্ত সরল, সেখানেও তারা বাহ্যিক রীতি-টাকেই বড় করে দেখে, কিছুতেই হস্তক্ষেপ করতে চায় না। ভয়ংকর!'

অ্যাডভোকেট বলল, 'ফৌজদারি আদালতই মামলা নষ্ট করে দিয়েছে।'

'আর সেলেনিন, সেও খারিজের পক্ষে মত দিল। ভয়ংকর! ভয়ংকর!' নেখ্‌ল্যুদভ বারবার বলতে লাগল। 'এখন কি করা হবে?'

'আমরা মহামান্য সম্রাটের কাছে আবেদন করব। এখানে থেকে আপনিই হাতে হাতে দরখাস্তটা দিয়ে যাবেন। আমিই লিখে দেব।'

ঠিক সেই সময় তারকাখচিত ইউনিফর্ম-পরিহিত ছোট্ট মানুষ উল্‌ফ্‌ ওয়েটিং রুমে ঢুকে নেখ্‌ল্যুদভের কাছে গেল। ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে চোখ বুঁজে সে বলল, 'প্রিয় প্রিন্স, কিছুই করা গেল না। আপিলের সপক্ষের যুক্তিগুলো মোটেই যথেষ্ট ছিল না।' কথাগুলি বলেই সে চলে গেল।

তার পুরনো বন্ধু নেখ্‌ল্যুদভ এখানে আছে, সেনেটরদের কাছে এ-কথা শুনে সেলেনিনও এল।

'দেখ, তোমাকে এখানে দেখতে পাব আমি আশাই করি নি,' সেলেনিন বলল। তার ঠোঁটে হাসি, কিন্তু চোখ দুটি বিষণ্ণ। 'আমি জানতাম না যে তুমি পিতার্সবার্গে আছ।'

'আর আমিও জানতাম না যে তুমি উপ-ন্যায়াধীশ।"

'সহকারী', সেলেনিন সংশোধন করে দিল। 'কিন্তু তুমি সেনেটে এসেছ কেন? আমি শুনলাম তুমি পিতার্সবার্গে এসেছ। কিন্তু এখানে কি করছ?'

'এখানে? আমি এখানে এসেছি কারণ আমি আশা করেছিলাম, ন্যায় বিচার পাব, নির্দোষ হয়েও দণ্ডিত একটি স্ত্রীলোককে বাঁচাতে পারব।'

'কে সে স্ত্রীলোক?'

'এই মাত্র যার মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গেল।'

হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় সেলেনিন বলল, 'ওহো। মাসলভা মামলা। আপিলের কোন যুক্তিই যে নেই।'

'আপিলের কথা নয়; স্ত্রীলোকটির কথা; সে নির্দোষ, অথচ তার শাস্তি হচ্ছে।'

সেলেনিন নিঃশ্বাস ছাড়ল।

'তা হতে পারে, কিন্তু—'

'হতে পারে নয়, তাই হচ্ছে—'

'তুমি কি করে জানলে?'

'আমিও জুরিতে ছিলাম। আমি জানি, আমরা কি ভুল করেছিলাম।'

সেলেনিন চিন্তিত হয়ে পড়ল।

বলল, 'সেই সময় তোমার একটা বিবৃতি দেওয়া উচিত ছিল।'

'আমি বিবৃতি দিয়েছিলাম।'

'সেটাকে সরকারী প্রতিবেদকের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। আপিলের দরখাস্তের সঙ্গে যদি সেটা জুড়ে দেওয়া হত—'

সেলেনিন ব্যস্ত মানুষ। বাইরের সমাজে খুব একটা মেশেও না। কাজেই নেখ্‌ল্যুদভের প্রণয়ঘটিত ব্যাপার কিছুই সে জানে না। সেটা বুঝতে পেরে নেখ্‌ল্যুদভ স্থির করল, মাসলভার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা কিছু না বলাই ভাল।

'তা ঠিক ; কিন্তু যে অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে তাতেই তো বোঝা যায় যে রায়টা স্ববিরোধী।'

সেলেনিন বলল, 'সে কথা বলবার কোন অধিকার সেনেটের নেই। সেনেট যদি নিজেদের ইচ্ছামত আদালতের রায়কে পাল্টাতে শুরু করে তাহলে জুরিদের রায় অর্থহীন হয়ে পড়বে এবং সেনেট ন্যায়ের রক্ষক না হয়ে ন্যায়-লংঘনকারী হয়ে উঠবে।'

'আমি শুধু এই বুঝি যে, স্ত্রীলোকটি সম্পূর্ণ নির্দোষ, এবং যে শাস্তি তার প্রাপ্য নয় তার হাত থেকে তাকে বাঁচাবার শেষ আশাও নিঃশেষ হয়ে গেল। উচ্চতম আদালত জঘন্যতম অবিচারকেই সমর্থন করল।'

চোখ মিটমিট করে সেলেনিন বলল, 'এটাই শেষ সিদ্ধান্ত নয়। মামলার ভাল-মন্দের বিচারে সেনেট যেতে পারে না। কখনও যায় না।'

পরক্ষণেই আলোচনার বিষয়বস্তু পাল্টাবার জন্য সেলেনিন বলল, 'তুমি তো তোমার মাসির কাছেই উঠেছ। কাল তিনি আমাকে বলেছিলেন, তুমি এখানে এসেছ ; একজন বিদেশী প্রচারকের ভাষণকে উপলক্ষ্য করে তিনি গতকাল সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করেছিলেন।'

সেলেনিন বিষয়ান্তরে চলে যাওয়ায় বিরক্ত হয়ে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'হ্যাঁ, আমি সেখানে ছিলাম, কিন্তু বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়েছিলাম।'

'কেন, বিরক্ত হয়ে কেন ? একপেশে এবং সম্প্রদায়গত হলেও সেও তো একটা ধর্মমতেরই অভিব্যক্তি।'

'ও তো এক ধরনের খেয়ালী মূর্খামী।'

'না ভাই, না। আশ্চর্যের বিষয় কি জান, আমাদের গীর্জার শিক্ষাকেই আমরা এত অল্প জানি যে আমাদের মৌলিক ধর্মবিশ্বাসকেই আমরা অনেক সময় নতুন বলে মনে করি।'

নেখ্‌ল্যুদভ সবিস্ময়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সেলেনিনের দিকে তাকাল। সেলেনিন চোখ নামাল। তার চোখের দৃষ্টিতে শুধু বিষাদ নয়, অশুভ ইচ্ছারও প্রকাশ।

নেখ্‌ল্যুদভ প্রশ্ন করল, 'তুমি কি তাহলে গীর্জার মতামতে বিশ্বাস কর ?'

নির্জীব দৃষ্টিতে নেখ্‌ল্যুদভের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে সেলেনিন জবাব দিল, 'নিশ্চয় করি।'

নেখ্‌ল্যুদভ নিঃশ্বাস ফেলল।

বলল, 'আশ্চর্য !'

সেলেনিন বলল, 'যা হোক, এ বিষয়ে অন্য সময় আলোচনা করা যাবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবার দেখা হবে। কিন্তু তোমাকে কোথায় পাওয়া যাবে ? সাতটার ডিনারে তুমি আমাকে সব সময় বাড়িতে পাবে। আমার ঠিকানা নাদেজ-দিন্‌স্কায়।' সে নম্বরটাও বলে দিল। 'হায় রে, সময় কখনও থেমে থাকে না।' শুধু ঠোঁটের হাসি হেসে সে পা বাড়াল।

'পারলেই যাব', নেখ্‌ল্যুদভ বলল। তার মনে হল, যে মানুষ একদিন তার কত কাছের, কত আপনার ছিল, একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনার ফলেই হঠাৎ সে কত অচেনা, কত দূরের, আর, বিরুদ্ধ না হলেও, কত দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে।

অধ্যায়—২৩

নেখ্‌ল্যুদভ যখন ছাত্র হিসাবে সেলেনিনকে চিনত তখন সে ছিল ছেলে হিসাবে ভাল, বন্ধু হিসাবে বিশ্বস্ত, আর বয়সের তুলনায় বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন একটি শিক্ষিত মানুষ,—রুচিবান, সুদর্শন এবং অস্বাভাবিক রকমের বিশ্বস্ত ও সৎ। সে অত্যধিক পরিশ্রম করত না, পণ্ডিতম্মন্যও ছিল না ; কিন্তু পড়াশুনায় বেশ ভালই ছিল ; প্রতিটি প্রবন্ধ রচনার জন্যই সে সোনার মেডেল পেত।

শুধু কথায় নয়। কাজেও মানবসেবাকেই সে জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করত। সরকারের চাকরি করা ছাড়া মানবসেবার অন্য কোন পথ তার চোখে পড়ত না। সুতরাং পড়াশুনার পাট চুকিয়ে দেবার পরেই কোন্ কাজে জীবন উৎসর্গ করা যায় সে বিষয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করে সে স্থির করল আইন প্রণয়নকারী চান্সেলারি-র দ্বিতীয় বিভাগই তার উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র এবং সরকারী চাকরির সেই বিভাগেই সে যোগদান করল। কিন্তু কঠোর আনুগত্যের সঙ্গে স্বীয় কর্তব্য পালন করা সত্ত্বেও সে কাজ তার মনঃপূত হল না এবং সে যে 'ঠিক কাজটি' করছে এ চেতনা তার মধ্যে জাগল না।

তার অত্যন্ত সংকীর্ণমনা গর্বিত উর্ধ্বতন কর্মচারির সঙ্গে বিরোধ দেখা দেওয়ায় এই অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পেল এবং তার ফলে সে চ্যান্সেলারি ছেড়ে সেনেটে ঢুকল। সেখানে পরিস্থিতি অনেকটা ভাল, কিন্তু সেই একই অসন্তোষ এখানেও তাকে তাড়া করতে লাগল ; এই বিভাগটি যে রকম হবে বলে সে আশা করেছিল এবং যে রকমটা হওয়া উচিত, আসলে তার থেকে অত্যন্ত পৃথক বলে তার মনে হল।

যখন সে বিয়ে করল তখনও এই একই মনোভাব তাকে পেয়ে বসল। জাগতিক বিচারে একটা খুব ভাল পাত্রী তার জন্য দেখা হল ; সেও বিয়ে করল ; কিন্তু বিয়ে করার প্রধান কারণ এ বিয়ে না করলে যে তরুণীটি তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক এবং যারা বিয়েটার ব্যবস্থাপক তারা উভয়েই মনে কষ্ট পাবে ; তাছাড়া, উচ্চ বংশের একটি সুন্দরী তরুণীকে বিয়ে করতে পারছে বলে সে বেশ গর্ব ও আত্মসুখ অনুভব করেছিল। কিন্তু শীঘ্রই এই বিয়েও সরকারী চাকরির মত 'ঠিক কাজটি' নয় বলে তার মনে হত লাগল।

তাদের প্রথম সন্তানের জন্মের পরে স্ত্রী স্থির করল, আর কোন সন্তান হবে না। সে তখন জাকজমকপূর্ণ পার্থিব সুখের জীবন যাপন করতে শুরু করল, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক স্বামীকেও সেই জীবনেরই অংশীদার হতে হল।

ছোট্ট মেয়েটির খালি পা আর সোনালী কোঁকড়া চুল। কিন্তু সে যেন তার আপনজন নয়, কারণ সে যে রকমটা চেয়েছিল তার ঠিক উল্টো রকমে তাকে মানুষ করা হচ্ছিল। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিল এবং তার থেকে শুরু হল নীরব যুদ্ধ, ভদ্রতার আবরণে বাইরের লোকের কাছ থেকে লুকিয়ে। ফলে তার পারিবারিক জীবন বোঝার মত হয়ে উঠল, এবং সরকারী চাকরির মত এ জীবনটাও তার কাছে 'ঠিক কাজটি' নয় বলে মনে হল।

ধর্মের ব্যাপারেও তার মনে একই ভাব গড়ে উঠল। নানা কারণে যে ধর্মমতকে সে প্রশ্রয় দিল, স্বীয় জীবনে গ্রহণ করল, সেটাও তার কাছে 'ঠিক কাজটি' হয়ে উঠতে পারল না।

তাই এতদিন পরে নেখ্লয়ুদভের সঙ্গে দেখা হওয়াতে মনের এই অসন্তোষ যেন নতুন করে তার মধ্যে জেগে উঠল। তার মন আশাভঙ্গের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ল।

ফলে দুজনই পুনরায় দেখা করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও দেখা করবার কোন রকম চেষ্টাই কেউ করল না। এবং যতদিন নেখ্লয়ুদভ পিতার্সবার্গে থাকল ততদিনের মধ্যে তাদের আর দেখা-সাক্ষাৎ ঘটল না।

অধ্যায়—২৪

সেনেট থেকে বেরিয়ে নেখ্লয়ুদভ ও অ্যাডভোকেট এক সঙ্গে হাঁটতে লাগল। অ্যাডভোকেটের নির্দেশে তার গাড়ির কোচয়ান গাড়িটা নিয়ে তাদের পিছন পিছন চলল। হাঁটতে হাঁটতে অ্যাডভোকেট পদস্থ কর্মচারি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নানা রকম চুরি, জোচ্চুরি ও নৈতিক অধঃপতনের কাহিনী অনর্গল বলে যেতে লাগল। সে সব কাহিনী ভাল না লাগায়

নেখ্‌ল্‌য়ুদভ একখানি ইজভজচিক ভাড়া করে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

নেখ্‌ল্‌য়ুদভের মন খুব খারাপ। সেনেট তার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে; ফলে নির্দোষ মাসলভা যে অর্থহীন যন্ত্রণা ভোগ করছে তার কোন প্রতিকার হল না; শুধু তাই নয়, এর ফলে মাসলভার সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িত করা আরও শক্ত হয়ে পড়ল। সমাজে প্রচলিত অসদাচরণের যে সব ভয়ংকর কাহিনী অ্যাডভোকেটটি বর্ণনা করল এবং একদা মিষ্টি স্বভাবের সরল উদার সেলেনিন আজ যে রকম উদাসীন আচরণ করল, তাতে তার মনোকষ্ট যেন অনেকগুণ বর্ধিত হল।

বাড়ি ফিরলে দারোয়ান তার হাতে একটা চিঠি দিয়ে কিছুটা ঘৃণার সুরেই জানাল, কে একটি মেয়েছেলে হলে বসে চিঠিটা লিখে রেখে গেছে। লিখেছে শুস্তভার মা। সে লিখেছে, মেয়ের হিতকারক উদ্ধারকর্তাকে ধন্যবাদ জানাতে এবং ভাসিল্‌য়েভস্কি, ৫ম লাইন,—নম্বর বাড়িতে তাদের সঙ্গে দেখা করবার অনুরোধ জানাতে সে এসেছিল। ভেরা দুখোভার জন্যই এটা একান্তভাবে প্রয়োজন। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে বিরক্ত করব, এ আশংকা যেন তিনি না করেন। তাদের কৃতজ্ঞতা তারা ভাষায় প্রকাশ করতে চায় না, তাঁকে দেখার আনন্দটুকুই চায়। কাল সকালে কি তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়?

আর একখানা চিঠি এসেছে প্রাক্তন সহকর্মী বর্তমানে সম্রাটের এ-ডি-কং বোগাতারয়ভ-এর কাছ থেকে। সে লিখেছে, ধর্ম-সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে লিখিত যে দরখাস্তখানা নেখ্‌ল্‌য়ুদভ তাকে দিয়েছে সেখানা সে নিজ হাতেই সম্রাটের হাতে পৌঁছে দেবে; তবে তার মনে হচ্ছে, এই ব্যাপারটা যে-লোকের উপর নির্ভর করছে নেখ্‌ল্‌য়ুদভ তার সঙ্গে একবার দেখা করলে ভাল হয়।

এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল এবং একটি পিওন ঘরে ঢুকে জানাল, কাউণ্টেস কাতেরিনা আইভানভ্‌না তাকে চা খেতে ডাকছে। কাগজপত্র ঠিকঠাক করে গুছিয়ে রেখে সে মাসির বসবার ঘরের দিকে চলল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে বাড়ির সামনে মারিয়েত-এর ঘোড়া দুটোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সহসা তার মুখ উজ্জল হয়ে হাসি ফুটে উঠল।

মাথায় টুপি পরে কালোর বদলে নানান রঙের একটা হাল্‌কা পোশাকে কাউণ্টেসের আরাম কেদারার পাশে বসে এক কাপ চা হাতে নিয়ে মারিয়েত অনর্গল কথা বলে চলেছে। তার হাসি-হাসি চোখ দুটি চক্‌চক্‌ করছে। নেখ্‌ল্‌য়ুদভ যখন ঘরে ঢুকল তখন সে এমন একটা মজার কথা বলছিল যে মাসি হেসে একেবারে লুটোপাটি খাচ্ছিল।

'তুমি আমাকে মেরে ফেলবে', মাসি কাশতে কাশতে বলল।

'কেমন আছ?' বলে নেখ্‌ল্‌য়ুদভ বসল।

মারিয়েত জানতে চাইল, তার কাজকর্ম কেমন চলছে। সেনেটে তার

অকৃতকার্যতা ও সেলেনিনের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা নেখ্‌ল্‌য়ুদভ বলল।

'আহা, কী সরল মানুষ! সে সত্যি a chevalier sans peu rot sans reproche (ভয়হীন ও অভিযোগহীন একটি নাইট)! বড়ই সরল!' সেলেনিন সম্পর্কে পিতার্সবার্গের সমাজে প্রচলিত কথাগুলি উচ্চারণ করেই দুটি মহিলা এক সঙ্গে কথা বলল।

নেখ্‌ল্‌য়ুদভ জিজ্ঞাসা করল, 'তার স্ত্রী মানুষটি কেমন?'

'তার স্ত্রী? দেখ, সে কথা আমি বলতে চাই না, তবে সে মহিলা ওকে বুঝতে পারে না।'

প্রকৃত সহানুভূতির সঙ্গে মারিয়েত বলল, 'এও কি সম্ভব যে সেও আপিল খারিজের পক্ষে মত দিল?' পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কী ভীষণ কথা। মেয়েটির জন্য আমি দুঃখিত।'

নেখ্‌ল্‌য়ুদভের ভুরু দুটি কুঁচকে উঠল। বিষয়ান্তরে যাবার জন্য সে শুস্তভার কথা তুলল। মারিয়েতের চেষ্টায়ই তাকে দুর্গ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। সেজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাতেই মারিয়েত নেখ্‌ল্‌য়ুদভকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'ওকথা আমাকে আর বলতে হবে না। যখন আমার স্বামী বলল যে তাকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে তখনই আমার মনে হয়েছিল, "সে যদি নির্দোষই হয় তাহলে তাকে এতদিন কারাগারে রাখা হয়েছিল কেন?" বিরক্তিকর—ব্যাপারটা বড়ই বিরক্তিকর।'

মারিয়েত তার বোনপোর সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলছে দেখে কাউণ্টেস কাতেরিনা আইভানভনার খুব মজা লাগল। তারা কথা থামালে সে বলল, 'আমি সব বুঝিয়ে দেব। কাল রাতে এলিনের বাড়িতে চল। কীসেওয়েটার সেখানে আসবেন। তুমিও এস মারিয়েত।'

তারপর আবার বোনপোর দিকে ফিরে বলল, 'Il vous a remarque (তিনি তোমাকে লক্ষ্য করেছেন)। তিনি আমাকে বলেছেন, তুমি যা যা বলেছ সেটা খুব ভাল লক্ষণ এবং যীশুর কাছে তোমাকে যেতেই হবে। যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ওকে আসতে বলো মারিয়েত, আর তুমি নিজেও এস।'

নেখ্‌ল্‌য়ুদভের দিকে চোখ রেখে মারিয়েত বলল, 'দেখুন কাউণ্টেস্, প্রথমত, প্রিন্সকে কোন রকম পরামর্শ দেবার অধিকার আমার নেই; দ্বিতীয়তঃ, আপনি তো জানেন, ও সব বাণী-টানী আমি মানি না…'

'তা জানি; সব কাজই তুমি ভুল পথে কর, আর তাও নিজের ধারণা মতই কর।'

মারিয়েত হেসে বলল, 'আমার ধারণা? সে তো একটি সাধারণ চাষীমেয়ের ধারণা। আর তৃতীয়ত, কাল রাতে আমি ফরাসি থিয়েটারে যাচ্ছি।'

'ওঃ, তুমি তাহলে দেখেছ—সেই যে কি যেন নামটা তার?'

মারিয়েত একজন বিখ্যাত ফরাসি অভিনেত্রীর নাম করল।

'তুমি অবশ্য যাবে ; অপূর্ব অভিনয় করে।'

নেখ্‌ল্যুদভ হেসে বলল, 'মাসি গো, কার বাণী আগে শুনব : অভিনেত্রীর, না প্রচারকের ?'

'দয়া করে পেঁচিয়ে কথা বল না।'

'আমার তো মনে হয় আগে প্রচারক, পরে অভিনেত্রী, অন্যথায় প্রচারকের বাণী মাঠে মারা যেতে পারে,' নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

'না ; বরং ফরাসি থিয়েটার দিয়েই শুরু কর ; প্রায়শ্চিত্ত পরে করলেও চলবে।'

'এই দেখ, আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করো না। প্রচারক প্রচারক, আর থিয়েটার থিয়েটার। উদ্ধারলাভের জন্য কাউকে মুখ বেজাড় করে কাঁদতে হবে না। বিশ্বাস যদি থাকে, আনন্দ আপনা থেকেই আসবে।'

'সত্যি মাসি গো, যে কোন প্রচারকের চাইতে তুমি ভাল প্রচার চালাতে জান।'

মারিয়েত বলল, 'কাল আমার বক্সে এস, আমি তোমাকে বলে দেব।'

'মনে হচ্ছে, আমি যেতে পারব না—'

পিওন এসে জানাল, একজন দর্শনার্থী এসেছে। একটি মানব-কল্যাণ সমিতির সেক্রেটারি। কাউণ্টেস স্বয়ং সেই সমিতির প্রেসিডেণ্ট।

'আঃ, লোকটা বোকার একশেষ। আমি বরং বাইরে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে আসছি। মারিয়েত, ততক্ষণ ওকে একটু চা দাও ; এই কথা বলে কাউণ্টেস দ্রুতপদে ঘর থেকে চলে গেল।

মারিয়েত হাত থেকে দস্তানাটা খুলে ফেলল। তার অনামিকায় অনেকগুলি আংটি।

জ্বলন্ত স্পিরিট-ল্যাম্পের উপর থেকে রূপোর কেত্‌লিটা তুলে বলল, 'একটু চা খাও।'

তার মুখ বিষণ্ণ ও গম্ভীর।

নেখ্‌ল্যুদভ নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইল ; তার মুখের উপর থেকে চোখ ফেরাতে পারল না।

'তুমি ভাব যে তোমাকে এবং তোমার ভিতরে যা চলছে তা আমি বুঝতে পারি না। তুমি কি করে বেড়াচ্ছ তা তো সকলেই জানে। **C'est le secret de polichinelle** (এটা তো প্রকাশ্য গোপন কথা)। তোমার কাজে আমি খুশি। আমি তোমাকে সমর্থন করি।'

'আসলে কিন্তু খুশি হবার মত কিছু নেই ; এখনও পর্যন্ত যৎসামান্যই করতে পেরেছি।'

'তাতে কি যায় আসে। তোমার মনোভাব আমি বুঝতে পারি ; সেই মেয়েটিকেও আমি বুঝি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এ বিষয়ে আর কিছু বলব

না,' তার চোখে-মুখে অসন্তোষ লক্ষ্য করে মারিয়েত বলল। নারীর সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা নেখ্‌ল্যুদভের কাছে কোন প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ সেটা অনুধাবন করে মারিয়েত আবার বলল, 'তুমি দুঃখীজনকে সাহায্য করতে চাও: অন্যের নিষ্ঠুরতায় ও উদাসীনতায় যারা তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করছে তাদের তুমি সাহায্য করতে চাও। জীবন বিলিয়ে দেবার বাসনাকে আমি বুঝতে পারি; এরকম মহান কাজে নিজের জীবনও বিলিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু প্রত্যেককেই তো তার ভাগ্য নিয়ে থাকতে হবে।'

'তোমার ভাগ্য নিয়ে কি তুমি সন্তুষ্ট নও?'

এ রকম একটা প্রশ্ন করায় বিস্মিত হয়ে সে বলে উঠল, 'আমি? আমাকে সন্তুষ্ট থাকতেই হবে। আমি সন্তুষ্টই আছি। কিন্তু একটা পোকা মাঝে মাঝে মাথা তোলে—'

নেখ্‌ল্যুদভ ফাঁদে পা দিল। বলল, 'তাকে আবার ঘুমিয়ে পড়তে দিও না। সে কণ্ঠস্বরকে মান্য করতেই হবে।'

পরবর্তীকালে অনেক অনেক বার নেখ্‌ল্যুদভ সে দিকের এই কথাগুলিকে লজ্জার সঙ্গে স্মরণ করেছে।

কাউন্টেস ফিরে এসে দেখল, তারা দুজন শুধু যে পুরনো কথা বলছে তাই নয়, মনে হচ্ছে নিরাসক্ত এক জনতার মাঝখানে একমাত্র তারা দুই বন্ধুই পরস্পরকে বুঝতে পেরেছে।

ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্ভাগাদের যন্ত্রণা, জনগণের দারিদ্র্য—এই সব বিষয় নিয়েই তারা কথা বলছিল; কিন্তু আসলে তাদের সব কথাকে ছাপিয়ে দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে চোখে-চোখে শুধু বলছিল, তুমি কি আমাকে ভালবাসতে পার?' আর জবাব দিচ্ছিল, 'আমি পারি'; আর এমনি করে নানা অপ্রত্যাশিত ও আকর্ষণীয় রূপে যৌন আকর্ষণ তাদের পরস্পরকে কাছে টেনে নিচ্ছিল।

চলে যাবার সময় মারিয়েত জানাল, যে কোন ভাবে সাধ্যমত সে তার সেবা করতে ইচ্ছুক। আরও জানাল, মুহূর্তের জন্য হলেও পরদিন সে যেন থিয়েটারে তার সঙ্গে দেখা করে, কারণ একটি গুরুতর কথা বলবার আছে।

অলংকারখচিত হাতখানা সযত্নে দস্তানা দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, 'যেয়ো! কে জানে আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে?'

নেখ্‌ল্যুদভ কথা দিল।

সেদিন রাতে নিজের ঘরে একাকী শুয়ে পড়ে সে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল। কিন্তু ঘুম এল না। মাসলভার কথা, সেনেটের সিদ্ধান্ত, যে কোন অবস্থায় মাসলভার সঙ্গী হবার প্রতিজ্ঞা, সব জমিদারি ত্যাগ, এই সব কথা ভাবতে ভাবতে সহসা মারিয়েতের মুখখানি ভেসে উঠল। একদৃষ্টিতে

তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে যেন বলছে, 'আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে ?' তার হাসিটি এতই স্পষ্ট যে সে নিজেও হেসে উঠল, ঠিক যেন তাকে দেখতে পাচ্ছে। নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করল, 'আমার সাইবেরিয়া যাওয়া কি ঠিক হবে ? আর সব সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়ে কি ভাল করেছি ?'

পিতার্সবার্গের সেই রাতে জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে ঘরের মধ্যে পড়ছিল। সে রাতে এ সব প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর খুঁজে পায় নি। সব কিছুই কেমন যেন গোলমেলে। পূর্বেকার মানসিক অবস্থা ও চিন্তাধারা মনে পড়ল, কিন্তু তাদের মধ্যে আগেকার সেই জোর ও স্বতঃসিদ্ধতা যেন ছিল না।

সে ভাবতে লাগল, 'যদি ধরে নি যে এ সবই আমার কল্পনা, এ পথে চলতে আমি পারব না—যদি ধরে নি যে এ কাজের জন্য আমাকে পরে অনুতাপ করতে হবে, তাহলে ?' এ পশ্নের কোন জবাব না পেয়ে অভূতপূর্ব যন্ত্রণায় ও নৈরাশ্যে সে ভেঙে পড়ল। তারপর একসময় সেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল যে-ঘুম সে আগেকার দিনে তাসখেলায় প্রচণ্ডভাবে হেরে এসে ঘুমোত।

অধ্যায়—২৫

পরদিন ঘুম ভাঙতেই নেখ্‌ল্যুদভের মনে হল, গতকাল সে কিছু অন্যায় করেছে।

সে ভাবতে আরম্ভ করল। অন্যায় কিছু করেছে বলে তার মনে পড়ল না। কোন পাপ কাজ সে করে নি। সে শুধু ভেবেছিল, কাতয়ুশাকে বিয়ে করবার এবং সব জমি বিলিয়ে দেবার যে সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে তা অপ্রাপনীয় স্বপ্নমাত্র ; সে জীবনের ভার সে সইতে পারবে না ; সে জীবন কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক ; তাকে পূর্বেকার জীবনেই ফিরে যেতে হবে।

সে কোন পাপ কাজ করে নি বটে, কিন্তু পাপ কাজের চাইতেও যা খারাপ সেই পাপ চিন্তা সে করেছে : পাপ চিন্তা থেকেই তো পাপ কাজের সূচনা।

পাপ কাজ একবার করে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটালে চলে, তার জন্য অনুশোচনাও করা যায় ; কিন্তু পাপ চিন্তা থেকেই জন্ম নেয় পাপ কাজ।

একটা পাপ কাজ আর একটা পাপ কাজের পথকে মসৃণ করে দেয় মাত্র ; পাপ চিন্তা মানুষকে দুর্বার বেগে পাপের পথে টেনে নিয়ে যায়।

পিতার্সবার্গের সেই শেষ দিনটিতে সকালেই সে শুস্তভার সঙ্গে দেখা করতে ভাসিল্যয়েভস্কি দ্বীপে গেল।

শুস্তভা দোতলায় থাকে। পিছনের সিঁড়িটা দেখিয়ে দেওয়াতে নেখ্‌ল্যুদভ সোজা খাবারের গন্ধে-ভরা গরম রান্নাঘর ঢুকে পড়ল। গোটানো আস্তিন, এপ্রন ও চশমাপরিহিতা একটি বয়স্কা স্ত্রীলোক উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে কি

যেন নাড়ছিল।

চশমার উপর দিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে সে কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চাই ?'

নেখ্‌লুয়ুদভ জবাব দেবার আগে তার মুখে যুগপৎ আতংক ও আনন্দের আভাষ ফুটে উঠল।

এপ্রনে হাত মুছতে মুছতে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, প্রিন্স! আপনি পিছনের দরজা দিয়ে কেন এসেছেন? আপনি আমাদের পরম উপকারী। আমি তার মা। আমার মেয়েটিকে তারা প্রায় মেরে ফেলেছিল। আপনি আমাদের রক্ষা করেছেন।' নেখ্‌লুয়ুদভের হাতখানি ধরে চুম্বনের চেষ্টা করে সে বলল, 'গতকাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমার বোনই যেতে বলেছিল। সেও এখানে আছে। এই দিকে, দয়া করে এই দিকে আসুন।' মাথার চুলটা ঠিক করে নিয়ে স্কার্টটা উঁচু করে ধরে সরু দরজাটা পেরিয়ে একটা অন্ধকার দালানের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে শুস্তভার মা কথাগুলি বলল। 'আমার বোনের নাম কর্নিলভা। তার কথা আপনি নিশ্চয় শুনেছেন।' একটা বদ্ধ দরজার কাছে থেমে চুপি চুপি সে বলল, 'একটা রাজনৈতিক ব্যাপারে সে জড়িয়ে পড়েছিল। খুব চতুর মেয়ে।'

শুস্তভার মা দরজা খুলে নেখ্‌লুয়ুদভকে নিয়ে একটা ছোট ঘরে ঢুকল। সোফার উপরে একটি ছোটখাট হৃষ্টপুষ্ট মেয়ে বসেছিল। তার গোল বিবর্ণ মুখকে ঘিরে সুন্দর কোঁকড়া চুলের রাশি। পরনে ডোরা-কাটা সুতীর ব্লাউস। মুখখানি ঠিক তার মায়ের মত।

তার উল্টো দিকে সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে একটি যুবক বসেছিল। তার মুখে ঈষৎ কালো দাড়ি ও গোঁফ; পরনে কাজ-করা রুশ শার্ট। তারা দুজন আলোচনায় এতই মগ্ন ছিল যে নেখ্‌লুয়ুদভ ঘরের মধ্যে ঢুকলে তবে তারা মুখ তুলে তাকাল।

মা বলল, 'লিডিয়া, প্রিন্স নেখ্‌লুয়ুদভ! সেই তিনি·· ···।'

বিবর্ণ মেয়েটি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। একগুচ্ছ চুল কানের পাশে গুঁজতে গুঁজতে বড় বড় চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে নবাগতের দিকে তাকিয়ে রইল।

নেখ্‌লুয়ুদভ হেসে বলল, 'ভেরা দুখোভা যার জন্য আমাকে হস্তক্ষেপ করতে বলেছিল তুমিই তাহলে সেই ভয়ংকর মেয়েটি ?'

'হ্যাঁ, আমি।' শুস্তভার শিশুসুলভ হাসিতে সুন্দর দাঁতের পাটি বেরিয়ে পড়ল। 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে মাসির খুব আগ্রহ। মাসি!' শান্ত, নরম গলায় সে ডাক দিল।

'তুমি বন্দী হওয়ায় ভেরা দুখোভা খুবই দুঃখ পেয়েছিল', নেখ্‌লুয়ুদভ বলল।

যে যুবকটি আরাম-কেদারায় বসে ছিল সে এবার উঠে দাঁড়াল। সেই ভাঙা

কেদারাটা দেখিয়ে লিডিয়া বলল, 'এখানে বসুন, না বরং এখানে বসুন।'

নেখ্‌লুদভ যুবকটির দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সে বলল, 'আমার জ্ঞাতি-ভাই জাখারভ।'

লিডিয়ার মত সদয় হাসির সঙ্গেই যুবকটি নবাগতকে অভিবাদন জানাল। নেখ্‌লুদভ আসন গ্রহণ করলে আর একখানা চেয়ার নিয়ে এসে সে তার পাশেই বসল। বছর ষোল বয়সের একটি স্কুলের ছেলেও ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে জানালার গোবরাটে বসল।

শুস্তভা বলল, 'ভেরা দুখোভা আমার মাসির খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কিন্তু আমি তাকে প্রায় চিনিই না।'

পাশের ঘর থেকে একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল। মুখখানি ভারি সুন্দর। পরনে সাদা ব্লাউজ ও চামড়ার বেল্ট।

সোফায় লিডিয়ার পাশে বসেই সে বলল, 'কেমন আছেন? আপনি যে এসেছেন সে জন্য ধন্যবাদ। তারপর, ভেরা কেমন আছে? তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে কি? নিজের ভাগ্যকে সে কি ভাবে নিয়েছে?'

নেখ্‌লুদভ জবাব দিল, 'সে কোন অভিযোগ করে নি; বরং বলেছে, সে স্বর্গীয় সুখে আছে।'

মাথা নেড়ে হেসে মাসি বলল, 'এই তো ভেরার উপযুক্ত কথা। আমি তাকে চিনি। তাকে চিনতে হয়। দৃঢ় চরিত্রের মেয়ে। সব কিছুই পরের জন্য, নিজের জন্য কিছুই নয়।'

'না, নিজের জন্য সে কিছুই চায় নি, আপনার বোন-ঝিকে নিয়েই তার যত ভাবনা। সে বলেছে, আপনার বোন-ঝি যে বিনা কারণে গ্রেপ্তার হয়েছে সেটাই তার কাছে বেশী দুঃখের কারণ।'

মাসি বলল, 'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। খুবই ভয়ানক ব্যাপার। আমার জন্যই সে কষ্ট পেয়েছে।'

'মোটেই তা নয় মাসি; কাগজগুলো তো আমাকে নিতেই হত।'

মাসি বলল, 'সব কথা আমাকে ভালভাবে জানতে দাও। দেখুন, এ সব ঘটনার কারণ হল, এক্জন কেউ তার কাগজপত্রগুলি কিছু সময়ের জন্য আমাকে রাখতে দিয়েছিল। সে সময় আমার কোন আস্তানা না থাকায় ওর কাছে রেখে দিয়েছিলাম। সেই রাতেই পুলিশ ওর ঘরে তল্লাসি চালিয়ে ওকে কাগজ-পত্র শুদ্ধ ধরে নিয়ে যায় এবং সেগুলো ও কার কাছ থেকে পেয়েছে সেটা জানবার জন্য এতদিন ওকে আটক করে রাখে।'

অকারণেই একগুচ্ছ চুল ঠিক করতে করতে লিডিয়া তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কিন্তু আমি তাদের কিচ্ছু বলি নি।'

মাসি বলল, 'তুমি কিছু বলে দিয়েছ এ কথা তো আমি কখনও বলি নি।'

অস্বস্তিকরভাবে চারদিকে তাকিয়ে আরক্ত-মুখে লিডিয়া বলল, 'তারা

যদি মিতিনকে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, সেজন্য আমি দায়ী নই।'

মা বলে উঠল, 'ও সব কথা থাক লিডিয়া।'

'কেন থাকবে? সব কথা আমি বলতে চাই', লিডিয়া বলল। এখন তার মুখে হাসি নেই, বরং আরও লাল হয়ে উঠেছে।

'গতকাল এ সব কথা বলবার সময় কি হয়েছিল সেটা ভুলে যেয়ো না।'

'মোটেই ভুলি নি—আমাকে রেহাই দাও মা। আমি তো কিছুই বলি নি, চুপ করেই তো ছিলাম। মিতিন ও মাসির ব্যাপারে সে যখন আমাকে জেরা করছিল তখন আমি কিছুই বলি নি; শুধু বলেছিলাম, তার কোন কথার জবাব আমি দেব না। তখন এই···পেত্রভ্—'

বোন-ঝির কথাগুলি নেখ্‌ল্যুদভকে বোঝাবার জন্য মাসি বলল, 'পেত্রভ্ একটি গুপ্তচর, একটি সৈনিক, নীচ লোক।'

উত্তেজনার বসে লিডিয়া দ্রুত বলতে লাগল, 'তখন সে অনুনয়-বিনয় শুরু করল। বলল, "তুমি আমাকে যাই বল না কেন তাতে কারও ক্ষতি হবে না; বরং সব কথা যদি বল তাহলে যে সব নির্দোষ লোককে হয় তো আমরা বৃথাই যন্ত্রণা দিতাম তাদের আমরা ছেড়ে দিতে পারব।" দেখুন, আমি তখনও বলেছি, কিছুই বলব না। তখন সে বলল, "ঠিক আছে, বলো না, কিন্তু আমি যা বলব তা অস্বীকার করো না।" এবং সে মিতিনের নাম করল।'

'ও সব কথা বলো না', মাসি বলল।

'আঃ মাসি, বাধা দিও না।····আর ভাবুন, পরদিনই আমি শুনলাম—দেয়ালে টোকা মেরে তারাই আমাকে জানিয়ে গেল—যে মিতিন গ্রেপ্তার হয়েছে। দেখুন, আমি মনে করি আমি তাকে ধরিয়ে দিয়েছি, আর এই চিন্তাই আমাকে কষ্ট দিচ্ছে—এত কষ্ট দিচ্ছে যে আমি প্রায় পাগল হতে চলেছি।'

মাসি বলল, 'কিন্তু আমরা তো জানতে পেরেছি যে তোমার জন্য সে গ্রেপ্তার হয় নি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি তা জানতাম না। "আমি তাকে ধরিয়ে দিয়েছি।" ঘরময় হাঁটি আর ভাবি, "আমি তাকে ধরিয়ে দিয়েছি।" চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেও শুনতে পাই কানের কাছে কে যেন চুপি চুপি বলছে, 'ধরিয়ে দিয়েছ। মিতিনকে ধরিয়ে দিয়েছ। মিতিনকে ধরিয়ে দিয়েছ।' আমি জানি, এটা দিবাস্বপ্ন মাত্র, কিন্তু না শুনে পারি না। ঘুমোতে চাই, তাও পারি না। এ সব ভাবতে চাই না। কিন্তু না ভেবে পারি না। কী ভয়ংকর অবস্থা।' যত কথা বলে লিডিয়া ততই উত্তেজিত হয়ে ওঠে; আঙুলে চুলের গুচ্ছ জড়ায় আর খোলে, আর চারদিকে তাকায়।

তার কাঁধে হাত রেখে মা বলল, 'লিডিয়া, মা, শান্ত হও।'

কিন্তু শুভ্রভা তাকে থামাতে পারল না।

'ব্যাপারটা আরও ভয়ংকর কারণ…' কথা শেষ না করেই লিডিয়া চীৎকার করে লাফিয়ে উঠে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

তার মাও পিছনে পিছনে গেল।

'ওদের ফাঁসি দেওয়া উচিত, বদমায়েসের দল।' স্কুলের ছেলেটি বলে উঠল।

'ও আবার কি?' মা বলল।

'আমি শুধু বলছিলাম....না, সে কিছু না,' বলে স্কুলের ছেলেটি টেবিলের উপর থেকে সিগারেটটা নিয়ে টানতে লাগল।

অধ্যায়—২৬

একটা সিগারেট ধরিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে মাসি বলল, 'সত্যি, নির্জন বন্দীজীবন ছোটদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর।'

'আমি বলব, সকলের পক্ষেই কষ্টকর', নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

'না, সকলের পক্ষে নয়,' মাসি বলল। 'আমি শুনেছি, আসল বিপ্লবীদের কাছে ওটা বিশ্রাম ও শান্তি। পুলিশ যার পিছু নেয় তাকে সব সময় দুশ্চিন্তা ও নানা রকমের অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাতে হয়; তার ভয় নিজের জন্য অপরের জন্য এবং তার আদর্শের জন্য। শেষ পর্যন্ত সে যখন ধরা পড়ে তখন তো সব শেষ; তার ঘাড় থেকে সব দায়-দায়িত্ব নেমে যায়; ঠেশান দিয়ে বসে সে তখন বিশ্রাম নিতে পারে। শুনেছি, গ্রেপ্তার হলেই তারা খুশি হয়। কিন্তু যাদের বয়স অল্প, যারা নির্দোষ—তারা সব সময়ই প্রথমে লিডিয়ার মত নিরপরাধদেরই গ্রেপ্তার করে থাকে—তাদের কাছে প্রথম ধাক্কাটা খুবই সাংঘাতিক। চলা-ফেরার স্বাধীনতা থাকে না, বা খারাপ খাবার খেয়ে ও খারাপ বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে হয়—সে সব কিছুই না। ওর তিনগুণ কষ্ট তারা অনায়াসেই সহ্য করতে পারে; কিন্তু প্রথম গ্রেপ্তার হওয়ার নৈতিক আঘাতটাই ভয়ংকর।'

'আপনার নিজের অভিজ্ঞতা আছে নাকি?'

'আমি? আমি দু'বার কারাগারে গিয়েছি,' বিষণ্ণ হাসি হেসে মাসি জবাব দিল। প্রথমবার যখন গ্রেপ্তার হই তখন আমি কিছুই করি নি। আমার বয়স তখন বাইশ বছর, একটি সন্তান হয়েছে, আরও একটির আসবার সময় হয়ে এসেছে। চলা-ফেরার স্বাধীনতা হারানো এবং স্বামী-সন্তানের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া খুবই কষ্টের সন্দেহ নেই, কিন্তু যখন দেখতে পেলাম যে আমি আর মানুষ নেই, একটি বস্তুতে পরিণত হয়েছি, তখনকার অনুভূতির সঙ্গে তুলনায় সে সব তো কিছুই না। ছোট মেয়েটির কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইলাম, কিন্তু আমাকে ঠেলে তুলে দেওয়া হল একটা ইজভজচিকের

খাঁচায়। জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জবাব এল, সেখানে গেলেই জানতে পারবে। আমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ জানতে চাইলাম, কোন জবাব পেলাম না। আমাকে পরীক্ষা করা হল, আমার পোশাক খুলে কারাগারের নম্বরী জামা পরানো হল, আমাকে একটা গুদাম-ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। তখন আমি একেবারে একা। শুধু একটি শাস্ত্রী গুলি-ভরা রাইফেল কাঁধে নিয়ে আমার দরজার সামনে এদিক-ওদিক চলতে চলতে একটা ফোকড়ের ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে লাগল। এই সব দেখে-শুনে আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। জনৈক সৈনিক-অফিসার আমাকে জেরা করবার পর যখন একটা সিগারেট আমাকে দিল তখনই আমি সব চাইতে বেশী অবাক হলাম। তাহলে সে তো জানে যে, মানুষ ধূমপান করতে ভালবাসে ; তাহলে সে তো এটাও নিশ্চয় জানে যে, মানুষ স্বাধীনতা ও আলো ভালবাসে, মা সন্তানকে ভালবাসে, সন্তান মাকে ভালবাসে। তাহলে যা কিছু আমার প্রিয় তাদের কাছ থেকে এমন নির্মমভাবে ছিনিয়ে এনে একটা বন্য পশুর মত তারা আমাকে কারাগারে বন্দী করে রাখল কেমন করে ? এ সবের ফল কখনও ভাল হয় না। ঈশ্বরে ও মানুষে যাদের বিশ্বাস আছে, যারা বিশ্বাস করে যে মানুষ পরস্পরকে ভালবাসে, এসমস্ত অভিজ্ঞতার পরে তাদের সে বিশ্বাস চলে যায়। তখন থেকেই আমি মনুষ্যত্বে বিশ্বাস হারিয়েছি। জীবন আমার কাছে তিক্ত হয়ে উঠেছে,' ম্লান হেসে সে কথা শেষ করল।

লিডিয়ার মা ঘরে ঢুকে জানাল, সে খুবই মুসড়ে পড়েছে, তাই আর আসতে পারবে না।

মাসি বলল, 'এই তরুণ জীবনটি নষ্ট হয়ে গেল কিসের জন্য ? আমিই এর জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী, এই চিন্তাই আমার কাছে বিশেষভাবে বেদনাদায়ক।'

মা বলল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় গ্রামে ফিরে গেলে সে ভাল হয়ে যাবে। ওর বাবার কাছে ওকে পাঠিয়ে দেব।'

মাসি বলল, 'আপনি না থাকলে ও একেবারেই শেষ হয়ে যেত। আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু যে জন্য আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম সেটা এই : ভেরা দুখোভার কাছে একখানা চিঠি পৌছে দিতে আপনাকে অনুরোধ করব। পকেট থেকে সে একখানা চিঠি বের করল। 'চিঠিটা সিল করা নয় ; আপনি এটা পড়তে পারেন, ছিঁড়তে পারেন, আপনার যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। এর মধ্যে আপত্তিকর কিছুই নেই।'

নেখ্‌লুদভ চিঠিটা নিয়ে যথাস্থানে পৌছে দেবে বলে কথা দিয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

চিঠিটা না পড়েই সেটাকে সে সিল করল ; যথাস্থানেই চিঠিটা সে পৌছে দেবে।

অধ্যায়—২৭

পিতার্সবার্গে নেখ্‌লুদভের শেষ কাজ ধর্ম-সম্প্রদায়ের আবেদন। প্রাক্তন সহকর্মী এ-ডি-কং বগাতিরভ-এর মারফৎ দরখাস্তখানা জারের হাতে পৌঁছে দেবার ইচ্ছা তার ছিল। সকলে বগাতিরভ-এর ভবনে পৌঁছে দেখল, বাইরে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সে প্রাতরাশে বসেছে। লোকটি দীর্ঘকায় না হলেও বেশ শক্ত-সমর্থ এবং অমিত বলশালী (ঘোড়ার নালও সে বাঁকাতে পারে); সে দয়ালু, সৎ, সরল ও উদার। এ সব গুণ সত্ত্বেও সে কিন্তু দরবারে বেশ ঘনিষ্ঠ এবং জার ও তার পরিবারের প্রিয়। সেই উঁচু মহলে চলাফেরা করেও আশ্চর্য কোন উপায়ে সে সেখানে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু দেখে না এবং সেখানকার পাপ ও দুর্নীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে না। কখনও সে কোন ব্যক্তিকে বা কোন ব্যবস্থাকে নিন্দা করে না— সর্বদাই হয় চুপচাপ থাকে, আর না হয় তো অট্টহাসি হাসতে হাসতে উচ্চ বলিষ্ঠ কণ্ঠে তার বক্তব্যকে প্রকাশ করে। কোন কূটনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সে এ রকম করে না, আসলে এটাই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

'আরে, খুব ভাল হয়েছে যে তুমি এসেছ। কিছু খাবে না কি? বস, বস, শিক-কাবাবটা চমৎকার হয়েছে! আমি সব সময়ই ভাল কিছু দিয়ে শুরু করি—শুরু করি এবং শেষও করি। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তাহলে একপাত্র টেনে নাও,' ক্লারেটপূর্ণ একটি কাঁচের পাত্র দেখিয়ে সে সোচ্চারে বলে উঠল। 'তোমার কথাই ভাবছিলাম। দরখাস্তটা আমিই নিয়ে যাব; তাঁর নিজের হাতে দিয়ে দেব। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার; তবে আমার মনে হয়েছিল যে, তুমি যদি একবার তপরভ-এর সঙ্গে দেখা করতে তাহলে ভাল হত।'

তপরভ-এর কথা বলায় নেখ্‌লুদভ বিকৃত মুখভঙ্গি করল।

'তার উপরেই ব্যাপারটা নির্ভর করছে। তার সঙ্গে নিশ্চয় পরামর্শও করা হবে। হয় তো সে নিজেও তোমার কাজটা করে দিতে পারে।'

'তুমি যদি বল তাহলে যাব।'

'ঠিক আছে। তারপর, পিতার্সবার্গ কেমন লাগছে?' বগাতিরভ চেঁচিয়ে বলল। 'আরে, বলেই ফেল না।'

নেখ্‌লুদভ বলল, 'আমি তো মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি।'

'মোহাচ্ছন্ন! উচ্চকণ্ঠে হেসে বগাতিরভ কথাটার পুনরাবৃত্তি করল। 'তুমি তাহলে কিছুই খাবে না? বেশ, যেমন তোমার ইচ্ছা।' তোয়ালে দিয়ে গোঁফটা মুছে নিয়ে সে বলল, 'তাহলে তুমি যাচ্ছ? কি বল? তিনি যদি কিছু না করেন, তাহলে দরখাস্তটা আমাকে দিও, কাল আমি হাতে হাতে দিয়ে দেব।' কথা বলতে বলতেই সে উঠে দাঁড়াল এবং যে রকম অন্যমনস্কভাবে গোঁফটা মুছেছিল সেই একই ভাবে ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে তরবারিটা বাঁধতে শুরু করল।

'তাহলে বিদায় ; আমাকে যেতে দাও।'

'চল, দুজনই যাচ্ছি,' বগাতিরভ-এর শক্ত, চওড়া হাতখানিতে ঝাঁকুনি দিয়ে সে দ্বারপথেই তার কাছ থেকে বিদায় নিল।

কোন ফল হবে না জেনেও বগাতিরভ-এর পরামর্শমত সে তপরভ-এর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

অভ্যর্থনা-কক্ষে যে কর্মচারিটি বসেছিল সে নেখ্‌লুদভের দরকারের কথা শুনে জানতে চাইল, দরখাস্তখানা একবার পড়তে দিতে তার কোন আপত্তি আছে কি না। নেখ্‌লুদভ সেখানা তার হাতে দিলে সে আপিসে ঢুকে গেল। নেখ্‌লুদভ বাইরেই রইল। দরখাস্তটা পড়তে পড়তে তপরভ মাথা নাড়তে লাগল। দরখাস্তের সুস্পষ্ট ও অর্থপূর্ণ শব্দযোজনায় সে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হল।

পড়তে পড়তে সে ভাবল, 'এটা যদি সম্রাটের হাতে পড়ে তাহলে অনেক ভুল-বোঝাবুঝি ও অস্বস্তি দেখা দিতে পারে।' দরখাস্তটা টেবিলে রেখে সে ঘণ্টা বাজিয়ে নেখ্‌লুদভকে ডেকে পাঠাল।

এই ধর্ম-সম্প্রদায়ের ব্যাপারটা তার মনে পড়েছে ; তাদের কাছ থেকেই একটা দরখাস্ত সে আগেও পেয়েছে। ব্যাপারটা এই। গোঁড়া গ্রীক গীর্জা থেকে বিতাড়িত হবার 'পরে প্রথমে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয় এবং বিচারে তারা খালাস পায়। তখন বিশপ ও গভর্ণর একত্র মিলে তাদের বিবাহ আইনত অসিদ্ধ এই ওজুহাতে উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত লোকগুলিকে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানদের পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করে। সেই সব পিতা ও পত্নীরা আবেদন করে যে তাদের বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয়। তরপরভ-এর মনে পড়ল, বিষয়টা তার দৃষ্টিগোচরে আনা হলে ব্যাপারটা সেখানেই মিটিয়ে ফেলবে কিনা এ বিষয়ে সে ইতস্তত করেছিল। কিন্তু পরে তার মনে হয়েছিল যে, উক্ত ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারগুলির লোকজনদের আলাদা আলাদা করে নির্বাসন দণ্ড দিলে তাতে কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু ঐ সব চাষী পরিবারকে যদি স্বস্থানে থাকতে দেওয়া হয় তাহলে সেখানকার অন্য অধিবাসীদের উপর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে এবং তার গোঁড়া গীর্জা থেকে সরে যেতে হতে পারে। তারপর যখন জানা গেল যে এ ব্যাপারে বিশপের যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে, তখন সে হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু এখন যেহেতু নেখ্‌লুদভের মত একজন অ্যাডভোকেট তাদের পক্ষে রয়েছে এবং পিতার্সবার্গে তার যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তিও আছে, হয়তো একটা নিষ্ঠুর দৃষ্টান্ত হিসাবে বিষয়টা সম্রাটের কানে তোলা হতে পারে, বা বিদেশী সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হতে পারে। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তপরভ একটি অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত নিয়ে বসল।

'কেমন আছেন?' পাশে দাঁড়ান নেখ্‌লুদভকে এই কথা বলে অভ্যর্থনা জানিয়েই সে সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল।

দরখাস্তটা হাতে নিয়ে নেখ্‌লুদভকে দেখিয়ে সে বলে উঠল, 'ব্যাপারটা আমার জানা। নামগুলো দেখেই এই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপারটা আমার মনে পড়েছে। নতুন করে সেটা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য আপনার কাছে আমি ঋণী। এটা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অতি-উৎসাহেরই ফল।'

সম্মুখের একটি অবিচল বিবর্ণ মুখোশ নামক মুখের দিকে বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে নেখ্‌লুদভ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

এই সব ব্যবস্থা রদ করে লোকগুলি যাতে স্ব স্ব বাড়িতে বসবাস করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ আমি পাঠিয়ে দেব।'

'তার মানে এই দরখাস্তের কোন দরকার নেই?'

'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি,' তপরভ কথাটা বলবার সময় 'আমি'-র উপর এমনভাবে জোর দিল যাতে মনে হয় যে, তার সততা, তার কথাই সব চাইতে বড় ভরসাস্থল। 'সব চাইতে ভাল, এখনই আদেশটা লিখে দেওয়া। আপনি দয়া করে বসুন।'

টেবিলের কাছে গিয়ে সে লিখতে শুরু করল। নেখ্‌লুদভ না বসে তার টাক মাথা ও তার নীল শিরা বের-করা মোটা হাতের দ্রুতচালিত কলমের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে ভাবতে লাগল, এই অনুভূতিবিহীন মানুষটি এ কাজ কেন করছে, আর এত যত্নসহকারেই বা কেন করছে।

খামটা সিল করে তপরভ বলল, 'এই দেখুন, লিখে দিলাম। আপনাদের মক্কেলদের জানিয়ে দিতে পারেন।' একটা হাসির আভাষ ফোটাবার জন্য সে ঠোঁট দুটোকে প্রসারিত করল।

খামটা হাতে নিয়ে নেখ্‌লুদভ জিজ্ঞাসা করল, 'এই লোকগুলি তাহলে এতদিন কষ্ট পেল কেন?'

তপরভ মাথাটা তুলে হাসল, যেন প্রশ্নটা তাকে খুশি করেছে।

'সে কথা আপনাকে বলতে পারি না। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, জনগণের স্বার্থ আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আর সে দিক থেকে ধর্মের ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহ ততটা বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর নয় যতটা ক্ষতিকর সম্প্রতিকালের ব্যাপক উদাসীনতা—'

'কিন্তু এটা কি করে সম্ভব যে ধর্মের নামে ন্যায়পরায়ণতার প্রথম দাবীকেই লংঘণ করা হল—পরিবারগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা হল?'

তপরভ বলল, 'একজন ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টিকোণ থেকে সেই রকমই মনে হতে পারে বটে, কিন্তু কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যভাবে প্রতিভাত হয়ে থাকে। যাই হোক, আমাদের কাজ এখানেই শেষ হল।' তপরভ মাথা নুইয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

নেখ্‌লুদভ নীরবে হাতখানা চেপে ধরে দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। হাতটা ধরবার জন্য তার অনুশোচনা হল।

যেতে যেতে সে ভাবল, 'জনগণের স্বার্থে! অর্থাৎ তোমাদের স্বার্থে!'

অধ্যায়—২৮

নেখ্‌লুদভ হয় তো সেদিন সন্ধ্যায়ই পিতার্সবার্গ থেকে চলে যেত, কিন্তু মারিয়েত্তকে সে কথা দিয়েছে, থিয়েটারে তার সঙ্গে দেখা করবে; যদিও সে জানত যে সে-কথা রাখা তার পক্ষে উচিত নয়, তবু সে নিজেকে মিথ্যা করে বোঝাল যে, কথা দিয়ে সে কথা না রাখাটা অন্যায়।

নিজেকে সে প্রশ্ন করল, 'এই সব প্রলোভনকে জয় করবার শক্তি কি আমার আছে? এই শেষবারের মত চেষ্টা করে দেখতে হবে।'

সান্ধ্য পোশাকে সজ্জিত হয়ে সে যখন থিয়েটারে পৌঁছল তখন চিরন্তন নাটক Dame aux Came'lias-এর দ্বিতীয় অংক চলছে: একটি বিদেশিনী অভিনেত্রী জনৈকা যক্ষ্মারোগগ্রস্তা নারীর ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করছে।

থিয়েটার দর্শকে পূর্ণ। নেখ্‌লুদভ জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গেই সসম্মানে মারিয়েত্তের বক্সটা তাকে দেখিয়ে দেওয়া হল।

উর্দিপরা একজন ভৃত্য বাইরে করিডরে দাঁড়িয়েছিল; পরিচিতজনের মত নেখ্‌লুদভকে অভিবাদন করে সে বক্সের দরজা খুলে দিল।

বিপরীৎ দিকের বক্সে যারা বসে বা দাঁড়িয়েছিল, আশেপাশে যারা বসে ছিল বা গ্যালারির নীচের আসনগুলিতে যারা ছিল—কাঁচা, পাকা, কোঁকড়া-চুল বা টাক মাথা—সকলেই অভিভূত হয়ে অভিনয় দেখছিল: কৃশকায়া, হাড়-বের করা অভিনেত্রীটি রেশম ও লেসের পোশাক পরে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে এবং অস্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলছে।

দরজাটা খুলতেই কে যেন বলে উঠল, 'আস্তে!' আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ঠাণ্ডা ও একটা গরম বাতাস নেখ্‌লুদভের মুখে এসে লাগল।

বক্সে চারজন বসে ছিল: মারিয়েত্ত, লাল টুপি ও ভারী পোশাক পরা একটি মহিলা, মারিয়েত্তের স্বামী এবং মস্ত বড় গোঁফের ফাঁকে একটুখানি কামানো চিবুকওয়ালা একটি সুদর্শন ভদ্রলোক।

অভিনেত্রীটির একক সংলাপ শেষ হতেই করতালিধ্বনিতে রঙ্গমঞ্চ মুখরিত হয়ে উঠল। মারিয়েত্ত আসন থেকে উঠে বক্সের পিছনে গিয়ে তার স্বামীর সঙ্গে নেখ্‌লুদভকে পরিচয় করিয়ে দিল।

জেনারেল বলল, সে খুব খুশি হয়েছে; কিন্তু তারপরেই অজ্ঞাত কারণে একেবারে চুপ করে গেল।

নেখ্‌লুদভ মারিয়েত্তকে বলল, 'তোমাকে কথা না দিলে আমি আজই চলে যেতাম।'

তার কথার অর্থ বুঝতে পেরে জবাবে মারিয়েত্ত বলল, 'আমাকে দেখবার

ইচ্ছা না থাকলেও একটি অপূর্ব অভিনেত্রীকে তুমি দেখতে পাবে।' তারপর স্বামীর দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, 'আগের দৃশ্যটাতে কী অদ্ভুত অভিনয় করল না?'

স্বামী মাথা নাড়ল।

নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'এ সব আমাকে স্পর্শ করে না। আজই সত্যিকারের যন্ত্রণা এত বেশী দেখেছি যে—'

'ঠিক আছে, এখানে বসে তাই আমাকে বল।'

স্বামীটিও সব কথা শুনছে। তার চোখের হাসিতে ক্রমেই বেশী করে ব্যঙ্গের আভাস ফুটে উঠছে।

'একটি মেয়েকে দেখে এলাম; এতদিন কারাগারে রেখে সম্প্রতি তাকে ছেড়ে দিয়েছে। মেয়েটি একেবারেই ভেঙে পড়েছে।'

মারিয়েত স্বামীকে বলল, 'এই মেয়েটির কথাই তোমাকে বলেছিলাম।'

'ওঃ, আচ্ছা; তাকে ছেড়ে দেওয়ায় আমি খুব খুশি হয়েছি। বাইরে গিয়ে একটু ধূমপান করে আসছি।'

মারিয়েত তাকে কি বলতে চায় শুনবার জন্য নেখ্‌লয়ুদভ অপেক্ষা করে রইল। সে কিন্তু কিছুই বলল না, বলবার চেষ্টাও করল না। অভিনয়ের কথা নিয়েই হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল।

অবশেষে নেখ্‌লয়ুদভ বুঝতে পারল, তার বলবার কিছুই নেই; সে শুধু তাকে দেখাতে চায় তার জাকজমক—তার সান্ধ্য-পোশাক, তার ঘাড়, তার তিল-চিহ্ন। এ সব নেখ্‌লয়ুদভের মনকে টানে, আবার তাকে বিরক্তও করে। উঠে পড়বার জন্য বারকয়েক সে টুপিটা হাতেও নিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠল না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার স্বামী যখন তার ঘন গোঁফের ভিতর দিয়ে তামাকের কড়া গন্ধ ছড়িয়ে নেখ্‌লয়ুদভের দিকে এমন অবজ্ঞাভরে তাকাল যেন তাকে চিনতেই পারছে না, তখন নেখ্‌লয়ুদভ বক্স থেকে উঠে ওভারকোটটা নিয়ে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে গেল।

নেভ্‌স্কি ধরে বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে তার চোখে পড়ল, উগ্র পোশাকে সজ্জিত একটি দীর্ঘকায়া স্ত্রীলোক নিঃশব্দে তার আগে আগে হেঁটে চলেছে। তার মুখে ও সমস্ত দেহেই তার অশুভ শক্তির আভাষ ফুটে উঠেছে। যে কেউ তার সঙ্গে দেখা করল বা তার পাশ দিয়ে চলে গেল সেই একবার তার দিকে তাকাল। নেখ্‌লয়ুদভ স্ত্রীলোকটি অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে হাঁটতে হাঁটতে নিজের অজ্ঞাতেই তার মুখের দিকে তাকাল। রং-মাখা মুখটা দেখতে সুন্দর। স্ত্রীলোকটি তার দিকে তাকিয়ে হাসল; তার চোখ দুটো ঝিকমিকিয়ে উঠল। আর কী আশ্চর্য, নেখ্‌লয়ুদভের হঠাৎ মারিয়েতকে মনে পড়ে গেল; কারণ থিয়েটারের মতই আবার সে মনের মধ্যে একই সঙ্গে আকর্ষণ ও বিরক্তি

অনুভব করল।

দ্রুতপায়ে স্ত্রীলোকটিকে পার হয়ে বিরক্ত নেখ্‌লয়ুদভ মরুস্কায়ার দিকে মোড় নিল এবং নদীর তীর ধরে হাঁটতে লাগল।

সে ভাবতে লাগল, 'আমি যখন বক্সে ঢুকেছিলাম তখন সেও তো এমনি ভাবেই হেসেছিল, আর দুটি হাসির একই অর্থ। দুই-এর মধ্যে একমাত্র তফাৎ, এ খোলা-খুলিই বলছে, "যদি আমাকে চাও তো নাও, নইলে পথ দেখ", আর সে এমন ভাব দেখায় যেন এ সব কথা সে ভাবে না, বরং অনেক উঁচু সংস্কৃতির স্তরে বাস করে,—অথচ তলে তলে ঐ একই কথা। এ অন্তত সত্যবাদী, কিন্তু সে তো মিথ্যুক। তাছাড়া, এ এ-পথে এসেছে প্রয়োজনের তাগিদে, আর সে এই মনোরম অথচ বিরক্তিকর ও ভয়ংকর প্রবৃত্তিকে নিয়ে মজার খেলা খেলছে। রাস্তার এই স্ত্রীলোকটি যেন বদ্ধ পচা জল, বিরক্তি অপেক্ষা তৃষ্ণা যাদের প্রবলতর তারাই সেই জল পান করে; আর থিয়েটারের সে স্ত্রীলোকটি তো বিষ, যাকে স্পর্শ করে অলক্ষ্যে তাকেই বিষাক্ত করে তোলে।

মার্শালের স্ত্রীর সঙ্গে তার কাণ্ড-কারখানার কথা নেখলয়ুদভের মনে পড়ে গেল। অনেক লজ্জাকর স্মৃতি তার সামনে ভেসে উঠল।

সে ভাবতে লাগল, 'মানুষের পশু-প্রকৃতির এই জৈবধর্ম বিরক্তিকর, কিন্তু যতদিন সেটা খোলাখুলিভাবে আমাদের সামনে থাকে ততদিন আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চাসন থেকে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে আমরা তাকে ঘৃণা করি; এবং কেউ সে প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণই করুক আর তাকে প্রতিরোধই করুক, সে যা ছিল তাই থাকে। কিন্তু সেই জৈবধর্ম যখন কাব্য ও সৌন্দর্যানুভূতির মুখোশ পরে এসে আমাদের পূজা দাবী করে—তখন তার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে আমরা সেই জৈবধর্মকেই পূজা করি, ভাল-মন্দর পার্থক্যটাও ভুলে যাই। তখনই অবস্থা হয় ভয়ংকর।

তখন নেখ্‌লয়ুদভ যে রকম পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছিল প্রাসাদ, শাস্ত্রী, দুর্গ, নদী, নৌকা ও স্টক-এক্সচেঞ্জের বাড়ি, তেমনি পরিষ্কারভাবেই এ সব সত্য তার কাছে উদ্‌ঘাটিত হল।

সে চাইল এ সব কিছু ভুলতে, সব কিছু না দেখতে, কিন্তু না দেখে তো তার উপায় নেই। পিতার্সবার্গের উপর যে আলো ছড়িয়ে পড়েছে তার উৎস যেমন সে দেখতে পাচ্ছে না, ঠিক তেমনি যে আলোয় এ সব কিছু তার কাছে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে তার উৎসও সে দেখতে পাচ্ছে না। আর সে আলো যদিও তার কাছে একঘেয়ে, বিষণ্ণ ও অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে, তথাপি সে আলোয় যা ফুটে উঠেছে তাকে দেখতে সে বাধ্য; আর তা দেখে তার মন যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে ভরে উঠল।

অধ্যায়— ২৯

মস্কোতে ফিরে গিয়ে নেখ্‌লুয়্দভ তৎক্ষণাৎ কারা-হাসপাতালে চলে গেল। সেনেট যে আদালতের রায়ই বহাল রেখেছে এবং মাসলভাকে সাইবেরিয়া যাত্রার জন্য তৈরি হতে হবে, এ দুঃসংবাদটা তো মাসলভাকে জানাতে হবে।

সম্রাটের কাছে যে দরখাস্তটা অ্যাডভোকেট লিখে দিয়েছে সেটার সাফল্য সম্পর্কে বিশেষ কোন আশা পোষণ না করলেও মাসলভাকে দিয়ে সই করাবার জন্য দরখাস্তটা সে সঙ্গে করেই এনেছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, দরখাস্তটা কার্যকরী হোক সেটা সে আর চায়ও না। সাইবেরিয়ায় গিয়ে নির্বাসিত ও দণ্ডিতদের মধ্যে বাস করবার চিন্তায় সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে; তাছাড়া মাসলভা ছাড়া পেলে তাদের দুজনের জীবনযাত্রা কি রূপ নেবে সেটা ধারণায়ও আনতে পারছে না। মার্কিন লেখক থরোর কথা তার মনে পড়ল। আমেরিকায় যখন ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত ছিল তখন সে লিখেছিল, "যে সরকারের অধীনে একজনও অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ হয়, সেখানে কারাগারই একজন ন্যায়বান লোকের প্রকৃত বাসস্থান।" পিতার্সবার্গ ভ্রমণকাল নেখ্‌লুয়্দভ সেখানে যা কিছু দেখেছে তারপরে সেও সেই চিন্তাধারারই অনুগামী হয়ে পড়েছে।

'হ্যাঁ, বর্তমান রাশিয়াতে কারাগারই একজন সৎলোকের উপযুক্ত বাসস্থান,' একথা ভাবতে গিয়ে তার মনে হল, ব্যক্তিগতভাবে তার বেলায় এ কথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

কারা-প্রাচীরের ভিতরে ঢুকতেই হাসপাতালের দারোয়ান নেখ্‌লুয়্দভকে চিনতে পেরে জানাল যে, মাসলভা সেখানে নেই।

'তাহলে সে কোথায় আছে?'

'সে কারাগারেই ফিরে গেছে।'

'এখান থেকে তাকে সরানো হল কেন?' নেখ্‌লুয়্দভ জিজ্ঞাসা করল।

দরোয়ান হেসে অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, 'দেখুন মাননীয় মহাশয়, এ সব লোক এই রকমই হয়। ডাক্তারের সহকারীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি শুরু করায় প্রধান ডাক্তার তাকে ফেরৎ পাঠিয়েছে।'

মাসলভা ও তার মন যে নেখ্‌লুয়্দভের কাছে কতখানি তা সে নিজেই জানত না। এই খবর শুনে সে একেবারে পাথর হয়ে গেল।

একটা বড় রকমের অদৃষ্টপূর্ব দুর্ভাগ্যের সংবাদে যেমনটি হয় তারও সেই অবস্থাই হল। তীব্র যন্ত্রণা তাকে আঘাত করল। তার প্রথম অনুভূতি হল লজ্জার। মাসলভার আত্মার পরিবর্তন ঘটছে বলে যে কল্পনা সে করেছিল সেটা তার নিজের কাছেই হাস্যকর হয়ে উঠল। তার মনে হল, তার আত্মত্যাগকে স্বীকার না করতে মাসলভা যত কথা বলেছে, তার সব অনুযোগ ও চোখের জল,—এসবই নিজের সুবিধার জন্য তাকে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক একটি

ভ্রষ্টচরিত্র নারীর অপকৌশলমাত্র। তার মনে পড়ল, শেষ সাক্ষাৎকারের সময় মাসলভার এই একগুঁয়েমির লক্ষণ সে দেখতে পেয়েছিল। টুপিটা মাথায় দিয়ে সে হাসপাতাল থেকে চলে গেল।

'এখন আমি কি করব? এখনও কি তার সঙ্গে আমি বাঁধা আছি? তার এই কাজ কি আমাকে মুক্তি দেয় নি?' কিন্তু এই সব প্রশ্ন নিজেকে করামাত্র সে বুঝতে পারল, সে যদি নিজেকে মুক্ত মনে করে মাসলভাকে পরিত্যাগ করে তাহলে সে যা চাইছে তা হবে না, তাতে মাসলভার শাস্তি না হয়ে শাস্তি হবে তার নিজের। অমনি ভয় তাকে ঘিরে ধরল।

'না, যা ঘটেছে তা আমার সংকল্পকে পরিবর্তিত না করে বরং তাকে আরও শক্তিশালী করবে। তার যা খুশি তাই সে করুক। ডাক্তারের সহকারীকে নিয়ে যদি সে চলতে চায়, তাই চলুক; সেটা তার ব্যাপার। আমার বিবেক যা বলবে আমি তাই করব। আর আমার বিবেক বলছে, আমার মুক্তিকে বলি দিতে হবে। তাকে বিয়ে করবার, তাকে যেখানে পাঠানো হবে সেখানেই তাকে অনুসরণ করবার যে সংকল্প আমি করেছি তার কোন পরিবর্তন হবে না।' দৃঢ় পদক্ষেপে কারাগারের বড় বড় ফটকের দিকে অগ্রসর হতে হতে নেখ্‌ল্যুদভ আপন মনে এই কথাগুলি বলতে লাগল।

ফটকে পাহারারত রক্ষীকে সে বলল, সে মাসলভার সঙ্গে দেখা করতে চায় এ সংবাদটা ইন্সপেক্টরকে জানানো হোক। রক্ষী নেখ্‌ল্যুদভকে চিনত বলেই কারাগারের একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ তাকে জানিয়ে দিল। পুরনো ইন্সপেক্টরকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় একজন নতুন খুব কড়া কর্মচারিকে নিয়োগ করা হয়েছে।

রক্ষী বলল, 'এখানে খুব কড়াকড়ি চলছে; অবস্থা ভয়াবহ। তিনি ভিতরেই আছেন, এখনই খবর পাঠাচ্ছি।'

নতুন ইন্সপেক্টর কারাগারের ভিতরেই ছিল, একটু পরেই বেরিয়ে নেখ্‌ল্যুদভের কাছে এল। লোকটি দীর্ঘদেহ, চিবুকের হাড় বেশ উঁচু, মুখটা বিষণ্ণ, চলাফেরা করে শ্লথ গতিতে।

নেখ্‌ল্যুদভের দিকে না তাকিয়েই সে বলল, 'নির্দিষ্ট দিনগুলিতে ভিজিটিং-রুমেই দেখা করতে দেওয়া হয়ে থাকে।'

'কিন্তু আমার কাছে সম্রাটের বরাবর একটা দরখাস্ত আছে, সেটা সই করাতে হবে।'

'সেটা আমাকে দিতে পারেন।'

'আমি নিজে কয়েদীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। এর আগে সে অনুমতি আমাকে দেওয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা আগে', নেখ্‌ল্যুদভের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ইন্সপেক্টর জবাব দিল।

নেখ্‌লুদভ তবু বলল, 'আমার কাছে গভর্ণরের অনুমতি-পত্র আছে।'

'আমাকে দিন', তার দিকে তাকিয়েই ইন্সপেক্টর বলল। নেখ্‌লুদভের কাছ থেকে কাগজখানা নিয়ে ধীরে ধীরে পড়ে বলল, 'দয়া করে আপিসে আসুন।'

আপিস তখন খালি। টেবিলে বসে ইন্সপেক্টর কতকগুলি কাগজপত্র বাছাই করতে লাগল।

নেখ্‌লুদভ যখন জানতে চাইল, রাজনৈতিক বন্দী ভুখোভার সঙ্গে সে দেখা করতে পারবে কি না, তখন ইন্সপেক্টর সংক্ষেপে জানাল, পারবে না।

'রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় না', বলেই সে আবার কাগজপত্রে মন দিল।

ভুখোভার চিঠিখানা তখনও তার পকেটে। তার মনে হল, সে যেন কোন অপরাধ করতে চলেছে।

মাসলভা ঘরে ঢুকলে ইন্সপেক্টর মাথাটা একবার তুলল। কিন্তু তার দিকে বা নেখ্‌লুদভের দিকে না তাকিয়েই 'আপনারা কথা বলতে পারেন,' এটুকু বলেই আবার কাগজপত্র যাচাই করতে শুরু করল।

মাসলভার পরনে সেই সাদা জ্যাকেট, স্কার্ট ও রুমাল। নেখ্‌লুদভের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার ঠাণ্ডা, কঠিন চোখের দিকে তাকিয়ে মাসলভার মুখ লাল হয়ে উঠল। হাত দিয়ে জ্যাকেটের প্রান্ত মুচড়ে ধরে সে চোখ নীচু করল।

তার সেই বিচলিত ভাব দেখে নেখ্‌লুদভের মনে হল, হাসপাতালের দরোয়ানের কথাগুলি তাহলে ঠিক।

নেখ্‌লুদভ ভেবেছিল তার সঙ্গে আগেকার মতই ব্যবহার করবে, কিন্তু এখন তার প্রতি সে এতই বিরূপ হয়ে পড়েছে যে তার সঙ্গে করমর্দন করতেও তার ইচ্ছা হল না।

তার দিকে না তাকিয়ে, তার হাতখানি পর্যন্ত না ধরে একঘেয়ে গলায় সে বলল, 'আমি খারাপ খবর এনেছি। সেনেট তোমার আবেদন বাতিল করেছে।'

'আমি জানতাম তারা তাই করবে', এমন অদ্ভুতভাবে সে কথাগুলি বলল যেন তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

আগে হলে নেখ্‌লুদভ জিজ্ঞাসা করত, এ কথা সে কেন বলছে; কিন্তু এখন সে শুধু তার দিকে চেয়ে রইল। মাসলভার দুই চোখ জলে ভরে উঠেছে।

কিন্তু তাতেও তার মন নরম হল না; বরং তার বিরক্তি আরও বেড়ে গেল।

ইন্সপেক্টর উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

এই মুহূর্তে মাসলভার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও নেখ্‌লুদভের মনে হল, সেনেটের এই সিদ্ধান্তে তার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত।

সে বলল, 'তুমি নিরাশ হয়ো না। সম্রাটের কাছে আবেদন হয় তো সফল

হতে পারে। আমি আশা করছি—'

ভিজে ট্যারা চোখে তার দিকে করুণ ভাবে তাকিয়ে মাসলভা বলল, 'আমি সে কথা ভাবছি না।'

'তাহলে কি ভাবছ?'

'আপনি তো হাসপাতালে গিয়েছিলেন; তারা নিশ্চয় আমার বিষয়ে বলেছে যে—'

'তাতে কি হয়েছে? সেটা তো তোমার ব্যাপার,' ঠাণ্ডা গলায় কথাগুলি বলে সে ভুরু কোঁচকাল।

আহত গর্বের যে নিষ্ঠুর মনোভাব শান্ত হয়ে এসেছিল, হাসপাতালের উল্লেখে সেটা নতুন করে মাথা চাড়া দিল।

ঘৃণার দৃষ্টিতে মাসলভার দিকে তাকিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ ভাবতে লাগল: শ্রেষ্ঠ পরিবারের যে কোন মেয়ে তাকে বিয়ে করতে পারলে সুখী হত; অথচ সে যেচে তার স্বামী হতে চাওয়া সত্ত্বেও এই নারী একটু অপেক্ষাও না করে একটা ডাক্তারের সহকারীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি শুরু করে দিল।

পকেট থেকে একটা বড় খাম বের করে টেবিলের উপর রেখে বলল, 'এটা সই কর।' রুমালের কোণা দিয়ে চোখের জল মুছে সে জানতে চাইল, কোথায় কি লিখতে হবে।

সে দেখিয়ে দিল। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের আস্তিন গুটিয়ে মাসলভা বসে পড়ল। নেখ্‌ল্যুদভ তার পিছনে দাঁড়াল। চাপা আবেগে মাসলভার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। আহত গর্বের অভিমান আর যন্ত্রণাকাতরের প্রতি করুণা—মন্দ আর ভাল দুটো প্রবৃত্তি নেখ্‌ল্যুদভের বুকের মধ্যে লড়াই শুরু করে দিল—শেষ পর্যন্ত শেষেরটিই জয়লাভ করল।

সে মনে করতে পারছে না কোন্‌টি আগে এসেছে; তার প্রতি করুণা আগে মনে জেগেছে, না যে অপকর্মের জন্য আজ সে মাসলভাকে দোষী করছে সেই কাজ সে আগে করেছে? সে যাই হোক, তার মনে অপরাধ-বোধ ও করুণা যুগপৎ জাগ্রত হল।

দরখাস্তটা সই করে আঙুলের কালি পেটিকোটে মুছে সে উঠে দাঁড়াল; নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকাল।

'যাই ঘটুক, আর এর ফলাফল যাই হোক, আমার সংকল্প অপরিবর্তিতই আছে', নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

সে যে ক্ষমা করতে পেরেছে এই চিন্তার ফলে মাসলভার প্রতি তার করুণা ও সহানুভূতি আরও বেড়ে গেল; সে তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইল।

'আমি যা বলেছি তাই করব; ওরা তোমাকে যেখানেই নিয়ে যাবে আমি তোমার সঙ্গেই থাকব।'

তার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও মাসলভা তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল,

'তাতে লাভ কি ?'

'সে সব না ভেবে পথে তোমার কি কি লাগবে সেইটে বরং ভাব।'

'সে সব কিছুই আমি জানি না ; আপনাকে ধন্যবাদ।'

ইন্সপেক্টর এগিয়ে আসতেই তার কথার জন্য অপেক্ষা না করে নেখ্‌লুদভ বিদায় নিয়ে চলে গেল। অন্তরের মধ্যে সকলের প্রতি শান্তি, আনন্দ ও প্রেমের এমন অনুভূতি তার আগে কখনও হয় নি। মাসলভার কোন কাজেই তার প্রতি নিজের ভালবাসার কোন পরিবর্তন ঘটবে না, এই নিশ্চিত বিশ্বাস তাকে আনন্দে ভরে তুলল, এমন একটা উচ্চাসনে তাকে বসিয়ে দিল যেখানে সে এর আগে কখনও উঠতে পারে নি। ডাক্তারের সহকারীর সঙ্গে সে যা খুশি করুক ; সেটা তার ব্যাপার। সে তো নিজের জন্য তাকে ভালবাসে নি, ভালবেসেছে তারই জন্য, ঈশ্বরের জন্য।

যে ব্যাপারের জন্য মাসলভাকে হাসপাতাল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যে জন্য নেখ্‌লুদভ তাকেই দোষী মনে করেছে, সেটা কিন্তু আসলে এই রকম।

করিডরের শেষ প্রান্তে অবস্থিত ডিস্‌পেন্সারি থেকে কিছু ওষুধের নির্যাস আনবার জন্য হেড নার্স মাসলভাকে সেখানে পাঠিয়েছিল। সহকারিটি ঢ্যাঙা, মুখে ফুট্‌কি দাগ ; কিছুদিন ধরেই সে মাসলভার পিছনে লেগেছিল। তার হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্য মাসলভা তাকে এমন ধাক্কা মেরেছিল যে তার মাথা একটা তাকের উপর পড়ায় দুটো বোতল নীচে পড়ে ভেঙে যায়।

প্রধান ডাক্তার তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনে এবং মাসলভাকে রক্তিম মুখে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখে সে রেগে চীৎকার করে উঠল :

'দেখ ভালমানুষের মেয়ে, এখানেও যদি এসব চালাও তাহলে তোমার জায়গায়ই তোমাকে ফেরৎ পাঠাব। ····এ সবের মানে কি ?' এগিয়ে গিয়ে সহকারীর দিকে চশমার উপর দিয়ে তাকিয়ে সে বলল।

সহকারীটি হেসে নিজেকে সমর্থন করল। ডাক্তার তার কোন কথায় কোন কান দিল না। ওয়ার্ডে ফিরে গিয়ে সেইদিনই ইন্সপেক্টরকে জানাল, মাসলভার জায়গায় একজন ধীর-স্থির সহকারী নার্স তার চাই।

ডাক্তারের সহকারীর সঙ্গে এইটুকুই তার 'ফষ্টিনষ্টি'। ভালবাসাবাসির অপরাধে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, এইটেই মাসলভার বিশেষ কষ্টের কারণ। পুরুষের সঙ্গ তার কাছে অনেকদিন থেকেই বিরক্তিকর, বিশেষ করে নেখ্‌লুদভের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে সেটা আরও বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। তার অতীত ও বর্তমান জীবনের কথা ভেবে প্রত্যেক পুরুষ মানুষ, এমন কি এই ফুট্‌কি-মুখো সহকারীটি পর্যন্ত, ধরে নিয়েছে যে তাকে অপমান করবার এবং সে অস্বীকৃত হলে তাতে বিস্মিত হবার অধিকার তাদের আছে—

এই চিন্তাই তাকে বেশী করে আঘাত করছে, আত্ম-করুণায় তার চোখ জলে ভরে উঠেছে। এবার নেখ্‌লয়ুদভের কাছে এসে নিজের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগকে খণ্ডন করতেই সে চেয়েছিল; কিন্তু তার মনে হল, নেখ্‌লয়ুদভ তার কথা বিশ্বাস করবে না, বরং আত্ম-পক্ষ সমর্থন করলে তার সন্দেহ আরও বেড়ে যাবে; তাই চোখের জলে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, সে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

মাসলভা তখনও মনে করছে, নেখ্‌লয়ুদভকে সে ক্ষমা করে নি; দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে যেমন বলেছিল এখনও তাকে তেমনি ঘৃণা করে। কিন্তু আসলে সে তাকে আবার ভালবেসেছে, এমন ভালবেসেছে যে নিজের অজ্ঞাতেই তার ইচ্ছামত সব কাজই সে করে চলেছে; মদ ছেড়েছে, ধূমপান ছেড়েছে, ফষ্টিনষ্টি ছেড়েছে, এবং তার ইচ্ছামতই হাসপাতালের কাজও নিয়েছিল। অবশ্য নেখ্‌লয়ুদভ যতবার জানিয়েছে যে সব কিছু ছেড়ে সে তাকে বিয়ে করবে ততবারই সে যে দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছে তার কারণ একবার যে গর্বিত কথাগুলি সে বলেছিল সেগুলিকে বার বার উচ্চারণ করতে তার ভাল লাগত এবং সে জানত যে তার সঙ্গে বিয়ে হলে নেখ্‌লয়ুদভের পক্ষে সেটা দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। মনে মনে সে একান্তভাবেই সংকল্প করে নিয়েছিল যে নেখ্‌লয়ুদভের এই আত্মত্যাগকে সে কিছুতেই মেনে নেবে না; তথাপি সে যে তাকে ঘৃণা করছে, বিশ্বাস করছে যে সে যা ছিল আজও তাই আছে, তার মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটেছে সেটা বুঝতেও পারছে না, এটা তার কাছে বড় বেদনাদায়ক। নেখ্‌লয়ুদভ যে এখনও মনে করে যে হাসপাতালে থাকতে সে একটা অন্যায় করেছে, তার দণ্ডাদেশ বহালের দুঃসংবাদ অপেক্ষাও এই চিন্তাই তাকে বেশী যন্ত্রণা দিচ্ছে।

অধ্যায়—৩০

কয়েদীদের প্রথম দলের সঙ্গেই মাসলভাকে পাঠানো হতে পারে; কাজেই নেখ্‌লয়ুদভ যাত্রার তোড়জোড় শুরু করে দিল। কিন্তু সে জন্য এত কিছু করার রয়েছে যে, তার মনে হল, যত সময়ই হাতে থাকুক সব কাজ শেষ করা যাবে না। আগের থেকে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগে তাকে করণীয় কাজ খুঁজে বের করতে হত, আর সে সব কাজের কেন্দ্র-বিন্দু ছিল একটি মাত্র লোক, অর্থাৎ দিমিত্রি আইভানভিচ নেখ্‌লয়ুদভ; তথাপি তার জীবনের সব কিছু ঐভাবে কেন্দ্রায়িত হওয়া সত্ত্বেও সব কাজই ক্লান্তিকর মনে হত। এখন তার সব কাজের লক্ষ্যই অন্য মানুষ, দিমিত্রি আইভানভিচ নয়; সব কাজই উৎসাহজনক ও আকর্ষণীয়; সে কাজের আর শেষ নেই।

এখানেই শেষ নয়। আগেকার দিনে দিমিত্রি আইভানভিচ নেখ্‌লয়ুদভের

কাজকর্ম তার কাছে অস্বস্তিকর ও বিরক্তিকর বলে মনে হত ; এখনকার কাজ-কর্ম তার মনকে আনন্দে ভরে দেয়।

নেখ্‌লুদভের বর্তমান কাজকর্মকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। নিজের স্বাভাবিক পণ্ডিতম্মন্যতায় সেও সব কাজকে তিন ভাগে ভাগ করে সব কাগজ-পত্রকেও তিনটে আলাদা ফাইলে গুছিয়ে রাখতে লাগল।

প্রথমটি মাসলভা সংক্রান্ত : সম্রাটের কাছে যে দরখাস্ত করা হয়েছে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তার সাইবেরিয়া ভ্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।

দ্বিতীয়টি জমিদারির বিলি-ব্যবস্থা সংক্রান্ত। পানোভো-তে সে চাষীদের এই শর্তে জমি দিয়েছে যে, তারা যে খাজনা দেবে সেটা তাদের সমবায়ের প্রয়োজনেই ব্যয়িত হবে। কিন্তু সে ব্যাপারেও একটা আইনানুগ দলিল তৈরি করা এবং তদনুযায়ী উইল প্রস্তুত করা দরকার। কুজমিন্‌স্কোয়ে-তে প্রথম যে বন্দোবস্ত করেছিল তাই বলবৎ আছে : খাজনাটা সে পাবে ; কিন্তু খাজনার হার ঠিক করতে হবে এবং সে টাকার কতটা সে নিজের জন্য ব্যয় করবে আর কতটা চাষীদের জন্য রাখা হবে সেটাও স্থির করতে হবে।

সাইবেরিয়া যাত্রার ব্যাপারে কত খরচ লাগবে সে সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকায় সে-খাতের উপার্জন সবটা ছেড়ে দেওয়ার কথা সে এখনও ভাবে নি, যদিও সেটাকে আধাআধিতে নামিয়ে এনেছে।

তার তৃতীয় কাজ হল সেই সব কয়েদীদের সাহায্য করা যারা ইদানীং দলে দলে সাহায্যের জন্য তার কাছে আবেদন করছে।

কয়েদীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনায়, যারা এখনও কারাগারে রয়েছে তাদের তালিকা দেখে এবং অ্যাডভোকেট, কারা-পুরোহিত ও ইন্সপেক্টরকে জেরা করে যতটা জানা গেছে তা থেকে নেখ্‌লুদভ এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে কয়েদীদের, তথাকথিত অপরাধীদের, পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথম হল সম্পূর্ণ নির্দোষ হয়েও বিচারবিভাগীয় ভ্রান্তির ফলে যারা দণ্ডিত হয়েছে। এই দলে আছে আগুন লাগানোর অভিযোগে অভিযুক্ত মেন্‌শভরা, মাসলভা এবং আরও অনেকে। সংখ্যায় তারা খুব বেশী নয়—পুরোহিতের বিবরণ অনুসারে শতকরা সাতজন মাত্র—কিন্তু তাদের অবস্থা বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে সেই সব মানুষ যারা কামনা, ঈর্ষা বা মদ্যপানজনিত মত্ততা প্রভৃতি এমন সব বিশেষ অবস্থায় কৃত অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়েছে যে অবস্থায় পড়লে তাদের বিচারকরাও অনুরূপ কাজই করত। নেখ্‌লুদভের পর্যবেক্ষণ অনুসারে অর্ধেকের বেশী অপরাধী এই দলে পড়ে।

তৃতীয় শ্রেণীতে আছে সেই সব মানুষ যারা এমন সব কাজের জন্য দণ্ডিত হয়েছে যাকে তারা নিজেরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও ভাল কাজ বলে মনে করলেও

আইন-প্রণেতারা তাকে অপরাধ বলে গণ্য করে। এই দলে আছে সেই সব লোক যারা বিনা লাইসেন্সে মদ বিক্রি করে, যারা চোরা-কারবার চালায়, যারা বড় বড় জমিদারির অন্তর্ভুক্ত এবং সম্রাটের খাস জঙ্গল থেকে ঘাস ও কাঠ কেটে নেয়, পার্বত্য পথে যারা ডাকাতি করে, আর সেই সব অবিশ্বাসীর দল যারা গীর্জার সম্পত্তি লুঠ করে।

চতুর্থ শ্রেণীতে আছে তারা যাদের বন্দী করার কারণ সমাজের সাধারণ স্তরের মানুষের তুলনায় তারা নৈতিক বিচারে অনেক উচ্চে অধিষ্ঠিত। তারা হল ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোক, স্বাধীনতা অর্জনের কামনায় বিদ্রোহী পোল ও সারকাশিয়ানরা, রাজনৈতিক বন্দী, সমাজবাদী ও ধর্মঘটকারীরা। নেখ্‌লুদভের পর্যবেক্ষণ অনুসারে শতকরা একটা বড় অংশই এই দলে পড়ে এবং তাদের মধ্যে এমন অনেক শ্রেষ্ঠ মানুষ আছে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্যই যাদের দণ্ডিত করা হয়েছে।

পঞ্চম শ্রেণীতে আছে সেই সব মানুষ সমাজের সঙ্গে সম্পর্কের বিচারে যারা নিজেরা যত না অন্যায় করেছে তার চাইতে বেশী অন্যায় করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। তারা সেই সব সমাজপরিত্যক্ত মানুষ যারা নিয়ত উৎপীড়ণ ও প্রলোভনে হতবুদ্ধি, যেমন সেই ছেলেটি যে মাদুর চুরি করেছিল এবং সেই রকম আরও শত শত মানুষ, নেখ্‌লুদভ কারাগারের ভিতরে ও বাইরে যাদের দেখা পেয়েছে। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তারা বেঁচে থাকে, অপরাধ বলে বর্ণিত এই সব কাজ তারই অনিবার্য ফলস্বরূপ। নেখ্‌লুদভের মতে, বহুসংখ্যক চোর ও খুনী যাদের সঙ্গে ইদানিং তার যোগাযোগ ঘটেছে তারা এই দলেই পড়ে। সেই সব ভ্রষ্টচরিত্র নীতিহীন জীবদের সে এই দলে ফেলেছে অপরাধতত্ত্বের নতুন শাখা যাদের স্বভাব-অপরাধী বলে চিহ্নিত করেছে এবং যাদের অস্তিত্বকেই ফৌজদারি আইন ও দণ্ডের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে প্রধান প্রমাণ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। নেখ্‌লুদভের মতে এই সব নীতিহীন, চরিত্রহীন, অস্বাভাবিক লোকগুলির প্রতিও সমাজই অবিচার করেছে; শুধু তাদের ক্ষেত্রে অবিচারটা সরাসরি না করে করা হয়েছে তাদের পিতামাতা ও পূর্বপুরুষদের প্রতি।

এই শেষের শ্রেণীর একটি লোক বিশেষভাবে নেখ্‌লুদভের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার নাম ওখোতিন; দাগী চোর, এক বেশ্যার জারজ সন্তান, মানুষ হয়েছে সস্তার বস্তিতে। জীবনের ত্রিশ বছর পর্যন্ত এমন কোন লোককে সে চোখেও দেখে নি যার নৈতিক চরিত্র একটি পুলিশ অপেক্ষা শ্রেয়তর। অল্প বয়সেই সে একটা চোরের দলে ভিড়ে যায়। তবে হাসি-মস্করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ, তাই সকলেই তাকে ভালবাসত। নেখ্‌লুদভকে তারা ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য অনুরোধ করার সময় সে নিজেকে নিয়ে এবং উকিল, কারাগার ও মানবিক এবং ঐশ্বরিক নিয়ম-কানুন নিয়ে অনেক রকম ঠাট্টা-

তামাশা করেছিল। ঐ রকম আর একজন সুদর্শন ফিয়দরভ। সে ছিল একটা ডাকাত-দলের সর্দার। দলবল নিয়ে সে একজন বৃদ্ধ সরকারী কর্মচারিকে খুন করে তার সর্বস্ব লুঠ করেছিল। গোড়ায় সে ছিল চাষী। তার বাবাকে বে-আইনিভাবে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে সেনাদলে কাজ করবার সময় জনৈক অফিসারের সঙ্গিনীর সঙ্গে প্রেমে পড়ার অপরাধে তাকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল। তার প্রকৃতি ছিল কামময় ও আকর্ষণীয়, তাই যে কোনভাবে কামনা চরিতার্থ করার বাসনা ছিল তার প্রবল। সে কখনও কোন সংযত-চরিত্র মানুষকে দেখে নি, এবং সম্ভোগ ছাড়া জীবনের আর কোন আদর্শের কথাও কখনও শোনে নি। নেখ্‌লুদভ বুঝেছিল, এই দুটি লোকই প্রকৃতির প্রভূত দানে সমৃদ্ধ হয়েও অযত্নে বেড়ে ওঠা গাছের মতই অবহেলিত ও অসার্থক হয়ে পড়েছে। এমন একটি ভবঘুরে ও একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গেও তার দেখা হয়েছিল যাদের আপাত নিষ্ঠুরতায় বীতশ্রদ্ধ হলেও তাদের কারও মধ্যেই সেই অপরাধ প্রবণতা সে দেখতে পায় নি যার কথা ইতালীয় অপরাধ-তাত্ত্বিকরা লিখেছে; বরং তাদের প্রতি সেই রকম ব্যক্তিগত বিতৃষ্ণাই সে বোধ করেছে যে রকমটা সে বোধ করেছে কারাগারের বাইরের সেই সব লোকদের প্রতি যারা লেজ-ওয়ালা কোট পরে, কাঁধে মর্যাদাসূচক তক্‌মা ধারণ করে, বা লেস-বসানো জামা গায় দেয়।

সুতরাং সেই সব বিচিত্র চরিত্রের লোকদের কেন কারাগারে রাখা হয়েছে, অথচ তাদেরই মত অন্যরা বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার কারণ খুঁজে বের করাই নেখ্‌লুদভের চতুর্থ কর্তব্য।

সে আশা করেছিল পুঁথিপত্রে এ-প্রশ্নের জবাব পাবে। তাই এ বিষয়ে লিখিত সব বই সে কিনল। লম্‌ব্রসো, গারোফালো, ফেরি, লিজ্‌ত্‌, মড্‌স্লে ও তাদের সব বই কিনে সে যত্ন করে পড়ল। কিন্তু যত পড়ল ততই সে হতাশ হল। বিজ্ঞান চর্চার জন্য নয়, বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনার জন্য নয়, বিতর্কের জন্য নয়, শিক্ষাদানের জন্যও নয়, শুধুমাত্র জীবনের প্রাত্যহিক প্রশ্নের জবাব পাবার আশায় যারা বিজ্ঞানের আশ্রয় নেয় তাদের বেলায় সচরাচর যা ঘটে থাকে, তার বেলায়ও তাই ঘটল। ফৌজদারি আইন সংক্রান্ত হাজার রকমের সূক্ষ্ম ও অকৃত্রিম প্রশ্নের জবাব বিজ্ঞান দিতে পারে, শুধু দিতে পারে না যে প্রশ্নের জবাব সে খুঁজছে সেটা।

একটিমাত্র অতীব সরল প্রশ্ন তার: 'কিছু লোক অপর লোকদের আটক করে, যন্ত্রণা দেয়, নির্বাসনে পাঠায়, চাবুক মারে এবং খুন করে কেন এবং কোন্‌ অধিকারে, যখন তারাও তাদেরই মত একই স্তরের জীব?' এই প্রশ্নের জবাবে সে পেয়েছে শুধু আলোচনা: মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কি নেই; মাথার খুলির পরিমাপের দ্বারা অপরাধের লক্ষণ ধরা যায় কি না; অপরাধের ক্ষেত্রে বংশগতির ভূমিকা কতখানি; নীতিহীনতা বংশানুক্রমিক কিনা; নীতি

কি, উন্মত্ততা কি, অধঃপতন কি, বা স্বভাব কি; জলবায়ু, খাদ্য, অজ্ঞতা, অনুকরণের প্রবৃত্তি, সম্মোহন বা কামনা অপরাধকে কতখানি প্রভাবিত করে; সমাজ কি; সমাজের কর্তব্য কি—এমনি সব আলোচনা।

এই সব আলোচনা পড়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরবার পথে একটি ছোট ছেলে একদা যে জবাব দিয়েছিল সেটা নেখ্‌লয়ুদভের মনে পড়ল। নেখ্‌লয়ুদভ জিজ্ঞাসা করেছিল, সে বানান করতে শিখেছে কি না।

'হ্যাঁ, আমি বানান করতে পারি,' ছেলেটি জবাব দিল।

'বেশ, তাহলে বল তো, leg (পা) বানান কি?'

চতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছেলেটি বলল, 'কুকুরের পা, না কিসের পা?'

বিজ্ঞানের সব বইতেই তার একটিমাত্র মৌলিক প্রশ্নের ওই একই রকম জবাব নেখ্‌লয়ুদভ পেয়েছিল।

জ্ঞান, শিক্ষা ও আগ্রহের অনেক কথাই তাতে ছিল; ছিল না শুধু তার প্রধান প্রশ্নের জবাব: 'কোন্ অধিকারে কিছু মানুষ অন্য মানুষকে শাস্তি দেয়?'

শুধু যে কোন জবাব মেলে নি তাই নয়, সব যুক্তিই দেওয়া হয়েছে শাস্তির ব্যাখ্যায় ও সমর্থনে, যেন শাস্তির প্রয়োজনটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

নেখ্‌লয়ুদভ অনেক পড়াশুনা করল, কিন্তু সবই ছাড়া-ছাড়া ভাবে; এই ধরনের পড়াশুনাকেই তার ব্যর্থতার কারণ বলে ধরে নিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ আশায় রইল, পরবর্তীকালে এর জবাব পাবে। কিন্তু যে জবাব পরে প্রায়শই তার সামনে হাজির হতে লাগল তার সত্যতায় সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না।

অধ্যায়—৩১

যে কয়েদী-দলের সঙ্গে মাসলভা যাবে তারা ৫ই জুলাই যাত্রা শুরু করবে। নেখ্‌লয়ুদভও সেইদিনই যাত্রার ব্যবস্থা করল।

তার আগের দিন নেখ্‌লয়ুদভের দিদি ও তার স্বামী তার সঙ্গে দেখা করতে এল।

নেখ্‌লয়ুদভের দিদি নাতালিয়া আইভানভ্‌না রাগঝিন্‌স্কি ভাইয়ের থেকে দশ বছরের বড়। অংশত এই দিদির প্রভাবেই সে মানুষ হয়েছে। ছেলেবেলায় নেখ্‌লয়ুদভ দিদির খুব প্রিয় ছিল; তারপরে বিয়ের আগে দুজনের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মে, যেন দুটি সমবয়সী ভাই-বোন, অথচ দিদি তখন পঁচিশ বছরের যুবতী, আর সে পনেরো বছরের কিশোর। সেই সময় সেই ভাইয়ের বন্ধু নিকলেংকা ইর্তেনিয়েভকে ভালবেসেছিল। আজ আর সে বেঁচে নেই।

তারপর থেকে দুজনই চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছে: ভাই চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছে সামরিক

চাকরি আর পাপাসক্ত জীবনের জন্য, আর দিদি চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছে এমন একটি লোককে বিয়ে করে যার প্রতি তার ভালবাসা কাম-প্রণোদিত; তাছাড়া সে লোকটিও এক সময় যা কিছু তার ও তার ভাইয়ের কাছে ছিল একান্ত প্রিয় ও পবিত্র সে সবের ধার তো ধারেই না, বরং নৈতিক পূর্ণতার আকাংখা ও লোক-সেবার অর্থই সে বুঝতে পারে না; সে শুধু বোঝে উচ্চাকাংখা ও জাকজমকপূর্ণ জীবন।

নাতালিয়ার স্বামীর খ্যাতি বা সম্পত্তি কিছুই নেই, কিন্তু লোকটি স্বীয় বৃত্তিতে সুনিপুণ। অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে উদারনীতি ও রক্ষণশীলতার মাঝখানে থেকে যখন যেটা সুবিধাজনক মনে হয় সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে, এবং রমণীরঞ্জনের উপযুক্ত কতকগুলি গুণের সাহায্যে সেই আইনের বৃত্তিতে একটা মোটামুটি উজ্জ্বল জীবিকা গড়ে তুলেছে। প্রথম যৌবন পার হয়ে দেশভ্রমণে বের হয়ে সে নেখ্‌লয়ুদভের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং যেন তেন প্রকারেন পরিণত বয়স্কা নাতালিয়াকে নিজের প্রতি প্রণয়াসক্তা করে তোলে। নাতালিয়ার মায়ের এ বিয়েতে মত ছিল না; এ বিয়েকে সে অসম-বিবাহ বলে মনে করেছিল।

নেখ্‌লয়ুদভও ভগ্নিপতিকে ঘৃণা করত, যদিও সে মনোভাব সে নিজের কথা থেকেও লুকিয়ে রাখতে এবং সর্বদাই মন থেকে দূর করতে চেষ্টা করত।

রাগঝিন্‌স্কির প্রতি তার এই বিরূপতার কারণ তারই নীচতা ও সংকীর্ণতা হলেও তার আসল কারণ নাতালিয়া। স্বামীর চরিত্রের সংকীর্ণতা সত্ত্বেও নাতালিয়া তাকে এত তীব্রভাবে স্বার্থপরের মত ইন্দ্রিয় সুখপরিতৃপ্তির জন্য ভালবাসে যার ফলে তার মধ্যে একদিন যা কিছু মহৎ ছিল সব বিনষ্ট হয়ে গেছে।

ঐ লোমশ চকচকে টাক-মাথা আত্মম্ভরী লোকটার স্ত্রী হিসাবে নাতালিয়াকে ভাবতে তার কষ্ট হয়। এমন কি তার সন্তানদের প্রতিও সে বিরূপ মনোভাব পোষণ না করে পারে না।

রাগঝিন্‌স্কিরা দুজনই শুধু মস্কোয় এসেছে, ছেলে ও মেয়ে বাড়িতেই আছে। এখানে সব চাইতে বড় হোটেলের সব চাইতে ভাল ঘর তারা নিয়েছে। এসেই নাতালিয়া মায়ের পুরনো বাড়িতে গিয়েছিল; কিন্তু যখন আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌নার কাছে শুনল যে তার ভাই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে একটা লজিং-এ থাকে, তখনই সে সেখানে চলে যায়। লজিং-এর অন্ধকার দালানের দিনমানেও আলো জ্বলে। সেখানেই একটা নোংরা চাকরের সঙ্গে দেখা হলে সে জানাল যে প্রিন্স বাইরে চলে গেছে।

তার জন্য একটা চিঠি লিখে যাবার জন্য নাতালিয়া নেখ্‌লয়ুদভের ঘরটা দেখিয়ে দিতে বলাতে চাকর তাকে সেই ঘরে নিয়ে গেল।

নাতালিয়া ভাইয়ের দুখানি ছোট ছোট ঘর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। সে

লক্ষ্য করল, সব কিছুতেই ভাইয়ের স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা-প্রীতির স্বাক্ষর রয়েছে। পরিবেশের অদ্ভুত সরলতাও তার খুব ভাল লাগল। লেখার টেবিলের উপর রাখা ব্রোঞ্জের কুকুর-বসানো কাগজ-চাপাটা দেখেই সে চিনতে পারল; বিভিন্ন ফাইল ও লেখার সরঞ্জাম যে রকম পরিচ্ছন্নভাবে টেবিলে সাজানো রয়েছে তাও তার পরিচিত; হেনরি জর্জের লেখা একখানি ইংরেজি বই এবং দণ্ডবিধির উপরে লেখা অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে তাদের লেখা ফরাসি বইয়ের ভিতরে পৃষ্ঠা-চিহ্ন হিসাবে রাখা হাতির দাঁতের বাঁকানো কাগজ-কাটা ছুরিটাও সে দেখেই চিনতে পারল।

টেবিলে বসে একটা চিঠি লিখে তাকে সেইদিনই দেখা করতে বলে সে হোটেলে ফিরে গেল।

ভাইয়ের দুটো সমস্যা নিয়ে সে এখন বিব্রত; কাত্যুশার সঙ্গে তার বিয়ে—তাদের শহরেই অনেকের মুখে সে কথা সে শুনেছে—এবং চাষীদের সব জমি বিলিয়ে দেওয়া—সেটাও এখন সর্বজনবিদিত, আর অনেকেই কাজটাকে রাজনীতিগন্ধী ও বিপজ্জনক বলে মনে করে। একদিক থেকে কাত্যুশার সঙ্গে বিয়েতে সে খুশি হয়েছে। তার বিয়ের আগের সেই সুখের দিনগুলিতে ভাই-বোনের চরিত্রে যে দৃঢ়তা ছিল ভাইয়ের এই সংকল্পের ভিতর দিয়ে তারই প্রকাশকে সে প্রশংসার চোখেই দেখেছে। তবু এ রকম একটি ভয়ংকরী নারীকে তার ভাই বিয়ে করছে এ কথা ভাবতেও সে আতংকিত হয়ে উঠেছে। এই আতংকের অনুভূতিটাই তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। তাই সে স্থির করেছে, কাজটা কঠিন হলেও এ বিয়ে বন্ধ করতে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

চাষীদের জমি দেওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু তাকে ততটা বিচলিত করে নি, যদিও তার স্বামীর এ বিষয়ে খুবই আপত্তি এবং সে আশা করছে যে দিদির চেষ্টায় সেটা হয় তো বন্ধ করা যাবে। স্বামী বলল, 'জমির খাজনা তারা নিজেদেরই দেবে এই শর্তে চাষীদের জমি বন্দোবস্ত দেবার কি অর্থ হয়? সে যদি এই ব্যবস্থাই করতে চেয়েছিল তাহলে "চাষীদের ব্যাংক"-এর মারফৎ তাদের জমিগুলো বিক্রি করে দিল না কেন? তার তো খানিকটা মানে বোঝা যেত। আসলে, তার এ কাজ পাগলের কাণ্ড-কারখানারই সামিল।

নেখ্‌ল্যুদভের কাজকর্ম দেখাশুনা করার জন্য একজন আইনানুগ অছি নিযুক্ত করার কথা রাগঝিন্‌স্কি বিশেষভাবে চিন্তা করতে লাগল এবং তার স্ত্রীকে বলল, সে যেন এ বিষয়ে ভাইয়ের সঙ্গে গুরুত্বসহকারে আলোচনা করে।

অধ্যায়—৩২

সেদিন সন্ধ্যায় ফিরে এসে টেবিলের উপর দিদির চিঠিটা পেয়ে নেখ্‌ল্যুদভ তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেল। মায়ের মৃত্যুর পরে তাদের আর দেখা হয় নি। নাতালিয়া তখন ঘরে একা ছিল। স্বামী পাশের ঘরে বিশ্রাম করছিল। তার পরনে কালো রেশমের একটা আটো পোশাক, সামনে একটা লাল 'বো', মাথার চুল আধুনিক কেতায় বাঁধা।

সে স্বামীর সম-বয়সী, তাই স্বামীর জন্যই নিজেকে বয়সের তুলনায় ছোট দেখাবার চেষ্টাটা অত্যন্ত প্রকট।

ভাইকে দেখেই সে লাফ দিয়ে উঠে রেশমের পোশাকে খস্‌খস্‌ শব্দ তুলতে তুলতে ছুটে গিয়ে তাকে চুম্বন করল। হাসিমুখে দুজন দুজনকে দেখতে লাগল। তাদের সেই রহস্যময় দৃষ্টি-বিনিময়ের ভিতর দিয়ে যে অর্থ ও সত্য প্রকাশ পেল কোন ভাষায় তাকে প্রকাশ করা যায় না। তারপরই শুরু হল কথার খেলা; তাতে আন্তরিকতার স্পর্শ কম।

'তুমি তো আরও শক্ত-সমর্থ, আরও কম বয়সী হয়েছ', নেখ্‌ল্যুদভ বলল। খুশিতে তার ঠোঁটে ভাঁজ পড়ল।

'আর তুমি অনেক শুকিয়ে গেছ।'

'তোমার স্বামী কেমন আছে?'

'ও একটু বিশ্রাম নিচ্ছে; সারা রাত ঘুম হয় নি।'

অনেক কথাই বলবার ছিল,—কিন্তু মুখে বলা হল না; যা ভাষায় বলা গেল না, চোখে-চোখে তাই বলা হয়ে গেল।

'তোমার লজিং-এ গিয়েছিলাম।'

'জানি। বাড়িটা অত্যন্ত বড় বলেই সেখান থেকে চলে গেছি। সেখানে বড়ই একলা, বড়ই একঘেয়ে লাগত। সেখানকার কিছুই আমি চাই না, সে সব তুমি নিয়ে নাও। মানে, আসবাবপত্র প্রভৃতির কথা বলছি।'

'হ্যাঁ। আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌না আমাকে বলেছে। আমি সেখানেও গিয়েছিলাম। অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু—'

এমন সময় রূপোর চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে পরিচারক ঘরে ঢুকল।

সেই টেবিলে সব কিছু সাজিয়ে দিল। সকলেই চুপচাপ, নাতালিয়া টেবিলের কাছে গিয়ে নীরবেই চা তৈরি করল। নেখ্‌ল্যুদভও কোন কথা বলল না।

শেষ পর্যন্ত নাতালিয়াই প্রথম কথা বলল।

'দেখ দিমিত্রি, আমি সবই শুনেছি।' সে ভাইয়ের দিকে তাকাল।

'তাতে কি হল? তুমি তো জান আমি খুশি হয়েছি।'

'যে জীবন সে পেরিয়ে এসেছে তারপরেও তাকে ভাল করে তুলতে পারবে

এ আশা তুমি কি করে করছ?'

ছোট চেয়ারটায় সোজা হয়ে বসে সে মনোযোগ দিয়ে দিদির কথা শুনতে লাগল। তাকে ঠিক ঠিক বুঝে ঠিক ঠিক জবাব দেওয়াই তার ইচ্ছা। মাসলভার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারের ফলে তার মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল সেই শান্ত আনন্দ ও শুভ-বুদ্ধি তখনও তার মনকে ভরে রেখেছে।

সে জবাব দিল, 'তাকে তো নয়, আমি আমাকেই ভাল করে তুলতে চাইছি।'

নাতালিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

'বিয়ে ছাড়া অন্য পথেও তো তা করা যায়।'

'কিন্তু আমি মনে করি, এটাই শ্রেষ্ঠ পথ। তাছাড়া, এর ফলে যে জগতে আমি যাব সেখানে আমার অনেক কিছু করার আছে।'

'এতে তুমি সুখী হবে, এ বিশ্বাস আমি করি না।'

'আমার সুখটাই বড় কথা নয়।'

'তা হয় তো ঠিক; কিন্তু তার যদি মন বলে কিছু থাকে তাহলে সেও এতে সুখী হবে না—এমন কি সে এটা চাইবেও না।'

'সে এটা চায় না।'

'বুঝলাম; কিন্তু জীবন—'

'হ্যাঁ—জীবন?'

'জীবনের দাবী যে অন্য রকম।'

দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'আমরা ন্যায় কাজ করব, এ ছাড়া অন্য কোন দাবী জীবন করতে পারে না।'

'আমি বুঝতে পারছি না', বলে দিদি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

'বেচারি দিদি আমার, তার এতদূর পরিবর্তন হয়েছে?' নেখ্‌ল্যুদভ ভাবল। তার মনে পড়ল বিয়ের আগেকার নাতালিয়ার কথা, শৈশবের অজস্র স্মৃতি-বিজড়িত দিনগুলির কথা মনে পড়ে তার প্রতি গভীর মমতায় মনটা ভরে উঠল।

সেই মুহূর্তে রাগঝিন্‌স্কি ঘরে ঢুকল। তার চশমা, টাক ও কালো দাড়ি—সবই চকচক করছে।

কথাগুলির উপর অস্বাভাবিক জোর দিয়ে সে বলল, 'কেমন আছ? কেমন আছ?'

তারা কর-মর্দন করল। রাগঝিন্‌স্কি আস্তে একটা আরাম-কেদারায় বসে পড়ল।

'তোমাদের আলাপে বাধা দিলাম না তো?'

'না, আমি যা বলছি বা করছি তা কারও কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাইনা।'

যে মুহূর্তে তার লোমশ হাত চোখে পড়ল, ও তার আত্মম্ভরী অভিভাবক-সুলভ কথা কানে গেল, সেই মুহূর্তে তার মন থেকে সব বিনয়-নম্রতা উড়ে গেল।

নাতালিয়া বলল, 'তার মনের অভিপ্রায় নিয়েই কথা হচ্ছিল।' চায়ের পাত্রটা তুলে বলল, 'তোমাকে এক কাপ চা দেব কি?'

'ধন্যবাদ। তা অভিপ্রায়গুলি কি কি?'

জবাবটা নেখ্‌ল্যুদভই দিল, 'যে নারীর প্রতি আমি অন্যায় করেছি বলে মনে করি সে যে কয়েদীদের দলে রয়েছে তাদের সঙ্গে আমি সাইবেরিয়ায় যাব।'

'শুনেছি, শুধু সঙ্গে যাওয়া নয়, আরও বেশী কিছু।'

'হ্যাঁ, সে চাইলে তাকে বিয়ে করব।'

'বটে! যদি কিছু মনে না কর, তোমার মনের কথাটা আমাকে বুঝিয়ে বলবে কি? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমার মনের কথা...এই নারী···অধঃপতনের পথে এই নারীর প্রথম পদক্ষেপ···' সঠিক ভাষা মনে না আসায় নেখ্‌ল্যুদভ নিজের উপরেই চটে গেল। 'আমার মনের কথা হল, দোষী আমি আর শাস্তি পাচ্ছে সে।'

'যখন শাস্তি ভোগ করছে তখন তো সেও নির্দোষ হতে পারে না।'

'সে সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

অপ্রয়োজনীয় আবেগের সঙ্গে নেখ্‌ল্যুদভ সমস্ত ঘটনাটা বিবৃত করল।

'বুঝলাম, প্রেসিডেণ্টের অবহেলার ফলে জুরিরা একটা অবিবেচনাপূর্ণ রায় দেওয়াতেই ব্যাপারটা ঘটেছে। কিন্তু এ ধরনের মামলার জন্য তো সেনেট রয়েছে।'

'সেনেট আপিল খারিজ করে দিয়েছে।'

'দেখ, সেনেট যদি খারিজ করে দিয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে আপিলের পক্ষে যথেষ্ট কারণ ছিল না,' রাগঝিন্‌স্কি বলল। স্পষ্টতই সেও এই প্রচলিত মতই পোষণ করে যে, সত্য আইনগত সিদ্ধান্তেরই ফল। 'সেনেট কোন মামলার ভাল-মন্দ বিচার করতে পারে না। সত্যি যদি ভুল হয়ে থাকে, তাহলে সম্রাটের কাছে দরখাস্ত করা উচিত।'

'সেটা করা হয়েছে, তবে তাতে কোন ফল হবার সম্ভাবনা নেই। তারা বিষয়টা মন্ত্রিসভার কাছে পাঠাবে, মন্ত্রিসভা সেনেটের সঙ্গে পরামর্শ করবে, সেনেট তার আগেকার সিদ্ধান্তই বহাল রাখবে এবং যথারীতি যে নির্দোষ সে শাস্তি ভোগ করবে।'

একটুখানি ক্ষমার হাসি হেসে রাগঝিন্‌স্কি বলল, 'প্রথমত, মন্ত্রিসভা সেনেটের সঙ্গে পরামর্শ করবে না! আদালতের কাছ থেকে মূল দলিল-পত্র চেয়ে পাঠাবে এবং তাতে কোন ভুল দেখতে পেলে তদনুসারে সিদ্ধান্ত নেবে। আর দ্বিতীয়ত, যে নির্দোষ সে কখনও শাস্তি পায় না; পেলেও সে ধরনের ঘটনা খুবই বিরল। যে দোষী সেই শাস্তি পায়।' আত্ম-তুষ্ট হাসির সঙ্গে বেশ ভেবে-চিন্তেই

রাগঝিন্স্কি কথাগুলি বলল।

ভগ্নিপতির উপর অসন্তুষ্ট হয়েই নেখ্লুদভ বলল, 'আমি কিন্তু উল্টোটাই বিশ্বাস করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আইনের বিধানে যাদের দণ্ড হয় তাদের একটা বড় অংশই নির্দোষ।'

'কোন্ অর্থে?'

'শব্দটার আক্ষরিক অর্থেই। এই নারী যেমন কাউকে বিষ খাওয়ানোর ব্যাপারে নির্দোষ, যে চাষীটি খুন না করেও দণ্ডিত হয়েছে তার মত নির্দোষ; যে অগ্নিকাণ্ড বাড়ির মালিক নিজেই ঘটিয়েছে সেই অপরাধে দণ্ডোন্মুখ মা ও ছেলের মত নির্দোষ।'

'দেখ, বিচারে ভুল-ভ্রান্তি তো হয়ই, ভবিষ্যতেও হবে। মানুষের গড়া কোন প্রতিষ্ঠানই পূর্ণ হতে পারে না।'

'তাছাড়া, যে সমাজে তারা মানুষ হয়েছে সেখানে যে সব কাজকে অন্যায় বলে মনে করা হয় সে রকম কিছু না করেও বহুলোক দণ্ডিত হয়েছে।'

'আমাকে ক্ষমা কর, সে রকমটা হয় না; প্রত্যেক চোরই জানে চুরি করা অন্যায়, আমাদের চুরি করা উচিত নয়—চুরি করাটা দুর্নীতি।' কথা বলার সময় রাগঝিন্স্কির মুখে ঈষৎ ঘৃণার যে হাসি ফুটে উঠল তা দেখে নেখ্লুদভ আরও চটে গেল।

'না, সে তা জানে না; তারা অবশ্য বলে, "চুরি করো না," কিন্তু সে তো জানে কারখানার মালিক কম মজুরি দিয়ে তার শ্রম চুরি করে; নানা রকম কর বসিয়ে কর্মচারিদের মারফৎ সরকার অনবরত তার টাকা লুঠ করে।'

শ্যালকের কথাগুলি বিশ্লেষণ করে রাগঝিন্স্কি শান্তভাবে বলল, 'আর, এ তো নৈরাজ্যবাদের কথা।'

নেখ্লুদভ বলতে লাগল, 'কিসের কথা আমি জানি না; আমি শুধু যা ঘটে তাই বলছি। সে জানে, সরকার তার প্রাপ্য লুঠ করে; দীর্ঘকাল ধরে জমিদার তার প্রাপ্য লুঠ করে আসছে, যে জমি সকলের সম্পত্তি হওয়া উচিত তা থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে; আর তারপরে আগুন জ্বালাবার জন্য সেই চুরি-করা জমি থেকে সে যদি গাছের পাতা কুড়োয় বা ডাল ভাঙে, তাহলেই তাকে আমরা জেলে পাঠাই এবং তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি যে সেই চোর। অবশ্য সে জানে, যারা তার জমি লুঠ করে নিয়েছে তারাই চোর, সে নয়, এবং সেই চোরাই মালের কিছুটা পুনরুদ্ধার করা পরিবারের প্রতি তার পবিত্র কর্তব্য।'

'আমি বুঝতে পারছি না, আর বুঝতে পারলেও একমত হতে পারছি না। জমি তো কারও না কারও সম্পত্তি হবেই। তাকে যদি আজ সমানভাবে ভাগ করে দাও—', রাগঝিন্স্কি ধীরে ধীরে বলতে লাগল। তার নিশ্চিত ধারণা, নেখ্লুদভ একজন সমাজবাদী, জমির সম-বণ্টন সমাজবাদেরই দাবী,

সম-বণ্টন ব্যবস্থা খুবই বোকামি, আর সে কথা সে সহজেই প্রমাণ করে দিতে পারে। 'আজ যদি জমিকে সমান ভাবে ভাগ করে দাও, কালই আবার সে জমি পরিশ্রমী ও কৌশলী লোকদের হাতে গিয়ে পড়বে।'

'জমির সম-বণ্টনের কথা তো ভাবা হচ্ছে না। জমি কারও সম্পত্তি হওয়া উচিত নয়; তা নিয়ে কেনা, বেচা বা ভাড়া খাটানো চলবে না।'

'সম্পত্তিতে মানুষের অধিকার জন্মগত; এ অধিকার না থাকলে জমি চাষ করবার কোন প্রেরণাই থাকত না। সম্পত্তির অধিকার ধ্বংস কর, দেখবে আমরা বর্বরতার যুগে ফিরে গেছি।, রাগঝিন্‌স্কি খুব জোর দিয়ে কথাগুলি বলল। জমির ব্যক্তিগত মালিকানার সপক্ষে যে সব যুক্তিকে অখণ্ডনীয় বলে মনে করা হয় সেই প্রচলিত যুক্তিগুলিরই পুনরাবৃত্তি সে করে গেল।

'ঠিক উল্টো। জমি যখন কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না তখন আর কোন জমিই পতিত পড়ে থাকবে না যেমন এখন থাকে; আর তার কারণ জমিদাররা এখন নিজেরাও জমি চষতে পারে না, আবার যারা চাষ করতে পারে তাদেরও চাষ করতে দেয় না।'

'কিন্তু দিমিত্র আইভানভিচ, তুমি যা বলছ এতো নিছক পাগলামি। এ যুগে কি জমিদারি লোপ করা সম্ভব? আমি জানি, এটা তোমার পুরনো নেশা। তবু আমি তোমাকে খোলাখুলিই বলছি', বলতে বলতে রাগঝিন্‌স্কির মুখ ম্লান হয়ে উঠল,তার গলা কাঁপতে লাগল—বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার আগে সমস্যাটাকে তলিয়ে ভেবে দেখে, এই আমার পরামর্শ।'

'আপনি কি আমার ব্যক্তিগত বিষয়ের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। আমি মনে করি, যে বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আমরা মানুষ হই সেই অবস্থা থেকে উদ্ভূত দায়িত্বও আমাদের অবশ্যই পালন করতে হবে। আমার সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত: আমি যা আয় করি তাতে আমাদের আরামে চলে যায়; আমি আশা করি তাতে আমার সন্তানদের জীবনও আরামেই কাটবে। কাজেই তোমার কৃতকর্মের ব্যাপারে—আমি মনে করি কাজটা মোটেই সুবিবেচিত হয় নি—আমার আগ্রহ কোন রকম ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত নয়; নীতিগতভাবেই আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। তাই আমার পরামর্শ, সব ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখ, ভাল করে পড়াশুনা করে—'.

নেখ্‌লয়ুদভ ম্লান মুখে বলল,'দয়া করে আমার ব্যাপার আমাকেই মেটাতে দিন, আর আমি কি পড়ব না পড়ব সেটাও আমাকেই ঠিক করতে দিন।' নেখ্‌লয়ুদভ বুঝতে পারল তার হাত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, নিজেকে সে আর সংযত রাখতে পারছে না। তাই কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে সে চা খেতে শুরু করল।

অধ্যায়—৩৩

অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে নেখ্‌ল্যুদভ দিদিকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার ছেলে-মেয়েরা কেমন আছে?'

দিদি জানাল, তারা তাদের ঠাকুরমার কাছে আছে। আরও বলল, ছেলে-বেলায় তুমি যেমন একটা নিগ্রো ও একটা ফরাসি বৌ-পুতুল নিয়ে খেলা করতে, আমরা চলে আসার পরে তারাও তেমনি খেলা করছে।

নেখ্‌ল্যুদভ হেসে বলল, 'সত্যি সে সব তোমার মনে আছে?'

'হ্যাঁ; আরও ভেবে দেখ, তারাও ঠিক সেই একই রকম খেলা খেলে।'

ভগ্নিপতি ও নেখ্‌ল্যুদভের মধ্যে তখন অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে লাগল। এক সময়ে বিচারের প্রসঙ্গ উঠলে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'ন্যায়-বিচার কি আইনের লক্ষ্য?'

'তাছাড়া আর কি হতে পারে?'

'কেন? শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষা করা। আমি মনে করি, আমাদের শ্রেণীর সুবিধার জন্য প্রচলিত ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখার যন্ত্র হল আইন।'

শান্ত হাসির সঙ্গে রাগঝিন্‌স্কি বলল, 'এটা কিন্তু খুব নতুন কথা। সাধারণের ধারণা, আইনের লক্ষ্য সম্পূর্ণ আলাদা।'

'হ্যাঁ, নীতিগতভাবে তাই, কিন্তু আমি তো দেখেছি বাস্তবে তা নয়। আইনের একমাত্র লক্ষ্য বর্তমান ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখা; তাই যে সব সাধারণের চাইতে উঁচু স্তরের মানুষ সে ব্যবস্থাকে পাল্টাতে চায়—যেমন তথা-কথিত রাজনৈতিক অপরাধীরা—এবং যারা আরও নীচু স্তরের মানুষ—যেমন তথাকথিত অপরাধপ্রবণ লোকরা—আইন তাদেরই শাস্তি দেয়।'

'তোমার সঙ্গে আমি একমত নই। প্রথমত, রাজনৈতিক শ্রেণীভুক্ত অপরাধীদের উঁচু স্তরের মানুষ বলেই শাস্তি দেওয়া হয় এটা আমি স্বীকার করি না। অনেকক্ষেত্রেই তারা সমাজের আবর্জনা; ভিন্ন রূপে হলেও যাদের তুমি নীচু স্তরের অপরাধী বলছ তাদের মতই বিকৃতবুদ্ধি।'

'কিন্তু আমি এমন লোকদের জানি যারা নৈতিক বিচারে তাদের বিচারকদের চাইতে অনেক উঁচু; ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরা নীতিবাদী, দৃঢ়চিত্ত—'

রাগঝিন্‌স্কি কথা বলার সময় বাধাপ্রাপ্ত হতে অভ্যস্ত নয়। নেখ্‌ল্যুদভের কথায় কান না দিয়েই সে কথা বলে চলল।

'বর্তমান ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখাই আইনের লক্ষ্য, একথাও আমি স্বীকার করি না। আইনের লক্ষ্য সংস্কার করা—'

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'কারাগারে ঢুকিয়ে সংস্কার, চমৎকার!'

রাগঝিন্‌স্কি নিজের কথাই বলে চলল, 'অথবা যে সব বিকৃতবুদ্ধি ও

পশুভাবাপন্ন মানুষ সমাজকে বিপন্ন করে তোলে তাদের বিতাড়িত করা।'

'ঠিক সেইটেই সে করে না। এর কোনটা করার শক্তিই সমাজের নেই।'

জোর করে মুখে হাসি এনে রাগঝিন্স্কি বলল, 'তা কি করে হয়? আমি বুঝতে পারি না।'

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'আমি বলতে চাই, যুক্তিসম্মত শাস্তি মাত্র দু' রকমের হতে পারে, যেমন আগেকার দিনে ছিল : দৈহিক শাস্তি ও মৃত্যুদণ্ড; সমাজ যতই মানবিক হয়ে উঠছে এ দুটো ব্যবস্থাও ততই লোপ পেতে চলেছে।'

'সত্যি, তোমার মুখে এ সব কথা বেশ নতুন ও আশ্চর্যজনক।'

'হ্যাঁ, একটা লোককে শারীরিক আঘাত দেওয়া যুক্তিসম্মত যাতে সে ভবিষ্যতে অনুরূপ কাজ না করে; আর একটা লোক যখন সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে তখন তার মাথাটা কেটে ফেলাও যুক্তিযুক্ত। এসব শাস্তির তবু অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু কাজের অভাবে এবং খারাপ দৃষ্টান্তের ফলে বিকৃতবুদ্ধি একটি লোককে কারাগারে বন্দী করে রাখার অর্থ কি? কারাগারে তার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা, তার উপরে একটা অলস জীবন চাপিয়ে দেওয়া এবং অত্যন্ত বিকৃতবুদ্ধি সব মানুষের মধ্যে তাকে ঠেলে দেবারই বা অর্থ কি? জনসাধারণের টাকায় (জনপ্রতি ব্যায় হয় পাঁচশ' রুবলেরও বেশী) একটা লোককে তুলা থেকে ইর্কুতস্ক জেলায় চালান দেওয়া, অথবা কুর্স্ক থেকে—'

'হ্যাঁ, জনসাধারণের টাকায় হলেও, এই সব পথ চলাকে লোকে ভয় করে, এবং দীর্ঘ পথচলা ও কারাগার না থাকলে, তুমি আমি আজ এখানে এ ভাবে বসে থাকতে পারতাম না।'

'কিন্তু কারাগার তো আমাদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে পারে না, কারণ সেই সব লোক সেখানে চিরকাল থাকে না, তাদের আবার ছেড়ে দেওয়া হয়। বরং এই সব জায়গায় মানুষকে সব চাইতে বেশী পাপ ও অধঃপতনের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়; কাজেই বিপদ আরও বাড়ে।'

'তুমি তাহলে বলতে চাও যে, কারা-ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করা দরকার?'

'তার কোন উন্নতি হতে পারে না। উন্নত ধরনের কারাগার মানেই বর্তমান জন-শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তার চাইতেও অধিক অর্থব্যয় এবং জনসাধারণের ঘাড়ে আরও বোঝা চাপিয়ে দেওয়া।'

শ্যালকের কথায় কান না দিয়ে রাগঝিন্স্কি বলল, 'কিন্তু কারা-ব্যবস্থার ত্রুটি তো আইনকে অসিদ্ধ করতে পারে না।'

আরও গলা তুলে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'এ সব ত্রুটির কোন প্রতিকার নেই।'

রাগঝিন্স্কি মন্তব্য করল, 'তাহলে? তাদের স্রেফ মেরে ফেলা হবে? বা কোন কূটনীতিক যেমন প্রস্তাব করেছেন, লোকের চোখ উপড়ে নেওয়া হবে?'

'হ্যাঁ, কাজটা খুব নিষ্ঠুর হলেও ফলপ্রসূ হবে। এখন যা করা হয় তাও

নিষ্ঠুর, এবং শুধু যে অফলপ্রসূ তাই নয়, সেটা এতদূর বোকামি যে বুদ্ধিমান লোকরা কেমন করে যে ফৌজদারি আইনের মত একটা অবাস্তব ও নিষ্ঠুর কাজের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করে তা তো বুঝতে পারি না।'

বিবর্ণ মুখে রাগঝিন্স্কি বলল, 'কিন্তু আমিও তো ঐ কাজের সঙ্গেই জড়িত।'

'সেটা আপনার ব্যাপার। আমার কাছে এটা দুর্বোধ্য।'

কাঁপা গলায় রাগঝিন্স্কি বলল, 'আমার মনে হয়, অনেক ভাল জিনিসই তোমার কাছে দুর্বোধ্য।' সে উঠে দাঁড়াল।

নেখ্‌ল্যুদভের চোখে পড়ল, ভগ্নিপতির চশমার নীচে কি যেন চিকচিক করছে। 'চোখের জল কি?' সে ভাবল। চোখের জলই বটে, তবে আহত গর্বের অশ্রু। জানালার কাছে গিয়ে রাগঝিন্স্কি রুমাল বের করে একটু কেশে চশমা মুছল এবং পরে চশমা খুলে নিয়ে চোখ মুছল।

সোফায় ফিরে গিয়ে একটা সিগার ধরাল। আর কোন কথাই বলল না।

ভগ্নিপতি ও দিদিকে এতখানি আঘাত দেওয়ায় নেখ্‌ল্যুদভ দুঃখিত হল, লজ্জাবোধ করল; বিশেষ করে যখন পরের দিনই সে চলে যাচ্ছে এবং আর কোন দিনই তাদের সঙ্গে দেখা হবে না।

বিচলিতভাবে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে বাড়ি ফিরে গেল।

সে ভাবতে লাগল, 'হয় তো আমি যা কিছু বলেছি সবই সত্য—অন্তত তিনি তো কোন জবাব দেন নি। কিন্তু কথাগুলি বলা ঠিক হয় নি। তাদের প্রতি বিরক্তিবশত আমি যখন তাকে এবং বেচারি নাতালিয়াকে দুঃখ দিতে, আঘাত করতে পেরেছি, তখন বুঝতে হবে আমি সত্যি বদলে গেছি।'

অধ্যায়—৩৪

যে কয়েদীদের দলে মাসলভা ছিল তারা বেলা তিনটের ট্রেনে মস্কো ছাড়বে; কাজেই কয়েদীদের যাত্রারম্ভের সময় উপস্থিত থেকে তাদের সঙ্গে স্টেশনে যাবার উদ্দেশ্যে নেখ্‌ল্যুদভ বেলা বারোটার আগেই কারাগারে পৌছবে স্থির করল।

গত রাত্রে জিনিসপত্র গুছিয়ে কাগজপত্র বেছে নেবার সময় দিন-পঞ্জীটা হাতে পড়ল। পাতা উল্টে এখানে-সেখানে কিছুটা কিছুটা পড়ল। পিতার্সবার্গ যাবার আগে দিন-পঞ্জীতে শেষ লিখেছিল; 'আমার ত্যাগকে কাত্যুশা গ্রহণ করতে চায় না; সে নিজেই ত্যাগ করতে চায়। সে বিজয়িনী হয়েছে, আর আমিও বিজয়ী হয়েছি। যদিও আমার বিশ্বাস করতে ভয় হয় তবু তার মধ্যে যে আন্তর-পরিবর্তন শুরু হয়েছে তাতেই আমি সুখী। বিশ্বাস করতে আমার ভয় হলেও মনে হয় সে আবার জীবনের পথে ফিরে আসছে।' সে আরও পড়তে লাগল। 'অত্যন্ত কঠোর অথচ অত্যন্ত আনন্দময় অবস্থার ভিতর দিয়ে

আমি চলেছি। যখন শুনলাম, হাসপাতালে সে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে, তখন হঠাৎ মনে খুব ব্যথা পেয়েছিলাম। এটা যে এতদূর বেদনাদায়ক হতে পারে তা আগে বুঝতে পারি নি। মনে বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা নিয়ে তার সঙ্গে কথা বললাম। তখনি হঠাৎ মনে পড়ে গেল, যে অপরাধের জন্য তাকে আমি ঘৃণা করছি, অন্ততঃ চিন্তায়ও আমি নিজেও তো সে অপরাধ কতবার করেছি এবং এখনও করে চলেছি! তৎক্ষণাৎ আমি নিজের উপর বিরক্ত হয়ে উঠলাম; তার প্রতি মনে করুণ জাগল; আবার আমি সুখী হলাম। সময় মত নিজেদের বড় বড় দোষগুলি চোখে পড়লে আমরা অন্যের প্রতি কত সদয়ই না হতে পারি।' এ পর্যন্ত পড়ে সে নতুন করে লিখল: 'নাতালিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আত্ম-তুষ্টি আবার আমাকে নির্মম করে তুলেছিল, অন্যকে আঘাত করতে প্ররোচিত করেছিল। মন এখনও ভারি হয়ে আছে। কোন উপায় নেই। আগামীকাল শুরু হবে নতুন জীবন। পুরনো জীবনকে জানাব শেষ বিদায়! অনেক নতুন ধারণা মনের মধ্যে জমে উঠেছে, কিন্তু এখনও তাদের একসূত্রে বাঁধতে পারছি না।'

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙবার পরে প্রথমেই ভগ্নিপতির প্রতি গতকালের আচরণের জন্য নেখ্‌ল্যুদভের মনে অনুশোচনা দেখা দিল।

সে ভাবল, 'এ ভাবে আমি চলে যেতে পারি না। এখনই গিয়ে তাদের সঙ্গে মিটমাট করে আসব।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, সেখানে যাবার সময় নেই। কয়েদীদলের যাত্রার সময় সেখানে উপস্থিত থাকতে হলে তাকে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করতে হবে। অতি দ্রুত জিনিসপত্র ঠিক করে একটি চাকর ও ফেদসিয়ার স্বামী তারাসকে দিয়ে সেগুলি স্টেশনে পাঠিয়ে দিল এবং প্রথম যে ইজভজচিকটা পেল তাতেই চড়ে কারাগারের দিকে অগ্রসর হল।

যে ট্রেনে সে যাবে তার মাত্র দু'ঘণ্টা আগে কয়েদীদের ট্রেনটা ছাড়বে। কাজেই নেখ্‌ল্যুদভ লজিং-এর পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে চিরদিনের মত সেখানে থেকে বিদায় নিল।

তখন জুলাই মাস। আবহাওয়া অসহ্য গরম। রাজপথের পাথর, দেয়াল ও ছাদের লোহা সারা রাত গুমোটের জন্য মোটেই ঠাণ্ডা হয় নি; তার থেকে নিশ্চল বাতাসে যেন আগুনের হলকা বয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দু'একটা ঈষৎ ঠাণ্ডা বাতাস বইলেও তার ফলে ধুলো ও তেল-রঙের গন্ধভরা গরম বাতাসের ঝাপটা এসে গায়ে লাগছে।

রাস্তায় লোকজন খুব কম। যারা আছে তারাও ছায়ার দিকটা দিয়েই চলতে চেষ্টা করছে। শুধু রোদে-পোড়া তামাটে মুখের চাষীরা বাকলের জুতো পরে রাস্তা মেরামত করছে; রোদ্দুরে বসে তারা তপ্ত বালুর মধ্যে পাথর বসাবার জন্য হাতুড়ি পিটছে। বিষণ্ণ পুলিশরা রাস্তার মাঝখানে

দাঁড়িয়ে আছে, আর ঘোড়ায় টানা ট্রামগুলো ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে রৌদ্রদগ্ধ পথ দিয়ে আসা-যাওয়া করছে।

নেখ্‌ল্যুদভ যখন কারাগারে পৌঁছল, কয়েদীরা তখনও প্রাঙ্গণ ছেড়ে যায় নি। কয়েদীদের ছেড়ে দেওয়া ও বুঝে নেওয়ার ঝঞ্ঝাটপূর্ণ কাজটা শুরু হয়েছিল ভোর চারটের সময়, সে এখনও চলেছে। দলে আছে ছ' শ' তেইশজন পুরুষ ও চৌষট্টিজন স্ত্রীলোক। তাদের সকলকে গুণতে হবে, রেজিস্ট্রি-তালিকার সঙ্গে মেলাতে হবে, রুগ্ন ও দুর্বলদের আলাদা করতে হবে এবং তারপর সকলকে 'কনভয়' (সহগামী রক্ষিদল)-এর হাতে তুলে দিতে হবে। দু'জন সহকারী সহ নতুন ইন্সপেক্টর, ডাক্তার, তার সহকারী, কনভয়-অফিসার ও করণিক সকলেই কারাপ্রাঙ্গণে দেয়ালের ছায়ায় লেখার সরঞ্জাম ও কাগজপত্র বোঝাই একজন একটা টেবিলে বসে আছে। তারা একজন একজন করে কয়েদীদের ডাকছে, পরীক্ষা করছে, প্রশ্ন করেছে, আর মন্তব্য লিখছে।

রোদ ক্রমে টেবিলে এসে পড়ল। একে বাতাস নেই, তাতে একগাদা কয়েদীর নিঃশ্বাস, জায়গাটা অসহ্য গরম হয়ে উঠেছে।

'হায় ভগবান, এর কি আর শেষ হবে না!' কনভয়-অফিসারটি চেঁচিয়ে উঠল। ঢ্যাঙা, মোটা, লাল-মুখ লোকটির কাঁধ দুটি চওড়া, হাত দুখানি ছোট। ঘন গোঁফের ভিতর দিয়ে অবিরাম সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। 'আপনারা কি আমাকে মেরে ফেলবেন? এতসব জুটিয়েছেন কোত্থেকে? আরও অনেক বাকি আছে নাকি?'

করণিক তালিকাটা দেখল।

'আরও চব্বিশটি পুরুষ-কয়েদী আছে; তাছাড়া মেয়ে-কয়েদী তো আছেই।'

বাকি কয়েদীরা সার ধরে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দিকে তাকিয়ে কনভয়-অফিসার হাঁক দিল, 'ওখানে সব দাঁড়িয়ে আছ কেন? চলে এস।' তিন ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে কয়েদীরা গাদাগাদি করে প্রচণ্ড রোদ্দুরে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, কখন কার ডাক আসবে সেই আশায়।

কারা-প্রাঙ্গণে যখন এই সব চলছিল তখন ফটকের বাইরে (একজন রাইফেলধারী শাস্ত্রী তো যথারীতি দাঁড়িয়েই ছিল) কয়েদীদের মালপত্র এবং যে সব কয়েদী হেঁটে যেতে পারবে না তাদের বয়ে নিয়ে যাবার জন্য খান বিশেক গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। এককোণে দাঁড়িয়েছিল কয়েদীদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব; কয়েদীরা যখন বেরিয়ে আসবে তখন তাদের একবার দেখতে পাবার এবং সুযোগ পেলে দুটো কথা বলার ও কিছু জিনিসপত্র দেবার আশায়।

সেই দলের মধ্যে নেখ্‌ল্যুদভও জায়গা করে নিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়াবার পর শোনা গেল শিকলের ঝন্‌ঝন্‌, পা ফেলার শব্দ, কর্তৃপক্ষের হাঁক-ডাক, কাশির শব্দ ও অনেক মানুষের কল-গুঞ্জন।

এই চলল প্রায় পাঁচ মিনিট। এর মধ্যে কয়েকটি রক্ষী বার বার ফটক দিয়ে আসা-যাওয়া করল। তারপর শোনা গেল আদেশ।

ফটকটা সশব্দে খুলে গেল। শিকলের ঝনাৎকার উচ্চতর হল, কনভয়ের সাদা কোর্তা পরা রাইফেলধারী রক্ষীদল রাজপথে বেরিয়ে এসে ফটকের সামনে গোল হয়ে দাঁড়াল। এইটেই প্রচলিত ব্যবস্থা। তখন আর একটা আদেশ ধ্বনিত হল। সঙ্গে সঙ্গে জোড়ায়-জোড়ায় কয়েদীরা বেরিয়ে আসতে লাগল। তাদের কামানো মাথায় চ্যাপ্টা টুপি, কাঁধে ঝোলা। এক হাতে ঝোলাটা ধরে অন্য হাত ঝোলাতে ঝোলাতে শিকলে বাঁধা পা টেনে টেনে তারা বেরুতে লাগল।

প্রথমে এল সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীরা। সকলের একই পোশাক—ধূসর ট্রাউজার ও আলখাল্লা, পিঠের উপর নম্বর-মারা। যুবক ও বৃদ্ধ। সরু ও মোটা, ফ্যাকাসে, লাল ও কালো, দাড়িওয়ালা ও দাড়িবিহীন, রুশ, তাতার ও ইহুদি—সকলেই শিকলের শব্দ করে সবেগে হাত দোলাতে দোলাতে এমনভাবে বেরিয়ে এল যেন তারা দীর্ঘ পথের যাত্রী, কিন্তু দশ পা যাবার পরেই তাদের থামিয়ে দেওয়া হল; তারাও একান্ত অনুগতভাবে চারজন করে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে আরও মাথা কামানো লোক দলে দলে বেরিয়ে এল। তাদেরও একই পোশাক, শুধু পায়ে শিকল নেই, কিন্তু দু'জনে করে এক সঙ্গে হাতে-হাত কড়া লাগানো। এদের হয়েছে নির্বাসনদণ্ড। তারা ঐ একইভাবে দ্রুতগতিতে এসেই হঠাৎ থেমে গেল এবং চারজন করে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর এল সেই সব কয়েদী যারা তাদের কম্যুন কর্তৃক নির্বাসিত হয়েছে।

তারপর সেই একই পর্যায়ক্রমে এল নারী-কয়েদীরা প্রথমে, সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিতরা, তাদের পরনে ধূসর আলখাল্লা ও রুমাল; তারপর নির্বাসিত নারী ও যে সব স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বামীর অনুগমন করে চলেছে তারা, তাদের পরনে নিজ নিজ গ্রাম বা শহরের পোশাক। কারও বা কোলে শিশু-সন্তান।

স্ত্রীলোকদের সঙ্গে এসেছে ছোট ছেলে-মেয়ে ও বালক-বালিকা; একদল ঘোড়ার বাচ্চার মত তারা কয়েদীদের পিছু পিছু চলেছে।

পুরুষরা নীরবেই দাঁড়িয়ে আছে; মাঝে মাঝে একটু কাশছে, বা দু' একটা সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করছে।

কিন্তু মেয়েরা অনবরত বকে চলেছে। নেখ্‌লয়ুদভের মনে হল, সে যেন একবার মাসলভাকে দেখতে পেল, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। তার চোখের সামনে শুধু একদল ধূসর জীববিশেষ—তাদের মানবিকতার বিশেষ করে নারীত্বের লক্ষণমাত্র নেই। পিঠের উপর বোঁচকা ও চারদিকে ছেলেমেয়ে নিয়ে পুরুষদের পিছনে তারাও দাঁড়িয়ে পড়ল।

কারা-প্রাচীরের ভিতরে যদিও কয়েদীদের একবার গুণতি করা হয়েছে, তবু কনভয় আর একবার তাদের গুণে তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে নিল। এতে অনেক

সময় লাগল। বিশেষ করে কিছু কয়েদী চলাফেরা করে জায়গা বদল করায় কনভয়ের হিসাবে গোলমাল পাকিয়ে দেওয়ায় সময় আরও বেশী লাগল।

কনভয়ের সৈন্যদল কয়েদীদের ধাক্কা দিয়ে দিয়ে আর একবার গুণে নিল। সব গুণতি শেষ হয়ে গেলে অফিসার যাত্রার আদেশ দিতেই হৈ-চৈ লেগে গেল। পুরুষ, নারী, বাচ্চা সকলেই বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে যে যার আগে পারে গাড়িতে উঠতে লাগল। স্ত্রীলোকদের কোলে শিশুরা কাঁদছে, একটু বড় ছেলেমেয়েরা জায়গার জন্য কাড়াকাড়ি করছে, আর পুরুষরা বিষণ্ণ মনে গাড়িতে উঠছে।

কিছু কয়েদী মাথার টুপি খুলে অফিসারের কাছে কি যেন অনুনয়-বিনয় করতে লাগল। নেখ্‌ল্যুদভ বুঝতে পারল, তারা গাড়িতে একটুখানি জায়গা চাইছে। অফিসারটি এক-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে এমনভাবে হাত ছুঁড়তে লাগল যে কয়েদীরা ভয়ে সরে গেল।

অফিসার চেঁচিয়ে বলল, 'তোদের এমন গাড়ি চড়াব যে চিরদিন মনে থাকবে। যা, যা, হেঁটে চলে যা।'

শুধু একটি লোককে অনুমতি দেওয়া হল। লোকটি বুড়ো, পায়ে শিকল পরানো। ভারী শিকল নিয়ে সে পা দুটো তুলতেও পারছিল না। পাশ হতে একটি স্ত্রীলোক হাত ধরে তাকে গাড়িতে তুলে নিল।

সব মালপত্র ও লোকজন ওঠানো হয়ে গেলে অফিসার মাথার টুপি খুলে কপাল, টাক-মাথা ও লাল ঘাড়টা মুছে একটা ক্রশ-চিহ্ন আঁকল।

'আগে বাড়।' সে যাত্রার আদেশ দিল।

সৈন্যদের রাইফেলে খটখট শব্দ উঠল, কয়েদীরা টুপি খুলে ক্রশ-চিহ্ন আঁকল, যারা দেখা করতে এসেছিল তারা চীৎকার করে কি যেন বলতে লাগল, আর কয়েদীরাও প্রত্যুত্তরে কি সব বলল। সৈন্য পরিবৃত হয়ে একদল শিকল-পরা লোক পায়ে পায়ে ধুলো উড়িয়ে এগিয়ে চলল। প্রথমে সৈন্যদল; তারপর শিকল-পরা সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীরা; তারপর নির্বাসিত ও কম্যুন-কর্তৃক দণ্ডিত দু'জন করে হাত-কড়া লাগানো কয়েদীরা; তারপর মেয়েরা। তাদের পিছনে বোঁচকা-বুঁচকি বোঝাই গাড়িতে করে চলল দুর্বল কয়েদীরা। গাড়িতে বসে একটি স্ত্রীলোক সমানে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

অধ্যায়—৩৫

•

কয়েদীদের সারিটা এতই লম্বা হয়েছিল যে সামনের লোকজনরা যখন চোখের আড়ালে চলে গেল, মালপত্র ও দুর্বল কয়েদী বোঝাই গাড়িগুলো তখন সবে চলতে শুরু করল। শেষ গাড়িটা ছেড়ে দিলে নেখ্‌ল্যুদভ অপেক্ষমান ইজভজচিককে বলল গাড়ি চালিয়ে সামনের কয়েদীদের ধরে ফেলতে; তাহলেই দলে কোন পরিচিত কেউ থাকলে তার নজরে পড়বে এবং মাসলভাকে খুঁজে

পেয়ে পাঠানো জিনিসগুলো সে পেয়েছে কিনা সেটা জানবার চেষ্টাও করতে পারবে।

দিনটা অত্যন্ত গরম। একেবারেই বাতাস নেই। এক হাজার পায়ে পায়ে ধুলোর মেঘ উঠে রাস্তার মাঝখান দিয়ে এগিয়েচলা কয়েদীদের মাথার উপর ঝুলে রয়েছে। কয়েদীরা বেশ দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলেছে, কাজেই তাদের ধরে ফেলতে ধীর-গতি ইজভজচিকের ঘোড়াটার বেশ কিছু সময় লাগল। তারা একের পর এক সেই অপরিচিত ভীষণ-দর্শন কয়েদীদের দলকে পার হয়ে গেল, কিন্তু নেখ্‌লয়ুদভ তাদের কাউকে চিনতে পারল না।

সকলেরই একরকম পোশাক। পায়ে একরকম জুতো। খালি হাতটা দোলাতে দোলাতে পা ফেলে ফেলে তারা এগিয়ে চলেছে। তারা সংখ্যায় এত বেশী, দেখতে এতই এক রকম, আর এমন অদ্ভুত অস্বাভাবিক অবস্থায় তাদের ফেলা হয়েছে যে নেখ্‌লয়ুদভের মনে হল ওরা মানুষ নয়, অন্য কোন ভয়ংকর জীব। এই দলের মধ্যে যখন সে খুনী ফিয়দরভকে, নির্বাসিত ওখোতিন্‌কে এবং তার সাহায্যপ্রার্থী অপর একজন ভবঘুরেকে দেখতে পেল, তখন তার মনের এই ভাব কেটে গেল। তার গাড়িটা যখন পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন কয়েদীরা সকলেই গাড়িটার দিকে এবং ভিতরে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটিকে দেখছিল। ফিয়দরভ যে তাকে চিনতে পেরেছে সেটা বোঝাবার জন্য মাথাটাকে পিছন দিকে হেলিয়ে দিল, ওখোতিন্ একটু চোখটা টিপল, কিন্তু কেউই অভিবাদন করল না; হয় তো তারা মনে করেছে, এ অবস্থায় অভিবাদন করা চলে না।

মেয়েদের কাছে পৌঁছেই নেখ্‌লয়ুদভ মাসলভাকে চিনতে পারল। সে দ্বিতীয় সারিতে ছিল। তাদের সারির প্রথমে ছিল একাট খাটো পা, কালো চোখ, বীভৎস মেয়েমানুষ, আলখাল্লাটাকে সে কোমরে গুঁজে নিয়েছে। তার নাম খরলাভ্‌কা। দ্বিতীয় একটি গর্ভবতী স্ত্রীলোক, অতিকষ্টে সে নিজেকে টেনে নিয়ে চলেছে। মাসলভা তৃতীয়; কাঁধে বোঁচকা নিয়ে সে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখ শান্ত ও সংকল্পে দৃঢ়। সারির চতুর্থ জন একটি সুন্দরী তরুণী; পরনে খাটো আলখাল্লা, মাথায় চাষীদের মত করে রুমাল বাধা; বেশ তেজের সঙ্গে হাঁটছে। সেই ফেদসিয়া।

নেখ্‌লয়ুদভ গাড়ি থেকে নেমে মেয়েদের দিকে এগিয়ে গেল। মনের ইচ্ছা, মাসলভাকে জিজ্ঞাসা করবে পাঠানো জিনিসগুলো পেয়েছে কিনা এবং তার কেমন লাগছে। কনভয়-সার্জেণ্টটি সেই দিক ধরেই হাঁটছিল। তাকে দেখেই সে ছুটে এল।

'এ কাজ করবেন না স্যার। দলের কারও সঙ্গে কথা বলা নিয়মবিরুদ্ধ।'

কিন্তু নেখ্‌লয়ুদভকে চিনতে পেরে (কারাগারের সকলেই তাকে চিনত) সার্জেণ্টটি তার কাছে এসে টুপিতে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, 'এখন নয় স্যার;

রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করুন ; এখানে দেখা করতে দেওয়া হয় না। এই —পিছিয়ে থেক না, আগে বাড় !' কয়েদীদের উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে পায়ে সুদৃশ্য নতুন জুতো থাকা সত্ত্বেও সেই প্রচণ্ড গরমে একলাফে সে তার জায়গায় ফিরে গেল।

নেখ্‌লুদভ পাশের ফুটপাথে উঠে গেল এবং ইজভজচিককে পিছন পিছন আসতে বলে পায়ে হেঁটে এগোতে লাগল। কয়েদীর দল যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেখানেই আতংক ও সমবেদনা-মিশ্রিত দৃষ্টিতে সকলে তাদের দেখছে। গাড়ি করে যারা যাচ্ছে তারা মুখ বাড়িয়ে যতদূর দেখা যায় তাদের দেখছে। পদযাত্রীরা দাঁড়িয়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখছে। কেউ এগিয়ে এসে কয়েদীদের ভিক্ষা দিচ্ছে, কনভয়ের লোকেরাই সেগুলি নিয়ে নিচ্ছে। অনেকে আবার মোহাচ্ছন্নের মত কয়েদীদের পিছনে চলতে লাগল ; তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে মাথা নেড়ে হাঁ করে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। সর্বত্রই মানুষ ফটকে ও দরজায় এসে দাঁড়াল, হাঁক দিয়ে অন্যদের ডাকল, অথবা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এই ভীতিপ্রদ লোকযাত্রা দেখতে লাগল।

অধ্যায়—৩৬

কয়েদীদের দ্রুতগতির সঙ্গে তাল রেখেই নেখ্‌লুদভ এগোতে লাগল। হাল্কা জামা-কাপড়েও তার ভীষণ গরম লাগছিল ; দমবন্ধ করা, নিশ্চল, ধুলো-ভরা জ্বলন্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতেও বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

সিকি মাইলটাক হাঁটবার পরে সে আবার গাড়িতে উঠে বসল। কিন্তু রাস্তার মাঝখানে বলে সেখানে গরম আরও বেশী। গত রাতে ভগ্নিপতির সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল সেটা মনে পড়ল ; কিন্তু সকলের মত এখন আর সেরকম উত্তেজনা বোধ করল না। কয়েদীদের যাত্রা ও পথ চলা, এবং বিশেষ করে এই অসহ্য গরম সে সব কিছু ঢেকে দিয়েছে।

ফুটপাথের উপরে একটা বেড়ার উপর থেকে ঝুঁকেপড়া গাছের ছায়ায় দুটি স্কুলের ছাত্র একজন বরফওয়ালার সামনে দাঁড়িয়েছিল। একজন একটা বরফ খাচ্ছিল, আর একজনের জন্য সে সরবত তৈরি করছিল।

কিছু পানীয়ের প্রয়োজন বোধ করায় নেখ্‌লুদভ ইজভজচিককে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কিছু পানীয় কোথায় পাওয়া যাবে ?'

'কাছেই একটা ভাল জায়গা আছে,' বলে ইজভজচিক মোড় ঘুরে মস্ত বড় সাইনবোর্ড লাগানো একটা দরজার সামনে তাকে নিয়ে গেল।

এক বোতল সোডার জলের অর্ডার দিয়ে নেখ্‌লুদভ ময়লা চাদরে ঢাকা একটা ছোট টেবিলে গিয়ে বসল। আর একটা টেবিলে দুটো লোক চা ও একটা সাদা বোতল সামনে নিয়ে বসে ছিল। তাদের একজনের রং ময়লা,

মাথায় টাক, আর পিছনের দিকে অল্প কিছু চুল। অনেকটা রাগঝিনৃস্কির মত। তাকে দেখেই গতকাল ভগ্নিপতির সঙ্গে তার যে সব কথা হয়েছিল সেগুলি মনে পড়ে গেল, আর অমনি বোন ও ভগ্নিপতির সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা তার মনে জাগল।

সে ভাবল, 'ট্রেন ছাড়বার আগে তো আর সে সময় হবে না। তার চাইতে একটা চিঠি লিখি।' কাগজ, খাম ও টিকিট চেয়ে নিয়ে গ্নাসে চুমুক দিতে দিতে সে ভাবতে লাগল কি লিখবে। মাথায় এলোমেলো চিন্তা ঢোকায় চিঠির বয়ান কিছুতেই ঠিক করতে পারল না।

'প্রিয় নাতালিয়া,—গতকাল তোমার স্বামীর সঙ্গে যে সব কথা হয়েছিল তার গুরুভার মনের মধ্যে বহন করে আমি চলে যেতে পারছি না।...আর কি? কাল যা কিছু বলেছি তার জন্য তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আমি যা মনে করি তাই তাকে বলেছি। তিনি হয় তো ভাববেন, আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। তাছাড়া, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে তার হস্তক্ষেপ—না, আমি পারি না—' তার মনের মধ্যে পুনরায় লোকটির প্রতি ঘৃণা জেগে উঠল। অসমাপ্ত চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে পুরে দাম চুকিয়ে সে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর গাড়িতে উঠে কয়েদীদের দলকে ধরতে এগিয়ে চলল।

গরম আরও বেড়েছে। পাথর ও দেয়াল থেকে যেন গরম ভাঁপ বেরুচ্ছে, ফুটপাথে পা যেন পুড়ে যাচ্ছে, গাড়ির রং-করা মাড-গার্ডে হাত দিতেই হাতে যেন আগুনের ছ্যাঁকা লাগল।

রাস্তাটা যেখানে একটা নর্দমার দিকে ঢালু হয়ে গেছে সেখানে একটা বড় বাড়ির ফটকের সামনে একদল লোক জমা হয়েছে এবং কনভয়ের একটি সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে।

নেখ্‌লুদভ কোচয়ানকে থামতে বলল। একজন কুলিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

'একটা কয়েদীর কি যেন হয়েছে।'

গাড়ি থেকে নেমে নেখ্‌লুদভ ভীড়ের দিকে এগিয়ে গেল। নর্দমার এবড়োখেবড়ো পাথরের উপরে ঢালুর দিকে মাথা রেখে একটি বয়স্ক কয়েদী পড়ে আছে। মুখে লাল দাড়ি, চ্যাপ্টা নাক, সারা মুখটাও খুব লাল। পরনে একটা ধূসর আলখাল্লা ও ধূসর ট্রাউজার। ফুটকি-ফুটকি দাগওয়ালা হাতের তালু ছড়িয়ে দিয়ে লোকটি চিং হয়ে শুয়ে আছে। রক্তের মত লাল চোখ দুটো এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। চওড়া উঁচু বুকটা বেশ কিছুক্ষণ পরে পরে উঠছে-নামছে, আর একটা গোঙানি বেরিয়ে আসছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিরক্ত পুলিশ, একটি ফেরিওয়ালা, ডাক-পিয়ন, করণিক, ছোট ছাতা হাতে একটি বৃদ্ধা, ও খালি ঝুড়ি হাতে ছোট করে চুল ছাঁটা একটি ছেলে।

নেখ্‌লুদভকে দেখে করণিক বলল, 'এমনিতেই খুব দুর্বল। হাজতে আটক থেকে থেকেই দুর্বল হয়ে পড়ে। তার উপর এই প্রচণ্ড গরমের মধ্যে চলেছে।'

ছাতা হাতে বৃদ্ধাটি বলল, 'হয় তো মারাই যাবে।'

পিওন বলল, 'ওর কলারটা ঢিলে করে দেওয়া উচিত।'

পুলিশের লোকটি কাঁপা কাঁপা আঙুল দিয়ে কলারটা খুলতে শুরু করল। সেও বেশ উত্তেজিত ও বিচলিত হয়ে পড়েছে। তবু জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এখানে ভীড় করেছ কেন? এমনিতেই এই গরম। তার উপর তোমরা বাতাসটাও আটকে দিয়েছ।'

করণিক আইনের জ্ঞান দেখাতে বলল, 'উচিত ছিল একজন ডাক্তার দিয়ে সকলকে পরীক্ষা করানো এবং যারা দুর্বল তাদের রেখে আসা। প্রায় মরা অবস্থায়ই তো একে চালান করে দিয়েছে।'

শার্টের ফিতেটা খুলে দিয়ে পুলিশটি উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল।

'সবাই সরে পড়। এখানে তোমাদের কি কাজ? হাঁ করে দেখার কি আছে?' বলতে বলতে সে সমর্থনের আশায় নেখ্‌লুদভের দিকে তাকাল। কিন্তু তার মুখে সমর্থনের চিহ্ন না দেখে কনভয়-সৈন্যটির দিকে মুখ ফেরাল।

কিন্তু সে তখন তার মাড়িয়ে-দেওয়া জুতোর গোড়ালি পরীক্ষা করতেই ব্যস্ত, পুলিশের দিকে তার নজর নেই।

ভীড়ের ভিতর থেকে কেউ কেউ বলে উঠল, 'যাদের কাজ তারা তো থোরাই কেয়ার করে।......এই ভাবে মানুষকে মেরে ফেলা কি ঠিক,...... কয়েদীও তো মানুষ।'

নেখ্‌লুদভ বলল, 'ওর মাথাটা তুলে ধর, আর একটু জল দাও।'

'জল আনতে পাঠিয়েছি,' বলে পুলিশটি দুই হাতে কয়েদীটিকে ধরে অনেক কষ্টে নিজেও একটু উঁচু হল।

'এখানে এত ভীড় কিসের?' একটা কর্তৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আর পরিষ্কারভাবে কামানো ঝকঝকে জামা ও ততোধিক ঝকঝকে টপ-বুট পরা একজন পুলিশ-অফিসার দর্শন দিল।

'এগিয়ে যাও। এখানে দাঁড়ানো চলবে না।' ভীড় কেন জমেছে সেটা খোঁজ না করেই সে চেঁচিয়ে বলল।

তারপর কাছে গিয়ে মুমূর্ষু কয়েদীটিকে দেখতে পেয়ে এমন ভাবে মাথাটা নাড়ল যেন এটা তার আগে থেকেই জানা ছিল। পুলিশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ব্যাপার কি?'

পুলিশ জানাল, একদল কয়েদী যাচ্ছিল; একজন কয়েদী নীচে পড়ে গেলে কনভয়-অফিসারের আদেশে তাকে ফেলেই সকলে চলে গেছে।

'আচ্ছা। ঠিক আছে। ওকে থানায় নিয়ে যেতে হবে। একটা ইজভজ্-চিক ডাকো।'

টুপিতে আঙুল ছুঁইয়ে পুলিশ বলল, 'গাড়ি ডাকতে কুলি গেছে।'

করণিক গরম সম্পর্কে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, পুলিশ অফিসার বাধা দিল, 'সেটা কি আমার ব্যাপার, অঁ্যা? চলে যাও এখান থেকে।' সে এমন ভাবে তাকাল যে করণিকটি চুপ করে গেল।

নেখ্‌লুদভ বলল, 'একটু জল ওকে দেওয়া উচিত।'

পুলিশ-অফিসার তার দিকেও কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। কুলি এক মগ জল নিয়ে এলে অফিসার পুলিশকে বলল খানিকটা জল খাইয়ে দিতে। পুলিশ তার ঢলে-পড়া মুখটা তুলে একটু জল ঢেলে দিল, কিন্তু বন্দী সে জল গিলতে পারল না, তার দাড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ে কুর্তা ও নোংরা সুতীর শার্টটা ভিজিয়ে দিল।

অফিসার আদেশ করল, 'জলটা ওর মাথায় ঢেলে দাও'; পুলিশ টুপিটা খুলে বন্দীর লাল চুল ও টাকের উপর জলটা ঢেলে দিল।

লোকটি যেন ভয়ে ভয়ে চোখ খুলল; কিন্তু তার অবস্থা একরকমই রইল।

তার নোংরা মুখ থেকে জমাট ধুলো-বালি ধুয়ে পড়তে লাগল, কিন্তু মুখটা আগের মতই খাবি খেতে লাগল, সারা শরীর কাঁপতে লাগল।

নেখ্‌লুদভের ইজভজচিকটা দেখিয়ে পুলিশ-অফিসার বলল, 'দেখ, এটা নিয়ে যাও। এই, এগিয়ে আয়।'

চোখ না তুলেই ইজভজচিক বিরক্ত গলায় বলল, 'ভাড়া আছে।'

'ইজভজচিকটা আমার। তুমি ওকে নিয়ে যাও, ভাড়া আমিই দেব।' শেষের কথাগুলি নেখ্‌লুদভ কোচয়ানকে বলল।

অফিসার চীৎকার করে উঠিল, 'হাঁ করে আছ কেন সব? ওকে ধরে তোল।'

পুলিশ, কুলি ও কনভয়-সৈন্যটি মিলে মৃতপ্রায় লোকটিকে তুলে নিয়ে গাড়ির মধ্যে আসনে বসিয়ে দিল। কিন্তু সে বসে থাকতে পারল না; মাথাটা ঢলে পড়ল, আর তারপরেই সমস্ত শরীরটা আসন থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ল।

অফিসার হুকুম দিল, 'ওকে নীচেই শুইয়ে দাও।'

মৃতপ্রায় লোকটিকে আসনে নিজের পাশে বসিয়ে দিয়ে শক্ত ডান হাতটা দিয়ে তার শরীরটাকে জড়িয়ে ধরে পুলিশটি বলল, 'ঠিক আছে স্যার; এই ভাবেই ওকে থানায় নিয়ে যাচ্ছি।'

কনভয়-সৈন্যটি তার কারা-জুতো পরা মোজাহীন পা দুটি ধরে গাড়ির ভিতরে তুলে দিল।

কয়েদীর টুপিটাকে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ-অফিসার সেটাকে তুলে নিয়ে তার ঢলে-পড়া ভিজে মাথায় পরিয়ে দিল।

তারপর হুকুম করল, 'এগিয়ে চল।'

ইজভজচিক রেগে চারদিকে তাকাল, মাথা নাড়ল, তারপর কনভয়-

সৈন্যটিকে নিয়ে ধীরে ধীরে থানার দিকে এগিয়ে চলল। কয়েদীর পাশে বসে পুলিশটি বারে বারে পিছলে পড়ে-যাওয়া দেহটা টেনে তুলতে লাগল; তার মাথাটা এ-পাশ থেকে ও-পাশে দুলতে লাগল।

কনভয়-সৈন্যটি গাড়ির পাশে পাশে হাঁটছিল। সেও বারে বারে কয়েদীর পা জোড়াকে ঠিকমত রেখে দিচ্ছিল। নেখ্‌লুদভ গাড়ির পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগল।

অধ্যায়—৩৭

থানার ফটকে একজন সশস্ত্র শাস্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে পেরিয়ে গাড়িটা থানার উঠোনে ঢুকে একটা দরজার সামনে থামল।

উঠোনে জনকয়েক লোক হাতের আস্তিন গুটিয়ে গাড়ি ধুতে ধুতে উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা বলছিল।

গাড়িটা থামলে কয়েকজন পুলিশ সেটাকে ঘিরে দাঁড়াল এবং কয়েদীর প্রাণহীন দেহটাকে বাইরে বের করল।

যে পুলিশটি মৃতদেহটাকে এতক্ষণ ধরে ছিল সে গাড়ি থেকে নেমে অবশ হাতটাকে বার কয়েক নেড়ে-চেড়ে টুপিটা খুলে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল। মৃতদেহটাকে উপরে নিয়ে যাওয়া হল। নেখ্‌লুদভও সঙ্গে গেল। ছোট, নোংরা ঘরটায় চারটে শয্যা ছিল। দুটোতে ড্রেসিং-গাউন পরা দুটি রোগী বসেছিল; একজনের বাঁকা মুখ, গলায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, অপরজন ক্ষয়রোগী। দুটো শয্যা খালি ছিল; একটাতে কয়েদীকে শুইয়ে দেওয়া হল। একটি ছোটখাট মানুষ শুধুমাত্র তলবাস ও মোজা পরে দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকল। তার চোখ দুটি চকচক করছে, ভুরু দুটো অনবরত নাচছে। প্রথমে কয়েদীর দিকে, তারপরে নেখ্‌লুদভের দিকে তাকিয়ে লোকটি হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল। লোকটা পাগল, পুলিশ হাসপাতালে আছে।

'ওরা আমাকে ভয় দেখাতে চায়, কিন্তু না, তা পারবে না,' লোকটা বলল।

একজন পুলিশ অফিসার ও ডাক্তারের সাহায্যকারী ঘরে ঢুকল।

ডাক্তারের সাহায্যকারী মৃত লোকটির কাছে গিয়ে ফুটকি-দাগওয়ালা হাতটা তুলে ধরল। তখনও নরম থাকলেও হাতটা মরার মত সাদা ও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এক মুহূর্তের জন্য হাতটা ধরে রেখেই ছেড়ে দিল। হাতটা নির্জীবভাবে মৃত লোকটির পেটের উপর পড়ল।

সাহায্যকারী বলল, 'এর হয়ে গেছে।' তবু নিয়মরক্ষার জন্য কয়েদীর ভিজে জামাটা খুলে কোঁকড়া চুলগুলি পিছন দিকে সরিয়ে দিয়ে সে তার হল্‌দেটে চওড়া নিশ্চল বুকের উপর কানটা রাখল। কোন শব্দ নেই। সাহায্যকারী উঠে দাঁড়িয়ে মাথাটা নাড়ল, তারপর লোকটির স্থির নীল চোখ দুটির প্রথমে

একটির ও পরে অপরটির পাতা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল।

ডাক্তারের সাহায্যকারীর দিকে থুথু ছিটিয়ে পাগলটা বার বার বলতে লাগল, 'আমি ভয় পাই নি, আমি ভয় পাই নি।'

'তারপর ?' পুলিশ-অফিসার জিজ্ঞাসা করল।

ডাক্তারের সাহায্যকারী জবাব দিল, 'তারপর ? একে শব-ঘরে পাঠাতে হবে।'

'খুব সাবধান। আপনি নিশ্চিত তো ?' পুলিশ-অফিসার বলল।

মৃতের বুকের উপরে শার্টটা টেনে দিয়ে সাহায্যকারী বলল, 'এত দিনে তো বোঝা উচিত। যা হোক, মাত্ভি আইভানভিচকে ডেকে পাঠাচ্ছি, তিনি এসে একবার দেখুন। পেত্রভ, তাকে ডাক।' বলেই সে চলে গেল।

পুলিশ-অফিসার বলল, 'ওকে শব-ঘরে নিয়ে যাও।' তারপর কনভয়-সৈনিকটিকে বলল, 'তারপর তুমি আপিসে এসে সই করবে।'

'হ্যাঁ স্যার,' সৈনিকটি বলল।

পুলিশরা ধরাধরি করে মৃতদেহটা নামিয়ে নিয়ে গেল। নেখ্লয়ুদভও যাচ্ছিল কিন্তু পাগলটা তাকে বাধা দিল।

'আপনি তো এদের ষড়যন্ত্রের মধ্যে নেই, তাহলে একটা সিগারেট দিন,' সে বলল। নেখ্লয়ুদভ সিগারেট কেসটা বের করে তাকে সিগারেট দিল।

পাগলটা সারাক্ষণ ভুরু দুটো নাচাতে নাচাতে নানা রকম প্রশ্ন করে করে তাকে কি ভাবে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে তার বর্ণনা দিতে লাগল।

'জানেন, ওরা সব আমার শত্রু, নানা রকম পদ্ধতিতে ওরা আমাকে জ্বালা-যন্ত্রণা দিচ্ছে।'

'ক্ষমা করবেন,' বলে তার কোন কথায় কান না দিয়ে নেখ্লয়ুদভ উঠোনে বেরিয়ে গেল। মৃতদেহটা কোথায় রাখা হয় সেটা দেখাই তার ইচ্ছা।

পুলিশ অফিসার তাকে বাধা দিল।

'আপনি কি চান ?'

'কিছু না।'

'কিছু না ? তাহলে চলে যান।'

তার কথা মত নেখ্লয়ুদভ বেরিয়ে এসে ইজভজচিকের কাছে গেল। সে তখন ঝিমুচ্ছিল। তাকে জাগিয়ে তুলে দুজনে রেলওয়ে স্টেশনের দিকে অগ্রসর হল।

তারা একশ' গজও পার হয় নি, এমন সময় রাইফেলধারী জনৈক কনভয়-সৈন্যসহ একখানা গাড়ির সঙ্গে তাদের দেখা হল। গাড়িতে আর একটি কয়েদী শুয়ে আছে; স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সে ইতিমধ্যেই মারা গেছে। কয়েদীটি গাড়ির উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, গাড়ির প্রতিটি ধাক্কায় তার কামানো মাথাটা

লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে। ভারী বুট পরা গাড়োয়ান রাসটা হাতে নিয়ে গাড়ির পাশে পাশে হেঁটে চলেছে; একজন পুলিশও তার পিছন পিছন হাঁটছে। নেখ্‌লয়ুদভ ইজভজচিকের ঘাড়ে হাত রাখল।

ঘোড়া থামিয়ে ইজভজচিক বলল, 'দেখুন ওরা কি করছে!'

গাড়ি থেকে নেমে নেখ্‌লয়ুদভ কয়েদী-গাড়ির পিছনে পিছনে আবার থানার ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল।

পুলিশ-অফিসার এগিয়ে এসে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'একে আবার কোত্থেকে জোটালে?'

'গর্বাতভ্‌স্কায়া থেকে,' পুলিশটি জবাব দিল।

ফায়ার-বিগ্রেডের ক্যাপ্টেন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। সে প্রশ্ন করল, 'কয়েদী নাকি?'

'হ্যাঁ। এটা দু'নম্বর।'

পুলিশরা মৃত লোকটিকে গাড়ি থেকে নামিয়ে আগের মতই দোতলার হাসপাতালে নিয়ে গেল। নেখ্‌লয়ুদভ মোহাচ্ছন্নের মত তাদের অনুসরণ করল।

'আপনি কি চান?' একজন পুলিশ জিজ্ঞাসা করল।

নেখ্‌লয়ুদভ জবাব দিল না। সঙ্গে সঙ্গেই চলতে লাগল।

বিছানার উপর বসে পাগলটা নেখ্‌লয়ুদভের দেওয়া সিগারেটটাকে লোভীর মত টেনে যাচ্ছে।

হেসে বলল, 'আরে, আপনি ফিরে এসেছেন।' মৃতদেহটা দেখতে পেয়ে মুখ ভেংচে বলল, 'আবার! আর পারি না। আমি তো ছেলেমানুষ নই, কি বলেন?' নেখ্‌লয়ুদভের দিকে ঘুরে হাসতে হাসতে সে প্রশ্নটা করল।

নেখ্‌লয়ুদভ মৃত লোকটির দিকে তাকিয়ে ছিল। তার মুখটা দেখা যাচ্ছে, কয়েদীটির মুখ ও শরীর দুইই সুন্দর। পূর্ণ যৌবনদীপ্ত চেহারা। মাথার অর্ধেকটা কামানোর জন্য দেখতে কিছুটা খারাপ লাগলেও চুলের কাছটাতে ঈষৎ বাঁকানো সোজা কপাল, ও দুটি নিষ্প্রাণ চোখ বড়ই সুন্দর। সরু কালো গোঁফের উপর নাকটাও সুন্দর। ঠোঁট দুটি নীল হতে আরম্ভ করলেও এখনও তাতে হাসি লেগে রয়েছে। মুখের নীচের দিকে সামান্য দাড়ি, আর মাথার কামানো দিকটায় একটা সুগঠিত কানও দেখা যাচ্ছে। মুখের ভাবটা শান্ত, গম্ভীর, দয়াপরবশ।

সহজেই বোঝা যায়, লোকটির ভেতরকার একটি মহত্তর জীবনের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করা হয়েছে। তার হাতের ও শৃংখলিত পায়ের মজবুত হাড় ও সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্ত মাংসপেশী দেখে বোঝা যায় কী সুন্দর, শক্তিমান, কর্মচঞ্চল একটি মানব-পশু সে ছিল। তবু তার মৃত্যু ঘটান হল। আর সে জন্য একটি মানুষও দুঃখবোধ করল না, মানুষ হিসাবে তো নয়ই, এমন একটি কর্মক্ষম

পশুর মৃত্যুর জন্যও কেউ দুঃখিত হল না। তাকে কেন্দ্র করে একটি মাত্র মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে—আসন্ন পচনের আশংকায় তার দ্রুত অপসারণের প্রয়োজনীয়তার চিন্তাপ্রসূত বিরক্তি।

থানার ইন্সপেক্টরের সঙ্গে ডাক্তার ও তার সাহায্যকারী ঘরে ঢুকল।

মৃত লোকটি বিছানার পাশে বসে ডাক্তার তার সাহায্যকারীর মতই লোকটির হাতটা তুলে ধরল, বুকের উপর কানটা রাখল, তারপর ট্রাউজারটা টেনে উঠে দাঁড়াল।

'এর চাইতে আর বেশী মরতে পারে না,' ডাক্তার বলল।

ইন্সপেক্টর মুখ ভরে বাতাস নিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়তে লাগল।

কনভয়-সৈন্যটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ কারাগার থেকে সে এসেছে ?'

সৈনিক খবরটা জানিয়ে তাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে মৃত লোকটির শিকলটা রয়েছে।

'সে আমি খুলিয়ে নেব; প্রভুকে ধন্যবাদ, হাতের কাছেই একজন কামার আছে,' কথাটা বলে পুনরায় বাতাসে গাল ভরে নিয়ে ধীরে ধীরে সেটা ছাড়তে ছাড়তে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

নেখ্‌ল্যুদভ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করল, 'এরকম হল কেন ?'

চশমার ভিতর দিয়ে ডাক্তার তার দিকে তাকাল।

'এরকম কেন হয়েছে ? মানে আপনি বলতে চান, সর্দিগর্মিতে এরা মরে কেন ? কারণটা এই। সারা শীতকালটা এরা বিনা পরিশ্রমে, বিনা আলোয় বসে বসে কাটায়, আর তারপরই এই রকম একটা দিনের প্রচণ্ড রোদ্দুরে হঠাৎ তাদের বাইরে আনা হয়ঃ দল বেঁধে এগিয়ে চলে বলে একটু বাতাসও পায় না, ফলে সর্দি-গর্মি লাগে।'

'তাহলে এভাবে বাইরে আনা হয় কেন ?'

'ওঃ, এই কথা। তা সেটা যারা পাঠায় তাদের জিজ্ঞাসা করুন গে। কিন্তু আপনি কে জানতে পারি কি ?'

'একজন পথিক মাত্র।'

'খুব ভাল কথা। শুভ অপরাহ্ন; আমার আর সময় নেই।' বিরক্ত হয়ে ডাক্তার ট্রাউজারটাকে নীচের দিকে টেনে রোগীর বিছানার দিকে এগিয়ে গেল।

'তুমি কেমন আছ ?' বাঁকা মুখ, গলায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বিবর্ণ লোকটাকে ডাক্তার প্রশ্ন করল।

এদিকে পাগলটা বিছানায় বসে সিগারেটটা শেষ করে ডাক্তারের দিকে থুথু ফেলতে লাগল।

নেখ্‌ল্যুদভ বাইরে গিয়ে উঠোন পেরিয়ে ফটকটা পার হয়ে গেল। তারপর গাড়িতে উঠে বসল। কোচয়ান আবারও ঘুমিয়ে পড়েছিল।

অধ্যায়—৩৮

নেখ্‌লয়ুদভ যখন স্টেশনে পৌছল কয়েদীরা তখন রেলের কামরায় যার যার আসনে বসে পড়েছে। সব কামারার জানালাই লোহার জাল দিয়ে ঢাকা। তাদের সঙ্গে যারা দেখা করতে এসেছে তারা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে; কাউকে কামরার কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

সেদিন কনভয়কে খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। কারাগার থেকে স্টেশনে আসবার পথে যে দুজনকে নেখ্‌লয়ুদভ দেখেছে তা ছাড়াও আরও তিনজন কয়েদী সর্দিগর্মিতে মারা গেছে। প্রথম দুজনের মত অপর একজনকেও নিকটবর্তী থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, অন্যরা রেলওয়ে স্টেশনেই মারা গেছে।*

যে পাঁচটি লোক বেঁচে থাকতে পারত, তাদের হেপাজতে থেকে তারা মারা গেল, সে জন্য যে কনভয়ের লোকেরা কোন রকম অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করেছে তা নয়। এ সব ক্ষেত্রে আইনমাফিক যা কিছু করা দরকার পাছে তার কিছু বাদ পড়ে যায় সেটাই তাদের আসল দুশ্চিন্তা। নির্দিষ্ট স্থানে মৃতদেহগুলি পৌছে দেওয়া, তাদের কাগজপত্র ও জিনিসপত্রের বিলি-ব্যবস্থা করা, নিঝ্‌নি-নভ্‌গরদে যাদের পৌছে দিতে হবে তাদের তালিকা থেকে এদের নাম কেটে দেওয়া—এ সবই অত্যন্ত গোলমেলে কাজ, বিশেষ করে এ রকম প্রচণ্ড গরমের দিনে।

সব কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কনভয়ের লোকরা এই নিয়েই ব্যস্ত রইল। নেখ্‌লয়ুদভ ও অন্য যারা এ সব কাজ করবার অনুমতি চেয়েছিল তাদের কাউকে কামরার কাছে যেতেই দেওয়া হল না। অবশ্য নেখ্‌লয়ুদভ কনভয়-সার্জেণ্টকে কিছু বখশিস দিয়ে সেখানে যাবার অনুমতি পেয়ে গেল। সার্জেণ্ট তাকে বলল, ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নজরে পড়বার আগেই যেন সে তাড়াতাড়ি কথাবার্তা সেরে ফেলে। ট্রেনে মোট আঠারোটা কামরা ছিল, তার মধ্যে সরকারী কর্মচারিদের জন্য নির্দিষ্ট একটা কামরা ছাড়া বাকী সবগুলিই কয়েদীতে বোঝাই। যেতে যেতে নেখ্‌লয়ুদভ সব কামরাগুলোতেই শুনতে পেল শিকলের ঝনঝনানি, মিলিত হট্টগোল আর শাপ-শাপান্ত; সঙ্গী মৃত কয়েদীর কথা কারও মুখে শোনা গেল না। বস্তা, খাবার জল আর জায়গা নির্বাচন নিয়েই যত কথাকাটাকাটি।

পুরুষদের কামরা পার হয়ে নেখ্‌লয়ুদভ মেয়েদের কামরার কাছে গেল। দ্বিতীয় কামরা থেকে একটা মেয়ের আর্তনাদ শোনা গেল: 'ওঃ ওঃ, ওঃ! হা

---

*১৮৮০ সালে মস্কোতো বুতিরস্কায়া কারাগার থেকে নিঝ্‌নিনভ্‌গরদ রেলওয়ে স্টেশনে যাবার পথে একদিনে পাঁচজন কয়েদী সর্দিগর্মিতে মারা গিয়েছিল।—এল. টি.

ঈশ্বর! ওঃ, ওঃ, হা ঈশ্বর।'

জনৈক সৈন্যের নির্দেশক্রমে নেখ্‌ল্যুদভ তৃতীয় কামরার একটা জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। মানুষের ঘামের গন্ধেভরা একটা গরম বাতাস তার নাকে এসে লাগল। কানে এল নানা নারী-কণ্ঠের তীক্ষ্ণ আওয়াজ।

সবগুলি আসনই কারাগারের আলখাল্লা ও সাদা কোর্তা-পরিহিত উচ্চকণ্ঠে আলোচনারত ঘর্মাক্ত-দেহ মেয়েমানুষে বোঝাই। জানালায় নেখ্‌ল্যুদভের মুখটা দেখা যেতেই তার দিকে সকলের দৃষ্টি পড়ল। যারা কাছে ছিল তারা গল্প থামিয়ে এগিয়ে এল। মাসলভা বসেছিল বিপরীত দিকের জানালায়। পরনে সাদা কোর্তা, মাথা খোলা। হাস্যময়ী সুন্দরী ফেদসিয়া তার পাশেই বসেছিল। নেখ্‌ল্যুদভকে চিনতে পেরে সে কনুই দিয়ে মাসলভাকে ঠেলা মেরে জানালার দিকে ইঙ্গিত করল।

মাসলভা দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় রুমালটা বেঁধে নিল এবং তপ্ত লাল মুখে হাসি ফুটিয়ে জানালার কাছে গিয়ে একটা শিক ধরে দাঁড়াল।

স্মিত হাসি হেসে সে বলল, 'আজ বড় গরম।'

'জিনিসগুলো সব পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

'তোমার আর কিছু চাই কি?' চুল্লির ভিতর থেকে আসা গরম বাতাসের মত একটা তপ্ত হাওয়া গাড়ির ভিতর থেকে এসে তার গায়ে লাগল।

'ধন্যবাদ, আর কিছু চাই না।'

ফেদসিয়া বলল, 'খাবার জল একটু যদি পেতাম।'

মাসলভা কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করল।

'কেন, তোমাদের জল দেয় নি?'

'খানিকটা দিয়েছিল, সব ফুরিয়ে গেছে।'

'কনভয়ের কোন লোককে আমি বলে দেব। নিঝ্‌নি নভ্‌গরদে পৌঁছবার আগে আর আমাদের দেখা হবে না।'

'সে কি! আপনিও যাচ্ছেন?' মাসলভা এমনভাবে কথা বলল যেন সে জানত না। সানন্দে সে নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকাল।

'আমি পরের ট্রেনে যাচ্ছি।'

মাসলভা কথা বলল না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

পুরুষের মত ভরাট গলায় একটি ভীষণ-দর্শন বৃদ্ধা বলল, 'একথা কি সত্যি স্যার যে দশজন কয়েদীকে মেরে ফেলেছে?'

'দশজনের কথা শুনি নি; আমি দুজনকে দেখেছি,' নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

'সকলে বলছে ওরা দশজনকে মেরে ফেলেছে। আর ওদের কিছু হবে না? ভাবুন তো! যত সব শয়তান!'

'কোন স্ত্রীলোক কি অসুস্থ হয় নি?' নেখ্‌ল্যুদভ প্রশ্ন করল।

একটি ছোটখাট কয়েদী হেসে বলল, 'মেয়েরা বেশী শক্ত; শুধু একটি মেয়ের মাথায় ঢুকেছে তার প্রসব হবে। ওই সে যাচ্ছে।' পাশের যে কামরা থেকে আর্তনাদ ভেসে আসছিল সেই দিকটা সে দেখাল।

ঠোঁটের হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করে মাসলভা বলল, 'আপনি বলছেন আমাদের কিছু চাই কি না। ওই মেয়েটার তো ব্যথা উঠেছে। ওকে কি এখানে রেখে যাওয়া যায় না? আপনি যদি কর্তাদের একটু বলেন—'

'হ্যাঁ, বলব।'

'আর একটি কথা; ও কি ওর স্বামী তারাস-এর সঙ্গে দেখা করতে পারে না?' চোখের ইঙ্গিতে সে হাস্যময়ী ফেদসিয়াকে দেখিয়ে বলল। 'সেও তো আপনার সঙ্গে যাচ্ছে, তাই না?'

কনভয়-সার্জেণ্ট বলল, 'স্যার, কথা বলবেন না।'

যে সার্জেণ্ট নেখ্‌ল্যুদভকে অনুমতি দিয়েছে এ সে নয়।

নেখ্‌ল্যুদভ কামরার কাছ থেকে চলে গেল। কিন্তু অনেক খুঁজেও কনভয়-অফিসারের দেখা পেল না।

অবশেষে যখন দেখা পেল তখন ট্রেন ছাড়বার দ্বিতীয় ঘণ্টা বেজে গেছে।

হাত-কাটা অফিসারটি ঠুঁটো হাত দিয়ে মুখ-ভর্তি গোঁফ জোড়াটা মুছতে মুছতে জনৈক কর্পোরালকে কি জানি কেন খুব ধমকাচ্ছিল।

নেখ্‌ল্যুদভকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কি চাই?'

'এখানে একটি স্ত্রীলোক আছে যার প্রসব হবে, তাই ভাবছিলাম...'

'ওঃ, বেশ তো প্রসব হোক না; ও সব পরে দেখা যাবে,' ঠুঁটো হাতটা দ্রুত দোলাতে দোলাতে সে দৌড়ে কামরার দিকে চলে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাঁশি হাতে নিয়ে গার্ড চলে গেল, শেষ ঘণ্টা বাজল, আর প্ল্যাটফর্মের লোকজনের মধ্যে এবং মেয়েদের কামরা থেকে কান্না আর প্রার্থনার রোল উঠল।

প্ল্যাটফর্মে তারাসের পাশে দাঁড়িয়ে নেখ্‌ল্যুদভ তাকিয়ে রইল; মাথা কামানো কয়েদীদের নিয়ে কামরাগুলি একের পর এক তার চোখের সামনে দিয়ে পার হয়ে গেল। তারপর এল মেয়েদের প্রথম কামরা; জানালায় অনেক মাথা, কতক রুমাল-বাঁধা, কতক খোলা; তারপর দ্বিতীয় কামরা; গোঙানি তখনও শোনা যাচ্ছে; তারপর মাসলভার কামরা; অন্যদের সঙ্গে সেও জানালায় দাঁড়িয়ে আছে; করুণ হাসি হেসে নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকাল।

অধ্যায়—৩৯

যে যাত্রীবাহী ট্রেনে নেখ্‌ল্যুদভ যাবে সেটা ছাড়তে তখনও দু'ঘণ্টা বাকি। একবার ভাবল, এই ফাঁকে দিদির সঙ্গে দেখা করে আসবে ; কিন্তু সকাল থেকে এত ধকল গেছে যে প্রথম শ্রেণীর ভোজনাগারে একটা সোফার উপর বসে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তার এমন ঘুম পেয়ে গেল যে পাশ ফিরে শোবার সঙ্গে সঙ্গে মাথার নীচে হাতটা রেখে সে ঘুমিয়েই পড়ল।

তোয়ালে হাতে উর্দি-পরা ওয়েটার এসে তার ঘুম ভাঙাল।

'দেখুন স্যার, আপনি তো প্রিন্স নেখ্‌ল্যুদভ ? একটি মহিলা আপনার খোঁজ করছেন।'

নেখ্‌ল্যুদভ চমকে উঠে বসল। চোখ মুছতে মুছতে সে কোথায় আছে, আর সকাল থেকে কি কি ঘটেছে সব তার মনে পড়ে গেল।

কল্পনায় সে দেখতে পেল কয়েদীদের যাত্রা, মৃতদেহ, জাল দিয়ে ঘেরা জানালা সমেত রেলের কামরা, তাতে অনেক মেয়ে কয়েদী ঠাসা, একজনের প্রসব-ব্যথা উঠেছে অথচ তাকে সাহায্য করবার কেউ নেই, আর একজন গরাদের ফাঁক দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে করুণভাবে হাসছে।

কিন্তু তার সামনের বাস্তব দৃশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত : একটা টেবিলে ফুলদানি, মোমবাতি-দান ও চায়ের সরঞ্জাম সাজানো, চঞ্চল ওয়েটাররা চারদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে ; ঘরের অন্য প্রান্তে একটা ক্যাবার্ড, অনেকগুলো বোতল সাজানো, ফল ভর্তি পাত্র, একজন কর্মচারি ও দাঁড়িয়ে থাকা অনেক যাত্রীর পিঠ।

উঠে বসতেই তার চোখে পড়ল, ঘরের সকলেই সাগ্রহে দরজার দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে। সেও তাকাল। দেখল, একদল লোক একটা চেয়ার বয়ে নিয়ে চলেছে আর একটি মহিলা সেই চেয়ারে বসে আছে। তার মাথাটা খুব পাতলা কাপড়ে ঢাকা। নেখ্‌ল্যুদভের মনে হল, ঐসব লোক-জনদের মধ্যে কাউকে সে চেনে। একটি সুসজ্জিতা সুন্দরী সখী ও একটা পুঁটুলি, কয়েকটা ছাতা ও একটা গোলাকার চামড়ার ব্যাগ নিয়ে তার পিছন পিছন হেঁটে যাচ্ছে। তারপর এল প্রিন্স কর্চাগিন ; তার ঠোঁট দুখানি পুরু, ঘাড়টা অনবরত দোলে। মাথায় একটা যাত্রা-টুপি। তার পিছনেই মিসি, তার ভাই মিশা ও নেখ্‌ল্যুদভের পরিচিত হাঁস-গলা রাজনীতিবিদ্‌ অস্টেন। ঠাট্টার সঙ্গেই বেশ জোর দিয়ে সে যেন কি বলছে আর মিসি হাসছে। সক্রোধে একটা সিগারেট টানতে টানতে ডাক্তার চলেছে সকলের শেষে।

কর্চাগিন-পরিবার তাদের শহরের উপকণ্ঠবর্তী জমিদারী থেকে নিঝ্‌নি নভ্‌গরদ রেলপথের পার্শ্ববর্তী প্রিন্সেসের বোনের জমিদারীতে যাচ্ছে।

চেয়ার বহনকারী লোকজন, সখী ও ডাক্তারসহ পুরো দলটা মহিলাদের বিশ্রাম-কক্ষের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু বৃদ্ধ প্রিন্স সেখানেই থেকে গেল।

একটা টেবিলে বসে ওয়েটারকে ডেকে খাদ্য ও পানীয়ের অর্ডার দিল। মিসি এবং অস্টেনও ভোজনাগারেই থেকে গেল। তারাও টেবিলে বসতে যাচ্ছিল, এমন সময় দরজার কাছে একটি পরিচিত মহিলাকে দেখতে পেয়ে সেই দিকে এগিয়ে গেল। মহিলাটি নাতালিয়া রাগঝিন্স্কি।

আগ্রাফেনা পেত্রভ্নাকে সঙ্গে নিয়ে নাতালিয়া ভোজন-কক্ষে ঢুকে চারদিকে তাকাল। একই সঙ্গে সে তার ভাইকে ও মিসিকে পেল। ভাইয়ের দিকে মাথাটা নেড়ে প্রথমে সে মিসির কাছেই গেল। তাকে চুম্বন করে সঙ্গে সঙ্গে ভাইয়ের কাছে গেল।

বলল, 'শেষ পর্যন্ত তোমাকে পেলাম।'

মিসি, মিশা ও অস্টেনকে অভ্যর্থনা জানাতে ও তাদের সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে নেখ্লযুদভ উঠে দাঁড়াল। মিসি জানাল, তাদের গ্রামের বাড়িতে হঠাৎ আগুন লাগার জন্যই তারা বাধ্য হয়ে মাসির বাড়ি যাচ্ছে। অস্টেন অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে একটা মজার গল্প ফেঁদে বসল।

সেদিকে কান না দিয়ে নেখ্লযুদভ দিদির দিকে মুখ ফেরাল।

'তুমি আসায় খুব খুশি হয়েছি।'

নাতালিয়া বলল, 'আমি অনেকক্ষণ এসেছি। আগ্রাফেনা পেত্রভ্নাও আমার সঙ্গে এসেছে।' আগ্রাফেনা পেত্রভ্না একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকেই কিছুটা বিচলিতভাবে মর্যাদাসহকারে অভিবাদন জানাল।

'তোমাকে সব জায়গায় খুঁজেছি।'

'আর আমি এখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' নেখ্লযুদভ আবার বলল, 'তুমি আসায় খুশি হয়েছি। তোমাকে একটা চিঠি লিখতে আরম্ভও করেছিলাম।'

ভীত গলায় নাতালিয়া বলল, 'সত্যি? কি ব্যাপার?'

মিসি ও ভদ্রলোকটি বুঝতে পারল যে ভাই-বোনের মধ্যে অন্তরঙ্গ আলোচনা শুরু হতে চলেছে। তাই তারা সরে গেল। নেখ্লযুদভ ও তার দিদি জানালার ধারে একটা ভেলভেট-মোড়া সোফায় গিয়ে বসল। সেখানে একটা কম্বল, একটা বাক্স ও কিছু টুকিটাকি জিনিস ছিল।

নেখ্লযুদভ বলল, 'কাল তোমাদের ওখান থেকে আসবার পরেই মনে হল ফিরে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে আসি। কিন্তু তোমার স্বামী ব্যাপারটাকে কি ভাবে নেবে ঠিক বুঝতে পারি নি। তার সঙ্গে ও ভাবে কথা বলার জন্য আমি দুঃখবোধ করছিলাম।'

দিদি বলল, 'আমি জানতাম, ঠিক জানতাম, ওটা তোমার মনের কথা নয়। ওঃ, তুমি তো জান!' বলতে বলতে তার চোখে জল এসে গেল। ভাইয়ের হাতটা সে চেপে ধরল।

'তোমাকে ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।' এমন সময় হঠাৎ দ্বিতীয় মৃত কয়েদীর

কথা তার মনে পড়ে গেল। 'ওঃ, আজ কী দেখেছি। দুটি কয়েদীকে মেরে ফেলা হয়েছে।

'মেরে ফেলেছে? কি ভাবে?'

'হ্যাঁ, মেরে ফেলেছে। এই গরমে তাদের বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল, দুজন সর্দিগর্মিতে মারা গেছে।'

'অসম্ভব। কি বললে, আজই? এইমাত্র?'

'হ্যাঁ, এইমাত্র। মৃতদেহ দুটি আমি দেখেছি।'

নাতালিয়া বলে উঠল, 'কিন্তু মেরে ফেলেছে বলছ কেন? কে মারল?'

এ ব্যাপারটাকেও সে তার স্বামীর চোখ দিয়েই দেখছে এই কথা ভেবে বিরক্ত হয়ে নেখ্‌লুদভ বলল, 'যারা তাদের যেতে বাধ্য করেছে তারাই মেরে ফেলেছে।'

আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌না ততক্ষণে এগিয়ে এসেছিল। সে বলে উঠল, 'হা ঈশ্বর!'

'এই সব হতভাগ্যের প্রতি যে কী ব্যবহার করা হচ্ছে তার তিলমাত্র ধারণা আমাদের নেই। কিন্তু সকলকে এটা জানতে হবে,' কথাগুলি বলে সে বৃদ্ধ কর্চাগিনের দিকে তাকাল। বৃদ্ধ তখন গলায় তোয়ালে জড়িয়ে সামনে একটা বোতল নিয়ে বসেছিল। ঠিক সেই সময় সে নেখ্‌লুদভের দিকে তাকাল। ডেকে বলল, 'নেখ্‌লুদভ, আমার সঙ্গে বসে একটু খানাপিনা করবে না? দীর্ঘ যাত্রার আগে এটা খুব উপকারী।'

নেখ্‌লুদভ অসম্মতি জানিয়ে মুখ ফেরাল।

নাতালিয়া বলল, 'কিন্তু এ ব্যাপারে তুমি কি করবে?'

'যা করতে পারি। কি করব আমি জানি না, শুধু বুঝি কিছু একটা করতে হবে। এবং আমার যা সাধ্য তা করব।'

'হুঁ বুঝেছি। কিন্তু ওদের ব্যাপারে কি হবে?' হেসে কর্চাগিনকে দেখিয়ে সে বলল। 'ও পাট কি একেবারেই চুকে গেল?'

'সম্পূর্ণ, এবং আমার মনে হয় তাতে কোন পক্ষেরই কোন আপসোস নেই।'

'এটা বড়ই দুঃখের কথা। আমি কষ্টবোধ করছি। ওকে আমি ভালবাসি। আর তাই যদি হয়, তাহলেই বা তুমি..... তুমি নিজেকে বাঁধতে চাইছ কেন?' সহজভাবে নাতালিয়া বলল। 'তুমি সেখানে যাচ্ছ কেন?'

যেন এ প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যই নেখ্‌লুদভ গম্ভীর শুকনো গলায় জবাব দিল, 'আমি যাচ্ছি, কারণ যেতে আমাকে হবেই।'

সঙ্গে সঙ্গে এই রূঢ় ব্যবহারের জন্য সে লজ্জিত বোধ করল। ভাবল, আমার মনের সব কথা ওকে খুলে বলতে দোষ কি? আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌নাও সব কিছু শুনুক না।

'তুমি তো কাতয়ুশাকে বিয়ে করার কথা বলছ? দেখ, আমি স্থির করে-

ছিলাম বিয়ে করব, কিন্তু সে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আপত্তি করেছে।' কথাগুলি বলবার সময় নেখ্‌লুদভের গলা কাঁপতে লাগল। এ বিষয়ে কথা বললেই তার গলা কেঁপে ওঠে। 'আমার কোন ত্যাগই সে গ্রহণ করতে চায় না, বরং সে নিজেই ত্যাগ করে চলেছে। কিন্তু তার এই ত্যাগ যদি সাময়িক উত্তেজনার ফল হয়ে থাকে, তাহলে তো সেটাকে আমি মেনে নিতে পারি না। তাই আমি তার সঙ্গে চলেছি, সে যেখানে থাকবে সেখানেই থাকব এবং তার ভাগ্যের বোঝাকে যথাসাধ্য হাল্কা করতে চেষ্টা করব।'

নাতালিয়া কিছুই বলল না। আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌না তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘাড় নাড়তে লাগল। ঠিক সেই সময় মহিলা বিশ্রাম-কক্ষ থেকে সেই দলটা আবার বেরিয়ে এল। সেই সুদর্শন ফিলিপ ও দরোয়ান প্রিন্সেস কর্চাগিনাকে বয়ে নিয়ে চলল। বাহকদের থামিয়ে সে নেখ্‌লুদভকে কাছে ডাকল। করুণভাবে আংটি পরা হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, **'Epouvantable'** (অসহ্য) সে গরমের কথাই বলল। 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না। **Ce climat me tue**। (এ আবহাওয়া আমাকে মেরে ফেলল।)' তারপর রাশিয়ার আবহাওয়া সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করে এবং নেখ্‌লুদভকে দেখা করবার আমন্ত্রণ জানিয়ে সে লোকজনদের এগিয়ে যেতে বলল।

যেতে যেতেই মুখ ফিরিয়ে আবার বলল, 'আমাদের সঙ্গে দেখা করতে অবশ্য এস।'

লোকজনরা প্রিন্সেসকে নিয়ে ডাইনে ঘুরে প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে এগিয়ে গেল। কুলিটাকে নিয়ে নেখ্‌লুদভ বাঁ দিকে ঘুরল। বোঁচকাটা নিয়ে তারাসও তার সঙ্গে চলল।

তারাসকে দেখিয়ে নেখ্‌লুদভ দিদিকে বলল, 'এই আমার সঙ্গী।' তারাসের কথা সে আগেই দিদিকে বলেছিল।

নেখ্‌লুদভ যখন একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরার সামনে থামল এবং তারাস ও কুলিটা মালপত্র নিয়ে গাড়িতে উঠে গেল, তখন নাতালিয়া বলল, 'তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে নিশ্চয় যাচ্ছ না?'

সে বলল, 'হ্যাঁ আমি এটাই পছন্দ করি। তারাসের সঙ্গে একত্রে যাচ্ছি। আর একটা কথা, কুজমিন্‌স্কোয়ের জমি এখনও চাষীদের দেওয়া হয় নি; কাজেই আমার মৃত্যু হলে তোমার ছেলেমেয়েরাই সেটা পাবে।'

'ওকথা বলো না দিমিত্রি,' নাতালিয়া বলল।

'জমি যদি বিলিয়েও দেই, তাহলেও আর যা কিছু আছে সব তারাই পাবে, কারণ আমি আর বিয়ে করব না; এবং বিয়ে যদি করিও, আমার কোন সন্তান হবে না, সুতরাং—'

'দিমিত্রি, ও ভাবে কথা বলো না।' নাতালিয়া বলল। কিন্তু নেখ্‌লুদভ

বুঝতে পারল, তার কথায় সে খুশিই হয়েছে।

ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে গেল। গার্ডরা কামরার দরজা বন্ধ করতে করতে যাত্রীদের ভিতরে যেতে এবং অন্যদের বেরিয়ে আসতে বলল।

নেখ্‌লুয়্দভ সেই গরম দুর্গন্ধময় কামরায় ঢুকেই সঙ্গে সঙ্গে কামরার পিছন দিককার ছোট প্ল্যাটফর্মটায় গিয়ে দাঁড়াল।

কেতাদুরুস্ত ওড়না ও টুপি পরা নাতালিয়া আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌নাকে নিয়ে কামরার পাশেই দাঁড়িয়ে। কিছু একটা বলবার চেষ্টা করছিল।

'চিঠি লিখো', এ কথাটা সে কিছুতেই বলতে পারছিল না, কারণ কথাটা নিয়ে একসময়ে তারা অনেক হাসি-ঠাট্টা করত। বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত আলোচনার ফলে তাদের মনের ভাই-বোনের ভালবাসাটা যেন মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তারা যেন পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কাজেই ট্রেনটা যখন চলতে শুরু করল তখন সে মাথাটা নেড়ে বিষণ্ণ মুখে কোনমতে শুধু বলল, 'বিদায়, বিদায় দিমিত্রি।'

গাড়ি চলে যেতেই নাতালিয়া ভাবতে লাগল, কেমন করে ভাইয়ের কথাগুলি স্বামীকে শোনাবে; তার মুখ গম্ভীর ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

নেখ্‌লুয়্দভও ভাবতে লাগল, দিদিকে সে কত ভালবাসত, তার কাছ থেকে কিছুই গোপন করত না, অথচ তাকে নিয়ে সে অস্বস্তি বোধ করছে, বিদায় নিতে পেরে সে যেন খুশিই হয়েছে। তার মনে হল, যে নাতালিয়া একদিন তার এত প্রিয় ছিল, সে আজ আর নেই, তার জায়গা নিয়েছে একজন অপরিচিত, অপ্রীতিকর, কৃষ্ণাঙ্গ, লোমশ মানুষের এক ক্রীতদাসী। সে যখন বিষয়-সম্পত্তি ও চাষীদের জমি বিলিয়ে দেবার কথা অর্থাৎ তার স্বামীর স্বার্থ-সংক্রান্ত কথা বলছিল তখন নাতালিয়ার সারা মুখ যে রকম উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তাতেই এই সত্য তার কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল।

এ অনুভূতিতে তার মন দুঃখে ভরে উঠল।

অধ্যায়—৪০

তৃতীয় শ্রেণীর কামরাটা সারাদিন প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। ফলে সেটা এতই তেতে উঠেছে যে নেখ্‌লুয়্দভ কামরার ভিতরে না গিয়ে পিছনের ছোট প্ল্যাটফর্মটাতেই দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু সেখানেও বাতাসের ঝলকমাত্রও ছিল না। ট্রেনটা দালান-কোঠা পার হবার পরে তবে একটু বাতাস পাওয়া গেল; নেখ্‌লুয়্দভও বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস টানল।

'হ্যাঁ, মেরে ফেলেছে,' দিদিকে যা বলেছিল সেই কথাটাই সে নিজের মনে বলে উঠল। দ্বিতীয় মৃত কয়েদীটির সুন্দর মুখখানি, ঠোঁটের হাসিটুকু, দুটি ভুরুর কঠোর ভঙ্গী, কামানো নীলাভ খুলির নীচের কানটা—কল্পনায় সব তার

চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল।

সে ভাবতে লাগল, 'এইটেই সব চাইতে ভয়াবহ যে সে খুন হল, কিন্তু কে যে তাকে খুন করল তা কেউ জানে না। অথচ তাকে খুন করা হয়েছে। অন্য সব কয়েদীর মতই তাকেও মাস্লেনিকভের আদেশেই বাইরে নিয়ে আসা হয়েছিল। নাম ছাপানো একখণ্ড কাগজে মাস্লেনিকভই হয় তো মহাসমারোহে স্বাক্ষর করেছিল, অথচ নিজেকে সে নিশ্চয়ই দোষী বলে মনে করে নি। যে কারা-ডাক্তার কয়েদীদের পরীক্ষা করেছিল সে তো আরও মনে করবে না। সে ঠিকমতই তার কর্তব্য করেছিল, দুর্বলদের আলাদা করেও দিয়েছিল। এই প্রচণ্ড গরমের কথা, অথবা এমন ভীড় করে এত বেলায় এদের যাত্রা শুরু হবে সে কথা সে কি করে আগে থেকে জানবে? কারা-ইন্সপেক্টর? কিন্তু সে তো আদেশ পালন করছে মাত্র। কনভয়-অফিসারও দোষী হতে পারে না, কারণ এক জায়গা থেকে কতগুলি লোককে বুঝে নেওয়া এবং অন্য এক জায়গায় তাদের জমা দিয়ে দেওয়াই তার কাজ। সে তো যথানিয়মেই তাদের নিয়ে যাচ্ছিল; দুটি শক্ত-সমর্থ লোক যে সে যাত্রার ধকল সইতে না পেরে মারা যাবে তা দেখে তো সে বুঝতেই পারে নি। কেউ দোষী নয়, অথচ তাদের মৃত্যুর জন্য দোষী নয় এমন লোকরাই তাদের খুন করেছে।

'এই সব ঘটছে তার কারণ এই সব লোকরা এই গভর্ণর, ইন্সপেক্টর, পুলিশ-অফিসার, পুলিশের লোক—মনে করে যে, এমন কতগুলি পরিস্থিতি আছে যেখানে মানুষে-মানুষে মানবিক সম্পর্কের কোন প্রয়োজন নেই। এই সব লোক, মাস্লেনিকভ, এবং ইন্সপেক্টর, এবং কনভয়-অফিসার, এরা যদি গভর্ণর, ইন্সপেক্টর বা অফিসার না হত, তাহলে এতগুলো লোককে একসঙ্গে এই প্রচণ্ড গরমে বাইরে পাঠাবার আগে বিশ বার ভাবত,—পথে বিশ বার থামত, এবং একটি লোক ক্রমেই দুর্বল হয়ে শ্বাস টানছে দেখলে তাকে ছায়ায় নিয়ে যেত, জল খাওয়াত, বিশ্রাম করতে দিত, আর তার পরেও যদি দুর্ঘটনা ঘটত তাহলে সে জন্য দুঃখ প্রকাশ করত। কিন্তু এসব কিছুই তারা করে নি, বরং অন্য কেউ করতে চাইলে তাকে বাধা দিয়েছে, কারণ তারা কেউই মানুষের কথা এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্যের কথা ভাবে নি, ভেবেছে শুধু যার যার চাকরির কথা, আর মনে করেছে যে চাকরির প্রতি কর্তব্য মানবিক সম্পর্কের চাইতে বড়। এই হচ্ছে আসল কথা।' নেখ্লয়ুদভ ভেবেই চলল। 'মাত্র এক ঘণ্টার জন্যই হোক আর কোন বিশেষ ক্ষেত্রেই হোক, একবার যদি মেনে নেই যে মানুষের প্রতি ভালবাসার চাইতেও বড় কিছু আছে, তাহলে এমন কোন অপরাধ নেই যা আমরা অপরাধবোধ মুক্ত হয়ে খোলা মনে করতে না পারি।'

নেখ্লয়ুদভ নিজের চিন্তার মধ্যে এতই ডুবে গিয়েছিল যে আবহাওয়ার পরিবর্তনটা তার চোখেই পড়ে নি। একটা ঝুলে-পড়া ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ

সূর্যকে ঢেকে ফেলেছে। পশ্চিম দিক থেকে একটা ঘন আধূসর মেঘ দ্রুত এগিয়ে আসছে, এবং অনেক দূরে মাঠ ও গাছপালার উপর ঘন বর্ষণ শুরু হয়েছে। মেঘের জল-কণা বাতাসের সঙ্গে মিশেছে। মেঘের বুক চিরে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, এবং বজ্রের গর্জন ট্রেনের ঝক-ঝক আওয়াজের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বাতাস ক্রমেই এগিয়ে আসছে। বায়ুতাড়িত বৃষ্টির তির্যক ফোঁটাগুলো প্ল্যাটফর্মে ও নেখ্‌লুদভের কোটের উপর পড়তে লাগল। প্ল্যাটফর্মের অপর দিকটায় সরে গিয়ে ফসলের ও ভিজে মাটির গন্ধে ভরা তাজা জলীয় বাতাসে নিঃশ্বাস টানতে টানতে সেখানে দাঁড়িয়েই সে দেখতে লাগল, বাগান, গাছপালা, হলুদ যবের ক্ষেত, সবুজ যইয়ের ক্ষেত, ফুলন্ত আলু-গাছের ঘন সবুজ সারি—সব সরে সরে যাচ্ছে। সব কিছুই ঝকঝক করছে : সবুজ সবুজতর দেখাচ্ছে, হলুদ আরও হলুদ এবং কালো আরো কালো।

নববর্ষণে উজ্জীবিত বাগান ও গাছপালা দেখে উৎফুল্লচিত্তে নেখ্‌লুদভ বলে উঠল, 'আরও! আরও!'

ঘন বর্ষণ বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। মেঘের কিছুটা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ল, কিছুটা হাওয়ায় উড়ে গেল, আর দেখতে দেখতে বৃষ্টির শেষ ফোঁটাগুলি সোজা ভিজে মাটির উপর পড়তে লাগল। আবার সূর্য উঠল, সব কিছু চিক-চিক করতে লাগল, আর পূর্ব প্রান্তে—দিগন্ত-রেখা থেকে খুব উঁচুতে নয়—একটা উজ্জ্বল রামধনু দেখা দিল; তার এক দিক ভাঙা, আর বেগুনি রংটা বড়ই স্পষ্ট।

প্রকৃতির এই দৃশ্য-পরিবর্তন যখন শেষ হয়ে গেল, ট্রেনটা যখন দুই পাশের উঁচু ঢালের ভিতর দিয়ে চলেছে, তখন নেখ্‌লুদভ নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল, 'হ্যাঁ, আমি যেন কি ভাবছিলাম?'

'ওঃ! এই সব লোকের কথা ভাবছিলাম : ইন্সপেক্টর, কনভয়ের লোকজন যারা চাকরি করে এবং যারা মূলত ভাল লোক, শুধু চাকরি করে বলেই নিষ্ঠুর।'

সে আবার ভাবতে লাগল, 'গভর্ণর, ইন্সপেক্টর, পুলিশ,—হয় তো এদেরও প্রয়োজন আছে; কিন্তু মানুষের মধ্যে যখন প্রধান মানবিক গুণ পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতির অভাব ঘটে সে যে বড়ই মর্মান্তিক।

'আসলে যা আইন নয় তাকেই এরা আইন বলে মানে, আর ঈশ্বর নিজের হাতে মানুষের বুকের মধ্যে যে শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় আইন লিখে রাখেন তাকে এরা আইন বলে মোটেই মানে না। সেই জন্যই যখনই এসব লোকের সংস্পর্শে আসি তখনই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। তাদের আমি ভয় করি। সত্যি তারা ভয়ংকর, দস্যুর চাইতেও ভয়ংকর। দস্যুর অন্তরেও করুণা থাকে, কিন্তু তাদের মনে করুণার স্থান নেই; এই সব পাথরের বুকে যেমন গাছ জন্মে না, তেমনি তাদের বুকে করুণার শিকড় গজায় না। সেই জন্যই তারা ভয়ংকর।

লোকে বলে "পুগাচভ্" ও "রাজিন"রা* ভয়ংকর। এই সব লোকেরা তাদের চাইতে হাজার গুণ ভয়ংকর।' নেখ্‌লুদভের চিন্তা এগিয়েই চলল।

কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করলে আমাদের সমকালীন মানুষরা—খৃস্টধর্মে-বিশ্বাসী, মানবিকবোধসম্পন্ন, দয়ালু মানুষরা—অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ করবে অথচ তাদের মনে কোন অপরাধবোধ জাগবে না, এই রকম একটা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা যদি উপস্থাপিত করা যায়, তাহলে তার একটিমাত্র সমাধানই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে : যা করা হচ্ছে সেটাকেই চালিয়ে যাওয়া। শুধু দরকার এই মানুষগুলিকে গভর্ণর, ইন্সপেক্টর, পুলিশ বানিয়ে দেওয়া, তাদের শুধু এইটুকু বুঝিয়ে দেওয়া যে সরকারী চাকরি নামক এক ধরনের কাজ আছে যাতে মানুষের সঙ্গে ভাইয়ের মত ব্যবহার না করে কোন বস্তুর মত ব্যবহার করা চলে; আর এই সরকারী চাকরির সুতো দিয়ে তাদের সকলকে এমন ভাবে একত্রে বেঁধে দেওয়া দরকার যাতে তাদের কৃতকর্মের দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে কারও একলার ঘাড়ে না চাপে। আজ যে সব ভয়ংকর ঘটনা আমি স্বচক্ষে দেখলাম, এই পথে ছাড়া আজকের দিনে তা কিছুতেই ঘটতে পারত না। এর একমাত্র কারণ, মানুষ মনে করে যে কোন কোন পরিস্থিতিতে মানুষের সঙ্গে প্রেমহীন আচরণ করা যায়। কিন্তু এ রকম কোন পরিস্থিতি থাকতে পারে না। প্রেমহীন আচরণ বস্তুর সঙ্গে করা যায়—বিনা প্রেমে আমরা গাছ কাটতে পারি, ইঁট বানাতে পারি, লোহা পিটতে পারি,—কিন্তু খুব সাবধান না হয়ে যেমন মৌমাছির সঙ্গে ব্যবহার করা চলে না, ঠিক তেমনি বিনা প্রেমে মানুষের সঙ্গেও ব্যবহার করা যায় না। মৌমাছির সঙ্গে অসতর্ক ব্যবহার করলে মৌমাছিদেরও ক্ষতি হবে, নিজেরও ক্ষতি হবে। মানুষের বেলায়ও ঠিক তাই। তার অন্যথা হতে পারে না, কারণ পারস্পরিক ভালবাসাই মানব জীবনের মূল নীতি। একথা ঠিক যে মানুষকে দিয়ে জোর করে করিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু জোর করে ভালবাসা পাওয়া যায় না; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ভালবাসা ছাড়াই মানুষের সঙ্গে চলা যায়, বিশেষ করে সেই মানুষের কাছে যদি কোন প্রত্যাশা থাকে। তোমার মনে যদি ভালবাসা না থাকে, চুপ করে বসে থাক, নানা রকম জিনিস নিয়ে, নিজেকে নিয়ে, তোমার যা খুশি তাই নিয়ে থাক, শুধু মানুষের কাছে এস না। একমাত্র ক্ষিধে থাকলেই যেমন তুমি নিজের ক্ষতি না করে খেতে পার, ঠিক তেমনি একমাত্র ভালবাসা থাকলেই তুমি বিনা ক্ষতিতে সকলের কল্যাণে কাজ করতে পার। বিনা প্রেমে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার কর, যেমন গতকাল আমার ভগ্নিপতির সঙ্গে আমি করেছি, দেখবে অপরের প্রতি তোমার নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতার কোন সীমা থাকবে

---

* রাশিয়ায় সংঘটিত বিদ্রোহের দুই নেতা: স্তেংকা রাজিন সপ্তদশ শতাব্দীর এবং পুগাচভ্ অষ্টাদশ শতাব্দীর।

না, যেমনটি আজ আমি নিজের চোখে দেখলাম, এবং তার ফলে তুমি নিজের জন্যও সীমাহীন যন্ত্রণা ডেকে আনবে—যে যন্ত্রণার সাক্ষী আমার সমস্ত জীবন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই, এই প্রকৃত সত্য; হ্যাঁ, এই প্রকৃত সত্য।' অসহ্য গরমের পরে প্রকৃতির শীতল আবহাওয়ায় যে সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে তার মনকে ঘিরে ছিল তার একটা সুস্পষ্ট সমাধান খুঁজে পেয়ে নেখ্‌ল্যুদভ নিজের মনেই কথাগুলি বার বার বলতে লাগল।

অধ্যায়—৪১

. নেখ্‌ল্যুদভের কামরাটা লোকজনে অর্ধেক ভর্তি। তাদের মধ্যে চাকর, মজুর, কারখানার কর্মী, কসাই, ইহুদি, দোকানদার, মজুরদের স্ত্রী, একজন সৈনিক, দুটি মহিলা (একটি তরুণী ও খোলা হাতে ব্রেসলেট পরা একটি বৃদ্ধা) এবং কালো টুপিতে প্রতীক-চিহ্ন বসানো একটি ভীষণ-দর্শন ভদ্রলোক। যার যার জায়গা দখলের হৈচৈ থেমে গেছে; সকলেই চুপচাপ বসে আছে; কেউ কড়মড় করে চানা-ভাজা খাচ্ছে, কেউ ধূমপান করছে, কেউ বা গল্প করছে। তারাস পথের পাশে খুশি মনে বসে আছে। নেখ্‌ল্যুদভের জন্যও একটা জায়গা রেখেছে। সুতীর কোট-পরা একটি পেশীবহুল লোকের সঙ্গে সে বেশ জমিয়ে গল্প করছে। নেখ্‌ল্যুদভ পরে জেনেছিল, সে একজন মালী, নতুন জায়গায় চলেছে। তারাসের কাছে যাবার আগে নেখ্‌ল্যুদভ পথের পাশেই সাদা দাড়িওয়ালা সুতীর হলদে কোট-পরা একটি বুড়ো লোকের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। চাষীদের পোশাকপরা একটি যুবতীর সঙ্গে বুড়ো কথা বলছিল। যুবতীটির পাশে বসে বছর সাতেকের একটি নতুন জামা পরা মেয়ে অনবরত চানা খাচ্ছিল।

বুড়ো লোকটি নেখ্‌ল্যুদভকে দেখতে পেয়ে নিজের জামার কোণটা সরিয়ে একটুখানি জায়গা করে দিয়ে বলল, 'এই যে, এখানে একটা জায়গা আছে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে যুবতীটি আবার কথা বলতে শুরু করল।

সে গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। শহরে গিয়েছিল স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে স্বামী তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছে তাই সে বলছিল।

'সেই "শ্রোভটাইড" উৎসবের সময় একবার গিয়েছিলাম, আর প্রভুর ইচ্ছায় এখন একবার গেলাম। ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে খৃস্টমাসের সময় আর একবার যাব।'

নেখ্‌ল্যুদভের দিকে একবার তাকিয়ে বুড়ো বলল, 'ঠিক করেছ। মাঝে মাঝে গিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ করা ভাল, নইলে শহর বলে কথা, একটা লোকের বিগড়ে যেতে কতক্ষণ।'

'না, না, আমার মানুষটা সে রকম নয়। কোন রকম বদ্দোষ নেই; একেবারে কুমারী মেয়েটির মত থাকে। যা কিছু উপার্জন করে একটা কোপেক পর্যন্ত বাড়ি পাঠায়। আর এই যে মেয়েটি, একে দেখে কী যে খুশি হয়েছে সে আর কি বলব।' কথা বলে যুবতীটি হাসতে লাগল।

বুড়ো বলল, 'আরে, তাহলে তো খুবই ভাল কথা। ও রকমটা নয় তো?' কামরার অন্য দিকে কারখানার মজুর শ্রেণীর দুটি স্বামী-স্ত্রী বসে ছিল। তাদের দেখিয়ে বুড়ো শেষের কথাগুলি বলল।

স্বামী একটা বোতল থেকে গলায় ভদকা ঢালছিল আর স্ত্রী একটা থলে হাতে নিয়ে হাঁ করে তাই দেখছিল।

যুবতীটি বলে উঠল, 'না, না, আমার মানুষটা মদ খায় না, ধোঁয়া টানে না। না গো, তার মত মানুষ জগতে বেশী মেলে না।' তারপর নেখ্‌লুয়ুদভের দিকে ফিরে বলল, 'এই এর মত মানুষ সে।'

খাওয়া শেষ করে লোকটা স্ত্রীকে বোতলটা দিল। সেও ঘাড় নেড়ে হাসতে হাসতে সেটাতে ঠোঁট লাগাল। নেখ্‌লুয়ুদভ ও বুড়ো লোকটি তাদের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে মজুরটি নেখ্‌লুয়ুদভকে বলল:

'কি দেখছেন স্যার? ভদকা খাচ্ছি তাই? আমরা কি কাজ করি সেটা কেউ দেখে না, সকলেই মদ খাওয়াটাই দেখে। নিজের টাকায় কিনেছি, নিজে খাচ্ছি, বৌকে খাওয়াচ্ছি। বাস। খতম।'

কি বলবে বুঝতে না পেরে নেখ্‌লুয়ুদভ বলল, 'ঠিক, ঠিক।'

'ঠিকই স্যার। আমার বৌ খুব ভাল। তাকে নিয়ে সুখে আছি, কারণ সে আমার দুঃখ বোঝে। কি বলিস্ মাভ্‌রা, ঠিক বলি নি?'

বোতলটা ফিরিয়ে দিয়ে বৌ বলল, 'এই নাও, আমি আর চাই না। আরে, এমন করে ফেলে দিচ্ছ কেন?'

'লাও ঠেলা! ভাল তো—বেশ ভাল; তারপরই মরচে-ধরা চাকার মত খিচ্‌ খিচ্‌ শুরু করে দেবে। ঠিক বলেছি কিনা মাভ্‌রা?'

মাভ্‌রা হেসে উঠল। মাতালের মত হাতটা নাড়তে লাগল।

'মলো যা, আবার শুরু করল।'

'লাও ঠেলা! ভাল তো—বেশ ভাল; কিন্তু লেজে পা পড়লেই একেবারে ফোঁস।......কেমন, ঠিক বলেছি কি না? ক্ষমা করবেন স্যার, একটু টেনেছি! কি আর করা যাবে?' বলতে বলতে মজুরটি ঘুম দেবার জন্য তার হাসি-মুখ বৌটির কোলের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

নেখ্‌লুয়ুদভ বুড়োর কাছে কিছুক্ষণ বসল। বুড়োও নিজের কথা বলতে শুরু করল। লোকটি স্টোভ তৈরি করে। পঞ্চাশ বছর ধরে এ কাজ করছে। এত স্টোভ তৈরি করেছে যে গুণে শেষ করা যায় না। এবার সে বিশ্রাম নিতে চায়, কিন্তু তার আর সময় হচ্ছে না। শহরে গিয়ে ছেলেপিলেদের

কাজের ব্যবস্থা করেছে, এবার গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। বুড়োর গল্প শুনে নেখ্‌লয়ুদভ তারাসের কাছে ফিরে গেল।

তারাসের উল্টো দিকে বসে ছিল মালী। নেখ্‌লয়ুদভের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বন্ধুত্বের সুরে বলে উঠল, 'ঠিক আছে স্যার, বসুন; বস্তাটা সরিয়ে দিচ্ছি।'

তারাস হেসে বলল, 'একটু চাপাচাপি হবে, তা হোক, আমরা তো সব বন্ধুর মত।' পাঁচ টোন ওজনের বস্তাটাকে একটা পাখির পালকের মত আস্তে তুলে সে দরজার কাছে নিয়ে গেল।

'প্রচুর জায়গা! তাছাড়া দরকার হলে একটু দাঁড়াতেও পারি, বা সিটের নীচেও ঢুকতে পারি। এখানে বেশ আরাম। ঝগড়াঝাটির কোন কারণই নেই।'

তারাস বলত, পেটে মদ না পড়লে সে কথা বলতে পারে না; মদ খেলেই ঠিক ঠিক কথাগুলো তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে আর সব কিছু বুঝিয়ে বলতে পারে। সত্যি, স্বাভাবিক অবস্থায় তারাস একেবারে চুপচাপ; কিন্তু কালে-ভদ্রে যখন মদ খায় তখন বেশ বাচাল হয়ে ওঠে। তখন সে অনেক কথা বলে; সহজ, সরলভাবে সত্য কথা বলে; তখন তার দুটি শান্ত নীল চোখের চাউনিতে এবং সদাহাস্যময় দুই ঠোঁটে অনেক সহৃদয়তা ঝিকমিকিয়ে ওঠে।

আজ সে সেই রকম অবস্থায়ই আছে। নেখ্‌লয়ুদভ এসে পড়ায় তাদের আলোচনায় বাধা পড়েছিল। বস্তাটাকে ঠিক জায়গায় রেখে তারাস আবার তার আসনে বসল এবং দুটো হাত এক করে কোলের উপর রেখে মালীর দিকে সোজা তাকিয়ে আগের কথায় ফিরে গেল। সে সবিস্তারে তার স্ত্রীর কথা বলছিল: কেন তাকে সাইবেরিয়ায় পাঠানো হচ্ছে, কেনই বা সেও তার সঙ্গে যাচ্ছে।

নেখ্‌লয়ুদভ এতটা বিস্তারিত বিবরণ জানত না, তাই সেও সাগ্রহে শুনতে লাগল। সে যখন এসে দাঁড়িয়েছে তখন গল্পটা সেই পর্যন্ত পৌঁচেছে যেখানে বিষপ্রয়োগের চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে এবং পরিবারের সকলেই বুঝতে পেরেছে যে সেটা ফেদসিয়ারই কাজ।

নেখ্‌লয়ুদভের দিকে তাকিয়ে তারাস বলল, 'আমার দুঃখের কথা বলছি। এমন একটি ভাল লোকের দেখা পেয়ে গেলাম বলেই কথায় কথায় তাকে সবই বলেছি।'

'বটে,' নেখ্‌লয়ুদভ বলল।

'তারপর বুঝলে বন্ধু, এইভাবে সব জানাজানি হয়ে গেল। মা পিঠেটা হাতে নিয়ে বলল, "আমি পুলিশ-অফিসারের কাছে যাচ্ছি।" বাবা বুড়ো মানুষ সে বলল, "দাঁড়াও বৌ, ও মেয়েটা ছেলেমানুষ, কি করেছে তা নিজেই জানে না। ওকে সবাই দয়া কর। তাহলেই ওর সুবুদ্ধি ফিরে আসবে।" কিন্তু কি বিপদ, মা কিছুতেই শুনবে না। সে বলে উঠল, "ওকে এখানে রাখলে

আমাদের সবাইকে আরসোলার মত শেষ করে ফেলবে।" বুঝলে বন্ধু, সে তো পুলিশ-অফিসারের কাছে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অফিসার এসে হাজির। সাক্ষীদের ডাকল।'

মালী জিজ্ঞাসা করল, 'আর তুমি?'

'আমি? আরে বন্ধু, আমি তো তখন পেটের ব্যথায় গড়াগড়ি দিচ্ছি আর বমি করছি। পেটের ভিতর থেকে সব যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে; কথাটাও বলতে পারছি না। তখন বাবাই গাড়ি জুতে ফেদসিয়াকে গাড়িতে বসিয়ে প্রথমে থানায় ও তারপরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে গেল। আর সেও বুঝল, প্রথম থেকেই যেমন করছিল ঠিক তেমনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও সব কবুল করল—কোথায় আর্সেনিক পেল, কেমন করে পিঠে বানাল, সব। ম্যাজিস্ট্রেট শুধাল, "তুমি এ কাজ করলে কেন?" সে বলল, "কেন? কারণ ওকে আমি ঘৃণা করি। ওর কাছে থাকার চাইতে সাইবেরিয়ায় যাওয়াও ভাল।" এই হল ব্যাপার।' তারাস হাসল।

'তারপর সে তো সব কবুল করল। তখন স্বভাবতই—কারাগার; বাবা একা বাড়ি ফিরে গেল। সামনে ফসলের মরশুম, বাড়িতে মা একমাত্র মেয়েমানুষ, তার উপর তার শরীরেও আর আগের মত শক্তি নেই। কাজেই ভাবতে লাগলাম কি করা যায়। ওকে কি জামিনে বের করে আনা যায় না? অগত্যা বাবা গিয়ে একজন কর্মচারির সঙ্গে দেখা করল। সে ভাগিয়ে দিল। তারপর আর একজনের কাছে। এইভাবে পাঁচ পাঁচ জন। তখন ভাবলাম, ও চেষ্টা ছেড়েই দেব। তখন হঠাৎই একজন করণিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—এমন চালাক-চতুর লোক সচরাচর দেখা যায় না। সে বলল, "আমাকে পাঁচ রুবল দাও, ওকে বের করে দিচ্ছি।" তিন-এ রফা হল। কি রকম বুঝছ বন্ধু? বৌর নিজের হাতে বোনা কাপড়টা বন্ধক দিয়ে তাকে টাকাটা দিলাম। যেই না কাগজটা লিখে শেষ করল,' তারাস এমন ভাবে হাতটা ঘোরালো যেন সে বন্দুক থেকে গুলি করার বর্ণনা দিচ্ছে, 'আর সঙ্গে সঙ্গে ফল হল। আমি ততদিনে উঠে দাঁড়িয়েছি। নিজেই তাকে আনতে গেলাম।'

'তারপর বন্ধু, শহরে গেলাম, ঘোড়াটাকে রাখলাম, কাগজখানা নিলাম, কারাগারে হাজির হলাম "কি চাও?" আমি বললাম, "এই চাই; আমার বৌকে কারাগারে আটক রেখেছে।" "সঙ্গে কাগজ এনেছ?" কাগজখানা দিলাম। সে একনজর দেখে বলল, "অপেক্ষা কর।" একটা বেঞ্চিতে বসলাম। বেলা তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। একজন বাবু বেরিয়ে এল। "তুমি বরয়ুকভ?" "আমি।" "বেশ, নিয়ে যাও।" ফটক খুলে গেল। সুস্থ শরীরে নিজের পোশাকেই তাকে বের করে দিল। "আরে, চলে এস।" "তুমি কি পায়ে হেঁটে এসেছ?" "না, ঘোড়া নিয়ে এসেছি।" তারপর সহিসকে তার পাওনা মিটিয়ে দিলাম, ঘোড়াটাকে জুতলাম, বাকি খড়টা

বিছিয়ে তার উপর বস্তা পেতে তার বসার জায়গা করে দিলাম। একটা শালে শরীরটা ঢেকে সে উঠে বসল। আমিও ঘোড়া চালিয়ে দিলাম। সেও কিছু বলে না, আমিও কিছু বলি না। বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে সে বলল, "মা কেমন আছে? বেঁচে আছে তো? "হ্যাঁ, আছে।" "আর বাবা, সে বেঁচে আছে তো?" "হ্যাঁ আছে।" সে বলল, "তারাস, আমার বোকামির জন্য আমাকে ক্ষমা কর। আমি যে কি করলাম আমি নিজেই বুঝতে পারি নি।" আমি বললাম, "কথায় তো কাজ হবে না। অনেক আগেই তোমাকে ক্ষমা করেছি।" সে আর কোন কথা বলল না। আমরা বাড়ি পৌঁছলাম। সে মার পায়ের উপর উপুর হয়ে পড়ল। মা বলল, "প্রভু তোমাকে ক্ষমা করবেন।" আর বাবা বলল, "কেমন আছ? যা হবার তা হয়ে গেছে। ভালভাবে চলতে চেষ্টা কর। এখন এসব কথার সময় নয়। ফসল কাটার সময় হয়ে গেছে। প্রভুর ইচ্ছায় মাঠে এত যব হয়েছে যে কাস্তে চালান যাচ্ছে না। সব জড়িয়ে ফসলের ভারে মাঠে শুয়ে পড়েছে; কিন্তু যেমন করে হোক কাটতে তো হবেই। কালই তারাস আর তুমি গিয়ে বরং দেখে এস।" দেখ বন্ধু, সেই থেকেই সে কাজে লেগে গেল, আর এমন কাজ করতে লাগল যে সকলেই অবাক হয়ে গেল। ঐ সময় আমরা তিন "দেসাতিনা" (১ দেসাতিনা=২¾ একর) জমি ভাড়া নিয়েছিলাম এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রচুর যই ও যব আমরা পেলাম। আমি ফসল কাটি ও আঁটি বাঁধে, কখনও বা দুজনই কাটি। আমি ভালই কাজ করি, কাজকে ডরাই না কিন্তু ও যে কাজে হাত দেয় সেটা আরও ভালভাবে করে। ও খুবই চটপটে আর জীবন্ত। কি বলব বন্ধু কাজে ওর এত আগ্রহ যে অনেক সময় আমাকে থামিয়ে দিতে হয়। যখন বাড়ি ফিরে যাই, আঙুলগুলো ফুলে-ওঠে, হাত ব্যথা করে; কিন্তু ও বিশ্রাম না নিয়েই পরদিন আঁটি বাঁধবার দড়ির জোগাড় করতে সঙ্গে সঙ্গে গোলায় চলে যায়। কী পরিবর্তন!'

মালী জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, তোমার সঙ্গে তখন ভাল ব্যবহার করত তো?'

'নিশ্চয়। সে এমনভাবে আমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল যেন আমরা এক আত্মা! আমি যা বলি তাই সে বোঝে। খুব রেগে থাকলেও। মাও না বলে পারল না; "মনে হচ্ছে আমাদের ফেদসিয়া বদলে গেছে; সে এখন একেবারে আলাদা মেয়েমানুষ!" খড় বোঝাই করে আনবার জন্য দুটো গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলাম। সে আর আমি এক গাড়িতেই ছিলাম। আমি বললাম, "ফেদসিয়া, ও কাজটা করবার কথা তোমার মাথায় এল কেমন করে?" সে বলল, "এই ভাবে কিনা আমি তোমার সঙ্গে থাকতেই চাই নি। ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে থাকার চাইতে মরে যাওয়াই ভাল।" আমি বললাম, "আর এখন?" সে বলল, "এখন তো তুমি আমার প্রাণের প্রাণ!" তারাস থামল,

খুশির হাসি হাসল, আর তার পরেই সবিস্ময়ে মাথা নাড়তে লাগল। 'সবে ফসল ঘরে তুলেছি, শন-পাট জলে ভিজিয়ে বাড়ি ফিরেছি,' কথা থামিয়ে সে মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে আবার শুরু করল,—'এমন সময় সমন এসে হাজির; ওকে বিচারের জন্য হাজির হতে হবে। আমরা তো এর মধ্যে সে সব কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম।'

মালী বলল, 'সবই শয়তানের কাজ। কোন মানুষ কি নিজের থেকে আর একটা জীবনকে নষ্ট করার কথা ভাবতে পারে? এক সময়ে আমাদের একজন চেনাশোনা লোক ছিল'—মালী একটা গল্প ফাঁদতে যাবে এমন সময় ট্রেনের গতি কমতে লাগল।

সে বলল, 'মনে হচ্ছে একটা স্টেশন আসছে। একচুমুক খেয়ে আসি।'

আলোচনা বন্ধ হল। মালীর সাথে সাথে নেখ্‌ল্যুদভও কামরা থেকে বেরিয়ে স্টেশনের ভিজে প্ল্যাটফর্মে পা দিল।

অধ্যায়—৪২

কামরা থেকে বের হবার আগেই নেখ্‌ল্যুদভের নজরে পড়েছিল, স্টেশন-চত্বরে যেন কিছু সুসজ্জিত গাড়ি-ঘোড়া, লোকজন, চাকর-বাকর হাজির রয়েছে। কোন গাড়িতে তিনটি, কোন গাড়িতে চারটি ঘোড়া জোতা রয়েছে; তাদের গলার ঘণ্টা ঠুন্‌-ঠুন্‌ করে বাজছে। ভিজে প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েই সে দেখতে পেল, প্রথম শ্রেণীর কামরার সামনে একদল লোক জটলা করছে। তাদের মধ্যে আছে একটি মজবুত চেহারার মহিলা; তার গায়ে একটা ওয়াটার-প্রুফ জড়ানো, টুপিতে দামী পালক বসানো। তার পাশেই একটি একহারা চেহারার যুবক, পরনে সাইক্লিং সুট। গলায় দামী কলার বাঁধা একটা মস্ত বড় কুকুর তার সঙ্গে। তাদের পিছনে একটি লোক ছাতা ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর আছে কোচয়ান।

মোটাসোটা মহিলাটি থেকে লম্বা কোট-পরা কোচয়ান পর্যন্ত সকলেরই চেহারায় ঐশ্বর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের ছাপ। দেখতে দেখতে তাদের চারপাশে ছোটখাট একটা ভীড় জমে গেল—লাল টুপি-পরা স্টেশন-মাস্টার, একটি সৈনিক, গলায় মালা একটি শুকনো চেহারার কৃশ তরুণী, জনৈক করণিক, ও কিছু স্ত্রী-পুরুষ যাত্রী।

কুকুর হাতে যুবকটিকে নেখ্‌ল্যুদভ চিনতে পারল—ব্যায়ামের আখড়ার ছাত্র তরুণ কর্চাগিন। তাহলে ঐ মোটা মহিলাটি নিশ্চয় প্রিন্সেসের বোন, যার জমিদারিতে কর্চাগিনরা চলেছে। সোনালী দড়ি-লাগানো পোশাক ও চকচকে টপ-বুট পায়ে চীফ গার্ড সসম্মানে কামরার দরজা খুলে দাঁড়াল; ফিলিপ ও সাদা এপ্রন-পরা একটি কুলি খুব সাবধানে ফোল্ডিং-চেয়ারে বসিয়ে

প্রিন্সেসকে কামরা থেকে নামাল। দুই বোনের দেখা হল, আর ফরাসী শব্দের ফোয়ারা ছুটল। প্রিন্সেস ঢাকা গাড়িতে যাবেন, না খোলা গাড়িতে? অবশেষে শোভাযাত্রা শুরু হল; সকলের শেষে চলল মহিলার পরিচারিকাটি, তার হাতে ছাতা ও চামড়ার ব্যাগ।

এদের সঙ্গে পুনরায় দেখা করার ইচ্ছা নেখ্‌ল্যুদভের ছিল না। তাই এরা বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

প্রিন্সেস, তার ছেলে মিসি, ডাক্তার ও পরিচারিকা প্রথম গেল। বৃদ্ধ প্রিন্স ও তার শ্যালিকা তাদের পিছনে। নেখ্‌ল্যুদভ তাদের কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাই কয়েকটি অসংলগ্ন ফরাসী উক্তি ছাড়া আর কিছুই তার কানে এল না। যে কারণেই হোক প্রিন্সের একটা বক্তব্য অবিকল তারই উচ্চারণ-ভঙ্গীসহ নেখ্‌ল্যুদভের স্মৃতিতে দাগ কেটে গেল।

রক্ষী ও কুলিদের নিয়ে শ্যালিকাকে সঙ্গে করে স্টেশন থেকে বের হবার সময় প্রিন্স তার আত্মম্ভরী উচ্চকণ্ঠে কার প্রসঙ্গে যেন বলে উঠল, "Oh it est du vrai grand monde, du vrai grand monde" (ওঃ, সে খুব বড় ঘরের ছেলে, খুব বড় ঘরের ছেলে)।

ঠিক সেই মুহূর্তে স্টেশনের এক কোণ থেকে একদল মজুর এসে হাজির হল। তাদের পায়ে বাকলের জুতো, কাঁধে ভেড়ার চামড়ার কোট ও বস্তা। সামনে যে কামরা পেল সেটাতেই তারা উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু গার্ড তাদের সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দিল। মজুররাও ছুটাছুটি ঠেলাঠেলি করে পরের কামরায় উঠতে গেল। তাদের দেখতে পেয়ে আর একজন গার্ড এসে ভীষণভাবে বকতে শুরু করে দিল। অগত্যা তারা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে পরের কামরাটার দিকে গেল। সেই কামরাতেই নেখ্‌ল্যুদভ ছিল। গার্ড সেখানেও তাদের বাধা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু নেখ্‌ল্যুদভ বলল যে ভিতরে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে, তারা স্বচ্ছন্দে উঠতে পাবে। নেখ্‌ল্যুদভের পিছনে পিছনে তারা সকলেই সেই কামরায় উঠে পড়ল। সকলে বসতে যাবে এমন সময় সেই প্রতীক চিহ্ন লাগানো ভদ্রলোক ও মহিলা দুটি ভীষণভাবে আপত্তি করে তাদের তাড়িয়ে দিতে চাইল। মজুরদের দলে ছেলে-বুড়ো মিলিয়ে জনকুড়ি লোক। কী আর করে, বস্তাগুলো টানতে টানতে তারা আবার দরজার দিকে এগোতে লাগল। দেখে মনে হল, যেন তারাই দোষ করেছে এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়েও যেখানে তাদের বসতে বলা হবে সেখানেই তারা বসতে রাজী, লোহার গজালের উপর বসতেও বুঝি তাদের আপত্তি নেই।

আর একজন গার্ডের কাছে পৌঁছতেই সেও খেঁকিয়ে উঠল, 'এই শয়তানের বাচ্চারা। ঠেলতে ঠেলতে কোথায় চলেছিস? এখানে বসে পড়্।'

মহিলা দুটির মধ্যে যে ছোট সে চেঁচিয়ে বলল, 'Voila encore des novelles (এ তো দেখছি বেশ নতুন রকম ব্যবস্থা)!' তার ধারণা, তার

চোস্ত্ ফরাসী শুনে নেখ্লুযুদভ তার দিকে নজর দেবে।

ব্রেসলেট-পরা মহিলাটি মুখভঙ্গী করে হাঁচতে শুরু করল; এই সব দুর্গন্ধভরা চাষীদের সঙ্গে চলা, ফেরায় যে কী সুখ তা নিয়ে মন্তব্য করতে লাগল।

একটা বিপদ কেটে গেলে মানুষ যে রকম খুশি হয়ে ওঠে তেমনি খুশি মনে কাঁধ থেকে বস্তাগুলো নামিয়ে মজুররা সব সিটের নীচে সেগুলি ঠেলে দিল।

তারাসের সামনে দুটো ও পাশে একটা সিট খালি ছিল। তিনটি মজুর সেখানে বসে পড়ল। কিন্তু ভদ্রলোকের পোশাক-পরা নেখ্লুযুদভ যখন সেখানে এসে দাঁড়াল তখন অপ্রস্তুতের মত তারা উঠে দাঁড়াল। নেখ্লুযুদভ তাদের বসতে বলে একটু দূরে আর একটা সিটে গিয়ে বসল।

বছর পঞ্চাশ বয়সের একটি মজুর আর একটি কম বয়সী মজুরের সঙ্গে বিস্মিত, বুঝিবা ভীত দৃষ্টি-বিনিময় করল। একজন ভদ্রলোকের পক্ষে যা স্বাভাবিক নেখ্লুযুদভ সেই ভাবে তাদের বকুনি দিয়ে না তাড়িয়ে নিজের জায়গায় তাদের বসতে দিল, এতে তারা বিস্মিত ও বিব্রত বোধ করতে লাগল। তাদের ভয় হল, কি জানি এর ফলে আবার খারাপ কিছু না ঘটে।

যাই হোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা যখন দেখল নেখ্লুযুদভ বেশ সহজ ভাবেই তারাসের সঙ্গে কথা বলছে, তখন তারা বুঝতে পারল এর পিছনে কোন ষড়যন্ত্র নেই। এইটুকু স্বস্তি বোধ করে তারা একটা ছেলেকে বস্তার উপর বসতে বলে নেখ্ল্যুদভকে তার সিটে গিয়ে বসবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। যে বয়স্ক লোকটি নেখ্লুযুদভের মুখোমুখি বসে ছিল প্রথমে সে পা গুটিয়ে একপাশে কুঁকড়ে বসে ছিল, পাছে ভদ্রলোকের গায়ে পা লেগে যায়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে বেশ বন্ধুর মত হয়ে উঠল এবং কথা বলতে বলতে নেখ্লুযুদভের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য দু'একবার তার হাঁটুতে থাপ্পড়ও বসিয়ে দিল।

তার সব কথা সে বলতে লাগল। জল-ভরা খনির মধ্যে তাকে কাজ করতে হয়। আড়াই মাস কাজ করে এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। সঙ্গে আছে দশ রুবলের মত, কারণ কাজে ঢুকবার আগেই কিছুটা আগাম নেওয়া ছিল। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এক-হাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের কাজ করতে হয়; মাঝে দু'ঘণ্টা খাওয়ার ছুটি।

'যাদের অভ্যাস নেই তাদের খুবই কষ্ট হয়, তবে একবার অভ্যাস হয়ে গেলে তখন আর কষ্ট হয় না, অবশ্য খাওয়াটা যদি ভাল হয়। গোড়ায় খাবার খারাপ দিত। তারপর সকলে নালিশ করায় এখন ভাল খাবার দেয়। ফলে কাজের সুবিধা হয়েছে।'

সে বলতে লাগল, 'বিশ বছর যাবৎ সে কাজ করছে আর সব উপার্জনের টাকা বাড়িতে পাঠিয়েছে; প্রথমে বাবাকে, তারপর বড় ভাইকে, আর এখন ভাই-পোকে, কারণ সেই এখন বাড়ির কর্তা। বছরে যে পঞ্চাশ ষাট রুবল সে

উপার্জন করে তার থেকে দুই বা তিন রুবল মাত্র সে নিজের জন্য খরচ করে—তামাক, দেশলাই ইত্যাদি বাবদ।'

একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে সে আরও বলল, 'তবে আমারও পাপ আছে; খুব ক্লান্তি বোধ করলে মাঝেসাঝে একটু ভদ্‌কা খাই।'

তারপর বাড়িতে মেয়েরা কি রকম কাজকর্ম করে সে কথা বলল। আরও বলল, 'আজ রওনা হবার আগে কণ্ট্রাক্টর মজুরদের আধ-বালতি ভদ্‌কা খাইয়েছে, তাদের মধ্যে একজন মারা গেছে, আর একজন অসুস্থ অবস্থায় তাদের সঙ্গেই ফিরছে। অসুস্থ ছেলেটি কামরার এককোণে বসে ছিল। তার চোখ-মুখ বসে গেছে, ঠোঁট দুটি নীল হয়ে গেছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, যন্ত্রণায় বেশ কষ্ট পাচ্ছে। নেখ্‌লুদভ তার কাছে এগিয়ে গেলে ছেলেটি এমন কাতর চোখে তার দিকে তাকাল যে তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করে নেখ্‌লুদভ বয়স্ক লোকটিকে বলল কুইনিন কিনে দিতে, আর কথাটা একটা কাগজে লিখেও দিল। দামটাও দিতে চেয়েছিল, কিন্তু মজুরটি জানাল, দামটা সেই দেবে।

বুড়ো লোকটি তারাসকে বলল, 'দেখ, আমি অনেক দেশ ঘুরেছি, কিন্তু এ রকম একজন ভদ্রলোক কখনও দেখি নি। মাথায় ঘুষি মারার বদলে তিনি নিজের জায়গাটাই তোমাকে ছেড়ে দেন। বোঝা যাচ্ছে, ভদ্রলোকও নানা রকম হয়।'

এইসব বলিষ্ঠ দেহ, ঘরে-তৈরি মোটা কাপড়ের পোশাক, আর রোদে-পোড়া শ্রান্ত, ক্লান্ত মুখগুলির দিকে তাকিয়ে এবং চারিদিকে নতুন মানুষের দল ও তাদের শ্রমিক জীবনের সুখ-দুঃখের মাঝখানে বসে নেখ্‌লুদভের মনে হল, 'হ্যাঁ, সত্যি এ এক নতুন ও স্বতন্ত্র জগৎ।'

সে মনে মনে বলল, 'এই তো **le vrai grand monde** (সব বড় ঘরের ছেলে)। প্রিন্স কর্চাগিনের কথাগুলি তার মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল, সংকীর্ণ, হীন স্বার্থসর্বস্ব কর্চাগিন-পরিবারের অলস, বিলাসবহুল জগতের কথা।

সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন, অজ্ঞাতপূর্ব ও সুন্দর জগতের আবিষ্কর্তা অভিযাত্রীর আনন্দে তার মন ভরে গেল।

তৃতীয় খণ্ড

অধ্যায়—১

যে কয়েদীদের দলে মাসলভা ছিল তারা প্রায় তিন হাজার মাইল পার হয়ে গেছে। ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে দণ্ডিত বন্দীদের সঙ্গে সেও রেল ও ষ্টীমবোটে পার্ম শহর পর্যন্ত যায়। ভেরা দুখোভার পরামর্শ অনুসারে নেখ্‌লু-দভের চেষ্টায় সেখান থেকেই মাসলভা রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে পথ চলবার অনুমতি পায়। ভেরা দুখোভাও সেই দলেই ছিল।

কি শারীরিক দিক থেকে, কি নৈতিক দিক থেকে, পার্ম পর্যন্ত পথযাত্রা মাসলভার পক্ষে বড়ই কষ্টদায়ক ছিল: শারীরিক দিক থেকে, কারণ অত্যধিক ভীড়, নোংরা, আর অস্বস্তিকর পোকা-মাকড়, যার ফলে তার মনে এতটুকু শান্তি ছিল না; আর নৈতিক দিক থেকে কারণ সমান অস্বস্তিকর পুরুষের দল। প্রতিটি বিরতি-কেন্দ্রে কিছু কিছু বদল হলেও সর্বত্রই পুরুষগুলি ছিল পোকা-মাকড়ের মতই নাছোড়বান্দা। তারা ঝাঁক বেঁধে তাকে ঘিরে থাকত, এতটুকু বিশ্রাম দিত না। স্ত্রী ও পুরুষ কয়েদীর দল, রক্ষীদল, কনভয়-সৈনিক দল—সকলের মধ্যেই ইতর ব্যভিচারের স্বভাব এমনই বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে কোন স্ত্রী-কয়েদী যদি তার নারীত্বের সুযোগ নিতে না চায় তাহলে তাকে সদা-সর্বদা অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চলতে হবে। সর্বদা ভয় ও সংঘর্ষের মধ্যে থাকা খুবই কষ্টকর; আর মাসলভার উপরেই আক্রমণটা চলত বেশী, কারণ তার চেহারা সুন্দর, আর তার অতীতও সকলের জানা। যে রকম দৃঢ়তার সঙ্গে সে পুরুষদের নাছোড়বান্দা আচরণের মোকাবিলা করতে লাগল তাতে তারা সকলেই তার উপর চটে গেল, তাদের মনে তার প্রতি একটা বিরূপ ভাবের সৃষ্টি হল। তবে ফেদসিয়া ও তারাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকায় তার কিছুটা সুবিধা হয়েছিল। স্ত্রীর উপর নির্যাতনের খবর শুনে তাকে সাহায্য করবার আশায় সে স্বেচ্ছায় নিঝ্‌নি নভ্‌গরদে গ্রেপ্তার বরণ করে এবং ঐ দলের সঙ্গেই কয়েদী হিসাবে চলতে থাকে।

তারপর যখন মাসলভাকে রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হল তখন তার অবস্থা অনেকটা সহনীয় হয়ে উঠল। রাজনৈতিক বন্দীদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থাও অনেক ভাল, এবং তাদের প্রতি ব্যবহারও ততটা কঠোর নয়। পুরুষের হাতে নির্যাতন সইতে হচ্ছিল না বলে এবং যে অতীতকে সে ভুলে থাকতে চায় সেটাকে কেউ মনে করিয়ে দিচ্ছিল না বলে তখন মাসলভার অবস্থা অনেকটা ভাল। কিন্তু এই পরিবর্তনের ফলে তার সব

চাইতে বড় সুবিধা এই হল যে, এখানে এমন কয়েকটি লোকের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটল যারা তার চরিত্রের উপর একটা নিঃসংশয় ও কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করতে লাগল।

সবগুলি বিরতি-কেন্দ্রেই মাসলভাকে রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হত; কিন্তু তার গায়ে জোর থাকায় ও স্বাস্থ্য ভাল থাকায় তাকে সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গেই পথ চলতে বাধ্য করা হত। এই ভাবে তম্স্ক্ থেকে সারাটা পথ তাকে হেঁটেই যেতে হল। দুটি রাজনৈতিক বন্দীও সেই দলের সঙ্গে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল: একজন পিঙ্গল-নয়না সুন্দরী মারিয়া পাভ্লভ্না—নেখ্ল্যুদভ যখন কারাগারে দুখোভার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল তখন এই মেয়েটির প্রতি তার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল; অপরজন সাইমনসন; যুবকটির গায়ের রং গাঢ়, চুল উস্কোখুস্কো, চোখ দুটি বসা; ঐ একই সময়ে নেখ্ল্যুদভ তাকেও দেখেছিল, আর এখন সে চলেছে ইয়াকুতস্ক অঞ্চলে নির্বাসনে। মারিয়া পাভ্লভ্না হেঁটেই চলেছে কারণ সে তার গাড়ির আসনটা একটি গর্ভবতী সাধারণ কয়েদীকে ছেড়ে দিয়েছে; আর সাইমনসন হেঁটে চলেছে কারণ একটা শ্রেণীগত সুবিধা ভোগ করাটা সে উচিত বলে মনে করে না। এই তিনজন খুব ভোরে সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে যাত্রা করত; বাকি রাজনৈতিক বন্দীরা গাড়িতে চড়ে পরে আসত; একটা বড় শহরে পৌছবার আগে পর্যন্ত যাত্রাপথে এই ব্যবস্থাই চলছিল; সেখানে পৌছে একজন নতুন কনভয়-অফিসার সেই দলের দায়িত্ব গ্রহণ করত।

সেপ্টেম্বরের একটি বর্ষণসিক্ত সকাল। মাঝে মাঝেই একটা ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়া বইছে। কখনও বৃষ্টি পড়ছে, কখনও বরফ পড়ছে। কয়েদীদের পুরো দলটা (প্রায় চারশ' পুরুষ ও পঞ্চাশটি স্ত্রীলোক) বিরতি-কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে জমা হয়েছে। কিছু কয়েদী কনভয়ের প্রধান কর্মকর্তাকে ঘিরে ধরেছে, কারণ কিছু কিছু বিশেষভাবে বেছে নেওয়া কয়েদীর হাতে সে দুদিনের খরচের টাকা দিয়ে দিচ্ছিল অপর কয়েদীদের মধ্যে বিলি করে দেবার জন্য; আবার কিছু কয়েদী ফেরিওয়ালীদের কাছ থেকে খাবার-দাবার কিনছিল। কয়েদীদের টাকা গোণার ও জিনিসপত্র কেনার শব্দ এবং ফেরিওয়ালীদের কর্কশ শব্দ কানে আসছিল।

কাত্যুশা ও মারিয়া পাভলভ্না বাড়িটার ভিতর থেকে উঠোনে বেরিয়ে এল। দুজনেরই পায়ে উঁচু বুট, গায়ে কলামের তৈরি খাটো জোব্বা, আর মাথায় শাল জড়ানো। ফেরিওয়ালীরা তখন বাতাস থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য উঠোনের উত্তরের দেয়ালের নীচে বসে তারস্বরে চেঁচিয়ে যার যার বেসাতী বেচতে ব্যস্ত: টাটকা রুটি, মাংসের পিঠে, মাছ, সেমাই, যবের হালুয়া, যকৃৎ, গো-মাংস, ডিম, দুধ—একজনের কাছে একটা সেদ্ধ শূকর-ছানাও ছিল।

সাইমনসন রবারের কুর্তা, রবারের জুতো ও সুতীর মোজা পরে (সে

নিরামিষাশী বলে কোন জন্তুর চামড়া ব্যবহার করে না) দলের যাত্রার অপেক্ষায় সেই উঠোনেই দাঁড়িয়েছিল। ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে যা মনে আসছিল তাই তার নোট-বইতে লিখে নিচ্ছিল। সে লিখল : "কোন সংক্রামক জীবাণু যদি মানুষের নখ পরীক্ষা করতে পারত তাহলে সে ওটাকে অজীব পদার্থ বলে ঘোষণা করত ; ভূ-মণ্ডলের বেলায় আমরাও সেই রকম তার বহিরাবরণটিকে পরীক্ষা করেই তাকে অজীব বলে ঘোষণা করি। এটা ভুল।"

ডিম, রুটি, মাছ ও চাপাটি কিনে মাসলভা সেগুলিকে তার থলেতে ভরছিল আর মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না স্ত্রীলোকটিকে তার দাম মিটিয়ে দিচ্ছিল, এমন সময় কয়েদীদের মধ্যে একটা সোরগোল পড়ে গেল। সকলেই চুপচাপ যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। অফিসারটি বেরিয়ে এসে যাত্রা শুরু করার আদেশ দিল।

যথারীতি আবার সবই করা হল। কয়েদীদের গুণতি করা হল, তাদের পায়ের শিকল পরীক্ষা করা হল, আর যারা জোড়ায়-জোড়ায় যাবে তাদের দুজন করে হাতে হাত-কড়া লাগিয়ে একসঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল। কিন্তু হঠাৎ অফিসারটি সক্রোধে চেঁচিয়ে উঠল এবং একটা আঘাতের শব্দ ও একটা শিশুর কান্না শোনা গেল। মুহূর্তের জন্য সব নিশ্চুপ, আর তারপরই ভিড়ের ভিতর থেকে একটা চাপা গুঞ্জন ভেসে এল। যেখান থেকে শব্দটা আসছিল মাসলভা ও মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না সেই দিকে এগিয়ে গেল।

অধ্যায়—২

ঘটনাস্থলে পৌঁছে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না ও কাতয়ুশা দেখতে পেল, সুন্দর একজোড়া গোঁফওয়ালা গাট্টাগোট্টা অফিসারটি ভুরু কুঁচকে কর্কশ গলায় কাঁচা খিস্তি করতে করতে নিজের ডান হাতের তালুটা ঘষছে ; একটি কয়েদীর মুখে চড় কসাবার দরুণ তার হাতে লেগেছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি ঢ্যাঙা, লিকলিকে কয়েদী ; তার মাথাটা অধেক কামানো, একটা খাটো জোব্বা এবং ততোধিক খাটো ট্রাউজার পরনে ; সে এক হাতে তার রক্তাক্ত মুখটা মুছছে এবং আরেক হাতে শালে মোড়া একটি ছোট মেয়েকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ; মেয়েটি ভয়ে চীৎকার করছে।

"আমি তোকে এইটে (কাঁচা খিস্তি) দেব। মুখে মুখে তর্ক করার এমন ঝাল বুঝিয়ে দেব (আরও খিস্তি)। ওটাকে মেয়েদের হাতে দিয়ে দিতে হবে!" অফিসারটি চেঁচাতে লাগল। "এই—এবার যাত্রা শুরু করাও।"

গ্রাম্য কম্যুন কর্তৃক নির্বাসিত এই কয়েদীটি তমস্ক্‌ থেকে সারাটা পথ

ছোট মেয়েটিকে বয়ে এনেছে, কারণ সেখানেই তার স্ত্রী টাইফয়েডরোগে মারা গেছে। এখানে এসে অফিসার হুকুম দিয়েছে, তার হাতে হাত-কড়া পরাতে হবে। নির্বাসিত লোকটি আপত্তি জানিয়ে বলেছে যে হাত-কড়া লাগালে সে মেয়েটিকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। অফিসারটির মেজাজ এমনিতেই খারাপ ছিল। বাস, এতেই সে খাপ্পা হয়ে ওঠে এবং তার আদেশ অমান্য করায় গোলমেলে কয়েদীটিকে ঠেঙানি দেয়।*

আহত কয়েদীটির পাশে একজন কনভয়-সৈনিক দাঁড়িয়ে ছিল। আর তার পাশে ছিল কালো দাড়িওয়ালা একটি কয়েদী; তার এক হাতে এক জোড়া হাত-কড়া; সে বিষণ্ন মুখে একবার অফিসারের দিকে একবার মেয়ে কোলে আহত কয়েদীটির দিকে তাকাচ্ছিল। অফিসার পুনরায় সৈনিকটিকে আদেশ করল মেয়েটিকে নিয়ে যেতে। এবার কয়েদীদের কলগুঞ্জন উচ্চতর হল।

পিছন থেকে কে যেন কর্কশ গলায় বলে উঠল, "তম্স্ক্ থেকে সারাটা পথ তো তাদের হাত-কড়া পরানো হয় নি।"

"এটা তো একটা শিশু, কুকুরের বাচ্চা নয়।"

"মেয়েটাকে নিয়ে সে কি করবে?"

"এটা তো আইন নয়," অপর কেউ বলল।

"লোকটা কে হে?" যেন কেউ হুল ফুটিয়েছে এমনভাবে অফিসারটি চীৎকার করে উঠল। ভীড়ের মধ্যে ছুটে গিয়ে বলল, "তোকে আইন শেখাচ্ছি। কে বলেছে? তুই? তুই?"

"সকলেই বলেছে, কারণ,—" একটি বেঁটে চওড়া-মুখ কয়েদী জবাব দিল।

তার কথা শেষ হবার আগেই অফিসারটি দুই হাতে তার মুখে আঘাত করল। "বিদ্রোহ? বটে? বিদ্রোহ কাকে বলে দেখাচ্ছি! তোদের সব্বাইকে কুকুরের মত গুলি করে মারব, আর তাতে কর্তৃপক্ষ আমাকে ধন্যবাদ দেবে। মেয়েটাকে নিয়ে যাও।"

ভীড় নিশ্চুপ। একটি কনভয়-সৈনিক ক্রন্দনরতা মেয়েটিকে জোর করে কেড়ে নিল। অপর সৈনিক কয়েদীটির হাতে হাত-কড়া পরিয়ে দিল; এবার সে বিনীতভাবে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

তলোয়ার-বাঁধা বেল্টটা ঠিক করতে করতে অফিসার চেঁচিয়ে বলল, "ওকে মেয়েদের কাছে নিয়ে যাও।"

ছোট মেয়েটির মুখ লাল হয়ে উঠেছে। শালের ভিতর থেকে হাত দুটি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে তারস্বরে চীৎকার করছে। মারিয়া পাভ্লভ্না ভীড়ের

---

* ডি. এ. লিন্য়েভ 'Transportation' গ্রন্থে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন।
—এল. টি.

ভিতর থেকে অফিসারের কাছে এগিয়ে গেল।

বলল, "আমি কি এই ছোট মেয়েটিকে বয়ে নিয়ে যেতে পারি ?"

"কে তুমি ?" অফিসার জিজ্ঞাসা করল।

"একজন রাজনৈতিক বন্দী।"

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নার সুন্দর মুখ ও বড় বড় দুটি চোখ (কয়েদীদের বুঝে নেবার সময়ই অফিসার তাকে লক্ষ্য করেছিল) অফিসারের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হল। নীরবে তার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভেবে সে বলল : "ইচ্ছা করলে নিতে পার, আমার কোন আপত্তি নেই। তোমার পক্ষে দয়া দেখানো সহজ ! কিন্তু লোকটা পালিয়ে গেলে কে তার জবাবদিহি করত ?"

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বলল "একটা মেয়েকে কোলে নিয়ে সে পালাবে কেমন করে ?"

"তোমার সঙ্গে বক-বক করবার সময় আমার নেই। ইচ্ছা হলে ওটাকে নিতে পার।"

"ওকে দিয়ে দেব কি ?" সৈনিকটি জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ, দিয়ে দাও।"

মেয়েটিকে ভুলিয়ে কাছে আনবার জন্য মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বলল, "আমার কাছে এস।"

কিন্তু শিশুটি সৈনিকের কোল থেকেই তার বাবার দিকে হাত বাড়িয়ে কাঁদতে লাগল, মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নার কাছে যেতে চাইল না।

থলে থেকে একটা পিঠে বের করে মাসলভা বলল, "একটু অপেক্ষা কর মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না, ও আমার কাছে আসবে।"

ছোট মেয়েটি মাসলভাকে চিনত ; তার মুখ ও পিঠেটা দেখে সে তার কোলে গেল।

আবার সব শান্ত। ফটক খোলা হল। কয়েদীর দল বাইরে গিয়ে সার বেঁধে দাঁড়াল। কনভয় আবারও কয়েদীদের গুণ্‌তি করল। গাড়ির উপর বস্তাগুলি চাপিয়ে তার উপর দুর্বল কয়েদীদের বসানো হল। মেয়েটিকে কোলে নিয়ে মাসলভা মেয়েদের দলে ফেদসিয়ার পাশে জায়গা করে নিল। সাইমনসন এতক্ষণ সব কিছু দেখছিল ; এবার সে দৃঢ় পদক্ষেপে অফিসারের দিকে এগিয়ে গেল। যাত্রার আদেশ দিয়ে সবে সে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় সাইমনসন বলল :

"আপনি খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন।"

"তোমার জায়গায় যাও ; সেটা তোমার ব্যাপার নয়।"

"আপনি যে খারাপ ব্যবহার করেছেন সেটা জানিয়ে দেওয়া আমার কাজ, আর সেটা আপনাকে জানিয়ে গেলাম।" পুরু ভুরুর নীচ থেকে অফিসারের

মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে সাইমনসন কথাগুলি বলল।

তার কথায় কান না দিয়ে অফিসার হাঁক দিয়ে উঠল, "তৈরি? আগে বাড়! বলেই কোচয়ানের ঘাড়ে হাত রেখে সে গাড়িতে উঠে বসল।

কয়েদীর দল যাত্রা শুরু করল। ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যে কর্দমাক্ত বড় রাস্তাটা চলে গেছে তার দুই দিকেই নালা। সেই রাস্তায় পড়ে কয়েদীর দল সার বেঁধে এগিয়ে চলল।

অধ্যায়—৩

যত কষ্টকরই হোক, দীর্ঘ ছ বছর শহরের লাঞ্ছিত, বিলাসী ও নারীসুলভ জীবন এবং সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে ছ'মাস কারা-জীবন কাটাবার পরে রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে জীবন কাটাতে কাতয়ুশার বেশ ভালই লাগছিল। প্রতিদিন পনেরো থেকে বিশ মাইল পথ পার হওয়া, ভাল খাবার ও দু'দিন অন্তর একদিন বিশ্রাম—ফলে তার শরীরে বল ফিরে এল। নতুন সঙ্গীদের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে এমন একটি অর্থপূর্ণ নতুন জীবনকে সে দেখতে পেল যার কথা আগে কখনও সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। যে সব আশ্চর্য মানুষের সঙ্গে (তার নিজের কথা) সে চলেছে তেমন সে আগে কখনও দেখা তো দূরের কথা কল্পনাও করতে পারে নি।

সে বলত, 'দেখ! যখন শাস্তি দেওয়া হল তখন আমি কেঁদেছিলাম। অথচ এই দণ্ডাজ্ঞার জন্য আমার সারা জীবন ধরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। নইলে তো আজ আমি যাঁদের চিনেছি কোন দিন তাঁদের দেখা পেতাম না।"

বিনা চেষ্টায় সহজেই সে এই সব মানুষের কাজের মূল প্রেরণাটাকে উপলব্ধি করতে করতে এবং সে নিজেও জনতার একজন হওয়ার দরুন তাঁদের প্রতি তার পূর্ণ সহানুভূতি জেগে উঠল। সে বুঝতে পারত, এই মানুষগুলি উচ্চশ্রেণীর বিরুদ্ধে জনগণের পক্ষ সমর্থক, এবং নিজেরা সেই উচ্চশ্রেণীর লোক হয়েও জনগণের জন্যই সব সুযোগ-সুবিধা ও স্বাধীনতা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেছে। বিশেষ করে সেই জন্যই সে তাঁদের এত বড় মনে করে, এত প্রশংসা করে।

নতুন সঙ্গীদের সকলকেই তার ভাল লাগে, কিন্তু বিশেষ করে ভাল লাগে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নাকে। শুধু যে ভাল লাগে তাই নয়, একটা অদ্ভুত শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঙ্গে সে তাকে ভালবাসে। এই সুন্দরী মেয়েটি তিনটে ভাষা বলতে পারে, সে একজন ধনী জেনারেলের মেয়ে, তার ধনী দাদা যা কিছু পাঠিয়েছিল সব সে বিলিয়ে দিয়েছে, একটি সরল মজুর মেয়ের মত সে থাকে, তার সাজ-পোশাক শুধু সরল নয়, একেবারেই গরীবের মত, নিজের

চেহারার দিকেও তার দৃষ্টি নেই। এ সব কিছু দেখে মাসলভা অভিভূত হয়েছে। তার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, নারীসুলভ ছলা-কলার সম্পূর্ণ অভাবই মাসলভার কাছে বিশেষভাবে বিস্ময়কর ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

মাসলভা বুঝতে পারে, মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না যে সুন্দরী তা সে নিজে জানে এবং জেনে খুশিও হয়, অথচ তার সেই সুন্দর চেহারার যে প্রতিক্রিয়া পুরুষের মনে দেখা দেয় তাতে সে মোটেই খুশি নয়ঃ বরং সেটাকে সে ভয় করে এবং সকলেই যে তার সঙ্গে প্রেমে পড়তে চায় এতে সে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করে, ভীত হয়। তার পুরুষ সঙ্গীরা এ কথা জানে এবং কখনও তার সঙ্গে প্রেমে পড়ে না—আর পড়লেও তা চেপে রাখে—এবং তার সঙ্গে একটি পুরুষ—সঙ্গীর মতই ব্যবহার করে; কিন্তু অপরিচিত যে সব পুরুষ তাকে জ্বালাতন করে তাদের বেলায় তার দৈহিক শক্তিটা খুবই কাজে লাগে।

সে হাসতে হাসতে কাতয়ুশাকে বলে, "একদিন হল কি একটি লোক পথে আমার পিছু নিল। সে কিছুতেই আমাকে ছাড়বে না। শেষে তাকে ধরে এমন ঝাঁকুনি দিলাম যে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।"

সে নিজেই বলেছে, শিশুকাল থেকেই সে ধনী লোকদের জীবনযাত্রাকে অপছন্দ করত এবং সাধারণ মানুষের জীবনকে ভালবাসত, আর সেই জন্যই সে বিপ্লবী হয়েছে। বসবার ঘরের বদলে চাকরদের ঘরে, রান্নাঘরে বা আস্তাবলে দিন কাটাত বলে তখন সে অনেক বকুনি খেয়েছে।

সে বলে, 'রাঁধুনি ও কোচোয়ানদের সঙ্গে থাকতেই আমার ভাল লাগত; ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকদের সঙ্গে থাকলেই কেমন মন খারাপ হয়ে যেত। তারপর যখন সব কিছু বুঝতে শিখলাম তখন দেখলাম, আমাদের জীবনটা একেবারেই ভুল। আমার মা ছিল না। বাবাকেও ভাল লাগত না। তাই উনিশ বছর বয়সেই বাড়ি ছাড়লাম এবং একটি মেয়ে-বন্ধুর সঙ্গে কারখানায় কাজে ঢুকলাম।"

কারখানা ছেড়ে সে কিছুদিন গ্রামে ছিল। তারপর শহরে ফিরে সে এমন একটা আস্তানায় থাকত যেখানে তাদের একটা গুপ্ত ছাপাখানা ছিল। সেখান থেকেই সে গ্রেপ্তার হয় এবং সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সে নিজে কিছু না বললেও কাতয়ুশা অন্যদের কাছ থেকে শুনেছে যে, পুলিশ যখন তাদের আস্তানায় খানাতল্লাসি চালায় তখন একজন বিপ্লবী অন্ধকারের ভিতর থেকে গুলি চালায় এবং সেই দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না দণ্ডভোগ করে।

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকেই কাতয়ুশা লক্ষ্য করছে যে, নিজে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন সে কখনও নিজের কথা ভাবেনা,সর্বদাই অপরের সেবা করতেই সে ব্যস্ত; ছোট বড় যে কোন ব্যাপারে অন্যকে সাহায্য করতেই সে চায়। তার সম্পর্কে একজন বর্তমান সঙ্গী মন্তব্য করেছেন যে বিশ্ব-প্রেমের খেলায় সে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। কথাটি ঠিক। খেলোয়াড় যেমন

খেলার সন্ধানে ফেরে, সেই রকম অপরকে সেবা করবার সুযোগ খোঁজাই তার সারা জীবনের লক্ষ্য। সেই খেলা ক্রমে তার জীবনের অভ্যাস ও কাজে পরিণত হয়েছে; এমন সহজভাবে এ সব কাজ সে করে যে যারা তাকে জানে তারা এ জন্য তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, বরং প্রত্যাশাই করে।

মাসলভা যখন প্রথম তাদের মধ্যে এল তখন মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না তার প্রতি বিরূপ হয়েছিল, বিরক্ত হয়েছিল। কাত্যুশাও সেটা লক্ষ্য করেছিল; কিন্তু সে আরও বুঝতে পেরেছিল যে সে মনোভাবকে জয় করবার চেষ্টার ফলে ক্রমে সে মাসলভার প্রতি বিশেষ মমতা ও করুণা বোধ করতে শুরু করেছে। একটি অসাধারণ মানুষের এই মমতা ও করুণা মাসলভাকে এতই অভিভূত করে ফেলল যে সে তার সমস্ত অন্তরটাই তাকে দিয়ে ফেলল; নিজের অজ্ঞাতেই তার মতামতকে গ্রহণ করে সর্বপ্রকারে তাকে অনুকরণ করতে লাগল। আর মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নাও কাত্যুশার এই আত্ম-নিবেদিত ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে প্রতিদানে তাকেও ভালবেসে ফেলল।

যৌন ভালবাসার প্রতি বিরূপতাও তাদের দুজনকে এক সূত্রে বেঁধে দিল একজন সে ভালবাসাকে ঘৃণা করে কারণ সে ভালবাসার সব রকম বিভীষিকার অভিজ্ঞতা তার হয়েছে; আর অপর জন সেদিক থেকে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হওয়ায় সেটাকে একটা দুর্বোধ্য, ঘৃণ্য ও মানবিক মর্যাদার পরিপন্থী কিছু বলে মনে করে।

অধ্যায়—৪

যেসব প্রভাবের কাছে মাসলভা নিজেকে নত করেছে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নার প্রভাব তাদের অন্যতম। মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নার প্রতি মাসলভার ভালবাসাই তার উৎস। তার জীবনের আর একটি প্রভাব এসেছে সাইমনসনের কাছ থেকে। মাসলভার প্রতি সাইমনসনের ভালবাসাই তার উৎস।

মানুষ বেঁচে থাকে এবং কাজ করে অংশত নিজের ধারণা এবং অংশত অপরের ধারণা অনুসারে। এই দুইয়ের তারতম্য অনুসারেই একজন মানুষ থেকে আর একজন মানুষকে পৃথক করা হয়। কারও কাছে চিন্তা এক ধরনের মানসিক খেলা: অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের বুদ্ধিকে সংযোগরক্ষাকারী ফিতেবিহীন একটা চালক-চক্রের (driving wheel) মত ব্যবহার করে, এবং অপর লোকের ধারণার দ্বারা—প্রচলিত রীতিনীতি, ঐতিহ্য অথবা আইনের দ্বারা—পরিচালিত হয়। আবার কেউ বা সব রকম কাজের ক্ষেত্রেই নিজেদের ধারণাকেই প্রধান প্রেরণা-শক্তি বলে গ্রহণ করে, নিজেদের বুদ্ধির নির্দেশকেই মেনে চলে; তবে কখনও কখনও ভাল করে বিচার-বিবেচনা করে তবে অপরের মতামতকে গ্রহণ করে। সাইমনসন সেই রকম একটি মানুষ; সমস্ত

ঘটনাকে ভাল করে পরীক্ষা করে নিজের বুদ্ধি অনুসারে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং তার পরে তদনুসারেই কাজ করে।

স্কুলের ছাত্রাবস্থায় যখন সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে সরকারী আপিসে খাজাঞ্চির কাজে নিযুক্ত তার বাবার আয় সৎপথে উপার্জিত নয়, তখনই সে বাবাকে বলেছিল সে-টাকা জনসাধারণকে দিয়ে দেওয়া উচিত। তার কথা না শুনে বাবা যখন উল্টে তাকেই বকুনি লাগাল তখনই সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল এবং কিছুতেই আর বাবার টাকা-পয়সা নিতে রাজী হল না। যখনই তার মনে হল যে জনগণের অশিক্ষাই সব দোষের মূল কারণ, তখনই সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এসেই "নারদনিক" (গণ দল)-এ যোগ দিল, একটি গ্রাম্য স্কুল-শিক্ষকের চাকরি নিল এবং ছাত্রদের ও চাষীদের সাহসের সঙ্গে সেই সব শিক্ষা দিতে লাগল যাকে সে ন্যায় বলে মনে করে, আর যাকে অন্যায় বলে মনে করে প্রকাশ্যে তার প্রতিবাদ করতে লাগল।

সে গ্রেপ্তার হল। তার বিচারও হল।

বিচারের সময় সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে তার বিচার করবার কোন অধিকার তার বিচারকদের নেই, আর সে কথা তাদের জানিয়েও দিল। বিচারকরা যখন তার কথায় কান না দিয়ে বিচার চালিয়ে যেতে লাগল, তখন সে স্থির করল তাদের কোন প্রশ্নের জবাব দেবে না, এবং তাদের সব রকম জেরার উত্তরে একেবারে চুপ করে রইল।

আর্খাঙ্গেলস্ক্ জেলায় তাকে নির্বাসিত করা হল। সেখানে একটি নতুন ধর্ম-শিক্ষার প্রবর্তন করে তদনুসারে তার সব কাজকর্ম পরিচালিত করতে লাগল। সেই শিক্ষার মূল কথা হল: এই জগতের সব কিছুই প্রাণময়, কোন কিছুই মৃত নয়, যে সকল বস্তুকে আমরা নিষ্প্রাণ বা অজৈব বলে মনে করি সে সব কিছুই আমাদের বুদ্ধির অগম্য এক বিরাট জৈব সত্তার অংশ মাত্র; আর সেই বিরাট জীব-দেহের ও তার প্রতিটি জীবন্ত অংশের প্রাণ-প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখাই তার অংশস্বরূপ প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। এবং তার মতে জীব-হিংসামাত্রই অপরাধ; তাই সে যুদ্ধ, প্রাণদণ্ড এবং মানুষ অথবা অন্য কোন প্রাণী হত্যার বিরোধী। বিবাহ-বিষয়েও তার একটা নিজস্ব মত ছিল: সে মনে করত, জীবসৃষ্টি মানব-জীবনের নীচু স্তরের কর্তব্য, জীবিত প্রাণীর সেবাই তার মহত্তর কর্তব্য। রক্তে শ্বেত-কণিকার অস্তিত্বই তার মতকে সমর্থন করে বলে সে বিশ্বাস করত। তার মতে চিরকুমাররা ঐ শ্বেত-কণিকার মত, জীব-দেহের দুর্বল ও রুগ্ন অংশকে সাহায্য করাই তাদের কাজ। এই সিদ্ধান্তে আসার পর থেকেই সে অনুরূপ জীবন যাপন করতে শুরু করেছে, যদিও যৌবনে সে অনেক প্রমোদে দিন কাটিয়েছে। নিজেকে এবং মারিয়া পাভ্লভ্নাকেও সে মানবিক শ্বেত-কণিকা বলে মনে করে।

কাত্যুশার প্রতি তার ভালবাসা এই ধারণার পরিপন্থী নয়, কারণ তার সে

ভালবাসা দেহাতীত ; কাজেই তার মতে সেই ভালবাসা শ্বেত-কণিকা হিসাবে তার কাজের বিঘ্ন তো নয়ই, বরং প্রেরণা স্বরূপ।

তার নিজের মত করে সে যে শুধু নৈতিক সমস্যারই সমাধান করেছে তা নয়, বাস্তব সমস্যারও সমাধান করছে। সব বৈষয়িক ব্যাপারেই তার একটা নিজস্ব মত ছিল ; কত ঘণ্টা কাজ করতে হবে, কত ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে হবে, কি রকম খাদ্য খেতে হবে, কি রকম সাজ-পোশাক করতে হবে, এবং কি ভাবে ঘরকে গরম রাখতে বা আলোকিত করতে হবে—এ সবই সে নিয়মমাফিক করত।

এ সব সত্ত্বেও সাইমনসন ছিল লাজুক ও নম্র স্বভাবের মানুষ ; কিন্তু একবার মনস্থির করলে কিছুই তাকে সংকল্পচ্যুত করতে পারত না।

এই মানুষটি মাসলভার প্রতি ভালবাসার জোরে তার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। নারীর সহজাত প্রবৃত্তি বলেই মাসলভাও অচিরেই বুঝতে পারল যে সাইমনসন তাকে ভালবাসে, আর এমন একটি ছেলের ভালবাসা পেয়েছে বলে নিজের কাছেই সে যেন অনেক বড় হয়ে উঠল। নেখ্‌ল্যুদভ তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে উদারতাবশে, অতীতের কিছু ঘটনার ফলে, কিন্তু সাই-মনসন ভালবেসেছে আজকের মাসলভাকে, ভালবাসার জন্যই ভালবেসেছে। সে ভাবল, সাইমনসন নিশ্চয় তাকে বিশেষ মহৎ গুণসম্পন্ন অসাধারণ স্ত্রীলোক বলে মনে করে। তার মধ্যে কি কি মহৎ গুণ আছে বলে সে মনে করে মাসলভা তা জানে না, কিন্তু নিজেকে নিরাপদ রাখবার জন্য এবং তাকে নিয়ে সাইমনসনের যাতে স্বপ্নভঙ্গ না হয় সেজন্য নিজের ধারণামত শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিকারিণী হবার জন্য যথাসম্ভব ভাল হয়ে উঠবার জন্য সে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে লাগল।

তারা যখন কারাগারে ছিল তখন থেকেই এটা শুরু হয়েছে। সেটা ছিল সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন ; মাসলভা লক্ষ্য করল, এই দুটি দয়ালু ঘন নীল চোখ চওড়া ভুরুর নীচ থেকে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে আরও লক্ষ্য করল যে, লোকটি যেমন অদ্ভুত, তার চেয়ে থাকার ধরণটাও তেমনি অদ্ভুত। সে আরও লক্ষ্য করল, তার এলোমেলো চুল ও কুঞ্চিত ললাটের রুক্ষতার সঙ্গে তার দৃষ্টির শিশুসুলভ মমতা ও সরলতার একটা আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে। তার সঙ্গে মাসলভার আবার দেখা হয় তম্‌স্ক্‌-এ যখন সে রাজনৈতিক কয়েদীদের দলে চলে আসে। যদিও তাদের মধ্যে তখন একটিও কথা হয় নি, তবু দৃষ্টি বিনিময়ের ভিতর দিয়েই তারা পরস্পরকে চিনেছিল ও পরস্পরের গুরুত্বকে উপলব্ধি করেছিল। এমন কি তারপরও তাদের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কখনও হয় নি, কিন্তু মাসলভা যেন বুঝতে পেরেছে যে, যখনি তার উপস্থিতিতে সাইমনসন কোন কথা বলেছে সে কথা তাকে লক্ষ্য করে তার জন্যই বলেছে, নিজেকে যথাসম্ভব স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্যই বলেছে।

কিন্তু যখন থেকে তারা সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল একমাত্র তখন থেকেই তারা পরস্পরের অনেকটা কাছে এসে গেল।

অধ্যায়—৫

পার্ম ছেড়ে যাবার আগে পর্যন্ত নেখ্‌ল্যুদভ দু'বার মাত্র কাতয়ুশার সঙ্গে দেখা করতে পেরেছে—একবার নিঝ্‌নি নভ্‌গরদ-এ কয়েদীদের যখন তারের জাল দিয়ে ঘেরা খাঁচায় ভরবার জন্য বজরায় তোলা হচ্ছিল, এবং আর একবার পার্ম-এর কারা-আপিসে। সে দু'বারই কাতয়ুশাকে দেখেছে সংযত ও বিরূপ। সে যখন প্রশ্ন করেছে তার কিছু চাই কিনা এবং সে বেশ ভাল আছে কি না তখন সে লজ্জার সঙ্গে খুবই ভাসা-ভাসা জবাব দিয়েছে; নেখ্‌ল্যুদভের মনে হয়েছে, তার আগেও কয়েকবার যে বিরূপ তিরস্কারের মনোভাব সে দেখিয়েছে সেখানেও তাই দেখিয়েছে। সে সময় পুরুষগুলো যে ভাবে তার পিছনে লেগেছিল তাতে কাতয়ুশা খুবই মনমরা হয়েছিল, আর সে জন্য নেখ্‌ল্যুদভও যন্ত্রণা ভোগ করছিল। তার ভয় হয়েছিল পাছে যাত্রাপথের এই কঠোর অবমাননাকর পরিস্থিতিতে আবার সে আগেকার মতই নৈরাশ্য ও সংঘাতের চাপে ভেঙে পড়ে তার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে এবং সব কিছু ভুলে থাকবার জন্য আগেকার মতই আবার মদ খেতে ও ধূমপান করতে শুরু করে দেয়। কিন্তু সে সময়ে তাকে কোন প্রকার সাহায্য করাই তার পক্ষে সম্ভব হয় নি যেহেতু তখন সে তার সঙ্গে দেখাই করতে পারে নি। কিন্তু যখন সে রাজনৈতিক বন্দীদের দলে যোগ দিল তখন থেকেই নেখ্‌ল্যুদভ বুঝতে পারল তার সে আশংকা কত ভিত্তিহীন; প্রতিটি সাক্ষাৎকারেই সে লক্ষ্য করতে লাগল যে, কাতয়ুশার অন্তরের পরিবর্তন ক্রমাগতই সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। একান্তভাবে এই পরিবর্তনই তো সে চেয়েছিল। তম্‌স্ক্‌-এ যখন প্রথম তাদের দেখা হল তখন মাসলভা যেন আবার মস্কো ছেড়ে আসবার সময়কার দিনগুলিতে ফিরে গিয়েছিল। নেখ্‌ল্যুদভকে দেখে সে ভ্রূকুটি করল না, বিচলিত হল না, বরং সরলভাবে খুশি মনে তার সঙ্গে দেখা করল, তার জন্য সে যা কিছু করেছে, বিশেষ করে যে লোকদের সঙ্গে সে এখন আছে সেখানে তাকে নিয়ে আসবার জন্য সে তাকে ধন্যবাদ জানাল।

দলের সঙ্গে দুটো মাস পথ চলবার পরে তার মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে সেটা তার চেহারায় ফুটে উঠেছে। তার চেহারা রোদে-পোড়া ও আগেকার তুলনায় কৃশ হয়েছে; তাকে কিছুটা বয়স্কও দেখাচ্ছে; কপালে ও মুখের চারপাশের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। কিন্তু তার কপালের উপর একগাছিও চুল এসে পড়ে নি, সব চুল রুমাল দিয়ে ঢাকা। যেভাবে সে চুল বেঁধেছে, পোশাক পরেছে ও কথা বলছে তাতে ছলা-কলার চিহ্নমাত্র নেই। এইভাবে

যে পরিবর্তন ঘটেছে এবং অবিরাম ঘটে চলেছে তাতে নেখ্‌ল্যুদভ খুব খুশি হল।

মাসলভার প্রতি তার এমন একটা অনুভূতি হল যার অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয় নি। তার প্রথম কাব্যিক ভালবাসার সঙ্গে এই অনুভূতির কোন মিল নেই; পরবর্তীকালের যৌন ভালবাসা অথবা বিচারের পরে যে কর্তব্য পালনের আত্মতুষ্টিতে (আত্ম-প্রশংসাও তার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল) সে তাকে বিয়ের সংকল্প করেছিল, তার সঙ্গেও এ অনুভূতির কোন মিলই নেই। বর্তমান অনুভূতি শুধুমাত্র করুণা ও মমতার অনুভূতি। এই অনুভূতি তার মনে জেগেছিল যখন সে প্রথমবার তাকে দেখতে কারাগারে গিয়েছিল, এবং পুনরায় জেগেছিল যখন নিজের বিতৃষ্ণাকে জয় করে হাসপাতালের ডাক্তারের সহকারীর সঙ্গে তার কাল্পনিক ফষ্টিনষ্টিকে সে ক্ষমা করেছিল (তখন তার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল সেটা পরে ধরাও পড়েছে)। এখনও সেই অনুভূতিই তার মনে জেগেছে, তবে দুইয়ের মধ্যে তফাৎ এই যে তখন যেটা ছিল সাময়িক এখন সেটা হয়েছে স্থায়ী অনুভূতি। এখন সে যা কিছু ভাবে, যা কিছু করে, সব সময়ই তার মনে জেগে থাকে সেই করুণা ও মমতার অনুভূতি, শুধু মাসলভার জন্য নয়, প্রত্যেকের জন্য।

নেখ্‌ল্যুদভের অন্তরে যে ভালবাসার প্রবাহ এতদিন অবরুদ্ধ হয়ে ছিল, এই অনুভূতি যেন তার দুয়ার খুলে দিয়েছে, তাই সে ভালবাসা এখন সকলের দিকেই সমভাবে বয়ে চলেছে।

এই ভ্রমণকালে নেখ্‌ল্যুদভের অনুভূতি এতখনি সজাগ হয়ে উঠেছে যে কোচয়ান থেকে আরম্ভ করে কনভয়-সৈনিক, কারা-পরিদর্শক ও গভর্ণর পর্যন্ত যার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে তার প্রতিই মনোযোগী ও বিবেচনাশীল না হয়ে সে পারে নি।

মাসলভা এখন রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে থাকে; ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের অনেকের সঙ্গেই নেখ্‌ল্যুদভের পরিচয় ঘটেছে; প্রথমে ইয়েকাতেরিনবার্গে যেখানে বন্দীদের অনেক বেশী স্বাধীনতা ছিল এবং সকলকে এক সঙ্গে একটা বড় ঘরে রাখা হয়েছিল, এবং তারপরে পথ চলতে সেই পাঁচজন পুরুষ ও চারজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে যাদের দলে মাসলভাকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এইভাবে রাজনৈতিক কারণে নির্বাসিতদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটার ফলে তাদের সম্পর্কে নেখ্‌ল্যুদভের ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গেল।

রাশিয়ায় বিপ্লব আন্দোলনের শুরু থেকেই, বিশেষ করে ১লা মার্চ তারিখে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার নিহত হবার পর থেকে নেখ্‌ল্যুদভ বিপ্লবীদের অপছন্দ করত, ঘৃণা করত। সরকার-বিরোধী সংগ্রামে যে নিষ্ঠুরতা ও গোপনতার নীতি তারা মেনে চলত, বিশেষ করে তারা যে সব হত্যাকাণ্ড করত তার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তার মন বিদ্রোহ করত। এই সব বিপ্লবীরা নিজেদের যে

ভাবে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে মনে করত তাও সে অপছন্দ করত। কিন্তু এখন আরও ঘনিষ্ঠভাবে তাদের পরিচয় পেয়ে এবং সরকারের হাতে যে নির্যাতন তারা সহ্য করেছে সেটা জানতে পেরে সে ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে যে তারা যা তার চাইতে অন্য কিছু হতে পারত না।

ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুসারে দণ্ডিত কয়েদীদের উপর ভয়ংকর ও অর্থহীন অত্যাচার করা হয় সত্য, তবু দণ্ডাদেশের আগে ও পরে তাদের প্রতি অন্তত একটা লোক-দেখানো সুবিচার প্রদর্শন করা হয়ে থাকে; কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীদের বেলায় সেই লোক-দেখানো ভড়ংটুকুও থাকে না; শুস্তভার ক্ষেত্রে এবং আরও অনেকের ক্ষেত্রেই নেখ্‌লুদভ সেটা লক্ষ্য করেছে। তাদের প্রতি জালে আটক মাছের মত ব্যবহার করা হয়: যা কিছু জালে পড়ে সব শুদ্ধ ডাঙায় টেনে তোলা হয়; তারপর দরকারী বড় মাছগুলোকে বেছে আলাদা করে নিয়ে ছোটগুলোকে সেখানেই অযত্নে ফেলে রাখা হয় যাতে তারা শুকিয়ে মরে যায়। যে সকল নির্দোষ মানুষ কখনও কোন বিপদ ঘটাতে পারত না তাদের শ'য়ে শ'য়ে গ্রেপ্তার করে বছরের পর বছর ধরে কারাগারে আটক রাখা হয়; সেখানে তারা ক্ষয়রোগে ভোগে, পাগল হয়ে যায়, বা আত্মহত্যা করে! অথচ তাদের আটক রাখার একমাত্র কারণ সরকারী কর্মচারিরা তাদের মুক্তির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোরই দরকার বোধ করে নি, বরং ভেবেছে যে তাদের নিরাপদে কারাগারে রাখলে হয়তো কোন সময়ে কোন রকম বিচার বিভাগীয় তদন্তের সুবিধা হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন কি সরকারী দৃষ্টি-কোণ থেকেও নির্দোষ এইসব মানুষের ভাগ্য নির্ভর করে কতকগুলি পুলিশ অফিসার, গুপ্তচর, সরকারী উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট, গভর্ণর, বা মন্ত্রীর খেয়াল, অবসর ও খুশির উপর। এই সব কর্মচারিদের অনেকেরই কাজে মন থাকে না অথবা নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, এবং নিজের খেয়ালের বশে অথবা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের খেয়ালমাফিক মানুষকে গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড, অথবা মুক্তির আদেশ দেয়। আর সেই সব ঊর্ধ্বতন কর্মচারিও সেই একই কারণে অথবা কোন মন্ত্রীর চাপে মানুষকে পৃথিবীর ওপারে নির্বাসনে পাঠায়, নির্জন কক্ষে আটক রাখে, সাইবেরিয়ায় পাঠায়, কঠোর শ্রম ও মৃত্যুদণ্ড দেয়, আবার কোন মহিলার অনুরোধে মুক্তিও দেয়।

তাদের প্রতি যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাই তারাও সরকারী কর্ম-চারিদের বিরুদ্ধে সেই একই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এবং সামরিক বিভাগের লোকজন যেমন এমন একটি জনমতের বাতাবরণের মধ্যে বাস করে যাতে তাদের কাজকর্মের দোষ তো ঢাকা পড়েই, উপরন্তু সে সব কাজকে বীরত্বের পরিচায়ক বলেও প্রচার করা হয়, ঠিক তেমনি রাজনৈতিক অপরাধীরা তাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী যে সব লোকের মধ্যে বাস করে তারাও এমন একটা বাতাবরণের সৃষ্টি করে যাতে নিজেদের স্বাধীনতা ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এবং মানুষের কাছে যা

কিছু প্রিয় তার ঝুঁকি নিয়ে সমূহ বিপদের মুখে তারা যে সব নিষ্ঠুর কাজ করে সেগুলিকেও খারাপের বদলে গৌরবজনক বলেই মনে হয়। যে সকল নরম স্বভাবের মানুষ কাউকে যন্ত্রণা দেওয়া দূরের কথা কোন প্রাণীর উপর নির্যাতন চোখে পর্যন্ত দেখতে পারত না তারাই আবার শান্ত চিত্তে মানুষকে খুন করতে পারে, এই বিস্ময়কর ঘটনার একটা ব্যাখ্যা যেন নেখ্‌লুয়ুদভ এবার খুঁজে পেয়েছে; তাদের প্রায় সকলেই মনে করে যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এবং জনকল্যাণের যে মহান আদর্শ তারা গ্রহণ করেছে তাকে বাস্তবায়িত করার প্রয়োজনে হত্যা আইনসম্মত ও ন্যায়সম্মত। সরকার তার নিজের কাজকর্মের উপর এবং রাজনৈতিক অপরাধীদের প্রতি নিষ্ঠুরতার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করে থাকে তার ফলেই বিপ্লবীরাও তাদের আদর্শের উপর ও নিজেদের উপর সে একই গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। যে নির্যাতন তাদের উপর চালানো হয় সেটাকে সহ্য করবার জন্যই নিজেদের সম্পর্কে একটা উচ্চ ধারণা তাদের পোষণ করতে হয়।

তাদের আরও ভালভাবে জানবার পরে নেখ্‌লুয়ুদভ বুঝতে পেরেছে, কিছু লোক তাদের যে ধরনের পাড় দুর্বৃত্ত মনে করে, অথবা কিছু লোক তাদের যে ধরনের পুরোপুরি মহাবীর বলে মনে করে, তার কোনটাই তারা নয়; তারা সকলেই অতি সাধারণ মানুষ, এবং অন্য সব জায়গার মত তাদের মধ্যেও কিছু ভাল, কিছু মন্দ, ও কিছু মাঝারি লোক আছে।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিপ্লবী হয়েছে কারণ তারা সৎভাবে বিশ্বাস করে যে বর্তমান অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা তাদের কর্তব্য; কিন্তু তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা উচ্চাকাংখার বশীভূত হয়ে এই কর্ম-পদ্ধতি বেছে নিয়েছে। অবশ্য অধিকাংশ লোকই বিপদ, ঝুঁকি ও জীবন নিয়ে খেলার নেশায়ই বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নেখ্‌লুয়ুদভ ভাল করেই জানে যে, মানুষের মন যখন যৌবনের শক্তিতে ভরপুর থাকে তখন অতি সাধারণ মানুষের অন্তরেও এইসব অনুভূতি জাগ্রত হয়ে থাকে। তবে সাধারণ মানুষ থেকে তাদের এই পার্থক্য আছে যে তাদের নৈতিকতার ধারণাটা অনেক উঁচু পর্দায় বাঁধা। শুধু যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, কঠোর জীবনযাপন, সত্যপরায়ণতা ও নিঃস্বার্থপরতাকেই তারা তাদের কর্তব্য বলে মনে করে তাই নয়, আদর্শের জন্য সব কিছু, এমন কি জীবন পর্যন্ত বলি দেওয়াকেও তারা তাদের কর্তব্য বলে মনে করে। সুতরাং তাদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তারা সাধারণের পক্ষে দুরধিগম্য একটি নৈতিক স্তরে আত্মপ্রতিষ্ঠ; আর যারা নিকৃষ্ট তারা সাধারণ মানুষের চাইতেও নীচু স্তরের জীব; এমন কি তাদের মধ্যে অনেকেই মিথ্যাচারী, প্রবঞ্চক, আত্মম্ভরী ও গর্বে উদ্ধত। ফলে নেখ্‌লুয়ুদভ তার কিছু নবপরিচিত মানুষকে শ্রদ্ধা করতে, এমন কি সর্বান্তঃকরণে ভালবাসতেও শিখল, আর বাকিদের সম্পর্কে সে রইলো একান্ত উদাসীন।

অধ্যায়—৬

বিশেষ করে ক্রাইল্ত্সভকে নেখ্ল্যুদভের খুব ভাল লেগে গেল। এই ক্ষয়রোগগ্রস্ত যুবকটি সশ্রম দণ্ড ভোগ করতে কাতয়ুশাদের দলের সঙ্গেই যাচ্ছিল। ইয়েকাতেরিনবার্গে তার সঙ্গে নেখ্ল্যুদভের প্রথম পরিচয় হয়। তারপর পথ চলতেও কয়েকবার আলাপ হয়েছে। একদা গ্রীষ্মকালে একটি বিরতি-কেন্দ্রে নেখ্ল্যুদভ একটা পুরো দিন তার সঙ্গে কাটিয়েছিল, আর ক্রাইল্ত্সভও কথাপ্রসঙ্গে তার জীবনের কাহিনী, কেমন করে সে বিপ্লবী হয়েছে সবই একে একে বলেছিল। অচিরেই কারাদণ্ডের পূর্ব পর্যন্ত সব কথাই সে বলে ফেলল। তার বাবা ছিল দক্ষিণ রাশিয়ার এক ধনী জমিদার। শৈশবেই সে বাবাকে হারায়। সেই একমাত্র ছেলে। মাই তাকে বড় করে তুলল। সহজেই স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শেষ করল। গণিত বিভাগে প্রথম হল। বিদেশে পড়াশুনা করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা বৃত্তিও পেল। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে সে দেরী করে ফেলল। সে প্রেমে পড়ল, বিয়ের কথাও ভাবল, গ্রামের শাসনকার্যে অংশ নেবার কথাও ভাবতে লাগল। সবকিছু করতেই মন চায়, কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারে না। সেই সংকট-মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি সহপাঠী জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য তার কাছে কিছু টাকা চাইল। সে জানত কাজটা বিপ্লবসংক্রান্ত। সে সময় বিপ্লবের প্রতি কোন আগ্রহ না থাকলেও সহপাঠীদের টানে এবং পাছে তারা মনে করে যে সে ভয় পেয়েছে সে আত্মম্ভরিতার বশে টাকাটা সে দিয়ে দিল। টাকাটা যারা নিয়েছিল তারা ধরা পড়ল এবং তাদের কাছে এমন একটা চিঠি পাওয়া গেল যাতে প্রমাণ হল যে ক্রাইল্ত্সভই টাকাটা দিয়েছিল। তাকে গ্রেপ্তার করা হল, এবং প্রথমে থানায় ও পরে কারাগারে পাঠানো হল।

"কারাগারের লোকজনরা খুব একটা কড়া ছিল না," ক্রাইল্ত্সভ বলতে লাগল (উঁচু বিছানার তাকে সে বসেছিল ; কনুই দুটো হাঁটুর উপরে রাখা, বুকটা বসে গেছে, চকচকে দুটি সুন্দর চোখে সে নেখ্ল্যুদভের দিকে তাকিয়ে ছিল)। "দেয়ালে টোকা দেওয়া ছাড়া অন্যভাবেও আমরা কথাবার্তা চালাতাম, করিডরে বেড়াতে পারতাম, খাদ্য ও তামাক নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে পারতাম, এমন কি সন্ধ্যাবেলা গলা মিশিয়ে সকলে গানও করতাম। আমার গলা খুব ভাল ছিল। মা অবশ্য খুবই দুঃখ পেয়েছিল, নইলে আর সবই ঠিকমত সুখে-আনন্দেই চলছিল। সেখানেই বিখ্যাত পেত্রভ ও আরও অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। পেত্রভ অবশ্য পরে দুর্গের মধ্যে একখানা কাঁচের সাহায্যে আত্মহত্যা করে। কিন্তু তখনও আমি বিপ্লবী হই নি। পাশাপাশি সেল-এর আরও দুজনের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়েছিল। একই কাজের জন্য তারা দুজন ধরা পড়ে। তাদের কাছে পোল্যাণ্ড-ঘোষণাপত্র

পাওয়া যায়। রেলওয়ে স্টেশনে যাবার পথে কনভয় থেকে পালাবার চেষ্টার অপরাধে তাদের বিচার হয়। তাদের একজন হল পোল্যাণ্ডের লজিনস্কি, অপর-জন ইহুদি রজভস্কি। হ্যাঁ। রজভস্কি তখন একেবারেই ছেলেমানুষ। সে বলত সতেরো বছর, কিন্তু তাকে দেখাত পনেরো বছর। একহারা, বেঁটে, কর্মঠ, দুটি ঝকঝকে কালো চোখ, আর অধিকাংশ ইহুদির মতই ভারি সুরেলা গলা। গলার স্বর তখনও ভাঙছে, তবু চমৎকার গাইত। হ্যাঁ। দুজনকেই বিচারের জন্য নিয়ে যেতে দেখলাম। সকালবেলা নিয়ে গেল। সন্ধ্যায় ফিরে এসে তারা জানাল, তাদের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। এটা কেউই আশংকা করে নি। তাদের কেসটা এতই তুচ্ছ ; তারা কনভয় থেকে পালাতে চেষ্টা করেছিল শুধু, কাউকে জখম পর্যন্ত করে নি। তাছাড়া রজভস্কির মত একটা ছেলেমানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া খুবই অস্বাভাবিক। কারাগারে আমরা সকলেই ভাবলাম, তাদের ভয় দেখাবার জন্যই এ দণ্ড দেওয়া হয়েছে, শেষ পর্যন্ত কার্যকর করা হবে না। প্রথমে আমরা খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, পরে অবশ্য নিজেদের শান্ত করলাম এবং আমাদের জীবন আগের মতই চলতে লাগল। হ্যাঁ। তারপর একদিন সন্ধ্যায় পাহারাওয়ালা আমার দরজার কাছে এসে রহস্যজনকভাবে জানাল যে মিস্ত্রিরা এসে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করছে। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারি নি। কি বললে ? কিসের ফাঁসি-মঞ্চ ? কিন্তু বুড়ো পাহারাওয়ালাটা এতই উত্তেজিত হয়েছিল যে তখনই বুঝতে পারলাম, আমাদের দুটি ছেলের জন্যই এই ব্যবস্থা। দেয়ালে টোকা দিয়ে অন্য সহকর্মীদের জানাতে চাইলাম, কিন্তু ভয় হল পাছে ওরা দুজন শুনে ফেলে। কমরেডরা সকলেই চুপচাপ। বুঝলাম, সকলেই জেনেছে। সেদিন সারাটা সন্ধ্যা সেল-এর ভিতরে ও করিডরে সব কিছুই মৃত্যুর মত নিস্তব্ধ। দেয়ালে কোন টোকা পড়ল না, কেউ গান করল না। দশটার সময় পাহারা-ওয়ালা আবার এসে জানাল, মস্কো থেকে জল্লাদ এসে হাজির হয়েছে। এই কথা বলেই সে চলে গেল। তাকে ডাকতে লাগলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম করিডরের ওপাশ থেকে রজভস্কি আমাকে চেঁচিয়ে বলছে, 'ব্যাপার কি ? ওকে ডাকছ কেন ?' আমি বললাম, ওকে দিয়ে কিছুটা তামাক আনাব। কিন্তু কি বুঝে সে আমাকে প্রশ্ন করল, 'আজ রাতে আমরা গান করলাম না কেন ? দেয়ালে টোকা দিলাম না কেন ?' তাকে কি বলেছিলাম মনে নেই, তবে যাতে তার সঙ্গে কথা বলতে না হয় তাই সেখানে থেকে সরে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ ; সে এক ভয়ংকর রাত। সারা রাত কান পেতে রইলাম। ভোরের দিকে হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ শুনলাম। কারা যেন হেঁটে যাচ্ছে—অনেক মানুষ। দরজার ছিদ্রটার কাছে এগিয়ে গেলাম। করিডরে একটা আলো জ্বলছে। প্রথমে গেল ইন্সপেক্টর ; স্বাভাবিক অবস্থায় লোকটি সংকল্পে দৃঢ় ও আত্মপ্রত্যয়শীল, কিন্তু এখন তার মুখ ছাইয়ের মত সাদা, বিপর্যস্ত, বুঝি বা ভীত ; তারপরে এল তার সহকারী বিষণ্ণ কিন্তু সংকল্পে দৃঢ় ; সকলের পিছনে সৈনিকরা। আমার

দরজা পার হয়ে পরের দরজার সামনে তারা থামল। শুনতে পেলাম সহকারীটি আশ্চর্য এক গলায় বলে উঠল, 'লজিন্‌স্কি, ওঠ, পোশাক পরে নাও!' হ্যাঁ। তারপর দরজা খোলার শব্দ শুনলাম। তারা সেল-এ ঢুকল। তারপর শুনতে পেলাম, লজিন্‌স্কি করিডরের উল্টো দিকে চলে গেল। আমি শুধু ইন্সপেক্টরকেই দেখতে পাচ্ছিলাম। ফ্যাকাসে মুখে সে দাঁড়িয়ে আছে, কোটের বোতামগুলো খুলছে আর লাগাচ্ছে, মাঝে মাঝেই ঘাড় ঝাঁকুনি দিচ্ছে। হ্যাঁ। তারপর যেন কোন কিছুতে ভয় পেয়ে সেখান থেকে সে সরে গেল। সে লজিন্‌স্কি। তাকে পাশ কাটিয়ে লজিন্‌স্কি আমার দরজার কাছে এল। বলেছি তো, ছেলেটি ভারী সুন্দর, চোখে-মুখে পোল্যাণ্ডের কমনীয়তা : চওড়া সোজা ভুরু, এক-মাথা সুন্দর কোঁকড়া চুল, দুটি সুন্দর নীল চোখ। ফোটা ফুলের মত কী তাজা, কী স্বাস্থ্যবান। সে আমার ছিদ্রটার সামনে এসে দাঁড়াল; তার সবটা মুখ আমি দেখতে পেলাম। একখানি ভয়ংকর, বিশীর্ণ, বিবর্ণ মুখ। 'ক্রাইল্‌ত্‌সভ, সিগারেট আছে?' কয়েকটা দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সহকারীটি তাড়াতাড়ি তার সিগারেট-কেসটা বের করে এগিয়ে দিল। একটা সিগারেট সে তুলে নিল। সহকারী দেশলাই জ্বালাল। সিগারেটটা ধরিয়ে টানতে টানতে সে কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়েছে এইভাবে বলে উঠল, 'এ নিষ্ঠুর—এ অন্যায়। আমি কোন অপরাধ করি নি। আমি—' আমি দেখতে পেলাম তার গলার ভিতরে কি যেন কাঁপছে। চোখ ফেরাতে পারলাম না। সে থামল। হ্যাঁ। সেই মুহূর্তে শুনতে পেলাম, রজভ্‌স্কি তার জোরালো ইহুদি-গলায় চীৎকার করছে। লজিন্‌স্কি সিগারেটটা ফেলে দিয়ে দরজা থেকে সরে গেল। আমার ছিদ্র-পথে এসে দাঁড়াল রজভ্‌স্কি। ছেলেমানুষী মুখখানি রক্তিম ও সিক্ত। দুটি স্বচ্ছ কালো চোখ। তারও পরনে পরিষ্কার পোশাক। ট্রাউজারটা এত ঢিলে যে টেনে ধরে রেখেছে। সারা শরীর কাঁপছে। করুণ মুখখানি আমার ছিদ্রের কাছে তুলে ধরল। 'ক্রাইল্‌ত্‌সভ, ডাক্তার আমার জন্য একটা কাশির ওষুধ দিয়েছে সেটা কি সত্যি, না কি? আমার শরীর ভাল নেই। আরও ওষুধ আমি খাব।' কেউ জবাব দিল না; সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে, একবার ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাতে লাগল। সে যে কি বলতে চেয়েছিল, আমি কোন দিন বুঝতে পারি নি। হ্যাঁ। হঠাৎ সহকারীটি কঠোর মুখে কর্কশ গলায় বলে উঠল, 'আরে, এসব কি ইয়ার্কি হচ্ছে? এবার আমাদের যেতে হবে।' মনে হল, তার সামনে কি অপেক্ষা করে আছে তা সে বুঝতে পারে নি; তাই সে করিডর ধরে সকলের আগে দৌড়ে চলে গেল। কিন্তু তারপরেই পিছিয়ে এল; তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ও কান্নার শব্দ আমি শুনতে পেলাম। তারপর অনেক পায়ের শব্দ, অনেক গোলমাল। সে আর্তনাদ করছে, ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সব শব্দ ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে এল, সব শেষে দরজার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ, তারপর সব শান্ত।...হ্যাঁ। তাদের ফাঁসি

হয়ে গেল। একগাছি দড়িতে দুজনের গলায় ফাঁস পরানো হল। অপর একটি পাহারাওয়ালা ফাঁসিটা দেখেছিল। সে আমাকে বলল, লজিন্‌স্কি একটুও বাধা দেয় নি ; কিন্তু রজভ্‌স্কি অনেকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছিল, সকলে তাকে টানতে টানতে ফাঁসির মঞ্চে তুলে জোর করে ফাঁসির দড়ি তার গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। হ্যাঁ। পাহারাওয়ালাটা একটু বোকা ছিল। সে বলল : 'স্যার, ওরা আমাকে বলেছিল যে ব্যাপারটা খুব ভয় পাবার মত, কিন্তু মোটেই ভয় পাবার মত নয়। যখন ঝুলিয়ে দেওয়া হল তখন শুধু দু'বার তারা ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়েছিল—এই ভাবে,'—ঘাডটা কি ভাবে উঠেছিল আর পড়েছিল সেটাই সে দেখাল—'তারপর ফাঁসিটাকে আঁটবার জন্য জল্লাদ একটু টান দিল, আর সব শেষ হয়ে গেল ; তারা আর নড়ল না।' "

ক্রাইল্‌ত্‌সভ পাহারাওয়ালার কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করে বলল, "মোটেই ভয় পাবার মত নয়," সে হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ল। তারপর অনেকক্ষণ সে একেবারে চুপ করে রইল ; ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল, আর যে চাপা কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল তাকে চাপা দিতে চেষ্টা করতে লাগল।

"সেই দিন থেকে আমি বিপ্লবী হলাম। হ্যাঁ।" অনেকটা শান্ত হলে সে কথাগুলি বলল এবং অল্প কথায় তার কাহিনী শেষ করল।

সে "নারদ্‌নিক" দলের লোক ; যে "ধ্বংসসাধক দল"-এর লক্ষ্যই ছিল সরকার যাতে স্বেচ্ছায় জনগণের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয় সেজন্য তাকে সন্ত্রস্ত করে তোলা সেই দলের প্রধানের পদেও সে অধিষ্ঠিত ছিল। এই উপলক্ষ্যে সে পিতার্সবার্গ, কিয়েভ, ওডেসা ও বিদেশে ভ্রমণ করেছে এবং সর্বত্রই সফলকাম হয়েছে। কিন্তু একজন অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন লোক তাকে ধরিয়ে দেয়। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তার বিচার হয়, এবং দু বছর কারাগারে আটক রাখার পরে তার প্রাণদণ্ড হয় ; কিন্তু পরে সে দণ্ড হ্রাস করে তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

কারাগারে থাকতেই তার ক্ষয়রোগ দেখা দেয় ; বর্তমানে তার যা স্বাস্থ্যের অবস্থা তাতে আর কয়েক মাসের বেশী সে বাঁচবে না। তা সে জানে, কিন্তু সেজন্য তার মনে কোন অনুশোচনা নেই ; সে বলে, যদি আর একটা জীবন সে পায় তাহলে সে জীবনও এই একই ভাবে কাটাবে, যাতে এ জীবনে যে সব জিনিস সে দেখেছে যে-ব্যবস্থায় তা ঘটে তার পরিবর্তন সে ঘটাতে পারে।

যে সব কথা নেখ্‌ল্যুদভ আগে বুঝত না এই লোকটির গল্প শুনে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে সে-সবই এখন বুঝতে পেরেছে।

অধ্যায়—৭

যেদিন বিরতি-কেন্দ্রে একটি শিশুকে নিয়ে কয়েদীদের সঙ্গে কনভয়-অফিসারের গোলমাল হয়েছিল সেদিন নেখ্‌লুয়ুদভ একটা গ্রাম্য সরাইখানায় রাত কাটিয়েছিল। সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরী হওয়ায় এবং পরবর্তী বড় "শহরে' ডাকে ফেলবার জন্য কিছু চিঠিপত্র লেখায় সরাইখানা থেকে বের হতে অন্য দিনের চাইতে কিছুটা দেরী হয়ে গিয়েছিল; ফলে অন্যান্য দিনের মত কয়েদীদের দলকে পথের মধ্যে সে ধরতে পারে নি, এবং পরবর্তী বিরতি-কেন্দ্রের গ্রামে যখন সে পৌছল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

সরাইখানায় ঢুকে গাটা গরম করে নিল। সরাইখানার মালকিনের সাদা ঘাড়টা অসম্ভব রকম মোটা। অনেক মূর্তি ও ছবিতে সাজানো একটি পরিষ্কার ঘরে বসে চা খেয়েই সে তাড়াতাড়ি কাত্যুশার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি সংগ্রহের জন্য অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

গত ছ'টা বিরতি কেন্দ্রের অফিসারের কাছ থেকে এই অনুমতি সে পায় নি। বার কয়েক অফিসার বদল হলেও তাদের কেউই নেখ্‌লুয়ুদভকে বিরতি-কেন্দ্রে ঢুকতে দেয় নি, ফলে সপ্তাহখানেকের মধ্যে কাত্যুশাকে সে দেখে নি। একজন উচ্চপদস্থ কারা-অফিসারের এই পথ দিয়ে যাবার কথা আছে বলেই এত কড়াকড়ি চলছে। দলটাকে পরিদর্শন না করেই সে অফিসারটা চলে গেছে; তাই নেখ্‌লুয়ুদভ আশা করছে আগেকার অন্য অফিসারদের মতই নতুন অফিসারটিও এবার কয়েদীদের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি তাকে দেবে।

গ্রামের অপর প্রান্তে অবস্থিত বিরতি-কেন্দ্রে নিয়ে যাবার জন্য মালকিন একটা গাড়ি ডেকে দেবার কথা বলেছিল, কিন্তু নেখ্‌লুয়ুদভ হেঁটেই চলতে লাগল। হারকিউলিসের মত চওড়া-কাঁধ একটি যুবক মজুর তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। যুবকটির পায়ের ঢাউস হাই-বুটের নতুন লাগানো কড়া পালিশের তীব্র গন্ধ তার নাকে আসছিল।

একটা ঘন কুয়াসায় আকাশটা ঢাকা। ফলে রাস্তাটা এত অন্ধকার যে মাঝে মাঝে পাশের কোন জানালার আলো এসে না পড়লে তিন-পা আগের যুবকটিকেও সে দেখতে পাচ্ছিল না। তবে গভীর আঠালো কাদায় তার ভারী বুটের থপ-থপ শব্দ ঠিকই শুনতে পাচ্ছিল।

গীর্জার সামনেকার খোলা জায়গা এবং দুদিকের সারি সারি জানালার উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত বড় রাস্তা পার হয়ে নেখ্‌লুয়ুদভ যখন যুবকটির পিছনে পিছনে গ্রামের শেষ সীমায় পৌছল সেখানে তখন গাঢ় অন্ধকার। তবে বিরতি-কেন্দ্রের সামনেকার বাতির আলো কুয়াসা ভেদ করেও তার চোখে এসে পড়ল। সেই আলোর লাল বিন্দুগুলি ক্রমেই বড় হতে লাগল। ক্রমে অনেকগুলি খুঁটি ও বেড়া, শাস্ত্রীর চলমান মূর্তি, সাদা-কালো দাগ-টানা একটা

বোর্ড, ও শান্ত্রীর দাঁড়াবার বাক্স—সবই দেখা যেতে লাগল।

তারা এগিয়ে যেতেই শান্ত্রী যথারীতি হাঁক দিল, "কে যায়"; তারপর তাদের অপরিচিত লোক বলে বুঝতে পেরে বেড়ার কাছেও এগোতে দিল না। কিন্তু নেখ্‌লুয়ুদভের সঙ্গী এই কড়াকড়িতে মোটেই ঘাবড়াল না।

"আরে বাবা, এত ক্ষেপেছ কেন? গিয়ে তোমার কর্তাকে ডেকে তোল, আমরা এখানেই অপেক্ষা করছি।"

শান্ত্রী কোন জবাব না দিয়ে ফটকের কাউকে চেঁচিয়ে কি যেন বলল। বাতির আলোয় একটা টুকরো কাঠ খুঁজে নিয়ে মজুরটি সেটা দিয়ে নেখ্‌লুয়ুদভের বুটের কাদা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলে দিতে লাগল আর শান্ত্রীও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে লাগল। বেড়ার পিছন দিক থেকে নারী-পুরুষের গলার শব্দ ভেসে এল। মিনিট তিনেকের মধ্যেই কঁ্যাচ-কঁ্যাচ শব্দ করে ফটকটা খুলে গেল। কাঁধের উপর জোব্বাটা চাপিয়ে একজন সার্জেণ্ট অন্ধকার থেকে বেরিয়ে বাতির আলোয় এসে কি ব্যাপার জানতে চাইল।

সার্জেণ্টটি শান্ত্রীর মত অত কড়া নয়, বরং সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইল। কিছু বকশিসের আশায় এবং সেটা যাতে ফস্কে না যায় সেজন্য সে জানতে চাইল, অফিসারের সঙ্গে নেখ্‌লুয়ুদভের কিসের দরকার, সে কে, ইত্যাদি। নেখ্‌লুয়ুদভ জানাল, একটা বিশেষ কাজে সে এসেছে এবং কিছু উপর-হস্তও করবে; এখন সার্জেণ্ট কি একটা চিঠি অফিসারকে পৌঁছে দিতে পারবে? চিঠিটা নিয়ে মাথা নুইয়ে সার্জেণ্ট চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আবার ফটক খোলার শব্দ হল। সাইবেরীয় ভাষায় উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে বলতে একদল স্ত্রীলোক ঝুড়ি, বাক্স, জগ ও বস্তা নিয়ে বেরিয়ে এসে ফটকে দাঁড়াল। তাদের কারও পরনেই চাষীদের পোশাক নেই, তার বদলে আছে শহুরে কায়দায় তৈরি জ্যাকেট ও লোমের লাইনিং দেওয়া জোব্বা। ঘাঘরাগুলো বেশ উঁচুতে তোলা আর মাথায় শাল জড়ানো। বাতির আলোয় তারা অদ্ভুতভাবে নেখ্‌লুয়ুদভ ও তার সঙ্গীকে দেখতে লাগল। একজন তো চওড়া-কাঁধ যুবকটিকে দেখে খুশি হয়ে উঠল এবং আদর করে তাকে একটি সাইবেরীয় খিস্তি ঝেড়ে দিল।

বলে উঠল, "এই দস্যি, এখানে কি করছিস? তোকে শয়তানে ধরুক।'

যুবকটি জবাব দিল, 'এই ভদ্রলোককে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছি। তোরা এখানে কি নিয়ে এসেছিলি?'

"গোয়ালের জিনিসপত্তর। সকালে আরও আনতে হবে।"

যুবকটি জিজ্ঞাসা করল, "রাতের জন্য তোকে আটকে রাখল না?"

মেয়েটি হেসে বলল, "মুখে আগুন, মিথ্যুক কোথাকার! আরে, আমাদের সঙ্গে গাঁ পর্যন্ত চল্‌ না।"

যুবকটি কি যেন বলল আর তা শুনে শান্ত্রী সমেত সকলেই হেসে উঠল।

তারপর নেখ্‌ল্‌যুদভের দিকে ফিরে বলল, "একাই ফিরে যেতে পারবেন তো? না কি, হারিয়ে যাবেন?"

"ঠিক পথ চিনে নিতে পারব।"

"গীর্জাটা পার হয়ে তিন-তলা বাড়িটা থেকে দ্বিতীয় বাড়ি। ও হো, এই যে, লাঠিটা নিন," তার নিজের থেকেও লম্বা হাতের লাঠিটা সে নেখ্‌ল্যুদভকে দিয়ে দিল, তারপর কর্দমাক্ত পথে ঢাউস বুটের শব্দ করতে করতে মেয়েদের সঙ্গে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কুয়াসার ভিতর থেকে মেয়েদের গলার সঙ্গে তার গলা ভেসে আসতে লাগল। এমন সময় ফটকটা আবার সশব্দে খুলে গেল, আর সার্জেণ্ট বেরিয়ে এসে অফিসারের কাছে নিয়ে যাবার জন্য তাকে ডাক দিল।

অধ্যায়—৮

সাইবেরিয়া যাবার পথের পাশে অবস্থিত অন্য সব বিরতি-কেন্দ্রের মতই এই বিরতি-কেন্দ্রটিও চারদিকে সূক্ষ্মাগ্র খুঁটি দিয়ে ঘেরা তিনটি একতলা বাড়িতে অবস্থিত। যে বাড়িটি সব চাইতে বড় ও জানালায় লোহার তার লাগানো সেটাতে কয়েদীরা থাকে; আর একটায় কনভয়-সৈনিকরা থাকে; আর তৃতীয়টিতে আপিস ও অফিসারের থাকার ব্যবস্থা। তিনটি বাড়ির জানালাতেই আলো দেখা যাচ্ছে; সে আলো দেখে অবশ্য মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে ভিতরকার ব্যবস্থা বেশ আরামদায়ক। বাড়িগুলোর ফটকেও আলো জ্বলছে; তাছাড়া দেয়াল বরাবর আরও পাঁচটা আলো থাকায় উঠোনটাও বেশ আলোকিত। উঠোনের এক পাশ থেকে অপর পাশ পর্যন্ত পাতা একটা কাঠের উপর দিয়ে সার্জেণ্ট নেখ্‌ল্যুদভকে নিয়ে ছোট বাড়িটার ফটকে হাজির হল। তিনটে সিঁড়ি ভেঙে সার্জেণ্ট সামনের ছোট ঘরটায় নেখ্‌ল্‌যুদভকে এগিয়ে দিল। ঘরে একটা ছোট বাতি জ্বলছে; তার ধোঁয়ায় ঘরটা আচ্ছন্ন। স্টোভের পাশে দাঁড়িয়ে মোটা সার্ট এবং নেকটাই ও কালো ট্রাউজার পরা একটি সৈনিক এক পায়ে টপ-বুট পরে অন্য টপ-বুটটা দিয়ে সামোভার-এর কয়লায় হাওয়া করছে। নেখ্‌ল্‌যুদভকে দেখতে পেয়ে সে এগিয়ে এসে তার চামড়ার কোটটা খুলতে সাহায্য করল এবং তারপরেই ভিতরকার ঘরটায় চলে গেল।

"তিনি এসেছেন স্যার।"

"উত্তম। তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দাও," একটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠ গর্জন করে উঠল।

"দরজা দিয়ে ভিতরে যান," বলে সৈনিকটি আবার সামোভার-এ কাজে লেগে গেল।

পাশের ঘরে একটা ঝোলানো বাতিতে আলো জ্বলছিল। টেবিলের পাশে একজন অফিসার বসে। লাল মুখে একজোড়া সুন্দর গোঁফ, গায়ের আঁটো

অস্ট্রীয়ান জ্যাকেটটা চওড়া বুকে ও ঘাড়ে বেশ চেপে বসেছে। টেবিলের উপরে রাতের খাবারের কিছু কিছু পড়ে আছে, আর আছে দুটো বোতল। ঘরের বাতাসে তামাকের আর সস্তা আতরের কড়া গন্ধ। নেখ্‌ল্যুদভকে দেখে অফিসারটি উঠে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধ চোখে তার দিকে তাকাল।

"আপনার কি চাই?" বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "বারনভ! সামোভার! এতক্ষণ কি করছ?"

"এখুনি যাচ্ছি।"

"দেখাচ্ছি তোমার 'এখুনি' তখন বুঝবে ঠেলা," অফিসারটি চীৎকার করে বলল। তার চোখ দুটো জ্বলছে।

"যাচ্ছি," বলে সৈনিকটি সামোভার নিয়ে ঢুকল।

নেখ্‌ল্যুদভ দাঁড়িয়েই রইল। সৈনিকটি টেবিলের উপর সামোভারটা রেখে ঘর থেকে চলে গেল। নিষ্ঠুর চোখ মেলে তার গমন-পথের দিকে তাকিয়ে থেকে অফিসার চা তৈরি করে একটা চৌকো পাত্রে ঢালল এবং তার স্যুটকেস থেকে কয়েকখানা আলবার্ট বিস্কুট বের করল। সব কিছু টেবিলে সাজিয়ে সে আবার নেখ্‌ল্যুদভের দিকে মুখ ফেরাল।

"হ্যাঁ আপনার জন্য কি করতে পারি?"

না বসেই নেখ্‌ল্যুদভ বলল, "একটি কয়েদীর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা যদি করে দেন।"

"রাজনৈতিক কয়েদী কি? সেটা তো আইনত বারণ," অফিসার বলল।

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, "আমি যে স্ত্রীলোকটির কথা বলছি সে রাজনৈতিক বন্দী নয়।"

"বটে; আরে, আপনি বসুন," অফিসার বলল।

নেখ্‌ল্যুদভ বসল।

"সে রাজনৈতিক বন্দী নয়, কিন্তু আমার অনুরোধে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাকে রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে থাকবার অনুমতি দিয়েছেন—"

অফিসার বাধা দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, আমি জানি। ছোটখাট, ময়লা রং। তা, সে ব্যবস্থা করা যাবে। ধূমপান করেন তো?"

সিগারেটের বাক্সটা নেখ্‌ল্যুদভের দিকে এগিয়ে দিল। দুই গ্লাসে চা ঢেলে একটা নেখ্‌ল্যুদভের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "যদি আপত্তি না করেন—"

"ধন্যবাদ। আমি কিন্তু দেখাটা—"

"রাত তো লম্বা। অনেক সময় পাবেন। ওকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলে দেব।"

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, "কিন্তু সে যেখানে আছে সেখানে কি দেখা হতে পারে না? পাঠিয়ে দেবার কি দরকার?"

"রাজনৈতিক বন্দীদের কাছে গিয়ে? সেটা আইনবিরুদ্ধ।"

"অনেক বার তো আমাকে যেতে দেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে কিছু পাচার করে দেবার কথাই যদি বলেন সে তো ওর মারফৎ দিতে পারি।"

"না, না, তাকে তো সার্চ করা হবে," বলেই অফিসার অদ্ভুতভাবে হাসতে লাগল।

"বেশ তো, তাহলে আমাকেই সার্চ করুন।"

"ঠিক আছে, ব্যবস্থা একটা করে দেব।" কথা বলে কাঁচের পাত্রটার মুখ খুলে নেখ্‌লুদভের চায়ের গ্লাসের দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'আপনাকে আর একটু দেব কি? না? ঠিক আছে, আপনার যেমন ইচ্ছা। এই সাইবেরিয়ায় থাকলে মশায়, একজন শিক্ষিত লোকের দেখা পেলে ভারি ভাল লাগে। জানেন তো এমনিতেই আমাদের কাজটা বাজে, তারপর কিছুদিন ভালভাবে কাটাবার পরে এখানে এসে আরও খারাপ লাগে। লোকের ধারণা, আমরা কনভয়-অফিসাররা কাঠখোট্টা অশিক্ষিত মানুষ; কেউ একবারও ভাবে না যে এর চাইতে অনেক ভাল কাজও আমরা পেতে পারতাম।"

এই অফিসারটির লাল মুখ, আতর, আংটি, বিশেষ করে তার অস্বস্তিকর হাসি—সবই নেখ্‌লুদভের কাছে খুব বিরক্তিকর লাগছিল; কিন্তু এই পথ-পরিক্রমার কালে অন্য সব দিনের মত আজও মনের সেই গম্ভীর অবিচল অবস্থাই সে বজায় রেখে চলল যাতে কোন মানুষের সঙ্গেই উপেক্ষা বা ঘৃণাসূচক ব্যবহার না করে তার পরিভাষা মতে "খোলাখুলি" ভাবেই কথা বলতে পারে। অফিসারটির কথা শুনে তার মনে হল, অন্যকে যন্ত্রণা দেওয়ার কাজটাকে সে কষ্টসাধ্য বলেই মনে করে।

গম্ভীর গলায় নেখ্‌লুদভ বলল, "আমার মনে হয়, আপনার অবস্থায় থেকেও দুঃখী মানুষকে কিছুটা সাহায্য করতে পারা যায়।"

"তাদের আবার কিসের দুঃখ? এই সব লোক যে কী তা আপনি জানেন না।"

নেখ্‌লুদভ বলল, "তারা বিশেষ ধরনের কোন জীব নয়। তারাও ঠিক অন্য মানুষেরই মত; বরং কেউ কেউ সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

অবশ্যি সব রকম লোকই তাদের মধ্যে আছে, আর তাই তাদের প্রতি করুণাও হয়। কেউ কেউ হয় তো খুবই কড়া, তবে আমি যতটা পারি তাদের বোঝা হাল্কা করতেই চেষ্টা করি। তাদের বদলে না হয় আমিই কিছুটা কষ্ট পেলাম। অনেকেই আইনকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, এমন কি গুলি পর্যন্ত করে; কিন্তু আমি দয়া করি……। অনুমতি করেন তো—আর এক গ্লাস হোক।" নেখ্‌লুদভের জন্য সে আর এক গ্লাস চা ঢেলে দিল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁ, যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে আপনি দেখা করতে চান সে কে?"

নেখ্‌লুদভ জবাব দিল, "একটি ভাগ্যহীনা নারী যাকে পতিতালয়েও ঢুকতে হয়েছিল এবং তার বিরুদ্ধে মিথ্যা করে বিষ প্রয়োগের অভিযোগ আনা

হয়েছিল ; কিন্তু মেয়েটি বড় ভাল মানুষ।"

অফিসার মাথা নাড়ল।

"হ্যাঁ, এ রকমটা ঘটে, জনৈকা এম্‌মার কথা আপনাকে বলতে পারি। সে কাজান-এ থাকত। মেয়েটি জন্মসূত্রে হাঙ্গেরীয় হলেও তার চোখ দুটি ছিল পুরোপুরি পারসিক।" তার কথা মনে হতেই অফিসারের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে বলতে লাগল, "তার মধ্যে এমন একটা লাবণ্য ছিল যে সে কোন কাউণ্টের পত্নীও হতে পারত।"

নেখ্‌লুদভ বাধা দিয়ে পূর্ব-আলোচনায় ফিরে গেল।

যেন কোন বিদেশী বা শিশুর সঙ্গে কথা বলছে এমনিভাবে প্রতিটি শব্দকে যথাসম্ভব স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে সে বলতে লাগল, "আমি তো মনে করি, আপনার হেপাজতে যারা আছে তাদের কষ্ট লাঘব করতে আপনি পারেন, এবং সে কাজ করলে আপনিও নিশ্চয় যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করবেন।"

অফিসারটি চকচকে চোখ তুলে নেখ্‌লুদভের দিকে তাকাল। কখন সে থামবে তার জন্য অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কারণ পারসিক নয়নের সেই হাঙ্গেরীয় নারী এতই স্পষ্ট হয়ে তার স্মৃতি-পথে জাগরুক হয়েছে এবং তার মনোযোগকে এতদূর আকর্ষণ করেছে যে তার কাহিনীটি বলবার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

সে বলল, 'হ্যাঁ, এ সবই সত্যি ; আর তাদের আমি দয়াও করি ; কিন্তু সেই এম্‌মার কথা আপনাকে বলছি। সে কি করেছিল জানেন—"

নেখ্‌লুদভ বলল, "জানবার কোন আগ্রহ আমার নেই। আপনাকে খোলখলিই বলছি, যদিও একসময় আমি অন্য প্রকৃতির মানুষ ছিলাম, এখন স্ত্রীলোকের সঙ্গে ও ধরনের সম্পর্ককে আমি ঘৃণা করি।"

অফিসার সন্ত্রস্ত চোখে নেখ্‌লুদভের দিকে তাকাল।

বলল, "আর একটু চা নেবেন কি ?"

"না, ধন্যবাদ।"

অফিসার হাঁক দিল, "বারনভ ! এই ভদ্রলোককে ভাকুলভ-এর কাছে নিয়ে যাও। রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য যে আলাদা ঘরটা আছে সেখানে ওঁকে নিয়ে যেতে বল, কয়েদী পরিদর্শনের সময় পর্যন্ত উনি সেখানে থাকবেন।"

অধ্যায়—৯

আর্দালির সঙ্গে নেখ্‌লুদভ বাতির লাল আলোয় স্বল্পালোকিত উঠোনে নামল।

একটি কনভয়-সৈনিক আর্দালিকে জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাচ্ছ ?"

"৫নং আলাদা ঘরে।"

"এদিকে দিয়ে যেতে পারবে না, তালা দেওয়া আছে। ও পাশ দিয়ে ঘুরে যাও।"

"তালা দেওয়া কেন ?"

"বড়কর্তা গ্রামে গেছেন, আর চাবিটা তার কাছেই আছে।"

"ঠিক আছে। এদিকে আসুন।"

সৈনিকটি তাকে নিয়ে কাঠের উপরে পা ফেলে ফেলে আর একটা দরজার কাছে নিয়ে গেল। উঠোনে থাকতেই নেখ্‌লুদভ শুনতে পেয়েছিল, ভিতরে অস্পষ্ট শব্দ ও হৈ-চৈ হচ্ছিল ; মৌ-চাক ছেড়ে উড়ে যাবার আগে মৌমাছিদের মধ্যে ঠিক এই ধরনের গুঞ্জন শোনা যায়। কিন্তু কাছে গিয়ে দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সে গুঞ্জন স্পষ্টতর হয়ে নানা রকম চীৎকার, গালাগালি ও উচ্চ হাসিতে রূপান্তরিত হল। তার কানে এল শিকলের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ ও নাকে লাগল অতি-পরিচিত দুর্গন্ধ।

অন্য সময়ের মতই সেই হৈ হট্টগোল, শিকলের ঝনঝনানি ও দুর্গন্ধ একত্র হয়ে নেখ্‌লুদভের মনে এমন একটা নৈতিক বিবমীষা সৃষ্টি করল যা ক্রমে দৈহিক 'বিবমীষায় পরিণতি লাভ করল এবং এই দুই অনুভূতি একত্র মিলিত হয়ে একটা অপরটাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলতে লাগল।

ঘরে ঢুকে নেখ্‌লুদভ প্রথমেই দেখতে পেল, মস্তবড় দুর্গন্ধময় একটা পিপের কানার উপর একটি স্ত্রীলোক বসে আছে, আর মাথার আধখানা কামানো দিকটার উপর পিঠের আকারের টুপি পরা একটি লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। নিজেদের মধ্যে তারা কথা বলছিল। নেখ্‌লুদভকে দেখে লোকটি চোখ টিপে বলল :

"স্বয়ং জারও নদীর স্রোতকে আটকাতে পারেন না।"

স্ত্রীলোকটি কিন্তু অপ্রস্তুত হয়ে জোব্বার কোণাটা নামিয়ে দিল।

দরজার মুখ থেকেই একটা করিডর চলে গেছে। তার পাশে-পাশে কয়েকটি দরজা খোলা। প্রথমটিতে সপরিবারে থাকার ব্যবস্থা, দ্বিতীয়টি একক পুরুষদের এবং একেবারে শেষের দুটো ঘর রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য আলাদা করে রাখা।

বাড়িটায় মোট দেড়শ' কয়েদী থাকার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এখন এত ভীড় যে চারশ' পঞ্চাশজন কয়েদী সেখানে আছে : ফলে ঘরের মধ্যে সকলের জায়গা হয় নি, অনেকে দালানেও রয়েছে। কেউ কেউ মেঝেতে শুয়ে-বসে আছে, কেউ খালি চায়ের পাত্র নিয়ে বাইরে যাচ্ছে, কেউ বা তাতে গরম জল ভরে নিয়ে ফিরে আসছে। তাদের মধ্যে তারাসও ছিল। নেখ্‌লুদভের কাছে এসে সে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। নাকের উপরে ও চোখের নীচে কালসিটে দাগ পড়ে তারাসের সুন্দর মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে।

"তোমার কি হয়েছে ?" নেখ্‌লুদভ প্রশ্ন করল।

তারাস হেসে জবাব দিল, "এই, কিছু একটা হয়েছে।"

কনভয়-সৈনিকটি বলল, "ঝগড়া-ঝাটি লেগেই আছে।"

তারাসের পিছনে আর একটি কয়েদী আসছিল। সে বলল, "একটি মেয়েকে নিয়েই ঝামেলা। কানা ফেদকার সঙ্গে এর এক হাত হয়ে গেছে।"

"আর ফেদসিয়া কেমন আছে?"

"সে ভালই আছে। তার চায়ের জন্যই জল নিয়ে যাচ্ছি।" কথা কয়টি বলে তারাস প্রথম ঘরে ঢুকে গেল।

নেখ্‌ল্যুদভ দরজা দিয়ে ভিতরে তাকাল। স্ত্রী-পুরুষে ঘরটা ভর্তি; কেউ তাকের উপর বিছানায়, কেউ বা তার নীচে। ভিজে কাপড় শুকোতে দেবার জন্য ঘরটা গরম ভাঁপে ভর্তি। মেয়েদের কলকণ্ঠের বিরাম নেই। পরের ঘরটা পুরুষদের। সেটা আরও বোঝাই; এমন কি দরজা ও সামনের দালানটাতেও লোক থিক্-থিক্ করছে। সকলেরই জামা-কাপড় ভেজা, সকলেই কোন না কোন কাজে ব্যতিব্যস্ত। কনভয়-সার্জেণ্ট বুঝিয়ে দিল: যে কয়েদীটির উপর সকলের খাবার-দাবার কেনার ভার সে জনৈক তাসের জুয়ারীর কাছ থেকে টাকা ধার করেছিল, আর এখন খাবার কেনার টাকা থেকেই সেই ধার শোধ করছে এবং তার কাছ থেকে তাসের তৈরি কতকগুলি ছোট ছোট টিকিট নিচ্ছে। কনভয়-সৈনিক ও একটি ভদ্রলোককে দেখে তারা চুপ করে বাঁকা-চোখে তাদের দেখতে লাগল। তাদের মধ্যেই নেখ্‌ল্যুদভ তার পূর্ব-পরিচিত অপরাধী ফিয়দরভকে দেখতে পেল। ফোলা চেহারার ভুরু-ওল্টানো একটা দুঃখী ছেলেকে সে সব সময় সঙ্গে রাখত। তার সঙ্গে আর থাকত মুখে বসন্তের দাগ-ভরা একটা ভবঘুরে লোক যাকে কয়েদীরা সকলেই ভাল করে চেনে, কারণ একবার কারাগার থেকে পালাবার সময় একজন স্যাঙাতকে সে জলাভূমির মধ্যে খুন করেছিল এবং শোনা যায় যে তার মাংস খেয়ে পেট ভরিয়েছিল। সেই ভবঘুরেটা কাঁধের উপর ভিজে জোব্বাটা ফেলে উদ্ধত বিদ্রূপের ভঙ্গীতে নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকিয়ে পথের উপর দাঁড়িয়ে রইল, একটুও সরল না। নেখ্‌ল্যুদভ পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

যদিও এ ধরনের দৃশ্য এখন তার কাছে খুবই পরিচিত, যদিও গত তিন মাস ধরে এই চার শ' কয়েদীকে সে বার বার নানা অবস্থার মধ্যে দেখেছে—প্রচণ্ড গরমে পথে পথে শিকল-বাঁধা পা টেনে টেনে চলার ফলে ধুলোর মেঘে আচ্ছন্ন অবস্থায়; পথের পাশের বিরতি-কেন্দ্রে; বিরতি-কেন্দ্রের ভিতরে; এবং গরমের সময় খোলা উঠোনে অত্যন্ত বেহায়া ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার নৃশংস দৃশ্যের মধ্যে—তথাপি যখনই সে তাদের মধ্যে এসেছে, আজকের মত যখনই কেউ তাকে একদৃষ্টিতে দেখেছে, তখনই লজ্জা ও তাদের প্রতি পাপের চেতনা তাকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছে। সেই লজ্জা ও

অপরাধবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঘৃণা ও বিভীষিকার একটা দুর্জয় অনুভূতি। সে জানে, যে অবস্থায় তারা আছে তাতে এর চাইতে ভাল কিছু হয়ে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু এই বীতরাগকে সে চেপে মারতে পারে না।

রাজনৈতিক বন্দীদের ঘরের দিকে যেতে যেতে সে শুনতে পেল, কে যেন কর্কশ গলায় বলে উঠল, "গরীবের রক্ত-চোষাদের জন্য এই যথেষ্ট।" আরও কিছু কাঁচা খিস্তি সে করল; সকলে ঘৃণায়, বিদ্রূপে হো-হো করে হেসে উঠল।

অধ্যায়—১০

অবিবাহিতদের ঘরটা পার হয়েই নেখ্‌লুদভের সঙ্গী সার্জেণ্টটি চলে গেল; বলে গেল, পরিদর্শনের আগে সে আবার আসবে। সার্জেণ্ট চলে যেতেই পায়ের শিকল তুলে ধরে খালি পায়ে একটি কয়েদী দ্রুত তার কাছে এগিয়ে এল। একটা তীব্র কটু ঘামের গন্ধ তার নাকে এসে লাগল। কয়েদীটি অদ্ভুতভাবে ফিসফিস করে বলল:

"কেসটা হাতে নিন স্যার। ছেলেটাকে তারা সম্পূর্ণ বোকা বানিয়ে ফেলেছে। তারা ওকে মদ খাইয়েছে, আর আজ পরিদর্শনের সময় সে তার নাম বলে দিয়েছে কারমানভ। এটা বন্ধ করুন স্যার; আমাদের সাহস হয় না; ওরা আমাদের খুন করে ফেলবে।" কথাগুলি বলেই অস্বস্তিকরভাবে চারদিকে তাকাতে তাকাতে সে চলে গেল।

ঘটনাটা এই রকম। কারমানভ নামক জনৈক অপরাধী ঠিক তার মত দেখতে নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত একটি যুবককে রাজী করিয়েছে, যেন সে তার সঙ্গে নাম বদল করে তার জায়গায় খনিতে চলে যায়, যাতে সে (কারমানভ) যুবকটির বদলে নির্বাসনে যেতে পারে।

এই নাম-বদলের খবর নেখ্‌লুদভ জানত। আগের সপ্তাহে ওই কয়েদীই তাকে বলেছে। সে ইঙ্গিতে তাকে বোঝাল যে যা করবার তা সে করবে এবং তারপরেই কোন দিকে না তাকিয়ে এগিয়ে গেল।

যে কয়েদীটি তার সঙ্গে কথা বলল নেখ্‌লুদভ তাকে চেনে। ইয়েকাতেরিন-বার্গে থাকতে তার স্ত্রী যাতে তার সঙ্গে যেতে পারে তার অনুমতি আদায় করে দেবার জন্য সে নেখ্‌লুদভকে ধরেছিল। অতি সাধারণ চাষী গোছের লোক; মাঝারি গড়ন, বছর ত্রিশেক বয়স, খুন ও রাহাজানির চেষ্টার অভিযোগে সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত। নাম মাকার দেভকিন। তার অপরাধটা একটু অদ্ভুত ধরনের। নেখ্‌লুদভকে সে বলেছিল। কাজটা সে নিজে (মাকার) করে নি, করেছে আর একজন, মানে শয়তান। সে বলেছিল: একটি পথিক তার বাবার কাছে এসে ছাব্বিশ মাইল দূরের একটি গ্রামে যাবার

জন্য স্লেজ ভাড়া করল। মাকারের বাবা তাকে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যেতে বলল আর সেও গাড়িতে ঘোড়া জুতে পোশাক পরে সেই পথিকের সঙ্গে চা খেতে বসল। চা খেতে খেতে পথিক বলল, শীঘ্রই তার বিয়ে হবে এবং মস্কো থেকে সে পাঁচ শ' রুবল উপার্জন করে নিয়ে চলেছে। এই কথা শুনে মাকার বেরিয়ে উঠোনো গেল এবং স্লেজের খড়ের নীচে একটা কুড়ুল রেখে দিল।

সে বলল, "আমি নিজেই জানতাম না কুড়ুলটা কেন নিলাম; সেই আর একজনেই আমাকে বলল 'কুড়ুলটা নাও', আর আমিও নিলাম। স্লেজে চেপে যাত্রা শুরু করলাম। ভালভাবেই চলতে লাগলাম। এমন কি কুড়ুলটার কথাও ভুলে গেলাম। গ্রামের কাছে পৌঁছে গেলাম—আর মাত্র মাইলচারেক বাকি। জংশন থেকে বড় রাস্তাটা ক্রমেই উপরে উঠছে, তাই আমি গাড়ি থেকে নেমে পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগলাম। সেই আর একজন আমার কানে কানে বলল, 'কি ভাবছ? পাহাড়ের উপরে উঠে গেলেই পথে অনেক লোকজন চোখে পড়বে, আর তার পরেই তো গ্রামটা। তখন তো ও টাকাটা নিয়ে সরে পড়বে; যদি কাজটা করতে চাও তো এই সময়। যেন খড়গুলো ঠিক করছি এইভাবে আমি স্লেজটার উপর উপুড় হলাম আর কুড়ুলটা যেন নিজের থেকেই লাফিয়ে আমার হাতে উঠে এল। লোকটি মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'কি করছ তুমি?' আমি কুড়ুলটা তুলে তাকে মারতে গেলাম; কিন্তু সে তাড়াতাড়ি লাফ দিয়ে নেমে আমার হাতটা চেপে ধরল। 'এটা কি করছ শয়তান?' সে আমাকে বরফের উপর ফেলে দিল! আমি কোন রকম বাধা না দিয়েই তার হাতে ধরা দিলাম। চাবুকটা দিয়ে আমার হাত বেঁধে গাড়িতে তুলে আমাকে সোজা থানায় নিয়ে গেল। আমাকে কারাগারে পাঠাল। বিচার হল। কম্যুন আমার চরিত্রের প্রশংসা করে বলল, আমি খুব ভাল ছেলে, কখনও কোন খারাপ কাজ করতে আমাকে দেখা যায় নি। যাদের বাড়িতে আমি কাজ করতাম সেই মনিবরাও আমাকে ভাল বলল। কিন্তু উকিল লাগাবার পয়সা তো আমাদের ছিল না, তাই আমার চার বছর সশ্রম দণ্ডাদেশ হ'ল।'

এই লোকটিই স্বগ্রামবাসী একটি লোককে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও নেখ্‌লুদভের কাছে কয়েদীটির গোপন কথা বলে দিল। তার এ কাজের কথা তারা যদি জানতে পারে তাহলে নির্ঘাৎ তাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে।

অধ্যায়—১১

রাজনৈতিক বন্দীদের দুটো ছোট ঘরে রাখা হয়েছে। দরজার সামনেকার দালানের সেই অংশটুকু একটা বেড়া দিয়ে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। সেই

ঘেরা জায়গাটায় ঢুকে নেখ্‌লুয়ুদভ দেখতে পেল, রবারের কুর্তা পরে হাতে একটা পাইনের কাঠ নিয়ে সাইমনসন স্টোভের পাশে ঝুঁকে বসে আছে। ভিতরকার গরমের টানে দরজাটা কাঁপছে।

নেখ্‌লুয়ুদভকে দেখতে পেয়ে উঁচু ভুরুর নীচে দিয়ে সে তার দিকে তাকাল এবং উঠে না দাঁড়িয়েই হাতটা বাড়িয়ে দিল।

মুখে একটা বিশেষ ভাব ফুটিয়ে নেখ্‌লুয়ুদভের চোখে চোখ রেখে সে বলল, "আপনি আসাতে খুব খুশি হয়েছি। আপনার সঙ্গে কথা আছে।"

"আচ্ছা, কি কথা ?" নেখ্‌লুয়ুদভ জিজ্ঞাসা করল।

"পরে বলব। এখন খুব ব্যস্ত আছি।"

সাইমনসন আবার স্টোভের প্রতি মনোযোগ দিল। যতদূর সম্ভব কম তাপ-শক্তি নষ্ট হয় এ রকম একটা নিজস্ব পদ্ধতিতে স্টোভটা জ্বালাচ্ছিল।

নেখ্‌লুয়ুদভ প্রথম দরজা দিয়ে ঢুকতে যাবে এমন সময় অন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এল মাসলভা। হাতল-ছাড়া একটা বার্চের ঝাঁটা হাতে নিয়ে নীচু হয়ে সে একগাদা জঞ্জাল ও ধুলো-ময়লা ঝেঁটিয়ে স্টোভের কাছে জমা করল। পরনে সাদা কুর্তা ঘাগরাটা একটু তুলে কোমরে গোঁজা আর ধুলো থেকে চুলগুলোকে বাঁচাবার জন্য একটা রুমাল ভুরু পর্যন্ত জড়ানো। নেখ্‌লুয়ুদভকে দেখতে পেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তার চোখ-মুখ ঝলমলিয়ে উঠল; হাতের ঝাঁটাটা ফেলে দিয়ে ঘাঘরায় হাত মুছে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

কর-মর্দণ করে নেখ্‌লুয়ুদভ বলল, "ঘর সাফাই করছ দেখতে পাচ্ছি।"

সে হেসে বলল, "হ্যাঁ, আমার পুরনো কাজ। কিন্তু কী ধুলো! আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। সাফাই করছি তো করছিই।" সাইমনসনের দিকে ফিরে বলল, "কম্বলটা শুকিয়েছে কি ?"

"প্রায়", বিশেষ ভাবে মাসলভার দিকে তাকিয়ে সে জবাব দিল। সেটা নেখ্‌লুয়ুদভের দৃষ্টি এড়াল না।

"ঠিক আছে। এখনই নিয়ে যাব, আর জোব্বাগুলো নিয়ে আসব শুকোবার জন্য।...আমাদের লোকজন সব ওখানে আছে," দ্বিতীয় দরজা দিয়ে যেতে যেতে প্রথম দরজাটা দেখিয়ে সে নেখ্‌লুয়ুদভকে শেষের কথা কয়টি বলল।

দরজা ঠেলে নেখ্‌লুয়ুদভ একটা ছোট ঘরে ঢুকল। তক্তপোষ হিসাবে ব্যবহারের জন্য দেয়ালের সঙ্গে আটকানো তাকের একপাশে একটা ছোট টিনের বাতি জ্বলছে। তারই আলোয় ঘরটা ঈষৎ আলোকিত হয়েছে। ঘরের ভিতরটা বেশ ঠাণ্ডা। ঝাঁট-দেওয়া ধুলোটা এখনও মরে নি। ফলে ঘরের বাতাস ধুলো, স্যাঁতসেঁতে মেঝে ও তামাকের ধোঁয়ার গন্ধে ভরা। ছোট টিনের বাতিটার কাছে যারা রয়েছে তাদের উপর বেশ আলো পড়েছে, কিন্তু বিছানাগুলি সবই অন্ধকারে ঢাকা, ছায়াগুলি দেয়ালের উপর নড়াচড়া করছে।

খাদ্যপরিবেশনকারী দু'জন গরম জল ও খাবার আনতে বাইরে গেছে, তবে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রায় সকলেই এই ছোট ঘরটাতে জমায়েত হয়েছে। নেখ্‌লুদভের পরিচিত ভেরা দুখোভাও আছে। আগের থেকে আরও কৃশ ও হলদে হয়ে গেছে। বড় বড় দুটি ভীরু চোখ, খাটো চুল আর কপালে একটা ফুলে-ওঠা শিরা তেমনি আছে। পরনে একটা ধূসর কুর্তা। সামনে একখানা খোলা খবরের কাগজ নিয়ে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সিগারেট পাকাচ্ছে।

এমিলিয়া রান্‌সেভাও আছে। রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে তাকেই নেখ্‌লুদভের সব চাইতে ভাল লাগে। সে এখানকার গৃহস্থালি দেখাশুনা করে। অত্যন্ত অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যেও সে সর্বত্র একটা বাড়ির আরাম ও আকর্ষণ ছড়িয়ে দিতে পারে। হাতের আস্তিন গুটিয়ে সে বাতিটার পাশে বসে কাপ ও মগগুলি ভাল করে মুছে তার রোদে-পোড়া সুন্দর কুশলী হাতে একটা তাকের উপর বিছানা চাদরের উপর সাজিয়ে রাখছিল। রান্‌সেভা দেখতে একটি সাধারণ যুবতী। মুখশ্রীটি সুন্দর। সে যখন হাসে তখন সমস্ত মুখটা খুব সতেজ ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। মুখে সেই হাসি ফুটিয়েই সে নেখ্‌লুদভকে অভ্যর্থনা জানাল।

সে বলল, 'সে কি, আমরা তো ভেবেছি আপনি রাশিয়ায় ফিরে গেছেন।'

ছোট মেয়েটিকে নিয়ে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নাও একটি অন্ধকার কোণে বসেছিল। মেয়েটি তার ছেলেমানুষি গলায় অনর্গল বক্‌-বক্‌ করে চলেছে।

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না নেখ্‌লুদভকে বলল, 'আপনি আসায় কী যে ভাল লাগছে। কাত্যুশার সঙ্গে দেখা হয়েছে কি? এখানে একটি নতুন মানুষও আছে," বলে সে ছোট মেয়েটিকে দেখাল।

আনাতলি ক্রাইল্‌ত্‌সভও সেখানে ছিল। জুতো শুদ্ধই পা ভেঙে শির-দাঁড়াটাকে বেঁকিয়ে একেবারে উপুড় হয়ে ঘরের এককোণে বসে সে কাঁপছে। হাত দুটো জোব্বার আস্তিনের মধ্যে ঢোকানো। জ্বরক্লান্ত চোখে সে নেখ্‌লুদভের দিকে তাকাল। নেখ্‌লুদভও তার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় তার চোখে পড়ল দরজার ডান পাশে একটি লোক সুন্দরী হাস্যময় গ্রাবেৎস-এর সঙ্গে কথা বলছে। তার চোখে চশমা, মাথায় কোঁকড়া লাল চুল, পরনে রবারের কুর্তা। ইনিই বিখ্যাত বিপ্লবী নভদ্‌ভরভ্‌। তার সঙ্গে দেখা করতে নেখ্‌লুদভ দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ির কারণ, রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে এই লোকটিকেই সে সবচাইতে অপছন্দ করে। ভুরু কুঁচকে সে নেখ্‌লুদভের দিকে তাকাল। চশমার ভিতর দিয়ে তার নীল চোখ দুটি ঝকঝক করতে লাগল। শীর্ণ হাতখানি এগিয়ে দিয়ে বিদ্রূপের সুরে সে বলল, "আরে, ভ্রমণটা বেশ ভালই হচ্ছে তো?"

যেন বিদ্রূপটা সে বুঝতেই পারে নি, বরং প্রশ্নটাকে ভদ্রতা বলেই মনে করেছে এমনিভাবেই নেখ্‌লুদভ জবাব দিল, "হ্যাঁ, আকর্ষণীয় অনেক কিছুই

তো আছে।" বলেই সে ক্রাইল্‌ত্‌সভের দিকে এগিয়ে গেল।

সব ব্যাপারে উদাসীন থাকবার চেষ্টা সত্ত্বেও আসলে নেখ্‌লুয়ুদভ সেটা পারছিল না। অস্বস্তিকর কিছু বলবার বা করবার ইচ্ছায়ই নভদ্‌ভরভ্‌ যে কথাগুলি বলল তাতে নেখ্‌লুয়ুদভের মনে বেশ আঘাত লাগল। মনে মনে সে দুঃখে অবসন্ন বোধ করতে লাগল।

যাই হোক, ক্রাইল্‌ত্‌সভের ঠাণ্ডা কাঁপা হাতটা চেপে ধরে সে জিজ্ঞাসা করল, "এই যে, কেমন আছ?"

তাড়াতাড়ি হাতটা জোব্বার মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে ক্রাইল্‌ত্‌সভ বলল, "খুব ভাল। শুধু শরীরটা কিছুতেই গরম হচ্ছে না; সব যেন ভিজে যাচ্ছে। আর এ জায়গাটাও অসম্ভব ঠাণ্ডা। দেখুন না, জানালার কাঁচগুলোও ভাঙা।" লোহার গরাদের পিছনকার ভাঙা কাঁচগুলো সে হাত দিয়ে দেখাল। "আপনি কেমন আছেন? অনেকদিন আমাদের দেখতে আসেন নি কেন?"

"আমাকে আসতে দেয় নি। কর্তৃপক্ষ বড়ই কড়া ছিল। আজকের অফিসারটি একটু উদার।"

"উদার! তা বটে" ক্রাইল্‌ত্‌সভ মন্তব্য করল। "মারিয়াকে জিজ্ঞাসা করুন না' আজ সকালে সে কি করেছে।"

সকালে তারা বিরতি-কেন্দ্র থেকে চলে গেলে ছোট মেয়েটির কি হয়েছিল সে ঘটনাটা মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না তার জায়গায় এক কোণে বসেই বলল।

"আমি মনে করি সকলে মিলে এর প্রতিবাদ করা অত্যন্ত দরকার," সুদৃঢ় কণ্ঠে কথাগুলি বলে ভেরা দুখোভা ভীত, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার এর দিকে একবার ওর দিকে তাকাতে লাগল। "ভলাদিমির সাইমনসন প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়।"

বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্রাইল্‌ত্‌সভ বলল, "কী প্রতিবাদ আপনি চান?" ভেরা দুখোভার সরলতার অভাব, তার কৃত্রিম চাল-চলন ও স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য ক্রাইল্‌ত্‌সভ অনেকদিন থেকেই বিরক্ত বোধ করছিল।

নেখ্‌লুয়ুদভকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি কাত্যুশাকে খুঁজছেন? তিনি তো সারাক্ষণ শুধু কাজই করছেন। পুরুষদের এই ঘরটা পরিষ্কার করে এবার গেছেন মেয়েদের ঘরে। কিন্তু মাছিগুলোকে কিছুতেই তাড়ানো যায় না—যেন জীবন্ত খেয়ে ফেলতে চায়। আরে, মারিয়া ওখানে কি করছে?" মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না যেখানে বসেছিল সেই কোণটা দেখিয়ে সে বলল।

রান্ত্‌সেভা জবাব দিল, "পালিতা কন্যার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে।"

ক্রাইল্‌ত্‌সভ বলল, "কিন্তু উকুনগুলো আমাদের তাড়া করবে না তো?"

রান্ত্‌সেভার দিকে ঘুরে মারিয়া বলল, "আরে না, না! আমার নজর আছে। এখন ও খুব ধোপ-দুরস্ত মেয়ে হয়ে গেছে। তুমি ওকে ধরো, আমি ততক্ষণ মাসলভাকে সাহায্য করিগে। ওর কম্বলটাও এনে দেব।"

রাস্ত্‌সেভা ছোট মেয়েটিকে কোলে নিয়ে তার মোটাসোটা হাত দুটো মায়ের স্নেহে বুকে চেপে ধরে তাকে একটুকরো মিছরি দিল।

মারিয়া পাভ্‌লভনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দুটি লোক গরম জল ও খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল।

অধ্যায়—১২

নবাগত দুজনের একটি যুবক বেঁটেখাটো ও শীর্ণকায়। গায়ে কাপড়ের আস্তরণ দেওয়া ভেড়ার চামড়ার কোট, পায়ে হাই-বুট। দুটো ধূমায়িত চায়ের পাত্র ও বগলের নীচে কাপড়ে-মোড়া একটা রুটি সে নিয়ে দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকল।

চায়ের পাত্র দুটো কাপের পাশে রেখে রুটিটা রাস্ত্‌সেভাকে দিয়ে সে বলল, "আরে, আমাদের যুবরাজ যে আবার হাজির হয়েছেন। আমরা কিন্তু খুব ভাল ভাল জিনিস এনেছি।" ভেড়ার চামড়াটা খুলে সকলের মাথার উপর দিয়ে তাকের বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে সে বলতে লাগল, "মার্কেল কিনেছে দুধ ও ডিম; তার মানে আজ রাতে রীতিমত বল-নাচ জমে উঠবে। এদিকে রাস্ত্‌সেভা তো চারদিকে সুচারু পরিচ্ছন্নতা ছড়িয়ে দিয়েছে; আশা করি এবার সে কাটা তৈরি করবে।"

এই লোকটির উপস্থিতি: তার গতিবিধি, তার কণ্ঠস্বর, তার দৃষ্টি—সব কিছু থেকেই যেন উৎসাহ ও আনন্দ ঝরে পড়ছে। তার অপর সঙ্গীটি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত; সে হতাশ ও বিষণ্ণ। চেহারা ছোটখাটো, হাড় মোটা, চোয়াল বের-করা, বিবর্ণ মুখ, পাতলা ঠোঁট, সুন্দর সবুজাভ চোখ। গায়ে পুরনো তালি-মারা কোট, পায়ে উঁচু বুট ও "গ্যালোস"। দুই পাত্র দুধ ও বার্চ-গাছের বাকলের তৈরি দুটো গোল বাক্স এনে সে রাস্ত্‌সেভার সামনে রাখল। শুধু ঘাড়টা নুইয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে নেখ্‌লুদভকে অভ্যর্থনা জানাল। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভিজে হাতটা দিয়ে কর-মর্দন করে সে খাবার জিনিসগুলি বের করতে লাগল।

এই দুজন রাজনৈতিক বন্দীই সাধারণ মানুষ। প্রথমটি নবতভ, একজন চাষী; দ্বিতীয়টি মার্কেল কন্দ্রাতেভ, একজন মজুর। মার্কেল বিপ্লবী দলে এসেছে বেশী বয়সে; নবতভ যোগ দিয়েছে ষোল বছর বয়সে। গ্রামের স্কুল ছাড়বার পর অসাধারণ মেধার জন্য হাই স্কুলে জায়গা পেয়ে গেল; যতদিন সেখানে ছিল অন্যকে পড়িয়ে নিজের খরচ চালাত; পড়া শেষ করে সোনার মেডেল পেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ঢুকল না। কারণ স্কুলের উপরের শ্রেণীতে পড়তে পড়তেই সে মনস্থির করে ফেলেছিল যে জনতার মধ্যে চলে গিয়ে অবহেলিত ভাইদের মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালাবে। তাই সে করল। প্রথমে

একটা বড় গ্রামে সরকারী করণিকের চাকরি পেল। অচিরেই তাকে গ্রেপ্তার করা হল, কারণ সে চাষীদের অনেক কিছু পড়ে শোনাত এবং তাদের ফসল তোলা ও বিক্রির ব্যাপারে একটা সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল। আট মাস কারাগারে আটক রেখে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল, কিন্তু তখনও পুলিশের নজরবন্দী করে রাখা হল। ছাড়া পেয়েই সে স্কুল-শিক্ষকের চাকরি নিয়ে আর একটা গ্রামে চলে গেল এবং প্রথম গ্রামে যা করেছিল তাই করতে লাগল। ফলে আবার গ্রেপ্তার এবং চৌদ্দ মাস কারাবাস। সেখানেই তার রাজনৈতিক প্রত্যয় দৃঢ়তর হল।

তারপর তাকে পার্ম জেলায় নির্বাসিত করা হল এবং সেও সেখান থেকে পালাল। তারপর আবার সাত মাস কারাবাস এবং তারপর আর্থাঙ্গেল্‌স্‌-এ নির্বাসন। নতুন জারের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে অস্বীকার করায় তাকে পাঠানো হল ইয়াকুতস্ক্‌ অঞ্চলে। এই ভাবে তার পরিণত জীবনের অর্ধেকটাই কেটে গেল কারাগারে ও নির্বাসনে। কিন্তু এই সব অভিযান তার চিত্তকে তিক্ত করে তোলে নি, তার শক্তিকে দুর্বল করে নি, বরং উদ্দীপনায় ভরিয়ে তুলেছে। সে সর্বদাই কর্মব্যস্ত, আনন্দময় ও উদ্দীপনাপূর্ণ। কোন কিছুর জন্যই তার অনুশোচনা নেই, দূর ভবিষ্যতের দিকে সে তাকায় না, তার সব শক্তি, কুশলতা ও বাস্তব জ্ঞান নিয়ে বর্তমান জীবনকে ঘিরেই কাজ করে চলে। যখনই মুক্ত থাকে, নিজের উদ্দেশ্য সাধনেই কাজ করে—মজুরদের, বিশেষ করে গ্রাম্য মজুরদের মধ্যে আলোক বিতরণ করা আর তাদের ঐক্যবদ্ধ করে তোলাই সেই উদ্দেশ্য। যখন কারাগারে থাকে তখনও বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার উপায় উদ্ভাবনে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে নিজের এবং দলের অন্য সকলের জীবনকে যতটা আরামে রাখা যায় তার ব্যবস্থা করতে সে সমান উদ্যম ও বাস্তবতার সঙ্গেই কাজ করে যায়। সব চাইতে বড় কথা সে সামাজিক লোক—কম্যুনের একজন সদস্য। তাকে দেখলেই মনে হয়, নিজের জন্য সে কিছুই চায় না, যৎসামান্য কিছু পেলেই সে সন্তুষ্ট, কিন্তু সহকর্মীদের জন্য সে চায় অনেক কিছু এবং তার জন্য দিন-রাত না ঘুমিয়ে, না খেয়ে সে শরীর ও মনের দিক থেকে অবিরাম কর্মব্যস্ত থাকতে পারে। চাষী হিসাবে সে ছিল পরিশ্রমী, পর্যবেক্ষণশীল ও কর্মপটু; সে ছিল স্বভাবতই সংযত, ভদ্র এবং অপরের ইচ্ছা ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তার বুড়ি মা তখনও বেঁচেছিল; একটি অশিক্ষিতা, কুসংস্কারপরায়ণা, বৃদ্ধা কৃষক রমণী। নবতভ তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করত, ছাড়া পেলেই গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করত। যতদিন বাড়িতে তার কাছে থাকত ততদিন মার জীবনের সব কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকত, তার কাজে সাহায্য করত, ছোটবেলার খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত, তাদের সঙ্গে মিশে সস্তা সিগারেট খেত, তাদের মুষ্টিযুদ্ধে অংশ নিত, তাদের বুঝিয়ে দিত কি ভাবে তারা

প্রতারিত হচ্ছে এবং কি করলে তারা এই প্রতারণার হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে। বিপ্লব সম্পর্কে যখনই সে ভাবত বা কথা বলত, তখনই সে কল্পনা করত যে, যে-জনগণের ভিতর থেকে সে উঠে এসেছে তারা প্রায় আগেকার মত অবস্থায়ই থাকবে, শুধু তাদের যথেষ্ট জমি থাকবে এবং ভদ্রলোক ও সরকারী কর্মচারিরা তাতে নাক গলাবে না। তার মতে—আর এ ব্যাপারে নভদ্ভরভ্ ও তার অনুগামী মার্কেল কন্দ্রাতেভ-এর সঙ্গে তার মত-বিরোধ আছে—বিপ্লব কখনও জনগণের মৌলিক জীবন-ধারাকে বদলে ফেলবে না, পুরো বাড়িটাকেই ভেঙে ফেলবে না, শুধু তার বড় আদরের সুন্দর, মজবুত, বিরাট পুরনো বাড়িটার ভিতরকার দেয়ালগুলোকে বদলে দেবে।

ধর্মের ব্যাপারেও চাষীদের চিরন্তন ধারণারই সে অনুবর্তী : তাত্ত্বিক সমস্যা, সব উৎসের মূল উৎসের সমস্যা বা ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্যা নিয়ে সে চিন্তাই করে না। তার কাছে ঈশ্বর (আরাগোর মতই) এমন একটি কল্পনা যার প্রয়োজন সে আজ পর্যন্ত বোধ করে নি। জগতের আদি কারণ নিয়ে তার কোন রকম মাথা-ব্যথা নেই, মোজেস বা ডারউইন কার কথা ঠিক তাতেও তার কিছু যায় আসে না। যে ডারউইন-তত্ত্বকে তার বন্ধুরা এত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে, তার কাছে কিন্তু সেটাও ছ'টি দিন সৃষ্টির মত একটা মানসিক খেলার মতই।

পৃথিবী কি করে সৃষ্টি হয়েছিল সে ব্যাপারেও তার কোন আগ্রহ নেই, কারণ এই পৃথিবীতে কি করে ভালভাবে বেঁচে থাকা যায় সেই সমস্যা নিয়েই সে সব সময় ব্যাপৃত থাকত। পরজন্মের কথাও সে কখনও ভাবত না। দেশের অন্য সব মজুরদের মতই পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে জন্মসূত্রে পাওয়া এই দৃঢ় মূল অবিচলিত বিশ্বাসকেই সে অন্তরের অন্তস্তলে আঁকড়ে ধরে ছিল যে, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে যেমন কোন কিছুরই বিনাশ নেই, শুধু অবিরাম প্রতিটি বস্তুর আকারের পরিবর্তন ঘটছে মাত্র—সার থেকে শস্য, শস্য থেকে মুরগি, ব্যাঙাচি থেকে ব্যাং, শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি, বীজ থেকে বনস্পতি—ঠিক সেই রকম মানুষের বিনাশ নেই, আছে শুধু পরিবর্তন। এ বিশ্বাস তার ছিল, আর ছিল বলেই সে সব সময় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারত, এবং যে দুঃখ-যন্ত্রণা মানুষকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যায় তাকে সে সাহসের সঙ্গে সহ্য করতেও পারত ; শুধু সে সম্পর্কে কোন কথা বলতে জানত না, বলতে চাইতও না। সে কাজকে ভালবাসত, সব সময়ই কোন না কোন কাজ নিয়ে থাকত, এবং সহকর্মীদেরও সেই পথেই টেনে নিয়ে যেত।

জনগণের ভিতর থেকে আসা দ্বিতীয় রাজনৈতিক বন্দী মার্কেল কন্দ্রাতেভ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। পনেরো বছর বয়সেই সে মজুরী শুরু করে এবং তার প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে এই অস্পষ্ট ধারণাটাকে গলা টিপে মারবার জন্য ধূমপান করতে ও মদ খেতে শেখে। তার প্রতি যে অন্যায় করা হচ্ছে এ বোধ

তার প্রথম জন্মে একটি খৃস্টমাস দিবসে। মালিকের স্ত্রীর দ্বারা আয়োজিত একটি খৃস্টমাস-বৃক্ষের উৎসবে তারা (কারখানার ছেলেমেয়েরা) আমন্ত্রিত হয়েছিল। সেখানে সে পেল এক ফার্দিং দামের একটা বাঁশি, একটা আপেল, একটা রাংতা-লাগানো আখরোট গাছ ও ডুমুর গাছ ; আর মালিকের ছেলে-মেয়েরা যে উপহার পেল তা যেন পরীদের দেশ থেকে আনা, আর তার দাম, সেটা সে পরে শুনেছিল, পঞ্চাশ রুবলেরও বেশী। তার বয়স যখন বিশ বছর তখন একজন খ্যাতনাম্নী বিপ্লবী তাদের কারখানায় মজুরের কাজ করতে এল। তার অনেক রকম গুণের পরিচয় পেয়ে সেই মেয়েটিই কন্দ্রাতেভকে নানা রকম পুস্তক-পুস্তিকা দিতে শুরু করল, তার সঙ্গে কথা বলে তার বর্তমান অবস্থা ও তার প্রতিকারের কথা বুঝিয়ে বলতে লাগল। অত্যাচারের হাত থেকে নিজেকে ও অন্যকে মুক্ত করার সম্ভাবনা যখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল তখন চলতি ব্যবস্থার অন্যায়গুলি অনেক বেশী নিষ্ঠুর ও নৃশংস বলে মনে হতে লাগল ; এবং শুধু মুক্তি নয়, এই নিষ্ঠুর অন্যায় অবস্থার যারা ব্যবস্থাপক ও রক্ষক তাদের শাস্তি দানের বাসনাও তার মনে উদগ্র হয় উঠল। তাকে বলা হল, একমাত্র জ্ঞানের পথেই তা সম্ভব ; কন্দ্রাতেভও এক মনে জ্ঞানার্জনে আত্ম-নিয়োগ করল। জ্ঞানের পথ ধরে কেমন করে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পৌছনো যাবে তা সে বুঝত না, কিন্তু সে বিশ্বাস করত যে-জ্ঞান তার জীবনের সব অন্যায়কে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে সেই জ্ঞানই সে অন্যায়কে দূর করতেও পারবে। তাছাড়া এই জ্ঞানই তাকে অন্য সকলের উপরে তুলে দেবে সে মনে করত। সুতরাং সে ধূমপান ও মদ খাওয়া ছেড়ে দিল এবং সবটা অবসর সময়ই (মালখানার কাজে বদলি হওয়ায় অনেক বেশী অবসর সে তখন পেত) পড়াশুনা নিয়ে থাকত।

বিপ্লবী মেয়েটি তাকে পাঠ দিত ; তার সব কিছু জানবার আগ্রহ এবং গ্রহণ করবার ক্ষমতা দেখে সে বিস্মিত হয়ে যেত। দু'বছরের মধ্যেই সে বীজগণিত, জ্যামিতি ও ইতিহাস (তার প্রিয় বিষয়) ভালভাবেই শিখে ফেলল, এবং কাব্য, উপন্যাস ও প্রবন্ধ, বিশেষ করে সমাজতন্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধের সঙ্গেও পরিচিত হয়ে উঠল।

বিপ্লবীটি গ্রেপ্তার হল ; সেই সঙ্গে কন্দ্রাতেভও, কারণ নিষিদ্ধ বইগুলি তার কাছেই পাওয়া গেল। দুজনকেই কারাগারে পাঠানো হল এবং সেখান থেকে ভলগ্দা জেলায় নির্বাসনে। সেখানেই তার পরিচয় হল নভদ্ভরভ-এর সঙ্গে ; আরও অনেক বেশী বৈপ্লবিক পুঁথিপত্র পড়ল, সব কিছু মনে রাখল এবং সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শে তার প্রত্যয় দৃঢ়তর হল। নির্বাসনের পরে একটা বড় ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিল। শেষ পর্যন্ত কারখানাটা ধ্বংস হয়ে গেল এবং তার ডিরেক্টর খুন হল। আবার গ্রেপ্তার হয়ে সেও নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হল।

প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যে রকম ধর্মের বিষয়েও সেই রকম

তার অভিমত নেহাৎই নঞার্থক। যে ধর্মের মধ্যে সে বড় হয়ে উঠেছে তার অবাস্তবতা উপলব্ধি করে এবং প্রথমে সভয়ে ও পরে সোৎসাহে অনেক চেষ্টা করে তার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করে এখন সে সুযোগ পেলেই সক্রোধে বিদ্রূপাত্মক ভাষায় পুরোহিত ও ধর্মীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে কখনও কসুর করে না ; হয় তো তাকেও তার পূর্বপুরুষগণকে যে ভাবে এতকাল বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্যই এ কাজ সে করে।

সে খুব সংযত কঠোর জীবন যাপন করে। প্রয়োজনীয় সামান্য কিছু পেলেই সে সন্তুষ্ট। ছেলেবেলা থেকেই সে কাজ করতে অভ্যস্ত ; তার মাংসপেশীগুলিও সবল ; তাই যে কোন দৈহিক পরিশ্রমের কাজই সে খুব সহজেই দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে। তবে তার কাছে সব চাইতে মূল্যবান কারাগারে ও বিরতি কেন্দ্রের অবসরের সময়গুলি, কারণ সেই সময়টা সে পড়াশুনা করতে পারে। সে এখন কার্ল মার্কসের প্রথম খণ্ডটি পড়ছে ; বইটিকে সে সব সময়ই একটি মূল্যবান সম্পদের মত তার থলের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। একমাত্র নভদ্‌ভ্‌রভ্‌ ছাড়া অন্য সব সহকর্মীর প্রতিই সে সংযত ও উদাসীন ব্যবহার করে থাকে। নভদ্‌ভ্‌রভের প্রতি সে খুবই অনুরক্ত ; আর সব বিষয়েই তার যুক্তিকে সে অখণ্ডনীয় বলে গ্রহণ করে থাকে।

স্ত্রীলোকদের প্রতি তার অপরিসীম ঘৃণা ; তাদের সে সব প্রয়োজনীয় কাজের পক্ষেই বিঘ্নস্বরূপ বলে মনে করে। কিন্তু মাসলভার প্রতি সে সহানুভূতিশীল এবং তার সঙ্গে ভাল ব্যবহারও করে। সে মনে করে, উচ্চতর শ্রেণী নিম্নতর শ্রেণীর উপর যে শাসন চালিয়ে থাকে মাসলভা তারই একটি দৃষ্টান্তস্থল। সেই একই কারণে সে নেখ্‌লুদভকে অপছন্দ করে ; তাই তার সঙ্গে সে কদাচিত কথা বলে এবং তার হাতে হাত রাখে ; তবে তার সঙ্গে দেখা হলে করমর্দনের জন্য নিজের হাতটাই এগিয়ে দেয়।

অধ্যায়—১৩

স্টোভ গরম হওয়ায় আগুন নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে ; চা তৈরি হয়ে কাপে ও মগে ঢালা হয়েছে, দুধ মেশানো হয়েছে ; বিস্কুট, গমের টাটকা রুটি, মাখন, সিদ্ধ ডিম, এবং বাছুরের মাথা ও পা টেবিল-ঢাকনার উপর সাজানো হয়েছে। যে বিছানার তাকটা টেবিল হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে সকলেই সেখানে ভিড় করে খেতে খেতে গল্প-গুজব করছে। রান্‌তসেভা একটা বাক্সের উপর বসে চা ঢালছে। সকলেই তাকে ঘিরে ধরেছে, শুধু ক্রাইল্‌তসভ ছাড়া। ভিজে জোব্বাটা গা থেকে খুলে একটা শুকনো কম্বল জড়িয়ে নিজের জায়গায় বসেই সে নেখ্‌লুদভের সঙ্গে কথা বলছে।

বৃষ্টির মধ্যে অনেকটা পথ হেঁটে এসে এখানেও সকলে ধুলো-ময়লা ও বিশৃংখলার মধ্যে পড়ে ; অনেক কষ্টে সাফ-সাফাই করে এবং কিছু মুখে দিয়ে ও গরম গরম চা খেয়ে এখন সকলেরই মন-মেজাজ বেশ খুশি হয়ে উঠেছে।

দেয়ালের ওপাশ থেকে কয়েদীদের পায়ের শব্দ আর চীৎকার-চেঁচামেচি ও গালাগালির শব্দ ভেসে আসছে। তা থেকেই তাদের পরিবেশের অবস্থাটা বুঝতে পারার জন্যই এ ঘরে সকলের আমার-বোধটা যেন কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেন সমুদ্রের মাঝখানে একটা দ্বীপে এই লোকগুলো এমন একটুখানি জায়গা পেয়েছে যেখানে চারপাশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশার ছাপ পড়ে নি। এতেই তাদের মনের অবস্থা অনেকটা ভাল হয়েছে, তারা বেশ উত্তেজিত বোধ করছে। বর্তমান অবস্থা ও আসন্ন ভবিষ্যৎ ছাড়া আর সব কিছু নিয়েই তারা আলোচনা করছে। তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সাধারণত যে রকম ঘটে থাকে—বিশেষত তাদের যদি এই লোকগুলির মত বাধ্য হয়ে এক সঙ্গে থাকতে হয়—সব রকম মিল-অমিল ও আকর্ষণ-বিকর্ষণের একটা মিশ্রিত মনোভাব তাদের পেয়ে বসেছে। প্রায় সকলেই প্রেমে পড়েছে। নভদ্রভ প্রেমে পড়েছে সুন্দরী হাস্যময়ী গ্রাবেৎস-এর সঙ্গে। এই অবিবেচক মেয়েটি গিয়েছিল লেখাপড়া করতে, বিপ্লবের ব্যাপারে সে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন ; কিন্তু যুগের হাওয়ায় পড়ে কি ভাবে যেন দলে ভিড়ে গেল এবং নির্বাসিত হল। যখন বাইরে ছিল তখনও যেমন, বিচার চলাকালে, কারাগারে এবং নির্বাসনেও তেমনই পুরুষকে জয় করাই ছিল তার জীবনের প্রধান আগ্রহ। এখন পথ-পরিক্রমার কালে সে যে নভদ্ভরভ্-এর মনকে জয় করতে পেরেছে তাতেই তার সুখ ; সেও তাকে ভালবেসেছে। ভেরা দুখোভা প্রেমে পড়তে খুবই উৎসুক, কিন্তু অপরের মনে প্রেম জাগাতে সে পারে না ; তাই প্রেমের প্রত্যাশায় সে একবার নবতভের দিকে একবার নভদ্ভরভের দিকে ঝুঁকছে। ক্রাইল্ত্সভের মনেও জেগেছে মারিয়া পাভ্লভ্নার প্রতি ভালবাসা। সে পুরুষের মন নিয়েই মারিয়াকে ভালবাসে, কিন্তু এ ধরনের ভালবাসাকে সে যে কি চোখে দেখে তা বুঝতে পেরে যে রকম মমতায় মারিয়া তার সেবা করে চলেছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা ও বন্ধুত্বের আবরণেই সে নিজের ভালবাসাকে ঢেকে রেখেছে। নবতভ ও রান্ত্সেভা পরস্পরকে বড়ই জটিল বাঁধনে বেঁধেছে। মারিয়া পাভ্লভ্না যেমন সম্পূর্ণ পবিত্র একটি কুমারী কন্যা, রান্ত্সেভাও তেমনই স্বামীর পত্নী হিসাবে একান্তভাবেই পতিপ্রাণা।

যখন ষোল বছরের একটি স্কুলের ছাত্রী তখনই সে পিতার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রান্ত্সেভাকে ভালবাসে এবং সে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়বার আগেই মাত্র উনিশ বছর বয়সে তাকে বিয়ে করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার চতুর্থ বছরে তার স্বামী একটি ছাত্র-গোলযোগের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, পিতার্সবার্গ থেকে নির্বাসিত হয় এবং বিপ্লবী দলে যোগদান করে। মেয়েটিও তখন ডাক্তারি পড়া ছেড়ে

দিয়ে তার দেখাদেখি বিপ্লবীদলে যোগ দেয়। স্বামীকে সে যদি চতুরতম ও শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে মনে না করত তাহলে তার প্রেমে পড়ত না, আর প্রেমে না পড়লে তাকে বিয়েও করত না! কিন্তু চতুরতম ও শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে যাকে ভালবেসেছে ও বিয়ে করেছে, জীবন ও তার আদর্শকে সে চোখে দেখেছে স্বভাবতই মেয়েটিও সেই চোখেই জীবন ও তার আদর্শকে দেখেছে। প্রথমে সে মনে করত যে শিক্ষাই জীবনের আদর্শ, তাই মেয়েটিও তখন তাই মনে করত। পরে সে বিপ্লবী হলে মেয়েটিও তাই হল। রাস্ত্সেভা বেশ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলত যে বর্তমান ব্যবস্থা চলতে পারে না, কাজেই তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে প্রতিটি মানুষ যাতে স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে পারে তদনুরূপ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা গড়ে তুলতে সংগ্রাম করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য; আর মেয়েটিও মনে করত যে সেও বুঝি তাই ভাবে ও অনুভব করে, কিন্তু আসলে তার স্বামীর যত কিছু চিন্তা-ভাবনা তাকেই সে একান্ত সত্য বলে মনে করে, আর সর্ব অবস্থায় স্বামীর সঙ্গে পূর্ণ মতৈক্য এবং তার সঙ্গে নিজের পরিপূর্ণ একাত্মবোধই তার জীবনের একমাত্র কাম্য বলে মনে করে, কারণ তাতেই সে পরিপূর্ণ নৈতিক সন্তুষ্টি খুঁজে পায়।

স্বামী ও সন্তানকে (সে তার মায়ের কাছে আছে) ছেড়ে আসতে তার খুবই কষ্ট হয়েছে, কিন্তু দৃঢ়ভাবে ও শান্ত চিত্তে সে কষ্ট সে সহ্য করেছে, কারণ এ সবই সে করেছে স্বামীর জন্য, আর তার স্বামী যে আদর্শের জন্য কাজ করে চলেছে সেটা যে খুবই ভাল সে বিষয়ে তার তিলমাত্র সন্দেহ নেই। চিন্তায় সে এখনও স্বামীর সঙ্গেই আছে, তাই তার কাছে কাছে থাকতে যেমন পারত না তেমনই এখনও অপর কাউকে ভালবাসতে সে পারে না। কিন্তু নবতভ-এর আন্তরিক পবিত্র ভালবাসা তার মনকে ছুঁয়েছে, তাকে উত্তেজিত করেছে। স্বামীর বন্ধু এই দৃঢ়চরিত্রের নীতিবান মানুষটি তাকে ভগ্নির মত দেখতেই চেষ্টা করে, তবু তার আচরণে তার চাইতেও বেশী কিছু বুঝি আত্মপ্রকাশ করে, তাতে দুজনই ভয় পায়, আবার তার ফলেই তাদের এই কঠোর জীবনে বুঝি রংও লাগে।

কাজেই সারা দলটার মধ্যে একমাত্র মারিয়া পাভ্লভনা ও কন্দ্রাতেভই বুঝি প্রেমের স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

অধ্যায়—১৪

চায়ের পর কাতয়ুশার সঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত কথা বলা যাবে এই আশায় নেখ্লয়ুদভ ক্রাইল্ত্সভ-এর পাশে বসে গল্প করতে লাগল। কথা প্রসঙ্গে সে মাকার-এর কথা ও তার অনুরোধের কথাও জানাল। চকচকে চোখ মেলে নেখ্লয়ুদভের দিকে তাকিয়ে ক্রাইল্ত্সভ মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনল।

তারপর হঠাৎ বলে উঠল, "সত্যি, আমিও মাঝে মাঝেই ভাবি, এই যে

আমরা পাশাপাশি যাদের সঙ্গে যাচ্ছি—তারা কারা? তারাই তো সেই মানুষ যাদের জন্য আমরা এ পথে চলেছি অথচ তাদের যে আমরা চিনি না শুধু তাই নয়, চিনতে চাইও না। তার চাইতেও খারাপ, তারা আমাদের ঘৃণা করে, শত্রু বলে মনে করে। কী সাংঘাতিক অবস্থা বলুন তো?"

তাদের আলোচনা শুনতে পেয়ে নভদ্‌ভরভ্‌ মাঝখানে বলে উঠল, "এর মধ্যে সাংঘাতিক তো কিছু নেই। জনতা সব সময়ই একমাত্র ক্ষমতাকেই পূজা করে। আজ সরকারের হাতে ক্ষমতা আছে, তাই তারা সরকারকে পূজা করে, আর আমাদের ঘৃণা করে। কাল আমরা ক্ষমতা হাতে পাব, তখন তারা আমাদেরই পূজা করবে।

ঠিক সেই সময় দেয়ালের ও পাশ থেকে প্রচণ্ড গালাগালি ও শিকলের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ ভেসে এল। কারা যেন দেয়ালে আঘাত করছে আর চীৎকার চেঁচামেচি করছে। কাকে যেন পেটানো হচ্ছে, আর সে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, "খুন! বাঁচাও!"

নভদ্‌ভরভ্‌ শান্ত গলায় মন্তব্য করল, "ওই শোন, পশুগুলোর কাণ্ড! ওদের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা কেমন করে সম্ভব?"

"আপনি ওদের পশু বলছেন, আর নেখ্‌লুদভ এই মাত্র এমন একটা ঘটনা আমাকে বলেছেন," বিরক্ত গালায় ক্রাইলতস্‌ভ পাল্টা জবাব দিল এবং মাকার কি ভাবে একজন গ্রামের প্রতিবেশীকে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছে তাও বলল। "এটা তো পশুর কাজ নয়, এটা তো বীরত্ব।"

"বাজে ভাবালুতা!" নভদ্‌ভরভ্‌ ঘৃণার সঙ্গে সজোরে বলে উঠল। "এই লোকগুলোর মনোভাব ও তাদের কাজের ধারা বোঝা আমাদের পক্ষে কষ্টকর। তুমি দেখছ উদারতা, কিন্তু এটা অপর কয়েদীর প্রতি ঈর্ষাও হতে পারে।"

হঠাৎ রেগে গিয়ে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বলল, "অন্যের কিছুই কি আপনি ভাল দেখতে পারেন না?"

"যার অস্তিত্বই নেই তাকে কেমন করে দেখা যাবে।"

"একটা মানুষ যখন নৃশংস মৃত্যুর ঝুঁকি নেয়, তখন নিশ্চয় ভাল কিছু থাকে।"

নভদ্‌ভরভ্‌ বলল, "আমি মনে করি, আমরা যদি কিছু করতে চাই তাহলে তার প্রথম শর্ত হল—" (এই সময় কন্দ্রাতেভ হাতের বইটা বন্ধ করে গুরুর কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুরু করল) "কল্পনায় ভেসে না গিয়ে আমরা কঠোর বাস্তবকে দেখব। জনগণের জন্য সাধ্যমত সব কিছু আমরা করব, বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা করব না। জনগণ আমাদের কাজের উপলক্ষ্যই হতে পারে, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তারা আজকের মত অকর্মণ্যতার মধ্যে ডুবে থাকবে ততদিন তারা আমাদের সহকর্মী হতে পারবে না।" সে যেন একটা বক্তৃতা দিয়ে চলল। "কাজেই তাদের যে উন্নতি সাধনের জন্য আমরা কাজ করে

চলেছি যতদিন সে উন্নতি সাধিত না হয় ততদিন তাদের কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য প্রত্যাশা করা ভুল।"

"কিসের উন্নতি?" ক্রাইল্ত্সভ পুনরায় রেগে বলল, "আমরা বলে থাকি যে স্বেচ্ছাচারী শক্তির আমরা বিরোধী; অথচ এটা কি অত্যন্ত ভয়াবহ স্বেচ্ছাচারী শক্তি নয়?"

নভদ্ভরভ্ শান্তভাবে জবাব দিল, "এটা কোন রকম স্বেচ্ছাচারী শক্তিই নয়। আমি শুধু বলছি, জনগণের হদিস আমি জানি, আর তাই তাদের পথ দেখাতে পারি।"

"কিন্তু আপনি কি করে নিশ্চিত হলেন যে আপনার দেখানো পথই ঠিক পথ? যে স্বেচ্ছাচারী থেকে ফরাসী বিপ্লবের এত বিচার, দণ্ড ও প্রাণ-বলির জন্ম হয়েছিল, এটাও কি ঠিক তাই নয়? তারাও তো বিজ্ঞানের সাহায্যে একটিমাত্র সঠিক পথই জেনেছিল।"

"তারা ভুল করেছিল বলে আমিও ভুল করছি তা তো প্রমাণ হয় না। তাছাড়া, আদর্শের বাগাড়ম্বর আর অর্থনীতির দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ঘটনার মধ্যে অনেক তফাৎ।"

নভদ্ভরভ্-এর কণ্ঠস্বর ঘরের মধ্যে গম-গম করতে লাগল। একমাত্র সেই কথা বলে চলল, আর সকলেই নীরব।

একটি নিশ্চুপ মুহূর্তের অবসরে মারিয়া পাভ্লভ্না বলল, "সব সময় তর্ক নিয়ে আছে।"

নেখ্লয়ুদভ তাকে জিজ্ঞাসা করল, "এ ব্যাপারে আপনি নিজে কি মনে করেন?"

"আমি মনে করি ক্রাইল্ত্সভই ঠিক বলেছে—জনগণের উপর আমাদের মতামত চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়।"

"আর তুমি কাতয়ুশা?" নেখ্লয়ুদভ হেসে জিজ্ঞাসা করল। পাছে সে অদ্ভুত কিছু বলে বসে তাই সে উৎকণ্ঠার সঙ্গে তার জবাবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

"আমি মনে করি, সাধারণ মানুষের প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে," কথাগুলি বলেই মাসলভা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। "আমি মনে করি, তাদের প্রতি ভয়ংকর অন্যায় করা হচ্ছে।"

নবতভ জোর গলায় বলে উঠল, "ঠিক বলেছ মাসলভা, ঠিক বলেছ। তাদের প্রতি ভীষণ অন্যায় করা হচ্ছে—জনগণের প্রতি—কিন্তু তাদের প্রতি অবিচার করা চলবে না, আর সেটাই আমাদের কাজ।"

"বিপ্লবের লক্ষ্য সম্পর্কে এ এক অদ্ভুত ধারণা" বিরক্ত কণ্ঠে মন্তব্য করে নভদ্ভরভ্ নিঃশব্দে ধূমপান করতে লাগল।

"ওর সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি না" চুপি চুপি কথা কয়টি বলে

ক্রাইল্ত্সভও চুপ করল।

নেখ্ল্যুদভ বলল, "না পারাই ভাল।"

অধ্যায়—১৫

সব বিপ্লবীই নভদ্ভরভ্কে শ্রদ্ধা করে; সে শিক্ষিত এবং সকলে তাকে জ্ঞানী লোক বলেই মনে করে; কিন্তু নেখ্ল্যুদভ মনে করে, যে সব মানুষ বিপ্লবী হয়েও নৈতিক বিচারে সাধারণ মানুষ অপেক্ষাও নীচু স্তরের, সে তাদেরই একজন। লোকটির বুদ্ধির উৎকর্ষ—তার লব—খুব বেশী; কিন্তু নিজের সম্পর্কে তার ধারণা—তার হর—অপরিমেয় ভাবে বেশী, এবং তার বুদ্ধির উৎকর্ষকে অনেক বেশী ছাড়িয়ে গেছে।

তার প্রকৃতি সাইমনসনের প্রকৃতির ঠিক বিপরীত। সাইমনসন পুরুষোচিত চরিত্রের মানুষ; বিচারবুদ্ধির নির্দেশেই সে কাজ করে, তার দ্বারাই পরিচালিত হয়। অপরদিকে, নভদ্ভরভ্ নারীসুলভ চরিত্রের লোকদের অন্যতম; তাদের বিচারবুদ্ধি পরিচালিত হয় অংশত আবেগ-নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টায় এবং অংশত সেই চেষ্টাপ্রসূত কার্যাবলীর সমর্থনে।

যদিও নভদ্ভরভ্ তার বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলতে পারে, তথাপি নেখ্ল্যুদভ মনে করে যে, সে সবই তার উচ্চাকাংখা ও আধিপত্য কামনার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম দিকে অন্যের চিন্তকে গ্রহণ করবার এবং সঠিকভাবে তাকে প্রকাশ করবার ক্ষমতার জন্য উচ্চ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে সে বেশ একটা আধিপত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কারণ সেখানে এই সব গুণকে খুবই মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে, আর তাই নিয়েই সে সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু পড়া শেষ করে ডিপ্লোমা পাবার পরে সে আধিপত্য যখন চলে গেল, তখন হঠাৎ অন্যত্র আধিপত্য বিস্তারের জন্য সে মত পাল্টে ফেলল (ক্রাইল্ত্সভ তাই বলে) এবং সংযত উদারপন্থী থেকে নারদনিক-দলের প্রচণ্ড ভক্ত হয়ে পড়ল।

যে নৈতিক ও নান্দনিক গুণাবলী থাকলে মানুষের মনে সন্দেহ ও দ্বিধা দেখা দেয় তা না থাকায় অচিরেই সে বিপ্লবী মহলে তার ঈপ্সিত আসনটি পেয়ে গেল—দলনেতার আসন। একবার একটা পথ বেছে নেবার পরে সে আর কোন সন্দেহ বা দ্বিধা করে না; সুতরাং সে একেবারেই নিশ্চিত যে তার কখনও ভুল হয় না। তার চোখে সব কিছুই সহজ, সরল, নিশ্চিত। তার মতাদর্শের সংকীর্ণতা ও একদেশদর্শিতার জন্যই সব কিছু এত সরল ও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পেরেছে; সে তো বলেই, দরকার শুধু যুক্তিনিষ্ঠ হওয়া। তার আত্ম-প্রত্যয় এত বেশী যে মানুষ হয় তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়, নয় তো তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। যেহেতু সে প্রধানত অল্প বয়সী যুবকদের মধ্যেই কাজ-

কর্ম করে এবং তারাও তার সীমাহীন আত্মপ্রত্যয়কে গভীর জ্ঞান বলে ভুল করে, তাই বেশীর ভাগ কর্মীই তাকে মেনে নেয় এবং বিপ্লবী মহলে তার বিপুল সাফল্য স্বীকৃতি লাভ করে। এমন একটি গণ-অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিতে সে তার ক্রিয়া-কলাপকে পরিচালিত করছে যার ফলে সে ক্ষমতা দখল করতে পারবে এবং সেই উদ্দেশ্যে সে একটি সমাবেশের ডাক দিয়েছে। তার রচিত একটি কর্ম-পন্থা সেই সমাবেশের সামনে রাখা হবে ; তার স্থির বিশ্বাস, তার সেই কর্ম-পন্থা সব সমস্যার সমাধান করবে এবং সেটা নিশ্চয় গৃহীত হবে।

সাহস ও দৃঢ়চিত্ততার জন্য সহকর্মীরা তাকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু ভালবাসে না। সেও কাউকে ভালবাসে না ; খ্যাতিমান সব লোককেই সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে এবং সম্ভব হলে ধেড়ে বাঁদর বাচ্চা বাঁদরদের সঙ্গে যে ব্যবহার করে থাকে তাদের সকলের প্রতি সেই ব্যবহারই করে। অন্য লোকের মন থেকে সব শক্তি, সব ক্ষমতা সে ছিঁড়ে ফেলে দিত, যাতে তারা কেউ তার ক্ষমতা প্রকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করতে না পারে। যারা তার কাছে মাথা নত করে শুধু তাদের সঙ্গেই সে ভাল ব্যবহার করে। এখনও এই পথ-পরিক্রমায় সে ভাল ব্যবহার করছে কন্দ্রাতেভ-এর সঙ্গে (তার প্রচারকার্যের দ্বারা সে প্রভাবিত হয়েছে) এবং ভেরা দুখোভা ও সুন্দরী গ্রাবেৎস-এর সঙ্গে (এরা দুজনই তার প্রেমে পড়েছে)। নীতিগতভাবে মেয়েদের আন্দোলনকে সমর্থন করলেও মনে মনে সে কিন্তু সব স্ত্রীলোককেই নির্বোধ ও তুচ্ছ মনে করে ; তবে যে সব স্ত্রীলোকের সঙ্গে সে ভালবাসার আবেগে জড়িত (যেমন এখন সে গ্রাবেৎস্‌কে ভালবাসে) তাদের কথা আলাদা ; তাদের সে ব্যতিক্রম বলেই মনে করে এবং তাদের গুণপনা একমাত্র সেই বুঝতে পারে।

যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে সে মনে করে যে যথেচ্ছ মিলনই এ সমস্যার সার্থক সমাধান।

তার একটি নামমাত্র স্ত্রী ছিল এবং একটি আসল স্ত্রীও ছিল ; কিন্তু আসল স্ত্রীর কাছ থেকে সে আলাদা হয়ে গেছে কারণ সে বুঝেছে যে তাদের মধ্যে প্রকৃত ভালবাসা নেই। আর এখন সে গ্রাবেৎসের সঙ্গে যথেচ্ছ মিলনের কথা ভাবছে।

নভদ্‌ভরভ্‌ নেখ্‌লুদভকে ঘৃণা করে, তার কারণ সে মাসলভার সঙ্গে (তার ভাষা অনুযায়ী) "বোকা বোকা খেলা খেলছে" ; বিশেষত প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার ত্রুটি ও সেই ত্রুট সংশোধনের পদ্ধতির ব্যাপারে নভদ্‌ভরভের দৃষ্টিকোণ দ্বারা পরিচালিত না হয়ে নেখ্‌লুদভ অনুসরণ করেছে তার নিজস্ব পথ-পদ্ধতি : একজন প্রিন্সের পদ্ধতি অর্থাৎ বোকার পদ্ধতি। তার প্রতি নভদ্‌ভরভ্‌-এর এই মনোভাবের কথা নেখ্‌লুদভ জানে ; সে দুঃখের সঙ্গে আরও জানে যে, এই পথ-পরিক্রমার কালে মনের যে শুভ-বুদ্ধি সে অর্জন করেছে তা সত্ত্বেও এই লোকটিকে উচিত কথা না বলে সে পারে নি, তার প্রতি মনের গভীর

বিতৃষ্ণাকে সে চেপে রাখতে পারে নি।

অধ্যায়—১৬

পাশের ঘর থেকে সরকারী কর্মচারিদের গলা ভেসে এল। কয়েদীরা সব চুপচাপ। দুজন কনভয়-সৈন্যকে সঙ্গে নিয়ে সার্জেন্ট ঘরে ঢুকল। পরিদর্শনের সময় হয়েছে। সার্জেন্ট সকলকে গুণতি করল। নেখ্‌ল্যুদভের পালা এলে সার্জেন্ট চেনা লোকের মত তাকে বলল, "প্রিন্স, পরিদর্শনের পরে আপনি এখানে থাকবেন না। এবার আপনাকে যেতে হবে।"

এর অর্থ নেখ্‌ল্যুদভ জানে। সার্জেন্টের কাছে এগিয়ে গিয়ে সে তার হাতে একটি তিন রুবলের নোট গুঁজে দিল।

"আহা, ঠিক আছে; আপনাকে নিয়ে কী যে করি? ইচ্ছা হলে আরও কিছুক্ষণ থাকতে পারেন।"

সার্জেন্ট বেরিয়ে যেতে উদ্যত হতেই আর একজন সার্জেন্ট একটি কয়েদীকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। কয়েদীটির মুখে হাল্কা দাড়ি, আর চোখের নীচে আঘাতের দাগ।

কয়েদীটি বলল, "একটি মেয়ের জন্য আমি এসেছি।"

"এই যে বাপি এসেছে।" একটি শিশুর গলা শোনা গেল। রান্ত্‌সেভার পিছন থেকে একটি মাথা উঁকি দিল। রান্ত্‌সেভা নিজের পেটিকোটটা কেটে কাত্যুশা ও মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নার সাহায্যে শিশুটির জন্য একটা নতুন জামা তৈরি করছিল।

কয়েদী বুজভ্‌কিন সস্নেহে বলল, "হ্যাঁ মা, আমি এসেছি।"

বুজভ্‌কিনের ছড়ে-যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বলল, "ও আমাদের কাছেই থাকুক।"

রান্ত্‌সেভার হাতের সেলাইটা দেখিয়ে মেয়েটি বলল, "মাসিরা আমার জন্য নতুন জামা বানিয়ে দিচ্ছে। কী সু-ন্দ-র চ-ম-ৎ-কা-র জামা!"

মেয়েটিকে আদর করে রান্ত্‌সেভা বলল, "তুমি আমাদের কাছে শোবে তো?"

"হ্যাঁ, শোব। বাপিও শোবে।"

রান্ত্‌সেভার মুখে একটুকরো হাসি ঝিলিক দিল। বাপের দিকে ফিরে সে বলল, "না, বাপি শোবে না। তাহলে ওকে আমরা রাখছি।"

"হ্যাঁ, ওকে রেখে যেতে পার", এই কথা বলে প্রথম সার্জেন্ট অপর জনকে নিয়ে চলে গেল।

তারা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই নবতভ বুজভ্‌কিনের কাছে গিয়ে তার পিঠ চাপড়ে বলল, "আচ্ছা বুড়ো, কারমানভ্‌ নাম বদল করতে চায় এটা

কি সত্যি ?"

বুজভ্কিনের সদয় শান্ত মুখখানি হঠাৎ বিষণ্ন হয়ে উঠল ; তার চোখের উপর যেন একটা পর্দা নেমে এল।

সে ধীরে ধীরে বলল, "আমরা কিছু শুনি নি" ; তারপর চোখে সেই আবছা দৃষ্টি নিয়েই সে মেয়ের দিকে তাকাল।

"দেখ আক্সয়ুত্কা, মাসিদের কাছে বেশ ভাল হয়ে থেকো," বলেই সে দ্রুত পায়ে চলে গেল।

নবতভ বলল, "নাম বদলের কথাটা সত্যি, আর ও তা ভাল করেই জানে। আপনি কি করবেন ?"

নেখ্ল্যুদভ বলল, "পাশের ঘরের কর্তাব্যক্তিদের আমি সব বলব। কয়েদী দুজনকে আমি দেখলেই চিনতে পারব।"

আবার একটা তর্ক বেঁধে যাবে ভয়ে সকলেই চুপ করে রইল।

সাইমনসন এতক্ষণ দুই হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে ছিল ; কোন কথাই বলে নি। সে এবার উঠে যারা বসেছিল তাদের পাশ কাটিয়ে নেখ্ল্যুদভের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

"এবার আমার কথা শুনবেন কি ?"

"নিশ্চয়।" নেখ্ল্যুদভ উঠে তাকে অনুসরণ করল।

মাসলভা সবিস্ময়ে চোখ তুলল। নেখ্ল্যুদভের চোখে চোখ পড়তেই তার মুখ লাল হয়ে উঠল ; বিচলিতভাবে সে মাথা নাড়তে লাগল।

বাইরের দালানে গিয়ে সাইমনসন কথা বলতে শুরু করল, "আমি যা বলতে চাই তা এই।" কয়েদীদের গলার শব্দ ও চীৎকার-চেঁচামেচি এখানে আরও বেশী করে কানে আসছে। নেখ্ল্যুদভ মুখটা বাঁকাল, কিন্তু সাইমনসন তাতে মোটেই ঘাবড়াল না। গম্ভীর স্বরে সে বলতে শুরু করল, "কাত্যুশা মাসলভার সঙ্গে আপনার সম্পর্কের কথা জানি বলেই এটা আমার কর্তব্য বলে মনে করি যে—।' সে কথা থামাতে বাধ্য হল, কারণ দরজার কাছেই দুটো গলা এক সঙ্গে চীৎকার শুরু করে দিয়েছে।

একজন চেঁচিয়ে বলল, "বোকার ডিম, আমি বলছি ওগুলো আমার নয়।"

অপরজন চেঁচিয়ে বলল, "চুপ কর্ শয়তান।"

ঠিক সেই সময় মারিয়া পাভ্লভ্না দালানে বেরিয়ে এল।

সে বলল, "এখানে কথা বলবেন কেমন করে ? ভিতরে যান ; ভেরা একা আছে।" দ্বিতীয় দরজা দিয়ে সে একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকল। ঘরটা নির্জন সেল হিসাবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এখন রাজনৈতিক নারী বন্দীদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ভেরা দুখোভা আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে।

মারিয়া পাভ্লভ্না বলল, "ওর মাথা ধরেছে, তাই ঘুমিয়ে পড়েছে ; আপনাদের কথা শুনতে পাবে না। আর আমি চলে যাচ্ছি।"

সাইমনসন বলল, "আপনি বরং এখানেই থাকুন। কারও কাছ থেকে গোপন করবার মত কথা আমার নেই—আপনার কাছ থেকে তো নয়ই।"

"ঠিক আছে," বলে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না ছোট মেয়ের মত শরীরটাকে দোলাতে দোলাতে শোবার তাকের কাছে চলে গেল, এবং সেখানে স্থির হয়ে বসল। তার সুন্দর বাদামী চোখের দৃষ্টি যেন কোন্ সুদূরে উধাও হয়ে গেছে।

সাইমনসন আবার বলল, "দেখুন, এই হল আমার কথা। কাতয়ুশা মাসলভার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা জানি বলেই আমি মনে করি যে তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে আমি বাধ্য।"

নেখ্‌লুদভ সাইমনসনের বলার সরলতা ও স্পষ্টবাদিতার প্রশংসা না করে পারল না।

"আপনি কি বলতে চান?" সে প্রশ্ন করল।

"আমি বলতে চাই, কাতয়ুশা মাসলভ্‌াকে আমি বিয়ে করতে চাই।"

সাইমনসনের দিকে চোখ রেখে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বলল, "ও কথা বলবেন না!"

সাইমনসন বলেই চলল, "তাই—আমি স্থির করেছি, তাকে আমার স্ত্রী হতে অনুরোধ করব।"

"তাতে আমি কি করতে পারি? এটা তো তার উপরে নির্ভর করে।"

"তা ঠিক, কিন্তু আপনাকে ছাড়া সে কিছুই স্থির করতে পারবে না।"

"কেন?"

"কারণ তার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা না মিটলে সে মনস্থির করতে পারছে না।"

"আমার দিক থেকে তো চূড়ান্তভাবেই সব মিটে গেছে। আমি যা কর্তব্য বলে মনে করি তাই করতে চাই; তার দুর্ভাগ্যকেও হ্রাস করতে চাই; কিন্তু কোন অবস্থাতেই তার উপর কোন রকম চাপ সৃষ্টি করতে চাই না।"

"তা ঠিক, কিন্তু সে তো আপনার ত্যাগকে গ্রহণ করতে চায় না।"

"এটা কোন ত্যাগ নয়।"

"আমি জানি, তার এ সিদ্ধান্ত পাকা।"

"তাহলে তো আমার সঙ্গে কথা বলার কোন দরকারই নেই," নেখ্‌লুদভ বলল।

"আপনিও যে তার মতই ভাবছেন সেটা আপনি স্বীকার করুন, তাই সে চায়।"

"যা আমার কর্তব্য বলে মনে করি তা করব না, একথা আমি স্বীকার করি কেমন করে? আমি শুধু এই পর্যন্ত বলতে পারি যে, আমি মুক্ত নই, কিন্তু সে মুক্ত।"

সাইমনসন চুপ করে রইল। একটু চিন্তা করে বলল: "ঠিক আছে,

তাহলে এই কথাই তাকে বলব। ভাববেন না যে আমি তার প্রেমে পড়েছি। জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছে এমন একটি অসাধারণ আশ্চর্য মানুষ হিসাবে আমি তাকে ভালবাসি। তার কাছে আমি কিছুই চাই না। আমার মনের গভীর বাসনা তার দুঃখকে লাঘব করতে"—

সাইমনসনের কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনে নেখ্‌লুদভ বিস্মিত হল।

সাইমনসন বলতে লাগল, "তার দুঃখকে লাঘব করতে সাহায্য করা। সে যদি আপনার সাহায্য নিতে না চায়, তাহলে তাকে আমার সাহায্য নিতে দিন। তার সম্মতি থাকলে সে যেখানে আটক থাকবে সেখানেই যাবার অনুমতি আমি চাইব। চারটি বছর তো অনন্তকাল নয়। তার পাশে পাশে থাকব, হয়তো তার ভাগ্যের বোঝা কিছুটা হাল্কা করতে পারব—" সে আবার থেমে গেল; উত্তেজনায় তার মুখ দিয়ে আর কথা বের হল না।

নেখ্‌লুদভ বলল, "আমি কি বলব? আপনার মত একজন আশ্রয়দাতা সে পেয়েছে দেখে আমি খুশি হয়েছি—"

সাইমনসন আবার বাধা দিয়ে বলল, "আমিও তাই জানতে চেয়েছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম, তাকে ভালবেসে, তার সুখের কামনা করে আপনি একথা মনে করেন কি না যে আমাকে বিয়ে করলে তার ভাল হবে?"

নেখ্‌লুদভ দৃঢ় গলায় বলল, "হ্যাঁ, তা মনে করি।"

"সবই তার উপর নির্ভর করছে। আমি শুধু চাই, এই দুঃখী মানুষটা একটু শান্তি পাক।" এমন শিশুসুলভ মমতায় সাইমনসন কথাগুলি বলল যে তার মত একটি বিষণ্ণ-দর্শন লোকের মুখ থেকে কেউ তা আশা করতে পারে না।

সাইমনসন উঠে নেখ্‌লুদভের কাছে গেল, সলজ্জভাবে হাসল, তারপর তাকে চুম্বন করল।

"সেই কথাই তাকে বলব," বলে সে চলে গেল।

অধ্যায়—১৭

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বলল, "এ ব্যাপারে আপনার কি মত? প্রেমে পড়েছে, গভীর প্রেমে পড়েছে! তবে তার কাছ থেকে এ রকমটা আমি আশা করি নি—ভলাদিমির সাইমনসনও প্রেমে পড়বে, তাও আবার এরকম ছেলেমানুষের মত! এটা সত্যি বিস্ময়কর, আর সত্যি কথা বলতে কি, দুঃখজনকও বটে।" সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল।

নেখ্‌লুদভ জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু সে—কাত্যুশা? সে এটাকে কি চোখে দেখছে বলে আপনার মনে হয়?"

"সে?" সম্ভবত যথাসম্ভব সঠিক জবাব দেবার জন্যই মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না

একটু থামল। "সে? দেখুন, তার অতীত যাই হোক, তার নৈতিক বোধ খুব ভাল—আর তার মনটাও সুন্দর। সে আপনাকে ভালবাসে, যথার্থই ভালবাসে, আর আপনি যাতে তাকে নিয়ে জড়িয়ে না পড়েন অন্তত সেটুকু করতে পেরেও সে খুব খুশি। আপনার সঙ্গে বিয়ে তার পক্ষে ভয়ংকর অধঃপতন এমন কি তার সমস্ত অতীত অপেক্ষাও ভয়ংকর; আর সেই জন্যই সে বিয়েতে সে কোন দিন সম্মত হবে না। অথচ আপনার সান্নিধ্য আজও তাকে উদ্বেলিত করে।"

"আচ্ছা, তাহলে আমি কি করব? উধাও হয়ে যাব কি?"

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না শিশুসুলভ হাসি হেসে বলল, "হ্যাঁ, খানিকটা তাই।"

"খানিকটা উধাও হওয়া যায় কি ভাবে?"

"আমার কথার হয়তো কোন অর্থই নেই। তবে তার দিক থেকে আপনাকে বলতে পারি, সাইমনসনের এ ধরনের উচ্ছ্বসিত ভালবাসার তুচ্ছতা সে হয়তো বুঝতে পারে—সাইমনসন এখনও তাকে কিছু বলে নি,—আর এ ব্যাপারে সে যেমন গর্ববোধ করে, তেমনই ভয়ও পায়। আপনি তো বুঝতেই পারছেন, এ ব্যাপারে কোন রায় দেবার মত যোগ্যতা আমার নেই; তবু আমার বিশ্বাস, যে আবরণেই ঢাকা থাকুক সাইমনসনের দিক থেকে ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। সে বলছে, এই ভালবাসা তাকে উজ্জীবিত করে, এই ভালবাসা দেহাতীত, কিন্তু আমি জানি, যতই ব্যতিক্রম হোক না কেন এরও তলায় রয়েছে সেই একই মলিনতা……যে মলিনতা রয়েছে নভদ্‌ভরভ্‌ ও গ্রাবেৎসের মধ্যে।"

প্রিয় বিষয়ের আলোচনা শুরু হওয়ায় মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না মূল কথা থেকে সরে গেছে।

"কিন্তু আমি কি করব?" নেখ্‌লয়ুদভ জিজ্ঞাসা করল।

"আমি তো মনে করি, আপনার উচিত সব কিছু তাকে খুলে বলা। সব কিছু খোলাখুলি হওয়া সব সময়ই ভাল। তার সঙ্গে কথা বলুন। আমি তাকে ডেকে দেব। দেব কি?"

"হ্যাঁ, তাই দিন," নেখ্‌লয়ুদভ বলল।

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না চলে গেল।

ছোট ঘরটাতে নেখ্‌লয়ুদভ তখন একা। ভেরা দুখোভা ঘুমুচ্ছে। তার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে গোঙানির শব্দ। দুটো দরজা দিয়ে ভেসে আসছে অবিশ্রাম হৈ-হট্টগোল। নেখ্‌লয়ুদভের মনে একটা আশ্চর্য অনুভূতি জাগল।

স্বেচ্ছায় যে কর্তব্যকে সে ঘাড়ে নিয়েছিল, অনেক দুর্বল মুহূর্তে যে কর্তব্য তার কাছে বড়ই কঠোর ও বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে, আজ সাইমনসনের কথা সে কর্তব্য থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছে; তথাপি তার মনে এমন একটা অনুভূতি জেগেছে যেটা শুধু অপ্রীতিকরই নয়, বেদনাদায়কও বটে। সে

বুঝতে পারছে, সাইমনসনের এই প্রস্তাব তার নিজের ত্যাগের বিরল গৌরবকে ধ্বংস করে দিয়েছে, এবং তার নিজের ও অন্য সকলের কাছেই তার মূল্য অনেক হ্রাস পেয়েছে। এ রকম একটি ভালমানুষ যদি কোন রকম বাধ্য-বাধকতা না থাকা সত্ত্বেও মাসলভার সঙ্গে তার নিজের ভাগ্যকে একসূত্রে বাঁধতে চায়, তাহলে তার ত্যাগের মহত্ত্ব কোথায় থাকে! সাধারণ ঈর্ষাও হয়তো এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তাকে ভালবাসতে সে এতখানি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে অন্য কেউ তাকে ভালবাসুক এটা সে মেনে নিতে পারছে না।

তারপর যতদিন মালসভা দণ্ডভোগ করবে ততদিন তার কাছে থাকবার যে পরিকল্পনা সে করেছিল তাও তো ভেস্তে যাচ্ছে। সে যদি সাইমনসনকে বিয়ে করে তাহলে তো উপস্থিতির আর কোন দরকারই থাকবে না; তাকে নতুন ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে।

নিজের মনকে বিশ্লেষণ করবার আগেই কয়েদীদের উচ্চ কলরব (আজ তাদের মধ্যে যেন বিশেষ কিছু ঘটে চলেছে) সবেগে ঘরে ঢুকল। দরজা খুলে দেখা দিল কাত্যুশা।

দ্রুত পায়ে সে নেখ্‌ল্যুদভের কাছে এগিয়ে এল।

বলল, "মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না আমাকে পাঠিয়ে দিল।"

"হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে কথা আছে। বস। ভলাদিমির সাইমনসন আমার সঙ্গে কথা বলেছে।"

কোলের উপর হাত দুটি ভাঁজ করে সে চুপচাপ বসে ছিল। কিন্তু নেখ্‌ল্যুদভ সাইমনসনের নাম করতেই তার মুখটা লাল হয়ে উঠল।

জিজ্ঞাসা করল, "সে কি বলেছে?"

"সে আমাকে বলল, সে তোমাকে বিয়ে করতে চায়।"

সহসা তার মুখখানা যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠল। কোন কথা না বলে সে চোখ নামাল।

"সে আমার সম্মতি চাইছিল, অথবা আমার পরামর্শও বলতে পার। আমি বলেছি, সব কিছুই তোমার উপর নির্ভর করে—সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে।"

"আঃ, এ সবের অর্থ কি? কেন?" কোন রকমে কথাগুলি উচ্চারণ করে ঈষৎ টেঁরা দৃষ্টিতে সে নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকাল। পরস্পরের চোখে চোখ রেখে কয়েক সেকেণ্ড তারা চুপচাপ বসে রইল। সে দৃষ্টি বুঝি অনেক কিছুই তাদের বলে দিল।

নেখ্‌ল্যুদভ আবার বলল, "তোমাকেই সব স্থির করতে হবে।"

"কি স্থির করব? অনেক আগেই তো সবকিছু স্থির হয়ে গেছে।"

"না, ভলাদিমির সাইমনসনের প্রস্তাব তুমি গ্রহণ করবে কি না সেটা

তোমাকেই স্থির করতে হবে,” নেখ্‌লয়ুদভ বলল।

“আমি তো দণ্ডিত কয়েদী—আমি কেমন করে স্ত্রী হব? আমি ভলাদিমির সাইমনসনকেও নষ্ট করব কেন?” ভ্রূকুটির ভঙ্গীতে সে বলল।

“আচ্ছা, ধরো যদি দণ্ড মকুব করা হয়?”

“আ', আমাকে ছেড়ে দিন। আর কিছু বলার নেই”, কথা থামিয়ে দিয়ে ঘর থেকে চলে যাবার জন্য সে উঠে দাঁড়াল।

অধ্যায়—১৮

কাতয়ুশার পিছনে পিছনে পুরুষদের ঘরে ঢুকে নেখ্‌লয়ুদভ দেখল সেখানে সকলেই উত্তেজিত হয়ে আছে। নবতভ সব জায়গায় যাতায়াত করে, সকলকে চেনে-জানে, সব কিছু খবরও রাখে। এই মাত্র সে এমন একটা খবর এনেছে যাতে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। খবরটা হল—কোন একটা দেয়ালের গায়ে সে বিপ্লবী পেত্‌লিন-এর হাতে লেখা একটা মন্তব্য দেখতে পেয়েছে। তাকে সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল এবং সকলেই জানে যে অনেক দিন আগেই সে কারায় পৌঁছে গেছে; কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে মিশে খুব সম্প্রতিকালেও সে এই পথ দিয়ে চলে গেছে।

মন্তব্যে লেখা আছে, “১৭ই অগস্ট তারিখে কয়েদীদের সঙ্গে শুধু আমাকে পাঠানো হয়েছিল। নেভেরভ আমার সঙ্গে ছিল, কিন্তু কাজানের পাগলা গারদে সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। আমি ভাল আছি, মন-মেজাজ ভাল আছে, আশা করছি থাকবেও।”

সকলেই পেত্‌লিন-এর অবস্থা ও নেভেরভ-এর আত্মহত্যার কারণ নিয়ে আলোচনা করছে। শুধু ক্রাইল্‌ত্‌সভ চুপচাপ বসে নিজের মধ্যেই ডুবে গিয়েছে। তার ঝকঝকে চোখ দুটি একদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে।

রান্ত্‌সেভা বলল, “আমার স্বামী আমাকে বলেছে, নেভেরভ যখন ‘পিতার অ্যাণ্ড পল’ দুর্গে ছিল তখনই একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিল।”

নভদ্‌ভরভ্‌ বলল, “হ্যাঁ, সে ছিল কবি ও স্বপ্নদর্শী; এ ধরনের লোকরা নির্জন কারাবাস সহ্য করতে পারে না। আমি যখন নির্জন কারাবাসে ছিলাম, কখনও নিজেকে কল্পনায় উড়ে যেতে দেই নি; অত্যন্ত শৃংখলার সঙ্গে দিনগুলি কাটাতাম বলেই সব কিছু ভালভাবে সইতে পেরেছি।”

সকলের মনের বিষণ্ণতা কাটিয়ে দেবার জন্য নবতভ খুশিমনে বলে উঠল, “তা আর পারবেন না কেন? তারা আমাকে যখন ঘরে তালাবন্দী করল, তখন আমিও তো বেশ খুশিই ছিলাম। যত কিছু ভয় সব গোড়ার

দিকে : গ্রেপ্তার করবে, অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে দেবে, সব কাজ পণ্ড করে দেবে; তারপর যেই সেলে বন্দী হলাম, অমনি সব দায়িত্ব শেষ; বিশ্রাম কর আর বসে বসে সিগারেট টানো।"

ক্রাইল্ত্‌সভের বিকৃত মুখের দিকে তাকিয়ে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি তাকে ভাল করে চিনতে?"

যেন অনেকক্ষণ ধরে চেঁচিয়েছে বা গান করেছে এমনিভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে ক্রাইল্ত্‌সভ হঠাৎ বলতে লাগল, "নেভেরভ স্বপ্নদর্শী। আমাদের দরোয়ানের ভাষায় বলা যায়, নেভেরভের মত মানুষ 'পৃথিবীতে অল্পই জন্মে'। ঠিক......তার প্রকৃতি ছিল স্ফটিকের মত; তার ভিতরকার সব কিছু দেখা যায়। সে মিথ্যা বলতে পারত না; তার স্বভাবে কপটতাও ছিল না। শুধু যে তার চামড়া পাতলা ছিল তাই নয়, তার সব স্নায়ু-তন্তুও ছিল খোলা, যেন কেউ তার চামড়াটা খুলে নিয়েছে। হ্যাঁ......সে ছিল জটিল মহৎ প্রকৃতির মানুষ......অন্যদের মত নয়। কিন্তু সে কথা বলে আর কি লাভ?" সে একটু থামল, তারপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে আবার বলতে লাগল, "আগে জনগণকে শিক্ষিত করে তুলে তারপর সমাজ-জীবনের মানের পরিবর্তন করা হবে, না আগেই সমাজ-জীবনের মান পরিবর্তন করা হবে, এ নিয়ে আমরা তর্ক করে থাকি; তারপর আমরা তর্ক করি, আমাদের সংগ্রাম কোন্ পথে চলবে: শান্তিপূর্ণ প্রচার না সন্ত্রাসের পথে? আমরা তর্ক করি। কিন্তু তাঁরা তর্ক করে না, তাঁরা তাঁদের কাজ বোঝে: ডজন ডজন, শত-শত লোক মরল কিনা তারা ভাবেও না। আর কী মানুষ তাঁরা! না, তাঁরা চায়, যারা শ্রেষ্ঠ তারাই জীবন দিক। হ্যাঁ, হেরজেন বলেছেন, ডিসেম্বরবাদীদের যখন সরিয়ে নেওয়া হল, তখন সমাজের সাধারণ মান অনেক নেমে গেল। সত্যি তাই। তারপর স্বয়ং হেরজেন ও তাঁর দলবলকেও সরিয়ে দেওয়া হল; এবার নেভেরভদের পালা......"

তেমনি খুশির সুরেই নবতভ বলল, "কিন্তু তাঁদের সবাইকে সরানো যায় না। দলকে বাঁচিয়ে রাখবার মত লোকের অভাব কোন দিন হবে না।"

"না, তা হবে না, শুধু আমরা যদি তাঁদের একটু করুণার চোখে দেখি," কেউ যাতে তার কথায় বাধা দিতে না পারে সেজন্য গলা তুলে ক্রাইল্ত্‌সব কথাগুলি বলল। "আমাকে একটা সিগারেট দিন।"

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বলল, "আঃ, আনাতলি, ওটা তোমার পক্ষে ভাল নয়। সিগারেট খেয়ো না।"

সে রেগে বলল, "আঃ, রাখ তো।" একটা সিগারেট ধরিয়ে টান দিতেই সে আবার কাশতে ও হেঁচকি তুলতে লাগল, খুব অসুস্থ হয়েই পড়বে। খানিকটা গয়ের তুলে সে আবার বলতে শুরু করল: "আমরা যা করে চলেছি সেটা কোন কাজের কাজই নয়। তর্ক করা নয়, ঐক্যবদ্ধ হওয়া ...ওদের

ধ্বংস করা চাই।"

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, "কিন্তু তারাও তো মানুষ।"

"না, তারা মানুষ নয় : তারা যা করছে তা কোন মানুষ করে না।...... না।.........শুনছি নতুন ধরনের বোমা ও বেলুন আবিষ্কার হয়েছে। একজন কেউ বেলুনে চড়ে উপরে গিয়ে বোমা ছুঁড়বে আর সব মানুষ ছারপোকার মত ধ্বংস হয়ে যাবে।... হ্যাঁ। কারণ......।" সে আরও কথা বলতে চেয়েছিল কিন্তু আগের চাইতেও বেশী করে কাশতে কাশতে তার মুখ লাল হয়ে উঠল, এক ঝলক রক্ত উঠে এল মুখে।

নবতভ বরফ আনতে ছুটে গেল। মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না একটা ওষুধ এনে দিতে গেল, কিন্তু জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতেই সরু সাদা হাতটা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে সে চোখ বুজল। বরফ ও ঠাণ্ডা জলে কিছুটা শান্ত হলে তাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। সার্জেণ্ট অনেকক্ষণ ধরেই নেখ্‌ল্যুদভের জন্য অপেক্ষা করছিল। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কয়েদীরা এখন চুপচাপ। অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তারা শোবার তাকের উপরে, নীচে এবং দুটো তাকের মাঝখানে মেঝেয় শুয়ে পড়েছে, তবু সেখানে সকলের জায়গা না হওয়ায় অনেকে বাইরের দালানে বস্তা মাথায় দিয়ে ভিজে জোব্বায় শরীর ঢেকে শুয়ে আছে।

নাক ডাকার শব্দ, গোঙানি ও ঘুমের ঘোরে নানারকম শব্দ খোলা দরজা দিয়ে দালানে আসছে। সব জায়গায়ই কারাগারের জোব্বায় ঢাকা মানুষের দল স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। শুধু একক পুরুষদের ঘরে কিছু লোক প্রায়-নিঃশেষিত মোমবাতির আলোয় (সার্জেণ্টকে দেখে তারা মোমবাতিটা নিভিয়ে রেখেছিল) জেগে বসেছিল, আর একটি বুড়ো দালানের বাড়ির নীচে খালি গায়ে বসে শার্ট থেকে ছারপোকা বাছছিল। এখানকার ঘেসাঘেসি ভীড়ের দুর্গন্ধের তুলনায় রাজনৈতিক বন্দীদের ঘরের দুর্গন্ধ বাতাসকে মনে হবে সতেজ ও খোলা। ধোঁয়ায় ঢাকা বাতিটা যেন কুয়াশার ভিতর দিয়ে অস্পষ্ট আলো ফেলেছে। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। দালানের ভিতর দিয়ে চলতে হলে খুব সতর্ক হতে হবে, একটা পা ফেলে আর একটা পা ফেলবার মত ফাঁকা জায়গা খুঁজে নিতে হবে। তিনটি লোক দালানেও জায়গা না পেয়ে ছিদ্র টবের জলে পংকিল জায়গাটার পাশে ছোট্ট ঘরটাতেই শুয়ে আছে। তাদের একজন একটি বোকা-বোকা বুড়ো মানুষ; নেখ্‌ল্যুদভ অনেকবারই তাকে দলের সঙ্গে পথ চলতে দেখেছে; আর একটি ছেলের বয়স বছর দশেক; একটি কয়েদীর পায়ের উপর মাথা রেখে সে দুজনের মাঝখানে শুয়ে আছে।

ফটক পার হয়ে নেখ্‌ল্যুদভ একটা টানা নিঃশ্বাস নিল এবং অনেকক্ষণ ধরে বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে নিঃশ্বাস টানতে লাগল।

অধ্যায়—১৯

পরিষ্কার আকাশে তারাগুলি ঝলমল করছে। কিছু কিছু জায়গা ছাড়া কাদা শুকিয়ে জমে গেছে। তার ভিতর দিয়ে সরাইখানায় পৌঁছে নেখ্‌লুদভ একটা অন্ধকার জানালায় টোকা দিতে লাগল। চওড়া-কাঁধ মজুরটি খালি পায়ে এসে দরজা খুললে সে ভিতরে ঢুকল। ডাইনের দরজা দিয়ে পিছনের ঘরগুলো দেখা যায়। গাড়িওয়ালারা সেখানে ঘুমোয়। তাদের নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। উঠোন থেকে অনেকগুলো ঘোড়ার যই চিবনোর শব্দও আসছে। সামনের ঘরে মূর্তির সামনে একটা লাল আলো জ্বলছিল; সেখান থেকে সোমরাজ-কাঠ ও ঘামের গন্ধ আসছিল; একটা বেড়ার ও-পাশে একটি লোক বেশ জোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। পোশাক ছেড়ে নেখ্‌লুদভ তার ভ্রমণ-বালিশটা সোফায় রেখে কম্বলটা বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। সারাটা দিন যা শুনেছে ও দেখেছে শুয়ে শুয়ে তাই ভাবতে লাগল। একজন কয়েদীর পায়ের উপর মাথা রেখে টবের দুর্গন্ধ জলের মধ্যে ঘুমন্ত ছেলেটিকেই তার সব চাইতে ভয়ংকর মনে হল।

সন্ধ্যায় সাইমনসন ও কাতয়ুশার সঙ্গে তার যে সব কথা হয়েছিল সেটা অপ্রত্যাশিত ও গুরুতর হলেও এখন সে কথা তার মনে পড়ল না। সে ব্যাপারে তার অবস্থা এতই জটিল ও অনির্দিষ্ট যে সে চিন্তাকেই সে মন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু যে হতভাগারা সেই অস্বাস্থ্যকর বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল আর দুর্গন্ধ টবের জলের মধ্যে শুয়েছিল তাদের কথা, বিশেষ করে যে ছেলেটি একটা কয়েদীর পায়ে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিল তার নির্দোষ মুখখানিই বার বার তার মনের সামনে ভেসে উঠছিল; তাদের চিন্তাকে সে কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারছিল না।

অনেক দূরে কোন এক জায়গায় বসে কিছু মানুষ অন্য সব মানুষের মাথায় অসম্মান ও নির্যাতনের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে এ-কথা শুধুমাত্র জানা, আর তিনটি মাস ধরে অনবরত চোখের সামনে সেই অসম্মান ও নির্যাতনকে প্রত্যক্ষ করা—এ দুইয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। এই তিন মাসে অনেকবার সে নিজেকে প্রশ্ন করেছে, "আমি কি পাগল যে কেউ যা দেখতে পায় না আমি তাই দেখি, না কি যা আমি দেখি সে সব কাজ যারা করে তারাই পাগল? অথচ তারা (সংখ্যায় তারা অনেক) এই সব কাজকে এত স্থির মস্তিষ্কে ও দৃঢ় প্রত্যয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণকর কাজ মনে করে যে তাদের পাগল ভাবা খুব শক্ত; আবার নিজেকেও সে তো পাগল ভাবতে পারে না। এই চিন্তা-সংকট তাকে অনবরত বিভ্রান্ত করে রেখেছে।

কিন্তু এখন নেখ্‌লুদভ কারা-জীবনকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছে: সে জেনেছে, মাতলামি, জুয়াখেলা, নিষ্ঠুরতা, নৃশংস অপরাধ, এমন কি নরমাংস-

ভোজন প্রভৃতি যে সব পাপ কয়েদীদের মধ্যে গড়ে ওঠে সেগুলি আকস্মিক নয়, অধঃপতনপ্রসূত নয়, অপরাধপ্রবণ মানুষের অমানুষিকতার ফলও নয় (যদিও সরকারের পক্ষসমর্থনকারী বিজ্ঞানীরা এই ভাবেই তার ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে), বরং মানুষ একে অন্যকে শাস্তি দিতে পারে, এই অকল্পনীয় ভ্রান্ত বিশ্বাসেরই অনিবার্য ফল। নেখ্‌ল্যুদভ বুঝতে পেরেছে, নরমাংস-লিপ্সার জন্ম কোন জলাভূমিতে হয় না, তার জন্ম হয় মন্ত্রিসভায়, কমিটিতে এবং সরকারী দপ্তরখানায় আর তার পরে সে কাজটা সংঘটিত হয় কোন জলাভূমিতে। সে দেখেছে, ঘোষণাকারী থেকে উকিল (তার ভগ্নীপতিসহ) ও সরকারী কর্মচারি কেউই ন্যায়-বিচারের জন্য অথবা মানুষের ভালর জন্য এতটুকু মাথা ঘামায় না; বরং যে সব ক্রিয়া-কলাপের ফলে এই অধঃপতন ও দুঃখ-যন্ত্রণার সূচনা হয়ে থাকে সেই সব কাজ-কর্ম নিয়মমাফিক সম্পাদন করবার জন্য যে রুবল তাদের দেওয়া হয় সেটাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। এটা খুবই স্পষ্ট সত্য।

"তাহলে এ সবই কি একটা ভুল-বোঝাবুঝির ফল? এ রকম একটা ব্যবস্থা কি করা যায় না যে, এই সব কর্মচারিদের বেতন যথারীতি দেওয়া হবে, কিছু উপরি পাওনাও তারা পাবে, আর বিনিময়ে এখন তারা যে সব কাজ-কর্ম করছে তা থেকে বিরত থাকবে?" কথাগুলি নেখ্‌ল্যুদভ ভাবল; আর ভাবতে ভাবতে মোরগরা যখন দ্বিতীবার ডেকে উঠল তখন মাছির ঝাঁক ঝর্ণার মত তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরা সত্ত্বেও সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

অধ্যায়—২০

নেখ্‌ল্যুদভের ঘুম ভাঙবার অনেক আগেই গারোয়ানরা সরাইখানা থেকে চলে গেছে। চা-খাওয়া শেষ করে সরাইখানার মালকিন তার মোটা ঘর্মাক্ত ঘাড়টা মুছতে মুছতে এসে জানাল, বিরতি-কেন্দ্র থেকে জনৈক সৈনিক একটা চিঠি দিয়ে গেছে। চিঠিটা লিখেছে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না। সে জানিয়েছে, ক্রাইলত্‌সভের অসুখ খুব বেড়েছে। প্রথমে আমরা চেয়েছিলাম তাকে এখানেই রেখে দেব এবং আমরা তার সঙ্গে থেকে যাবার অনুমতি চেয়ে নেব; কিন্তু সে অনুমতি মেলে নি, কাজেই আমরা তাকে নিয়ে গেলাম। কিন্তু আমাদের খুব ভয় হচ্ছে, কখন কি ঘটে যায়। দয়া করে এমন একটা ব্যবস্থা করুন যাতে পরবর্তী শহরে তাকে রাখা যায় এবং আমরা একজন তার সঙ্গে থাকতে পারি। তার সঙ্গে থাকবার জন্য যদি তাকে বিয়ে করতে হয়, আমি তাতেও রাজী আছি।"

মজুর যুবকটিকে ঘোড়া ভাড়া করবার জন্য ডাক-ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গোছাতে লাগল। তার দ্বিতীয় গ্লাস চা শেষ হবার আগেই একটা তিন-ঘোড়ার ডাক-গাড়ি ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে

ফটকে এসে দাঁড়াল। জমাট কাদার উপর গাড়ির চাকাগুলো যেন পাথরের মত শব্দ করতে করতে এল। ঘাড়-মোটা মালকিনের পাওনা চুকিয়ে দিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ তাড়াতাড়ি বাইরে এসে গাড়িতে চেপে বসল; কোচয়ানকে হুকুম দিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালিয়ে কয়েদীর দলটাকে ধরতে হবে। সমবায় চারণ-ভূমির ফটক পার হয়েই তারা বস্তা ও রুগ্ন কয়েদী বোঝাই গাড়িটা ধরে ফেলল। সে গাড়িতে অফিসার ছিল না; সে আগে চলে গেছে। সৈনিকরা মদ খেতে খেতে মনের ফূর্তিতে গল্প-গুজব করতে করতে গাড়ির পাশে হেঁটে চলেছে। অনেকগুলো গাড়ি চলেছে। প্রথম দিককার প্রতিটি গাড়িতে দুজন করে অশক্ত কয়েদীকে ঠেসে বোঝাই করা হয়েছে। আর শেষের তিনটে গাড়ির প্রত্যেকটিতে রয়েছে তিনজন করে রাজনৈতিক বন্দী: একটায় আছে নভদ্‌ভরভ্‌, গ্রাবেৎস্‌, ও কন্দ্রাতেভ, আর একটাতে রান্তসেভা, নবতভ ও সেই মেয়েটি মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না যাকে তার জায়গাটা ছেড়ে দিয়েছে। তৃতীয় গাড়িতে একগাদা খড়ের উপর একটা বালিশ মাথায় দিয়ে ক্রাইল্‌ত্‌সভ শুয়ে আছে, আর তার পাশে গাড়ির এক কোণে বসে আছে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না। কোচয়ানকে থামতে বলে নেখ্‌লয়ুদভ গাড়ি থেকে নেমে ক্রাইল্‌ত্‌সভের দিকে এগিয়ে গেল। একটি মাতাল সৈনিক হাত তুলে নিষেধ করল; কিন্তু তাতে কান না দিয়ে সে গাড়িটাকে হাত দিয়ে ধরে ক্রাইল্‌ত্‌সভের পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। গায়ে ভেড়ার চামড়ার কোট, মাথায় ফারের টুপি, মুখটা রুমাল দিয়ে বাঁধা, ক্রাইল্‌ত্‌সভ্‌কে আগের চাইতেও ফ্যাকাসে ও শীর্ণ দেখাচ্ছে। সুন্দর চোখ দুটি যেন আরও বড়, আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গাড়ির ঝাঁকুনিতে এ-পাশ ও-পাশ দুলতে দুলতে সে শুয়ে শুয়েই একদৃষ্টিতে নেখ্‌লয়ুদভের দিকে তাকিয়ে রইল। সে কেমন আছে জানতে চাইলে সে শুধু চোখ দুটি বুজল, রাগের সঙ্গে মাথাটা নাড়তে লাগল; গাড়ির ঝাঁকুনি সহ্য করতেই যেন তার সব শক্তি ফুরিয়ে গেছে। মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না গাড়ির উল্টো দিকে বসেছিল। তার সঙ্গে নেখ্‌লয়ুদভের অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় হল; তাতেই ক্রাইল্‌ত্‌সভের জন্য তার সব উদ্বেগ প্রকাশ পেল। পরক্ষণেই সে খুশির সুরে কথা বলতে শুরু করল।

গাড়ির চাকার শব্দকেও ছাপিয়ে যাতে শোনা যায় সেই রকম জোরে জোরে সে বলতে লাগল, "মনে হচ্ছে অফিসার তার ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হয়েছে। বুজভ্‌কিনের হাত-কড়া খুলে দেওয়া হয়েছে; সেই এখন তার মেয়েটিকে নিয়ে চলেছে। কাত্যুশা ও সাইমনসন তার সঙ্গে রয়েছে; ভেরাও আছে। সে আমার জায়গাটা নিয়েছে।"

ক্রাইল্‌ত্‌সভ কি যেন বলল, কিন্তু গোলমালে শোনা গেল না। একটা কাশি চাপবার চেষ্টায় ভুরু কুঁচকে সে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। তার কথা শুনবার জন্য নেখ্‌লয়ুদভ তার মুখের উপর ঝুঁকল; ক্রাইল্‌ত্‌সভ মুখের রুমালটা

সরিয়ে ফিস ফিস করে বলল, "এখন অনেকটা ভাল। আর ঠাণ্ডা না লাগলেই হয়।"

নেখ্‌লয়ুদভ মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিল। আবার মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নার সঙ্গে তার দৃষ্টি-বিনিময় হল।

অনেক চেষ্টা করে একটুখানি হেসে ক্রাইল্‌ত্‌সভ অস্ফুটস্বরে বলল, "তিন গ্রহের সমস্যাটার কি হল? সমাধানটা খুব শক্ত, নয় কি?"

নেখ্‌লয়ুদভ কিছুই বুঝতে পারল না; মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বুঝিয়ে বলল, সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর অবস্থানগত বিখ্যাত গাণিতিক সমস্যাটির কথাই সে বলতে চেয়েছে; ক্রাইল্‌ত্‌সভ সেই সমস্যাটির সঙ্গে নেখ্‌লয়ুদভ, কাতয়ুশা ও সাইমনসনের পারস্পরিক সম্পর্ককে তুলনা করেছে। ক্রাইল্‌ত্‌সভ মাথা নেড়ে জানাল, মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না তার ঠাট্টাটাকে ঠিক ভাবেই বুঝিয়ে বলতে পেরেছে।

নেখ্‌লয়ুদভ বলল, "সমাধানটা তো আমার হাতে নেই।"

"আমার চিঠিটা কি পেয়েছেন? সে কাজটা কি করবেন?" মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না জিজ্ঞাসা করল।

"নিশ্চয় করব," নেখ্‌লয়ুদভ জবাব দিল; তারপর ক্রাইল্‌ত্‌সভের মুখের উপর একটা অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করে সে গাড়িতে ফিরে গেল। উঁচু-নীচু রাস্তার খাদে-খানায় পড়ে গাড়িটা এখন এমনভাবে ঝাঁকুনি দিতে লাগল যে সে দুই হাতে গাড়িটা চেপে ধরে বসে রইল। কয়েদীর দলটাকে পাশে রেখে গাড়ি এগিয়ে চলল। ধূসর জোব্বা, ভেড়ার চামড়ার কোট, শিকল ও হাত-কড়ার সেই শোভাযাত্রা রাস্তাটার প্রায় পৌনে এক মাইল পথ জুড়ে এগিয়ে চলেছে। রাস্তার উল্টো দিকে নেখ্‌লয়ুদভের চোখে পড়ল কাতয়ুশার নীল শাল, ভেরা দুখোভার কালো কোট ও সাইমনসনের ত্রোচেটের টুপি ও বুনুনি-করা সাদা মোজা। সাইমনসন মেয়েদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তুমুল তর্ক চালিয়ে যাচ্ছে।

নেখ্‌লয়ুদভকে দেখে সকলেই অভিবাদন জানাল, সাইমনসন গম্ভীরভাবে টুপিটা তুলল। কিছু বলার না থাকায় নেখ্‌লয়ুদভ গাড়ি থামাল না। দেখতে দেখতে সে দলটাকে ছাড়িয়ে গেল। রাস্তার অপেক্ষাকৃত সমতল অংশে পড়ে গাড়িটা দ্রুতবেগে ছুটতে লাগল।

একটা ঘন পাইন-বনের ভিতর দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে। মাঝে মাঝে বার্চ ও ঝাউ গাছের সারি; তাদের হলদে পাতাগুলো তখনও সরে যায় নি। অর্ধেক পথ পার হবার পরে বনী শেষ হল। রাস্তার দুদিকেই মাঠ। দূরে একটা মঠের ক্রুশ-চিহ্ন ও গম্বুজ দেখা যাচ্ছে। মেঘ সরে গেছে, আকাশ বেশ পরিষ্কার; বনের মাথার উপর দিয়ে সূর্য উঠেছে; তার আলোয় গাছের পাতা, বরফ-জমা জলাশয় ও মঠের সোনালী রং করা ক্রুশ-চিহ্ন ও গম্বুজ ঝলমল করছে। একটু ডাইনে নীলাভ ধূসর দিগন্তে সাদা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। গাড়ি একটা বড় গ্রামে ঢুকল। রুশীয় ও অন্যান্য দেশের অনেক লোক নানা রকম টুপি ও

জোব্বা পরে গ্রামের রাস্তায় চলাফেরা করছে। মাতাল ও ভালমানুষ স্ত্রী-পুরুষের দল এখানে-ওখানে জটলা করছে। দেখলেই বোঝা যায় কাছেই একটা শহর আছে।

কোচয়ান চাবুক মেরে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। দেখতে দেখতে তারা একটা নদীর তীরে উপস্থিত হল। সেখানে খেয়ায় পার হতে হবে। খেয়া নৌকোটা তখন মাঝ নদী থেকে এগিয়ে আসছে। প্রায় কুড়িটা গাড়ি পার হবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। নেখ্‌ল্যুদভকে অবশ্য বেশী সময় অপেক্ষা করতে হল না।

চওড়া-কাঁধ পেশীবহুল দীর্ঘকায় খেয়ার মাঝি নীরবে দড়িটা ছুঁড়ে দিয়ে নৌকোটা নোঙর করল। যে সব গাড়ি ও যাত্রী তীরে অপেক্ষা করছিল, তাদের খেয়ায় তুলে নিল। নৌকোটা গাড়ি-ঘোড়ায় বোঝাই হয়ে গেল। জল দেখে ঘোড়াগুলো পা ছুঁড়তে শুরু করল। নদীর তীব্র স্রোত খেয়ার গায়ে আছড়ে পড়ছে। ফলে দড়িতে আরও টান পড়ছে। খেয়া বোঝাই হয়ে গেল। নেখ্‌ল্যুদভের গাড়িটাও তোলা হল। সঙ্গে সঙ্গে মাঝি খেয়ার মুখটা হুড়কো টেনে বন্ধ করে দিল; যারা উঠতে পারে নি তাদের কোন কাকুতি-মিনতিই শুনল না; দড়ি খুলে খেয়া ছেড়ে দিল।

নৌকোয় সকলেই চুপচাপ। শুধু খেয়ার মাঝিদের পায়ের শব্দ। আর ঘোড়ার ক্ষুরের খটখট শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

অধ্যায়—২১

খেয়ার এক কোণে দাঁড়িয়ে নেখ্‌ল্যুদভ চওড়া নদীটার দিকে তাকিয়েছিল। তার মনের সামনে দুটো ছবি ভেসে উঠল। একটি, ক্রোধে মুমূর্ষু ক্রাইল্‌ত্‌সভের মাথা নাড়া; অপরটি, সাইমনসনের পাশাপাশি কাতয়ুশার দৃঢ় পদক্ষেপে পথ চলা। ক্রাইল্‌ত্‌সভের প্রস্তুতিহীন মৃত্যু-যাত্রা তার মনের উপর একটা বিষাদের ছায়া বিছিয়ে দিল। কাতয়ুশা যে সাইমনসনের মত একটি মানুষের ভালবাসা পেয়েছে এবং সত্যের লক্ষ্যে চলবার একটা প্রকৃত নির্ভরযোগ্য পথের সন্ধান পেয়েছে তাতে নেখ্‌ল্যুদভের খুশি হওয়াই উচিত, অথচ এতেও তার মনের উপর একটা ভারী চাপ পড়েছে।

শহরের দিক থেকে একটা বড় ধাতব ঘণ্টার শব্দ কেঁপে কেঁপে ভেসে এল। নেখ্‌ল্যুদভের কোচয়ান ও অন্য সকলেই টুপি খুলে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল—শুধু রেলিং-এর ধারে দাঁড়ানো একটি বেঁটেখাটো বিপর্যস্ত চেহারার বুড়ো মানুষ সে সব কিছুই করল না। লোকটিকে নেখ্‌ল্যুদভ আগে খেয়াল করে নি। সে ক্রুশ-চিহ্ন না এঁকে মাথা তুলে নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকাল। বুড়ো লোকটির পরনে তালি-মারা কোট, সুতীর ট্রাউজার ও ছেঁড়া তালি-মারা জুতো। তার

কাঁধে একটা ছোট ঝোলা, আর মাথায় একটা অতি জীর্ণ ফারের টুপি।

নিজের টুপিটা পুনরায় মাথায় বসাতে বসাতে নেখ্‌লয়ুদভের কোচয়ান তাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি প্রার্থনা করলে না কেন বুড়ো বাবা? তোমার কি দীক্ষা হয় নি?"

প্রত্যেকটি কথার উপর জোর দিয়ে ছিন্নবস্ত্র বুড়োটি সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট জবাব দিল, "কার কাছে প্রার্থনা করব?"

"কার কাছে? ঈশ্বরের কাছে,।" কোচয়ান বলল।

"তাহলে আমাকে দেখিয়ে দাও তিনি কোথায় থাকেন—তোমাদের এই ঈশ্বর?"

কোচয়ান বুঝতে পারল লোকটি সোজা চিজ নয়; তবু সকলের সামনে মুখ রক্ষার জন্য সেও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল. "কোথায় থাকেন? নিশ্চয় স্বর্গে।"

"সে স্বর্গে কখনও গিয়েছ কি?"

"আমি যাই বা না যাই, সকলেই জানে যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেই হবে।"

"কোন মানুষ কোন দিন ঈশ্বরকে দেখে নি। তাঁর একমাত্র দত্তকপুত্র যিনি পিতার কোলেই ফিরে গেছেন তিনিই তাঁর কথা ঘোষণা করেছেন," ভুরু কুঁচকে সেই একই ভঙ্গীতে বুড়ো কথাগুলি বলল।

কোচয়ান বলল, "বোঝা যাচ্ছে তুমি খৃস্টান নও, তুমি শূন্যের পূজারী। যাও, সেই শূন্যকেই পূজা করগে।"

কেউ কেউ হেসে উঠল।

একটি মাঝ-বয়সী গাড়িওয়ালা জিজ্ঞাসা করল, "তোমার ধর্ম কি বুড়ো?"

সঙ্গে সঙ্গে আগের মতই দ্বিধাহীনভাবে বুড়ো বলল, "আমার কোন ধর্ম নেই, কারণ আমি কাউকে বিশ্বাস করি না—শুধু নিজেকে ছাড়া।"

এবার নেখ্‌লয়ুদভ আলোচনায় যোগ দিল। বলল, "নিজেকে বিশ্বাস করবে কেমন করে? তোমার তো ভুলও হতে পারে।"

মাথা নেড়ে বুড়ো লোকটি দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "জীবনে কখনও আমার ভুল হয় নি।"

নেখ্‌লয়ুদভ জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে নানা রকম ধর্ম আছে কেন?"

"নিজেদের বিশ্বাস না করে মানুষ অন্যকে বিশ্বাস করে বলেই নানা রকম ধর্ম আছে। আমিও অন্যকে বিশ্বাস করেছিলাম, আর বিশ্বাস করে এমন গভীর গাড্ডায় পড়েছিলাম যে তা থেকে বেরিয়ে আসবার কোন আশাই ছিল না। প্রাচীনপন্থী ও নববিধানপন্থী, জুডাইজার ও খল্‌য়াইস্তি, আর পপভ্‌ৎসি ও বেজপপভ্‌ৎসি, আর আভ্‌স্ত্রিয়াক, মলকান ও স্কপ্‌ৎসি—প্রত্যেকটি সম্প্রদায় শুধু নিজেদেরই গুণগান করে, আর কানা কুকুরছানার মত ঘুরে বেড়ায়। ধর্ম অনেক, কিন্তু আত্মা এক—আমার মধ্যে, আপনার মধ্যে এবং তার মধ্যে।

কাজেই প্রত্যেকে যদি নিজেকে বিশ্বাস করে তাহলেই সকলে এক হবে; প্রত্যেকে স্বপ্রতিষ্ঠ হলেই সকলে এক হয়ে উঠবে।"

বুড়ো লোকটি বেশ জোরে জোরেই কথা বলছিল এবং মাঝে মাঝেই চারদিকে তাকাচ্ছিল; তার ইচ্ছা যাতে সকলেই তার কথা শুনতে পায়।

"তোমার এ বিশ্বাস কি অনেক দিনের?"

"আমার? দীর্ঘদিনের। এই তেইশ বছর তারা আমাকে নির্যাতন করেছে।"

"তোমাকে নির্যাতন করেছে! কেমন করে?"

"যেমন করে তারা খৃস্টকে নির্যাতন করেছিল, সেই ভাবে। তারা আমাকে ধরে নিয়ে আদালতের সামনে, পুরোহিত, মুন্‌সি ও ধর্মধ্বজীদের সামনে হাজির করে। একবার তারা আমাকে পাগলা গারদে ঢুকিয়ে দিল; কিন্তু আমি মুক্ত, তাই আমার কিছু করতে পারল না। তারা বলল, 'তোমার নাম কি?' ভেবেছিল, আমি একটা নাম বলব। কিন্তু আমার তো কোন নাম নেই। আমি সব কিছু ত্যাগ করেছি; আমার নাম নেই, বাড়ি নেই, দেশ নেই, কিছু নেই। আমি শুধুই আমি। 'তোমার নাম কি?' 'মানুষ।' 'তোমার বয়স কত?' আমি বলি, 'আমি বয়স গণনা করি না; আর বয়স গুণতে পারিও না, কারণ আমি সব সময়ই অতীত এবং ভবিষ্যৎ।' 'তোমার বাবা-মা কারা?' 'ঈশ্বর ও ধরিত্রীমাতা ছাড়া আমার আর কোন বাবা-মা নেই।' 'আর জার? তুমি জারকে স্বীকার কর?' তারা বলে। আমি বলি, 'কেন করব না? তিনি তার নিজের জার, আমি আমার নিজের জার।' 'এর সঙ্গে কথা বলে লাভ কি?' তারা বলে। আর আমি বলি, 'কথা বলতে তো তোমাদের বলি নি।' এই ভাবে তারা আমাকে নির্যাতন করে।"

নেখ্‌লুদভ জিজ্ঞাসা করল, "এখন তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

'ঈশ্বর যেখানে নিয়ে যাবে। কাজ পেলে কাজ করি, না পেলে ভিক্ষা করি।'

বুড়ো দেখল, খেয়া তীরে ভিড়তে চলেছে। তাই সে থেমে বিজয়ীর দৃষ্টিতে আশপাশের সকলের দিকে তাকাতে লাগল।

খেয়া ওপারে ভিড়ল। নেখ্‌লুদভ থলে বের করে বুড়ো লোকটিকে কিছু দিতে গেল। সে না নিয়ে বলল:

"ও সব জিনিস আমি নিই না: শুধু রুটি নিই।"

"আমাকে ক্ষমা কর।"

"ক্ষমার কিছু নেই, আপনি তো আমাকে কোন আঘাত দেন নি, তাছাড়া আমাকে আঘাত দেওয়া সম্ভবও নয়।" লোকটি কাঠের বোঁচকাটা আবার তুলে নিল।

ইতিমধ্যে ডাক-গাড়িটা খেয়া থেকে নামিয়ে ঘোড়াগুলি জোতা হয়ে গেছে।

কোচয়ান বলল, "স্যার, আপনি ওর সঙ্গে কথা বলছেন দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।" খেয়ার মাঝিকে বকশিস দিয়ে নেখ্‌লুয়ুদভ আবার গাড়িতে উঠে বসে বলল, "একটা নিষ্কর্মা ভবঘুরে মাত্র।"

অধ্যায়—২২

নদীর পাড়ের উপর উঠে কোচয়ান নেখ্‌লুয়ুদভের দিকে মুখ ফেরাল।

"কোন্ হোটেলে যাব?"

"কোনটা সব চাইতে ভাল হোটেল?"

"দি সাইবেরিয়ান' থেকে ভাল আর নেই, তবে 'দ্যুখভ'ও ভাল।"

"যেটাতে খুশি চল।"

কোচয়ান আবার গাড়ির পাশে বসে সবেগে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। এ শহরটাও অন্য সব শহরের মতই। সেই একই রকম বাড়ি-ঘর, একই ধরনের জানালা ও সবুজ ছাদ, একই রকম গীর্জা, বড় রাস্তায় একই রকম দোকানপাট, ভাঁড়ার ঘর, বুঝিবা পুলিশও একই রকম। তবে বাড়িগুলো অধিকাংশই কাঠের, আর রাস্তাগুলো পাকা নয়। জনবহুল রাস্তার একটা হোটেলের সামনে কোচয়ান গাড়ি থামাল, কিন্তু সেখানে জায়গা পাওয়া গেল না। তখন আর একটা হোটেলে নিয়ে গেল। দু'মাস পরে নেখ্‌লুয়ুদভ আরাম ও পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে আবার তার অভ্যস্ত পরিবেশ ফিরে পেল। যদিও ঘরটা খুবই সাধারণ, তবু দুটো মাস ডাক-গাড়ি, গ্রাম্য সরাইখানা ও বিরতি-কেন্দ্রে কাটাবার পরে নেখ্‌লুয়ুদভ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। বিরতি-কেন্দ্রগুলিতে ঘোরাফেরার সময় যে উকুনের হাত থেকে সে কিছুতেই নিজেকে পুরোপুরি বাঁচাতে পারে নি সেগুলোকে দূর করাই হল তার প্রথম কাজ। জিনিসপত্র খুলে প্রথমেই ঢুকল রুশ স্নান-ঘরে। তারপর শহরের পোশাক—মাড়-দেওয়া শার্ট, ট্রাউজার, ফ্রক-কোট ও ওভারকোট পরে সে আঞ্চলিক গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করতে চলল। হোটেলওয়ালাই একজন ইজভজচিককে ডেকে দিল; তার সুপুষ্ট কিরঘিজ-ঘোড়া ও ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করা গাড়ি অবিলম্বে নেখ্‌লুয়ুদভকে একটা প্রকাণ্ড সুদৃশ্য বাড়ির ফটকের সামনে পৌঁছে দিল। ফটকে শাস্ত্রী ও পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটার সামনে ও পিছনে বাগান; সেখানে আস্‌পেন ও বার্চ গাছের প্রসারিত পত্রহীন শাখা-প্রশাখার ফাঁকে ফাঁকে মাথা তুলেছে ঘন সবুজ পাইন ও দেবদারু গাছের সারি।

জেনারেলের শরীর ভাল না থাকায় দেখা করতে চাইল না। তথাপি নেখ্‌লুয়ুদভ পিওনকে তার কার্ডটা দিল। পিওন সুসংবাদ নিয়ে ফিরল।

"দয়া করে ভিতরে আসবেন কি?"

হল-ঘর, পিওন, আর্দালি, সিঁড়ি, ঝকঝকে মেঝেওয়ালা নাচ-ঘর—সবই

পিতার্সবার্গের মত, তবে আরও বেশী জমকালো এবং অপেক্ষাকৃত নোংরা।

নেখ্‌ল্যুদভকে পাঠ-কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল।

জেনারেল লোকটি মোটাসোটা ও আত্মপ্রত্যয়শীল। নাকটা মোটা, কপালে বড় বড় আঁব, চোখের নীচটা কালো, মাথায় টাক। একটা তাতার-রেশমের ড্রেসিং-গাউনে শরীরটা ঢেকে সে সিগারেট টানতে টানতে রূপোর পাত্রে রাখা গ্লাস থেকে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল।

ড্রেসিং-গাউনটা মোটা ঘাড়ে জড়িয়ে জেনারেল বলল, "কেমন আছেন বলুন স্যার? ড্রেসিং-গাউন জড়িয়েছি বলে ক্ষমা করবেন। এটা ছাড়া আপনার সঙ্গে দেখাই করতে পারতাম না। শরীরটা ভাল নয়, তাই বাইরে বেরুই না। আমাদের এই দূর দেশে কি জন্য এসেছেন?"

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, "একদল কয়েদীর সঙ্গে আমি যাচ্ছি। তার মধ্যে একজনের সঙ্গে আমি খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ইয়োর এক্সেলেন্সির সঙ্গে আমি দেখা করতে এসেছি কতকটা তার পক্ষ হয়ে এবং কতকটা অন্য কাজে।"

জেনারেল সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে চায়ে চুমুক দিল; তারপর সবুজ ম্যালাকাইটের ছাই-দানিতে সিগারেটটা রেখে চকচকে চোখে নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকিয়ে একমনে তার কথা শুনতে লাগল।

নেখ্‌ল্যুদভ জানাল, যে স্ত্রীলোকটির বিষয়ে সে আগ্রহী তাকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং তার পক্ষ থেকে সম্রাটের কাছে দরখাস্ত পেশ করা হয়েছে।

"বেশ, তারপর?" জেনারেল বলল।

"পিতার্সবার্গ থেকে আমাকে কথা দিয়েছিল যে, মেয়েটির ব্যাপারে যা স্থির হয় সেটা আমাকে একমাসের মধ্যে এবং এখানেই জানিয়ে দেওয়া হবে—"

সিগারেট টানতে টানতে এবং সশব্দে কাশতে কাশতে জেনারেল টেবিলের দিকে হাতটা বাড়িয়ে বেঁটে-বেঁটে আঙুল দিয়ে ঘণ্টাটা বাজাল।

"তাই আমার অনুরোধ, দরখাস্তের জবাব না আসা পর্যন্ত স্ত্রীলোকটিকে এখানে থাকবার অনুমতি দেওয়া হোক।"

পোশাকধারী আর্দালি ঘরে ঢুকল।

জেনারেল তাকে বলল, "আন্না ভাসিল্যেভ্‌না উঠেছে কি না দেখ। আর আরও খানিকটা চা নিয়ে এসো।" তারপর নেখ্‌ল্যুদভের দিকে ফিরে বলল, "হুঁ, আর কি?"

"আমার অপর অনুরোধ, ঐ দলের একটি রাজনৈতিক বন্দীকে নিয়ে।"

"তাই নাকি?" অর্থপূর্ণভাবে ঘাড় নেড়ে জেনারেল বলল।

"সে গুরুতর অসুস্থ—মরণোন্মুখ—হয়তো তাকে এখানকার হাসপাতালে রেখে যাবে। একটি রাজনৈতিক বন্দিনীও তার সঙ্গে এখানে থেকে

যেতে চায়।"

"তার কোন আত্মীয়া কি?"

"না; তবে তাকে বিয়ে করলে যদি তাকে থাকতে দেওয়া হয় তাহলে সে বিয়ে করতেও রাজী।'

চকচকে চোখ মেলে বক্তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে এবং তাকে পরাজিত করাবার উদ্দেশ্যে জেনারেল নীরবে তার কথা শুনতে শুনতে সিগারেটটা টানতে লাগল।

নেখ্লয়ুদভের কথা শেষ হতেই জেনারেল টেবিল থেকে একখানা বই তুলে নিল, এবং আঙুল ভিজিয়ে দ্রুত পাতা উল্টে বিবাহ সংক্রান্ত বিধিটা বের করে পড়ে ফেলল।

বই থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, "তাঁর কি শাস্তি হয়েছে?"

"মেয়েটির? সশ্রম দণ্ড।"

"দেখুন, তাহলে তো বিবাহের ফলে সে ধরনের দণ্ডিত কয়েদীর অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটানো যায় না—"

"তা ঠিক, কিন্তু—"

"মাফ করবেন। কোন মুক্ত নাগরিক যদি তাকে বিয়ে করে তথাপি তাকে পুরো দণ্ডই ভোগ করতে হবে। এ সব ক্ষেত্রে আসল প্রশ্ন হল, কার শাস্তি বেশী, পুরুষটির না স্ত্রীলোকটির?"

"ওদের দুজনেরই সশ্রম দণ্ডাদেশ হয়েছে।"

"খুব ভাল কথা; তাহলে তো দু'জনেই খালাস," বলেই জেনারেল হো-হো করে হেসে উঠল। "ছেলেটির যে অবস্থা মেয়েটিরও সেই অবস্থা, কিন্তু যেহেতু ছেলেটি অসুস্থ তাকে রেখে যাওয়া যেতে পারে, অবশ্য তার সুখ-সুবিধার জন্য যতটা যা করা সম্ভব সেটা করা হবে। কিন্তু মেয়েটির বেলায় সে যদি ছেলেটিকে বিয়েও করে তাহলেও সে দল ছেড়ে এখানে থাকতে পারে না—"

পিওন ঘোষণা করল, "হার এক্সেলেন্সি কফি পান করছেন।"

জেনারেল মাথা নেড়ে আগের কথায় ফিরে গেল: "যা হোক, আমি এ বিষয়ে ভেবে দেখব। তাদের নামগুলো কি? নাম দুটো এখানে লিখে দিন।"

নেখ্লয়ুদভ নাম দুটো লিখে দিল।

মুমূর্ষু যুবকটিকে দেখার অনুমতি চাইলে জেনারেল নেখ্লয়ুদভকে বলল:

"ওটাও আমি পারি না। আমি অবশ্য আপনাকে সন্দেহ করি না, কিন্তু তার ব্যাপারে এবং আরও অনেকের ব্যাপারে আপনি আগ্রহ প্রকাশ করছেন, আপনার টাকা আছে, আর এসব জায়গায় টাকার জোরে সব কিছু করা যায়। কর্তৃপক্ষ বলেন, 'ঘুষ বন্ধ কর।' কিন্তু সকলেই যেখানে ঘুষ খায় সেখানে আমি

ঘুষ বন্ধ করব কেমন করে? আর যত নীচের দিককার লোক ততই ঘুষের বাহার। তিন হাজার মাইলেরও বেশী জায়গা জুড়ে কে ঘুষ ধরতে পারে? এখানে যেমন আমি, সেখানেও তেমনি প্রত্যেকটি কর্মচারিই একটি ক্ষুদে জার।" জেনারেল হেসে উঠল। "আপনি নিশ্চয়ই রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে দেখা করেছেন, টাকা দিয়েছেন আর অনুমতি পেয়েছেন। অ্যাঁ?" সে অবার হাসল। "তাই নয় কি?"

"হ্যাঁ, তাই।"

"তাই যে আপনাকে করতে হয়েছে তা আমি ভাল করেই জানি। একটি রাজনৈতিক বন্দীর প্রতি করুণাবশত আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে চান। ইন্সপেক্টর বা কনভয় অফিসারও হাত পাতে, কারণ সে মাইনে পায় দৈনিক চল্লিশ কোপেক, তার একটি পরিবার আছে, তাই হাত না পেতে উপায় নেই। তার জায়গায় বা আপনার জায়গায় থাকলে তিনি বা আপনি যা করেছেন আমিও তাই করতাম। কিন্তু আমি যে-পদে অধিষ্ঠিত আছি সেখানে থাকতে নিজেকে আমি আইন থেকে এক ইঞ্চিও সরে যেতে দেব না। কারণ আমিও মানুষ এবং করুণার দ্বারা আমিও প্রভাবিত হতে পারি। আমি শাসন-ব্যবস্থার একজন সদস্য, কতকগুলি শর্তে আমাকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হয়েছে, আর সে সব শর্ত আমি অবশ্য মেনে চলব।...অতএব সে কথার ইতি হোক। এবার বলুন, রাজধানীর হালচাল কি?" তারপর জেনারেল নানা রকম প্রশ্ন করল, নিজেও অনেক কথা বলল, কিছু সংবাদ নেওয়া এবং নিজের গুরুত্ব জাহির করাই তার একমাত্র বাসনা।

অধ্যায়—২৩

নেখ্‌লুদভের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় জেনারেল জিজ্ঞাসা করল, "ভাল কথা, আপনি উঠেছেন কোথায়? দ্যুখভ'-এ? আরে, সে তো সাংঘাতিক জায়গা। আজ পাঁচটায় আসুন, এখানে আমাদের সঙ্গে আহারাদি করবেন। আপনি ইংরেজীতে কথা বলেন তো?'

"আজ্ঞে হাঁ।"

"খুব ভাল। দেখুন, এইমাত্র একজন ইংরেজ ভ্রমণকারীও এখানে এসে পৌঁচেছেন। তিনি নির্বাসনের সমস্যা নিয়ে গবেষণা করছেন এবং সেই প্রসঙ্গে সাইবেরিয়ার কারাগারগুলি পরীক্ষা করে দেখেন। দেখুন, আজ সন্ধ্যায় তিনিও আমাদের সঙ্গে আহার করবেন, কাজেই আপনিও আসুন, তার সঙ্গে দেখা করুন। ঠিক পাঁচটায় আমরা খাই, আর আমার স্ত্রী সময়ানুবর্তিতার পক্ষপাতী। সেই সময় সেই মেয়েটি ও অসুস্থ লোকটির ব্যাপারেও আপনাকে আমার জবাবটা জানাতে পারব। হয় তো তার জন্য কাউকে রেখে দেওয়া সম্ভব হতেও

পারে।”

জেনারেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ ডাক-ঘরে গেল। তার মন তখন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরে উঠেছে।

একটা নীচু-ছাদের ঘরে ডাক-ঘরটি অবস্থিত। কাউণ্টারের পিছনে বসে কয়েকজন কর্মচারি কাজ করছে। বেশ ভিড় জমেছে। একজন কর্মচারি মাথা হেলিয়ে বসে একহাতে চিঠিগুলি ঠেলে দিচ্ছে আর অন্য হাতে তার উপর ছাপ মারছে। নেখ্‌ল্যুদভকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। নামটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ডাকে তার জন্য যা কিছু এসেছিল সবই তার হাতে তুলে দেওয়া হল। অনেক কিছুই ছিল: কতকগুলি চিঠি, টাকা, বই এবং “পিতৃভূমির চিঠি”-র সর্বশেষ সংখ্যাটি। সব কিছু হাতে নিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ একটা কাঠের বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। একখানা বই হাতে নিয়ে একটি সৈনিকও সেখানে বসেছিল। তার পাশে বসে নেখ্‌ল্যুদভ চিঠিগুলি সাজাতে লাগল। খুব সুন্দর খামের একটা রেজিস্ট্রি চিঠি ছিল; তার উপর একটা স্পষ্ট লাল সিল মারা। সিলটা ভেঙে কিছু সরকারী কাগজপত্রসহ সেলেনিন-এর চিঠিখানা দেখেই তার মুখে যেন রক্ত উঠে এল। তার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল। কাত্যুশার দরখাস্তের জবাব এসেছে। কী সে জবাব? নিশ্চয় বাতিল নয়? অত্যন্ত অস্পষ্ট ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরের কাঁপা হাতে লেখা চিঠিটার উপর অতিদ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। জবাবটা কাত্যুশার অনুকূল।

সেলেনিন লিখেছে “প্রিয় বন্ধু, আমাদের শেষ আলোচনাটি আমার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। মাসলভার ব্যাপারে তোমার মতই ঠিক। বিষয়টা আমি যত্নসহকারে আগাগোড়া দেখেছি এবং মনে করি যে, তার প্রতি ভয়ংকর অন্যায় করা হয়েছে। যে দরখাস্ত-কমিটির কাছে তুমি দরখাস্তটা করেছিলে একমাত্র তারাই এর প্রতিকার করতে পারত। বিষয়টার পুনর্বি-বেচনার সময় আমি কিছুটা সাহায্য করেছি, এবং এই সঙ্গে দণ্ড হ্রাসের একটি অনুলিপি পাঠাচ্ছি। তোমার মাসি কাউণ্টেস কাতেরিনা আইভানভনা আমাকে যে ঠিকানা দিয়েছেন সেই ঠিকানাতেই তোমাকে কাগজপত্র পাঠালাম। বিচারের আগে সে যে-কারাগারে ছিল মূল দলিলটা সেখানে পাঠানো হয়েছে এবং সম্ভবত সেখান থেকে অতি সত্বর সাইবেরিয়ার প্রধান সরকারী কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আমি তাড়াতাড়ি শুভ সংবাদটি তোমাকে জানালাম এবং সাদরে তোমার হাতটা চেপে ধরলাম।—তোমার সেলেনিন।”

দলিলটা এই রকম: “মহামান্য সম্রাটের বরাবরে প্রেরিত দরখাস্তসমূহ গ্রহণকারী মহামান্য সম্রাটের দপ্তরে” (এর পরে রয়েছে তারিখ ও বিভিন্ন সরকারী বিধি-ব্যবস্থার মুসাবিদা)। “মহামান্য সম্রাটের বরাবর প্রেরিত দরখাস্তসমূহ গ্রহণকারী মহামান্য সম্রাটের দপ্তরের প্রধান সচিবের আদেশক্রমে ‘মেশ্‌চাংকা’ নারী কাতেরিনা মাসলভাকে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে

যে, তাহার একান্ত অনুগত দরখাস্ত প্রসঙ্গে কৃত প্রার্থনার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া মহামান্য সম্রাট এই মর্মে আদেশ প্রচার করিতেছেন যে, তাহার প্রতি প্রদত্ত কঠোর দণ্ডাদেশ মকুব করিয়া সাইবেরিয়ার অপেক্ষাকৃত স্বল্পদূরবর্তী কোন জেলায় নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হইল।"

সংবাদটি গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দের। কাতয়ুশার জন্য এবং নিজের জন্যও নেখ্‌ল্যুদভ যা কিছু আশা করেছিল তাই ঘটেছে। এ কথা সত্য যে মাসলভার এখন যা অবস্থা হল তাতে কিছু নতুন জটিলতা দেখা দিয়েছে। সে যখন কয়েদী ছিল তখন তার সঙ্গে বিয়েটা হত নেহাৎই নামকাওয়াস্তে; মাসলভার অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটা ছাড়া সে বিয়ের আর কোন অর্থই থাকত না। কিন্তু এখন তাদের দুজনের একত্রে জীবন যাপনের পথে কোন বাধাই নেই, অথচ নেখ্‌ল্যুদভ সে জন্য নিজেকে মোটেই প্রস্তুত করে নি। আর তাছাড়া, তার সঙ্গে সাইমনসনের সম্পর্কেরই বা কি হবে? গতকাল মাসলভা যে সব কথা বলেছে তার অর্থই বা কি? আবার সে যদি সাইমনসনকে বিয়ে করতে রাজী হয়, তার ফল কি হবে—ভাল না মন্দ? এ সব সমস্যার কোন সুরাহাই সে করতে পারল না; তাই তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে দিল। সে ভাবল, "পরে আপনা থেকেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। এ নিয়ে এখন কিছু না ভেবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাসলভাকে সুসংবাদটা জানিয়ে তাকে খালাস করতে হবে।" তার মানে হল, দলিলের যে অনুলিপিটি সে পেয়েছে তাই যথেষ্ট; কাজেই ডাক-ঘর থেকে বেরিয়ে সে ইজভজচিককে কারাগারের দিকে যেতে বলল।

সেদিন সকালে কারাগারে ঢুকবার অনুমতি সে গভর্ণরের কাছ থেকে পায় নি। তবু অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, ঊর্ধ্বতন অফিসারদের কাছ থেকে যা পাওয়া যায় না, অধীনস্থ কর্মচারিদের কাছে থেকে তা সহজেই পাওয়া যায়। তাই সে চেষ্টা করে কোন রকমে কারাগারে ঢুকে কাৎয়ুশাকে সুসংবাদটা জানাবে, হয়তো তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করবে. এবং সেই সঙ্গে ক্রাইল্‌ত্‌-সভের স্বাস্থ্যের খবর নেবে ও তাকে এবং মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নাকে জেনারেলের কথাগুলি জানাবে।

কারা-ইন্সপেক্টর একটি দীর্ঘদেহ ভারিক্কী চেহারার মানুষ; গোঁফ আর জুলফি দুই-ই মুখের কোণ পর্যন্ত প্রসারিত। বেশ কড়া মেজাজেই সে নেখ্‌ল্যুদভকে অভ্যর্থনা জানাল। সে স্পষ্টই জানিয়ে দিল, উপরওয়ালার কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে না এলে কোন বাইরের লোককে সে বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে দেবে না। নেখ্‌ল্যুদভ যখন বলল যে রাজধানীতে পর্যন্ত তাকে বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়েছে, তখন সে জবাব দিল:

"তা হতে পারে, কিন্তু আমি অনুমতি দেব না।" মুখে এইটুকুই বলল বটে, কিন্তু তার কথার সুর যেন বলতে চাইল, "তোমরা মহানগরের ভদ্রলোকরা

মনে করতে পার যে আমাদের ধাপ্পা দিয়ে ভুলিয়ে দেবে, কিন্তু আমরা পূর্ব সাইবেরিয়ার লোকেরাও আইন কাকে বলে তা জানি, এবং তোমাদের শিখিয়েও দিতে পারি।"

সম্রাটের নিজস্ব দপ্তরের দলিলের অনুলিপি দেখেও কারা-ইন্সপেক্টর ভুলল না। নেখ্‌লুদভকে কারা-প্রাচীরের ভিতরে ঢুকতে দিতে সে সরাসরি আপত্তি জানাল। নেখ্‌লুদভ যখন বলল, যে-অনুলিপিটি সে পেয়েছে মাসলভাকে মুক্তি দেবার পক্ষে তাই যথেষ্ট, তখন সে শুধু অবজ্ঞার হাসি হাসল; আর সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিল, কাউকে মুক্তি দেবার আগে তার ঊর্ধ্বতন অফিসারের সরাসরি আদেশ-পত্র অবশ্যই প্রয়োজন। সে শুধু এইটুকু করতে রাজী হল যে, তার দণ্ড-হ্রাসের আদেশ যে এসেছে এ-খবর সে মাসলভাকে জানিয়ে দেবে, আর তার প্রধানের কাছ থেকে মাসলভার মুক্তির আদেশ আসবার পরে সে আর একটি ঘণ্টাও তাকে আটকে রাখবে না।

ক্রাইল্‌ত্‌সভের কোন খবর জানাতেও সে রাজী হল না; এমন কি ঐ নামের কোন কয়েদী আছে কি না তাও সে বলল না। কাজেই প্রায় কোন কাজ না করেই নেখ্‌লুদভ গাড়িতে চেপে আবার হোটেলে ফিরে গেল।

অবশ্য ইন্সপেক্টরের এই কড়াকড়ির একটা কারণ ছিল। কারাগারে যত লোক ধরে তার দ্বিগুণ লোক সেখানে রাখা হয়েছে; ফলে কারাগারের ভিতরে টাইফয়েড রোগ মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছে। ইজভজচিকই নেখ্‌লুদভকে বলেছে, "কারাগারে প্রতিদিন অনেক লোক মারা যাচ্ছে। এক ধরনের পোকা তাদের আক্রমণ করেছে। একদিনেই কমসে কম বিশ জনকে কবর দেওয়া হয়েছে।"

অধ্যায়—২৪

কারাগারে ব্যর্থ হলেও মনের সেই একই উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে নেখ্‌লুদভ গভর্ণরের দপ্তরে গেল, যদি মাসলভার মূল দলিলটা সেখানে এসে থাকে। সেখানেও আসে নি। অগত্যা হোটেলে ফিরে সে সেলেনিন ও অ্যাডভোকেটকে ব্যাপারটা লিখে জানাল। চিঠি শেষ করে সে ঘড়ি দেখল; জেনারেলের ভবনে খেতে যাবার সময় হয়ে গেছে।

মনে মনে বলল, "আপাততঃ এ সব ভুলে যেতে হবে; সময় হলে দেখা যাবে।" সেখানে গিয়ে জেনারেলকে কি বলবে তাই ভাবতে লাগল।

ধনী লোক ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের মধ্যে প্রচলিত যে ধরনের বিলাসবহুল আহারাদির ব্যবস্থায় নেখ্‌লুদভ একসময় অভ্যস্ত ছিল, জেনারেলের ভবনে সেই রকম ব্যবস্থাই করা হয়েছে। শুধু বিলাস-বৈভবই নয়, অত্যন্ত সাধারণ আরাম-আয়েস থেকেও নেখ্‌লুদভ অনেক দিন নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

তাই আহার-পর্বটা তার কাছে খুবই ভাল লাগল।

গৃহকর্ত্রী পিতার্সবার্গের সেকেলে সমাজের একজন সম্মানিতা মহিলা। প্রথম নিকোলাসের রাজ-দরবারে সে ছিল সম্মানিতা সহচরী। সে খুব ভাল ফরাসী বলতে পারে, কিন্তু তার রুশ ভাষা খুবই অস্বাভাবিক। সে শরীরটাকে সব সময় সোজা রাখে এবং হাত নাড়বার সময় কনুই দুটোকে কোমরের খুব কাছাকাছি রাখে। স্বামীর প্রতিও তার মনোযোগ আছে, তবে ভিন্ন ভিন্ন অতিথির প্রতি আচরণের বিভিন্নতা থাকলেও সাধারণভাবে সে একান্তভাবে অতিথিপরায়ণা। নেখ্‌ল্যুদভকে সে আপনজনের মতই গ্রহণ করল; তার সূক্ষ্ম স্তাবকতা নেখ্‌ল্যুদভকে যেন তার নিজের গুণাবলীর কথাই নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিল; মনে মনে তাতে সে খুশিই হল। যে অভূতপূর্ব সৎ পদক্ষেপের ফলে তাকে সাইবেরিয়ায় আসতে হয়েছে, মহিলাটি সে খবরও রাখে; তাই নেখ্‌ল্যুদভকে সে একজন অসাধারণ মানুষ বলেই মনে করে। এই সূক্ষ্ম স্তাবকতা, জেনারেলের বাসভবনের বিলাসবহুল জাঁকজমক, সুস্বাদু আহার্য, নানা রকম সুধীজনের সমাবেশ—সব মিলিয়ে তার বিগত কয়েক মাসের পরিবেশকে তার কাছে যেন স্বপ্ন বলে মনে হতে লাগল; যেন সে-স্বপ্ন ভেঙ্গে এক নতুন বাস্তবতার মধ্যে সে জেগে উঠেছে।

পরিবারের লোকজন—জেনারেলের মেয়ে-জামাই ও এ-ডি-কং ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিল জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোক, স্বর্ণ-সন্ধানী এক ব্যবসায়ী এবং সাইবেরিয়ার কোন দূরবর্তী শহরের একজন গভর্ণর।

ইংরেজ ভদ্রলোক বেশ স্বাস্থ্যবান, গায়ের রং গোলাপি, বাজে ফরাসী ভাষা বলে, কিন্তু নিজের ভাষায় তার দখল ও বাগ্মিতা বেশ উঁচুদরের। অনেক কিছু সে দেখেছে। আমেরিকা, ভারতবর্ষ, জাপান ও সাইবেরিয়া প্রসঙ্গে তার বক্তব্য খুবই আকর্ষণীয়।

যুবক ব্যবসায়ীটি একজন চাষীর ছেলে। স্বর্ণ-খনির ব্যাপারে আগ্রহী। পরনে লণ্ডনে-তৈরি সান্ধ্য পোশাক ও হীরের বোতাম লাগানো শার্ট। তার একটা ভাল লাইব্রেরী আছে, মানব-কল্যাণের কাজে সে মুক্ত হস্তে দান করে, মোটামুটি ভাবে ইওরোপে প্রচলিত উদার মতবাদেরই সমর্থক। সংস্কৃতি-বিহীন অথচ সুস্থ চাষী বংশের ভিতর থেকে যে সভ্য ও ইওরোপীয় সংস্কৃতির ধারক নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠেছে তারই দৃষ্টান্তস্থল হিসাবে এই যুবকটিকে নেখ্‌ল্যুদভের বেশ ভাল লাগল।

দূরবর্তী সাইবেরীয় শহরের গভর্ণরটি সরকারী বিভাগের একজন প্রাক্তন ডিরেক্টর। পিতার্সবার্গে থাকতে নেখ্‌ল্যুদভ তার কথা অনেক শুনেছে। গৃহকর্তা এই গভর্ণরটিকে খুব মান্য করে, কারণ চারদিককার ঘুষখোরদের মধ্যে একমাত্র এই লোকটিই ঘুষ খায় না। গৃহকর্ত্রীও তাকে খুব পছন্দ করে, কারণ সে সঙ্গীতজ্ঞ এবং গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে একটি দ্বৈত নাচে যোগও দিল। তাকেও

নেখ্‌ল্যুদভের ভাল লাগল।

উৎসাহী এ-ডি কংটি নানাভাবে সকলকে সাহায্য করছিল। তার সুন্দর আচরণ নেখ্‌ল্যুদভকেও খুশি করল।

কিন্তু তাকে সব চাইতে খুশি করছে সুন্দর তরুণ দম্পতিটি—জেনারেলের কন্যা-জামাতা। মেয়েটি দেখতে যেমন মনের দিক থেকেও তেমনি সহজ, সরল। দুটি সন্তানকে নিয়েই সে সদাব্যস্ত। স্বামীকে সে প্রেম করে বিয়ে করেছিল; অবশ্য সেজন্য বাবা-মার সঙ্গে তাকে অনেক লড়াই করতে হয়েছিল। ছেলেটি উদারপন্থী, মস্কো বিদ্যালয়ের সাম্মাসিক স্নাতক, বিনয়ী, বুদ্ধিমান! সরকারী চাকুরে, সংখ্যাতত্ত্বে তার অনুরাগ, বিশেষ করে স্থানীয় আদিবাসীদের নিয়ে সে পড়াশুনা করে, তাদের ভালবাসে, তারা যাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে না যায় সেজন্য চেষ্টা করে।

এরা সকলেই নতুন মানুষ হিসাবে নেখ্‌ল্যুদভের সঙ্গে আলাপ করেও খুশি হয়েছে। জেনারেল ইউনিফর্ম পরে সাদা ক্রুশ-চিহ্ন ঝুলিয়ে আহারে বসল। নেখ্‌ল্যুদভের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করল। অতিথিদের একটা পাশের টেবিলে ডেকে নিয়ে এক গ্লাস করে ভদ্‌কা ও অন্য কিছু দিয়ে খিদেটা শাণিয়ে নিতে বলল। নেখ্‌ল্যুদভ সকাল থেকে কি কি করেছে তাও সে জানতে চাইল। নেখ্‌ল্যুদভ কাশল, সে ডাক-ঘরে গিয়ে খবর পেয়েছে সকালে যার কথা সে বলেছিল তার দণ্ডাদেশ হ্রাস করা হয়েছে; সেই সঙ্গে আবারও সে কারাগারে ঢুকবার অনুমতি চাইল।

খাবার সময় কাজের কথা তোলায় জেনারেল কিছুটা অসন্তুষ্ট হল। ভুরু কুঁচকে চুপ করে রইল।

ইংরেজ ভদ্রলোকটি এইমাত্র এসে পৌঁছল; তাকে ফরাসীতে সম্বোধন করে সে বলল, "এক গ্লাস ভদ্‌কা হোক।"

ভদ্‌কা পান করে ইংরেজটি বলল, "গীর্জা ও কারখানা দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু নির্বাসিতদের বড় কারাগারটা একবার দেখতে পেলে ভাল হত।"

জেনারেল নেখ্‌ল্যুদভকে বলল, "তাহলে তো যোগাযোগ হয়েই গেল। আপনারা একসঙ্গেই যান। ওদের একটা পাশ দিয়ে দিও।" শেষের কথাটা সে এ-ডি-কং কে বলল।

নেখ্‌ল্যুদভ জিজ্ঞাসা করল, "কখন যেতে চান?"

ইংরেজটি জবাব দিল, "সন্ধ্যার পরে কারাগার পরিদর্শন করাই আমি পছন্দ করি। তখন সকলেই ভিতরে থাকে আর আগে থেকে কোন প্রস্তুতিও নিতে পারে না; তারা যেভাবে থাকে সেই ভাবেই পাওয়া যায়।"

"ওহো, কারাগারকে উনি পূর্ণ গৌরবে দেখতে চান? তাই দেখুন। আমি অনেক লেখালেখি করেছি, কেউ কান দেয় না। এবার বিদেশের খবরের কাগজ মারফৎ সব জানুক।" কথা শেষ করে জেনারেল খাবারের

টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। গৃহকর্ত্রী তখন অতিথিদের যার যার আসনে বসিয়ে দিল।

আহারাদির পরে কফি খেতে খেতে নেখ্‌লুদভ, ইংরেজ ভদ্রলোক ও গৃহকর্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনকে নিয়ে একটা আকর্ষণীয় আলোচনায় মেতে উঠল। নেখ্‌লুদভ বুঝতে পারল, সে এমন সব বুদ্ধির কথা বলছে যা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, ভাল খাবার ও ভাল পানীয়ের পরে উদারহৃদয় রুচিবান ভদ্রলোকদের সঙ্গে আরাম-কেদারায় বসে কফির চুমুক দিতে তার যেন ক্রমেই বেশী করে ভাল লাগছে। তারপর ইংরেজ ভদ্রলোকের অনুরোধে গৃহকর্ত্রী যখন বিভাগীয় প্রাক্তন ডিরেক্টরের সঙ্গে পিয়ানোর দিকে এগিয়ে গেল এবং পরিশীলিত ভঙ্গিমায় বীথোভেন-এর "ফিফথ্‌ সিম্পনি" বাজাতে লাগল, তখন নেখ্‌লুদভ এমন একটা পরিপূর্ণ আত্মপ্রসাদের মধ্যে ডুবে গেল যেখান থেকে সে দীর্ঘদিন দূরে পড়ে ছিল; তার মনে হল, সে যেন সহসা আবিষ্কার করল সে কত ভাল মানুষ।

নেখ্‌লুদভ এমন আনন্দদানের জন্য গৃহকর্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাল। তারপর সকলের কাছ থেকে বিদায় নিতে যাবে এমন সময় জেনারেলের মেয়েটি এগিয়ে এসে বলল, "আপনি আমার সন্তানদের কথা বলছিলেন; তাদের একবার দেখবেন কি?"

তার মা হেসে বলল, "ওর ধারণা সকলেই ওর ছেলেমেয়েকে দেখতে চায়। নারে, প্রিন্স সে ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী নয়।"

"ঠিক উল্টো, আমি খুবই আগ্রহী," নেখ্‌লুদভ বলল। "দয়া করে তাদের দেখান।"

জামাতা, স্বর্ণ-খনি-ব্যবসায়ী ও এ-ডি-কং-কে নিয়ে জেনারেল তাসের টেবিলে বসেছিল। হাসতে হাসতে সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, "ও তো প্রিন্সকে নিয়ে যাচ্ছে ছেলেমেয়েদের দেখাতে। তুমিও যাও, একটু গুণ-কীর্তন করে এস।"

যুবকটি অগত্যা নেখ্‌লুদভের পিছনে পিছনে ভিতরের ঘরে ঢুকল। ঘরটা উঁচু, সাদা কাগজে মোড়া, একটা ঢাকা-দেওয়া বাতি জ্বলছে। দুটো ছোট খাট পাতা, আর মাঝখানে নার্স বসে আছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে অভিবাদন জানাল।

প্রথম খাটের উপর ঝুঁকে পড়ে মা বলল, "এই হল কাত্যা। খুব সুন্দর না? জানেন, এই দু' বছর মাত্র বয়স হল।"

"চমৎকার!"

"আর এই হল ভাস্যুক, দাদু ঐ নামেই ডাকে। দেখতে একেবারে অন্য রকম। অনেকটা সাইবেরীয়, নয় কি?"

একটা গোলগাল শিশু উপুর হয়ে ঘুমিয়ে আছে। তার দিকে তাকিয়ে নেখ্‌লুদভ বলল, "ভারী সুন্দর ছেলে।"

সগর্ব খুশির হাসি হেসে মা বলল, "তা ঠিক।"

নেখ্‌লুদভের মনে পড়ে গেল—শিকল, কামানো মাথা, ঝগড়া, ব্যভিচার, মুমূর্ষু ক্রাইল্‌ত্‌সভ, কাতয়ুশা ও তার অতীত জীবন ; সে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল ; তার মনও যেন এই চাইছে ; এই তো পবিত্র, রুচিসম্মত সুখ।

মায়ের কাছে বার বার ছেলেমেয়েদের প্রশংসা করে নেখ্‌লুদভ বসবার ঘরে ফিরে গেল। সেখানে কারাগারে যাবার জন্য ইংরেজ ভদ্রলোক তার জন্য অপেক্ষা করছিল। ছোট-বড় সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইংরেজ ভদ্রলোককে সঙ্গে করে সে বাড়ির ফটক পার হয়ে গেল।

আবহাওয়া বদলে গেছে। বরফের বড় বড় টুকরো ঘন হয়ে পড়ছে। এরই মধ্যে রাস্তা, ছাদ, বাগানের গাছপালা, ফটকের সিঁড়ি, গাড়ির মাথা ও ঘোড়ার পিঠ বরফে ঢেকে গেছে।

ইংরেজ ভদ্রলোকের নিজের গাড়ি ছিল। সে কোচয়ানকে কারাগারে যেতে বলল। নেখ্‌লুদভও তার ইজভজচিককে ডেকে তাতে উঠে বসল। নরম বরফের উপর দিয়ে ইজভজচিকের চাকা বেশ কষ্ট করে ঘুরে চলল।

অধ্যায়—২৫

দরজায় শাস্ত্রী, ফটকের নীচে আলো জ্বলছে, জানালায়-জানালায় আলোর সারি, ফটক, ছাদ ও দেয়ালের উপর বরফের সাদা আস্তরণ—এ সব কিছু সত্ত্বেও বিষণ্ণ কারা-ভবনটি যেন সকালের চাইতেও বেশী বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

ভারিক্কী ইন্সপেক্টরটি ফটকে বেরিয়ে এল, বাতির আলোয় নেখ্‌লুদভ ও ইংরেজ ভদ্রলোককে দেওয়া পাশটা পড়ল এবং বিস্ময়ে ঘাড় ঝাঁকুনি দিল ; কিন্তু পাশের নির্দেশ অনুসারে আগন্তুকদ্বয়কে ভিতরে ঢুকতে বলল। উঠোন পেরিয়ে ডান দিকের দরজা দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে তারা উপরের আপিসে ঢুকল। তাদের বসতে বলে ইন্সপেক্টর জানতে চাইল, তাদের জন্য সে কি করতে পারে। নেখ্‌লুদভ বলল, সে এখনই মাসলভার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ইন্সপেক্টর একজন রক্ষীকে পাঠাল তাকে ডেকে আনতে। তারপর সে ইংরেজ ভদ্রলোকের প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত হল। নেখ্‌লুদভ দো-ভাষীর কাজ করতে লাগল।

ইংরেজটি জিজ্ঞাসা করল, "এ কারাগারে কতজন কয়েদী রাখার মত ব্যবস্থা আছে?…আসলে এখন কতজন আছে?…কতজন পুরুষ?…কতজন স্ত্রীলোক? …শিশু?…কতজনের কঠোর দণ্ডাদেশ হয়েছে?…কতজনের নির্বাসন? …কতজন অসুস্থ?…"

কে কি বলছে সেদিকে খেয়াল না রেখেই নেখ্‌লুদভ ইংরেজ ভদ্রলোক ও ইন্সপেক্টরের কথাগুলি ভাষান্তর করে দিচ্ছিল। এক ভাবে একটা পংক্তি

ভাবান্তরের ঠিক মাঝখানে সে একটি পায়ের শব্দ শুনতে পেল। দরজাটা খুলে গেল, একজন রক্ষী ঘরে ঢুকল, তার পিছনে কাতয়ুশা, মাথায় রুমাল বাঁধা, পরনে কারা-কুর্তা। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

"আমি বাঁচতে চাই, পরিবার চাই, সন্তান চাই, মানুষের মত জীবন চাই।" কাতয়ুশা দ্রুত পায়ে চোখ নীচু করে ঢোকামাত্রই এই চিন্তা বিদ্যুৎ-চমকের মত তার মনের মধ্যে ঝল্‌সে উঠল।

সে উঠে দাঁড়িয়ে, কাতয়ুশার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল। কিন্তু কাতয়ুশার মুখ কঠিন, বিরূপ। এর আগে সে যখন নেখ্‌ল্যুদভকে তিরস্কার করেছিল ঠিক তেমনি। তার মুখ রক্তিম হয়ে ম্লান হয়ে গেল; আঙুল দিয়ে অসহায়ভাবে জ্যাকেটের কোণটা মোচড়াতে লাগল; একবার চোখ তুলে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

"তুমি তো জান দণ্ডহ্রাসের আদেশ এসেছে?"

"হ্যাঁ, রক্ষী আমাকে বলেছে।"

"কাজেই মূল দলিলটা আসামাত্রই তুমি ছাড়া পেয়ে কোথায় থাকবে সেটা স্থির করতে পারবে। তখন আমরা ভাবব—"

মাসলভা তৎক্ষণাৎ বাধা দিল।

"আমি আর কি ভাবব? ভ্‌লাদিমির সাইমনসন যেখানে যাবে আমিও সেখানেই যাব।"

প্রভূত উত্তেজনা সত্ত্বেও নেখ্‌ল্যুদভের দিকে চোখ রেখে সে কথাগুলি এত দ্রুত ও স্পষ্টভাবে বলল যেন আগে থেকে তৈরি হয়েই এসেছিল।

"সত্যি?"

"দেখুন দিমিত্রি আইভানভিচ, সে চায় আমি তার সঙ্গে বাস করি," ভয় পেয়ে সে থেমে গেল; নিজেকে সংশোধন করে বলল, "সে চায় আমি তার কাছে কাছেই থাকি। তার চাইতে বেশী আমি আর কি চাইতে পারি? একেই আমি সুখ বলে মনে করব। আমার আর কি আছে?......"

"দুটোর যে কোন একটা," নেখ্‌ল্যুদভ ভাবল। "হয় সে সাইমনসনকে ভালবাসে এবং আমি তার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করছি বলে ভাবছি তার কোন প্রয়োজনই তার নেই, অথবা সে এখনও আমাকেই ভালবাসে, এবং আমার জন্যই আমাকে ত্যাগ করে সাইমনসনের সঙ্গে তার ভাগ্যকে জড়িয়ে নিজের জাহাজেই আগুন জালিয়ে দিচ্ছে।" লজ্জায় সে অবনত হল; সে বুঝল তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

জিজ্ঞাসা করল, "আর তুমি নিজে, তুমি কি তাকে ভালবাস?"

"ভালবাসি কি বাসি না, তাতে কি যায় আসে? সে সবই তো অতীতের ব্যাপার। তাছাড়া ভ্‌লাদিমির সাইমনসন একটি অসাধারণ মানুষ।"

"সে তো নিশ্চয়ই," নেখ্‌লুদভ বলল, "সে তো চমৎকার লোক ; আমি মনে করি—"

মাসলভা আবার বাধা দিয়ে বলে উঠল, "না, দিমিত্রি আইভানভিচ, আপনার ইচ্ছামত কাজ করতে পারছি না বলে আমাকে ক্ষমা করবেন।" অতলস্পর্শ ঈষৎ টেঁরা চোখে সে নেখ্‌লুদভের দিকে তাকাল। "হ্যাঁ, এই রকম হওয়াই উচিত। আপনাকেও তো বাঁচতে হবে।"

কয়েক মুহূর্ত আগে নেখ্‌লুদভ নিজে যা ভাবছিল ঠিক সেই কথাই মাসলভা তাকে বলছে। কিন্তু এখন আর সে সে-চিন্তা করছে না, তার চিন্তা-ভাবনাও বদলে গেছে। সে যে শুধু লজ্জিত বোধ করছে তাই নয়, মাসলভাকে হারিয়ে সে যে সব কিছুই হারাচ্ছে তাতেই তার দুঃখ।

সে বলল, "এটা আমি আশা করি নি।"

"এখানে থেকে আপনি কেন কষ্ট পাবেন? যথেষ্ট কষ্ট তো ভোগ করেছেন," বিচিত্র হাসি হেসে সে বলল।

"কোন কষ্টই আমার হয় নি। ওতে আমার ভালই হয়েছে ; যদি পারতাম চিরদিনই এইভাবে তোমার সেবা করে যেতাম।"

"আমরা"—আমরা কথাটা বলেই সে নেখ্‌লুদভের দিকে তাকাল— "আমরা কিছুই চাই না। এমনিতেই আমার জন্য আপনি অনেক করেছেন। আপনি না থাকলে…" সে আরও কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু তার গলা কাঁপতে লাগল।

নেখ্‌লুদভ বলল, "তোমার অন্তত আমাকে ধন্যবাদ দেবার কোন কারণ নেই।"

"হিসাব-নিকাশ করে আর কি হবে? ঈশ্বর আমাদের হিসাব মিলিয়ে দেবেন," মাসলভা বলল, তার কালো চোখ দুটি অশ্রুজলে চিকচিক করতে লাগল।

নেখ্‌লুদভ বলল, "তুমি কত ভাল।"

"আমি, ভাল?" চোখের জলে সে কথা বলল ; একটা বিষণ্ণ হাসিতে তার মুখখানি উদ্ভাসিত হল।

ইংরেজ ভদ্রলোক বলল, "আপনি তৈরি?"

"এখনই," বলে নেখ্‌লুদভ ক্রাইল্‌ত্‌সভের কথা জিজ্ঞাসা করল।

মনের আবেগ দমন করে মাসলভা শান্তভাবে সব কথা বলল। ক্রাইল্‌ত্‌সভ্‌ খুব দুর্বল ; তাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে পাঠানো হয়েছে ; মারিয়া পাভ্‌লভ্না তার জন্য খুবই চিন্তিত ; সে নার্স হয়ে দাতব্য চিকিৎসালয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু অনুমতি পায় নি।

ইংরেজ ভদ্রলোক অপেক্ষা করছে দেখে মাসলভা বলল, "আমি কি এবার চলে যাব?"

হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে নেখ্লয়ুদভ বলল, "আমি কোন দিন বলব না বিদায়; আবার তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

"আমাকে ক্ষমা করবেন," এত নীচু গলায় মাসলভা কথা বলল যে সে শুনতেই পেল না। দুজনের চোখে চোখ মিলল; তার টেঁরা চোখের বিচিত্র দৃষ্টি ও মুখের বিষণ্ণ হাসি দেখে নেখ্লয়ুদভ বুঝতে পারল, যে দুটি কারণে এই সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে তার দ্বিতীয়টিই সত্য। মাসলভা তাকে ভালবাসে, আর তাই সে ভেবেছে, তার সঙ্গে নিজেকে জড়ালে নেখ্লয়ুদভের জীবনকেও সে নষ্ট করে ফেলবে। সে মনে করছে, সাইমনসনের সঙ্গে চলে গেলে সে নেখ্ল্য়ুদভকে মুক্তি দিতে পারবে এবং যদিও সে কাজ করতে পারছে বলে সে খুশিই হয়েছে, তবু তার কাছ থেকে চলে যেতে তার কষ্ট হচ্ছে।

মাসলভা তার হাতখানা চেপে ধরল, তারপর দ্রুত মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

নেখ্লয়ুদভ যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দেখল, ইংরেজ ভদ্রলোক তখনও কি যেন লিখছে; তাই তাকে বিরক্ত না করে দেয়ালের পাশে একটা কাঠের বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। সহস্র রাজ্যের ক্লান্তি যেন তাকে ছেয়ে ফেলল। নিদ্রাহীন রাত, বা পথের শ্রম, বা উত্তেজনার জন্য এ ক্লান্তি নয়; বেঁচে থাকাটাই তার কাছে ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে। কাঠের বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে সে চোখ বুজল, আর মুহূর্তের মধ্যে গভীর গাঢ় ঘুমে ঢলে পড়ল।

ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করল, "এবার কি সেলগুলি দেখবেন?"

নেখ্লয়ুদভ চোখ মেলে তাকাল। নিজেকে সেই অবস্থায় দেখে বিস্মিত হল। ইংরেজ ভদ্রলোক লেখার কাজ শেষ করে সেলগুলি দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

শ্রান্ত, নিরুদ্যম নেখ্লয়ুদভ তাকে অনুসরণ করল।

অধ্যায়—২৬

ছোট ঘরটা পেরিয়ে তারা একটা দুর্গন্ধময় করিডরে পড়ল। কী আশ্চর্য, দুটো কয়েদী সেখানে দাঁড়িয়ে মেঝের উপর প্রস্রাব করছে। ইংরেজ ভদ্রলোক নেখ্লয়ুদভ ও ইন্সপেক্টর রক্ষীদের নিয়ে প্রথম ওয়ার্ডে ঢুকল। সেখানে থাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত বন্দীরা। সেখানে প্রায় সত্তরজন কয়েদী ইতিমধ্যেই শুয়ে পড়েছে। তারা পর পর সারি বেঁধে শুয়ে আছে। আগন্তুকরা ঘরে ঢুকতেই তারা শিকল ঝনঝনিয়ে লাফ দিয়ে উঠে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল; শুধু দুজন উঠল না: তাদের একটি যুবক, তার খুব জ্বর হয়েছে, আর একটি বৃদ্ধ, সে শুধু গোঙাচ্ছে।

ইংরেজটি জানতে চাইল, যুবকটি কতদিন অসুস্থ হয়েছে। ইন্সপেক্টর জবাব দিল, সেদিন সকালেই সে অসুস্থ হয়েছে, তবে বুড়ো লোকটা অনেক দিন

থেকেই পেটের যন্ত্রণায় ভুগছে; কিন্তু দাতব্য হাসপাতালে জায়গা না থাকায় তাকে সেখানে পাঠানো যাচ্ছে না। ইংরেজটি আপত্তিসূচক ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, সে ওদের সঙ্গে কিছু কথা বলতে চায়, আর নেখ্‌লুদভ যেন তার কথাগুলি ভাষান্তর করে বুঝিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সাই-বেরিয়ার নির্বাসন-কেন্দ্র ও কারাগারগুলি পরিদর্শন করা ছাড়া ইংরেজ ভদ্র-লোকের আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল, ধর্মের পথে ত্রাণ ও উদ্ধারের প্রচার।

সে বলল, "ওদের বলুন, খৃস্ট ওদের করুণা করেন, ওদের ভালবাসেন, ওদের জন্যই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। এ কথা বিশ্বাস করলেই ওরা রক্ষা পাবে।" সে যখন কথা বলছিল, সব বন্দী তখন দুই হাত পাশে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। "ওদের বলুন, এই পুঁথিতে সে সব লেখা আছে। ওদের মধ্যে কেউ কি পড়তে জানে?"

কুড়িজনেরও বেশী পড়তে জানে।

ইংরেজটি তার ছোট থলে থেকে কয়েক খণ্ড বাঁধানো "টেস্টামেণ্ট"বের করল, আর কঠিন কালো নখওয়ালা অনেকগুলি শক্তিমান হাত মোটা কাপড়ের শার্টের আস্তিনের ভিতর থেকে বেরিয়ে কাড়াকাড়ি করে তার দিকে প্রসারিত হল। এই ওয়ার্ডে সে দুখানা 'টেস্টামেণ্ট' বিলিয়ে দিল।

দুই নম্বর ওয়ার্ডেও তাই ঘটল। সেই একই দুর্গন্ধ বাতাস, জানালার মাঝে মাঝে মূর্তি ঝুলছে, দরজার বাঁদিকে সেই একই জলের টব; গায়ে গা লাগিয়ে সকলেই শুয়ে আছে; এবং সেই একই ভাবে লাফিয়ে উঠে দুই হাত ঝুলিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে পড়ল—তিনজন ছাড়া অন্য সবাই; তাদের মধ্যে দুজন উঠে বসল, আর অপর জন শুয়েই রইল, চোখ মেলে আগন্তুকদের একবার দেখলও না। তারা তিনজনই অসুস্থ। ইংরেজটি সেই একই বক্তৃতা করল এবং আবারও দুখানা "টেস্টামেণ্ট" বিলিয়ে দিল।

তিন নম্বর ঘর থেকে গোলমাল ও চীৎকার ভেসে এল। ইন্সপেক্টর দরজায় টোকা মেরে চেঁচিয়ে উঠল, "চুপ!" দরজা খুললে আগন্তুকরা দেখল, কয়েকজন ছাড়া অন্য সকলেই বিছানার পাশে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; যারা দাঁড়ায় নি তাদের মধ্যে কয়েকজন অসুস্থ আর দুজন মারামারি করছে; তীব্র ক্রোধে তাদের মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে; পরস্পরকে তারা জড়িয়ে ধরেছে—একজন ধরেছে চুল, আর একজন ধরেছে দাঁড়ি। ইন্সপেক্টর ছুটে যেতে তবে তারা পরস্পরকে ছেড়ে দিল। একজনের নাকে ঘুসি লাগায় নাক দিয়ে রক্ত ও সিকনি গড়িয়ে পড়ছে: কাফতানের আস্তিন দিয়ে সে সেগুলি মুছতে লাগল। অপর জনের যে দাঁড়িগুলো উপড়ে ফেলা হয়েছে সেইগুলিই সে কুড়িয়ে নিচ্ছিল।

ইন্সপেক্টর কড়া গলায় হাঁক দিল, "মনিটর!"

একটি বলিষ্ঠ সুন্দর লোক এগিয়ে এল।

চোখ মিটমিট করতে করতে সে বলল, "ওদের আমি ছাড়াতে পারি নি হুজুর।"

"মজা দেখাচ্ছি।" ভুরু কুঁচকে ইন্সপেক্টর বলল।

ইংরেজ ভদ্রলোক ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল, "ওরা কিসের জন্য লড়াই করছিল?"

নেখ্‌লুদভ মনিটরকে জিজ্ঞাসা করল।

মনিটর তখনও হাসছিল। বলল, "একজন অপর জনের কম্বল চুরি করেছিল। একজন ঘুসি বাগিয়ে গেছে, আর অন্যজন ঘুসি বসিয়ে দিয়েছে।"

ইংরেজটি ইন্সপেক্টরকে বলল, "আমি ওদের কিছু বলতে চাই।"

নেখ্‌লুদভ ভাষান্তর করে বলল।

ইন্সপেক্টর বলল, "বলতে পারেন।" ইংরেজটি একখানি চামড়া-বাঁধানো "টেস্টামেণ্ট" বের করে নেখ্‌লুদভকে বলল, "দয়া করে আমার এই কথাগুলি ভাষান্তর করে বলে দিন: 'তোমরা ঝগড়া করতে করতে ঘুসোঘুসি করেছ, কিন্তু যে খৃস্ট আমাদের জন্য জীবন দিয়েছেন তিনি আমাদের ঝগড়া মেটাবার অন্য পথ দেখিয়েছেন। খৃস্টের উপদেশ অনুসারে কেউ আমাদের প্রতি অন্যায় করলে তার সঙ্গে আমরা কি রকম ব্যবহার করব সেটা ওরা জানে কিনা জিজ্ঞাসা করুন।

নেখ্‌লুদভ সবটাই ভাষান্তর করে বলল।

ইন্সপেক্টরের ভারিক্কী চেহারার দিকে একনজর তাকিয়ে অন্যতম যুধ্যমান বলল, "প্রধানের কাছে নালিশ কর; সেই সব মিটিয়ে দেবে, এই কথা তো?"

অপরজন বলল, "চোয়ালে লাগাও একখানা কসে, তাহলে আর দ্বিতীয়বার সে তোমার ছায়াও মাড়াবে না।"

ঘরের সকলেই মুখ টিপে হেসে তার কথা সমর্থন করল।

নেখ্‌লুদভ দুজনের জবাবই ভাষান্তর করে দিল।

"ওদের বলে দিন, খৃস্টের উপদেশ অনুসারে তাদের ঠিক বিপরীত ব্যবহার করতে হবে; কেউ তোমার এক গালে চড় মারলে অপর গালটি তার দিকে এগিয়ে দাও," নিজের গাল এগিয়ে দিয়ে ইংরেজ ভদ্রলোক বলল।

নেখ্‌লুদভ ভাষান্তর করে দিল।

কে যেন বলে উঠল, "নিজেই একবার পরীক্ষা করে দেখুন না।"

অসুস্থ বন্দীদের একজন জিজ্ঞাসা করল, "সে যদি গালে চড় না মারে, তাহলে কি এগিয়ে দেবেন?"

"সে তাহলে তোমাকে আগা-পাস্তলা ধোলাই দেবে।"

একজন হো-হো করে হেসে বলল, "উনি সেটাই একবার পরীক্ষা করুন!" সারা ঘর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। এমন কি নাক দিয়ে রক্ত ও সিক্‌নি ঝরাতে ঝরাতে আহত লোকটিও হেসে উঠল। অসুস্থ বন্দীরাও সে হাসিতে যোগ দিল।

কিন্তু ইংরেজটি তাতে বিচলিত হল না। সে নেখ্‌ল্যুদভকে ওদের জানিয়ে দিতে বলল যে, প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসীর কাছে অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়, আনন্দদায়ক হয়।

সে বলল, "ওদের জিজ্ঞাসা করুন, ওরা মদ খায় কিনা।"

"খায় না বুঝি!" একজন বলে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে নাক ঝাড়ার শব্দ ও আর এক প্রস্থ অট্টহাসি।

ঐ ঘরে চারজন অসুস্থ বন্দী ছিল। ইংরেজটি যখন জানতে চাইল তাদের আলাদা করে এক ঘরে রাখা হয় নি কেন, তখন ইন্সপেক্টর জানাল, ওরা নিজেরাই সেটা চায় না, ওদের রোগও সংক্রামক নয়, আর তাছাড়া ডাক্তারের সহকারী ওদের দেখাশুনা করে, দরকার মত সব কিছুই করে।

"অথচ উনি এখানে এসেছেন পনেরোটা দিনও হয় নি," কে যেন চাপা গলায় বলল।

ইন্সপেক্টর কোন জবাব দিল না, সকলকে নিয়ে পাশের ওয়ার্ডে ঢুকল। আবার দরজা খোলা হল, সকলে উঠে নীরবে দাঁড়াল, আর ইংরেজটিও আবার "টেস্টামেণ্ট' বিলি করল। পাঁচ নম্বর ও ছয় নম্বর ওয়ার্ডে, ডাইনে ও বাঁয়ের সব ওয়ার্ডেই ওই একই ঘটনা ঘটল।

সেখান থেকে তারা গেল নির্বাসিতদের ওয়ার্ডে; আবার সেখান থেকে কম্যুন কর্তৃক নির্বাসিত এবং যারা স্বেচ্ছায় এসেছে তাদের ওয়ার্ডে। সর্বত্রই শীতার্ত, ক্ষুধার্ত, কর্মহীন, রোগাতুর, লাঞ্ছিত ও অবরুদ্ধ মানুষগুলিকে বন্য-পশুর মত প্রদর্শন করা হল।

যতগুলি "টেস্টামেণ্ট" বিলি করবার কথা ছিল সেটা হয়ে গেলে ইংরেজটি আর বক্তৃতাও দিল না, পুঁথিও বিলোল না। ঐ সব বিষণ্ণ দৃশ্য ও দম আটকানো আবহাওয়ায় তার উৎসাহও ঝিমিয়ে পড়ল; সেল থেকে সেলে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি ওয়ার্ডের বন্দীদের সম্পর্কে ইন্সপেক্টরের প্রতিবেদন প্রসঙ্গে সে শুধু একটিমাত্র কথাই বলল—"ঠিক আছে।"

নেখ্‌ল্যুদভও শ্রান্তি ও হতাশার সেই একই অনুভূতির চাপে না পারল তাদের সঙ্গে চলতে অস্বীকার করতে, আর না পারল সেখান থেকে চলে যেতে—কেমন যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে তাদের অনুসরণ করতে লাগল।

অধ্যায়—২৭

নির্বাসিতদের একটি ওয়ার্ডে নেখ্‌ল্যুদভ সেই আশ্চর্য বুড়ো মানুষটিকে দেখে বিস্মিত হল যাকে সেদিন সকালে খেয়া পার হবার সময়ে সে দেখেছিল। এই বিপর্যস্ত বলিরেখাংকিত বুড়ো মানুষটি কয়েদীদের বিছানার পাশে মেঝেয় বসে ছিল। খালি পা, পরনে ছাই-রঙের একটা নোংরা শার্ট, কাঁধের কাছে

ছেঁড়া, আর সেই রকম একটা ট্রাউজার। চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে নবাগতদের দিকে তাকিয়েছিল। নোংরা ছেঁড়া শার্টের ভিতর দিয়ে তার অস্থির দেহটা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল লোকটা অত্যন্ত দুর্বল; কিন্তু তার চোখে-মুখে সেদিনকার চাইতেও বেশী উৎসাহ-উদ্দীপনার আভাষ। অন্য ওয়ার্ডের মত এখানেও কর্মচারিরা ঢোকামাত্রই বন্দীরা লাফিয়ে উঠে খাড়া দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সে বুড়ো বসেই রইল। দারুণ ক্রোধে তার চোখ দুটি চকচক করছে, ভুরু কুঁচকে উঠেছে।

ইন্সপেক্টর তাকে বলল, "উঠে দাঁড়াও।"

বুড়ো উঠল না, শুধু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল।

"চাকররা তোমার সামনে দাঁড়িয়েছে। আমি তোমার চাকর নই। তোমার কপালে সেই চিহ্ন দেখছি····· " ইন্সপেক্টরের কপাল দেখিয়ে বুড়ো বলল।

"কী-ই-ই ?" ইন্সপেক্টর ভয়ংকর ভাবে চেঁচিয়ে এক পা এগিয়ে গেল।

নেখ্‌লয়ুদভ তাড়াতাড়ি বলল, "লোকটিকে আমি চিনি। ওকে বন্দী করা হয়েছে কেন ?"

বুড়োর দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ইন্সপেক্টর বলল, "পাশপোর্ট না থাকায় পুলিশ ওকে এখানে পাঠিয়েছে। অনেকবার বলেছি এ রকম পাঠিও না, তবু ওরা পাঠায়।"

বুড়ো নেখ্‌লয়ুদভকে বলল, "তাহলে আপনিও খৃস্টবিরোধী বাহিনীর একজন ?"

"না, আমি দর্শনার্থী," নেখ্‌লয়ুদভ বলল।

"সে কি ? খৃস্টবিরোধী কি ভাবে মানুষকে নির্যাতন করে তাই দেখতে এসেছেন ? তাহলে দেখুন। তাদের সে খাঁচায় বন্দী করেছে—একটা গোটা বাহিনীকে। কথা ছিল, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মানুষ রুটির জোগাড় করবে। কিন্তু সে তাদের বন্দী করে নিষ্কর্মা করে রেখেছে, তাদের শুয়োরের মত খেতে দিচ্ছে, যাতে দিনে দিনে তারা পশুতে পরিণত হয়।"

"ওকি বলছে ?" ইংরেজটি জানতে চাইল।

নেখ্‌লয়ুদভ জানাল, লোকগুলোকে বন্দী করে রাখার জন্য ও ইন্সপেক্টরকে দোষ দিচ্ছে।

ইংরেজটি বলল, "ওকে জিজ্ঞাসা করুন তো, আইন ভঙ্গকারীদের প্রতি কেমন ব্যবহার করা উচিত।"

নেখ্‌লয়ুদভ প্রশ্নটি ভাষান্তর করে দিল।

দুই পাটি দন্ত বিকশিত করে লোকটি অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল।

ঘৃণার সঙ্গে বলল, "আইন ? আগে সে সকলের সব কিছু লুঠ করেছে, সব জমি দখল করেছে, মানুষের সব অধিকার হরণ করেছে—সব নিজের কুক্ষিগত

করেছে—যারা বিরুদ্ধাচরণ করেছে তাদের সবাইকে হত্যা করেছে, আর সব কিছু করে তারপরে আইন বানিয়েছে লুণ্ঠন ও হত্যা নিষিদ্ধ করে। এই সব আইন আরও আগে করা উচিত ছিল।"

নেখ্লয়ুদভ ভাষান্তর করে দিল। ইংরেজ হাসল।

"আচ্ছা, এবার ওকে জিজ্ঞাসা করুন, এখন চোর ও খুনীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ?"

নেখ্লয়ুদভ প্রশ্নটাকে আবার ভাষান্তর করে দিল।

তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটির সঙ্গে বুড়ো বলল, "ওকে বলুন, খৃস্টবিরোধী তকমাটা নিজের গা থেকে খুলে ফেলতে হবে। তাহলেই সে দেখতে পাবে, চোরও নেই, খুনীও নেই। কথাগুলি ওকে বলে দিন।"

নেখ্লয়ুদভ বুড়োর কথাগুলি ভাষান্তর করে দিলে ইংরেজটি বলল, "লোকটা পাগল"; একটা ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে সে সেল থেকে বেরিয়ে গেল।

বুড়ো বলতে লাগল, "নিজের চরকায় তেল দাও বাবা, অন্যকে ছেড়ে দাও। যার যার কাজ তার তার। কাকে শাস্তি দিতে হবে, আর কাকে ক্ষমা করতে হবে, তা ঈশ্বরই জানেন, আমরা জানি না। নিজেই নিজের উপরওয়ালা হও, তাহলে আর উপরওয়ালার দরকার হবে না। যাও, চলে যাও," রাগে ভুরু কুঁচকে সে বলল। নেখ্লয়ুদভ তখনও সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। চকচকে চোখে তার দিকে ফিরে বলল, "খৃস্টবিরোধীর চেলারা কেমন করে উকুনের মত মানুষকে কুরে কুরে খায় তা আর কত দেখবেন ? চলে যান। চলে যান!"

নেখ্লয়ুদভ ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেল। একটা খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ইংরেজটি ইন্সপেক্টরকে জিজ্ঞাসা করল, "এটা কাদের সেল।" সেই সময় নেখ্লয়ুদভও সেখানে হাজির হল।

"এটা লাশ-ঘর।"

"ও", বলে ইংরেজটি ভিতরে যেতে চাইল।

লাশ-ঘর একটা সাধারণ সেল, বেশী বড় নয়। একটা ছোট বাতি দেয়ালে ঝুলছে। তার স্বল্প আলোয় দেখা যাচ্ছে এক কোণে কিছু বস্তা ও কাঠ জড়ো করা রয়েছে এবং ডান দিকে শোবার তাকের উপর চারটে মৃতদেহ পড়ে আছে। প্রথম লাশটা মোটা সুতীর শার্ট ও পাজামা পরা; লোকটা উঁচু-লম্বা, সামান্য দাঁড়ি আছে, মাথাটা অর্ধেক কামানো। দেহটা এরই মধ্যে বেশ শক্ত হয়ে গেছে; নীলাভ হাত দুখানি বুকের উপর থেকে এলিয়ে পড়েছে। পা দুটিও ছড়ানো, খালি পায়ের পাতা বেরিয়ে পড়েছে। তার পাশেই খালি-পা, খালি-মাথা একটি বুড়ি, পরনে সাদা পেটিকোট ও কুর্তা, মাথার অল্প চুল খোলা, যন্ত্রণাপীড়িত ছোট হলদে মুখ ও খাড়া নাক। তারপর বেগুনি রঙের পোশাক-পরা আর একটি লোক। ঐ রং দেখে নেখ্লয়ুদভের কি যেন মনে

পড়ে গেল।

আরও এগিয়ে সে লাশটা দেখতে লাগল।

ছোট ছুঁচলো দাঁড়ি উপরদিকে তোলা, সুগঠিত নাক, উঁচু সাদা কপাল, অল্প কোঁকড়া চুল,—এ সবই তার পরিচিত, কিন্তু নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। গতকালও এই মুখ সে দেখেছে— ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত, যন্ত্রণাদীর্ণ ; এখন সে মুখ শান্ত, নিশ্চল, ভীষণ সুন্দর।

হ্যাঁ, এই ক্রাইল্‌ত্‌সভ, অথবা তার দৈহিক সত্তার শেষ চিহ্ন তো বটেই।

"কেন সে এত কষ্ট পেল ? কেন সে বেঁচেছিল ? সে কি এবার তা বুঝতে পেরেছে ?" নেখ্‌ল্যুদভ মনে মনে ভাবল, কিন্তু কোন উত্তর পেল না ; মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই কোথাও নেই ; তার মনে হল সে বুঝি মূর্চ্ছা যাবে।

ইংরেজ ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই সে ইন্সপেক্টরকে বলল তাকে উঠোনে পৌঁছে দিতে। এখন সে একটু একা থাকতে চায়। সারাটা সন্ধ্যা যা কিছু ঘটেছে সব কিছু আর একবার ভেবে দেখবার জন্য গাড়িতে চেপে সে হোটেলে ফিরে গেল।

অধ্যায়—২৮

নেখ্‌ল্যুদভ শুতে গেল না। অনেকক্ষণ ধরে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। কাত্যুশার সঙ্গে তার সব সম্পর্কের অবসান হয়েছে। কাত্যুশা তাকে চায় না, সেটা তার কাছে একাধারে দুঃখ ও লজ্জা। কিন্তু সে জন্য সে বিচলিত নয়। তার আর একটি কাজ এখনও অসমাপ্ত আছে ; সেটা তাকে বিচলিত করেছে, তাকে কাজের মধ্যে টানতে চাইছে।

ইদানীংকালে এই যে এত পাপ সে চোখে দেখেছে, কানে শুনেছে, বিশেষ করে সেই ভয়াবহ কারাগারে আজ সে যা দেখেছে ও শুনেছে—যে পাপ তার বড় আদরের ক্রাইল্‌ত্‌সভকে হত্যা করেছে—শেষ পর্যন্ত তারাই তো জয়লাভ করেছে ; অথচ তাদের পরাজিত করবার, এমন কি সে পথের সন্ধানলাভের সম্ভাবনাটুকু পর্যন্ত সে পাচ্ছে না।

কল্পনায় তার চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই সব হাজার হাজার লাঞ্ছিত মানুষের দল যারা একদল নির্বিকার সেনাপতি, ন্যায়াধীশ ও ইন্সপেক্টরের হাতে কোন না কোন অস্বাস্থ্যকর কারাগারে বন্দী হয়ে আছে ; তার মনে পড়ল সেই মুক্ত বৃদ্ধ লোকটির কথা যে কর্তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করায় পাগল সাব্যস্ত হয়েছে ; মনে পড়ল অনেকগুলি মৃতদেহের মধ্যে ক্রাইল্‌ত্‌সভ-এর মোমের মত সাদা সুন্দর মুখখানি, অনেকখানি ক্রোধ বুকে নিয়ে যে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। তাহলে কে পাগল : সে নেখ্‌ল্যুদভ নিজে, না এই সব কাজ করবার পরেও যারা মনে করে তারা ঠিক করেছে তারা : এই

প্রশ্নটিই বার বার নতুন শক্তিতে তার সামনে উপস্থিত হয়ে জবাবের দাবী জানাচ্ছে।

পায়চারি করতে করতে শ্রান্ত হয়ে, অবিরাম চিন্তার ভারে ক্লান্ত হয়ে এক সময় সে বাতিটার পাশে সোফায় বসে পড়ল। যে "টেস্টামেণ্ট" খানা ইংরেজ ভদ্রলোক স্মৃতি-চিহ্ন হিসাবে তাকে দিয়েছিল ঘরে ঢুকে পকেট থেকে অন্য সব জিনিস বের করবার সময় সে বইখানি বের করেও সে টেবিলের উপরে রেখেছিল। এবার সে যন্ত্রবৎ সেই বইখানি চোখের সামনে মেলে ধরল।

"লোকে বলে এই বইতে সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়", এই কথা ভেবে বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ম্যাথু অধ্যায় ১৮ থেকে পড়তে লাগল :

১। ঠিক সেই সময় শিষ্যরা যীশুর কাছে এসে বলল, স্বর্গ-রাজ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

২। আর যীশু একটি ছোট শিশুকে কাছে ডেকে তাদের মাঝখানে বসিয়ে দিলেন।

৩। আর বললেন, নিশ্চিতরূপেই আমি তোমাদের বলছি, যতক্ষণ তোমরা রূপান্তরিত হয়ে ছোট শিশুদের মত না হবে ততক্ষণ কেউ স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

৪। সুতরাং যে এই ছোট শিশুটির মত ছোট হতে পারবে সেই হবে স্বর্গ-রাজ্যে শ্রেষ্ঠ।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, একথা ঠিক," সে বলে উঠল; তার মনে পড়ল, নিজেকে যখন সে ছোট ও বিনীত করেছিল একমাত্র তখনই সে পেয়েছিল জীবনের শান্তি ও সুখ।

৫। আর যারা এইভাবে আমার নাম নিয়ে এরূপ একটি শিশুকে গ্রহণ করবে তারাই আমাকে পাবে।

৬। আর যারা এইভাবে আমার প্রতি বিশ্বাসী এই সব ছোট শিশুদের প্রতি অন্যায় করবে, গলায় যাঁতার পাথর ঝুলিয়ে তাদের ফাঁসি দেওয়া হোক, সাগরের অতলে তাদের ডুবিয়ে দেওয়া হোক।

"এ সব কথার অর্থ কি?—'এই ভাবে গ্রহণ করবে।' কি ভাবে গ্রহণ করবে? 'আমার নাম নিয়ে' কথারই বা অর্থ কি?" এই সব প্রশ্ন তার মনে জাগল। সে বুঝতে পারল, এই সব শব্দ তাকে কিছু স্পষ্ট করে বলতে পারে নি "আর। গলায় যাঁতার পাথরই বা কেন? সাগরের অতলেই বা কেন? না, এতে হবে না; এ তো সঠিক নয়, স্পষ্ট নয়;" তার মনে পড়ল, জীবনে একাধিকবার এই ধর্মগ্রন্থ সে পড়েছে, কিন্তু সে সব কথার স্পষ্টতার অভাব বার বার তার মনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আবার সে পড়তে লাগল ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম শ্লোক: তাতে লেখা আছে আঘাতের কথা, আঘাত যে

আসবেই সে কথা, "গেহেন্না',-তে (*) ফেলে দিয়ে শাস্তির কথা, এবং কিছু কিছু দেবদূত যারা স্বর্গে পরম পিতার মুখ দেখতে পায় তাদের কথা। তার মনে হল, "কী দুঃখের কথা যে এ সবই এত সামঞ্জস্যহীন ! অথচ মনে হয় বুঝি এর মধ্যে ভাল কিছু আছে।"

১১। আর যা হারিয়েছে তাকে উদ্ধার করবার জন্যই মানব-পুত্রের আবির্ভাব হয়েছে, সে পড়েই চলল।

১২। তোমরা কি মনে কর? কোন লোকের যদি একশ'টি ভেড়া থাকে, আর তাদের একটা যদি হারিয়ে যায়, তাহলে সে কি নিরানব্বইটাকে ছেড়ে পাহাড়ে গিয়ে সেই হারিয়ে-যাওয়া একটার খোঁজ করে না?

১৩। আর যদি এমন হয় যে সেটাকে সে খুঁজে পায়, তাহলে, আমি তোমাদের নিশ্চিত করে বলছি, যে নিরানব্বইটা হারিয়ে যায় নি তাদের চাইতে সেই একটা ভেড়ার জন্যই সে বেশী আনন্দ করে।

১৪। তথাপি তোমাদের স্বর্গের পরমপিতার এ ইচ্ছা নয় যে, এই সব শিশুর একটিও ধ্বংস হয়।

হ্যাঁ, তারা ধ্বংস হোক এটা পরম পিতার ইচ্ছা নয়, কিন্তু এখানে তারা শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে ধ্বংস হচ্ছে। আর তাদের রক্ষা করবার কোন সম্ভাবনাই নেই," এই কথা ভাবতে ভাবতে সে আরও পড়তে লাগল।

২১। তখন পিটার এসে তাকে বলল, প্রভু, আমার ভাই কত-বার আমার বিরুদ্ধে অন্যায় করলেও আমি তাকে ক্ষমা করব? সাত বার পর্যন্ত কি?

২২। যীশু তাকে বললেন, আমি তোমাকে বলছি না, সাত বার পর্যন্ত ঃ বরং সত্তর গুণিত সাতবার পর্যন্ত।

২৩। সুতরাং স্বর্গ-রাজ্যকে সেই রাজার সঙ্গে তুলনা করা হয় যে তার ভৃত্যদের কথা বিবেচনা করবে।

২৪। এবং যখন সে হিসাব করতে বসল, তখন তার সামনে এমন একজনকে উপস্থিত করা হল যে তার কাছ থেকে দশ হাজার ট্যালেণ্ট* ধার করেছিল।

২৫। কিন্তু যেহেতু ধার শোধ করবার মত অর্থ তার ছিল না তাই তার মনিব আদেশ দিল, তাকে, ও তার স্ত্রীকে ও তার সন্তানগণকে

---

* গেহেন্না—জেরুজালেমের নিকটবর্তী একটি উপত্যকা যেখানে ইস্রাইলরা তাদের সন্তানদের উৎসর্গ করত।

* ট্যালেণ্ট—প্রাচীন মুদ্রা।

ও তার যথাসর্বস্ব বিক্রি করে ধার শোধ করা হোক।

২৬। সুতরাং ভৃত্যটি মাটিতে পড়ে তাকে পূজা করে বলল, প্রভু, ধৈর্য ধরুন, আমি আপনার সব ঋণ শোধ করে দেব।

২৭। তখন সেই ভৃত্যের মনিব করুণাপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিল এবং তার সব ঋণ মকুব করে দিল।

২৮। কিন্তু সেই ভৃত্যটিই বাইরে গিয়ে আর একটি সহ-ভৃত্যকে ধরল যে তার কাছ থেকে একশ পেনি ধার করেছিলঃ আর সে তার গায়ে হাত দিয়ে গলা টিপে ধরে বলল, তুমি যা ধার করেছ তা শোধ করে দাও।

২৯। এবং তার সহ-ভৃত্য তার পায়ের উপর পড়ে অনুনয়-বিনয় করে বলল, তুমি ধৈর্য ধর, তোমার সব পাওনা আমি মিটিয়ে দেব।

৩০। কিন্তু সে শুনল নাঃ ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করল।

৩১। তারপর তার অপর সহ-ভৃত্যরা এই সব দেখে খুব দুঃখিত হল এবং তাদের মনিবের কাছে গিয়ে সব কথা জানাল।

৩২। তখন তার মনিব তাকে কাছে ডেকে বলল, ওরে দুষ্ট ভৃত্য, তোর কথামত তোর সব ঋণ আমি মকুব করে দিয়েছি।

৩৩। আমি যেমন তোর প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছি, তেমনি তোরও কি উচিত ছিল না তোর সহ-কর্মীকে করুণা করা?

"আর এই কি সব?" নেখ্‌লুদভ সহসা উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল; আর তার সমগ্র সত্তার অন্তর-কণ্ঠ বলল, "হ্যাঁ, এই সব।"

আর যারা আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করে তাদের যেমন হয়ে থাকে নেখ্‌লুদভেরও তাই হল। যে চিন্তা গোড়ায় মনে হয় অদ্ভুত, আত্ম-বিরোধী, এমন কি বিদ্রূপের বস্তু, জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত হয়ে অকস্মাৎ তাই হয়ে ওঠে সরলতম, নিশ্চিততম সত্য। এই ভাবে যে ভয়ংকর পাপের জন্য মানুষ যন্ত্রণা ভোগ করছে তার হাত থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় যে ঈশ্বরের কাছে সর্বদা নিজেদের অপরাধী বলে স্বীকার করা এবং অন্য কাউকে শাস্তি দিতে বা ভাল করে তুলতে যে তারা অক্ষম সে সত্যকেও স্বীকার করা—সেই ধারণাটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল, কারাগারে ও জেলখানায় যে নৃশংস পাপ সে ঘটতে দেখেছে, দেখেছে সেই দুষ্কৃতকারীদের অবিচল আত্ম-প্রত্যয়, সে সবই সম্ভব হয়েছে মানুষের অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টার ফলেঃ নিজেরা পাপী হয়ে তারা পাপকে সংশোধন করতে চেয়েছে বলে। পাপীরাই অন্য পাপীকে সংশোধন করতে চেষ্টা করেছে; তারা ভেবেছে কতকগুলি যান্ত্রিক পদ্ধতিতেই তারা একাজ করতে পারবে। আর সে সবের মোট ফল হয়েছে এই যে অভাবগ্রস্ত লোভী মানুষরা অন্যকে

শাস্তিদান ও সংশোধনকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে নিজেরা চরম দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, আর যাদের তারা নির্যাতন করছে তাদেরও অবিরাম ঠেলে দিচ্ছে দুর্নীতির পথে। কোথা থেকে এসেছে এই নৃশংসতা যা সে এতদিন দেখে এসেছে, আর তার অবসান ঘটাতে হলে কি করতে হবে, এখন তা সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে। যে-জবাব সে এতদিন খুঁজে পায় নি সেই জবাবই খৃস্ট দিয়েছেন পিটারকে। সে জবাব হল— সর্বদা ক্ষমা করা, সকলকে ক্ষমা করা, অসংখ্যবার ক্ষমা করা, কারণ যারা নিজেরা দোষী নয়, এবং সেই হেতু অন্যকে শাস্তি দিতে বা সংশোধন করতে পারে এমন কোন মানুষ নেই।

"কিন্তু ব্যাপারটাতো এত সোজা হতে পারে না", সে ভাবল; কিন্তু গোড়ায় যতই অদ্ভুত ঠেকুক, এখন সে নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারছে যে মূল সমস্যার এটা যে শুধু একটা নীতিগত সমাধান তাই নয়, এটা কার্যকর সমাধানও বটে। "তাহলে দুষ্কৃতকারীদের নিয়ে কি করা হবে? তারা কি বিনা শাস্তিতেই পার পেয়ে যাবে?" এই মামুলি আপত্তি আজ আর তাকে বিচলিত করতে পারল না। যদি এটা প্রমাণ করা যেত যে শাস্তি অপরাধের সংখ্যা হ্রাস করে অথবা অপরাধীকে সংশোধন করে, তাহলে হয় তো এই আপত্তির একটা অর্থ থাকত; কিন্তু যেহেতু তার উল্টোটাই প্রমাণিত হয়েছে এবং যেহেতু অপরকে সংশোধন করবার ক্ষমতা কারও নেই, সেই হেতু একমাত্র যুক্তিসম্মত কাজ হচ্ছে সেই কাজ থেকে বিরত থাকা যা শুধুমাত্র বৃথা চেষ্টাই নয়, যা ক্ষতিকর, নীতিবিরুদ্ধ ও নিষ্ঠুর। অনেক শতাব্দী ধরে অপরাধী বলে গণ্য লোকদের হত্যা করা হচ্ছে। আচ্ছা, তাতে কি অপরাধীরা নির্মূল হয়েছে? নির্মূল হওয়া দূরের কথা, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে; আর সে বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে একদিকে শাস্তির ফলে দুর্নীতিগ্রস্ত অপরাধীরা, আর অন্য দিকে সেই সব আইনসিদ্ধ অপরাধীরা—বিচারক, ন্যায়াধীশ, ম্যাজিস্ট্রেট ও কারাধ্যক্ষরা—যারা মানুষকে বিচার করে, দণ্ড দেয়। নেখ্‌লুদভ এখন বুঝতে পেরেছে, সমাজ ও শৃংখলা যে এখনও আছে তার কারণ এই সব বিচারক ও দণ্ডদাতা আইনসিদ্ধ অপরাধীরা নয়, তার কারণ তাদের কলুষিত প্রভাব সত্ত্বেও মানুষ আজও মানুষকে করুণা করে, ভালবাসে।

ধর্মগ্রন্থে তার এই চিন্তাধারার সমর্থন লাভের আশায় নেখ্‌লুদভ পুনরায় গোড়া থেকে বইটি পড়তে শুরু করল। সে "পর্বতশিখর থেকে প্রদত্ত কথামৃত (Sermon on the Mount) পড়ে শেষ করল। এই অংশটি সব সময়ই তাকে অভিভূত করে। কিন্তু আজই প্রথম সে বুঝতে পারল, এ কথামৃত শুধু একটি সুন্দর বিমূর্ত চিন্তার প্রকাশই নয়। এতে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কতকগুলি অতিরঞ্জিত ও অসম্ভব দাবী উপস্থিত করা হয়েছে তাও নয়। এতে রয়েছে সরল, সুস্পষ্ট বাস্তবধর্মী এমন কতগুলি বিধান যা কার্যে পরিণত হলে (আর সেটা খুবই সম্ভব) সমাজ-জীবনে এমন এক নতুন ও বিস্ময়কর

পরিবেশের সৃষ্টি হবে যেখানে নেখ্‌লুদভের মনের সব হিংসা-বিরোধী ক্ষোভ আপনা থেকেই শুধু যে দূর হয়ে যাবে তাই নয়, মানুষ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদস্বরূপ মাটির পৃথিবীতেই স্বর্গ-রাজ্যে উত্তীর্ণ হতে পারবে।

এ রকম বিধান আছে পাঁচটি।

প্রথম বিধান (ম্যাথু। অধ্যায় ৫।২১-২৬) হল, মানুষ তার ভাইকে হত্যা করবে না। এমন কি তার প্রতি ক্রোধও প্রকাশ করবে না; কাউকে "রাকা" অকর্মণ্য মনে করবে না; এবং যদি কারও সঙ্গে তার বিবাদ হয়ে থাকে তাহলে ঈশ্বরের কাছে উপহার নিয়ে যাবার আগে, অর্থাৎ প্রার্থনা করবার আগে সে বিবাদ অবশ্য মিটিয়ে ফেলবে।

দ্বিতীয় বিধান (ম্যাথু। অধ্যায় ৫।২৭-৩২) হল, মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না, এবং নারীর সৌন্দর্যকে ভোগ করতে চেষ্টা পর্যন্ত করবে না; যদি সে একবার কোন নারীর সঙ্গে একসূত্রে আবদ্ধ হয় তাহলে কখনও তার প্রতি অবিশ্বাসী হবে না।

তৃতীয় বিধান (ম্যাথু। অধ্যায় ৫।৩৩-৩৭) হল, মানুষ কখনও শপথের দ্বারা নিজেকে আবদ্ধ করবে না।

চতুর্থ বিধান (ম্যাথু। অধ্যায় ৫।৩৮-৪২) হল, মানুষ কখনও চোখের বদলে চোখ দাবী করবে না, কেউ এক গালে আঘাত করলে অন্য গাল এগিয়ে দেবে। কেউ কোন ক্ষতি করলে তাঁকে ক্ষমা করবে ও বিনীতভাবে তা সহ্য করবে, এবং সাহায্য চাইলে কখনও কাউকে প্রত্যাখ্যান করবে না।

পঞ্চম বিধান (ম্যাথু। অধ্যায় ৫।৪৩-৪৮) হল, মানুষ কখনও শত্রুদের ঘৃণা করবে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, বরং তাদের ভালবাসবে, সাহায্য করবে, সেবা করবে।

নেখ্‌লুদভ বাতিটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে রইল; তার হৃৎপিণ্ডও স্তব্ধ হয়ে গেছে। যে-জীবন আমরা যাপন করি তার আসুরিক অব্যবস্থার কথা স্মরণ করে সে এখন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, মানুষকে যদি এই সব বিধান মেনে চলতে শেখানো হত তাহলে তাদের জীবন কী হতে পারত; আর যে আনন্দ সে অনেকদিন অনুভব করে নি তাতে তার মন ভরে গেল। যেন দীর্ঘ দিনের ক্লান্তি ও যন্ত্রণার পরে সহসা আজ সে শান্তি ও মুক্তির স্বাদ পেয়েছে।

সারা রাত সে ঘুমুতে পারল না; অনেক অনেক মানুষ যারা ধর্মগ্রন্থখানি পড়ে তাদের মতই সেও এই প্রথম প্রতিটি কথার পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারল, অথচ এই কথাগুলি আগেও সে অনেকবার পড়েছে, কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারে নি। একটা স্পঞ্জ যেমন করে জলকে শুসে নেয়, ঠিক তেমনি ভাবে এই সব প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দময় অভিব্যক্তিকে সে আকণ্ঠ পান করতে লাগল। যা কিছু পড়ছে তাই পরিচিত মনে হচ্ছে;

বা সে আগে থেকেই জানত, কিন্তু যার অর্থ সে কখনও সম্পূর্ণ বুঝতে পারে নি বা সম্পূর্ণ বিশ্বাসও করেনি, তাই সে আজ তার চৈতন্যের মধ্যে উপলব্ধি করছে। এখন সবই সে বুঝতে পারছে, বিশ্বাস করছে। এই সব বিধান পালন করলে মানুষ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ লাভ করবে— শুধু এই উপলব্ধি ও বিশ্বাসই নয়। সে আরও উপলব্ধি করছে, বিশ্বাস করছে যে এই সব বিধানকে পূর্ণ করাই প্রতিটি মানুষের একমাত্র কর্তব্য, তাতেই নিহিত রয়েছে জীবনের একমাত্র অর্থ, এবং এই সব বিধান থেকে বিচ্যুত হলেই ঘটবে ভ্রান্তি, আর সে ভ্রান্তির পরিণতি প্রতিশোধ। সমগ্র কথামৃত থেকে এই সত্যই প্রবাহিত হচ্ছে এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জের নীতি-কাহিনীতে এই সত্যই অত্যন্ত জোরের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে।

চাষীরা ভেবেছিল মনিবের হয়ে যে দ্রাক্ষাকুঞ্জে তারা কাজ করতে গিয়েছিল সেটা তাদের নিজস্ব, সেখানে যা কিছু আছে সবই তাদের, এবং মনিবের কথা ভুলে গিয়ে তার লোকজন সবাইকে হত্যা করে সেই দ্রাক্ষাকুঞ্জে সুখে বাস করাই হল তাদের কাজ।

নেখ্‌লয়ুদভ ভাবতে লাগল, "যখন আমরা ভাবি যে আমরাই আমাদের জীবনের মালিক এবং সুখ-সম্ভোগের জন্যই এ জীবন আমরা লাভ করেছি, তখন কি আমরাও ঠিক ওই কাজই করি না? কিন্তু এতো অসম্ভব। কারও ইচ্ছায় কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমাদের এখানে পাঠানো হয়েছে। অথচ আমরা স্থির করেছি, শুধু নিজেদের সুখের জন্যই আমরা বেঁচে থাকব, আর তার ফলেই আমাদের কপালে জোটে দুঃখ, যেমন জুটেছিল সেই চাষীদের কপালে যখন তারা মনিবের আদেশ মত কাজ করে নি। এই সব বিধানের ভিতর দিয়েই মনিবের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে। যে মুহূর্তে মানুষ এই সব বিধানকে পূর্ণ করে তুলবে, তখনই মাটির পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে স্বর্গ-রাজ্য, মানুষ লাভ করবে তার শ্রেষ্ঠ কল্যাণ।"

"কিন্তু তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধর্মকে আবিষ্কার কর ; এবং তাহলেই আর সব কিছু তোমাদের করায়ত্ত হবে।" কিন্তু আমরা শুধু "আর সব কিছুর সন্ধান করি, আর তাই তাদের খুঁজে পাই না।

"এবং এখানেও তাই ঘটেছে—আমার জীবনের কর্মক্ষেত্রে। একটা কাজ শেষ করতে না করতেই আর একটা শুরু হয়েছে।"

নেখ্‌লয়ুদভের কাছে সেই রাত্রে একটা সম্পূর্ণ নতুন জীবনের আবির্ভাব হল ; জীবনের নতুন পরিবেশের মধ্যে পদার্পণ করেছে বলে নয়, সেই রাতের পর থেকে সে যা কিছু করেছে সে সবই তার জন্য একটা নতুন ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থ বহন করে এনেছে।

তার জীবনের এই নতুন অধ্যায় কি ভাবে শেষ হবে, একমাত্র মহাকালই তা বলতে পারে।

———

শৈশব : কৈশোর : যৌবন

(ভূমিকা)

"Four Epochs of Development" নাম দিয়ে একখানি আত্ম-জীবনীমূলক উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন লিও তলস্তয়। তদনুসারে তিনি প্রথম তিনটি পর্ব লিখে শেষ করেছিলেন: শৈশব (১৮৫২) ; কৈশোর (১৮৫৪) ; যৌবন (১৮৫৭)। চতুর্থ পর্বটি কোনদিনই লেখা হয় নি। প্রথম রচনা হিসাবে "শৈশব" যখন প্রকাশিত হয় তখন তলস্তয়ের বয়স ছিল মাত্র চব্বিশ বছর।

শৈশব

অধ্যায়—১

শিক্ষক কার্ল আইভানিচ

দশম জন্মদিবসে আমি নানা রকম আশ্চর্য উপহার পেয়েছিলাম ; তার পরবর্তী তৃতীয় দিন ১৮—সালের ১২ই আগস্ট তারিখে কার্ল আইভানিচ সকাল সাতটার সময় আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন একটা লাঠির মাথায় চিনি-কাগজ জড়িয়ে তৈরি মাছি ধরার জাল দিয়ে আমার ঠিক মাথার উপরে একটা মাছিকে সশব্দে ধরতে গিয়ে। এমন বাজেভাবে তিনি কাজটা করলেন যে বিছানার উপরকার ওক কাঠের তাকে রাখা দেবীমূর্তিটিকে তাতে জড়িয়ে ফেললেন, আর মরা মাছিটা সোজা এসে ছিটকে পড়ল আমার মাথার উপরে। আমি চাদরের নীচ থেকে বেরিয়ে মূর্তিটিকে ঠিক করে বসিয়ে দিলাম, মরা মাছিটাকে ঝেঁটিয়ে মেঝেতে ফেলে দিলাম, আর ঘুম ঘুম রাগী চোখে কার্ল আইভানিচের দিকে তাকালাম। কিন্তু জোড়াতালি দেওয়া বিচিত্র বর্বর ড্রেসিং-

গাউন, সেই একই কাপড়ের কোমরবন্ধ, হাতে বোনা ঝোপ্পাসমেত একটা লাল আঁটো টুপি ও নরম ছাগলের চামড়ার জুতো পরে তিনি দেয়াল বরাবর ছুটতে লাগলেন, আর নিশানা স্থির করে একটার পর একটা মাছি তাড়াতে লাগলেন।

আমি ভাবলাম, "না হয় আমি ছোট, তাই বলে তিনি আমাকে বিরক্ত করবেন? ভলদিয়ার বিছানার চারপাশে ঘুরে কেন তিনি মাছি মারুন না? সেখানে তো এত মাছি আছে। না, ভলদিয়া যে আমার চাইতে বড়, আমি যে সকলের ছোট, আর তাই তিনি আমাকেই কষ্ট দেন।" ফিস্‌ফিস্‌ করে বললাম, "আমার যা খারাপ লাগে সে রকম কাজ করা ছাড়া জীবনে তার আর কোন ভাবনা-চিন্তাই নেই। তিনি তো ভাল করেই জানেন যে তিনি আমার ঘুম ভাঙিয়েছেন, আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছেন, অথচ এমন ভান করছেন যেন কিছুই দেখেন নি—জঘন্য লোক! আর তার ড্রেসিং-গাউন, তার টুপি আর ঝোপ্পা—কী বিরক্তিকর।"

এইভাবে যখন মনে মনে কার্ল আইভানিচের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করছি তখন তিনি তার নিজের বিছানার কাছে এলেন, স্ফটিকের মালা দিয়ে সাজানো তাকের উপর ঝুলিয়ে রাখা ঘড়িটার দিকে তাকালেন, একটা পেরেকের সঙ্গে জালটাকে ঝুলিয়ে রাখলেন, এবং খুব খুশি মনেই আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

"Auf, Kinder, auf · s ist Leit. Die Mutter ist schou im Saal!" সহজ জার্মান ভাষায় তিনি বললেন; তারপর আমার কাছে এসে পায়ের কাছে বসে পড়ে পকেট থেকে নস্যির কৌটোটা বের করলেন। আমি ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম। কার্ল আইভানিচ একটিপ নস্যি নিলেন, নাকটা মুছলেন, আঙুলের গাঁট ফোটালেন, তারপর আমার দিকে নজর দিলেন। হাসতে হাসতে আমার গোড়ালিতে সুড়সুড়ি দিতে লাগলেন। মুখে বললেন, "জাগো আলসেরা, জাগো!"

সুড়সুড়িকে আমার বড় ভয়, তবু আমি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলাম না, বা তার কথার কোন জবাব দিলাম না; কিন্তু মাথাটাকে বালিশের নীচে আরও বেশী করে ঢুকিয়ে দিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে লাথি চালাতে লাগলাম, এবং হাসি রুখতে সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগলাম।

"উনি কত ভাল, আমাদের কত ভালবাসেন, তবু ওর সম্পর্কে আমি কত খারাপ কথা চিন্তা করলাম।"

নিজের প্রতি ও কার্ল আইভানিচের প্রতি আমি খুবই বিরক্ত হলাম: ইচ্ছা হল হাসি এবং কাঁদি: আমার স্নায়ুগুলো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

বালিশের নীচ থেকে মাথাটা বের করে অশ্রুসিক্ত চোখে বলে উঠলাম: **"Ach, lassen Sie,** কার্ল আইভানিচ!" অবাক হয়ে কার্ল আইভানিচ

সুড়সুড়ি দেওয়া বন্ধ করলেন, সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন আমার কি হয়েছে ; আমি কি কোন খারাপ স্বপ্ন দেখেছি ? তার প্রসন্ন জার্মান মুখের দিকে তাকিয়ে এবং যে সহানুভূতির সঙ্গে তিনি আমার চোখের জলের কারণ জানতে চাইলেন তা বুঝতে পেরে আমার চোখে আরও বেশী করে জল এল। আমি লজ্জা পেলাম ; এক মুহূর্ত আগেই কেমন করে আমি কার্ল আইভানিচকে ঘৃণা করেছিলাম। তার ড্রেসিং-গাউন, তার টুপি ও ঝোপ্পাটাকে বিরক্তিকর মনে করেছিলাম, তা বুঝতেই পারলাম না। বরং এখন সে সব কিছুই অন্তত মনোরম বলে মনে হল ; এমন কি তার ঝোপ্পাটাকেই মনে হল তার ভাল-মানষেমির স্পষ্ট প্রমাণ। তাকে বললাম, একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেই আমি কাঁদছিলাম—স্বপ্নে দেখলাম মামণি মারা গেছে, আর সকলে তাকে কবর দিতে নিয়ে চলেছে। এ সবই আমার বানানো, কারণ সে রাতে আমি যে কি স্বপ্ন দেখেছি তাই জানতাম না ; কিন্তু আমার গল্পে অভিভূত হয়ে কার্ল আইভানিচ যখন আমাকে সান্ত্বনা দিতে, শান্ত করতে লাগলেন তখন মনে হল বুঝি বা সত্যি সত্যি একটা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছিলাম, আর তখনই অন্য একটা কারণে আমার দুই চোখে জলের ধারা নামল।

কার্ল আইভানিচ চলে গেলে বিছানার উপর বসে আমি যখন আমার ছোট ছোট পায়ে মোজা পরতে লাগলাম তখন আমার চোখের জল কিছুটা থামল ; কিন্তু কাল্পনিক বিষণ্ণ চিন্তা আমাকে ছাড়ল না। দিয়াদ্‌কা (ছোটদের খানসামা) নিকলাই ঘরে ঢুকল—চটপটে, পরিচ্ছন্ন, ছোটখাট মানুষটি ; সব সময়ই গম্ভীর, সঠিক ও শ্রদ্ধাশীল, আর কার্ল আইভানিচের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে আমাদের জামা ও জুতো এনে দিল ; ভলদিয়ার এখন বুট হয়েছে, কিন্তু আমার এখনও সেই ফিতে-বাঁধা অসহ্য জুতো। তার সামনে কাঁদতে আমার লজ্জা করছিল ; তাছাড়া, সকাল বেলাকার সূর্যের আলো এসে পড়েছে জানালা দিয়ে, ভলদিয়া মারিয়া আইভানভনার (আমার দিদির গভর্নেস) হাবভাবের নকল করছে, আর ওয়াস-বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে খুশি হয়ে এত জোরে হাসছে যে গম্ভীর নিকলাই পর্যন্ত কাঁধের উপর তোয়ালে রেখে, একহাতে সাবান ও অন্য হাতে হাত-বেসিন নিয়ে হেসে বলল : যথেষ্ট হয়েছে ভলাদিমির পেত্রভিচ, দয়া করে হাতমুখটা ধুয়ে নিন।"

আমিও খুব খুশি হয়ে উঠলাম।

"তোমরা তৈরি হলে ?" স্কুল-ঘর থেকে কার্ল আইভানিচের গলা ভেসে এল।

তার কণ্ঠস্বর কঠিন ; যে প্রসন্ন স্বর শুনে আমার চোখে জল এসেছিল এখন আর তার ছোঁয়াটুকুও নেই। স্কুল-ঘরে কার্ল আইভানিচ সম্পূর্ণ অন্য মানুষ : তিনি তখন শিক্ষক। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে হাতমুখ ধুয়ে ভেজা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতেই আমি স্কুল ঘরে ঢুকলাম।

নাকের উপর চশমা পরে, হাতে একটা বই নিয়ে কার্ল আইভানিচ দরজা

ও জানালার মাঝখানে তার নিজস্ব জায়গাটাতে বসে আছেন। দরজার বাঁ দিকে দুটো তাক-ভর্তি বই : একটা আমাদের—অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের; অন্যটা কার্ল আইভানিচের বিশেষ সম্পত্তি। আমাদের তাকে নানা রকম বই সাজানো—স্কুলপাঠ্য ও অন্য বই; কতকগুলো দাঁড় করানো, কতকগুলো শোয়ানো। কেবল লাল চামড়ায় বাঁধানো "হিস্তরিস্ দ্য ভয়েজেস"-এর দুটো বড় বড় খণ্ড দেয়ালের গায়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে; তারপরেই একগাদা লম্বা, মোটা, বড় ও ছোট বই, বইছাড়া মলাট, মলাটছাড়া বই। খেলার ঘণ্টার আগে যখন আমাদের উপর এই লাইব্রেরিটা—কার্ল আইভানিচ তাকটাকেই ঐ নামে ডাকেন—পরিষ্কার করার হুকুম হত তখন আমরা উল্টো-পাল্টা সব কিছু মুখস্ত করতাম। তার ব্যক্তিগত তাকের বইয়ের সংগ্রহ আমাদের মত এত বড় না হলেও আরও নানা ধরনের বইতে সুসজ্জিত। তার তিনখানা বইয়ের নাম আমার মনে আছে—কপি-বাগানের সার-প্রয়োগের উপর এক-খানি মলাটবিহীন জার্মান পুস্তিকা; পার্চমেণ্ট কাগজে ছাপা এক কোণে পুড়ে যাওয়া একখণ্ড "সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ইতিহাস" এবং একখণ্ড হাইড্রো-স্ট্যাটিকস্ পাঠ"। কার্ল আইভানিচের বেশীরভাগ সময় বই পড়েই কাটে; তার ফলে চোখের দৃষ্টিরও ক্ষতি হয়েছে; কিন্তু এই বইগুলি এবং দিনর্দার্ণ বী" নামক একখানি জনপ্রিয় পত্রিকা ছাড়া আর কিছুই তিনি পড়েন না।

কার্ল আইভানিচের তাকে যেসব জিনিসপত্র থাকত তার মধ্যে একটি জিনিসের জন্যই তার কথা আমার সব চাইতে বেশী করে মনে পড়ে। জিনিসটা হল—একটা কাঠের স্ট্যাণ্ডের উপর গোল কার্ডবোর্ডের একটা ঢাকনা; কাঠের গজালের সাহায্যে সেটাকে ওঠানো-নামানো যায়। ঢাকনার গায়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে একজন মহিলা ও এক দর্জির হাস্যকর মূর্তি। কার্ল আইভানিচ এ ধরনের জিনিস তৈরি করতে খুব দক্ষ; উজ্জ্বল আলো থেকে নিজের দুর্বল চোখকে বাঁচাবার জন্যই তিনি এই ঢাকনাটির পরিকল্পনা করছেন এবং নিজের হাতেই বানিয়েছেন।

চোখের সামনে যেন এখনও দেখতে পাই তার সেই দীর্ঘ দেহ, তালি-মারা বিচিত্র ড্রেসিং-গাউন, লাল টুপির নীচে অল্প কয়েক গুচ্ছ সাদা চুল। আমি যেন দেখতে পাই, ছোট টেবিলটার পাশে তিনি বসে আছেন, দর্জির মূর্তি-সাঁটা আলোর ঢাকনাটার ছায়া পড়েছে তার মুখে; এক হাতে বই, আর একটা হাত চেয়ারের হাতলের উপর রাখা; সামনে রয়েছে ঘড়িটা, তাতে এক শিকারীর ছবি আঁকা; আর আছে চেক-কাটা রুমাল, কালো গোলাকার নস্যির কৌটো, সবুজ চশমার খাপ। প্রতিটি জিনিস যে রকম শৃংখলার সঙ্গে পরিষ্কারভাবে ঠিক-ঠিক জায়গায় রাখা আছে তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কার্ল আইভানিচের বিবেক পরিষ্কার, আর মনটা স্বস্তিতে ভরা।

অনেক সময় নীচের হল-ঘরে ছুটাছুটি করে শ্রান্ত হয়ে আমি পা টিপে

টিপে দোতালার স্কুল-ঘরে গিয়ে দেখতাম, কার্ল আইভানিচ একাকি হাতল-চেয়ারটায় বসে আছেন, কোন একটা প্রিয় বই পড়ছেন, মুখে ফুটে উঠেছে একটা শান্ত, গম্ভীর ভাব। কখনও বা এমন সব মুহূর্তে তার কাছে গিয়ে হাজির হতাম যখন তিনি কোন বই পড়ছেন না, শুধুই বসে আছেন, চশমা জোড়া নাকের উপর ঝুলে পড়েছে, আধ-বোজা নীল চোখ দুটি মেলে এক-দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে আছেন, ঠোঁটের উপর একটা বিষণ্ণ হাসির রেখা। ঘরের মধ্যে শান্ত স্তব্ধতা, শুধু শোনা যাচ্ছে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আর শিকারী-ঘড়ির টিক্-টিক্ আওয়াজ।

প্রায়ই তিনি আমাকে দেখতে পেতেন না; দরজায় দাঁড়িয়ে আমি ভাবতাম: বেচারি, বেচারি বুড়ো মানুষটি! আমরা কত লোক, একসঙ্গে খেলতে পারি, মজা করতে পারি,—কিন্তু তিনি একেবারে একা, তাকে একটু দয়া করবার কেউ নেই। নিজেই আমাদের বলেছেন, তিনি অনাথ। তার জীবনের কাহিনী এত ভীষণ দুঃখের! মনে পড়ে, তিনি নিকলাইকে সব বলতেন: এ রকম অবস্থায় পড়া বড়ই ভয়ংকর!

আমার এত দুঃখ হত যে তার কাছে গিয়ে হাতটা ধরে বলতাম, "Lieber কার্ল আইভানিচ।" আমার কথাগুলি তার খুব ভাল লাগত : কারণ তিনি সব সময় আমাকে আদর করতেন; বুঝতে পারতাম তার মনে খুব লেগেছে।

আর একটা দেয়ালে মানচিত্র ঝোলানো থাকত; তার প্রায় সবগুলিই ছেঁড়া, কিন্তু কার্ল আইভানিচের নিজের হাতে নিপুণভাবে মেরামত করা। তৃতীয় দেয়ালের মাঝখানের দরজা দিয়ে নীচে যাবার সিঁড়ি নেমে গেছে; সেই দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে দুটো রুলার : একটা আগাগোড়া খাঁজ-কাটা সেটা আমাদের; আর একটা আনকোরা নতুন—তার নিজস্ব ব্যক্তিগত রুলার, আমাদের হাতের লেখার খাতার চাইতে আমাদের উপরেই সেটা বেশী ব্যবহার করা হয়। দরজার অপর পাশে একটা ব্ল্যাকবোর্ড; তাতে আমাদের বড় বড় কুকর্মগুলি দেখানো হয়েছে বৃত্ত-চিহ্ন দিয়ে, আর ছোটগুলি ক্রুশ-চিহ্ন দিয়ে। বোর্ডের বাঁদিকে আছে সেই কোণ্টা শাস্তি দিতে হলে যেখানে আমাদের হাঁটু ভেঙে বসিয়ে রাখা হত।

সেই কোণ্টার কথা খুব মনে পড়ে। মনে পড়ে বিদ্যুৎ-নিয়ন্ত্রক যন্ত্রটা ও তার ভিতরকার গরম বাতাস ছাড়বার গর্তটার কথা, এবং সেটা চালিয়ে দিলে যে শব্দ হত তার কথা। সেই কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁটু ও পিঠ ব্যথা হয়ে যেত; মনে হত, কার্ল আইভানিচ বুঝি আমার কথা ভুলেই গেছেন। "তিনি তো বেশ আরাম করে নরম হাতল চেয়ারে বসে আছেন আর হাইড্রোস্টাটিক্স পড়ছেন; কিন্তু আমার অবস্থাটা কী?" তারপরই আমার অস্তিত্বকে স্মরণ করিয়ে দিতে আমি যন্ত্রটাকে আস্তে খুলে দিতাম আর বন্ধ করতাম, অথবা দেয়াল থেকে এক চাপড়া পলস্তারা খুলে ফেলতাম;

কিন্তু একটা বড় মাপের চাপড়া যদি হঠাৎ সশব্দে মেঝেতে খুলে পড়ত, তাহলে সব শাস্তির থেকেও বড় ভয় আমাকে পেয়ে বসত। উঁকি দিয়ে কার্ল আইভানিচের দিকে তাকাতাম, কিন্তু তিনি বই হাতে নিয়ে বসেই আছেন, যেন কোন কিছুই তার নজরে পড়ে নি।

ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল ছিল; ছেঁড়া কালো তেল-কাপড় দিয়ে ঢাকা; তার ফাঁক দিয়ে ছুরি দিয়ে অনেক জায়গায় কাটা টেবিলের ধারগুলো চোখে পড়ত। টেবিলের চারপাশে কয়েকটা রংবিহীন টুল, দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে মসৃণ হয়ে গেছে। শেষের দেয়ালে চারটে জানালা। সেগুলো রাস্তার দিকে খোলা; রাস্তার প্রতিটি গর্ত, প্রতিটি পাথর ও চাকার দাগ আমার অনেক দিনের পরিচিত ও প্রিয়; রাস্তার অপর দিকে ছাটা লেবু গাছের একটা বীথি; তার ভিতর দিয়ে একটা বাঁশের বেড়া উঁকি দিচ্ছে। বীথিটাকে ছাড়িয়ে চোখে পড়ে একটা প্রান্তর, তার একদিকে একটা গোলাবাড়ি, আর অপর দিকে একটা জঙ্গল; দূরে দেখা যেত পাহারাওয়ালার ছোট কুঁড়েটা। ডানদিকের জানালাটা দিয়ে একটা ছাদের অংশবিশেষ দেখা যায়, সাধারণত ডিনারের আগে বড়রা সেখানে বসে জটলা করত। কার্ল আইভানিচ যখন শ্রুতিলিখনের পাতায় ভুল সংশোধন করতেন তখন সেদিকে তাকালে চোখে পড়ত মামণির কালো মাথা, কারও বা পিঠ, আর কানে আসত কথাবার্তা ও হাসির অস্পষ্ট শব্দ; আর সেখানে যেতে না পেরে বিরক্ত হয়ে ভাবতাম: "কবে যে আমি বড় হব, লেখাপড়ার শেষ হবে, আর ঐ যাদের ভালবাসি তাদের সঙ্গে গিয়ে বসতে পারব?" বিরক্তি থেকে আসত দুঃখ, আর এমন সব অদ্ভুত চিন্তা মাথায় ভিড় করত যে শ্রুতলিখনের ভুলগুলির জন্য কার্ল আইভানিচের বকুনি কানেও ঢুকত না।

অবশেষে কার্ল আইভানিচ ড্রেসিং-গাউনটা ছেড়ে তার নীল রঙের চাতক-লেজের কোটটা পরে নিত, কাঁধের উপর অনেক রকম ভাঁজ ফেলত, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলাবন্ধটা ঠিক করে নিত এবং মামণিকে সুপ্রভাত জানাবার জন্য আমাদের নিয়ে নীচে নেমে যেতেন।

অধ্যায়—২

মামণি

বৈঠকখানায় বসে মামণি চা ঢালছে; এক হাতে চায়ের পাত্র, অন্য হাত সামোভারের কলে; সামোভার থেকে জল ঢালা হচ্ছে ট্রের উপর রাখা চায়ের পাত্রে। মামণির চোখ দুটি সেদিকে থাকলেও সেটা সে দেখছেই না; আমরা যে ঘরে ঢুকেছি তাও সে খেয়াল করেনি।

মানুষ যখন কোন প্রিয়জনের চেহারাটা মনে আনতে চেষ্টা করে তখন অতীতের স্মৃতি এত বেশী করে ভিড় করে যে চোখের জলের ভিতর দিয়ে দেখা জিনিসের মতই সে মুখের স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। এ অশ্রু কল্পনার। আমার মার সে সময়কার ছবি যখনই মনে করতে চেষ্টা করি তখনই তার দুটি বাদামী চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না; সে চোখে সব সময়ই থাকত ভালবাসা ও মমতার প্রকাশ; গলার যেখান থেকে চুল গজায় ঠিক তার নীচেই একটা তিল; সাদা কাজ-করা কলার; সেই ঠাণ্ডা, নরম হাত যা দিয়ে মা আমাকে আদর করত, যে হাতে আমি অনেক দিন চুমো খেয়েছি: কিন্তু তার পুরো ছবিটা কিছুতেই মনে করতে পারি না।

সোফার বাঁদিকে মস্ত বড় পুরনো ইংলিশ পিয়ানোটা; আমার শ্যামবর্ণা বোন লিউবা পিয়ানোতে বেশ কষ্ট করে ক্লিমেন্তির গৎ বাজাচ্ছে; ঠাণ্ডা জলে ধোয়া তার গোলাপী আঙুলগুলি রিডের উপর খেলা করছে। তার বয়স তখন ষোল। পরনে সাদা লেস-বসানো একটা খাটো সুতীর পোশাক, কোন রকমে "আর্পেজিও"-তে অষ্টম স্বরটা বাজাতে পারে। তার পাশে কিছুটা বেঁকে বসে আছে মারিয়া আইভানভ্না; গোলাপী ফিতে-বাঁধা টুপি ও নীল জামা তার পরনে। তার মুখটা এমনিতেই লাল ও রাগী; কার্ল আই-ভানিচ ঘরে ঢোকায় সে মুখ আরও কঠিন হয়ে উঠল। তার অভিবাদনে সাড়া না দিয়ে পিছন ফিরে একবার তাকিয়েই পায়ে তাল ঠুকে-ঠুকে আগের চাইতেও বেশী জোড়ে এক, দুই, তিন—এক, দুই, তিন গুণতে লাগল।

সে সবের প্রতি কোন নজর না দিয়ে কার্ল আইভানিচ মার দিকে এগিয়ে গিয়ে যথারীতি জার্মান ভাষায় তাকে শুভ কামনা জানালেন। মা চমকে উঠল, যেন বিষণ্ণ চিন্তাগুলিকে মন থেকে বিদায় দিতে মাথাটা নাড়ল, তারপর কার্ল আইভানিচের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল, এবং তিনি যখন মার হাতে চুমো খেতে মাথাটা নোয়ালেন তখন মাও তার ভাঁজ-পড়া কপালে চুমো খেল।

বলল, "Ich danke, lieber কার্ল আইভানিচ।" তারপর জার্মান ভাষাতেই প্রশ্ন করল।

"ছেলেমেয়েরা ভাল ঘুমিয়েছিল তো?"

কার্ল আইভানিচ এককানে কালা; এখন পিয়ানোর শব্দের জন্য কিছুই শুনতে পেলেন না। একটা হাত টেবিলের 'উপর রেখে একপায়ে দাঁড়িয়ে তিনি সোফাটার আরও কাছে ঝুঁকলেন; এমন মিষ্টি করে হাসলেন যে আমার কাছে সুরুচির চূড়ান্ত প্রকাশ বলে মনে হল; টুপিটা তুলে বললেন:

"আমাকে মাফ করবেন কি নাতালিয়া নিকলায়েভ্না?"

ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে কার্ল আইভানিচ কখনও তার লাল টুপিটা খোলেন না, কিন্তু যতবার বৈঠকখানায় ঢোকেন ততবারই টুপিটা পরে থাকার অনুমতি

চেয়ে নেন।

তার কাছে আরও এগিয়ে আরও জোরে মামণি বলল, "ওটা পরেই থাকুন কার্ল আইভানিচ…আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম ছেলেমেয়েদের ভাল ঘুম হয়েছে কি ?"

কিন্তু এবারও তিনি কিছুই শুনতে পেলেন না; টাক মাথায় লাল টুপিটা চাপিয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগলেন।

মামণি হেসে মারিয়া আইভানভ্‌নাকে বলল, "একটু থামতো মিমি, আমরা কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।"

মামণির মুখখানি এমনিতেই সুন্দর, কিন্তু হাসলে সে মুখ আরও অতুলনীয় সুন্দর হয়ে ওঠে, চারদিকের সব কিছুকেই যেন প্রাণবন্ত করে তোলে। জীবনের সংকট-মুহূর্তগুলোতে সে হাসির একটুখানি আভাষও যদি ধরে রাখতে পারতাম তাহলে দুঃখ কাকে বলে তা বুঝতেই পারতাম না। আমার মনে হয় একমাত্র এই হাসিই তো রূপের উৎস : হাসি যখন মুখের শ্রীবৃদ্ধি করে তখনই সে-মুখ সুন্দর হয়ে ওঠে; হাসি যদি মুখকে বদলে না দেয় তো সে মুখ সাধারণ; আর হাসি যদি মুখকে নষ্ট করে তো সে মুখ কুৎসিৎ।

আমাকে আদর করতে মামণি দুই হাতে আমার মাথাটা ধরে একটু পিছনে ঠেলে দিয়ে একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল :

"আজ সকালে তুমি কাঁদছিলে ?"

কোন জবাব দিলাম না। মা আমার চোখে চুমো খেয়ে জার্মান ভাষায় বলল :

"কেন কাঁদছিলে ?"

মামণি জার্মান ভাষাটা বেশ ভালই জানত : আমাদের সঙ্গে ভালভাবে কথা বলতে হলেই সে জার্মান ভাষা ব্যবহার করত।

কাল্পনিক স্বপ্নটার কথা সবিস্তারে স্মরণ করে বললাম : "আমি স্বপ্নের মধ্যে কেঁদেছিলাম মামণি।"

কার্ল আইভানিচ আমাকে সমর্থন করলেন, কিন্তু স্বপ্নটা সম্পর্কে কিছুই বললেন না। আবহাওয়া সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা হল, মিমিও তাতে যোগ দিল; তারপর কয়েকজন পেয়ারের চাকরের জন্য ট্রেতে দু'টুকরো চিনি রেখে মামণি জানালার পাশে রাখা সেলাইয়ের ফ্রেমটার কাছে চলে গেল।

"ছোটরা, এবার তোমাদের বাবাকে গিয়ে বল, ঝাড়াই-উঠোনে যাবার আগে তিনি যেন অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা করেন।"

বাজনা, তাল গোণা ও কালো চোখের চাউনি আবার শুরু হয়ে গেল; আমরাও বাপির কাছে চলে গেলাম। যে ঘরটাকে ঠাকুরদার আমল থেকে খানসামাদের ভাঁড়ার ঘর বলা হয় সেই ঘরের ভিতর দিয়ে আমরা পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

অধ্যায়—৩

বাপি

ডেস্কটার পাশে দাঁড়িয়ে কতকগুলি খাম, কাগজপত্র ও কয়েক বাণ্ডিল ব্যাংক-নোট দেখিয়ে বাপি কড়া গলায় নায়েব ইয়াকভ মিখাইলভের সঙ্গে কথা বলছে। নায়েব যথারীতি দরজা ও ব্যারোমিটারের মাঝখানে তার নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে দুই হাত পিছনে রেখে অনবরত আঙুলগুলিকে নাড়ছে ও মোচড়াচ্ছে।

বাপি যত রেগে যাচ্ছে আঙুলগুলো ততই জোরে নড়ছে; অপর দিকে বাপি যেই কথা বন্ধ করছে অমনি আঙুল নাড়াও থেমে যাচ্ছে; কিন্তু ইয়াকভ নিজে যখন কথা বলছে তখন তার আঙুলগুলো অত্যন্ত বেশী উত্তেজনার সঙ্গে ইতস্তত যেন লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার মনে হল, আঙুলের নড়াচড়া দেখেই ইয়াকভের মনের গোপন কথাগুলি অনুমান করা যেতে পারে। অন্য দিকে, তার মুখটা কিন্তু সব সময়ই শান্ত; একই সঙ্গে সেখানে প্রকাশ পাচ্ছে মর্যাদাবোধ ও অধীনতাবোধ; সে মুখ যেন বলছে, "আমি ঠিক আছি, কিন্তু আপনার যা খুশি তাই করতে পারেন।"

আমাদের দেখে বাপি শুধু বলল:

"একটু সবুর কর," তারপর ইঙ্গিতে দরজাটা বন্ধ করে দিতে বলল।

অভ্যাসমতই দুই কাঁধ কুঁচকে বাপি নায়েবকে বলতে লাগল, "দয়ালু ঈশ্বর! আজ তোমার কি হয়েছে ইয়াকভ? আটশ' রুবলসমেত এই খামটা...."

ইয়াকভ গণনা-যন্ত্রটা চালিয়ে আটশ' রুবল গণনা শেষ করে একটা বিশেষ বিন্দুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে পরবর্তী ঘোষণা শুনবার জন্য অপেক্ষা করে রইল।

"আমার অনুপস্থিতিতে চাষবাসের খরচের জন্য এটা রইল। বুঝতে পারলে? কারখানা থেকে পাবে একহাজার রুবল: ঠিক আছে? ট্রেজারি থেকে ধার পাবে আট হাজারের মত; খড়ের দরুন, তোমার হিসাব মতই সাত হাজার পুড (১পুড—প্রায় ৪০ পাউণ্ড) তুমি বিক্রি করতে পারবে—ধর ৪৫ কোপেক দরে—এবং তুমি পাবে তিন হাজার; তাহলে সব মিলিয়ে কত টাকা পাবে? বারো হাজার: ঠিক আছে?

"খুব ঠিক স্যার," ইয়াকভ বলল।

কিন্তু তার আঙুলের দ্রুতগতি দেখেই আমি বুঝতে পারলাম সে প্রতিবাদ জানাবে; কিন্তু বাপি তাকে বাধা দিল।

"তাহলে, এই টাকা থেকে তুমি পরিষদে পাঠাবে দশ হাজার রুবল্ পেত্রভ্-স্কয়ের জন্য। যে টাকাটা আপিসে আছে (ইয়াকভ বারো হাজার সরিয়ে রাখল এবং গুণল একুশ হাজার) সেটা আমার কাছে নিয়ে আসবে এবং আজ থেকে যত খরচ সেই টাকা থেকেই করবে। (ইয়াকভ পুনরায় গণনাযন্ত্রটাতে

ঝাঁকি দিয়ে সেটাকে উপুড় করল, হয় তো বোঝাতে চাইল যে একুশ হাজার ঐ একই ভাবে উধাও হয়ে যাবে।) এই খামে যে টাকাটা আছে সেটা প্রদত্ত ঠিকানায় আমাকে পাঠাবে।"

আমি টেবিলের পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম; লেখাটার দিকে আমার চোখ পড়ল। পড়লাম: "কার্ল আইভানিচ ময়ের।"

যেটা আমার দেখার কথা নয় সেটা যে আমি দেখে ফেলেছি এটা বাপির নজরে পড়ে গেল; কারণ আমার কাঁধে হাত রেখে একটু চাপ দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে টেবিলের কাছ থেকে আমার সরে যাওয়া উচিত। এটা আদর না তিরস্কার ঠিক বুঝতে পারলাম না; কিন্তু অর্থ যাই হোক, কাঁধের উপর রাখা স্নায়ুবহুল বড় হাতটাতে আমি চুমো খেলাম।

ইয়াকভ বলল, "ঠিক আছে স্যার। কিন্তু খাবারভ্‌কার টাকাটা সম্পর্কে আপনার কি হুকুম?"

খাবারভ্‌কা গ্রামটা মামণির সম্পত্তি।

"ওটা আপিসে রেখে দাও; আমার অনুমতি ছাড়া কোন অবস্থাতেই ওটা খরচ করবে না।"

ইয়াকভ কয়েক মিনিট চুপ করে রইল; তারপরই হঠাৎ তার আঙুলগুলো দ্রুতগতিতে নড়তে শুরু করল; এতক্ষণ যে নির্বোধ দাসসুলভ দৃষ্টিতে সে প্রভুর হুকুম শুনছিল তার জায়গায় দেখা দিল তার স্বাভাবিক চতুর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি; গণনাযন্ত্রটা কাছে টেনে নিয়ে সে কথা বলতে শুরু করল।

"প্রিয়তর আলেক্সান্দ্রভিচ, স্যার, আপনার অনুমতি নিয়েই বলছি, যথাসময়ে পরিষদকে টাকা পাঠানো অসম্ভব। আপনি বললেন, আমরা ধার করে, কারখানা থেকে এবং খড়ের দরুন টাকা পাব; কিন্তু আমার আশংকা আমাদের হিসাবে কিছুটা ভুল থেকে গেছে।"

"কেন?"

"আমাকে বুঝিয়ে বলতে দিন স্যার: কারখানার কথা—কারখানার মালিক সময় চেয়ে নেবার জন্য দুবার আমার কাছে এসেছে; শপথ করে বলেছে তার হাতে টাকা নেই। সে এখানেই আছে। আপনি নিজে কি তার সঙ্গে কথা বলবেন?"

বাপি নিজে যে তার সঙ্গে কথা বলতে চায় না মাথা নেড়ে সেটা বুঝিয়ে দিয়ে বাপি বলল, "সে কি বলছে?"

"সেই একই পুরনো কথা। সে বলছে, কোন কাজ হচ্ছে না; তার কাছে যৎসামান্য টাকা যা ছিল বাঁধ তৈরি করতে খরচ হয়ে গেছে। যদি তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাতেই কি কোন রকম সুবিধা হবে স্যার? তারপর যে ধারের কথা আপনি উল্লেখ করেছেন, আমার তো মনে হয় সে বিষয়ে আপনাকে আগেই জানিয়েছি যে সেখানে আমাদের টাকাটাই জলে গেছে।

শীঘ্র সে টাকা পাবার কোন আশাই নেই। কয়েক দিন আগে এক গাড়ি ময়দা শহরে আইভান আফানাসিককে পাঠিয়েছিলাম একটা হাত-চিঠি দিয়ে; তাতে সে জবাব দিয়েছে, পিয়তর আলেক্সান্দ্রভিসের কোন কাজে লাগতে পারলে সে খুশি হত। কিন্তু ব্যাপারটা তার হাতে নেই, আর দুমাসের আগে তার কাছ থেকে প্রাপ্য টাকা পাবেন না। আপনি খড়ের কথাটাও উল্লেখ করেছেন: "ধরুন তিন হাজারে যদি সেটা বিক্রি করতাম...।"

গণনাযন্ত্রে তিন হাজার বাদ দিয়ে সে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল; একবার গণনাযন্ত্রের দিকে, একবার বাপির দিকে তাকাল; যেন বলতে চাইল:

"আপনি নিজেই বুঝে দেখুন সে টাকাটা কত সামান্য। তাছাড়া, আপনি নিজেই জানেন যে এখন বিক্রি করলে বেশ লোকসান দিয়ে বেচতে হবে।"

বোঝা গেল, তার তহবিলে অনেক যুক্তি জমানো আছে; সেই কারণেই বাপি তার কথায় বাধা দিল।

বলল, "আমার ব্যবস্থার কোন রদ-বদল আমি করব না, কিন্তু টাকাটা পেতে সত্যি যদি বিলম্ব ঘটে তাহলে কিছুই করার নেই; যতটা দরকার হয় খাবারভকা তহবিল থেকে নিও।"

"ঠিক আছে স্যার।"

ইয়াকভের মুখের ভাব ও আঙুল দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল যে এই শেষ হুকুমটা তাকে সব চাইতে বেশী খুশি করেছে।

ইয়াকভ একজন ভূমিদাস; খুবই উৎসাহী ও বিশ্বস্ত। সব ভাল নায়েবের মতই মনিবের খরচপত্রের ব্যাপারে সে অত্যন্ত কৃপণ এবং মনিবের স্বার্থরক্ষায় খুবই সচেতন। কর্ত্রীঠাকরুণের সম্পত্তির বিনিময়ে মনিবের সম্পত্তি বাড়ানোর ব্যাপারে সে চিরদিনই একগুঁয়ে; সব সময়ই সে এটাই বোঝাতে চেষ্টা করে যে কর্ত্রীঠাকরুণের পেত্রভ্স্কয়ে-র জমিদারি (সে ঐ গ্রামেই বাস করে) থেকে পাওয়া সব আয়টাই লগ্নি করা দরকার। এই মুহূর্তে সে জয়লাভ করেছে। কারণ তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

বাপি আমাদের ডেকে বলল, এবার আলস্য কাটিয়ে উঠবার সময় হয়েছে, এখন আর আমরা শিশু নই, আমাদের মন দিয়ে পড়াশুনা করতে হবে।

আরও বলল, "তোমরা নিশ্চয়ই জান যে আজ রাতেই আমি মস্কো যাচ্ছি, আর তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।", তোমরা থাকবে তোমাদের দিদিমার কাছে, আর মেয়েদের নিয়ে মামণি থাকবে এখানে। তোমরা তো জান, এক্ষেত্রে তার একমাত্র সান্ত্বনা হবে—এ-কথা শোনা যে তোমরা ভাল করে লেখাপড়া করছ, আর তোমাদের শিক্ষকরা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট।"

কয়েকদিন ধরেই বাড়িতে যে সব উদ্যোগ আয়োজন চলছে তা থেকেই যদিও আমরা আশা করছিলাম যে অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে, তবু এই

সংবাদে আমরা আহত হলাম। ভলদিয়া লাল হয়ে উঠল; কাঁপা গলায় মামণির কথাটা শুনিয়ে দিল।

আমি ভাবলাম, "তা হলে স্বপ্নটা আমাকে এই আভাষই দিয়েছিল। ঈশ্বর করুন, আরও খারাপ কিছু যেন না ঘটে।"

মামণির জন্য আমার খুব, খুব কষ্ট হতে লাগল; আর সেই সঙ্গে আমরা যে বড় হয়ে উঠেছি সে চিন্তায় বেশ খুশিও বোধ করলাম।

ভাবলাম, "আজ রাতেই যখন আমরা চলে যাচ্ছি, তখন নিশ্চয়ই আজ আর পড়তে হবে না। কিন্তু দুঃখ হ'ল কার্ল আইভানিচের কথা ভেবে। তাকে তো নিশ্চয়ই ছাড়িয়ে দেওয়া হবে। সেই কারণেই তো তার জন্য একটা খামার তৈরি করা হয়েছে। না, এখান থেকে চলে না গিয়ে, মামণিকে ছেড়ে না গিয়ে, বেচারি কার্ল আইভানিসের মনে আঘাত না দিয়ে, চিরকাল ধরে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়াই তো ভাল ছিল। কার্ল আইভানিস বড়ই দুঃখী মানুষ।"

এই সব চিন্তা মনে আসায় চটির কালো ফিতের দিকে তাকিয়ে আমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ব্যারোমিটারের তাপ-রেখা নেমে যাওয়া নিয়ে কার্ল আইভানিসের সঙ্গে কয়েকটি কথা বলে, যাতে ডিনারের পরেই বেরিয়ে চলে যাবার আগে শেষবারের মত বাচ্চা কুকুরগুলোকে দিয়ে শিকার ধরার মহলা দেওয়া যায় সেজন্য ইয়াকভের উপর সেগুলোকে না খাইয়ে রাখার হুকুম জারি করে, এবং আমাদের প্রত্যাশাকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়ে বাপি আমাদের পড়তে পাঠিয়ে দিল; অবশ্য এইটুকু সান্ত্বনা দিল যে আমাদেরও শিকারে নিয়ে যাবে।

উপরে উঠবার পথে আমি ছুটে ছাদে চলে গেলাম। দরজার কাছে বাপির প্রিয় শিকারী-কুকুর মিল্‌চকা রোদে বসে চোখ মিট্‌মিট্‌ করে তাকাতে লাগল।

তার পিঠ চাপড়ে নাকে চুমো খেয়ে বললাম, "মিল্‌চকা আজই আমরা চলে যাচ্ছি; বিদায়! আর আমাদের কোনদিন দেখা হবে না।"

আবেগের উচ্ছ্বাসে আমি কেঁদে ফেললাম।

অধ্যায়—৪

লেখাপড়া

কার্ল আইভানিসের মেজাজ খুবই খারাপ। সেটা বোঝা গেল তার ভুরুর ভাঁজ দেখে, যেভাবে তার কোটটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ও রেগেমেগে কোমড়বন্ধটা আঁটতে লাগলেন তা দেখে, এবং সংলাপ-পুথির কোন্ জায়গাটা

মুখস্থ করতে হবে সেটা দেখাতে গিয়ে যেভাবে বইয়ের পাতার উপর নখ দিয়ে দাগ এঁকে দিলেন তা দেখে ভলদিয়া যত্নসহকারে পড়তে লাগল। কিন্তু আমি এতই বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম যে, কার্যত কিছুই করতে পারলাম না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত বোকার মত একদৃষ্টিতে সংলাপ-পুথির দিকে তাকিয়ে রইলাম, কিন্তু আসন্ন বিদায়ের কথা ভেবে এমন ভাবে দুই চোখ জলে ভরে উঠল যে একটুও পড়তে পারলাম না। যখন কার্ল আইভানিসের কাছে পড়া বলবার পালা এল তখন তিনি দুই চোখ অর্ধেক বুজে (লক্ষণটা খারাপ) শুনতে লাগলেন; আমাকে তখন সেই জায়গাটা মুখস্থ বলতে হবে যেখানে একজন বলছে, "*Wa Kommen Sie her ?*" আর অপরজন জবাব দিচ্ছে, "**Ich Komme vom kaffe-Hause**' আমি তখন চোখের জল রাখতে পারলাম না, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম, পড়া বলা আর হল না। যখন লেখার পালা এল তখন কাগজের উপর এমন বড় বড় ফোঁটায় চোখের জল পড়তে লাগল যে, মনে হল আমি বুঝি মলাট দেবার কাগজের উপর জল দিয়ে লিখছি।

কার্ল আইভানিচ রেগে গেলেন; আমাকে ঘরের কোণে পাঠিয়ে দিলেন, বললেন, এ-সব একগুঁয়েমি, নকল সং (এটা তার প্রিয় বকুনি); রুলার দিয়ে মারবার ভয় পর্যন্ত দেখালেন; হুমকি করলেন; তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে; কিন্তু চোখের জলের জন্য একটা কথাও বলতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত তিনি নিশ্চয় বুঝতে পারলেন যে, আমার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। কারণ তিনি নিকলাইয়ের ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন

নিকলাইয়ের ঘরের ভিতরকার কথাবার্তা স্কুল-ঘর থেকে শোনা যায়।

ঘরে ঢুকেই কার্ল আইভানিচ বললেন, "শুনেছ হে নিকলাই, ছেলেরা মস্কো চলে যাচ্ছে?"

"হ্যাঁ, তাতো শুনেছি," নিকলাই শ্রদ্ধার সঙ্গে উত্তর দিল।

সে বোধ হয় আসন ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল, কারণ কার্ল আইভানিচ বললেন। "না, উঠোনা নিকলাই!" তিনি দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। কোণ থেকে এসে আমি দরজার পাশে গিয়ে কান পাতলাম।

"যতই মানুষের ভাল কর, তাদের প্রতি যত মনের টানই হোক, কোন রকম কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করা চলবে না নিকলাই," কার্ল আইভানিচ আবেগের সঙ্গে বললেন।

নিকলাই জানালার পাশে বসে জুতো সেলাই করছিল; সে সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়ল।

চোখের দৃষ্টি ও নস্যির কৌটোটা সিলিং-এর দিকে তুলে কার্ল আইভানিচ

লতে লাগলেন, "বারো বছর এ বাড়িতে আছি নিকলাই, আর ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে বলতে পারি এদের যত ভালবেসেছি, এদের জন্য যা করেছি তা আমার নিজের ছেলেদের জন্যও করতাম না। তোমার তো মনে আছে নিকলাই, ভলদিয়ার যখন জ্বর হয়েছিল তখন কিভাবে আমি তার বিছানার পাশে বসেছিলাম, ন'দিনের মধ্যে একবারও চোখের পাতা এক করি নি। হ্যাঁ, তখন আমি ভাল মানুষ ছিলাম, প্রিয় আইভানিচ ছিলাম; তখন যে আমাকে দরকার ছিল। কিন্তু আজ," তিক্ত হাসির সঙ্গে তিনি বলতে লাগলেন, "আজ ছেলেরা বড় হয়েছে। তাদের ভাল করে লেখাপড়া করতে হবে। যেন এখানে তারা লেখাপড়া করত না, নিকলাই।"

সেলাইয়ের কাঁটাটা রেখে দুই হাতে সুতোটা টেনে নিকলাই বলল, "আমাকে যদি শুধোন তো বলি, তারা তো খুবই পড়াশুনা করে।"

"অথচ এখন আর আমাকে দরকার নেই, আমাকে ছাড়িয়ে দিতেই হবে। কিন্তু আমাকে যে সব কথা দিয়েছিলেন তার কি হল? কোথায় গেল কৃতজ্ঞতা?" বুকের উপর হাত রেখে বলতে লাগলেন, "নাতালিয়া নিকলায়েভ্‌নাকে আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি নিকলাই, কিন্তু তিনি কে? এ বাড়িতে তার দাম তো এর বেশী নয়," অর্থপূর্ণ ভঙ্গীতে একটুকরো চামড়া মেঝেতে ছুঁড়ে দিলেন। "আমি জানি এসব কার কাজ, কেন আজ আর আমাকে দরকার নেই; কারণ অন্য লোকের মত আমি তো খোশামদ করতে পারি না, গায়ে-পড়া ভাব দেখাতে পারি না।" স্বগর্বে বললেন, "চিরদিন সকলকে সত্য কথা বলতেই আমি অভ্যস্ত। ঈশ্বর তাদের বিচার করুন! আমাকে ছাড়িয়ে দিয়ে তারা কিন্তু বড়লোক হবেন না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমার রুটি আমি জুটিয়ে নিতে পারবই—পারব না নিকলাই?"

নিকলাই মাথাটা তুলে কার্ল আইভানিচের দিকে তাকাল, যেন নিজেকেই বোঝাতে চাইল যে লোকটি অবশ্যই তার রুটির যোগাড় করতে পারবে; কিন্তু মুখে কিছুই বলল না।

এই একই সুরে কার্ল আইভানিচ আরও অনেক কথা বললেন। বললেন, অমুক সেনাপতির বাড়িতে যখন ছিলেন তখন তার কাজের অনেক বেশী প্রশংসা হয়েছিল (এ-কথা শুনে আমার খুব কষ্ট হল)। স্যাক্সোনির কথা, তার বাবা-মার কথা, বন্ধু শোন্‌হিত দর্জির কথা, আরও অনেক কথাই তিনি বলতে লাগলেন।

তার দুঃখে আমার সহানুভূতি জাগল। বাপি ও কার্ল আইভানিচ—দুজনকেই আমি প্রায় সমান ভালবাসি; তারা কেউ কাউকে বুঝতে পারে নি দেখে আমার কষ্ট হতে লাগল। আবার ঘরের কোণে ফিরে গেলাম, হাঁটুর উপর বসে ভাবতে লাগলাম, কেমন করে তাদের মধ্যে একটা সমঝোতা করে দেওয়া যায়।

কার্ল আইভানিচ একসময় স্কুল-ঘরে ফিরে এলেন। আমাকে উঠতে বলে শ্রুত-লিখনের জন্য হস্তলিপির খাতাটা বের করতে বললেন। সব ঠিক হলে তিনি রাজকীয় ভঙ্গীতে হাতল-চেয়ারটায় বসলেন, আর মনের গভীর গহ্বর থেকে উৎসারিত কণ্ঠে জার্মান ভাষায় বলতে লাগলেন:

"অন্য সব রিপুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘৃণাই—এ পর্যন্ত লিখেছ?" একটু থেমে এক টিপ নস্যি নিয়ে আবার নতুন উদ্যমে শুরু করলেন, "সব চাইতে ঘৃণাই হল অ-কৃ-ত-জ্ঞ-তা'.. বড় হাতের I হবে।"

শেষ কথাটা লিখে আমি তার দিকে তাকালাম।

মনের গভীর ভাবের প্রকাশক এই সংক্ষিপ্ত বচনটিকে তিনি নানা স্বরে অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে বারকয়েক উচ্চারণ করলেন। তারপর আমাদের জন্য ইতিহাসের পড়া ঠিক করে দিয়ে জানালার পাশে গিয়ে বসলেন। তার মুখখানি এখন আর আগের মত বিরস নেই; যেন তার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তার যথোচিত প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে—এমনি একটা ভাব সেখানে ফুটে উঠেছে।

পৌনে একটা বাজল; কিন্তু আমাদের ছুটি দেবার ইচ্ছা যেন কার্ল আইভানিচের নেই; তার বদলে তিনি আমাদের নতুন পড়া দিলেন।

অবসাদ ও ক্ষুধা সমানে বেড়ে চলেছে। অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে এমন ইঙ্গিত লক্ষ্য করতে লাগলাম যাতে বোঝা যায় যে, ডিনারের সময় হয়ে গেছে। ঝাড়ন নিয়ে মেয়েটি প্লেট ধুতে এল; সাইড বোর্ডের উপর প্লেটের ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ শুনতে পেলাম। টেবিল সরানো ও চেয়ার পাতার শব্দ কানে এল; তারপর লিউবচ্‌কা ও কাতেংকাকে (কাতেংকা মিমির বারো বছরের মেয়ে) সঙ্গে নিয়ে মিমি বাগান থেকে এল; কিন্তু খানসামা ফোকার দেখা নেই; সেই তো সর্বদা এসে জানায় যে ডিনার প্রস্তুত। আর তখনই কার্ল আই-ভানিচের দিকে না তাকিয়েই আমরা বইপত্র একপাশে সরিয়ে রেখে ছুটে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যাই।

এতক্ষণে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল, কিন্তু এতো ফোকা নয়। তার পায়ের শব্দ আমি ভালই চিনি, তার বুটের ঘস্টানি শুনলেই বুঝতে পারি। দরজাটা খুলে গেল, আর আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি মূর্তি দেখা দিল।

অধ্যায়—৫

তীর্থযাত্রী

বছর পঞ্চাশ বয়সের একটি লোক ঘরে ঢুকল; লম্বা, ম্লান মুখটা বসন্তের দাগে ভর্তি, মাথায় লম্বা পাকা চুল, অল্প লাল্‌চে দাড়ি। লোকটি এত

লম্বা যে দরজা দিয়ে ঢুকতে শুধু মাথাই নয়, পুরো শরীরটাই নোয়াতে হল। পরনের ছেঁড়া পোশাকটা কাফ্‌তান ও জোব্বা দুইয়ের মতই দেখতে; হাতে একটা মস্তবড় লাঠি। ঘরে ঢুকবার সময় সেটা দিয়ে সজোরে মেঝেতে আঘাত করতে লাগল। হাঁ করে ভুরু কুঁচকে ভয়ংকর ও অস্বাভাবিকভাবে হেসে উঠল। লোকটির এক চোখ অন্ধ; সাদা মণিটা অনবরত লাফাচ্ছে; ফলে তার কুৎসিৎ মুখটা আরও বিশ্রী দেখাচ্ছে।

"আহ্হা, তোমাকে পেয়ে গেছি!" লোকটি চেঁচিয়ে বলে উঠল; তারপরই ছোট ছোট পা ফেলে ভলদিয়ার কাছে ছুটে গিয়ে তার মাথাটা ধরে মনোযোগ দিয়ে তার কপালটা পরীক্ষা করতে লাগল। তারপর অত্যন্ত গম্ভীর মুখে তাকে ছেড়ে দিয়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল এবং তেল-কাপড়ের নীচে ফুঁ দিতে দিতে তার উপরে ক্রুশা-চিহ্ন আঁকতে লাগল। "ওঃ-ও, কী লজ্জা! ওঃ-ও, কী দুঃখ! ওরা চলে যাবে!" আবেগভরে ভলদিয়ার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে অশ্রু-কাঁপা গলায় সে বলল। সত্যি সত্যি তার চোখে জল এসে গেল; আস্তিন দিয়ে চোখের জল মুছতে লাগল।

তার কণ্ঠস্বর রুক্ষ ও কঠোর; চলাফেরা দ্রুত ও আকস্মিক; কথাবার্তা অর্থহীন ও অসংলগ্ন; কিন্তু তার কণ্ঠস্বর এতই করুণ, কুৎসিৎ হলদে মুখটা মাঝে মাঝে এমন আন্তরিক রকমের বিষণ্ণ হয়ে ওঠে যে, তার কথা শুনলে করুণা, ভয় ও দুঃখের একটা মিশ্র অনুভূতিকে চেপে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

লোকটি তীর্থযাত্রী গ্রিসা।

কোথা থেকে এসেছে? কে তার বাবা-মা? কেন সে বেছে নিয়েছে এই তীর্থযাত্রীর জীবন? কেউ তা জানে না। আমি শুধু জানি, পনেরো বছর বয়স থেকেই সে খালি পায়ে ভাঁড়ের মত শীত-গ্রীষ্মে সমানভাবে ঘুরে বেড়ায়, মঠে-মঠে যাতায়াত করে, যাদের মনে ধরে তাদের ছোট ছোট দেবমূর্তি দেয়, আর এমন সব রহস্যজনক কথা বলে যাকে লোকে দৈববাণী বলে মেনে নেয়; এছাড়া তার অন্য কোন পরিচয় কেউ জানে না; মাঝে মাঝে দিদিমার কাছে যায়; কেউ বলে সে ধনী বাবা-মার এক অভাগা সন্তান, তার মনটা পবিত্র ও সাধুর মত; আবার কেউ বলে সে একটা অকর্মা চাষীমাত্র।

অবশেষে বহু-প্রতীক্ষিত ফোকা ঠিক সময়ে এসে হাজির হল, আর আমরাও নীচে নেমে গেলাম। গ্রিশা তখনও ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর আবোল-তাবোল বকে চলেছে। সেও আমাদের পিছু নিল, আর সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে তার লাঠিটা সজোরে ঠুকতে লাগল। নীচু গলায় কথা বলতে বলতে হাত ধরাধরি করে বাপি ও মামণি বসার ঘরে ঢুকল। মারিয়া আইভানভ্‌না বেশ গুছিয়ে একটা হাতল-চেয়ারে বসল; যে সব মেয়েরা তার পাশে বসল নীচু, কঠিন গলায় তাদের বকতে লাগল। কার্ল আইভানিচ ঘরে ঢুকলে

তার দিকে একবার তাকিয়েই সে সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিল; তার মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল যার অর্থ করা যেতে পারে, "কার্ল আইভানিচ, তুমি আমার দৃষ্টিপাতের যোগ্য নও।" মেয়েদের চোখ দেখেই বোঝা গেল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আমাদের জানাবার জন্য তারা ব্যগ্র হয়ে পড়েছে; কিন্তু লাফিয়ে আমাদের কাছে চলে এলে সেটা মিমির বিধান লংঘনের সামিল হবে। আমাদেরই আগে গিয়ে তাকে বলতে হবে, "বঁজুর মিমি!" গায়ে পড়ে আলাপ করতে হবে; তবেই মিলবে কথাবার্তা বলার অনুমতি।

মিমি যে কী অসহ্য জীব! তার সামনে কোন কথা বলা অসম্ভব: তার কাছে সব কিছুই অন্যায়। তাছাড়া, সে আমাদের সব সময় ফরাসীতে কথা বলতে প্ররোচিত করে, আর তাও যেন ঈর্ষাবশতই ঠিক যখন আমরা রুশ ভাষায় কথা বলতে চাই। অথবা ডিনারে বসে যখন সবে মৌজ করে খেতে শুরু করেছি, যখন একা থাকতেই ভাল লাগছে, তখনই এসে সে ফরাসী ভাষায় বক্‌বক্ শুরু করে দেবে। কিন্তু আমাদের নিয়ে তার এত মাথাব্যথা কেন? তিনি তার মেয়েদের নিয়ে থাকুন—আমাদের দেখাশুনার জন্য তো কার্ল আইভানিচই আছেন। তিনি যে কোন কোন মানুষকে ঘৃণা করেন আমি তার পূর্ণ অংশীদার।"

বড়রা খাবার ঘরে চলে গেলে কাতেংকা আমার জামা টেনে ধরে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "মামণিকে বল না আমাদের শিকারে নিয়ে যেতে।"

"ঠিক আছে; চেষ্টা করব।"

গ্রিশাও খাবার ঘরেই খেতে বসল, কিন্তু আলাদা করে একটা ছোট টেবিলে; সে থালা থেকে চোখও তুলছে না, নানা রকম ভয়ংকর মুখভঙ্গী করছে, মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, নিজের মনেই তো-তো করে বলছে; "কী দুঃখের কথা—মেয়েটা তো উড়ে চলল……কপোতী পাখা মেলবে স্বর্গের পথে···আঃ, কবরে একটা পাথরও রয়েছে!" ইত্যাদি।

সকাল থেকেই মামণির মনের অবস্থা খারাপ; গ্রিসার উপস্থিতি, তার কথাবার্তা, তার আচরণ তাকে আরও বিচলিত করে তুলেছে।

ঝোলের পাত্রটা বাপির হাতে তুলে দিয়ে মামণি বলল, "হ্যাঁ, তোমাকে একটা কথা বলতেই ভুলে গেছি।"

"কি কথা?"

"দয়া করে তোমার ওই বাঘা কুকুরগুলোকে বেঁধে রাখ; গ্রিশা যখন উঠোন পার হচ্ছিল তখন তাকে কামড়ে দিয়েছিল আর কি। আর ছেলেমেয়েদেরও তো আক্রমণ করতে পারে।"

নিজের নাম শুনে গ্রিশা টেবিলের দিকে চোখ ফেরাল, এবং পোশাকের ছেঁড়া অংশগুলো দেখিয়ে মুখ-ভর্তি খাবার নিয়ে কথা বলতে

লাগল।

"কামড়ে মেরে ফেলতেই চেয়েছিল……ঈশ্বরই ঠেকিয়েছেন……কুকুর লেলিয়ে দেওয়াটা পাপ! মেরো না বল্‌শাক (গ্রাম-প্রধান)……ঈশ্বর ক্ষমা করবেন·· এখন তো দিনকাল বদলেছে।"

কঠোর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বাপি শুধাল, "ও কি বলছে? আমি তো একটা কথাও বুঝতে পারছি না।"

মামণি জবাব দিল, "দেখ—আমি বুঝতে পারি। ও বলছে, কয়েকজন শিকারী ওর বিরুদ্ধে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল যাতে কুকুরগুলো ওকে কামড়ে মেরে ফেলে, আর তোমাকে মিনতি করছি, এ জন্য তুমি তাদের শাস্তি দিও না।

বাপি বলল, "ওঃ, এই কথা। ও কি করে জানল যে আমি তাদের শাস্তি দেব?" তারপর ফরাসীতে বলল, "তুমি তো জান এইসব ভদ্রলোকদের জন্য আমার কোন গদগদ ভাব নেই; আর বিশেষ করে একে তো আমি মোটেই ভাল চোখে দেখি না—"

মামণি সভয়ে বাধা দিয়ে বলল, "না, না, ও কথা বলো না। ওর সম্পর্কে তুমি কিই বা জান?"

"আমি তো মনে করি এই সব লোকদের কথা জানবার যথেষ্ট সুযোগ আমার হয়েছে: তাদের অনেকেই তো তোমার কাছে আসে। ওরা সকলেই এক। বার বার সেই একই কাহিনী।"

বোঝা গেল, এ বিষয়ে মামণির ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা, কিন্তু সে তর্ক করতে চাইল না।

মামণি বলল, "আমাকে একটা প্যাটি দাও। আজ ওটা ভাল হয়েছে তো?"

একটা প্যাটি হাতে নিয়ে মামণির দিকে তুলে ধরে বাপি বলল, "বুদ্ধিমান ও রুচিবান লোকরা যে ওদের ফাঁদে পা দেয় তা দেখে আমার খুব কষ্ট হয়।"

হাতের কাঁটাটা দিয়ে সে টেবিলটা ঠুকল।

হাত বাড়িয়ে মামণি বলল, "তোমাকে তো বললাম একটা প্যাটি আমার হাতে দিতে।"

হাতটা আরও সরিয়ে নিয়ে বাপি বলল, "এসব লোকদের যে গ্রেপ্তার করে সেটা ভালই করে। তাদের একমাত্র কাজই তো কিছু মানুষের দুর্বল স্নায়ুকে বিপর্যস্ত করে দেওয়া।" তারপর কথাগুলি শুনে মামণি খুবই দুঃখ পাচ্ছে দেখে প্যাটিটা তার হাতে দিল।

"এ বিষয়ে আমার শুধু একটা কথাই বলার আছে: ষাট বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও যে মানুষটা শীতে-গ্রীষ্মে খালি পায়ে চলে, পোশাকের তলে দুই পুড

ওজনের একটা শেকল পড়ে থাকে, কখনও সেটা খুলে রাখে না, সহজ ও আরামের জীবন যাপনের প্রস্তাব যে একাধিকবার প্রত্যাখ্যান করেছে—সে যে কেবলমাত্র আলস্যবশতই এসব করে সেটা বিশ্বাস করা শক্ত।"

একটু থেমে মামণি আরও বলল, "আর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা, 'Je suis payee pour y croie ; আমার তো মনে হয় তোমাকে বলেছি, বাপির মৃত্যুর দিন-ক্ষণ সবই কিরয়ুশা আগে থেকেই বলে দিয়েছিল।"

দুঃখের ভান করে মুখের উপর হাত রেখে বাপি হেসে বলল, "হায় প্রিয়ে, তুমি আমার এ কী করলে! তার পদযুগলের কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে কেন? আমি তো দেখে ফেলেছি, আর তো আমার খাবার জুটবে না।"

ডিনার প্রায় শেষ হয়ে এল। লিউবচ্‌কা ও কাতেংকা তাদের চেয়ারে নড়েচড়ে বারবার আমাদের দিকে চোখ টিপছে আর চাঞ্চল্য প্রকাশ করছে। অবশ্য চোখ টেপার অর্থ: "আমাদের শিকারে নিয়ে যাবার কথা বলছ না কেন?" কনুই দিয়ে ভলদিয়াকে গুঁতো মারলাম; ভলদিয়া আমাকে গুঁতো মারল, তারপর সাহস সঞ্চয় করে প্রথমে ভীরু গলায় ও পরে বেশ উচ্চ দৃঢ় গলায় বলল, যেহেতু আমরা আজই চলে যাচ্ছি, তাই আমরা চাই যে মেয়েদেরও একই গাড়িতে আমাদের সঙ্গে শিকারে নিয়ে যাওয়া হোক। বড়দের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরে আমাদের স্বপক্ষেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল; আর যেটা সব চাইতে খুশির কথা, মামণি বলল যে সেও আমাদের সঙ্গে যাবে।

অধ্যায়—৬

শিকারের প্রস্তুতি

ফল-মিষ্টি পরিবেশনের সময় ইয়াকভকে ডেকে এনে গাড়ি, কুকুর, জিন-পরানো ঘোড়া—সব কিছুর বন্দোবস্ত করার হুকুম দেওয়া হল; সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলা হল, এমনকি প্রতিটি ঘোড়ার নাম পর্যন্ত বলে দেওয়া হল।

ডিনার শেষ হল; বড়রা কফি খেতে লাইব্রেরিতে গেল, আর আমরা এক ছুটে বাগানে চলে গেলাম। সেখানে অনেক কথা হল, কিন্তু আমাদের চলে যাওয়া সম্পর্কে একটা কথাও কেউ বলল না। আমাদের আলোচনায় বাধা দিয়ে গাড়ি এসে পড়ল; তার পিছনেই এল শিকারীরা তাদের কুকুর নিয়ে, এল কোচয়ান ইগ্‌নাত। সে সব দেখে নয়ন সার্থক করতে আমরা ফটকে ছুটে গেলাম।

দিনটা গরম; সারা সকাল নানা বিচিত্র আকৃতির সাদা মেঘের দল

দিগন্তের কোলে ভেসে বেড়াচ্ছে; পরে একটা হাল্কা হাওয়ায় সেগুলো ক্রমেই কাছে আসতে লাগল, আর মাঝে মাঝেই সূর্যকে ঢেকে দিতে লাগল। কিন্তু সে মেঘের রং ও আনাগোনা দেখেই বোঝা গেল সেগুলো জমে কোন বজ্রগর্ভ ঝড়ের সৃষ্টি করবে না; আর আমাদের শেষ দিনের আনন্দটাও মাটি হবে না। সন্ধ্যার দিকে মেঘগুলো আবার সরে গেল: কিছু মেঘ হাল্কা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, কিছু পালিয়ে গেল দিগন্তের দিকে; বাকিরা ঠিক মাথার উপরে সাদা, স্বচ্ছ মাছের আঁসের মত রূপ ধরল; শুধু একখণ্ড কালো বড় মেঘ তখনও পূব দিকে রয়ে গেল। বিভিন্ন ধরনের মেঘ কোথায় যায় কার্ল আইভানিচ সেটা ভালই জানেন; তিনি জানালেন, এ মেঘ মাস্‌লভ্‌কার দিকে চলে যাবে, এখানে বৃষ্টি হবে না, আর আবহাওয়া ভালই থাকবে।

বেশ বয়স হলেও কোকা চটপট সিঁড়ি দিয়ে নেমে চেঁচিয়ে বলল, "গাড়ি এগিয়ে নিয়ে এস।" মহিলারা এগিয়ে গেল, কে কোন্‌দিকে বসবে, কে কাকে জড়িয়ে ধরবে, এই নিয়ে কিছু কথা-কাটাকাটির পরে সকলেই বসে পড়ল, হাতের ছোট ছাতা মেলে ধরল, আর গাড়িও ছেড়ে দিল।

আমি আবার ঘোড়ায় চেপে বসলাম।

একটি শিকারী বলল, "দেখবেন, কুকুরগুলোকে চাপা দেবেন না।"

আমি সগর্বে জবাব দিলাম, "কোন চিন্তা করো না—আমি আগেও ঘোড়ায় চেপেছি।"

ভলদিয়া একটা শিকারী ঘোড়ায় চাপল। তাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে—ঠিক যেন একটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। তার উরু দুটি জিনের উপর এমন সুন্দর চেপে বসেছে যে, তাকে আমার ঈর্ষা হল—বিশেষ করে আমার ছায়াটা দেখেই আমি বুঝতে পারলাম যে আমাকে অতটা সুন্দর দেখাচ্ছে না।

তারপর সিঁড়িতে বাপির পায়ের শব্দ শোনা গেল; ওভারশিয়ার সবগুলো কুকুর এনে জড়ো করল।

বাপি ঘোড়ায় চাপল; আর আমাদের যাত্রা শুরু হল।

অধ্যায়—৭
শিকার

প্রধান শিকারীর নাম তুর্কা; সকলের আগে একটা গাঢ়-ধূসর রঙের ঘোড়ায় চড়ে সে চলেছে; মাথায় লোমের টুপি, কাঁধে ঝোলানো মস্তবড় শিঙা, আর কোমরবন্ধে ছুরি। তার হিংস্র গম্ভীর চেহারা দেখলে যে কেউ মনে করবে সে বুঝি মারাত্মক কোন যুদ্ধে চলেছে, একটা সৌখীন শিকারে নয়। তার ঘোড়ার পিছু পিছু চলেছে নানা রঙের একপাল শিকারী কুকুর।

ফটক থেকে বেরিয়ে আমাদের ও চাকরদের রাস্তা ধরে ঘোড়া চালাবার হুকুম দিয়ে বাপি নিজে যবের ক্ষেতের পথ ধরল।

ফসল কাটার পুরো মরশুম চলছে। যতদূর চোখ যায় তাকেও ছাড়িয়ে একদিকে বিস্তৃত হয়ে আছে ঝকঝকে হলুদ মাঠ; তার একেবারে শেষ প্রান্তে মস্ত নীল অরণ্য; তখন আমি ভাবতাম সেই অনেক দূরে রহস্যময় জায়গায় পৌঁছে পৃথিবীটা শেষ হয়ে গেছে, অথবা সেখান থেকে শুরু হয়েছে কোন জনবসতিহীন অঞ্চল। সারা মাঠে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে খড়ের আঁটি আর নানা লোকজন। নানা মানুষের কলগুঞ্জন, ঘোড়া ও গাড়ির আওয়াজ, ভারুই পাখির মিষ্টি শিস, নিশ্চল ঝাঁক বেঁধে বাতাসে ভেসে বেড়ানো পতঙ্গের গুনগুন শব্দ, কাঠ, খড় ও ঘোড়ার ঘামের গন্ধ, মাঠের উজ্জ্বল হলুদ নাড়ার উপর জ্বলন্ত সূর্যের কিরণ পড়ে হাজারো বিচিত্র রং ও ছায়ার খেলা, দূর অরণ্যের নীলিমা আর বিবর্ণ লাইলাক ফুলের মত মেঘ, সাদা লূতাতন্তু বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে, নয়তো নাড়ার উপর ছড়িয়ে আছে—এসবই আমি দেখলাম, শুনলাম, অনুভব করলাম।

কালিনভো জঙ্গলে পৌঁছে দেখলাম, গাড়িটা আগেই পৌঁছে গেছে, আর—যেটা আমরা মোটেই আশা করিনি— একটা গাড়ির উপর খানসামা বসে আছে। খড়ের নীচ থেকে সামোভারটা উঁকি দিচ্ছে; দেখা যাচ্ছে বরফের বাক্স ও আরও নানা ঝুড়ি-ঝোড়া। এসব দেখে ভুল হবার কোন কারণ নেই; খোলা হাওয়ায় বসে আমরা চা, আইসক্রিম ও ফল খেতে পাব। গাড়িটা দেখেই আনন্দে চীৎকার করে উঠলাম। জঙ্গলের মধ্যে ঘাসের উপর বসে চা খাওয়া, বিশেষ করে এমন একটা জায়গায় যেখানে এর আগে আর কেউ চা খায় নি—তার মজাই আলাদা।

ছোট জঙ্গলটার কাছে এসে তুর্কা থামল, বাপির সব নির্দেশ মনযোগ দিয়ে শুনল (যদিও সেগুলি সে কখনও মেনে চলে না, নিজের ইচ্ছামতই কাজ করে)। তারপর কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে ছোট বার্চ-গাছগুলির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। ছাড়া পেয়ে কুকুরগুলিও আনন্দে লেজ নাড়তে নাড়তে মাটি শুঁকে শুঁকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

"তোমার কাছে রুমাল আছে?" বাপি শুধাল।

পকেট থেকে রুমাল বের করে তাকে দেখালাম।

"ঠিক আছে, এই ধূসর কুকুরটার গলায় বেঁধে দাও।"

"ঝিরান?" আমি সব-জান্তা ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করলাম।

"হ্যাঁ; এবার রাস্তা ধরে ছুট লাগাও। ছোট মাঠটায় পৌঁছে থামবে, চারদিকে তাকাবে; আর একটা খরগোস না নিয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে না।"

ঝিরানের লোমশ গলায় রুমালটা জড়িয়ে দিয়ে রুদ্ধশ্বাস গতিতে নির্দিষ্ট

জায়গাটার উদ্দেশ্যে ছুটতে লাগলাম। বাপি হাসতে হাসতে পিছন থেকে বলে উঠল :

"আরও জোরে, আরও জোরে, নইলে তোমার দেরী হয়ে যাবে।"

ঝিরান মাঝে মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়ে, কান খাড়া করে শিকারের আওয়াজ শুনতে থাকে। সব শক্তি দিয়ে টেনেও তাকে নড়াতে পারি না। শেষ পর্যন্ত যেই না চেঁচিয়ে বললাম "তাল্লি-হো! হাল্লু।" অমনি সে এমন জোরে ছুটতে শুরু করে দিল যে, আমি তাকে ধরে রাখতেই পারলাম না। গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার আগে একাধিকবার মাটিতে পড়ে গেলাম। একটা মস্তবড় ওক গাছের শেকড়ের নীচে সমতল ছায়াময় জায়গা বেছে নিয়ে ঘাসের উপর শুয়ে পড়লাম। ঝিরানকেও পাশেই শুইয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ওক গাছটার খোলা শেকড়ের চারদিকে অসংখ্য পিঁপড়ের ভিড়। তারা দল বেঁধে এগিয়ে চলেছে; কারও পিঠে বোঝা, কেউ বা চলেছে শূন্য পিঠে। একদৃষ্টিতে তাদের দিকেই তাকিয়ে আছি এমন সময় হল্‌দে পাখাওয়ালা একটা প্রজাপতি উড়ে এসে আমার মনকে টেনে নিল। দেখতে না দেখতেই প্রজাপতিটা উড়ে গিয়ে একটা সাদা বুনো ঘাসের উপর কয়েকটা পাক খেয়ে তার উপরেই বসে পড়ল। সেটা কি সূর্যের কিরণে শরীরটা গরম করে নিচ্ছে, না কি ঘাসের বুক থেকে রস টানছে তা জানি না, কিন্তু প্রজা-পতিটা যে খুব মজা পাচ্ছে তা বুঝতে পারলাম। মাঝে মাঝেই পাখা নেড়ে নেড়ে ফুলের আরও কাছে চেপে বসেছে, আর তারপরেই চুপ করে থাকছে। দুই হাতের মধ্যে মাথাটা রেখে মনের আনন্দে সেই দিকেই তাকিয়ে রইলাম।

হঠাৎ ঝিরান চীৎকার শুরু করে দিল; এমন জোরে টান দিল যে আমি উল্টে পড়ে গেলাম। মুখ তুলে তাকালাম। জঙ্গলের ধার ঘেঁসে একটা খরগোস লাফিয়ে চলেছে, একটা কান ঝুলছে, একটা কান খাড়া। মাথায় রক্ত চড়ে গেল; সেই মুহূর্তে সবকিছু ভুলে উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠলাম, কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়ে খরগোসটার দিকে ছুট দিলাম। কিন্তু মুহূর্তকাল পরে নিজের কাজের জন্যই আমার দুঃখ হল— খরগোসটা শুয়ে পড়ে একটা লাফ দিল; আর সেটাকে দেখতে পেলাম না।

কিন্তু যখন দেখতে পেলাম শিকারী কুকুরগুলো পিছন পিছন এসে একটা জঙ্গলের পিছন থেকে তুর্কা দেখা দিল তখন আর আমার আপশোসের শেষ রইল না। আমার ভুলটা সে বুঝতে পেরেছে (অপেক্ষা না করাটাই আমার ভুল হয়েছিল), ঘৃণার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল: "**Ekh, barin**! (মালিক)। বাস, ঐ পর্যন্তই, কিন্তু তার কথার সুরে মনে হল, সে যদি খরগোসের মত আমাকে তার জিনের সঙ্গে ঝুলিয়ে নিত সেও যে ছিল ভাল।

গভীর হতাশায় সেই একই স্থানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। কুকুরটাকে

ডাকলাম না; তুই উরু চাপড়ে বার বার "হায়, আমি কী করলাম!" এই কথাটা বলা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলাম না।

দূরে শিকারী কুকুরগুলোর চলার শব্দ শুনতে পেলাম; তারা জঙ্গলের অপর পারে খরগোসটাকে মেরে ফেলল, সে শব্দও শুনলাম; লম্বা চাবুকের শব্দ করে তুর্কা তাদের ডেকে নিল তাও শুনলাম; তবু সে জায়গাটা থেকে একটুও নড়তে পারলাম না।

অধ্যায়—৮

খেলাধুলা

শিকার-পর্ব শেষ হল। ছোট বার্চ গাছগুলোর ছায়ায় একটা কার্পেট বিছিয়ে সকলে গোল হয়ে বসল। খানসামা গাভ্রিলো পায়ের নীচে ঘন সবুজ ঘাস মাড়িয়ে প্লেটগুলো মুছল, কুল ও পিচ-ফলের ঝুড়িগুলো খালি করল। বার্চ গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে কাঁপা কাঁপা ছায়া ফেলল কার্পেটের নক্সার উপর, আমার পায়ের উপর, এমন কি গাভ্রিলের ঘামে-ভেজা টাক-মাথার উপর। একটা ঠাণ্ডা ফুরফুরে হাওয়া পাতার ফাঁক দিয়ে এসে আমার চুল ও মুখের উপর খেলা করতে লাগল।

বরফ ও ফল সাবার করার পরে কি নিয়ে আর কার্পেটে বসে থাকা যায়; অগত্যা সূর্যের বাঁকা অথচ গরম কিরণের মধ্যেই আমরা খেলতে নেমে গেলাম।

চোখ মিট্মিট্ করে সূর্যের দিকে তাকিয়ে ঘাসের উপর লাফাতে লাফাতে লিউবচ্কা বলল, "এবার কি করা হবে? এস, আমরা 'রবিন্সন' খেলি।"

ঘাসের উপর গড়িয়ে একটা পাতা চিবুতে চিবুতে ভলদিয়া বলল, "না, ওটা বিরক্তিকর; আমরা তো সব সময়ই 'রবিন্সন' খেলি। যদি খেলতেই চাও, চল, একটা কুঞ্জবন তৈরি করি।"

ভলদিয়া খুব একটা ভারিক্কি চাল দেখাচ্ছে; হয়তো তার মধ্যে কল্পনার অভাব আছে বলেই সে 'রবিন্সন' খেলাটা ভালবাসে না। এ খেলাটা হল কিছুদিন আগে পড়া "রবিন্সন স্যুইসে" (দি স্যুইস ফ্যামিলি রবিন্সন) বইয়ের বিভিন্ন দৃশ্যের অভিনয় করা।

"তাই খেলা যাক....আমাদের খাতিরে তাই খেল," মেয়েরা পীড়াপীড়ি করতে লাগল। ভলদিয়ার আস্তিন ধরে টানতে টানতে কাতেংকা বলল, "তুমি চার্লস হয়ো, আর্নেস্ট হয়ো, বা বাবা হয়ো, যা তোমার খুশি।"

আত্মতুষ্টির হাসি হেসে ভলদিয়া বলল, "সত্যি আমি খেলতে চাই না; ওটা আমার খুবই বিরক্তিকর লাগে।"

চোখের জল ফেলে লিউবচ্‌কা বলল, "কেউ যখন খেলতে চাইছে না তখন বাড়িতে থাকলেই তো ভাল হয়।"

লিউবচ্‌কা বড়ই ছিচকাঁদুনে মেয়ে।

"তাহলে চল; শুধু দয়া করে কেঁদো না। আমি সইতে পারি না।"

ভলদিয়ার এই অনুগ্রহ আমাদের মোটেই ভাল লাগল না: বরং তার এই অলস ভাবভঙ্গী খেলাটার মজাই নষ্ট করে দিল।

আমরা সকলেই যখন মাটিতে বসে পড়ে একটা মৎস-শিকারে যাবার দৃশ্য কল্পনা করে প্রাণপণে বৈঠা চালাতে শুরু করলাম, ভলদিয়া তখন হাত গুটিয়ে এমনভাবে বসে রইল যাকে ছেলেদের ভঙ্গী কোন মতেই বলা চলে না। আবার আমি যখন শিকারে যাবার অভিনয় করতে একটা লাঠি কাঁধের উপর ফেলে জঙ্গলের পথে যাত্রা করলাম, ভলদিয়া তখন দুই হাতের উপর মাথা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল, আর আমাকে বলল আমি যেন ধরে নেই যে সেও আমার সঙ্গেই চলেছে। এই ধরনের কথাবার্তা ও আচরণের ফলে খেলার উৎসাহে ভাটা পড়ল; আমরা খুবই অসন্তুষ্ট হলাম: আরও বেশী অসন্তুষ্ট হলাম এই কারণে যে, আমাদেরও মনে হল ভলদিয়া হয় তো ঠিক কথাই বলেছে।

আমি তো নিজেও জানি, একটা পাখিকে মারা তো দূরের কথা, হাতের লাঠিটা দিয়ে সেটাকে আঘাত করাও অসম্ভব। কিন্তু এটা একটা খেলা বৈ তো নয়। সেভাবে তর্ক করলে তো চেয়ারটাকে ঘোড়া মনে করেও তাতে সওয়ার হওয়া যায় না। কিন্তু, আমি মনে মনে বললাম, ভলদিয়ার তো মনে থাকা উচিত যে অনেক শীতের সন্ধ্যায় একটা হাতল-চেয়ারকে কাপড় দিয়ে ঘিরে আমরা একখানা "ক্যালাস" (নীচু গাড়ি) বানিয়েছি; তাতে কেউ চড়ে বসেছে কোচয়ান হয়ে, কেউ বা পরিচারক হয়ে, আর মেয়েদের মাঝখানে বসিয়ে আমরা ভ্রমণে বেরিয়েছি। পথে কত রকমের উত্তেজনাপূর্ণ অভিযান চালিয়েছি। তাতে শীতের সন্ধ্যাগুলো কত আনন্দে, কত তাড়াতাড়ি কেটে গেছে! তুমি যদি বাস্তবের কথা বল, তাহলে কোন খেলাই হয় না। আর খেলাধুলাই যদি না হল, তাহলে আর রইল কি?

অধ্যায়—৯

প্রথম প্রেমের মত

গাছ থেকে কিছু মার্কিন ফল পাড়বার ভান করে লিউবচ্‌কা মস্ত বড় একটা শুঁয়োপোকা সমেত গাছের পাতাটা ছিঁড়েই ভয়ে সেটাকে মাটিতে ফেলে দিল, দুই হাত তুলে একলাফে পিছিয়ে গেল; যেন সে ভয় পেয়েছে যে শুঁয়োপোকাটা

হয় তো তার গায়ে বিষ ছড়িয়ে দেবে। খেলা বন্ধ হয়ে গেল ; অদ্ভুত প্রাণীটাকে ভাল করে দেখবার জন্য সকলেই মাথা নীচু করলাম ; মাথায় মাথা লেগে গেল।

শুঁয়োপোকাটার সামনে একটা পাতা মেলে ধরে তার উপর সেটাকে তুলে নেবার চেষ্টা করল কাতেংকা। আমি তার কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়ে সব দেখছিলাম।

পোকাটার উপর উপুড় হবার সময় কাতেংকা ঘাড়টাকে একটা ঝাঁকুনি দিল, আর তার ফলে তার নীচু-গলার ফ্রকটা একটুখানি সরে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে এক ঝলক বাতাস রুমালটাকেও তার সাদা গলার উপর থেকে উড়িয়ে দিল। তার ছোট কাঁধটা তখন আমার ঠোঁট থেকে মাত্র দু'আঙুল দূরে। আমার চোখ তখন আর পোকাটার উপর নেই : আমি একদৃষ্টিতে কাতেংকার কাঁধের দিকেই তাকিয়ে রইলাম, আর তারপরেই প্রাণপণ শক্তিতে সেখানে চুমো খেলাম। সে মুখ ফেরাল না, কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম তার গলা কান লাল হয়ে উঠেছে। ভলদিয়া মাথা না তুলেই ঘৃণার সঙ্গে বলে উঠল :

"কী নরম!"

কিন্তু আমার চোখ তখন জলে ভরে উঠেছে।

কাতেংকার দিক থেকে চোখ আর ফেরাতে পারি না। তার ছোট তাজা মুখখানি অনেক দিন দেখেছি, ভালবেসেছি। কিন্তু এখন আরও মন দিয়ে মুখখানির দিকে তাকালাম, আরও বেশী ভাল লাগল।

বড়দের সঙ্গে যখন মিলিত হলাম তখন বাপি ঘোষণা করল যে, মামণির অনুরোধে আমাদের যাত্রা পরের দিন পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা সকলেই খুব খুশি।

ঘোড়ায় চেপে গাড়ির পাশাপাশি আমরা বাড়ি ফিরলাম। ভলদিয়ার ও আমি পাশাপাশি চলেছি ; কে ভাল ঘোড়সওয়ার, কার সাহস বেশী, তাই দেখতে দুজনই ব্যস্ত। আমার ছায়াটা আগের চাইতে দীর্ঘতর দেখাচ্ছে, আর তাই দেখে আমি কল্পনা করে নিলাম যে, আমাকে একজন ভাল অশ্বারোহীর মতই দেখাচ্ছে ; কিন্তু পরবর্তী ঘটনা অচিরেই আমার সে আত্মতুষ্টিকে ভেঙে চুরমার করে দিল। যারা গাড়িতে যাচ্ছে তাদের সকলকেই তাক লাগিয়ে দেবার জন্য আমি একটু পিছিয়ে পড়েছি ; তারপরেই কাঁটা মেরে চাবুক চালিয়ে আমার ঘোড়াটাকে জোড় কদমে ছুটিয়ে দিলাম ; মনের ইচ্ছা, যেদিকে কাতেংকা বসেছে সেই পাশ দিয়ে ঘূর্ণিবাতাসের মত ছুটে চলে যাব। কিন্তু চুপচাপ ঘোড়া ছুটিয়ে যাব, নাকি পাশ কাটাবার সময় একটা চীৎকার করব—মনে মনে সেটাই স্থির করবার চেষ্টা করছি এমন সময় আমার বোকা ঘোড়াটা গাড়ির ঘোড়াগুলির পাশাপাশি পৌঁছেই এমন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ থেমে গেল যে, আমি জিনের

উপর থেকে ছিটকে গলার উপর গিয়ে পড়লাম এবং তার পিঠের উপর থেকে উল্টে পড়ে গেলাম।

অধ্যায়—১০

আমার বাবা কেমন লোক ছিলেন?

তিনি ছিলেন বিগত শতাব্দীর মানুষ; সে সময়কার অন্য সব যুবকদের মতই তার চরিত্রেও ছিল বীরত্ব, উত্তম, আত্মপ্রত্যয়, সাহসিকতা ও লাম্পট্যের এক অবর্ণনীয় মিশ্রণ। বর্তমান প্রজন্মকে তিনি ঘৃণার চোখেই দেখেন: তার কারণ যতটা তার সহজাত গর্ববোধ ঠিক ততটাই তার মনের এই গোপন বিক্ষোভ প্রসূত যে একসময়ে সকলের উপর যে প্রভাব তিনি বিস্তার করেছিলেন আর যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন এখন আর সেই প্রভাব ও সাফল্যলাভের ক্ষমতা তার নেই। তার জীবনের প্রধান নেশাই ছিল তাস আর মেয়েমানুষ। সারাটা জীবনে তাসের আড্ডায় তিনি জিতেছেন লক্ষ লক্ষ, আর নানা শ্রেণীর অসংখ্য নারীর সংস্পর্শেও এসেছেন।

দীর্ঘ, রাজোচিত চেহারা, অদ্ভুত রুচিবান আচরণ, কাঁধ ঝাঁকুনি দেবার অভ্যাস, সর্বদা হাসিমাখা দুটি চোখ, মস্ত বাঁকা নাক, চাপা ঠোঁট, আধ আধ কথা ও একটি টাক মাথা বাবার সম্পর্কে প্রথম যে স্মৃতি আমার মনে আছে তাতে এই তার চেহারা; আর এই চেহারা নিয়েই শ্রেণী ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকল মানুষের ভালবাসা তিনি অর্জন করেছিলেন।

সকলের উপরে কেমন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তা তিনি জানতেন। যদিও কোন সময়ই তিনি সমাজের সর্বোচ্চ মহলের লোক ছিলেন না, তবু সেই মহলেই তিনি চলাফেরা করতেন এবং সকলের শ্রদ্ধা আদায় করে নিতে পারতেন। কতটা অহংকার ও আত্মপ্রত্যয় অন্যকে আঘাত না দিয়ে জগতের চোখে তাকে শ্রদ্ধার আসনটি এনে দেবে তার সঠিক পরিমাপ তিনি জানতেন। তার মৌলিকতা ছিল, আর প্রয়োজন হলে বংশমর্যাদা ও অর্থের প্রতিবর্ত হিসাবে সেই মৌলিকতাকে তিনি ব্যবহার করতেন। এ জগতে কোন কিছুই তার মনে বিস্ময় জাগাত না: যত উচ্চপদেই আসীন হোক না কেন সেটাকেই তিনি তার জন্মগত অধিকার বলে মনে করতেন। ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ জীবনের অপেক্ষাকৃত অন্ধকার দিকটিকে অপরের কাছ থেকে, এমন কি নিজের কাছ থেকেও লুকিয়ে রাখবার এমন একটা ক্ষমতা তার ছিল যাকে ঈর্ষা না করে পারা যায় না।

যাকিছু আরাম ও সুখ এনে দিতে পারে তিনি ছিলেন তারই পৃষ্ঠপোষক, আর কেমন করে তাকে কাজে লাগাতে হয় তাও তিনি ভাল করেই

জানতেন। বড় বড় আত্মীয়-বন্ধুদের ব্যাপারে তার গর্বের সীমা ছিল না: এই আত্মীয়তা-বন্ধুত্ব তিনি অর্জন করেছিলেন কতকটা আমার মার সঙ্গে বিবাহসূত্রে, আর কতকটা তার যৌবনকালের সঙ্গীদের মাধ্যমে; অবশ্য মনে মনে তাদের সকলের বিরুদ্ধেই তিনি একটা ক্ষোভ পোষণ করেন, কারণ তারা সকলেই পদ-মর্যাদায় অনেক উপরে উঠে গেলেও তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত লেফ্টেন্যান্টই রয়ে গেলেন। সব প্রাক্তন অফিসারদের মতই কেতামাফিক পোশাক পরতে তিনি জানতেন না; তবু তার পোশাক ছিল মৌলিক ও রুচিসম্মত। সব সময়ই ঢিলে ও হাল্কা পোশাক পরতেন, সেরা মানের কাপড় ব্যবহার করতেন, বড় বড় কাফ ও কলার উল্টে পরতেন। বস্তুত তিনি যা কিছু পরতেন সেটাই তার দীর্ঘ, পেশীবহুল দেহ, তার টাক মাথা, তার শান্ত, আত্মপ্রত্যয়শীল চাল-চলনের সঙ্গে মানিয়ে যেত। তিনি ছিলেন খুবই অনুভূতিশীল, আর সহজেই কেঁদে ফেলতেন। গলা ছেড়ে কোন করুণ কিছু পড়তে বসলেই তার গলা কাঁপত, চোখে জল আসত, বিরক্ত হয়ে বই রেখে দিতেন। সঙ্গীত ভালবাসতেন, নিজের পিয়ানো বাজিয়ে বন্ধু এ-র লেখা প্রেম-সঙ্গীত গাইতেন, আর গাইতেন কিছু জিপসি-গীতি ও অপেরার সুর; কিন্তু গুরুগম্ভীর সঙ্গীতের ধার ধারতেন না; জনমতকে উপেক্ষা করে খোলাখুলিই বলে দিতেন যে বিঠোভেন-এর সোনাতা শুনলে তার ঘুম পায়; অথবা মাদাম সেমেনভ্নার গাওয়া "কুমারীর ঘুম ভাঙিও না" এবং জিপ্সি মেয়ে তানিউশার গাওয়া "তুমি ছাড়া কেউ নয়"-এর চাইতে উঁচুদরের গান তার জানা নেই। কোন রকম নীতিবোধ তার ছিল কিনা বলা কঠিন। সব রকম আবেগ-উত্তেজনা নিয়ে তার জীবন এতই পরিপূর্ণ ছিল যে ওসব কথা ভাববার সময়ই তার ছিল না, আর নিজের জীবন নিয়ে তিনি এত সুখী ছিলেন যে, সেসব ভাববার কোন দরকারও বোধ করতেন না।

যত বড় হতে লাগলেন, ততই জীবন সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ও একটা কঠোর আচরণ-বিধি গড়ে তুললেন, যদিও সেটা ছিল একান্তভাবেই বাস্তবতামুখী। জীবনে যেসব কাজ ও আচরণ তাকে আনন্দ ও সুখ এনে দিত তার কাছে সেটাই ছিল ভাল; তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সকলেই সেটাকে অনুসরণ করতে বাধ্য। তিনি খুব বাকপটু ছিলেন, আর আমার মনে হয় এই গুণটিই তার মতামতকে অতিমাত্রায় নমনীয় করে তুলত: একই কাজকে তিনি আকর্ষণীয় কৌতুক অথবা পুরোপুরি শয়তানীরূপে তুলে ধরতে পারতেন।

অধ্যায়—১১

পড়ার ঘরে ও বসার ঘরে

যখন বাড়ি ফিরলাম তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। মামণি স্বয়ং পিয়ানোতে বসেছে; আমরা কেউবা কাগজ, পেন্সিল ও রং নিয়ে গোল টেবিলটাতে বসে গেলাম আঁকার জন্য। আমার শুধু নীল রংই ছিল; তবু তাই দিয়েই আমি শিকারের ছবি আঁকতে লাগলাম। নীল ঘোড়ার উপর একটি নীল ছেলে ও কয়েকটা নীল কুকুর অত্যন্ত তাড়াতাড়ি এঁকে ফেললাম; কিন্তু নীল খরগোস আঁকা যায় কিনা ঠিক বুঝতে না পেরে লাইব্রেরিতে বাপির কাছে গেলাম পরামর্শ করতে। বাপি পড়ছিল, "নীল খরগোস কি আছে?" আমার এই প্রশ্নের জবাবে বলল, "হ্যাঁ বাবা আছে।" গোল টেবিলে ফিরে গিয়ে একটা নীল খরগোস আঁকলাম, তারপর মনে হল ওটাকে ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার। ঝোপটা ঠিক পছন্দ হল না; ঝোপটার বদলে একটা গাছ আঁকলাম, গাছটাকে বদ্‌লে খড়ের গাদা আঁকলাম এবং খড়ের গাদাকে বদ্‌লে মেঘ, শেষ পর্যন্ত পুরো পাতাটাকেই নীল রং মেখে এমন নোংরা করে ফেললাম যে বিরক্ত হয়ে কাগজ ছিঁড়ে ফেলে বড় হাতল-চেয়ারে শুয়ে একটা ঘুম দিতে চলে গেলাম।

মামণি তার শিক্ষক ফিল্ড-এর "দ্বিতীয় কনসার্টো' বাজাচ্ছে। আমার চোখে স্বপ্ন নেমে এল: কল্পনায় ভেসে উঠল ভৌতিক সব স্বপ্ন-মূর্তি। তারপর সে বাজাল বীঠোভেন-এর "সোনাতা পাথেতিক," আর আমার স্মৃতিগুলো বিষণ্ণ ও দুঃখময় হয়ে উঠল।

আমার ঠিক উল্টো দিকে পড়ার ঘরের দরজা। ইয়াকভ ঘরে ঢুকল, এবং কাফতান পরা আরও কয়েকটি লম্বা দাড়িওয়ালা লোক। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ভাবলাম, "এবার কাজকর্ম শুরু হল।" আমার ধারণা, পড়ার ঘরে যে সব কাজকর্ম হয় তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছু পৃথিবীতে থাকতে পারে না, কারণ পড়ার ঘরে যারাই ঢোকে তারাই পা টিপে টিপে হাঁটে আর ফিসফিস করে কথা বলে। দরজা দিয়ে বাপির দরাজ গলা ভেসে এল। সেই সঙ্গে এল চুরুটের গন্ধ; কেন জানি না ঐ গন্ধটা আমাকে উত্তেজিত করে তোলে। হাতল-চেয়ারে ঢুলতে ঢুলতে খানসামার ভাঁড়ার ঘরে বুটের পরিচিত ঘস্টানির শব্দ শুনতে পেলাম। মুখে দৃঢ় সংকল্পের আভাষ নিয়ে এবং হাতে কিছু কাগজপত্র নিয়ে কার্ল আইভানিচ পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে পাল্লায় আস্তে টোকা দিলেন। তাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দরজাটা আবার সশব্দে বন্ধ করা হল।

ভাবলাম, "আশা করি খারাপ কিছু ঘটবে না। কার্ল আইভানিচ রেগে আছেন; যা কিছু করে বসতে পারেন।"

আবার চোখে ঢুলুনি এল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক কিছু ঘটল না। ঘণ্টাখানেক পরে বুটের সেই একই শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। কার্ল আইভানিচ পড়ার ঘর থেকে রুমালে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন—তার দুই চোখে অশ্রু টলমল করছে—নিজের মনে কি যেন বলতে বলতে দোতলায় উঠে গেলেন। তারপরে বাপি বসার ঘরে এল। মামণির কাঁধে হাত রেখে খুশি হয়ে বলল, "এইমাত্র কি স্থির করলাম জান?"

"কি গো?"

"ছেলেদের সঙ্গে কার্ল আইভানিচকেও নিয়ে যাব। 'ব্রিৎস্কা'-তে (খোলা গাড়ি) তার জায়গাও হয়ে যাবে। ছেলেরা তার কাছে পড়তে অভ্যস্ত, আর সেও ওদের খুব ভালবাসে। বছরে সাত রুবল এমন কিছু বেশী নয়।"

মামণি বলল, "আমি খুব খুশি হয়েছি; ছেলেদের জন্যও আর তার জন্যও: বুড়ো বড় ভাল মানুষ।"

"আমি যখন তাকে বললাম যে উপহার হিসাবে সে পাঁচশ' রুবল রাখতে পারে তখন তার চাঞ্চল্য যদি দেখতে! আর সব চাইতে মজার জিনিস এই হিসাবটা; এইমাত্র সে এটা আমাকে দিয়ে গেল। একটা দেখার মত জিনিস," হেসে কথাটা বলে কার্ল আইভানিচের হাতে লেখা একটা ফর্দ বাপি মার হাতে দিল: "মজার ব্যাপার।"

ফর্দে লেখা ছিল:

"ছেলেদের জন্য দুটো বড়শি, সত্তর কোপেক।

"উপহারের বাক্স তৈরির জন্য রঙিন কাগজ, সোনালী পাড়, একটা চাপ-যন্ত্র ও আঠা, ছ' রুবল পঞ্চান্ন কোপেক।

"ছেলেদের উপহার একখানা বই ও একটা ধনুক, আট রুবল ষোল কোপেক।

"নিকলাইর জন্য ট্রাউজার, চার রুবল।

"পিয়তর আলেক্সান্দ্রভিচ ১৮—সালে মস্কো থেকে আমার জন্য একটা সোনার ঘড়ি কিনে আনবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, একশ' চল্লিশ রুবল।

"বেতন ছাড়াও কার্ল ময়ের-এর মোট পাওনা, একশ' উনষাট রুবল উনআশি কোপেক।"

এই যে ফর্দটা যাতে কার্ল আইভানিচ দেখিয়েছেন, উপহার দিতে যে টাকাটা তিনি খরচ করেছেন তা ছাড়াও তাকে যে উপহার দেওয়া হবে বলে কথা দেওয়া হয়েছিল সে টাকাটাও তাকে দিতে হবে, এটা পড়বার পরে যে কোন মানুষ ভাবতে পারে যে কার্ল আইভানিচ একটি অর্থলোভী, কঠোর হৃদয়, আত্মকেন্দ্রিক মানুষ ছাড়া আর কিছুই না,—কিন্তু সেটা ভাবলে খুব ভুল করা হবে।

এই ফর্দ হাতে নিয়ে এবং একটা বক্তৃতাকে মাথার মধ্যে তৈরি করে নিয়ে তিনি যখন পড়ার ঘরে ঢুকলেন তখন তার ইচ্ছা ছিল এ বাড়িতে যত কষ্ট তিনি সহ্য করেছেন সব কথা বাপিকে খুলে বলবেন; আবেগে আপ্লুত গলায় তিনি যখন বলতে শুরু করলেন তখন নিজের কথা শুনে নিজেই এতখানি বিচলিত হয়ে পড়লেন যে যেখানে তার বলবার কথা "ছেলেদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া যতই কষ্টকর হোক," সেখানে পৌঁছেই তিনি একেবারে ভেঙে পড়লেন, তার গলা কাঁপতে লাগল, পকেট থেকে ডোবা-কাটা রুমালটা বের করতে বাধ্য হলেন।

অশ্রুসিক্ত গলায় বললেন, "হ্যাঁ প্রিয়তর আলেক্সান্দ্রিচ, ছেলেদের সঙ্গে এতই জড়িয়ে পড়েছি যে তাদের ছেড়ে গিয়ে আমি যে কি করব তা জানি না। বিনা বেতনেই আমাকে থাকতে দিন," এক হাতে চোখের জল মুছে অন্য হাতে হিসাবটা এগিয়ে দিয়ে তিনি কথা শেষ করলেন।

কার্ল আইভানিচের দয়ালু হৃদয়ের খবর রাখি বলেই আমি জানি তার কথাগুলি খুবই আন্তরিক; কিন্তু তার এই কথাগুলির সঙ্গে ঐ হিসাবটাকে তিনি কেমন করে মেলালেন সেটাই আমার কাছে আজও একটা রহস্য হয়েই আছে।

তার কাঁধটা চাপড়ে দিয়ে বাপি বলল, "এটা যেমন তোমার পক্ষে কষ্টকর, তোমাকে ছেড়ে দেওয়াটা আমার পক্ষে আরও বেশী কষ্টকর। আমি আমার মত পাল্টেছি।"

নৈশ ভোজনের কিছু আগে গ্রিশা ঘরে ঢুকল। এ বাড়িতে আসার পর থেকেই তার দীর্ঘশ্বাস ও কান্নার বিরাম নেই; আর যারা তার ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতায় বিশ্বাস করে তাদের মতে সেটাই স্পষ্ট লক্ষণ যে আমাদের কোন বিপদ আসন্ন। শেষ পর্যন্ত পরদিন সকালেই চলে যাবার বাসনা জানিয়ে সে বিদায় নিল। ভলদিয়াকে চোখ টিপে আমিও ঘর থেকে চলে গেলাম।

"ব্যাপার কি?"

"যদি গ্রিশার শেকল দেখতে চাও তো উপরে চল। দ্বিতীয় ঘরে গ্রিশা ঘুমোয়। গুদাম-ঘর থেকে আমরা সব কিছু দেখতে পারব।"

"চমৎকার! এখানে অপেক্ষা কর; মেয়েদের ডেকে আনি।"

মেয়েরা ছুটে এল; আমরা উপরে উঠে গেলাম। কে প্রথম যাবে তা নিয়ে কিছু আলোচনার পরে আমরা অন্ধকার চিলে-কোঠায় ঢুকে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অধ্যায়—১২

গ্রিশা

অন্ধকার যেন আমাদের সকলের উপর চেপে বসল : এক সাথে মাথাগুঁজে বসে রইলাম ; কারও মুখে কথা নেই।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশব্দ পায়ে গ্রিশা তার ঘরে ঢুকল। তার এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে পিতলের মোমবাতিদানে একটা চর্বি-বাতি। আমরা শ্বাসরোধ করে বসে আছি।

"প্রভু যীশুখৃস্ট! ঈশ্বরের পবিত্র জননী! পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা!" নানা সুরে, নানা সংক্ষিপ্ত আকারে কথাগুলি সে বারবার আবৃত্তি করতে লাগল।

প্রার্থনা করতে করতেই লাঠিটা ঘরের এককোণে রেখে, বিছানাটা ভাল করে দেখে নিয়ে, সে পোশাক ছাড়তে শুরু করল। প্রথমে কালো পুরনো কোমরবন্ধটা খুলল, শতচ্ছিন্ন গেরুয়া আলখাল্লাটা ছাড়ল, সেটাকে সযত্নে ভাঁজ করে চেয়ারের পিঠের উপর রেখে দিল। এখন আর তার মুখে সেই স্বাভাবিক দ্রুততা ও বোকামির চিহ্ন নেই। বরং মুখটা এখন শান্ত, বিষণ্ণ, এমন কি মহনীয়। চলাফেরা যথাযথ ও সুচিন্তিত।

তলবাসমাত্র পরে সে আস্তে বিছানায় বসল, বিছানার চারদিকে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল এবং ভুরু কুঁচকে বেশ চেষ্টা করে শার্টের নীচেকার শেকলটাকে ঠিক করে নিল। কিছুক্ষণ সেখানে বসে থেকে জামার কয়েকটা ছেঁড়া জায়গা ভাল করে পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াল, মোমবাতি দশটাকে পূজাবেদীর সমান উচ্চতায় তুলল। সেখানে রাখা দেবমূর্তিগুলোর সামনে প্রার্থনা করল, ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল, তারপর বাতিটাকে উপুড় করে ধরল। দপ্ দপ্ করে বাতিটা নিভে গেল।

জানালা দিয়ে প্রায় ভরা চাঁদের আলো এসে পড়ল। চাঁদের ম্লান রূপোলি আলো লোকটির দীর্ঘ সাদা মূর্তির একটা পাশে পড়ল ; তার অন্য পাশটা গাঢ় আঁধারে ঢাকা। নীচের উঠোন থেকে পাহারাওয়ালার খট্‌খট্ শব্দ ভেসে এল।

বড় বড় হাত দুটো বুকের উপর ভাঁজ করে, মাথাটা নুইয়ে মূর্তিগুলোর সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে গ্রিশা অবিরাম দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল ; তারপর একটু কষ্ট করে হাঁটু ভেঙে বসে প্রার্থনা করতে লাগল।

প্রার্থনার কথাগুলি অসংলগ্ন, কিন্তু মর্মস্পর্শী। সব উপকারীর (যারা তাকে আশ্রয় দেয় তাদেরই সে উপকারী বলে) জন্য সে প্রার্থনা করল ; তাদের মধ্যে মামণি ও আমরাও আছি ; তারপর নিজের জন্য প্রার্থনা করল, নিজের মহাপাপের জন্য ঈশ্বরের ক্ষমাভিক্ষা করল ; আর বলল, "হে ঈশ্বর, আমার শত্রুদের তুমি ক্ষমা কর।" আর্তনাদ করে উঠে দাঁড়াল, বার বার একই কথা উচ্চারণ করল, আবার মেঝেতে বসে পড়ল, আবার উঠল ; মেঝেতে ঠোকা লেগে শেকলের ঝন্‌ঝন্ শব্দ হতে লাগল, কিন্তু শেকলের বোঝার কোন

খেয়ালই তার নেই।

ভলদিয়া আমার পায়ে জোরে চিমটি কাটল, কিন্তু আমি ফিরেও তাকালাম না: এক হাতে জায়গাটা ঘসতে ঘসতে শিশুসুলভ বিস্ময়, করুণা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রিশার প্রতিটি কথা ও ভঙ্গী অনুসরণ করতে লাগলাম।

গুদাম-ঘরে ঢুকবার সময় যে কৌতুক ও হাসির ব্যাপার আশা করেছিলাম তার পরিবর্তে বুকের মধ্যে একটা কাঁপন ও ডুবে যাওয়ার ভাব অনুভব করতে লাগলাম।

এই ধর্মীয় উচ্ছ্বাস ও তাৎক্ষণিক প্রার্থনা নিয়ে গ্রিশা দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দিল। বার বার বলতে লাগল, "প্রভু, দয়া কর" অথবা "দয়া কর প্রভু, কি আমার কর্তব্য তা শিখিয়ে দাও; কি অকর্তব্য তাও শিখিয়ে দাও প্রভু!" মাঝে মাঝে করুণ বিলাপও শুনতে পেলাম। এবার হাঁটু ভেঙে বসে, বুকের উপর দুই হাত আড়াআড়িভাবে রেখে চুপ করে রইল।

নিঃশব্দে আমি দরজা দিয়ে মুখটা বাড়ালাম, নিঃশ্বাস আটকে রাখলাম। গ্রিশা নিশ্চল; দীর্ঘশ্বাসে তার বুকটা ভেঙে যাচ্ছে; অন্ধ চোখের অস্পষ্ট মণিটার উপর এক বিন্দু অশ্রু চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে।

হঠাৎ অবর্ণনীয় ভঙ্গীতে সে চীৎকার করে উঠল, "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!" মেঝেতে কপাল ছুঁইয়ে শিশুর মত ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সেদিনের পর থেকে অনেক সময় পার হয়ে গেছে; অতীতের অনেক স্মৃতি আমার কাছে অর্থহীন হয়ে গেছে, স্বপ্নের মত আবছা ও অস্পষ্ট হয়ে গেছে, এমন কি তীর্থযাত্রী গ্রিশাও অনেক দিন আগেই তার তীর্থযাত্রা শেষ করেছে; কিন্তু সেদিন আমার মনের উপব যে দাগ সে কেটেছিল, যে অনুভূতি জাগিয়েছিল, তা আমার স্মৃতি থেকে কোন দিন বিলুপ্ত হবে না।

হে মহান খৃস্টভক্ত গ্রিশা! তোমার বিশ্বাস এত শক্তিশালী বলেই ঈশ্বরের উপস্থিতি তুমি অনুভব করতে পারতে; এতই মহৎ ছিল তোমার প্রেম যে আপনা থেকেই তোমার ঠোঁটে কথা ঝবে পডত। আর যখন কোন কথা খুঁজে না পেয়ে তুমি মেঝেতে শুয়ে পড়ে কাঁদতে তখন ঈশ্বরের মহত্ত্ব কী অপূর্ব গৌরবই না লাভ করত।

যে আবেগের সঙ্গে গ্রিশার কথাগুলি শুনলাম তা বেশীক্ষণ রইল না: প্রথমত, তখন আমার কৌতূহল মিটে গেছে, আর দ্বিতীয়ত, একভাবে বসে আমার পা দুটো তখন কাঠ হয়ে গেছে, আর আমার পিছনে অন্ধকারের মধ্যে তখন যে গুজ-গুজ ফিস-ফিস চলেছে তাতে যোগ দেবার ইচ্ছা জেগেছে আমার মনে। একজন আমার হাতটা ধরে বলল, "এটা কার হাত?" সব অন্ধকার, তবু হাতের স্পর্শ ও ফিসফিসানি থেকেই বুঝতে পারল সে কাতেংকা।

সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই কনুই পর্যন্ত ঢাকা আস্তিনশুদ্ধ তার হাতটা চেপে ধরে আমার ঠোঁটের উপর তুলে নিলাম। কাতেংকা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে

গিয়েছিল, কারণ একঝটকায় সে হাতটা সরিয়ে নিল, আর তার ফলে হাতটা ছিটকে গিয়ে ধাক্কা খেল একটা ভাঙা চেয়ারের সঙ্গে। গ্রিশা মাথা তুলল, প্রার্থনা করতে করতে চারদিকে তাকাল, ঘরের কোণে কোণে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকতে লাগল। নিজেদের মধ্যে জোরে ফিস্-ফিস্ করতে করতে আমরা সশব্দে চিলে-কোঠা থেকে ছুটে পালালাম।

অধ্যায়—১৩

নাতালিয়া সাবিশ্না

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নাতাশ্কা নামে একটা ছোট মেয়ে খাবারভ্কা গ্রামের উঠোনে ছুটোছুটি করে বেড়াত; পরনে ছেঁড়া পোশাক, খালি পা, কিন্তু মোটাসোটা চেহারা, গাল দুটি লাল, সব সময়ই হাসিখুশি। ঠাকুর্দা তাকে "উপরতলায়" নিয়ে তুললেন, অর্থাৎ মেয়েটির বাবা ভূমিদাস ক্ল্যারিওনেট-বাদক সাব্বার চাকরির সুবাদে ও তারই অনুরোধে মেয়েটিকে দিদিমার দাসীদের দলে ভর্তি করা হল। দাসী হিসাবে শান্ত স্বভাব ও কাজের উৎসাহের জন্য নাতাশ্কার বেশ সুনাম হল; ফলে মামণির জন্মের পরে যখন একজন নার্সের দরকার হল তখন সে কাজের ভার পড়ল নাতাশ্কার উপর; আর সেই নতুন কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রমশীলতা, বিশ্বস্ততা ও ছোট্ট মনিবের প্রতি মনের টানের জন্য তার কপালে প্রশংসা ও পুরস্কার দুইই জুটল।

কাজকর্ম উপলক্ষ্যে তরুণ খানসামা ফোকার সঙ্গে নাতালিয়ার প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হত। আর তার ফলেই তার পাউডার-মাখা মাথা, পায়ের মোজা ও শক্তসমর্থ শরীর মেয়েটির সরল ও স্নেহশীল মনকে জয় করে ফেলল। ভালবাসার সাহসে ভর করে মেয়েটি নিজেই ঠাকুর্দার কাছে গিয়ে ফোকাকে বিয়ে করার অনুমতি চাইল। এই অনুরোধকে অকৃতজ্ঞতা বিবেচনা করে ঠাকুর্দা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিল, আর শাস্তিস্বরূপ নিজেরই তৃণাঞ্চলের একটা গ্রামে পাঠিয়ে দিল গো-রাখালের কাজ করতে। কিন্তু ছ' মাসের মধ্যে যখন তার জায়গায় কোন ভাল লোক পাওয়া গেল না তখন নাতালিয়াকে আবার তার পুরনো কাজেই ফিরিয়ে আনা হল। ফিরে এসে নাতালিয়া ঠাকুর্দার কাছে গেল, তার পায়ের উপর পড়ে মিনতি জানাল, আগেকার অনুগ্রহ ও স্নেহের মধ্যেই তাকে ফিরিয়ে নেওয়া হোক; কথা দিল, ও ভুল সে আর কখনও করবে না। মেয়েটি তার কথা রেখেছে।

সেদিন থেকেই নাতাশ্কা হয়ে গেল নাতালিয়া সাবিশ্না, তার মাথায় উঠল একটা টুপি। নিজের ভালবাসার সব ভাণ্ডার নতুন কর্ত্রীর উপর উজাড় করে ঢেলে দিল।

পরবর্তীকালে গভর্নেস এসে যখন তার জায়গাটা জুড়ে বসল, তখন

গৃহস্থালি দেখাশুনার কাজটাই তাকে দেওয়া হল; জামা কাপড় ও খাবার-দাবারের সব ভার তার উপরেই পড়ল। সেই একই অনুরাগ ও উৎসাহের সঙ্গে এই নতুন কর্তব্যও সে পালন করতে লাগল। মনিবের সম্পত্তি রক্ষাই হল তার ধ্যান-জ্ঞান; সর্বত্রই তার চোখে পড়ল অপচয়, সর্বনাশ ও ডাকাতি, আর তাকে প্রতিরোধ করাই হল তার অবধারিত কর্তব্য।

মামণির যখন বিয়ে হল তখন বিশ বছরের সেবা ও পরিবারের প্রতি অনুরাগের পুরস্কারস্বরূপ মামণি নাতালিয়া সাবিশ্‌নাকে কাছে ডেকে তার ভূয়সী প্রশংসা করে তার হাতে একখানি সরকারী দলিল দিয়ে জানিয়ে দিল যে সেদিন থেকে নাতালিয়া সাবিশ্‌না স্বাধীন হয়ে গেল, আর এবাড়িতে কাজ করুক আর নাই করুক বার্ষিক ৩০০ রুবল করে পেন্সন সে পাবে। নাতালিয়া সাবিশ্‌না চুপচাপ সব শুনল; তারপর দলিলটা হাতে নিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সেটাকে ভাল করে দেখল, তো-তো করে কি যেন বলল এবং ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; যাবার সময় দরজাটাকে সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে গেল। তার এই অদ্ভুত আচরণে বিস্মিত হয়ে মামণি নাতালিয়ার ঘরে গেল। দেখল, সে সিন্দুকের উপর বসে আছে, দুই চোখ থেকে জল ঝরছে, আঙুল দিয়ে রুমালটা নাড়াচাড়া করছে, আর মেঝের উপর ছড়ানো মুক্তি-দলিলের ছেঁড়া টুকরোগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

তার হাত ধরে মামণি শুধাল, "কি হয়েছে রে নাতালিয়া সাবিশ্‌না ?"

সে জবাব দিল, "কিছুই হয় নি দিদিমা। আমাকে নিশ্চয় আপনার আর ভাল লাগছে না, তাই তো আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। বেশ তো, আমি চলেই যাব।"

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে অনেক কষ্টে চোখের জল চেপে সে ঘর থেকে চলে যেতে চাইল; কিন্তু মামণি তাকে আটকে দিল, তাকে জড়িয়ে ধরল, আর দুজনই কাঁদতে বসল।

যেদিন থেকে আমি পুরনো কথা মনে করতে শিখেছি তখন থেকেই নাতালিয়া সাবিশ্‌না ও তার ভালবাসা ও মমতার কথা আমার মনে পড়ে; তবু শুধু এখনই সে স্মৃতির মূল্য দিতে আমি শিখেছি—এই বৃদ্ধা নারীটি যে কী এক বিরল আশ্চর্য অস্তিত্ব সে কথা তখন আমার মাথায়ই আসে নি। সে যে মুখে কখনও নিজের কথা বলত না তাই নয়, নিজের কথা সে কখনও ভাবতও না: তার সারাটা জীবনই ছিল ভালবাসা ও আত্মত্যাগ। তার নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও মমতায় আমি এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে অন্য রকম কিছু কল্পনাই করতে পারতাম না; তার প্রতি কোন কৃতজ্ঞতা বোধও আমার ছিল না; একবারও ভেবে দেখি নি সে সুখে আছে কি না।

প্রায়ই কোন না কোন অজুহাতে আমি পাড়া ছেড়ে এক ছুটে তার ঘরে

চলে যেতাম এবং তার উপস্থিতিতে কোন রকম সংকোচ বোধ না করে গলা ছেড়ে যত রাজ্যের কল্পনার জাল বুনতে শুরু করে দিতাম। সে সর্বদাই কোন না কোন কাজে ব্যস্ত থাকত: হয় একটা মোজা বুনছে, না হয় তো ঘর ভর্তি সিন্দুকগুলি পরিষ্কার করছে, অথবা জামাকাপড়ের হিসাব করছে। কাজ করতে করতেই সে আমার যত সব আগড়ম-বাগড়ম কথা মন দিয়ে শুনত। আমি হয় তো বলতাম, "যখন সেনাপতি হব তখন এক পরমা সুন্দরীকে বিয়ে করব, নিজের জন্য একটা লাল-ধূসর ঘোড়া কিনব, একটা স্ফটিকের বাড়ি বানাব। আর স্যাকসনি থেকে কার্ল আইভানিচের সব আত্মীয়দের নিয়ে আসব" ইত্যাদি; তখন সে বলত, "ঠিক সোনা, ঠিক।" সেখান থেকে বিদায় নেবার সময় সে একটা নীল রঙের সিন্দুক খুলত, যতদূর মনে পড়ে সেই সিন্দুকের ডালার ভিতর দিকের ডালার উপর পমেড-বাক্স থেকে তুলে নেওয়া জনৈক হুজারের একটা ছবি এবং ভলদিয়ার আঁকা একটা ছবি সাঁটা ছিল—আর সিন্দুকের ভিতর থেকে একটা ধূপকাঠি বের করে সেটা জ্বালিয়ে দিয়ে নাড়তে নাড়তে বলত:

"এটা হচ্ছে ওচাকভ ধূপ। তোমার পরলোকগত ঠাকুর্দা—তার আত্মা শান্তি লাভ করুক।—তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়ে সেখান থেকে এটা এনেছিলেন। এটাই শেষ কাঠি।" সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলত।

নাতালিয়া সাবিশ্‌নার ঘরভর্তি সিন্দুকগুলোর মধ্যে সব কিছু থাকত। কারও কিছু দরকার হলেই আমরা বলতাম, "নাতালিয়া সাবিশ্‌নাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে," আর সত্যি সত্যি একটু খুঁজে পেতেই সে জিনিসগুলো পেয়ে যেত। বলত, "দেখেছি লুকিয়ে রেখে ভালই করেছি।"

একবার সে আমাকে খুব রাগিয়ে দিয়েছিল। ব্যাপারটা এই। ডিনারের সময় নিজের জন্য কৃভাস ঢালতে গিয়ে ডিকেণ্টারটা হাত থেকে ফেলে দিয়েছিলাম; ফলে টেবিল-ঢাকনাটা নোংরা হয়ে যায়।

মামণি বলল, "নাতালিয়া সাবিশ্‌নাকে ডাক, সে এসে তার আদরের খোকার কীর্তিটা দেখুক।"

নাতালিয়া সাবিশ্‌না এসে আমার কাণ্ড-কারখানা দেখে মাথা নাড়তে লাগল; মামণি তার কানে কানে কি যেন বলল, আর আমার দিকে আঙুল নাড়তে নাড়তে সে বেরিয়ে গেল।

ডিনারের পরে মনের সুখে লাফাতে লাফাতে হল-ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম, এমন সময় নাতালিয়া সাবিশ্‌না টেবিল-ঢাকনাটা হাতে নিয়ে হঠাৎ এক লাফে দরজার পাশ থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে ধরে ফেলল, এবং প্রাণপণে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও ঢাকনাটার ভেজা অংশ দিয়ে আমার মুখটা ঘসতে ঘসতে বলল, "কখনও টেবিল-ঢাকনা নোংরা করো না। কখনও টেবিল-ঢাকনা নোংরা করো না।" আমি রাগে গর্জে উঠলাম।

"ভেজা টেবিল-ঢাকনা দিয়ে আমাকে আঘাত করার সাহস তার হল কেমন করে। আমি কি একটা ছোকরা চাকর?" ঘরময় হাঁটতে হাঁটতে চোখের জল গলা দিয়ে নামিয়ে আমি নিজের মনেই বলতে লাগলাম। "কী ভয়ংকর!"

সে যখন দেখল যে আমি কাঁদছি তখন আমাকে সেখানে রেখেই সে ছুটে চলে গেল। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এসে ভীরু পায়ে আমার কাছে এল, আমাকে শান্ত করতে চেষ্টা করল।

"শোন সোনা, কেঁদো না। আমাকে ক্ষমা কর, আমি একটা বোকা বুড়ি। দোষ তো আমার। তুমি আমাকে ক্ষমা করলে তো লক্ষ্মীসোনা? এই নাও, এটা তোমার জন্য।"

রুমালের ভিতর থেকে সে একটা লাল কাগজের প্যাকেট বের করল; তার মধ্যে ছিল দুটো মেঠাই আর একটা ডুমুর; কাঁপা হাত বাড়িয়ে সেগুলো আমাকে দিল। দয়ালু বুড়িটার মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না; মুখ ঘুরিয়ে তার উপহার নিলাম; নতুন করে চোখে জল এল—এবার রাগে নয়, ভালবাসায় ও লজ্জায়।

অধ্যায়—১৪
বিদায় বেলায়

যেদিনের ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হল তার পরদিন বেলা বারোটায় কালাশ ও ব্রিৎচ্‌কা দুয়ারে দাঁড়িয়ে। নিকলাই দেশভ্রমণের পোশাক পরেছে—অর্থাৎ, ট্রাউজার বুটের মধ্যে গুঁজে দিয়েছে, পুরনো কোটের উপর কোমরবন্ধটা কসে বেঁধেছে। ব্রিৎচ্‌কার পাশে দাঁড়িয়ে সে আসনগুলোর নীচে ওভার-কোট ও কুশনগুলো ভরছে; একটার পর একটা চাপাতে চাপাতে যখন বেশী উঁচু হয়ে যাচ্ছে তখন নিজে কুশনের উপর বসে লাফিয়ে লাফিয়ে সেগুলিকে চেপে দিচ্ছে।

কালাশের ভিতর থেকে মুখ বের করে বাপির খানসামা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "ঈশ্বরের দোহাই নিকলাই দিমিত্রিচ, মালিকের বাক্সটা কি ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে পারি? বেশী জায়গা নেবে না।"

একটা গাঠরিকে প্রাণপণ শক্তিতে ব্রিৎচ্‌কার মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে নিকলাই রেগেমেগে তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "একথা আগে বলা উচিত ছিল মিখেই আইভানিচ। হা প্রভু, আমার মাথাটা ঘুরছে, আর তুমি এলে তোমার বাক্স নিয়ে!" টুপি খুলে সে রোদে-পোড়া ভুরুর উপর থেকে ঘামের বড় বড় ফোঁটাগুলি মুছে ফেলল।

চাকররা কোট, কাফ্‌তান ও শার্ট গায়ে টুপিহীন অবস্থায়, আর

ডোরাকাটা পেটিকোট ও ডোরা-কাটা পোশাক পরা মেয়েরা ছেলেমেয়ে কোলে নিয়ে খালিপায়ে ফটকে এসে দাঁড়িয়েছে, হাঁ করে গোছগাছ দেখছে, নিজেদের মত কথা বলছে। শিকারী কুকুরগুলো রোদে বসে হাঁফাচ্ছে; অন্যগুলো গাড়ির ছায়ায় ঘুরে ঘুরে চক্রদণ্ডের চর্বি চাটছে। এক ধরনের ধুলিমলিন কুয়াশায় বাতাস ভরে উঠেছে; দিগন্তে লিলাক ফুলের ধুসর রং লেগেছে; আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। জোরালো পশ্চিমা হাওয়ায় রাস্তা ও মাঠ থেকে ধুলির স্তম্ভ গড়ে উঠেছে, বাগানের উঁচু লিণ্ডেন ও বার্চগাছের মাথাগুলিকে নুইয়ে দিচ্ছে, শুকনো হল্‌দে পাতাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি জানালায় বসে অধৈর্য হয়ে এই সব উদ্যোগ-আয়োজন দেখছি।

শেষবারের মত কয়েকটা মিনিট একত্রে কাটাবার জন্য সকলে যখন বসার ঘরের বড় টেবিলটার চারদিকে সমবেত হল, তখনও আমি বুঝতে পারি নি যে একটা বেদনাদায়ক মুহূর্ত সমাগত। মনের মধ্যে যত সব তুচ্ছ চিন্তার আনাগোনা। অনুমান করতে চেষ্টা করলাম, কোন্ কোচয়ান কালাশ চালাবে, আর কে চালাবে ব্রিৎচ্‌কা; কে যাবে বাপির সঙ্গে, আর কেইবা যাবে কার্ল আইভানিচের সঙ্গে; আর আমাকেই বা একটা স্কার্ফ ও লম্বা ওভারকোটে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কেন।

"আমার স্বাস্থ্য কি এতই খারাপ? ঠাণ্ডায় আমি জমে যাচ্ছি না। এরা যদি একটু তাড়াতাড়ি গোছগাছটা সারতে পারত! আমার গাড়ি ছুটিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে।"

কান্নায় ফোলা চোখে একটা ফর্দ হাতে নিয়ে এসে নাতালিয়া সাবিশ্‌না মামণিকে বলল, "বাচ্চাদের পোশাকের ফর্দটা কাকে দেব?"

"নিকলাইকে দাও, আর বাচ্চাদের বিদায় দিয়ে যাও।"

বুড়ি কি যেন বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল, রুমালে মুখটা ঢেকে হাত নাড়তে নাড়তে ঘর থেকে চলে গেল।

তার গতিক দেখে আমার বুকটা ব্যথায় মুচড়ে উঠল, কিন্তু যাত্রার জন্য অধৈর্য ভাবটা তখন অনেক বেশী; তাই বাপি ও মামণির কথাবার্তাতেই কান দিলাম।

ফোকা এসে চৌকাঠে দাঁড়িয়েই ঘোষণা করল, "গাড়ি সব তৈরি"; যে সুরে সে ঘোষণা করে, "ডিনার তৈরি," ঠিক সেই সুর। লক্ষ্য করলাম, ঘোষণা শুনেই মামণি কেঁপে উঠল, ফ্যাকাসে হয়ে গেল, যেন এ ঘোষণা তার কাছে অপ্রত্যাশিত।

ফোকাকে সবগুলো দরজা বন্ধ করে দিতে বলা হল (দীর্ঘ ভ্রমণে যাত্রার আগে সব দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ এক সঙ্গে বসা একটা প্রাচীন রুশ প্রথা)। ব্যাপারটা আমার কাছে খুব হাস্যকর মনে হল, "আমরা সকলেই যেন কারও কাছ থেকে লুকিয়ে থাকছি।"

সকলে বসে পড়লে ফোকা নিজেও একটা চেয়ারের এক কোণে বসে পড়ল; কিন্তু সে বসামাত্রই দরজাটা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে উঠল; সকলে সে দিকে তাকাল। নাতালিয়া সাবিশ্‌না দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকে চোখ না তুলেই দরজার পাশে ফোকার সঙ্গে একই চেয়ারে বসে পড়ল। আমি যেন এখনও দেখতে পাই, ফোকার টাক মাথা আর ভাঁজ-পড়া নিশ্চল মুখ, বাঁকানো টুপিটার নীচে পরিদৃশ্যমান পাকা চুল। একই চেয়ারে ঠাসাঠাসি করে বসে তারাও যেন অপ্রস্তুত।

অধৈর্য হয়ে বসে রইলাম। বন্ধ ঘরের মধ্যে দশটা মিনিট যেন একটা ঘণ্টা বলে মনে হতে লাগল। অবশেষে সকলেই উঠলাম, ক্রুশ-চিহ্ন আঁকলাম, এবং বিদায় নিতে শুরু করলাম। বাপি মামণিকে জড়িয়ে ধরে বার কয়েক চুমো খেল।

বাপি বলল, "হয়েছে, হয়েছে গো। আমরা তো চিরদিনের মত বিদায় নিচ্ছি না।"

অশ্রুজলে কাঁপা স্বরে মামণি বলে উঠল, "তবু এ বড় বেদনাদায়ক।"

তার সেই গলা শুনে, তার কাঁপা ঠোঁট ও অশ্রুপূর্ণ চোখ দেখে আমি সব কিছু ভুলে গেলাম; এত কষ্ট হতে লাগল, মন এতই খারাপ হয়ে গেল যে মামণির কাছ থেকে বিদায় নেবার বদলে আমার পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম, বাপিকে আলিঙ্গন করার সময়ই মামণি আমাদের সকলের কাছ থেকেই বিদায় নিয়েছে।

সে ভলদিয়াকে এত বেশীবার চুমো খেল ও ক্রুশচিহ্ন আঁকল যে এবার আমার পালা আসবে ভেবে আমি এগিয়ে গেলাম। কিন্তু মামণি তখনও তাকেই বুকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করে চলেছে। অবশেষে আমিও তাকে আলিঙ্গন করলাম, তাকে জড়িয়ে ধরে কিছু না ভেবেই কেঁদে ফেললাম।

গাড়িতে উঠবার জন্য বাইরে যেতেই চাকররা একে একে এসে বিদায় জানাল। তাদের মুখে "দয়া করে আপনার হাতটা দিন স্যার," কাঠের উপর তাদের সশব্দে চুমো, তাদের মাথার চর্বির গন্ধ—সব মিলিয়ে ব্যাপারটা আমার কাছে বিরক্তিকরই বোধ হতে লাগল। সেই মনের অবস্থা নিয়েই আমি নাতালিয়া সাবিশ্‌নার মাথায় চুমো খেলাম। চোখের জলে ভেসে সে আমাকে বিদায় দিল।

কী আশ্চর্য যে এখনও পর্যন্ত সবগুলি চাকরের মুখ আমি যেন দেখতে পাই, তাদের সকলের মুখই ঠিক ঠিক আঁকতে পারি, কিন্তু মামণির মুখের ভাবটা আমার মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে; হয় তো এর কারণ সেই সময়ে আমি একটিবারের জন্যও তার মুখের দিকে সাহস করে তাকাতে পারি নি। আমার মনে হয়েছিল, তার মুখের দিকে তাকালেই তার ও আমার দুঃখ অসম্ভব রকমের বেড়ে যাবে।

সকলের আগে কালাশের কাছে ছুটে গিয়ে পিছনের আসনে বসে পড়লাম। "মামণিকে কি একবার শেষবারের মত দেখব, না দেখব না?" মনে মনে এই কথা বলে কালাশের ভিতর থেকেই মুখ বের করে ফটকের দিকে তাকালাম। ঠিক সেই মুহূর্তে ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে মামণিও গাড়িটির অন্য পাশে এসে আমার নাম ধরে ডাকল। পিছন থেকে তার গলা শুনে এত হঠাৎই মাথাটা ঘোরালাম যে দুজনের মাথায় ঠোকাঠুকি লাগল। বিষণ্ণ হাসি হেসে মামণি শেষবারের মত আমাকে আদর করে জড়িয়ে ধরে অনেকবার চুমো খেল।

গাড়িটা কয়েক গজ চলবার পরে তবে তার দিকে ফিরে তাকাবার সাহস পেলাম। মৃদু হাওয়ায় তার মাথার নীল রুমালটা সরে গেছে: দুই হাতে মুখ ঢেকে মাথাটা নীচু করে মামণি ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। ফোকা তাকে ধরে আছে।

বাপি নিঃশব্দে আমার পাশেই বসে আছে। চোখের জলে আমার গলা আটকে আসছে; গলার মধ্যে এমন একটা দলার মত বোধ হচ্ছে যে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাবে বলে ভয় হল। বড় রাস্তায় পড়ে আমরা দেখতে পেলাম বারান্দা থেকে কে যেন একটা সাদা রুমাল ওড়াচ্ছে। আমিও আমার রুমালটা ওড়ালাম, এবং তাতে যেন খানিকটা শান্ত হলাম। আমি তখনও কাঁদছি; এই কান্নাই যে আমার নরম মনের পরিচয় সে কথা ভেবে আনন্দ ও সান্ত্বনা পেলাম।

ভার্স্টখানেকের মত পথ চলবার পরে মন কিছুটা শান্ত হল; চোখের সামনে যা পড়ল তাই দেখতে দেখতে চলতে লাগলাম, আর মুখের উপর থেকে চোখের জল ভাল করে শুকিয়ে যাবার আগেই যে মাকে হয়তো বা চিরদিনের মত ছেড়ে এসেছি তার কথা মন থেকে অনেক দূরে সরে গেল, অথচ সব কথাতে বারবার তার কথাই মনে পড়তে লাগল। তারপরই হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আগের দিন বার্চ-বীথিতে একটা ব্যাঙের ছাতা নিয়ে লিউবচ্‌কা ও কাতেংকা কী রকম ঝগড়া করেছিল, আর বিদায় দেবার সময় তারা কী রকম কেঁদেছিল।

তাদের ছেড়ে, নাতালিয়া সাবিশ্‌নাকে ছেড়ে, বার্চ-বীথি ও ফোকাকে ছেড়ে যেতে আমার কত কষ্টই না হয়েছিল। এমন কি দুষ্ট মিমিকে ছেড়ে যেতে। তাদের কাউকে আর দেখতে পাবনা। আর বেচারি মামণি? আমার দুই চোখ জলে ভরে এল, কিন্তু সেও বেশীক্ষণের জন্য নয়।

অধ্যায়—১৫

শৈশব

আহা সুখের, কত সুখের শৈশব, সেই আনন্দময় কাল আর কোন দিন ফিরে আসবে না। তাকে ভাল না বেসে, তার উজ্জ্বল স্মৃতিকে বুকের মধ্যে

ধরে না রেখে কি পারি? সেই সব স্মৃতি আমাকে তাজা করে তোলে, আমার আত্মাকে উন্নত করে; তারা যে আমার কাছে অন্তহীন আনন্দের উৎস।

ছুটাছুটি করে ক্লান্ত হয়ে চায়ের টেবিলে আমার উঁচু চেয়ারটায় বসে আছি; অনেক আগেই এক পেয়ালা দুধ ও চিনি খাওয়া হয়ে গেছে; ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, তবু সেখান থেকে নড়ছি না—বসে বসে শুনছি। মামণি একজনের সঙ্গে কথা বলছে; তার গলাটা কী মিষ্টি। শুধু সেই শব্দই আমাকে কত কথাই না বলে। ঘুমে চোখ আবছা হয়ে আসছে; এক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, আর সঙ্গে সঙ্গে সে যেন ছোট, আরও ছোট হয়ে গেল—তার মুখটা এখন আর একটা ছোট বোতামের চাইতে বড় নয়, কিন্তু এখনও আমি মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দেখছি, আমার দিকে তাকিয়ে সে হাসছে। তাকে এত ছোট দেখতে ভাল্ লাগছে। চোখের মণির মধ্যে ছোট ছেলেদের যেমন দেখা যায় সে তাদের চেয়ে একটুও বড় নয়। আমি নড়েচড়ে বসতেই ছবিটা হারিয়ে গেল। চোখ দুটোকে পাকালাম, ঘোরালাম, সেই ছবিটাকে ফুটিয়ে তুলতে অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু সব বৃথা।

উঠে আরাম-কেদারায় আরাম করে বসলাম।

মামণি বলল, "তুমি আবার ঘুমতে যাও নিকোলেংকা; বরং দোতলায় চলে যাও।"

"শুতে ইচ্ছা করছে না মামণি," আমি বললাম; মিষ্টি, কুয়াশাঢাকা স্বপ্নরা মাথার মধ্যে ভিড় করে এল। শৈশবের স্বাস্থ্যপ্রদ ঘুমে চোখের পাতা নেমে আসে, মুহূর্তের মধ্যে চেতনা হারিয়ে যতক্ষণ কেউ ডেকে না তোলে ততক্ষণ ঘুমিয়ে থাকি। স্বপ্নের মধ্যেই বুঝতে পারি একজনের নরম হাত আমাকে স্পর্শ করল; স্পর্শে তাকে চিনতে পারি; ঘুমের মধ্যেই সে হাতটাকে চেপে ধরে কত, কত আদর করে আমার ঠোঁটের উপর চেপে ধরি।

অন্য সকলেই চলে গেছে: বসার ঘরে একটিমাত্র মোমবাতি জ্বলছে। মামণি বলছে, আমাকে জাগিয়ে দেবে: সেই তো এসে আমার পাশে বসল, আশ্চর্য নরম হাতটি আমার চুলে বুলিয়ে দিতে লাগল, কানে বাজছে সেই প্রিয়, পরিচিত কণ্ঠস্বর।

"উঠে পড় সোনা; বিছানায় যাবার সময় হয়েছে।"

নড়াচড়া না করে আবেগভরে তার হাতে চুমো খেলাম।

"উঠে পড় লক্ষ্মী আমার।"

হাত দিয়ে আমার গলাটা সে জড়িয়ে ধরল; তার নরম আঙুলগুলিতে আমার সুড়সুড়ি লাগছে। ঘরটা চুপচাপ, প্রায় অন্ধকার। ঘুম ভাঙল। মামণি পাশেই বসল, আমাকে ছুঁল, তার গন্ধ, তার স্বর চিনতে পারলাম। তারপরই লাফ দিয়ে উঠে দুই হাতে গলা জড়িয়ে ধরে তার বুকের

মধ্যে মাথাটা চেপে ধরলাম। বললাম, "ওঃ, সোনা, সোনা মামণি, তোমাকে আমি কত ভালবাসি।"

তার মুখে সেই রহস্যময় হাসি। দুই হাতে আমার মাথাটা ধরে ভুরুতে চুমো খেয়ে আমাকে কোলে তুলে নিল।

"তুমি তাহলে আমাকে খুব ভালবাস?" এক মুহূর্ত থেমে আবার বলল: "আমাকে সব সময় ভালবাসবে কেমন? আর কখনও ভুলে যাবে না তো? মামণি যখন থাকবে না, তখনও তাকে ভুলবে না তা? তাকে ভুলবে না তো নিকোলেংকা?"

গভীরতর মমতায় সে আমাকে চুমো খেল।

তার হাঁটুতে চুমো খেয়ে বললাম, "ও কথা বলোনা মাগো।" আমার দুই চোখে অশ্রুর ধারা নামল—ভালবাসা ও আবেগের অশ্রু।

তারপর দোতলায় আমার ঘরে গিয়ে ঢিলে ড্রেসিং-গাউনটা পরে দেবীমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে কতবার যে প্রার্থনা করলাম: "ঈশ্বর বাপি ও মামণিকে আশীর্বাদ করুন।"

প্রার্থনা শেষ করে হাল্কা ও খুশি মনে ছোট কম্বলটা গায়ের উপর টেনে দিলাম; একটার পর একটা স্বপ্নরা আসতে লাগল, আর কি নিয়ে সে সব স্বপ্ন? তারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, কিন্তু ভালবাসা ও সুখের আশায় ভরা। তার পরেই মনে পড়ল কার্ল আইভানিচ ও তার মন্দ ভাগ্যের কথা—আমার পরিচিতদের মধ্যে একমাত্র সেই মানুষটিই অসুখী—তার জন্য আমার দুঃখ হয়। তার প্রতি ভালবাসায় চোখ জলে ভরে এল, নিজের মনেই বললাম: "ঈশ্বর তাকে সুখী করুন, তাকে সাহায্য করবার, তার দুঃখ লাঘব করবার শক্তি তিনি আমাকে দিন; তার জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত।" তারপর আমার প্রিয় পুতুলগুলিকে—একটা চীনা কুকুর ও একটা খরগোস—পালকের বালিশের কোণে গুঁজে দিলাম, সেখানে ওরা গরমে ও আরামে থাকবে। আবার প্রার্থনা করলাম: ঈশ্বর সকলকে সুখী করুন, প্রত্যেকে যেন সন্তুষ্ট থাকে, আগামী কালের আবহাওয়া যেন হাঁটার পক্ষে ভাল হয়। পাশ ফিরলাম; চিন্তা ও স্বপ্ন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল; চুপচাপ শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম, তখনও চোখের জলে মুখটা ভিজে রয়েছে।

শৈশবের সেই স্নিগ্ধতা, সেই হাল্কা হৃদয়, সেই অনিবার্য ভালবাসা, সেই বিশ্বাসের ক্ষমতা—তারা কি আর কোন দিন ফিরে আসবে? নির্দোষ আনন্দ আর ভালবাসার জন্য সীমাহীন তৃষ্ণা—এই দুটি মহত্তম গুণই যখন থাকে জীবনের একমাত্র প্রেরণা তার চাইতে সুখের দিন আর কি হতে পারে?

কোথায় গেল সেই সাগ্রহ প্রার্থনা? কোথায় গেল সেই শ্রেষ্ঠ উপহার—আবেগে উচ্ছ্বসিত পবিত্র অশ্রুজল? সান্ত্বনার দেবদূত এসে হেসে হেসে চোখের জল মুছিয়ে দিত, শৈশবের পবিত্র কল্পনায় জাগিয়ে তুলত মধুর

সব দৃশ্যাবলী।

জীবন কি বুকের উপর এতই ভারী বোঝা চাপিয়েছে যে সেই অশ্রুজল ও আনন্দ আমাকে চিরদিনের মত ছেড়ে গেছে? শুধু কি স্মৃতিরাই বেঁচে থাকে?

অধ্যায়—১৬

কাব্যচর্চ্চা

মস্কো পৌঁছবার প্রায় একমাস পরে একদিন আমি দিদিমার বাড়ির দোতলায় বসে লিখছিলাম। বড় টেবিলটার ওপাশে বসে আঁকার মাস্টার মশাই জনৈক তুর্কীর মাথার একটা রেখাচিত্র সংশোধন করে দিচ্ছিলেন। তার পিছনে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে ভলদিয়া সেটা দেখছিল। এই মাথাটাই ভলদিয়ার প্রথম পেন্সিলে আঁকা ছবি; আজ সন্ত দিবস উপলক্ষ্যে ছবিটা দিদিমাকে উপহার দেওয়া হবে।

আঙুলের উপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে তুর্কীর গলাটা দেখিয়ে ভলদিয়া বলল, "এই জায়গাটা কি আর একটু গাঢ় করে দেবেন না?"

পেন্সিল ও পেন বাক্সে ভরে শিক্ষক বললেন, "তার, তার দরকার নেই; এই ঠিক আছে, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। তারপর, নিকোলেংকা, তোমার গোপন কথাটা কি আমাদের জানাবে না? তুমি দিদিমাকে কি দিচ্ছ? আমার তো মনে হয় এই রকম আর একটা মাথাই সেরা উপহার হত। চলি মশাইরা," বলে টুপি ও রেজিস্টার নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

সেই মুহূর্তে আমি ভাবছিলাম যে, আমি যা করছি তার থেকে একটা মাথাই কি ভাল হত। যখন আমাদের জানানো হল যে দিদিমার নামকরণ দিবস আসন্ন এবং সেই উপলক্ষ্যে আমাদের কিছু উপহার বানাতে হবে, তখনই একটা কবিতা লেখার কথা আমার মনে আসে আর সঙ্গে সঙ্গে দুটো শ্লোকও লিখে ফেললাম; ভাবলাম যে বাকিটা অচিরেই এসে যাবে। একটি শিশুর পক্ষে একটু অদ্ভুত এই ধারণাটা কেমন করে আমার মাথায় এল ঠিক জানি না; কিন্তু আজও মনে পড়ে যে ধারণাটা আমাকে খুব খুশি করেছিল, এবং এ বিষয়ে সব প্রশ্নের জবাবেই আমি বলেছিলাম যে দিদিমাকে একটা উপহার আমিও নিশ্চয় দেব, কিন্তু সেটা যে কি তা কাউকে বলব না।

কিন্তু আমার আশা যাই থাকুক, মুহূর্তের প্রেরণায় যে দুটি শ্লোক মাথায় এসেছিল অনেক চেষ্টা করেও তার বেশী আর কিছুই লিখতে পারলাম না। বইয়ের কবিতাগুলি পড়তে শুরু করলাম, কিন্তু দিমিত্রিয়েভ বা দের্জাভিন

কেউই কোন রকম সাহায্য করতে পারল না। বরং ঠিক উল্টোই হল, নিজের অক্ষমতাটাই আরও বেশী প্রকট হয়ে উঠল। আমি জানতাম যে কার্ল আইভানিচ কবিতা নকল করে রাখতে ভালবাসেন ; তাই লুকিয়ে তার কাগজপত্র ঘাটতে লাগলাম এবং জার্মান কবিতা ছাড়াও একটি রুশ কবিতা —নিশ্চয় তার নিজের কলমের ফসল—পেলাম :

মাদাম এল.-কে

মনে রেখো যারা কাছে আছে,
মনে রেখো যারা দূরে আছে,
চিরদিন মনে রেখো আমাকে—
আহা, কবরে যাবার পরেও মনে রেখো
আমাকে ও আমার ভালবাসাকে।

প্রেত্রভ্স্কয়ে, ১৯২৮, জুন ৩ কার্ল ময়ের

সুন্দর গোল-গোল হস্তাক্ষরে একটা পাতলা চিঠির কাগজে লেখা এই কবিতাটি আমাকে খুব খুশি করল তার মর্মস্পর্শী ভাবাবেগের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটি মুখস্ত করে ফেললাম এবং সেটাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করা স্থির করলাম। তারপর কাজ খুব দ্রুত এগিয়ে গেল। নামকরণ দিবস এসে পড়ার আগেই আমার অভিনন্দনসূচক বারোটি কবিতা লেখা হয়ে গেল এবং স্কুল-ঘরে বসে চামড়া কাগজে সেগুলো লিখতে বসে গেলাম।

দু' তা কাগজ নষ্ট হয়ে গেল ; আমি যে কবিতার কিছু রদবদল করতে চেয়েছিলাম তা নয়—কবিতাগুলি আমার কাছে খুব ভাল লেগেছিল—কিন্তু তৃতীয় পংক্তি থেকে শেষ পর্যন্ত লেখাগুলো ক্রমেই এমন ভাবে উপরের দিকে বেঁকে যেতে লাগল যে সেটাকে কোনক্রমেই উপহার হিসাবে দেওয়া চলে না।

তৃতীয় তা'র বেলায়ও সেই একই অবস্থা হল ; কিন্তু আমি স্থির করলাম আর নতুন করে নকল করব না। আমার কবিতায় দিদিমাকে অভিনন্দন জানিয়ে, তার স্বাস্থ্যপূর্ণ দীর্ঘ জীবন কামনা করে এই ভাবে শেষ করেছিলাম :

আমরা চেষ্টা করব তোমাকে আরামে রাখতে,
আমাদের নিজের মায়ের মতই তোমাকে ভালবাসতে।

কবিতাটা আমার খুব ভাল লাগল। শেষ পংক্তিটা লিখে ফেললাম। শোবার ঘরে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে অঙ্গভঙ্গী সহকারে পুরো কবিতাটা পড়লাম। কবিতায় তাল ও মাত্রার অনেক অভাব ছিল, কিন্তু তা নিয়ে আমি থামলাম না। কিন্তু শেষ পংক্তিটা নিয়ে আমার মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম।

"কেন লিখলাম 'আমাদের নিজের মায়ের মতই'? সে তো এখানেই

নেই, তার উল্লেখ করারও কোন দরকার ছিল না। দিদিমাকে ভালবাসি তা ঠিক; তাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তবু দুজন তো এক নয়। ও কথা কেন লিখলাম? কেন একটা মিথ্যা কথা লিখলাম? হলই বা কবিতা, তবু কাজটা উচিত হয় নি।"

ঠিক সেই সময় আমার নতুন জামা নিয়ে দর্জি ঢুকল।

"থাক এ সব কথা," বিরক্ত হয়ে কথাটা বলে কবিতাগুলোকে বালিশের তলায় গুঁজে দিয়ে নতুন পোশাক গায়ে দিয়ে দেখতে ছুটে গেলাম।

জামাগুলি সত্যি খুব ভাল হয়েছে। ব্রোঞ্জের বোতামওয়ালা তেঁতুল-বাদামী হাফ-কোটটা বেশ আঁটসাঁট মাপে তৈরি করা হয়েছে, ঠিক গ্রামের মত করে নয়। কালো ট্রাউজারগুলোও আঁটসাঁট; কী সুন্দরভাবে মাংসপেশীগুলো দেখা যাচ্ছে, আর জুতোটা ঢেকে গেছে।

যদিও নতুন পোশাকগুলো খুবই আঁটসাঁট, সেগুলো পরে চলাফেরা করাই শক্ত, তবু সে কথাটা লুকিয়ে রেখে সকলকেই বলে বেড়ালাম যে পোশাকগুলি খুব আরামদায়ক হয়েছে। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চুলটা ঠিক করে নিতে হিমসিম খেয়ে গেলাম।

আর একটা ঘরে কার্ল আইভানিচ পোশাক পরছিল। তার চাতক-লেজ কোট ও তলবাসগুলি স্কুল ঘরের ভিতর দিয়ে তাকে দিয়ে আসা হয়েছে। নীচে নামবার দরজার কাছে দিদিমার এক দাসীর গলা শুনে আমি বেরিয়ে এলাম। তার হাতে কড়া মাড়-দেওয়া একটা সার্ট-ফ্রন্ট; কার্ল আইভানিচের জন্য এসেছে; সে জানাল, এটাকে ঠিক করতে কাল সারা রাত সে ঘুময় নি। শার্ট-ফ্রন্টটাকে যথাস্থানে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়ে দাসীর কাছে জানতে চাইলাম, দিদিমা ঘুম থেকে উঠেছে কিনা।

"হ্যা, উঠেছেন স্যার! এর মধ্যেই তার কফি খাওয়া হয়ে গেছে, পুরোহিতও এসে গেছেন। আপনাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে!" আমার নতুন স্যুটটাকে দেখে সে হেসে বলল।

তার কথা শুনে লজ্জা বোধ করলাম।

শার্ট-ফ্রন্টটা কার্ল আইভানিচকে পৌঁছে দিতে গিয়ে দেখি সেটার আর দরকার নেই; তিনি অন্য একটা পরে ফেলেছেন, এবং ছোট আয়নাটার সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে দুই হাতে গলাবন্ধের গিঁটটা ধরে আছেন, আর পরিষ্কার কামানো থুত্‌নিটা উঠিয়ে নামিয়ে পরীক্ষা করে দেখছেন সেটা ঠিক মাপসই হয়েছে কি না। আমাদের পোশাককে ভালভাবে টেনেটুনে দিয়ে এবং নিকলাইকেও সেই নির্দেশ দিয়ে তিনি আমাদের সকলকে দিদিমার কাছে নিয়ে চললেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমাদের তিনজনেরই শরীর থেকে যে রকম পমেডের গন্ধ বেরুচ্ছিল তা মনে পড়লে এখনও আমার হাসি পায়।

কার্ল আইভানিচের হাতে তার নিজের তৈরি একটা উপহারের বাক্স, ভলদিয়ার হাতে তার ছবি, আর আমার হাতে কবিতা, আর প্রত্যেকেরই জিভের ডগায় অভিনন্দনের বাণী। কার্ল আইভানিচ বসার ঘরের দরজা খুলতেই দেখা গেল পুরোহিত তার রাজবেশ পড়ছেন। কানে এল অনুষ্ঠানের প্রথম কথাগুলি।

দিদিমাও বসার ঘরে হাজির: দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে একটা চেয়ারের পিঠে হাত রেখে মাথা নীচু করে ভক্তিসহকারে প্রার্থনা করছে; পাশে বাপি দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের মুখটা ফিরিয়ে আমরা সকলেই উপহারগুলো তাড়াতাড়ি পিছনে লুকিয়ে ফেলেছি দেখে বাপি হেসে ফেলল। আমরা চেয়েছিলাম উপহারগুলো দেখিয়ে সকলকে চমকে দেব; সেটা মাঠে মারা গেল।

এগিয়ে গিয়ে ক্রুশটাকে চুমো খাবার সময় হলে হঠাৎ লজ্জা এসে আমাকে এমনভাবে অচল করে দিল যে আমার মনে হল উপহারটা দেবার সাহসই হবে না, আর তাই আমি কার্ল আইভানিচের পিছনে লুকিয়ে পড়লাম। কার্ল আইভানিচ তখন বাছা বাছা কথায় দিদিমাকে অভিনন্দন জানিয়ে উপহারের বাক্সটাকে ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিয়ে সেটা তার হাতে তুলে দিলেন, এবং ভলদিয়াকে জায়গা করে দেবার জন্য কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। বাক্সটা দেখে খুশি হয়ে দিদিমা খুশির হাসি হেসে নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তার বাক্সটা কোথায় রাখবে বুঝতে না পেরে সেটাকে বাপির হাতে তুলে দিল।

নিজের কৌতূহল মিটিয়ে বাপি সেটাকে তুলে দিল পুরোহিতের হাতে; এই সামান্য জিনিসটা দেখে তিনিও খুবই খুশি হলেন। মাথাটা নাড়তে নাড়তে তিনি সাগ্রহে একবার বাক্সটাকে এবং একবার এমন সুন্দর জিনিসটির সৃষ্টিকর্তা শিল্পীটিকে সাগ্রহে দেখতে লাগলেন। ভলদিয়া তার তুর্কীটাকে বের করল এবং সেটাও সকলের প্রচুর প্রশংসা পেল। এবার আমার পালা: উৎসাহসূচক হাসি হেসে দিদিমা আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

লজ্জা-রোগে যারা ভোগে তারাই জানে যে যত দেরী হতে থাকে লজ্জাটা ততই বাড়তে থাকে, আবার একবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে পারলেই সেটা কমতে থাকে।

কার্ল আইভানিচ ও ভলদিয়া যখন তাদের উপহারগুলো দিল ততক্ষণে সাহস ও দৃঢ়চিত্ততার শেষ বিন্দুটিও আমাকে পরিত্যাগ করেছে, আমার লজ্জা উঠেছে চরমে; বুঝতে পারলাম, সব রক্ত আমার হৃৎপিণ্ড থেকে মাথায় চড়ে বসেছে। আমি একবার ফ্যাকাসে ও একবার লাল হতে লাগলাম, ঘামের বড় বড় ফোঁটা নাক ও কপালের উপর গড়িয়ে পড়তে লাগল। কান দুটো জ্বালা করছে; সারা শরীর কাঁপছে, ঠাণ্ডা ঘাম ঝরছে; একবার এ-পায়ে একবার ও-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, সেখান থেকে নড়তেও পারলাম না।

বাপি বলল, "তুমি এস নিকোলেংকা, কি এনেছ আমাদের দেখাও—একটা বাক্স না একটা ছবি।" কিছুই করার নেই। কাঁপা হাতে দুমড়ানো ও পাকানো কাগজটা এগিয়ে দিলাম; কিন্তু মুখে কথা ফুটল না, দিদিমার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার কাছ থেকে সকলেই একটা ছবি আশা করেছিল; তার পরিবর্তে আমার এই অপদার্থ কবিতাগুলি সকলের সামনে পড়া হবে এই চিন্তাটাই আমার কাছে অসহ্য। দিদিমা যখন গলা ছেড়ে আমার কবিতাটা পড়তে লাগল, ঠিকমত বুঝতে না পেরে একটা পংক্তির মাঝখানে থেমে গিয়ে বাপির দিকে তাকাল; তার উচ্চারণগুলো যখন আমার মনোমত হল না, এবং দুর্বল দৃষ্টিশক্তির দরুণ শেষ করবার আগেই কবিতাটা বাপির হাতে দিয়ে আর একবার গোড়া থেকে পড়তে বলল, তখন আমার যে কী কষ্ট হচ্ছিল তা কেমন করে বোঝাব? আমার মনে হল, আমার বাঁকা-বাঁকা লেখা বাজে কবিতা পড়ার ইচ্ছা ছিল না বলেই দিদিমা সেটা বাপির হাতে তুলে দিল; সে আরও চেয়েছিল যে বাপি কবিতার শেষ পংক্তিটা পড়ে বুঝুক মার প্রতি আমার কি মনোভাব। মনে করেছিলাম, কবিতাটা আমার নাকের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বাপি বলে উঠবে, "দুষ্টু ছেলে, তুমি মাকে ভুলে গেছ—এই নাও তার ফল।" কিন্তু সে রকম কিছুই ঘটল না; বরং সবটা পড়া হয়ে গেলে "চমৎকার!" বলে দিদিমা আমার কপালে চুমো খেল।

যে হাতল-চেয়ারটায় দিদিমা সব সময় বসে তার সঙ্গে লাগানো চলমান টেবিলের উপর ছোট বাক্সটা, ছবিটা ও কবিতাটা পরপর সাজিয়ে রাখা হল; তার পাশে রাখা হল দু'খানা ক্যামব্রিকের রুমাল ও মামণির মূর্তি-আঁকা একটা নস্যির কৌটো।

দিদিমার গাড়িতে সঙ্গে যে দু'জন বড় বড় পরিচারক থাকে তাদের একজন ঘোষণা করল, "প্রিন্সেস বারবারা ইলিনিচ্‌না।"

দিদিমা চিন্তিতমুখে নস্যিদানের কাছিমের খোলের ঢাকনার উপরে আঁকা প্রতিকৃতিটার দিকে তাকিয়ে রইল, কোন জবাব দিল না।

পরিচারক আবার বলল, "ইয়োর এক্সেলেন্সি তাকে অভ্যর্থনা জানাবেন?"

অধ্যায়—১৭

প্রিন্সেস কর্ণকোভা

হাতল-চেয়ারে ঠিক হয়ে বসে দিদিমা বলল, "তাকে ভিতরে নিয়ে এস।"

প্রিন্সেসের বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর, ছোটখাট, দুর্বল, শুকনো চেহারা, দুটি ধূসর সবুজ অস্বস্তিকর চোখের দৃষ্টি তার ঠোঁটের অস্বাভাবিক সৌজন্যপূর্ণ ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। উট পাখির পালক গোঁজা ভেলভেটের মস্তকাবরণের

নীচে হাল্কা লালচে চুল চোখে পড়ে; মুখের স্বাস্থ্যহীন বিবর্ণতার পশ্চাৎপটে ভুরু ও চোখের লোমগুলোকে আরও বেশী হাল্কা ও লালচে মনে হয়। তবু অসংযত আচরণ, ছোট ছোট হাত, ও শুকনো মুখ সত্ত্বেও তার চেহারায় একটা আভিজাত্য ও কর্মশীলতার আভাষ আছে।

প্রিন্সেস খুব বেশী কথা বলে; একবার গলা চড়ায়, আবার ধীরে ধীরে নামায়, তারপর একসময় চারদিকে তাকিয়ে নতুন উৎসাহে হঠাৎ কথা বলতে থাকে।

প্রিন্সেস দিদিমার হাতে চুমো খেল, বার বার তাকে ma bonne tante বলে ডাকল, তবু বুঝতে পারলাম যে দিদিমা তাকে দেখে খুব খুশি হয় নি। প্রিন্সেস যখন বুঝিয়ে বলছিল কেন প্রিন্স মিখাইলো একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও নিজে এসে দিদিমাকে অভিনন্দন জানাতে পারে নি, তখন তার ভুরু দুটো অদ্ভুতভাবে কুঁচকে যাচ্ছিল, আর প্রিন্সেসের ফরাসী কথার জবাব সে দিচ্ছিল রুশ ভাষায়।

দিদিমা একটানা বলে গেল, "তুমি আসায় আমি খুব কৃতজ্ঞ বোধ করছি, আর প্রিন্স মিখাইলোর না আসার কথা দয়া করে তুলো না। সে সব সময় এত ব্যস্ত; তাছাড়া আমার মত একজন বুড়িকে দেখে তার কীইবা ভাল লাগবে?" প্রিন্সেসকে প্রতিবাদ জানাবার সুযোগ না দিয়েই সে শুধাল, "তোমার ছেলেমেয়েরা কেমন আছে গো?"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ মা তাঁতে, তারা ভালই আছে, পড়াশুনা করছে, দুষ্টুমি করছে, বিশেষ করে এতিয়েন। সেই তো সকলের বড়, আর দিনে দিনে এমন বেয়াড়া হয়ে উঠছে যে তাকে নিয়ে যে কি করব জানি না; কিন্তু ছেলেটা বুদ্ধিমান,—অনেক সম্ভাবনা আছে তার মধ্যে। এই তো ভেবে দেখুন," হঠাৎ বাপির দিকে ঘুরে প্রিন্সেস বেশ উৎসাহের সঙ্গে কি যেন বলতে শুরু করে দিল। গল্পটা শেষ করে সে হেসে উঠল; বাপির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল:

"এ ব্যাপারে তুমি কি মনে কর দাদা? তাকে চাবুক মারাই উচিত ছিল; কিন্তু এই দুষ্টুমিটা এতই বুদ্ধির পরিচায়ক ও মজার যে আমি তাকে ক্ষমা করেছি।"

এক দৃষ্টিতে দিদিমার দিকে তাকিয়ে প্রিন্সেস হাসতে লাগল, কিছু বলল না।

"তুমি কি ছেলেমেয়েদের মারধোর কর?" অর্থপূর্ণ ভঙ্গীতে ভুরু তুলে "মারধোর" কথাটার উপর বিশেষ জোর দিয়ে দিদিমা প্রশ্ন করল।

বাপির দিকে একনজর তাকিয়ে প্রিন্সেস সহজসুরে বলল, "হায় মা বোনে তাঁতে, এ বিষয়ে আপনার অভিমত আমি জানি; অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে দ্বিমত হতে আমি বাধ্য: এ বিষয়ে আমি অনেক

ভেবেছি, অনেক পড়েছি, অনেক রকম পরামর্শ শুনেছি; তা সত্ত্বেও অভিজ্ঞতার ফলে আমার মনে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে ছেলেমেয়েদের ভয় দেখিয়ে শাসন করতে হবে। শিশুকে মানুষ করতে হলে ভয় দেখাতেই হবে। তাই নয় কি দাদা? তাহলে, ছোটরা লাঠির চাইতে বেশী আর কাকে ভয় করে?"

প্রিন্সেস সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাল: স্বীকার করছি, সেই মুহূর্তে আমি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

"যাই বলনা কেন, বারো, এমন কি চোদ্দ বছরের ছেলেও তো শিশুমাত্র। অবশ্য মেয়ের বেলায় কথাটা স্বতন্ত্র।"

আমি ভাবলাম, "ভাগ্যিস আমি তার ছেলে নই!"

দিদিমা বলল, "ঠিক, খুব ভাল কথা; কিন্তু আমাকে বলতো, এর পরেই কি ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে তুমি ভাল আচরণ আশা করতে পার?"

এ প্রশ্নের কোন জবাব পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে এবং এ আলোচনা শেষ করার ইচ্ছায় দিদিমা বলল:

"অবশ্য এ ব্যাপারে নিজস্ব মতামত পোষণের অধিকার সকলেরই আছে।"

প্রিন্সেস কোন জবাব দিল না, ক্ষমাসুলভ হাসি হাসল, যেন যে মানুষটিকে সে শ্রদ্ধা করে তার সঙ্গে তর্ক করার বাসনা তার নেই। আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "দয়া করে বাচ্চাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দাও।"

বাপি বলল, "প্রিন্সেসের হাতে চুমো খাও।"

ভলদিয়ার চুলে চুমো খেয়ে প্রিন্সেস বলল, "তোমার পিসীকে তো ভালবাসবে, তাই না? আমি অনেক দূর সম্পর্কের পিসী, কিন্তু রক্তের সম্পর্কের চাইতে বন্ধুত্বের সম্পর্ককে আমি বেশী মূল্য দেই।"

দিদিমা তখনও তার প্রতি অপ্রসন্ন; বলল, "আচ্ছা সোনা, আজকাল সে সম্পর্কের কোন দাম আছে কি?"

ভলদিয়াকে দেখিয়ে বাপি বলল, "এটি বড় হয়ে সংসারী মানুষ হবে, আর এটি কবি হবে।"

"কোন্‌টি?" প্রিন্সেস শুধাল।

"এই ছোটটি যার মাথায় একগুচ্ছ চুল আছে" বাপি হেসে বলল।

আমি ঘরের এক কোণে সরে গেলাম। "আমার একগুচ্ছ চুল আছে তাতে তার কি? কথা বলার কি আর কিছু পাওয়া গেল না?"

রূপ সম্পর্কে আমার ধারণাগুলি বিচিত্র। আমার চোখে তো কার্ল আইভানিচ পৃথিবীর সবচাইতে সুদর্শন মানুষ কিন্তু আমি যে সুদর্শন নই তা

আমি জানি, আর সে জানাটা ভুলও নয় : কাজেই আমার নিজের চেহারার কথা কেউ উল্লেখ করলে আমি খুব রেগে যাই।

মনে পড়ে একবার—সে সময় আমার বয়স ছিল ছ' বছর—ডিনারের সময় সকলে আমার মুখ নিয়ে কথা বলছিল ; ডিনারের শেষে আমার গাল ধরে আদর করে মামণি বলেছিল :

"মনে রেখো সোনা, তোমার মুখ দেখে কেউ তোমাকে ভালবাসবে না। কাজেই তোমাকে ভাল ও বুদ্ধিমান হতে চেষ্টা করতে হবে, বুঝলে তো ?"

সেই কথাগুলিই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে আমি সুদর্শন নই, আর তাই আমাকে ভাল ও বুদ্ধিমান হতেই হবে।

তবু কখনও কখনও বড়ই হতাশ বোধ করতাম : কল্পনা করতাম—আমার মত এ রকম চওড়া নাক, পুরু ঠোঁট ও কুতকুতে ছোট ধূসর চোখ যার আছে সে মানুষের জন্য এ পৃথিবীতে কোন সুখ নেই, ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানাতাম, একটা অলৌকিক কিছু ঘটিয়ে দাও, আমাকে সুন্দর করে দাও, একখানি সুন্দর মুখের বিনিময়ে বর্তমানে আমার যা কিছু আছে, আর ভবিষ্যতে যা কিছু থাকবে সব দিয়ে দেব।

অধ্যায়—১৮

প্রিন্স আইভান আইভানিচ

প্রিন্সেস যখন কবিতা শুনে কবির শিরে অজস্র প্রশংসা বর্ষণ করল তখন দিদিমার মনটা নরম হল ; প্রিন্সেসকে ছেলেমেয়ে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা আবার আসতে বলল ; প্রিন্সেসও রাজী হয়ে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বিদায় নিল।

অভিনন্দন জানাতে সেদিন এত বেশী অতিথিসমাগম হল যে সারাটা সকাল ফটকের কাছে উঠোনটায় গাড়ির ভিড় জমে গেল।

"বোঁজুর চেরে কুজিনে," জনৈক অতিথি ঘরে ঢুকে দিদিমার হাতে চুমো খেয়ে কথাটা বললেন।

লোকটির বয়স প্রায় সত্তর বছর, দশাসই চেহারা, পরনে সামরিক পোশাক, মস্ত বড় স্কন্ধত্রানের কলারের নীচে বড় একটা সাদা ক্রুশ চোখে পড়ে, মুখের ভাব শান্ত, দিলখোলা। যদিও কেবলমাত্র গলার ঠিক উপরে কিছু অর্ধ-বৃত্তাকার চুল এখনও মাথায় অবশিষ্ট আছে, এবং বসে-যাওয়া উপরের ঠোঁট দেখলেই দাঁতের অভাব বোঝা যায়, তবু এখনও তার মুখটা উল্লেখ-যোগ্যভাবে সুন্দর।

মহৎ চরিত্র, সুদর্শন চেহারা, উল্লেখযোগ্য সাহস, বিশিষ্ট ও শক্তিশালী রবার, এবং বিশেষ করে তার সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ, বিগত শতাব্দীর শেষ

ভাগে প্রিন্স আইভান আইভানিচ জীবনে উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠার অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি সামরিক চাকরিতেই থেকে গেলেন; তার উচ্চাকাংখা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এমনভাবে পূর্ণ হল যে সে পথে তার আর চাইবার মত কিছু রইল না। বিশেষ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী তিনি ছিলেন না, কিন্তু জীবনে যে উঁচু আসনে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন সেখান থেকে জীবনের তুচ্ছহৈ-হট্টগোলকে ছোট করে দেখা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল; তার মনের গড়ণটাই ছিল উন্নত ধরনের। স্বভাবত তিনি ছিলেন দয়ালু ও অনুভূতিশীল, কিন্তু আচরণে ছিলেন নির্বিকার ও উদ্ধত।

তিনি ছিলেন সংস্কৃতিবান ও লেখাপড়া জানা মানুষ, কিন্তু তার সংস্কৃতির দৌড়টা যৌবনে এসেই থেমে গিয়েছিল—অর্থাৎ গত শতাব্দীর সমাপ্তিকালে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দর্শন ও বাগ্মিতার উপরে যত উল্লেখযোগ্য বই লেখা হয়েছিল সে সব তিনি পড়েছিলেন; ফরাসী সাহিত্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ ফসল তার পরিচয় এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে তিনি রস, কর্নিল, বয়লু, মলিয়ের, মঁতান ও ফেনেলঁ থেকে মুখস্থ বলতে পারতেন এবং বলতে ভালবাসতেন। কিন্তু পাটিগণিতের বাইরে গণিত শাস্ত্রের কিছুই জানতেন না; পদার্থবিদ্যা ও সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কেও সেই একই অবস্থা; গ্যেটে, শিলার ও বায়রণ সম্পর্কে হয় সবিনয়ে চুপ করে থাকতেন, নয়তো দু' একটা মামুলি কথা বলতেন, কিন্তু তাদের লেখা কখনও পড়েন নি। যেখানে যখনই থাকুন সমাজ তার পক্ষে অপরিহার্য; মস্কোই হোক আর অন্যত্রই হোক, তিনি সব সময়ই উদারভাবে বসবাস করতেন; কোন কোন বিশেষ দিনে সারা শহরকে বাড়িতে আমন্ত্রণ করতেন। সমাজে তার এতই প্রতিষ্ঠা ছিল যে তার কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেলে অন্য সব বসার ঘরের দরজা খুলে যেত, আর সেই জন্যই অনেক যুবক ও সুন্দরী যুবতী স্বেচ্ছায় তার দিকে নিজেদের গোলাপী গাল এগিয়ে দিত, আর তিনিও পিতৃবৎ স্নেহে তাদের চুমো খেতেন; প্রিন্সেস পার্টিতে যোগ দিতে পারলে ছোট-বড় সকলে উৎফুল্ল হয়ে উঠত।

দিদিমার মত যারা এক সময়ে তার সঙ্গে একই সমাজের সদস্য ছিলেন, একই বয়স একই শিক্ষাদীক্ষা, একই মতামতের অধিকারী ছিলেন, তাদের খুব অল্প কয়েকজনই এখনও বেঁচে আছেন; আর সেই কারণেই প্রিন্স দিদিমার বন্ধুত্বকে বিশেষ মূল্য দেন, তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন।

প্রিন্সের দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। তার প্রতি প্রতিটি মানুষের শ্রদ্ধা, তার প্রকাণ্ড স্কন্ধত্রাণ, তাকে দেখামাত্র দিদিমার উচ্ছ্বসিত আনন্দ—এসব দেখে তার প্রতি আমার মনে যে শ্রদ্ধা জাগল সেটা দিদিমার প্রতি শ্রদ্ধারই সমতুল। দিদিমা আমার কবিতাগুলি তাকে দেখালে তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন, বললেন:

"কে জানে প্রিয় বহিন, এ হয়তো একজন দের্ঝাভিন হবে।"

অতিথিরা বিদায় নিল। বাপি ও ভলদিয়াও বেরিয়ে গেল। বসার ঘরে রইলাম শুধু প্রিন্স, দিদিমা ও আমি।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে প্রিন্স আইভান আইভানিচ হঠাৎ শুধাল, "আমাদের প্রিয় নাতালিয়া নিকলায়েভ্না এল না কেন?"

মাথাটা নীচু করে প্রিন্সের ইউনিফর্মের উপর হাত রেখে দিদিমা জবাব দিল, "ইচ্ছামত কাজ করবার ক্ষমতা থাকলে সে নিশ্চয়ই আসত। সে আমাকে লিখেছে; পিয়ের তাকেও আসতে বলেছিল, কিন্তু এ বছর আয়-উপার্জন ভাল হয় নি বলে সে আসতে রাজী হয় নি; লিখেছে: 'তাছাড়া, গোটা সংসার সঙ্গে নিয়ে এ বছর মস্কো যাবার কোন কারণও তো নেই।'...অবশ্য ছেলে দুটিকে আরও অনেক আগেই এখানে পাঠানো উচিত ছিল; তাতে তারা কিছু শিখতে পারত, সমাজে চলতে-ফিরতে অভ্যস্ত হতে পারত। গ্রাম দেশে তাদের কি ধরনের শিক্ষা দেওয়াই বা সম্ভব? আরে বড়টি তো শীঘ্রই তেরোয় পড়বে, ছোটটি এগারো। আপনি তো দেখেছেন ভাই, ওরা এখানে একেবারেই বন্নাছাড়া; কেমন করে ঘরে ঢুকতে হয় তাই জানে না।"

প্রিন্স উত্তরে বললেন, "সব সময় এই খারাপ অবস্থার নালিশ যে কেন ওঠে আমি তো বুঝতে পারি না। তার একটা খুব ভাল সম্পত্তি আছে, আর খাবারভ্কাতে নাতাশারও একটা জমিদারি আছে; এক সময়ে তো আপনার সঙ্গে সেখানে থিয়েটারও করেছি; আমি তো সবই জানি। জমিদারিটা চমৎকার, নিশ্চয়ই তার আয়ও বেশ ভালই হবে।"

দিদিমা বিষণ্ণমুখে বলে উঠল, "সত্যিকারের বন্ধু হিসাবে আপনাকে বলতে বাধা নেই। আমার তো মনে হয় এ সবই শ্রীমানের এখানে একলা থাকার ফন্দি; ক্লাবে ক্লাবে ঢুঁ মারবে, ডিনারে যাবে, ঈশ্বর জানেন আরও কত কি করে বেড়াবে। কিন্তু সে মেয়েটা কিছুই সন্দেহ করে না। আপনি তো জানেন, সে একটি দেবদূত; শ্রীমানের উপর তার অচল বিশ্বাস। ছেলে তাকে বুঝিয়েছে যে ছেলেদের নিয়ে মস্কো আসা দরকার, আর বোকা গভর্ণেসটিকে সঙ্গে দিয়ে তাকে গ্রামেই রেখে দেওয়া দরকার, আর অমনি সেও তাই বিশ্বাস করেছে।" এক মুহূর্ত থেমে দুটোর একটা রুমাল বের করে চোখের জল মুছে দিদিমা আবার বলতে লাগল, "হ্যাঁ বন্ধু, তাই। আমি অনেক সময় ভাবি সে মেয়েটাকে শ্রদ্ধা করে না, তাকে বুঝতেও পারে না; মেয়েটা যতই ভাল হোক, তাকে যতই ভালবাসুক, নিজের দুঃখকে যতই চেপে রাখুক—সেটা আমি ভালই জানি—স্বামীকে নিয়ে সে সুখী হতে পারবে না। আর, আমার কথাগুলি লক্ষ্য করুন, সে যদি না—"

দিদিমা রুমালে মুখ ঢাকল।

প্রিন্স তিরস্কারের সুরে বলল, "দেখছি আপনার বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছুই হয় নি। একটা কল্পিত দুঃখ নিয়ে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন। আপনার লজ্জা করে না?

দীর্ঘকাল ধরে আমি শ্রীমানকে জানি; আমি জানি সে ভাল, মনোযোগী ও চমৎকার স্বামী, আর যেটা বড় কথা, সে একটি পুরোপুরি সৎলোক।"

যে কথাগুলি আমার শোনা উচিত ছিল না আপনা থেকেই সেটা শুনে ফেলে অত্যন্ত বিচলিত অবস্থায় আমি পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

অধ্যায়—১৯
আইভিন পরিবার

"ভলদিয়া! ভলদিয়া! আইভিনরা!" জানালা দিয়ে তিনটি ছেলেকে দেখতে পেয়ে আমি চীৎকার করে উঠলাম; তাদের পরনে নীল রঙের ওভারকোট ও বীভার-লোমের কলার; উল্টো দিকের গলিটা পার হয়ে তারা আমাদের বাড়ির দিকেই আসছে; তাদের আগে আগে আসছে মর্যাদাসম্পন্ন যুবক শিক্ষকটি।

আইভিনরা আমাদের আত্মীয়; আমাদের সমবয়সী; মস্কো আসার কিছুদিন পরেই তাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, আর এখন আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছি।

দ্বিতীয় ছেলে সেরিওঝার গায়ের রং ঘোর, মাথার চুল কোঁকড়ানো, ছোট নাকটা ওল্টানো, তাজা লাল ঠোঁট দুটি উপরের পাটির বড় বড় দাঁতগুলোকে কদাচিৎ ঢাকতে পারে, গাঢ় নীল দুটি চোখ, মুখে একটা বিশেষ চটপটে ভাব। সে কখনও ছোট করে হাসে না, হয় খুব গম্ভীর থাকে, আর না হয় তো হো-হো করে এমন হাসি হাসে যে অন্যকেও হাসিয়ে ছাড়ে। তার অস্বাভাবিক রূপ প্রথম দর্শনেই আমার চোখে লেগেছিল। তার আকর্ষণ দুর্নিবার। তাকে দেখতে পাওয়াই আমাকে সুখী করার পক্ষে যথেষ্ট; সে সময় এই একটি বাসনাই আমার সমস্ত অন্তরকে জুড়ে ছিল। ঘটনাক্রমে যদি তিন-চার দিন তার সঙ্গে দেখা না হত তাহলে খুব খারাপ লাগত, এমনকি চোখে জল এসে যেত। ঘুমে ও জাগরণে তাকেই স্বপ্ন দেখতাম; ঘুমের আগে মন চাইত তাকেই যেন স্বপ্নে দেখি, আর চোখ বুজলেই সে সামনে এসে দাঁড়াত, আমার আনন্দের সীমা থাকত না। সে খুশি ছিল এতই মূল্যবান যে কাউকে সেকথা বলতাম না। সে কিন্তু আমার চাইতে ভলদিয়ার সঙ্গে কথা বলতে ও খেলা করতেই বেশী ভালবাসত; আমার চঞ্চল চোখ দুটি যে সব সময় তার দিকেই চেয়ে থাকে সেজন্য হয়তো সে বিরক্তি বোধ করত, অথবা হয় তো আমার প্রতি তার মনে কোন টান ছিল না। তবু তাতেই আমি খুশি; অন্য বাসনা নেই, অন্য দাবী নেই, তার জন্য আমি সবকিছু ত্যাগ করতে রাজী। একান্ত অনুরাগের পাশাপাশি তাকে আমার ভয়ও করত; ভয় হত পাছে তাকে আঘাত দেই, কোন ভাবে তার বিরাগভাজন হই। আমাদের মধ্যে ভালবাসার একটা কথাও হত না, কিন্তু আমার উপর তার এই প্রভাবের

কথা সে বুঝত, আর আমাদের ছেলেমানুষী কথাবার্তার ভিতর দিয়েই সেটাকে নিষ্ঠুরভাবে ব্যবহার করত। আমি চাইতাম নিজের মনকে উজাড় করে তার কাছে ঢেলে দিতে, কিন্তু ভয়ে খোলাখুলি কিছু বলতে পারতাম না। অনেক সময় তার প্রভাব আমার কাছে উৎপীড়ন বলে, অসহ্য বলে মনে হত; কিন্তু তা থেকে পালিয়ে যাবার শক্তি আমার ছিল না।

আমার মনের সেই প্রথম নিঃস্বার্থ ও নিঃসীম ভালবাসা যে প্রকাশের পথ খুঁজে না পেয়ে অথবা বিনিময়ের অভাবে একদিন শুকিয়ে ঝরে গিয়েছিল সেকথা ভাবলেও কষ্ট হয়।

এটা কেন হয় যে যখন আমি শিশু ছিলাম তখন বড়দের মত হতে চাইতাম, আবার যখন আর শিশু রইলাম না তখন শিশু হতেই চাই?

সেরিওঝার ব্যাপারে এই যে শিশুর মত না হতে চাওয়া তার ফলেই আমার মনের কথাকে প্রকাশ না করে সব সময় গোপন করে রাখতাম। অনেক ইচ্ছা সত্ত্বেও তাকে কখনও চুমো খেতে পারি নি, তার হাতটা ধরতে পারি নি, তাকে দেখতে যে ভাল লাগে সে কথা বলতেও পারি নি, শুধু তাই নয়। তাকে সেরিওনা বলে ডাকতে পর্যন্ত পারিনি, ডেকেছি গতানুগতিক সের্গেই বলে।

বাইরের ঘরেই আইভিনদের সঙ্গে দেখা করলাম, কুশল-বিনিময় করলাম, তারপর এক ছুটে দিদিমার কাছে চলে গেলাম। এ খবর শুনে না জানি দিদিমা কত খুশি হবে এই কথা ভেবেই মনের আনন্দে আইভিনদের আসার কথাটা তাকে জানালাম। তারপর সেরিওঝার পিছু পিছু বসার ঘরে ঢুকলাম, একটি বারের জন্যও তার উপর থেকে চোখ সরালাম না। দিদিমা যখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল যে সে অনেক বড় হয়ে গেছে, তখন আমার মনে ভয় ও প্রত্যাশার সেই অনুভূতি দেখা দিল যা একজন শিল্পীর মনে জাগে যখন সে তার শিল্পকর্মের কোন শ্রদ্ধেয় বিচারকের মতামতের জন্য অপেক্ষা করে থাকে।

আইভিনদের তরুণ শিক্ষক হের ফ্রস্ট দিদিমার অনুমতি নিয়ে আমাদের সঙ্গে করে সামনের বাগানে ঢুকল, এবং ব্রোঞ্জের মুঠিওয়ালা বেতের ছড়িটাকে দুই পায়ের ফাঁকে রেখে বেশ কায়দা করে পা দুটোকে ভাঁজ করে একটা সবুজ বেঞ্চের উপর বসে এমন ভঙ্গীতে চুরুট টানতে লাগল যেন তার খুশির সীমা নেই।

হের ফ্রস্ট একজন জার্মান, কিন্তু কার্ল আইভানিচের মত জার্মান নয়। প্রথমত, সে শুদ্ধভাবে রুশ ভাষা বলতে পারত, খারাপ উচ্চারণে ফরাসী বলত, মেয়ে-মহলে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করতে পারত; দ্বিতীয়ত, তার মুখে লাল গোঁফ, কালো সাটিনের গলাবন্ধে একটা বড় চুনির পিন আটকানো, পরনে স্প্রীংয়ের বোতাম ও কটিবন্ধসহ হাল্কা নীল রঙের ট্রাউজার; তৃতীয়ত, সে যুবক, সুদর্শন, বাইরে আত্মতুষ্ট, একজোড়া পেশীবহুল সুদৃশ্য পা। এই

পা দুটি নিয়েই তার বিশেষ গর্ব ; সে মনে করে, মেয়েদের কাছে তার পা দুটির আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য, আর হয়তো সেই কারণেই দাঁড়িয়েই হোক আর বসেই হোক, সব অবস্থাতেই সে পা দুটিকে দর্শনযোগ্য করে তুলতে চেষ্টা করে, পায়ের গুলিকে নাচাতে থাকে। যেসব তরুণ রুশ-জার্মান আমোদপ্রিয় ও নারীসঙ্গী হতে চায় সে তাদেরই প্রতীক।

বাগানে খুব মজা হল। ডাকাত-ডাকাত খেলাটা খুব জমে উঠল ; কিন্তু একটা ঘটনায় সবটাই মাটি হতে বসেছিল। সেরিওঝা হল ডাকাত ; পথিকদের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে তাড়াতাড়িতে সে এত জোরে একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেল যে মনে হল বুঝি তার পাটা ভেঙেই গেল। আমি হলাম পুলিশ, তাকে গ্রেপ্তার করাই আমার কর্তব্য, কিন্তু তা না করে তার কাছে গিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে জানতে চাইলাম তার লেগেছে কি না। সেরিওঝা আমার উপর চটে উঠল ; মুঠি পাকিয়ে পা মাটিতে ঠুকে চীৎকার করে বলে উঠল :

"লেগেছে তো কি হয়েছে ? তুমি তো খেলাটাই মাটি করে দিচ্ছ ! এস, আমাকে ধরে ফেল। কেন ধরছ না ?" ভলদিয়া ও বড় আইভিনের দিকে কটাক্ষে তাকিয়ে সে বারবার কথাটা বলল ; তারপরেই একটা চীৎকার করে হো-হো করে হাসতে হাসতে পথিকদের পিছনে ছুটতে লাগল।

তার এই সাহসিকতাপূর্ণ আচরণে আমি কতটা অভিভূত হয়েছিলাম তা বুঝিয়ে বলতে পারব না। তীব্র যন্ত্রণা সত্ত্বেও এ যে একটুও কাঁদল না তাই শুধু নয়, তার যে আঘাত লেগেছে সেটাই বুঝতে দিল না এবং মুহূর্তের জন্যও খেলাটাকে ভুলে গেল না।

আরও কিছুক্ষণ পরে ইলেংকা গ্রাপ যখন আমাদের দলে এসে যোগ দিল এবং ডিনারের সময় পর্যন্ত খেলাধূলা করার জন্য আমরা দোতলায় উঠে গেলাম, তখন সেরিওঝা তার সাহস ও চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখিয়ে আমাকে আর একবার স্তম্ভিত ও আনন্দিত করে দিল।

একজন গরীব বিদেশী এক সময় আমার ঠাকুর্দার বাড়িতে থাকত। নানাভাবে তার কাছে ঋণীও ছিল, আর তাই মাঝে মাঝে ছেলেকে এখানে পাঠানোটাকে সে তার অনিবার্য কর্তব্য বলে মনে করে। ইলেংকা গ্রাপ সেই ছেলে। লোকটি যদি মনে করে থাকে যে আমাদের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তার ছেলের সম্মান বাড়বে বা সে খুশি হবে, তাহলে সে ভুল করেছে ; কারণ ইলেংকার সঙ্গে আমরা বন্ধুর মত ব্যবহার করতাম না, বরং তাকে নিয়ে নানা রকম মজা করতাম। ইলেংকা গ্রাপ তেরো বছরের একটি লম্বা পাতলা চেহারার ছেলে ; ফ্যাকাসে, পাখির মত মুখ, আর মুখে ভালমানুষী বিনীতভাব।

ডাকাত-ডাকাত খেলা শেষ হয়ে গেলে আমরা দোতলায় উঠে লাফ-ঝাঁপ ও নানা রকম শারীরিক ক্রীড়া-কৌশল দেখাতে লাগলাম। সপ্রশংস হাসির

সঙ্গে ইলেংকা আমাদের খেলা দেখল, কিন্তু তাকে যখন খেলা দেখাতে বলা হল তখন সে আপত্তি জানিয়ে বলল যে তার গায়ে যথেষ্ট শক্তি নেই। সেরিওঝাকে চমৎকার দেখাচ্ছে। জামাটা খুলে ফেলেছে। গাল ও চোখ ঝকঝক করছে, অবিরাম হাসছে আর নতুন নতুন খেলা দেখাচ্ছে। তিনটে চেয়ার পাশাপাশি রেখে এক লাফে পার হচ্ছে, গাড়ির চাকা বানাচ্ছে, তাতিশ্‌চেভ-এর অভিধানে মাথা রেখে পা দুটো উপরে তুলে দিচ্ছে। এই শেষ খেলাটা দেখাবার পরে সে এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল—যথারীতি চোখ দুটি মিটমিট করে তাকাল—তারপর গম্ভীর মুখে ইলেংকার দিকে এগিয়ে গেল। "এবার, তুমি এই খেলাটা দেখাও; সত্যি এটা শক্ত কিছু নয়।" সকলেই তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে গ্রাপের মুখ লাল হয়ে উঠল, ক্ষীণ গলায় বলল, সে হয় তো পারবে না।

"ব্যাপারটা কি হে বাপু? ও কিছুই করবে না কেন? তোমরা কি মনে কর ও একটা মেয়ে! ওকে মাথার উপর দাঁড়াতেই হবে।"

সেরিওঝা তার হাত ধরে টানল।

ইলেংকাকে ঘিরে ধরে আমরা সকলেই চেঁচিয়ে উঠলাম, "হ্যা, হ্যা, মাথার উপর দাঁড়াও, এক্ষুণি!" ইলেংকা ভীষণ ভয় পেল, তার মুখটা সাদা হয়ে গেল। আমরা তার হাত ধরে টানতে টানতে অভিধানটার কাছে নিয়ে গেলাম।

"আমাকে ছেড়ে দাও; আমি নিজেই করব; তোমরা যে আমার জামাটাই ছিঁড়ে ফেলবে," ছেলেটি চীৎকার করে বলল। তার হতাশ চীৎকারে আমাদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল; হাসতে হাসতে দম বন্ধ হবার যোগাড়; সবুজ জামাটার প্রতিটি সেলাইতে পট্-পট্ শব্দ উঠল।

ভলদিয়া ও বড় আইভিন তার মাথাটা নীচু করে অভিধানের উপর বসিয়ে দিল; বেচারি পা দুটো ছুঁড়তে লাগল; সেরিওঝা ও আমি তার সরু পা দুটো চেপে ধরলাম, হাঁটু পর্যন্ত তার ট্রাউজারটা গুটিয়ে দিলাম, এবং হো-হো করে হাসতে হাসতে তার পা দুটোকে উপরের দিকে তুলে ধরলাম; আর ছোট আইভিন বাকি শরীরটার ভারসাম্য রক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ আমাদের সব হাসি থেমে গেল; সকলেই চুপ করে গেলাম; ঘরটা এত চুপচাপ হয়ে গেল যে কেবলমাত্র অভাগা গ্রাপের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দই শোনা যেতে লাগল। সেই মুহূর্তে আমি যেন ঠিক বুঝতে পারছিলাম না যে এর সবটাই হাস্যকর ও মজার ব্যাপার কি না।

সেরিওঝা তার পিঠ চাপড়ে বলল, "এই তো খাসা ছেলে।"

ইলেংকা চুপ করে রইল, নিজেকে ছাড়াবার জন্য চারদিকে পা ছুঁড়তে লাগল। বেপরোয়াভাবে পা ছোঁড়ার ফলে তার গোড়ালিটা প্রচণ্ড জোরে সেরিওঝার চোখে আঘাত করল; সঙ্গে সঙ্গে ইলেংকার পা ছেড়ে দিয়ে সে নিজের চোখটা চেপে ধরল আর ইলেংকাকে সজোরে ঠেলে দিল। ইলেংকাকে

তখন কেউ ধরে নেই; তাই সে সশব্দে মেঝেতে আছড়ে পড়ল; চোখের জলে শুধু বলে উঠল :

"কেন তোমরা আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ?"

বেচারি ইলেংকার শোচনীয় চেহারা, অশ্রুসিক্ত মুখ, এলোমেলো চুল ও গোটানো ট্রাউজার বুঝি আমাদের সুবুদ্ধি ফিরিয়ে আনল; চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমরা একটু-একটু হাসতে লাগলাম।

সেরিওঝাই প্রথমে আত্মস্থ হল।

ইলেংকাকে পা দিয়ে একটু ঠেলে দিয়ে বলল, শিকনি-ঝরা ছিচকাঁদুনে খোকা! একটা ঠাট্টাও বোঝে না। খুব হয়েছে। এবার উঠে পড়।"

ইলেংকা সক্রোধে বলল, "তুমি ভীষণ দুষ্টু ছেলে!" এক পাশে সরে গিয়ে সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

"কী! আমাকে লাথি মেরে আবার আমাকেই গালাগালি।" অভিধানটা তুলে নিয়ে হতভাগা ছেলেটার মাথার উপর ঘোরাতে ঘোরাতে সেরিওঝা চীৎকার করে বলল। ছেলেটা আত্মরক্ষার কথা না ভেবে দুই হাতে শুধু মাথাটা ঢাকল।

"এই নে! এই নে! ও যখন ঠাট্টাই বোঝে না তখন ওকে ছেড়ে দাও। চল আমরা নীচে যাই," জোর করে হেসে উঠে সেরিওঝা বলল।

আমি সহানুভূতির সঙ্গে বেচারির দিকে তাকালাম; অভিধানের উপর লুকিয়ে সে মেঝেতে পড়ে আছে; এমনভাবে কাঁদছে যে সারা শরীরের কাঁপুনির ফলে সে হয় তো মরেই যাবে।

বললাম, "আহা সের্গেই, কেন তুমি ও কাজ করলে?"

"বেশ করেছি। আমার হাঁটুটা কেটে যখন হাড় বেরিয়ে পড়ল তখন আমি তো কাঁদি নি; কেঁদেছিলাম কি?"

আমি ভাবলাম, "হ্যাঁ, তা তো ঠিক। ইলেংকা নেহাৎই ছিচকাঁদুনে খোকা। আর সেরিওঝা কেমন বীরপুরুষ!"

আমি ভাবতেই পারি নি যে ইলেংকার কান্নার কারণ যতটা তার শারীরিক কষ্ট তার চাইতেও বেশী এই চিন্তা যে, যে পাঁচটি ছেলেকে সে ভালবাসে তারা সকলেই অকারণে তাকে এই ঘৃণা ও উৎপীড়ণ করার কাজে যোগ দিয়েছে।

আমার নিজের নিষ্ঠুর আচরণের কোন ব্যাখ্যা আমি নিজেই খুঁজে পাই না। কেন আমি এগিয়ে গেলাম না, তাকে রক্ষা করলাম না, সান্ত্বনা দিলাম না? একটা কাকের ছানাকে বাসা থেকে পড়ে যেতে দেখে, অথবা একটা কুকুর-ছানাকে বাইরে ফেলে দিতে দেখে, আমার রাঁধুনি একটা মুরগির ছানাকে ঝোল রাঁধতে নিয়ে যেতে দেখে, যে গভীর সমবেদনায় আমি হাউ-হাউ করে কেঁদেছিলাম, আমার সে মন কোথায় গিয়েছিল?

সেরিওঝার প্রতি ভালবাসা এবং তার চোখে নিজেকে তার মতই

পুরুষোচিত দেখাবার বাসনাই কি মনের এই সুন্দর অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করেছিল? তাই যদি হয়, তাহলে সে ভালবাসা, সে বাসনা কিছুতেই ঈর্ষা করবার মত গুণ হতে পারে না। আমার শৈশব স্মৃতির পাতায় সেগুলিই একমাত্র কলংকের দাগ।

অধ্যায়—২০
অতিথি সমাগম

ভাঁড়ার ঘরের কর্মব্যস্ততা, উজ্জ্বল আলোকসজ্জায় ঝলমল বসার ঘর ও অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট বড় ঘর, বিশেষ করে প্রিন্স আইভানিচ কর্তৃক তার সঙ্গীতশিল্পীদের আমাদের বাড়ি পাঠানো—এইসব দেখে-শুনেই বুঝতে পারছিলাম যে সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাড়িতে অনেক অতিথির সমাগম হবে।

প্রতিটি গাড়ির শব্দ শুনলেই আমি জানালায় ছুটে গেলাম, কাঁচের উপর নাকটা চেপে ধরে ধৈর্যহীন কৌতূহলে বাইরে উঁকি মেরে দেখতে লাগলাম। অন্ধকারের ভিতরে প্রথমে কিছুই দেখা গেল না, কিন্তু ক্রমে রাস্তার ওপারের পরিচিত দোকানটা, তার পাশের লণ্ঠনটা দেখতে পেলাম; আরও দূরে নীচ তলায় দুটো আলোকিত জানালাসহ একটা বড় বাড়ি; রাস্তার মাঝখানে দু'জন যাত্রীসহ একটা বাজে ভাড়াটে গাড়ি; অথবা একটা খালি কালাশ ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। এবার একটা গাড়ি এসে ফটকে দাঁড়াল; নিশ্চয় আইভিনরা এসেছে এই আশায় আমি ছুটে নীচে গেলাম। কিন্তু তাদের পরিবর্তে তকমাধারী চাকরদের পিছনে দেখা গেল দুটি মহিলাকে: একজন লম্বা, পরনে কালো কলারের নীল জোব্বা; অপরজন ছোটখাট, সারা অঙ্গ একখানা সবুজ শালে জড়ানো; তার নীচে শুধু লোমের জুতোপরা পা দুটি দেখা যাচ্ছে। যদিও কর্তব্যবোধে আমি তাদের দেখে মাথা নোয়ালাম, তারা কিন্তু আমাকে খেয়ালই করল না; ছোটজন বড়র কাছে গিয়ে থামল। বড় তার মাথার রুমালটা খুলে দিল, জোব্বার বোতাম খুলে দিল, এবং তকমাধারী পরিচারক এসে পোশাকগুলি হাতে নিয়ে তার পায়ের ছোট লোমের জুতো জোড়াও খুলে নিল। তখন সেই সব পোশাকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বছর বারো বয়সের একটি ছোট্ট সুন্দরী মেয়ে; পরনে নীচু-গলার সাদা মসলিনের ফ্রক, কুঁচি-দেওয়া সাদা পাজামা আর ছোট্ট দুটি কালো চটি। গলায় কালো ভেলভেটের একটা ফিতে বাঁধা; মাথায় বাদামী রঙের কোঁকড়ানো চুলের ঢেউ; তাতে তার মুখটা আশ্চর্য রকম সুন্দর দেখাচ্ছে; চুলগুলি এমন আশ্চর্য সুন্দরভাবে তার সাদা কাঁধের উপর এসে পড়েছে যে স্বয়ং কার্ল আইভানিচ এসে যদি বলতেন যে "মস্কো গেজেট"-এর নির্দেশ মত সারাটা সকাল ধরে ঐ চুল কোঁকড়ানো হয়েছে এবং গরম লোহা

দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলেও সেকথা আমি বিশ্বাস করতাম না। দেখে মনে হল, ঐ কোঁকড়ানো চুলের শোভা নিয়েই সে জন্মেছে।

সকলের অলক্ষ্যে হল-ঘরে ঢুকে পড়ে একবার এগিয়ে একবার পিছিয়ে হাঁটতে লাগলাম, এমন ভাব দেখালাম যেন আমি গভীর চিন্তায় ডুবে আছি, অতিথিরা যে এসে গেছে সেদিকে আমার খেয়াল নেই। তারা ঘরের মাঝখানে এসে পৌঁছলে আমি এগিয়ে গিয়ে মাথা নুইয়ে জানালাম, দিদিমা বসার ঘরেই আছে। মাদাম ভালাখিনা, তার মুখটা ঠিক তার মেয়ে সোনেচ্‌কার মত বলেই তাকে আমার খুব ভাল লেগেছে, ললিত ভঙ্গীতে আমার দিকে মাথাটা নাড়ল।

সোনেচ্‌কাকে দেখে দিদিমা খুব খুশি; তাকে কাছে ডেকে কপালের উপর নেমে-আসা একগুচ্ছ চুলকে সরিয়ে দিয়ে তার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, "এ যে মনোহারিণী শিশু সুন্দরী!" সোনেচ্‌কা ঈষৎ লজ্জায় এমন সুন্দর ভাবে রাঙা হয়ে উঠল যে তা দেখে আমিও লাল হয়ে গেলাম।

তার থুত্‌নি ধরে মুখখানি তুলে দিদিমা বলল, "আশা করি এখানে তুমি একঘেয়ে বোধ করবে না লক্ষ্মী মেয়ে। বেশ মজা কর, মনের সাধ মিটিয়ে নাচ।" মাদাম ভালাখিনার দিকে মুখ ফিরিয়ে আমার গায়ে হাত দিয়ে দিদিমা আরও বলল, "তাহলে আমাদের একটি মহিলা ও দুটি ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই হাজির দেখছি।"

এভাবে আমাদের কাছাকাছি এনে দেওয়ায় আমি খুশিতে আবার লাল হয়ে উঠলাম।

আমার লাজুকতা বেড়েই চলেছে বুঝতে পেরে এবং গাড়ির চাকার শব্দ শুনতে পেয়ে আমি সেখান থেকে সরে গেলাম। বাইরের ঘরে একটি ছেলে ও অবিশ্বাস্য সংখ্যক মেয়েসহ প্রিন্সেস কর্ণাকোভাকে দেখতে পেলাম। মেয়েগুলো সব একেবারে একরকম—প্রিন্সেসের মতই দেখতে; কুৎসিত, তাদের একজনও দেখবার মত নয়। জোব্বা খুলে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে তারা কর্কশ গলায় কথাবার্তা ও হাসিঠাট্টায় মেতে উঠল। এতিয়েনের বয়স পনেরো বছর; লম্বা, থলথলে চেহারা, রক্তহীন মুখ, চোখ দুটো বসে গেছে, তার নীচে নীল দাগ পড়েছে, হাত ও পা বয়সের তুলনায় অনেক বেশী বড়। নিজেকে নিয়ে তাকে বেশ তুষ্টই মনে হল, কিন্তু আমার মতে সে সেই ধরনের ছেলে যাদের ছড়ি দিয়ে পেটানো হয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ দু'জনই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলাম; মুখে কেউ কিছু বললাম না, দু'জনে দু'জনকে শুধু দেখতে লাগলাম। তারপর কাছাকাছি এগিয়ে গেলাম, হয়তো পরস্পরকে চুমো খেতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে কি জানি কেন মনের ইচ্ছাটা বদলে গেল। তার বোনদের পোশাকের খস্‌খসানি মিলিয়ে গেলে কথাবার্তা শুরু করার উদ্দেশ্যেই জানতে চাইলাম,

গাড়িতে বড় বেশী লোকের ভিড় ছিল নাকি।

সে জবাব দিল, "আমি জানি না, কারণ আমি কখনও গাড়ির ভিতরে চড়ি না, গাড়িতে চড়লে আমি অসুস্থ বোধ করি। মামণি তা জানে। সন্ধ্যায় কোথাও যেতে হলে আমি বক্সে উঠে বসি। তোফা আরামে যাওয়া যায়; সব কিছু দেখা যায়; ফিলিপ আমাকে গাড়ি চালাতে দেয়, অনেক সময় আমি চাবুকও ধরি।" তারপর অর্থপূর্ণ ভঙ্গী করে বলল, "অনেক সময় পথচারীদেরও নজর পড়ে। সে ভারী মজা হয়!"

পরিচারক ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, "ইয়োর এক্সেলেন্সি, ফিলিপ জানতে চাইছে আপনি চাবুকটা কোথায় রেখেছেন।"

"কেন, তাকেই তো দিয়েছি।"

"সে বলছে দেন নি।"

"তাহলে লণ্ঠনের উপর ঝুলিয়ে রেখেছি।"

"ফিলিপ বলছে লণ্ঠনের উপরেও নেই; বরং আপনি বলুন যে ওটা আপনি হারিয়ে ফেলেছেন, নইলে আপনার দুষ্টুমির জন্য ফিলিপকে নিজের টাকা থেকে ওটার দাম দিতে হবে।" বলতে বলতে পরিচারকটির রাগ চড়তে লাগল।

ঝামেলা এড়াবার জন্য এতিয়েন বলল, "বেশ তো, তাহলে হারিয়েই ফেলেছি, তাতে কি হল? চাবুকের দাম তাকে দিয়ে দেব। ভারী মজার ব্যাপার, বুঝলে?" বলতে বলতে সে আমাকে নিয়ে বসার ঘরের দিকে এগিয়ে চলল।

"মাফ করবেন স্যার, কি করে আপনি দামটা দেবেন? আমি তো জানি, আট মাস ধরেই আপনি মারিয়া ভাসিলিয়েভ্‌নাকে বিশ কোপেক দিচ্ছেন, আমার বেলায়ও ঠিক তাই, আর আজ দু'বছর হল পেত্রুশ্‌কা—"

"মুখ সামলে কথা বল্!" রাগে আগুন হয়ে প্রিন্স চেঁচিয়ে বলল। "আমি বলে দেব।"

"বলে দেব, বলে দেব!" পরিচারক ঠাট্টা করে উঠল। "আপনার লজ্জা হওয়া উচিত ইয়োর এক্সেলেন্সি," তার কথা শেষ হবার আগেই আমরা বসার ঘরে ঢুকে গেলাম।

"ঠিক হয়েছে। ঠিক হয়েছে!" পিছন থেকে কার যেন সমর্থনসূচক গলা শোনা গেল।

বসার ঘর ও অতিথিদের ঘর ক্রমে ভরে গেল। ছোটদের পার্টিতে যেমন সচরাচর হয়ে থাকে, কিছু অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়ে জুটে যায়, নাচবার ও ফূর্তি করবার এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না, কিন্তু এমন ভাব দেখায় যেন গৃহকর্ত্রীকে সুখী করার জন্যই এ সব করছে।

আইভিনরা যখন এসে পড়ল তখন সেরিওঝার সান্নিধ্যে সাধারণত যে আনন্দ

আমি পাই তার বদলে আমার মনে একটা আশ্চর্য বিরক্তির ভাব দেখা দিল ; আমার কেবলই মনে হতে লাগল, এবার সে সোনেচ্‌কাকে দেখবে, আর সোনেচ্‌কা তাকে দেখবে।

অধ্যায়—২১

মাজুর্কার আগে

বসার ঘর থেকে এসে পকেট থেকে একজোড়া নতুন কিডের দস্তানা বের করে সেরিওঝা বলল, "মনে হচ্ছে এবার নাচ হবে। আমি কিন্তু দস্তানা পরে নেবই।"

আমি ভাবলাম, "আমরা কি করব—আমাদের তো দস্তানা নেই ; দোতলায় গিয়ে দেখি, যদি কোথাও খুঁজে পাই।"

সবগুলো টানা খুঁজেও পেলাম শুধু বেড়াতে যাবার উপযোগী সবগুলো আঙুল একসঙ্গে ঢাকা সবুজ দস্তানাগুলো আর কিডের এমন একটা দস্তানা যেটা আমার কোন কাজেই লাগবে না—প্রথমত, সেটা খুব পুরনো আর নোংরা, দ্বিতীয়ত, আমার হাতের তুলনায় অনেক বড়, আর বিশেষত, সেটার মাঝখানের আঙুলটা নেই, অনেক আগেই কেটে বাদ দেওয়া হয়েছিল, সম্ভবত হাতে ঘা হবার জন্য কার্ল আইভানিচই কেটেছিলেন। তবু দস্তানার সেই ধ্বংসাবশেষটাই হাতে পড়ে নিলাম, আর আমার মধ্যমার যে জায়গাটায় সব সময় কালির দাগ লেগে থাকে সেই দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"নাতালিয়া সাবিশ্‌না এখানে থাকলে নিশ্চয় এক জোড়া দস্তানা এনে দিতে পারত।" দস্তানা ছাড়া নীচে যাওয়া তো অসম্ভব, কারণ কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে আমি নাচিনি কেন তাহলে কি উত্তর দেব? এখানে থাকাও তো সমান অসম্ভব, কারণ সকলে নিশ্চয় আমার খোঁজ করবে। কি করা যায়?

দৌড়ে এসে ভলদিয়া শুধাল, "এখানে কি করছ? যাও, তোমার মনের মত সঙ্গিনী ঠিক কর, এখনই নাচ শুরু হবে।"

নোংরা দস্তানার মধ্যে দুটো আঙুল একসঙ্গে ঢোকানো হাতটা দেখিয়ে হতাশ গলায় বললাম, "ভলদিয়া, তুমি এটার কথা ভুলে গেছ।"

সে অধৈর্য হয়ে বলল, "কি? ওহো! দস্তানা। ওটা আমাদের নেই তা ঠিক। দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করে আসি।" কিছু না ভেবে চিন্তেই সে ছুটে নীচে চলে গেল।

যে ব্যাপারটা আমার কাছে খুব বড় বলে মনে হয়েছিল, সেটাকে সে এমন হাল্কা করে দেখায় আমিও তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলাম ; আমার বাঁ হাতে যে তখনও ছেঁড়া দস্তানাটাই পরা রয়েছে সেটা একেবারেই ভুলে গেলাম।

সতর্কভাবে দিদিমার হাতল-চেয়ারটার কাছে পৌঁছে তার ঢিলে জামাটা ছুঁয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললাম :

"দিদিমা, কি করি বল তো ? আমাদের যে দস্তানা নেই।"

"কি বলছ সোনা ?

আরও কাছে গিয়ে দুটো হাতই চেয়ারের হাতলের উপর রেখে আবার বললাম, "আমাদের তো দস্তানা নেই।"

সঙ্গে সঙ্গে আমার বাঁ হাতের উপর নজর পড়ায় দিদিমা বলে উঠল, "আরে, এটা কি ?" মাদাম ভালাখিনার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, "দেখ, দেখ মা চেয়ে, তোমার মেয়ের সঙ্গে নাচবে বলে এই যুবকটি কী সুন্দর সেজেছে।"

আমার হাতটা চেপে ধরে দিদিমা উপস্থিত অতিথিদের দিকে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে রইল। ক্রমে সকলেরই কৌতূহল মিটে গেল, সকলেই প্রাণ খুলে হাসতে লাগল।

সেই মুহূর্তে যদি সেরিওঝা আমাকে দেখতে পেত তাহলে আমি খুবই বিচলিত হতাম ; লজ্জায় ভ্রূকুটি করে বৃথাই আমার হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলাম ; কিন্তু সোনেচ্‌কার উপস্থিতিতে আমি মোটেই অপদস্থ বোধ করলাম না ; সে বেচারি হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলল ; তার দুই চোখ জলে ভরে উঠল, রাঙা মুখে ছড়িয়ে পড়ল কোঁকড়া চুলের রাশি। বুঝতে পারলাম, তার হাসি আন্তরিক ও সহজ, মোটেই ঠাট্টার হাসি নয় ; বরং আমরা দুজনই হেসে উঠলাম। আর সেই হাসি আমাদের দুজনকে আরও কাছাকাছি এনে দিল।

সোনেচ্‌কা ভালাখিনা যখন আমার ঠিক উল্টো দিকেই কিম্ভুত ছোট প্রিন্সটির সঙ্গে ফরাসী কোয়াড্রিল নাচতে লাগল তখন তাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছিল। পালাক্রমে সে যখন তার ছোট হাতখানি আমার হাতে রাখল তখন কী মিষ্টি করে সে হাসল ! তার সোনালী চুলের গুচ্ছ কী সুন্দর তালে তালে দুলতে লাগল, কী সহজভাবে সে দুটো পা-কে এক করে দাঁড়াল ! নাচের পঞ্চম পর্বে আমার সঙ্গিনী যখন আমাকে রেখে অন্য দিকে গেল এবং আমি একক নৃত্যের তালের জন্য অপেক্ষা করে ছিলাম, তখন সোনেচ্‌কা ঠোঁটে ঠোঁট চেপে অন্যদিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু আমাকে নিয়ে তার ভয়ের কোন কারণ ছিল না। বেশ সাহসের সঙ্গেই একবার সামনে পা ফেললাম। একবার পিছনে, আর তার পরেই ঘুরে গেলাম ; তারপর তার দিকে এগিয়ে গিয়ে কৌতুকের ছলে দুটো আঙুল বের-করা আমার ছেঁড়া দস্তানাটা তাকে দেখালাম। সে তো হেসে একেবারে কুটিপাটি ; মোমে-মাজা মেঝের উপর আরও মনোহারী ভঙ্গীতে পা ফেলে নাচতে লাগল। নাচের শেষে বৃত্তাকার হয়ে দাঁড়িয়ে আমরা যখন একত্রে হাতে হাত মেলালাম, সে তার ছোট মাথাটি ঈষৎ নোয়াল, আর আমার হাত থেকে নিজের হাতটা না সরিয়ে তার দস্তানা

দিয়ে নাকটা একটু ঘসে নিল। তখনকার সে ছবি আমার আজও মনে পড়ে। মনে হয় যেন চোখের সামনে সে সব দেখছি, আর যে "দানিয়ুব সুন্দরী" সঙ্গীতের তালে এসব ঘটেছিল তাও যেন কানে শুনতে পাচ্ছি।

দ্বিতীয় কোয়াড্রিলটা সোনেচ্‌কার সঙ্গেই নাচলাম। অথচ বিরতির সময় যখন একসঙ্গে গিয়ে বসলাম তখন কেমন যেন অস্বস্তি লাগল, তাকে কি যে বলব তাই বুঝতে পারলাম না। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পরে আমার ভয় হল যে সে হয়তো আমাকে বোকা মনে করবে; সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলাম সেটা কিছুতেই ঘটতে দেওয়া হবে না। ফরাসীতে একটা প্রশ্ন করলাম, সেও ফরাসীতে জবাব দিল। আরম্ভটা ভালই হল, আমার ফরাসী ভাষায় জ্ঞানের বহরটাও তাকে জানানো হল। কিন্তু এভাবে বেশীক্ষণ আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল না। এদিকে আবার আমাদের নাচের পালা আসতেও অনেক দেরী আছে; ফলে আবার নেমে এল সেই নীরবতা। এমন সময় সে হুম্ করে বলে বসল, "এমন মজার দস্তানা তুমি কোথায় পেলে?" আমিও মহা খুশি হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তাকে বললাম যে দস্তানাটা কার্ল আইভানিচের।

কোয়াড্রিল শেষ হলে সোনেচ্‌কা এমন মিষ্টি করে বলল "তোমাকে ধন্যবাদ" যেন সত্যি তার কৃতজ্ঞতা আমার প্রাপ্য। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম; এমন দুঃসাহসিক আত্মবিশ্বাস কোথা থেকে পেলাম তা আমি নিজেই জানি না। ঘরময় পায়চারি করতে করতে ভাবলাম, "কিছুই আমাকে অপ্রস্তুত করতে পারবে না; সব কিছুর জন্য আমি তৈরি।"

সেরিওঝা তার বদলে আমাকে নাচতে বলল। আমি বললাম, "ঠিক আছে; আমার কোন সঙ্গিনী নেই, তবে খুঁজে নিতে পারব।" ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম মহিলাদের সকলেরই সঙ্গী জুটে গেছে—শুধু একটি তরুণী অতিথি-কক্ষের দরজায় একাকি দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল একটি যুবক তাকে নাচে আমন্ত্রণ জানাতেই এগিয়ে গেল; সে তার প্রায় কাছে পৌঁছে গেছে, আর আমি ছিলাম হলের শেষ প্রান্তে। চোখের নিমেষে আমি যেন উড়ে চলে গেলাম তার কাছে, তাকে নাচে আমন্ত্রণ করলাম। তরুণীটি অনুগ্রহের হাসি হেসে হাতটা বাড়িয়ে দিল; যুবকটি সঙ্গিনীবিহীন অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে রইল।

আমি তখন আত্মশক্তিতে এত বেশী সচেতন যে, যুবকটির বিরক্তিটা তাকিয়েও দেখিনি, যদিও পরবর্তী কালে জেনেছিলাম, যে নোংরা ছেলেটা লাফিয়ে এসে তার সঙ্গিনীকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার সম্পর্কে সে নাকি খোঁজখবর করেছিল।

অধ্যায়—২২

মাজুর্কা

যে যুবকের সঙ্গিনীকে আমি ছিনিয়ে আনলাম সে মাজুর্কা নাচল প্রথম জুটিতেই। কিন্তু মিমি আমাদের যে রকম শিখিয়েছে সে ভাবে না নেচে সে নাচতে লাগল সম্পূর্ণ অন্য রীতিতে।

মাজুর্কায় আমার কোন সঙ্গী ছিল না, তাই দিদিমার উঁচু চেয়ারটার পিছনে বসে আমি দেখছিলাম।

ভাবলাম, "ও লোকটা এভাবে নাচে কেন? মিমি তো আমাদের এভাবে শেখায় নি। সে সব সময় বলত, সকলেই মাজুর্কা নাচে আঙুলের উপর ভর দিয়ে, পা দুটোকে ঘুরন্ত ভঙ্গীতে চালিয়ে। কিন্তু এরা তো সেভাবে নাচছে না। আইভিনরা, এতিয়েন, এমন কি ভলদিয়াও দেখছি নতুন কায়দাটা রপ্ত করে নিয়েছে। এটা খারাপ নয়। সোনেচ্‌কাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে! ঐ সে যাচ্ছে!"

আমি খুব খুশি।

মাজুর্কা শেষ হয়ে এসেছে। কয়েকটি বর্ষিয়সী মহিলা ও ভদ্রলোক দিদিমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। পিছনের ঘরে খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। দিদিমা খুবই ক্লান্ত, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথা বলছে, তাও খুব আস্তে। বাজিয়েরা ত্রিশতমবার একই সুর বাজাচ্ছে। যে তরুণীটির সঙ্গে আমি নেচেছিলাম, বিচিত্র হাসি হেসে সে সোনেচ্‌কা ও অসংখ্য প্রিন্সেসদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে এসে শুধাল, "গোলাপ, না বিছুটি?"

মুখটা ফিরিয়ে দিদিমা বলল, "আচ্ছা, তুমি এখানে! যাও, নাচতে যাও।"

সেই মুহূর্তে দিদিমার চেয়ারের পিছন থেকে বেরিয়ে না এসে সেখানে মাথা লুকিয়ে থাকতেই আমার ভাল লাগছিল; তবু তাদের প্রত্যাখ্যানই বা করি কেমন করে? সোনেচ্‌কার দিকে ভীরু চোখে তাকিয়ে বললাম, "গোলাপ।" সম্বিত ফিরে পাবার আগেই বুঝতে পারলাম কার যেন কিডের সাদা দস্তানা-পরা হাত আমার হাতের উপর নেমে এল; স্মিত হেসে প্রিন্সেস এগিয়ে চলল; কেমন করে পা ফেলতে হয় তার কিছুই যে আমি জানি না সে সম্পর্কে এতটুকু সন্দেহ তার মনে জাগল না।

আমি জানি, এ-নাচের যে রীতির সঙ্গে আমি পরিচিত সেটা এখানে অচল, অনুচিত, এমন কি আমার লজ্জার কারণও হতে পারে; কিন্তু মাজুর্কার অতি-পরিচিত বাজনার সুর আমার কানের ভিতর দিয়ে এসে আমার শ্রবণ-স্নায়ুগুলিকে চঞ্চল করে তুলল, আর সে চাঞ্চল্য আমার দুই পায়ে পৌঁছে আঙুলের উপর ভর-করা মারাত্মক বৃত্তাকার গতিতে আপনা থেকেই রূপান্তরিত হল। দর্শকরা সকলেই বিস্ময়ে বিমূঢ়। সেই বিপরীতধর্মী নাচের পরিণতিতে

একসময় এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হল যে, নিজের গতির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নাচের বদলে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি অদ্ভুতভাবে পা ঠুকতে ঠুকতে একসময় একেবারেই থেমে গেলাম। সকলেই আমাকে দেখছে! কেউ অবাক হয়ে, কেউ কৌতূহলের সঙ্গে, আবার কেউবা সহানুভূতির সঙ্গে; শুধু দিদিমাই তাকিয়ে রইল নির্বিকার ভঙ্গীতে।

বাপির ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর আমার কানে এল, "যখন নাচতে জান না তখন নাচতে এসো না।" আমাকে আস্তে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে আমার সঙ্গিনীর হাত ধরে পুরনো প্রথায়ই এক পাক নাচল। তা দেখে সকলেই খুশি হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মাজুর্কা নাচের পর্ব শেষ হল।

হে প্রভু, কেন তুমি এমন ভয়ংকর শাস্তি আমাকে দাও?

* * *

সকলেই আমাকে ঘৃণা করে, চিরকাল ঘৃণা করবে। ভালবাসা, বন্ধুত্ব, সম্মান—সব পথই আমার সামনে অবরুদ্ধ। সব শেষ! ভলদিয়া কেন আমাকে ইসারা করল যা সকলেই দেখল অথচ আমার কোন কাজে এল না? ঘৃণ্য প্রিন্সেস কেন ওভাবে আমার পায়ের দিকে তাকাল? মিষ্টি সোনেচ্‌কাই বা ঠিক সেই সময় হাসল কেন? বাপিই বা রাগে লাল হয়ে আমার হাত চেপে ধরল কেন? আমি কি তারও লজ্জার কারণ হয়েছিলাম? ওঃ, কী সাংঘাতিক! মামণি এখানে থাকলে তার নিকোলেংকার জন্য কখনও লজ্জা পেত না। কল্পনায় আমার মন বহুদূরে এক মধুর পরিবেশে চলে গেল। মনে পড়ল বাড়ির সামনে সেই মাঠ। বাগানের উঁচু লেবুগাছের সারি, পরিষ্কার পুকুরটার বুকে চাতক পাখিদের কিচির-মিচির, নীল আকাশ থেকে ঝুলে-থাকা সাদা স্বচ্ছ মেঘের দল, তাজা খড়ের গাদার গন্ধ; আমার বিকৃত কল্পনায় ভর দিয়ে ভেসে এল আরও অনেক আনন্দময় সান্ত্বনাদায়ক স্মৃতি।

অধ্যায়—২৩
মাজুর্কার পরে

নৈশভোজনের সময় যে যুবকটি প্রথম জুটিতে নেচেছিল সে এসে ছোটদের টেবিলে বসল এবং আমার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে লাগল। তখন আমি যে দুর্দশার মধ্যে ছিলাম তা না হলে এতে আমি হয়তো বেশ খুশিই হতাম। তবু আমাকে খুশি করতে সে যেন কৃতসংকল্প। সে আমার সঙ্গে রসিকতা করল। আমার কত প্রশংসা করল, বড়দের লুকিয়ে নানা বোতল থেকে মদ এনে আমাকে খাওয়ানোর জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। নৈশ-ভোজনের পরে খানসামা যখন আমার ছোট গ্লাসটায় মাত্র সিকি গ্লাস শ্যাম্পেন ঢালল তখন যুবকটি জেদ করে পুরো গ্লাস ঢালিয়ে নিয়ে একচুমুকে আমাকে

সবটা খাইয়ে দিল। শরীরের মধ্যে বেশ একটা গরম ভাব দেখা দিল, যুবকটির প্রতি মনে একটা সদয় ভাব জাগল, আমি খুশিতে হেসে উঠলাম।

হঠাৎ নাচ-ঘরে "পিতামহ নৃত্যের" বাজনা বেজে উঠল আর অতিথিরা টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল। যুবকটির সঙ্গে আমার বন্ধুত্বেরও ইতি ঘটল; সে বড়দের দলে ভিড়ে গেল। আর আমিও তাকে অনুসরণ না করে মাদাম ভালাখিনা মেয়েকে কি বলছে সেটা শুনবার জন্য সেই দিকে এগিয়ে গেলাম।

"আর ঠিক আধা ঘণ্টা," সোনেচ্‌কা মিনতি জানাল।

"অসম্ভব সোনা।"

"শোন, অন্তত আমার খাতিরে," মেয়েটি বলল।

"কাল আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে কি তুমি খুশি হবে?" মাদাম ভালাখিনা বলল।

"তাহলে আমরা থাকছি? কি বল?" সোনেচ্‌কা খুশিতে নেচে উঠল।

"কি আর করা যাবে। ঠিক আছে, যাও, নাচগে। এইতো তোমার জুটি," আমাকে দেখিয়ে বলল।

আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সোনেচ্‌কা নাচ-ঘরে ছুটল।

মদের নেশা, সোনেচ্‌কার উপস্থিতি এবং ফূর্তি আমাকে মাজুর্কার কষ্টটা একেবারেই ভুলিয়ে দিল। পা দিয়ে মজার সব কৌশল দেখাতে লাগলাম; প্রথমে ঘোড়ার নকল করে গর্বিত ভঙ্গীতে দুই পা তুলে দুল্‌কি চালে চলতে লাগলাম; তারপর কুকুরের তাড়া-খাওয়া ভেড়ার মত একই জায়গায় পা ঠুকে হো-হো করে হেসে উঠলাম; দর্শকরা কি ভাবছে না ভাবছে সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। সোনেচ্‌কাও অবিরাম হাসছে।

দিদিমার পড়ার ঘরের ভিতর দিয়ে যাবার সময় আয়নায় একঝলক নিজেকে দেখলাম; মুখটা ঘামে ভিজে গেছে, চুলগুলো এলোমেলো, মাথার উপরকার চুলের গোছাটা আরও বাজে দেখাচ্ছে; কিন্তু সাধারণভাবে আমাকে এত ফূর্তিবাজ ও স্বাস্থ্যবান দেখাচ্ছে যে আমি নিজেই খুশি হয়ে উঠলাম।

মনে মনে বললাম, "সব সময় যদি এ রকম থাকতে পারি তাহলে এখনও ওর মন পেতে পারি।"

কিন্তু আবার যখন সঙ্গিনীর সুন্দর মুখখানির দিকে তাকালাম তখন তার সে রূপের বহর দেখে নিজের উপরই বিরক্ত হয়ে উঠলাম; বেশ বুঝলাম, এরকম একটি আশ্চর্য প্রাণীকে আকর্ষণ করার আশা আমার পক্ষে দুরাশামাত্র।

ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা পাবার আশা আমি করতে পারি নি; বস্তুত সে কথা আমি ভাবিই নি; সুখে আমার অন্তর উপ্‌চে উঠছে। এই সুখ যেন কোন দিন শেষ না হয়—এই কামনা ছাড়া আর কিছু যে কামনা

করা যায়, এর চাইতেও বড় সুখ যে কেউ চাইতে পারে, সে কথা আমি কল্পনায়ও আনতে পারি নি। আমি সুখী, হৃদয় আমার কপোতের মত নেচে উঠেছে, রক্তে দোলা লেগেছে, আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছে।

বারান্দাটা পার হবার সময় সিঁড়ির নীচেকার অন্ধকার ভাঁড়ার ঘরটার দিকে তাকিয়ে মনে হল ; ওকে নিয়ে যদি চিরকাল এই অন্ধকার ভাঁড়ার ঘরে বাস করতে পারতাম, আর আমরা যে এখানে আছি কেউ যদি তা না জানত, তাহলে কী সুখই না হত !

"খুব খুশির রাত, তাই না ?" শান্ত, কাঁপা গলায় কথাটা বলেই আমি দ্রুত এগিয়ে গেলাম। কেমন যেন ভয় হল।

"হ্যাঁ, খুব," মাথাটা আমার দিকে ঘুরিয়ে এমনভাবে সে জবাবটা দিল যে আমার সব ভয় দূর হয়ে গেল।

"বিশেষ করে নৈশ ভোজনের পরে। জানেন, আপনারা একটু পরেই চলে যাবেন, আর কোনদিন আমাদের দেখা হবে না, তাতে আমি যে কত দুঃখ পাচ্ছি তা যদি জানতেন !"

"কেন দেখা হবে না ? মামণি ও আমি তো প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার তিভার্স্কয় বুল্‌ভার্দে বেড়াতে যাই। আপনি কি কখনও বেড়াতে যান ?"

"পরের মঙ্গলবার যাবার অনুমতি চাইব ; অনুমতি না দিলে একাই পালিয়ে চলে যাব, টুপি না নিয়েই। আমি পথটা চিনি।"

সোনেচ্‌কা হঠাৎ বলে উঠল, "এই মুহূর্তে আমি কি ভাবছিলাম জানেন ? যে সব ছেলেরা আমাদের বাড়িতে আসে তাদের আমি সব সময় তুমি বলি ; আমরাও পরস্পরকে 'তুমি' বলব। তুমি রাজী তো ?" মাথাটা পিছনে হেলিয়ে সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলল।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা নাচ-ঘরে পৌঁছে গেলাম, "পিতামহ নৃত্যে"র দ্বিতীয় অংশটা তখন সবে শুরু হয়েছে। বাজনার শব্দে আমার কথা চাপা পড়ে যাবে ভেবে বললাম, "আমি একমত⋯আপনার সঙ্গে।"

"বল 'তোমার', সোনেচ্‌কা ভুলটা শুধরে দিল।

"পিতামহ" শেষ হল। অনেক চেষ্টা করেও "তুমি দিয়ে একটা কথাও আমি বলতে পারলাম না, যদিও সে রকম অনেক বাক্য আমি মনে মনে তৈরি করে ফেলেছি। "তুমি রাজী তো ?" এই একটি বাক্য অবিরাম আমার কানে বাজতে লাগল। আমাকে যেন নেশা ধরিয়ে দিল। সোনেচ্‌কা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। কাউকে চোখে পড়ছে না। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দেখলাম, মার সঙ্গে সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে ; মাথাটা নেড়ে দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভলদিয়া, আইভিনরা, তরুণ প্রিন্স ও আমি—আমরা সকলেই সোনেচ্‌কার প্রেমে পড়েছি ; সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে যতদূর চোখ যায় তার দিকেই আমরা

তাকিয়ে রইলাম। আমি জানি না কার জন্য সে মাথাটা নেড়েছিল। তবে সে মুহূর্তে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে আমার জন্যই।

আইভিনদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় কেমন যেন নিরাসক্তভাবে সেরিওঝার সঙ্গে কর-মর্দণ করলাম। সে যদি বুঝে থাকে যে সেদিন থেকেই আমার ভালবাসা ও আমার উপর তার আধিপত্য সে হারিয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই সে দুঃখ পেয়েছে, যদিও বাইরে সে রকম কোন ভাব দেখা গেল না।

জীবনে এই প্রথম আমি ভালবাসার প্রতি অবিশ্বস্ত হলাম, এই প্রথম ভালবাসার মাধুর্যের স্বাদ পেলাম। পরিচিত অনুরাগের জীর্ণ অনুভূতির বিনিময়ে রহস্য ও অনিশ্চয়তা ভরা এক নতুন অনুভূতির স্বাদ পেয়ে আমার আনন্দের সীমা রইলো না। তদুপরি, একই সঙ্গে ভালবাসাকে হারানো ও ভালবাসাকে ফিরে পাওয়ার অর্থই তো দ্বিগুণ আবেগে নতুন করে ভালবাসা।

অধ্যায়—২৪

বিছানায়

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, "কেমন করে সেরিওঝাকে এত গভীরভাবে আর এত দীর্ঘকাল ধরে ভালবাসলাম? না, সে আমাকে কোনদিন বুঝতে পারে নি, আমার ভালবাসার মূল্য বোঝবার ক্ষমতা তার নেই, আর সে ভালবাসার যোগ্যও সে নয়। আর সোনেচ্‌কা? কত আদরের মানুষ! 'তুমি রাজী তো?' 'এবার তোমার শুরু করার পালা।"

ছোট মুখখানি চোখের সামনে স্পষ্টরেখায় ফুটে উঠতেই বিছানায় লাফ দিয়ে উঠে বসলাম, চাদর দিয়ে মাথাটা ঢেকে দিলাম, চারদিকে এমনভাবে গুঁজে দিলাম যাতে কোথাও কোন ফাঁক না থাকে; তারপর আরাম করে শুয়ে পড়ে মধুর স্বপ্নছবি ও স্মৃতির মধ্যে ডুব দিলাম। চিত্রবিচিত্র লেপের ওয়াড়ের উপর নিশ্চল দৃষ্টি মেলে আমি তাকে ঠিক সেই রকম স্পষ্ট দেখতে পেলাম যেমনটি এক ঘণ্টা আগে দেখেছিলাম; মনে মনে তার সঙ্গে কথা বললাম; সে কথা যত অর্থহীনই হোক, তাতেই আমার অবর্ণনীয় আনন্দ।

ছবিগুলি এতই স্পষ্ট যে মধুর আবেশে আমার ঘুম এল না; এই আনন্দের অতি-প্রাচুর্যকে কারও সঙ্গে ভাগ করে নেবার ইচ্ছা হল।

হঠাৎ পাশ ফিরে চড়া গলায় বললাম, "লক্ষ্মী সোনা! ভলদিয়া! তুমি কি জেগে আছ?"

সে ঘুম-ঘুম গলায় জবাব দিল, "না; কি হল?"

"আমি প্রেমে পড়েছি ভলদিয়া, সত্যি সোনেচ্‌কার প্রেমে পড়েছি।"

শরীরটাকে টান করে ভলদিয়া বলল, "বেশ তো, তাতে কি?"

"ওঃ, ভলদিয়া, আমার বুকের মধ্যে যে কি হচ্ছে তা তুমি কল্পনা করতে

পারবে না ; চাদর মুড়ি দিয়ে এখানে শুয়েছিলাম, আর তখনই তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখলাম। তার সঙ্গে কথা বললাম ; সত্যি, কি আশ্চর্য ব্যাপার ! জান, শুয়ে শুয়ে তার কথা মনে হচ্ছে আর আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছে।"

ভলদিয়া একটু নড়ল।

আমি বলতে লাগলাম, "আমার শুধু একটাই ইচ্ছা, সব সময় তার কাছে থাকব, সব সময় তাকে দেখব, আর কিছুই না। তুমি কখনও প্রেমে পড়েছ ? সত্যি করে বল ভলদিয়া !"

কথাটা বাজে, কিন্তু আমি চাই সকলে সোনেচ্‌কাকে ভালবাসুক, তার কথা বলুক।

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ভলদিয়া বলল, "তাতে তোমার কি ? হয়তো পড়েছি।"

তার ঝকমকে চোখ দেখে বুঝলাম, সে ঘুমের কথা মোটেই ভাবছে না ; চীৎকার করে বললাম, "তোমার মোটেই ঘুমবার ইচ্ছা নেই, শুধু ঘুমের ভান করছ। এস, তার কথা বলি। সে খুব ভাল, তাই না ? সে এত মিষ্টি যে যদি বলে 'মিকোলেংকা, জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়' অথবা আগুনে ঝাঁপ দাও,' তাহলে তৎক্ষণাৎ তাই করে বসতাম, আর খুব আনন্দের সঙ্গে। আহা, কত যে মনোহারিণী সে।" আনন্দে অধীর হয়ে আর একবার পাশ ফিরে বালিশের তলা থেকে মুখ বের করে বললাম, "ওঃ, আমার ভীষণ কাঁদতে ইচ্ছা করছে ভলদিয়া।"

"কী বোকা !" ভলদিয়া হেসে বলল, তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। "আমার কিন্তু তোমার মত অবস্থা হয় নি ; আমি বরং মনে করি, সম্ভব হলে তার পাশে বসব, দুটো কথা বলব।"

বাধা দিয়ে বললাম, "তাহলে তুমিও প্রেমে পড়েছ ?"

ভলদিয়া হেসে বলল, "তারপরে তার ছোট আঙুলে, চোখে, ঠোঁটে, নাকে, ছোট্ট দুটি পায়ে—তার সর্বাঙ্গে চুমো খাব।"

'যত বাজে কথা !" বালিশের তলা থেকে আমি চেঁচিয়ে বললাম।

ভলদিয়া তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, "এ ব্যাপারে তুমি কিচ্ছু বোল না।"

অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বললাম, "হ্যাঁ, আমি বুঝি, কিন্তু তুমি বোঝ না ; যত সব বাজে কথা বলছ।"

"দেখ, কান্নাকাটি করার কিছু নেই। কী ছিচকাঁদুনে খোকাই তুমি হয়েছ !"

অধ্যায়—২০

চিঠি

এইমাত্র যে দিনটার বর্ণনা দেওয়া হল তার প্রায় ছ' মাস পরে ১৬ই এপ্রিল তারিখে বাপি আমাদের পড়ার সময় দোতলায় এসে বলল, সেই রাতেই তার সঙ্গে আমাদের দেশে ফিরে যেতে হবে। এ খবরে বুকটা কুঁকড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে মাকে মনে পড়ল।

নিম্নলিখিত চিঠিটাই আনন্দের এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনের কারণ:

পেত্রভ্স্কয়ে, ১২ই এপ্রিল

"তোমার ৩রা এপ্রিল তারিখের প্রিয় পত্রখানি এইমাত্র সন্ধ্যা দশ ঘটিকার সময় পেয়েছি এবং যথারীতি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর লিখছি। ফিয়দর গত রাতে শহর থেকে চিঠিটা নিয়ে এসেছে, কিন্তু খুব দেরী হয়ে যাওয়ায় চিঠিটা মিমিকে দিয়েছিল। আর যেহেতু আমি অসুস্থ ও দুর্বল ছিলাম সেই জন্য মিমি সারাদিন চিঠিটা চেপে রেখেছিল। সত্যি আমি সামান্য জ্বর-জ্বর বোধ করছি, আর সত্যি কথা বলতে কি আজ চারদিন হল আমি শয্যাশায়ী।

"দোহাই তোমার, ভয় পেয়ো না; আমি বেশ ভালই আছি। আর আইভান ভাসিলিচ অনুমতি দিলে আগামী কালই উঠে বসতে পারব বলে মনে করছি।"

"শুক্রবার মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম; কিন্তু বড় রাস্তায় ঢুকবার মুখে যে সেতুটাকে আমি সব সময় ভয় করি তার কাছেই ঘোড়াগুলো কাদায় আটকে যায়। দিনটি ছিল চমৎকার। তাই ভাবলাম পায়ে হেঁটেই বড় রাস্তা পর্যন্ত চলে যাব, ততক্ষণে ওরা কালাশটাকে টেনে তুলবে। ছোট গির্জাটায় পৌছেই বসে পড়লাম, আমার খুব ক্লান্ত লাগছিল! এইভাবে আধঘণ্টা কেটে গেল; গাড়িটাকে টেনে তোলার জন্য ওরা লোকজন ডাকল। আমার ঠাণ্ডা লাগছিল, বিশেষ করে পায়ে, কারণ আমার পাতলা সোলের জুতো আগাগোড়া ভিজে গিয়েছিল। ডিনারের পরে জ্বর-জ্বর মনে হল, কিন্তু শুতে গেলাম না। চায়ের পরে যথারীতি লিউবচকার সঙ্গে 'ডুয়েট' খেলতে বসলাম। (ও এত উন্নতি করেছে যে তুমি ওকে চিনতেই পারবে না!) কিন্তু আমি যখন সময় গুণতে পারলাম না তখন আমার বিস্ময়টা কল্পনা কর। বার কয়েক গুণলাম, কিন্তু তখন আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। কানের মধ্যে একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। আমি গুণতে লাগলাম—এক, দুই, তিন, আর তারপরে একেবারে আট ও পনেরো; আর সব চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার, বাজে কথা বলছি বুঝতে পেরেও না বলে পারছি না। শেষ পর্যন্ত মিমি এসে আমাকে ধরে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিল।

হ্যাঁ গো, কেমন করে আমি অসুখ বাধালাম, আর কেনই যে সব দোষই আমার, তার বিস্তারিত বিবরণ তো শুনলে। পরদিন জ্বরটা খুব বাড়ল; ভাল মানুষ বুড়ো আইভান ভাসিলিচ এলেন; সেই থেকে এ বাড়িতেই আছেন। কথা দিয়েছেন অচিরেই আমাকে চাঙ্গা করে তুলবেন। বৃদ্ধ কত ভাল মানুষ! যখন জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছিলাম, তখন দিনরাত আমার পাশে বসে ছিলেন। আর এখন আমাকে চিঠি লিখতে দেখে মেয়েদের নিয়ে বসেছেন; আমার শোবার ঘর থেকেই শুনতে পাচ্ছি, তিনি জার্মান গল্প বলছেন আর মেয়েরা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

"তুমি যাকে 'সুন্দরী ফ্লামান্দে' বলে ডাক সেই মেয়েটি দু'সপ্তাহ হল আমার কাছেই আছে। কারণ তার মা যেন কোথায় বেড়াতে গেছে। আর মেয়েটিও আমার খুব ভক্ত। মনের সব গোপন কথা সে আমাকে বলেছে। সে যদি ভাল হাতে পড়ত তাহলে খুব ভাল মেয়ে হতে পারত; কিন্তু ওর কথা শুনেই বুঝতে পেরেছি যে-সমাজে ও বাস করে তাতে ওর একেবারেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমার মনে হচ্ছিল, এতগুলি ছেলেমেয়ে না থাকলে আমিও ওর ভার নিয়ে একটা ভাল কাজ করতে পারতাম।

"লিউবচ্‌কা নিজেও চিঠি লিখতে চেয়েছিল, কিন্তু এর মধ্যেই তিনখানা পাতা ছিঁড়ে নষ্ট করেছে; বলেছে, 'বাপির হালচাল তো আমি জানি! একটা ভুল হলে সব্বাইকে দেখিয়ে বেড়াবে।' কাতেংকা সেই রকমই মিষ্টি আছে। আর মিমিও আগের মতই ভাল ও বিরক্তিকর।

"এবার আসল কথা বলি। তুমি লিখেছ, এবার শীতে তোমার কাজকর্ম ভাল চলছে না, আর তাই বাধ্য হয়েই খাবারভ্‌কার আয়টাও তুমি নিয়েছ। এর জন্য তোমাকে আমার কাছ থেকে অনুমতি নিতে হচ্ছে দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। যা আমার তা তো সমানভাবে তোমারও।

তুমি এত সদয় ও ভাল যে পাছে আমি কষ্ট পাই তাই প্রকৃত অবস্থা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখ: কিন্তু আমি অনুমানেই বুঝতে পারছি যে তুমি হয়তো ইতিমধ্যেই তাস খেলে অনেক টাকা নষ্ট করেছ, আর বিশ্বাস কর, সেজন্য তোমার উপর আমি রাগ করি নি; সুতরাং এ বিপদ যদি কাটিয়ে উঠতে পারি তাহলে এ নিয়ে বেশী ভেবোনা, নিজেকে অকারণে দুশ্চিন্তায় রেখো না। ছেলেমেয়েদের জন্য তোমার বাজি জেতার উপর এমন কি (মাফ করো) তোমার গোটা সম্পত্তির উপর ভরসা না করতেই আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তুমি জিতলেই যেমন আমি খুশি হই না, তেমনি হারলেও কোন কষ্ট পাই না। একমাত্র যে জিনিসটা আমাকে কষ্ট দেয় সেটা হল তোমার জুয়াখেলার নেশা— যে নেশা তোমার অনুরাগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে, আর যার জন্য যে কথা এখন তোমাকে বলতে যাচ্ছি—ঈশ্বর জানেন একথা বলতে আমি কত দুঃখ পাচ্ছি—সেই রকম তিক্ত সত্য বলতে আমি বাধ্য হই। একটা জিনিসের

জন্য আমি সব সময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব, তিনি যেন আমাদের রক্ষা করেন—দারিদ্র্য (দারিদ্র্য কাকে বলে?) থেকে নয়—ছেলেমেয়েদের স্বার্থের সঙ্গে যখন আমাদের স্বার্থের সংঘাত বাঁধে সেই ভয়ংকর পরিস্থিতির হাত থেকে। এতদিন আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন: তুমি সেই সীমা-রেখাটা পার হওনি যেটা পার হলেই হয় আমাদের সম্পত্তি—যা এখন আর আমাদের নয়, ছেলেমেয়েদের—বিসর্জন দিতে হবে, অথবা—সে কথা ভাবতেও ভয় হয়—অথচ সেই ভয়ংকর দুর্ভাগ্যই অবিরাম আমাদের সামনে আসন্ন হয়ে উঠছে। হ্যাঁ, অত্যন্ত ভারী একটা ক্রুশ প্রভু আমাদের দুজনকে পাঠিয়েছেন।

"ছেলেমেয়েদের কথা লিখতে বসে তুমি আমাদের সেই পুরনো ঝগড়ায় ফিরে গেছ: তাদের কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পাঠাবার ব্যাপারে তুমি আমার অনুমতি চেয়েছ। এ ধরনের শিক্ষার বিরুদ্ধে আমার মতামত তুমি জান।

"আমি জানি না প্রিয় বন্ধু, আমার সঙ্গে তুমি একমত হবে কি না; তবু দোহাই তোমার, অন্তত আমার কথা চিন্তা করে আমাকে কথা দাও যে যতদিন আমি বেঁচে থাকব, এমন কি আমার মৃত্যুর পরেও, তুমি কখনও এ কাজ করবে না।

"তুমি লিখেছ, আমাদের বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে তোমাকে সেণ্ট পিতার্সবুর্গ যেতে হবে। খৃস্ট তোমার সহায় থাকুন বন্ধু: সেখানে গিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এস। তুমি না থাকলে আমাদের সকলেরই এত খারাপ লাগে! এখন বসন্ত কালটা আশ্চর্য সুন্দর। বারান্দার দরজাটা এর মধ্যেই নামিয়ে দেওয়া হয়েছে; কাঁচ-ঘরের পথটা চার দিন হল চমৎকার শুকিয়ে গেছে; পিচ গাছগুলি ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে, এখানে-ওখানে এখনও কিছু বরফ আছে, চাতক পাখিরা এসে গেছে, আর লিউবচ্‌কা আমাকে এনে দিয়েছে বসন্তের প্রথম ফুল। ডাক্তার বলেছেন, তিন দিনের মধ্যেই আমি সম্পূর্ণ সেরে উঠব, তাজা বাতাসে শ্বাস টানতে পারব। এপ্রিল মাসের রোদে নিজেকে গরম করে তুলতে পারব। এবার 'অ রিভোয়া' প্রিয় বন্ধু: দয়া করে আমার অসুখ বা তোমার লোকসান নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজকর্ম সেরে পুরো গ্রীষ্মকালের জন্য ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে চলে এস। গ্রীষ্মকালের জন্য বড়রকমের মতলব আঁটছি; তোমার উপস্থিতি ছাড়া সেগুলো পূর্ণ হবে না।"

চিঠির বাকি অংশটা লেখা হয়েছে ফরাসীতে আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে। অন্য একটা কাগজে। তার হুবহু অনুবাদ করে দিলাম:

"আমার অসুখের ব্যাপারে যা লিখেছি সেটা বিশ্বাস করো না; অসুখটা যে কত গুরুতর তা কেউ বুঝতে পারে নি। একমাত্র আমি জানি, আর কোন দিন আমি বিছানা থেকে উঠতে পারব না। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করো না: চলে এস; ছেলেদের সঙ্গে এনো। তাহলে হয় তো আবার তাদের

বুকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করতে পারব: এটাই আমার শেষ ইচ্ছা। কী ভয়ংকর আঘাত যে তোমাকে দিচ্ছি তা বুঝি! কিন্তু আজ হোক আর কাল হোক, আমার কাছ থেকেই হোক আর অন্যের কাছ থেকেই হোক, এ আঘাত তো তোমাকে পেতেই হবে। এস, আসল দুর্ভাগ্যকে দৃঢ়তার সঙ্গে সইতে চেষ্টা করি, ঈশ্বরের করুণায় ভরসা রাখি। তাঁর ইচ্ছার কাছেই নিজেদের সঁপে দেই।

"আমি যা লিখলাম সেটাকে কাল্পনিক প্রলাপ বলে মনে করো না; বরং এই মুহূর্তে আমার চিন্তা-ভাবনাগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং আমিও সম্পূর্ণ শান্ত। আবার এসব কিছুকেই ভীরু মনের অস্পষ্ট ও মিথ্যা বিকার বলে ধরে নিয়ে বৃথা আমায় সান্ত্বনাও খুঁজো না। না, আমি বুঝতে পারছি, ঈশ্বরই দয়া করে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আমি আর বেশী দিন বাঁচব না।

"তোমার প্রতি ও ছেলেমেয়েদের প্রতি আমার যত ভালবাসা সব কি এই জীবনের সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে? আমি জানি তা অসম্ভব। এই মুহূর্তে আমার ভালবাসা এতই কানায় কানায় পরিপূর্ণ যে, যে-ভালবাসা ছাড়া বেঁচে থাকার কথা আমি ভাবতেই পারি না তা কখনও নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে না। তোমার প্রতি ভালবাসা ছাড়া আমার আত্মার কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না; আর আমি জানি শুধু এই ভালবাসার জোরেই আমার আত্মা চিরদিন থাকবে; যদি চিরদিন নাই থাকবে তাহলে আমার এই ভালবাসার জন্ম কোনদিন হত না।"

"আমি তোমার কাছে থাকব না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমার ভালবাসা কোনদিন তোমাকে ছেড়ে যাবে না। এই চিন্তা আমার কাছে এতই সান্ত্বনার যে শান্ত চিত্তে নির্ভয়ে আমি আসন্ন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে আছি।"

"আমি শান্ত; ঈশ্বর জানেন মৃত্যুকে আমি চিরদিন একটা মহত্তর জীবনের দ্বার-পথ বলে মনে করে এসেছি, আর আজও তাই মনে করি; তবু কেন চোখের জল রাখতে পারছি না? যে মাকে ছেলেমেয়েরা এত ভালবাসে কেন তারা সেই মাকে হারাবে? কেন তুমি এত ভারী, অপ্রত্যাশিত আঘাত হান? তোমার ভালবাসা যখন আমার জীবনকে এমন সুখের অধিকারী করেছে তখন কেন আমাকে মরতেই হবে?"

"তাঁর পবিত্র ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!"

"চোখের জলের বাধায় আর লিখতে পারছি না। হয় তো তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। যে সুখ দিয়ে আমার এই জীবনকে তুমি ঘিরে রেখেছ সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রিয়তম; ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করুন। বিদায় প্রিয়তম; মনে রেখো, আমি যেদিন থাকব না, সেদিন যেখানেই তুমি থাক, আমার ভালবাসা কোনদিন তোমাকে

ত্যাগ করবে না। বিদায় ভলদিয়া, লক্ষ্মী সোনা; বিদায় আমার ছোট্ট বেঞ্জামিন, আমার নিকোলেংকা।"

"এও কি হতে পারে যে তারা আমাকে ভুলে যাবে?"

এই চিঠির সঙ্গে ফরাসিতে লেখা মিমির একটা চিরকুট ছিল; তাতে লেখা:

"যে বিষণ্ণ ভবিষ্যতের আশংকা তিনি প্রকাশ করেছেন ডাক্তারও সেটা সমর্থন করেছেন। গত রাতে তিনি আমাকে হুকুম করলেন। তক্ষুনি চিঠিটা ডাকে ফেলে দিতে। তার কথাকে প্রলাপ মনে করে আমি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। এবং তারপরে স্থির করলাম চিঠিটা খুলব। খোলামাত্রই নাতালিয়া নিকলায়েভ্‌না জানতে চাইল চিঠিটা নিয়ে আমি কি করেছি; এখনও পাঠিয়ে দেওয়া না হয়ে থাকলে যেন চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলি। বার বার চিঠিটার কথা উল্লেখ করে বলল, এই চিঠি আপনাকে খুন করবে। আমাদের দেবদূতটি চিরদিনের মত চলে যাবার আগে যদি তাকে দেখতে চান তো আসতে বিলম্ব করবেন না। এই চিরকুটের জন্য ক্ষমা করবেন। তিন রাত আমার ঘুম হয় নি। আপনি তো জানেন তাকে আমি কত ভালবাসি!"

১১ই এপ্রিল সারাটা রাত নাতালিয়া সাবিশ্‌না মামণির ঘরেই কাটিয়েছিল; সেই আমাকে বলেছে, চিঠির প্রথম অংশটা লিখে সেটাকে পাশের ছোট টেবিলে রেখে মামণি ঘুমতে গিয়েছিল।

নাতালিয়া সাবিশ্‌না বলেছিল, "আমি স্বীকার করছি, হাতল-চেয়ারে বসে আমি ঝিমুচ্ছিলাম, আমার হাত থেকে মোজাটা পরে গিয়েছিল। কিন্তু একটা নাগাদ স্বপ্নের মধ্যে শুনতে পেলাম তিনি যেন কার সঙ্গে কথা বলছেন। চোখ মেলে দেখলাম, তিনি এইভাবে দুটি ছোট হাত একত্র করে বিছানায় উঠে বসেছেন; আহা, আমার ছোট্ট কপোতীটি, তার দুই চোখে জলের ধারা বইছে। 'তাহলে সব শেষ হয়ে গেল?' এই কথা বলে দুই হাতে মুখ ঢাকলাম। লাফ দিয়ে উঠে শুধালাম: "আপনার কি হয়েছে?"

তিনি বললেন, "আঃ, নাতালিয়া সাবিশ্‌না, শুধু যদি জানতে আমি এইমাত্র কি দেখলাম!"

"কত করে আমার আরও প্রশ্নের জবাব দিতে বললাম, কিন্তু আর একটি কথাও তিনি বললেন না; শুধু ছোট টেবিলটা এনে দিতে বললেন, আরও খানিকটা লিখলেন, আমাকে দিয়ে তখুনি চিঠিটা সিল করলেন এবং তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিলেন। তারপর থেকেই তার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলেছে।"

অধ্যায়—২৬

গ্রামে আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করে ছিল

১৮ই এপ্রিল তারিখে আমরা পেত্রভস্কয়ে ভবনের ফটকে গাড়ি থেকে নামলাম। মস্কো ছাড়বার পর থেকেই বাপি খুব চিন্তিত ছিল ; ভলদিয়া যখন জানতে চাইলো মামণি অসুস্থ কিনা, বাপি তখন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে নীরবে মাথা নাড়ল। পথ চলতে চলতে তাকে কিছুটা শান্ত মনে হল ; কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই তার মুখটা ক্রমেই বিষণ্ণ হয়ে উঠতে লাগল ; কালাশ থেকে নেমে বাপি যখন ফোকাকে জিজ্ঞাসা করল "নাতালিয়া নিকলায়েভ্না কোথায় ?" তখন তার কণ্ঠস্বর অবিচলিত ছিল না। চোখে জল এসেছিল। ভালমানুষ বুড়ো ফোকাশ আমাদের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল, বাইরের ঘরের দরজাটা খুলে দিল এবং একপাশে সরে গিয়ে উত্তর দিল :

"আজ দু'দিন হল স্যার, তিনি কর্ত্রীঠাকরুণের ঘর থেকে বেরোন নি।"

মিল্‌কা বাপিকে দেখে ছুটে এল ! বাপি তাকে একপাশে সরিয়ে রেখে বসার ঘরের ভিতর দিয়ে সাজ-ঘরে ঢুকল ; সে-ঘর থেকে একটা দরজা দিয়ে সোজা শোবার ঘরে যাওয়া যায়। সেদিকে এগিয়ে যেতেই তার মনের চঞ্চলতা আরও বেড়ে গেল ; পা টিপে টিপে সাজ-ঘরে ঢুকল, শ্বাস ফেলতেই সাহস হচ্ছে না ; বন্ধ দরজার হাতলটা ঘোরাবার আগে একবার ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল। ঠিক সেই সময় মিমি বারান্দা থেকে ছুটে এল ; তার চেহারা এলোমেলো, মুখে চোখের জলের দাগ। হতাশ ভঙ্গীতে চুপি চুপি বলল, "আঃ, পিয়তর অলেক্সান্দ্রভিচ" ; তারপর বাপিকে হাতলটা ঘোরাতে দেখে বলল, "এ পথে নয়। এ দরজাটা তালাবন্ধ। দাসীদের ঘরের ভিতর দিয়ে যাবার পথ।"

হায়, এ সব কিছুই আমার শিশু-মনের কল্পনাকে কত না বিষণ্ণতায় ভরিয়ে তুলল !

আমরা দাসীদের ঘরে গেলাম। বারান্দায় ছোট্ট ভাঁড় আকিম-এর সঙ্গে দেখা হল। দেখা হলেই সে মুখ ভেংচে মজা করে, কিন্তু আজ সেরকম কিছুই করল না—বস্তুত তার অভিব্যক্তিহীন, নির্বিকার মুখটা আমার মনকে বেদনায় ভরে তুলল। দাসীদের ঘরে দুটি দাসী ছুঁচের কাজ করছিল ; আমাদের দেখে এমন বিষণ্ণ মুখে তারা অভিবাদন জানাল যে আমার ভয় করতে লাগল। মিমির ঘরটা পেরিয়ে বাপি শোবার ঘরের দরজাটা খুলে দিল ; আমরা ভিতরে ঢুকলাম। দরজার ডান দিকে দুটো জানালায় শাল ঝুলছে ; একটা জানালায় নাতালিয়া সাবিশ্না বসে আছে ; চশমাজোড়া নাকের উপর ঝুলিয়ে মোজা বুনছে। সে আমাদের চুমো খেল না, শুধু উঠে দাঁড়াল, চশমার ভিতর দিয়ে আমাদের দিকে তাকাল, গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। যারা সাধারণতই শান্ত ও সংযত তারা আমাদের দিকে তাকিয়েই কেঁদে ফেলছে, তা দেখে

আমি খুব বিচলিত হয়ে পড়লাম।

দরজার বাঁ দিকে একটা পর্দা, তার পিছনে বিছানা, ছোট টেবিল, ওষুধপত্রে বোঝাই ক্যাবেনিট, বড় হাতল চেয়ারে ডাক্তার চোখ বুজে শুয়ে আছে; বিছানার পাশে একটি অতীব সুন্দরী তরুণী বসে আছে। প্রাতঃকালীন সাদা পোশাকের আস্তিন গুটিয়ে সে মামণির মাথায় বরফ দিচ্ছে, কিন্তু মামণিকে দেখতে পাচ্ছি না। এই মেয়েটিই সেই "সুন্দরী ফ্লামান্দে" যার কথা মামণি চিঠিতে লিখেছিল; পরবর্তীকালে এই মেয়েটি আমাদের গোটা পরিবারের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। আমরা ঘরে ঢুকতেই সে মামণির মাথা থেকে হাত সরিয়ে নিল, বুকের উপর গাউনের ভাঁজগুলো সমান করে দিল, তারপর নীচু গলায় বলল, "অজ্ঞান হয়ে আছেন।"

সেই মুহূর্তে নিজেকে খুব হতভাগ্য মনে হলেও আপনা থেকেই এইসব তুচ্ছ ব্যাপারগুলো আমার নজরে পড়ল। ঘরটা প্রায় অন্ধকার, গরম, এবং পুদিনা, ইউ ডি কোলন, ক্যামোমিল ও হফম্যান-ড্রপের একটা মিশ্র গন্ধে ভরা। সেই গন্ধটা আমার মনের উপর এত গভীর দাগ কেটেছিল যে পরবর্তীকালে ঐ গন্ধটা নাকে আসামাত্রই আমার কল্পনা আমাকে নিয়ে যায় সেই অন্ধকার, শ্বাসরোধকারী ঘরে, আর সেই ভয়ংকর মুহূর্তের প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ আমার মনে পড়ে যায়।

মামণির চোখ দুটি খোলা, কিন্তু সে কিছুই দেখছে না। সেই ভয়ংকর চাউনি আমি কোন দিন ভুলব না। সে যে কী যন্ত্রণাময়।

আমাদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল।

পরবর্তীকালে মামণির শেষ মুহূর্তের কথা জানতে চাইলে নাতালিয়া সাবিশ্‌না বলেছিল:

"তোমাদের বাইরে নিয়ে যাবার পরে ঠাকরুণ অনেকক্ষণ অস্থিরভাবে কাটালেন, যেন কেউ তাকে কষ্ট দিচ্ছে, তার পরেই বালিশে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে স্বর্গের দেবদূতের মতই শান্ত হয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন। তার পানীয় আনতে দেরী হচ্ছে দেখে আমি বাইরে গেলাম। ফিরে এসে দেখলাম, তিনি হেলছেন এবং তোমার বাপিকে ইসারায় কাছে ডাকছেন। কর্তা ঝুঁকে দাঁড়ালেন, কিন্তু ঠাকরুণের কথা বলার শক্তি ছিল না, যা বলার ছিল তা বলতে পারলেন না; ঠোঁট দুটো ফাঁক করে শুধু আর্তনাদ করে উঠলেন, "হে ঈশ্বর হে প্রভু! ছেলেমেয়েরা, ছেলেমেয়েরা! ছুটে গিয়ে তোমাদের নিয়ে আসতে চাইলাম, কিন্তু আইভান ভসিলিট আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "তাতে ওর উত্তেজনা বাড়বে; না ডাকাই ভাল।" তারপরে আর একবার মাথাটা তুলেই আবার বালিশে রাখলেন। কী যে বোঝাতে চাইলেন তা ঈশ্বরই জানেন। আমার মনে হয়, তোমাদের অনুপস্থিতিতেই তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন। শেষ সময়ে প্রভু তাকে তোমাদের দেখতে

দিলেন। তারপর আমার ছোট্ট কপোতীটি নিজেকে একটু তুলে ধরে হাত দিয়ে এই রকম ভঙ্গী করে এমন স্বরে বললেন, 'ঈশ্বর জননী, তুমি ওদের ত্যাগ করো না।' যে সে কথা ভাবতেও আমার কষ্ট হয়। ততক্ষণে ব্যথটা হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে গেছে। তার চোখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম বেচারি কী ভীষণ কষ্টই না পাচ্ছেন; বালিশে এলিয়ে পড়লেন, বিছানার চাদরটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরলেন, দুই চোখে অনবরত জলের ধারা বইতে লাগল।

"তারপর?" আমি জানতে চাইলাম।

কিন্তু নাতালিয়া সাবিশ্না আর বলতে পারল না; মুখ ফিরিয়ে ভীষণভাবে কাঁদতে লাগল।

মামণি তীব্র যন্ত্রণা পেয়েই মারা গেছে।

অধ্যায়—২৭
বিষাদ

পরদিন সন্ধ্যার পরে আর একবার তাকে দেখতে ইচ্ছা হল। কোন রকমে ভয়ের ভাবটা কাটিয়ে আস্তে দরজা খুলে পা টিপে টিপে হল-ঘরে ঢুকলাম।

ঘরের মাঝখানে টেবিলের উপর শবাধারটি রয়েছে; চারদিক রূপোর উঁচু বাতিদানে মোমবাতিগুলো জ্বলছে। দূরে এক কোণে বসে গায়ক একঘেয়ে নীচু গলায় মন্ত্র পড়ছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে সোজা তাকালাম; কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে চোখের এমন দশা হয়েছে, আর স্নায়ুগুলি এতই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে কিছুই দেখতে পেলাম না। সব কিছুই আশ্চর্য ভঙ্গীতে চলেছে—আলো, ব্রোকেড, ভেলভেট, মস্তবড় শামাদান, লেস-বসানো গোলাপী রঙের বালিশ, ফিতে লাগানো টুপি, এবং মোমের মত স্বচ্ছ কিছু জিনিস। মামণির মুখ দেখবার জন্য একটা চেয়ারের উপর উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু মুখটা যেখানে থাকবার কথা সেখানেও সেই একই মোমের মত স্বচ্ছ পদার্থই দেখতে পেলাম। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটু একটু করে সেই পরিচিত, অতিপ্রিয় মুখ, চোখ, নাক সবই চিনতে পারলাম। এই যে আমার মামণি সেটা বুঝতে পেরে শিউরে উঠলাম। নিমিলিত চোখ দুটি এত বসে গেছে কেন? এক গালের চামড়ার নীচে ওরকম ভয়ংকর পাণ্ডুরতা ও কালো দাগ কেন? মুখের ভাব এত কঠিন ও নির্বিকার কেন? ঠোঁট দুটো এত বিবর্ণ, আর ঠোঁটের রেখাগুলি এত সুন্দর, এত মোহনীয় ও অপার্থিব শান্তির দ্যোতক যে সেদিকে তাকিয়ে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে, আমার চুলের ভিতর দিয়ে একটা শিহরণ খেলে গেল কেন?

তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, একটা দুর্বোধ্য, অপ্রতিরোধ্য শক্তি

আমার চোখ দুটিকে ঐ প্রাণহীন মুখখানির দিকে আকর্ষণ করছে। চোখ সরাতে পারলাম না; কল্পনায় একটি বিকশিত মুখ ও আনন্দের ছবি চোখের সামনে দেখতে পেলাম, যে মৃতদেহটি আমার সামনে রয়েছে, যার দিকে আমি বোকার মত একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি সে যে আমার মামণি সেকথা ভুলেই গেলাম। কল্পনায় তাকে আগেকার মূর্তিতেই দেখতে পেলাম—সেই সজীব, আনন্দিত ও হাসিমাখা। পরক্ষণেই হঠাৎ ভয়ংকর বাস্তব সম্পর্কে সচেতন হয়ে আবার শিউরে উঠলাম, কিন্তু দৃষ্টি সরাতে পারলাম না। আবার স্বপ্ন এসে বাস্তবকে সরিয়ে দেবে, তারপর আবার বাস্তবের চেতনা এসে স্বপ্নকে দেবে তাড়িয়ে। শেষ পর্যন্ত কল্পনা ক্লান্ত হয়ে হার মানল; আমাকে আর প্রতারিত করতে পারল না; বাস্তবের চেতনাও কোথায় মিলিয়ে গেল; আমি জ্ঞান হারালাম। এ অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম জানি না, অবস্থাটা কি রকম তাও জানি না; শুধু জানি, কিছুক্ষণের জন্য আমার অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে গেল, একটা উন্নত, অনির্বচনীয় প্রীতিপ্রদ ও দুঃখময় আনন্দের মধ্যে যেন জেগে উঠলাম।

হয়তো বা এখান থেকে কোন উন্নততর জগতে উড়ে যেতে যেতে তার সুন্দর আত্মা একবার পিছন ফিরে তাকাল সেই জগতের পানে যেখানে মামণি আমাদের রেখে গেছে; সে আমার দুঃখ বুঝতে পেরেছে, আমার প্রতি তার করুণা হয়েছে, ভালবাসার পাখায় ভর করে হাসি মুখে নেমে এসেছে পৃথিবীতে, আমাকে সান্ত্বনা দিতে, আশীর্বাদ করতে।

দরজায় ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হল; একজন গায়ক ঢুকল আগের গায়ককে ছুটি দিতে। সেই শব্দে আমি চেতনা ফিরে পেলাম। মামণির দিকে তাকিয়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকলাম, মাথাটা নোয়ালাম, তারপরই কেঁদে উঠলাম।

গভীর, প্রশান্ত ঘুমে রাতটা কেটে গেল; কোন বড় দুঃখের পরে এই রকমই হয়। যখন ঘুম ভেঙে গেল তখন চোখের জল শুকিয়ে গেছে, স্নায়ুগুলি শান্ত হয়েছে। দশটার সময় মৃতের প্রতি সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিতে আমাদের ডাকা হল। ক্রন্দনরত চাকর ও চাষীতে ঘরটা ভরে গেছে; তারা এসেছে কর্ত্রীঠাকরুণের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিতে। প্রার্থনা অনুষ্ঠানের সময় যথেষ্ট কাঁদলাম, মাটিতে নত হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম; কিন্তু আসলে আমি প্রার্থনা করি নি, আমি ছিলাম একান্তই অনুভূতিহীন। যে নতুন হাফ-কোটটা আমাকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটা বগলের নীচে আঁট হওয়ায় আমার মন খারাপ ছিল; ট্রাউজারের হাঁটুর নীচটা যাতে বেশী নোংরা না হয় সেটাই ছিল আমার চিন্তা; আমার চোখ ছিল সমবেত অন্য সকলের দিকে। বাবা দাঁড়িয়েছিল কফিনের শিওরে। মুখটা রুমালের মতই ফ্যাকাসে; অনেক কষ্টে চোখের জল আটকে রেখেছে। কালো কোট-পরা তার দীর্ঘ দেহ, তার পাণ্ডুর, ভাবপ্রবণ মুখ, তার মনোরম চালচলন—সব কিছুই অত্যন্ত কার্যকর; কিন্তু কেন জানিনা সেই মুহূর্তে এসব আমাকে খুশি

করতে পারল না। মিমি দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন দাঁড়িয়ে থাকতে তার কষ্ট হচ্ছে। তার পোশাক দুমড়ে গেছে, চুল এলিয়ে পড়েছে, টুপিটা একপাশে সরে গেছে, ফোলা চোখ দুটো লাল, মাথাটা নড়ছে। বুক-ভাঙ্গা ভঙ্গীতে কাঁদছে, হাত ও রুমালে মুখটা অনবরত ঢাকছে। আমার মনে হল, দর্শকদের কাছ থেকে নিজের মুখটাকে লুকোতে এবং নকল কান্নার শেষে একটু বিশ্রাম নিতেই সে এ রকম করছে। শোকজ্ঞাপক ফিতে লাগানো কালো ফ্রক পরে লিউবচ্‌কা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে; চোখের জলে মুখ ভিজে গেছে, শিশুসুলভ ভয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে শবাধারটির দিকে তাকাচ্ছে। কাতেংকা দাঁড়িয়ে আছে মার পাশে; বিষণ্ণভাব সত্ত্বেও মুখটা আগের মতই গোলাপী। দিলখোলা ভলদিয়া শোকপ্রকাশের বেলায়ও সমান দিলখোলা। চিন্তিত নিশ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল; হঠাৎ মুখটা বেঁকে গেল; তাড়াতাড়ি ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে সশ্রদ্ধভাবে মাথাটা নোয়াল। অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানে যে সকল অপরিচিত লোক উপস্থিত হয়েছে তাদের সকলকেই আমার কাছে অসহ্য মনে হল। তিনি স্বর্গে গিয়ে ভাল থাকবেন, তিনি এ পৃথিবীর মানুষ ছিলেন না—এই ধরনের যে সব সান্ত্বনার বাণী তারা বাপিকে শোনাল তাতে আমার মনে ক্রোধ জেগে উঠল।

তার কথা বলবার, তার জন্য শোক করবার জন্য কী অধিকার তাদের আছে? কেউ কেউ আমাদের অনাথ বলেও উল্লেখ করল। যেন মাতৃহীন শিশুদের যে ঐ নামেই ডাকা হয় তারা না বলে দিলে সেটা আমরা জানতাম না।

ভাঁড়ার ঘরের খোলা দরজার আড়ালে হল-ঘরের একেবারে এক কোণে একটি পাকা-চুল বুড়ি নতজানু হয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে। দুই হাত এক করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে; সে কাঁদছে না, কিন্তু প্রার্থনা করছে। ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানাচ্ছে, পৃথিবীতে যাকে সে সব চাইতে বেশী ভালবাসত, ঈশ্বর তাকে সেই মানুষটির সঙ্গেই মিলিয়ে দেবেন; আর তার আশা অচিরেই সেটা ঘটবে।

"এই একমাত্র লোক যে মামণিকে সত্যিকারের ভালবাসত!" একথা মনে হতেই আমি নিজের জন্য লজ্জা পেলাম।

অনুষ্ঠান শেষ হল; মৃতার মুখের আবরণ তুলে নেওয়া হল, আর শুধু আমরা ছাড়া আর সকলেই একে একে শবাধারের কাছে গিয়ে তাতে চুমো খেল।

সকলের শেষে একটি চাষী স্ত্রীলোক পাঁচ বছরের একটি ফুটফুটে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মামণিকে শেষ দেখা দেখতে তার কাছ থেকে বিদায় নিতে এগিয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে ভেজা রুমালটা অপ্রত্যাশিতভাবে আমার হাত থেকে পড়ে গেল, আর সেটাকে তুলে নিতে মাথাটা নীচু করলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা মর্মন্তুদ করুণ চীৎকার শুনে চমকে উঠলাম; সে চীৎকার এতখানি আতংকগ্রস্ত যে একশ' বছর বেঁচে থাকলেও তা আমি কোনদিন ভুলব না;

সেকথা যখনই মনে পড়ে তখনই আমার সারা দেহে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায়। মাথা তুললাম: শবাধারের পাশে একটা টুলের উপর সেই চাষী স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে আছে; কোলের ছোট মেয়েটি দুই হাত বাতাসে নেড়ে নেড়ে আমার মৃত মায়ের মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বার বার সভয়ে আর্তনাদ করে উঠছে। যে আর্তনাদ শুনে নিজে চমকে উঠেছিলাম তার চাইতেও অধিকতর ভয়ংকর স্বরে চীৎকার করে আমি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম কোথা থেকে এসেছে এই তীব্র, ভারী গন্ধ যা ধূপের গন্ধের সঙ্গে মিশে ঘরটাকে ভরে তুলেছে; আর যে মুখখানি মাত্র কয়েকদিন আগেই ছিল সৌন্দর্যে ও মমতায় ভরপুর, যে মুখখানিকে আমি জগতের অন্য সব কিছুর চাইতে ভালবাসতাম, সেই মুখই যে এতখানি ভয়ের উদ্রেক করতে পারে সে-কথা ভেবে এই প্রথম যেন একটা তিক্ত সত্য আমার কাছে উদ্ঘাটিত হল, আমার অন্তরাত্মাকে গভীর হতাশায় ভরে তুলল।

অধ্যায়—২৮
শেষ বিষণ্ণ স্মৃতিরা

মামণি এখন আর আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু আমাদের জীবন স্বাভাবিক পথেই এগিয়ে চলেছে। একই ঘরে, একই সময়ে আমরা ঘুমতে যাচ্ছি, ঘুম থেকে জাগছি; সকাল-সন্ধ্যায় চা, ডিনার, নৈশাহার, সবই যথাসময়ে সারা হচ্ছে; টেবিল-চেয়ারগুলি একই জায়গায় আছে; আমাদের বাড়িতে অথবা জীবনযাত্রায় কোন কিছুরই পরিবর্তন হয় নি, শুধু—মামণি আর নেই।

আমার মনে হল, এত বড় দুঃখের পরে সব কিছু বদলে যাওয়া উচিত—আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রার ধারাটা তার স্মৃতির প্রতি অপমান বলে মনে হল; তার অনুপস্থিতিটা যেন আরও বেশী করে মনে পড়তে লাগল।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আগের সন্ধ্যায় ডিনারের পরে শুতে যাবার ইচ্ছা হল; নাতালিয়া সাবিশ্‌নার নরম পালকের বিছানায় শুয়ে তার গরম চাদরের নীচে ঢুকে পড়বার ইচ্ছায় তার ঘরেই গেলাম। যখন তার ঘরে ঢুকলাম, নাতালিয়া সাবিশ্‌না হয়তো তখন ঘুমিয়েই ছিল: আমার পায়ের শব্দ শুনে জেগে উঠল, গরম চাদরটা গা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল, টুপিটা ঠিক করে নিয়ে বিছানার একপাশে বসল।

ডিনারের পরে একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্য আমি প্রায়ই তার ঘরে আসি; তাই আমি ঘরে ঢুকতেই সে বুঝতে পারল কেন আমি এসেছি।

বলল, "এখানে একটু বিশ্রাম করতে এসেছ, তাই তো? বেশ তো, শুয়ে পড় সোনা।"

তার হাত ধরে বললাম, "না, না, নাতালিয়া সাবিশ্‌না। সেটাই সব নয়। আসবার ইচ্ছা হল তাই এলাম। তুমি নিজে খুব ক্লান্ত ; বরং তুমি শুয়ে পড়।"

"আমি যথেষ্ট ঘুমিয়েছি সোনা," সে বলল, (আমি জানি তিন রাত সে ঘুমোয় নি), "তাছাড়া, এখন কি ঘুমের কথা ভাববার সময়।" সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

আমাদের দুর্ভাগ্য নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। আমি জানতাম মাকে সে কত ভালবাসে, তাই তার সঙ্গে কাঁদতে পারলে হয়তো কিছুটা শান্তি পাব।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে বিছানায় বসে বললাম, "নাতালিয়া সাবিশ্‌না, তুমি কি বুঝতে পেরেছিলে এ রকমটা ঘটবে?"

এ প্রশ্ন কেন করলাম তা হয় তো সে বুঝতে পারে নি ; তাই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

"এটা কি কেউ বুঝতে পারে?" আমি আবার বললাম।

মমতাভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধা বলে উঠল, "আমি তো এখনও এটা বিশ্বাস করতেই পারি না। আমি তো বুড়ি হয়েছি, অনেক আগেই তো আমার বুড়ো হাড়গুলোকে কবরে শুইয়ে দেওয়ার কথা, অথচ বুড়ো মালিক তোমার ঠাকুর্দা প্রিন্স নিকলাই নিকাইলভিচ (তার আত্মা শান্তি লাভ করুক!), আমার দুই ভাই, আমার বোন আনুশ্‌কা, এরা সকলেই বয়সে আমার ছোট হয়েও আমার আগেই কবরে শুয়েছে, আর এখন, আমারই পাপের ফল, আমি ঠাকরুণের পরেও বেঁচে আছি। তার পবিত্র ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! তিনিই তাকে নিয়েছেন কারণ তিনি নেবার যোগ্য, ঈশ্বর তো ভাল আত্মাদেরই সেখানে নিয়ে যেতে চান।"

এই সরল, সহজ চিন্তা আমাকে সান্ত্বনা দিল; নাতালিয়া সাবিশ্‌নার আরও কাছে ঘেসে বসলাম। দুই হাত বুকের উপর ভাঁজ করে সে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে ; দুটি অশ্রুভরা বসে-যাওয়া চোখে শান্ত অথচ গভীর দুঃখের প্রকাশ। তার মনের একান্ত আশা, এত বছর ধরে যার উপর সে তার সব ভালবাসা উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে, ঈশ্বর কখনও তার কাছ থেকে বেশীদিন তাকে দূরে সরিয়ে রাখবেন না।

"সত্যি সোনা, এই তো সেদিনের কথা, আমি ছিলাম তার নার্স, তাকে পোশাক পরিয়ে দিতাম, তিনি আমাকে নাশা বলে ডাকতেন। ছুটে এসে দু'খানি ছোট হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে বলতেন, আমার নাশিক, আমার রূপসী, আমার মিষ্টি!" আর আমি তামাশা করে বলতাম, "না সোনা, তুমি আমাকে ভালবাস না: সবুর কর, আগে বড় হও, বিয়ে কর, তখন তোমার নাশাকেই ভুলে যাবে।" তিনি খুব চিন্তায় পড়ে যেতেন ; বলতেন, 'নাশাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে না পারলে আমি বিয়েই করব না ; তাকে ছেড়ে আমি কখনও যাব না।' অথচ আজ তিনি আমাকে ছেড়ে গেলেন,

আমার জন্য অপেক্ষাও করলেন না। আমাকে কী ভালই বাসতেন। আসলে, তিনি কাকে না ভালবাসতেন? মামণিকে কখনও ভুলে যেয়ো না সোনা; তিনি সাধারণ মানুষ ছিলেন না; তিনি ছিলেন স্বর্গের দেবদূত। তার আত্মা যখন স্বর্গরাজ্যে পৌঁছবে, তখন তার আত্মা সেখান থেকেই তোমাকে ভালবাসবে, তোমার জন্য আনন্দ করবে।"

আমি শুধালাম, "যখন স্বর্গরাজ্যে পৌঁছবে বলছ কেন নাতালিয়া সাবিশ্‌না? আমি তো মনে করি, মামণি এর মধ্যেই স্বর্গে পৌঁছে গেছে।"

আমার আরও কাছে এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে নাতালিয়া সাবিশ্‌না বলল, "না সোনা, তার আত্মা এখনও ওখানেই রয়েছে।" উপরের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। এত আবেগ ও দৃঢ়তার সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে সে কথাটা বলল যে নিজের অজ্ঞাতেই আমি চোখ তুলে কার্নিসের দিকে তাকালাম। "ভাল মানুষের আত্মা স্বর্গে যাবার আগে তার চল্লিশ রকমের পরিবর্তন ঘটে; তাই চল্লিশটা দিন সে তার বাড়িতেই থাকতে পারে।"

অনেকক্ষণ ধরে এমন সরলতা ও বিশ্বাসের সঙ্গে সে এই ধরনের কথা বলতে লাগল যেন নিজের চোখে দেখা কোন দৈনন্দিন ঘটনার কথা বলছে; তার কথায় কোন রকম সন্দেহ কারও মাথায়ই আসতে পারে না। দম বন্ধ করে তার কথা শুনতে লাগলাম; তার সব কথা ঠিক মত বুঝতে না পারলেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলাম।

কথার শেষে নাতালিয়া সাবিশ্‌না বলল, "হ্যাগো সোনা, এখনও তিনি এখানেই আছেন; আমাদের দেখছেন, হয় তো আমরা যা বলছি তাও শুনছেন।"

মাথা নীচু করে সে চুপ করে রইল। চোখের জল মুছে ফেলবার জন্য একখানা রুমাল চাইল; উঠে দাঁড়িয়ে সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আবেগ-কম্পিত গলায় বলল:

"এই ঘটনার ভিতর দিয়ে প্রভু আমাকে তাঁর অনেক কাছে টেনে নিয়েছেন। এখন আর এখানে আমার কি আছে? কার জন্য আর বেঁচে থাকব? ভালবাসবারই বা কে আছে?"

আমার চোখের জল বাঁধ মানল না; শুধালাম, "তুমি কি আমাদের ভালবাস না?"

"ঈশ্বর জানেন তোমাদের আমি কত ভালবাসি, কিন্তু তাকে যে রকম ভালবাসতাম সে রকম কাউকে কখনও বাসি নি; সেভাবে কোনদিন কাউকে বাসতে পারব না।"

সে আর কিছু বলতে পারল না, মুখ ফিরিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ঘুমের কথা আর মনেই এল না, নিঃশব্দে মুখোমুখি বসে দু'জন কাঁদতে লাগলাম। ফোকা ঘরে ঢুকল; কিন্তু আমাদের অবস্থা দেখে, এবং হয়তো আমাদের

বিরক্ত করবে না বলে, নিঃশব্দে দরজায় দাঁড়িয়ে ভীরু চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

চোখ মুছে নাতালিয়া সাবিশ্‌না বলল, "কি চাও ভাল মানুষ ফোকা?"

"কুৎয়া (শোকযাত্রীদের জন্য তৈরি এক রকম খাবার) বানাবার জন্য দেড় পাউণ্ড কিসমিস, চার পাউণ্ড চিনি ও তিন পাউণ্ড চাল।"

তাড়াতাড়ি এক টিপ নস্যি নিয়ে নাতালিয়া সাবিশ্‌না বলল, "হ্যাঁ, এক্ষুণি দিচ্ছি।" দ্রুত পা ফেলে সে কাবার্ডের দিকে এগিয়ে গেল। কর্তব্য তার কাছে সব চাইতে বড়; তাই সে যখন কর্তব্যে মন দিল তখন আমাদের আলোচনা সংক্রান্ত দুঃখের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত তার মন থেকে মুছে গেল।

চিনি বের করে মাপতে মাপতে বলল, "চার পাউণ্ড কিসে লাগবে? সাড়ে তিনই যথেষ্ট। চালই বা আর লাগবে কেন? কালই তো তোমাকে আট পাউণ্ড চাল দিয়েছি! কিছু মনে করো না ফোকা দেমিদিচ, কিন্তু তোমাকে আর চাল আমি দেব না। বাড়িতে এখন টালমাটাল চলছে, তাই ভাংকার খুব মজা হয়েছে: ভাবছে দেখার কেউ নেই। না, মালিকের সম্পত্তি নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আমি দেব না। আট পাউণ্ড! এমন কথা কে কবে শুনেছে!"

"কি করা যাবে? সে যে বলছে সব ফুরিয়ে গেছে।"

"বেশ, তাহলে এই নাও! তাকে দাও!"

যে গভীর আবেগের সঙ্গে সে আমার সঙ্গে কথা বলছিল তা থেকে সরে গিয়ে এই ছোটখাট হিসাব নিয়ে তাকে হৈ-চৈ করতে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এ বিষয়ে পরে ভাবতে গিয়ে বুঝেছি, তার মনের মধ্যে যাই চলুক না কেন, নিজের কাজে ব্যস্ত থাকবার মত যথেষ্ট উপস্থিত বুদ্ধি তার ছিল, আর অভ্যাসের জোরেও সে দৈনন্দিন কাজকর্মগুলো ঠিকমতই করতে পেরেছিল। তার শোক এতই গভীর ও অকৃত্রিম যে ছোটখাট কাজকর্ম না করতে পারার ভান করার কোন দরকারই তার হয় নি।

প্রকৃত শোকের সঙ্গে অহংকার সম্পূর্ণ বেমানান, অথচ অনেকের স্বভাবেই এ দুটো এমন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত যে গভীরতম শোকও অহংকারকে দূর করে দিতে পারে না। শোকের দিনে নিজেকে ক্লিষ্ট বা দুঃখী দেখাবার ইচ্ছার মধ্যেই অহংকারের প্রকাশ। কিন্তু নাতালিয়া সাবিশ্‌না তার দুঃখে এত গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিল যে তার মনে কোন বাসনাই অবশিষ্ট ছিল না; তাই অভ্যাসের পথ ধরেই সে চলতে লাগল।

ফোকার কথামত খাবারদাবারগুলো দিয়ে এবং গির্জার লোকদের জন্য পেস্ট্রি তৈরি করার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সে তাকে বিদায় করে দিল; মোজা হাতে নিয়ে আবার আমার পাশে এসে বসল।

আবার আগের আলোচনারই জের চলল, আর আমরা দুজনও আবার কাঁদতে লাগলাম।

নাতালিয়া সাবিশ্‌নার সঙ্গে প্রতিদিনই এই আলোচনা হয়, তার শান্ত অশ্রুজল ও গভীর, আন্তরিক কথাগুলি আমাকে এনে দেয় শান্তি ও সান্ত্বনা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদায়ের দিন এল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার তিন দিন পরে গোটা পরিবারই মস্কোয় চলে গেল। তার সঙ্গে আর কখনও আমার দেখা হয় নি।

আমাদের মুখ থেকে এই ভয়ংকর সংবাদটা শুনে দিদিমা খুবই কষ্ট পেল। তার সঙ্গে আমাদের দেখা করতে দেওয়া হল না, কারণ পুরো এক সপ্তাহ দিদিমা অজ্ঞান হয়ে রইল; ডাক্তার তার জীবনের আশংকা করতে লাগল; তার আরও কারণ দিদিমা ওষুধ খেত না, কারও সঙ্গে কথা বলত না, ঘুমত না, কোনরকম পুষ্টিকর খাদ্যও খেত না। অনেক সময় তার ঘরের হাতল-চেয়ারটায় একলা বসে থেকে হঠাৎ সে হো-হো করে হাসত, তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠত, কিন্তু চোখে জল পড়ত না; অথবা চীৎকার করে অসংলগ্ন সব কথা বলতে বলতে সমস্ত শরীর ঝাঁকুনি দিতে শুরু করত। এটাই তার জীবনের প্রথম বড় শোক, তাই দিদিমা হতাশায় ভেঙে পড়ল। যেন নিজের এই দুর্ভাগ্যের জন্য কাউকে দোষী করতেই সে ভয়ংকর সব কথা বলে, অস্বাভাবিক উৎসাহের সঙ্গে কোন অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে কথা কয়, চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বড় বড় পা ফেলে ঘরময় পায়চারি করে, আর তার পরেই অজ্ঞান হয়ে যায়।

একদিন তার ঘরে ঢুকলাম। দিদিমা যথারীতি তার চেয়ারে বসে আছে, অবস্থা বেশ শান্তই আছে, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি দেখে চমকে উঠলাম। চোখ দুটি বড় বেশী বিস্ফারিত, শূন্য দৃষ্টি এদিক-ওদিক ঘুরছে; আমার দিকে সোজা তাকিয়ে আছে, অথচ আমাকে দেখছে না। ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখা দিল; মমতাস্নিগ্ধ গলায় বলল "এস সোনা; এখানে এস আমার দেবদূত।' আমাকেই ডাকছে ভেবে আরও কাছে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু সে আমার দিকেই তাকাল না। "আঃ, যদি জানতে আমি কী কষ্ট সহ্য করছি, আর এখন তুমি আসায় কত খুশি হয়েছি!" তখন বুঝলাম, দিদিমা কল্পনায় মামণিকে দেখছে; আমি থেমে গেলাম। ভুরু কুঁচকে বলতে লাগল, "ওরা বলছে তুমি মারা গেছ। কী বাজে কথা! তুমি কি আমার আগে মরতে পার?" বিকারগ্রস্তের মত সে অট্টহাসি হাসতে লাগল।

যে সব মানুষ গভীরভাবে ভালবাসতে পারে, গভীর শোকও তারাই সইতে পারে; ভালবাসার প্রয়োজনই তাদের শোককে প্রতিরোধ করে, সারিয়ে তোলে। সেই কারণেই মানুষের নৈতিক সত্তা তার দৈহিক সত্তার চাইতে অধিকতর সহনশীল; শোক তাকে মারতে পারে না।

এক সপ্তাহ পর থেকে দিদিমা কাঁদতে পারল; তার অবস্থারও উন্নতি হতে লাগল। আত্মস্থ হবার পরে তার প্রথম চিন্তাই হল আমাদের নিয়ে, আমাদের প্রতি তার ভালবাসা আরও বেড়ে গেল। তার হাতল-চেয়ার

ছেড়ে আমরা কোথাও যাই না; সে ধীরে ধীরে কাঁদে আর আমাদের আদর করে।

দিদিমার শোক দেখে এ-কথা কেউ মনে করবে না যে সে বেশী বাড়াবাড়ি করছে; তার শোকের প্রকাশ আমাদের গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে; তবু কেন জানিনা নাতালিয়া সাবিশ্‌নার প্রতিই আমার সহানুভূতি বেশী; আজও আমার ধারণা, সেই সরল, স্নেহশীল মানুষটির মত আন্তরিকভাবে আর কেউ মামণিকে ভালবাসে নি, তার জন্য শোক প্রকাশ করে নি।

মামণির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমার সুখের শৈশবের অবসান হল; শুরু হল একটা নতুন অধ্যায়—কৈশোর যুগ; কিন্তু যেহেতু যে নাতালিয়া সাবিশ্‌নার সঙ্গে আর কোনদিন আমার দেখা হয় নি, অথচ আমার গোটা জীবন ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর যার প্রভাব এত শক্তিশালী ও কল্যাণকর, তার স্মৃতি আমার জীবনের প্রথম যুগের সঙ্গেই জড়িত, সেই হেতু তার সম্পর্কে ও তার মৃত্যু সম্পর্কে আরও দু'চারটি কথা আমি বলব।

পরবর্তীকালে শুনেছি: আমরা চলে আসার পরে সে গ্রামেই থেকে গিয়েছিল; হাতে কোন কাজ না থাকায় তার দিনগুলো যেন আর কাটতে চাইত না। যদিও ইস্তিরি করার সব কাজ তার হাতেই ছিল; সব কাজ সে নিজের হাতেই করত, জামা-কাপড় একবার ঝুলিয়ে রেখে আবার সেগুলো পাট করে তুলে রাখত, তবু শিশুকাল থেকেই মনিবের উপস্থিতিতে এতবড় বাড়িটাতে সব সময়ই যে হৈ-হট্টগোলে সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল তার অভাবটা তার মনে বড় বেশী করে বাজত। শোক, জীবনযাত্রার ধারার পরিবর্তন, দায়িত্ব পালনের সুযোগের অভাব—এ সবকিছুর সুযোগে একটা পুরনো অসুখ বড় তাড়াতাড়ি মাথা চাড়া দিল। মামণির মৃত্যুর ঠিক এক বছর পরেই সে উদরী রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল।

মনে হয় এভাবে বেঁচে থাকাটা নাতালিয়া সাবিশ্‌নার পক্ষে খুবই শক্ত হয়ে পড়েছিল—এবং তার চাইতে বেশী শক্ত হয়ে পড়েছিল অতবড় একটা শূন্য বাড়িতে আত্মীয়হীন ও বন্ধুহীন অবস্থায় একাকি মৃত্যুকে বরণ করা। বাড়ির সকলেই নাতালিয়া সাবিশ্‌নাকে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত; কিন্তু কারও সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল না। আর তা নিয়ে সে গর্ববোধ করত।

ঐকান্তিক প্রার্থনায় নিজের মনের কথা ঈশ্বরকে জানিয়েই সে সান্ত্বনা পেতে চাইত এবং সান্ত্বনা পেত; কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতার মুহূর্তগুলিতে যখন কোন জীবিত প্রাণীর চোখের জল ও সহানুভূতির মধ্যেই মানুষ সান্ত্বনা খোঁজে, তখন সে তার ছোট্ট কুকুরটাকে বিছানায় তুলে নিত, তার সঙ্গে কথা বলত, তার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে কাঁদত। কুকুরটি যখন করুণ গলায় ডেকে উঠত, তখন তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করে বলত, "যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট! তুমি না বললেও বুঝতে পেরেছি যে আমার সময় হয়েছে।"

মৃত্যুর একমাস আগে সিন্দুক থেকে কিছুটা সাদা ক্যালিকো, সাদা মসলিন ও লাল ফিতে বের করে দাসীর সাহায্যে নিজের জন্য একটা সাদা পোশাক ও টুপি তৈরি করল এবং নিজের অন্ত্যেষ্টির সব রকম ব্যবস্থা করে রাখল। মনিবের সিন্দুকগুলো আলাদা করে তার ভিতরকার জিনিসপত্রের একটা সঠিক ফর্দ বানিয়ে নায়েবকে দিয়ে দিল। নিজের কাছে রেখে দিল শুধু দিদিমার দেওয়া দুটো রেশমী পোশাক ও একটা পুরনো শাল, এবং ঠাকুর্দার দেওয়া তার সামরিক পোশাকটা। নাতালিয়া সাবিশ্‌নার যত্নে সামরিক পোশাকটার কারুকাজ ও রেশমী ফিতেগুলো তখনও বেশ ঝকমকেই ছিল, আর কাপড়ও পোকায় কাটে নি।

মৃত্যুর আগে সে বলে গেছে, লাল পোশাকটা যেন ভলদিয়াকে দেওয়া হয় একটা ড্রেসিং-গাউন বা জ্যাকেট বানাবার জন্য। সেই একই উদ্দেশ্যে আমাকে যেন দেওয়া হয় বাদামী ডোরা-কাটা জামাটা। আর লিউবচ্‌কাকে শালটা। সামরিক পোশাকটা সে তাকে দান করে গেছে যে আমাদের মধ্যে আগে অফিসার হতে পারবে। বাদবাকি তার কিছু সম্পত্তি ও টাকা-পয়সা—অন্ত্যেষ্টি ও সমবেত প্রার্থনার জন্য নির্দিষ্ট চল্লিশ রুবল ছাড়া—সব দিয়ে গেছে তার ভাইকে। অনেক-কাল আগেই এখান থেকে মুক্তি পেয়ে তার ভাই বহুদূর দেশে কোথাও ভ্রষ্টাচারী জীবন যাপন করছে; জীবিতকালে ভাইয়ের সঙ্গে তার কোন রকম যোগাযোগই ছিল না।

নাতালিয়া সাবিশ্‌নার ভাই যখন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি বুঝে নিতে নিজে এসে হাজির হল এবং জানতে পারল যে মৃতার সম্পত্তি বলতে আছে শুধু পঁচিশ রুবলের নোট, তখন একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ষাট বছর একটা সমৃদ্ধ পরিবারে বাস করে, গৃহস্থালীর পুরো দায়িত্ব নিজের কাঁধে বহন করে, এবং কৃপণতার সঙ্গে সারাটা জীবন কাটিয়েও কিছুই রেখে যায় নি একথা সে কিছুতেই বিশ্বাস করল না। অথচ সেটাই প্রকৃত ঘটনা।

নাতালিয়া সাবিশ্‌না দু'মাস ধরে অসুখে ভুগল; খৃস্টানসুলভ ধৈর্যের সঙ্গে সব কষ্ট সহ্য করল; কারও বিরুদ্ধে কোন নালিশ জানাল না, ক্ষোভ প্রকাশ করল না, শুধু অবিরাম প্রার্থনা করতে লাগল। মৃত্যুর এক ঘণ্টা আগে আত্মদোষ স্বীকার করল, শেষ ধর্ম-সংস্কার ও তৈল-লেপন পর্বকে শান্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করল।

যদি কখনও কারও কোন ক্ষতি করে থাকে সেজন্য বাড়ির সব চাকরদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল: পুরোহিত ফাদার ভাসিলিকে অনুরোধ করল, সে যেন আমাদের সকলকে জানায় যে আমরা তার প্রতি যে সদয় ব্যবহার করেছি তার জন্য ধন্যবাদ জানাবার ভাষা তার জানা নেই, এবং নিজের বোকামির জন্য যদি আমাদের কাউকে কখনও দুঃখ দিয়ে থাকে তো সে জন্য আমরা যেন তাকে ক্ষমা করি; "কিন্তু আমি কখনও চোর ছিলাম না, আর একথা বলতে পারি যে

আমার মনিবদের একটা সুতোও কখনও ঠকাই নি।" নিজের এই গুণটিকেই সে সব চাইতে বেশী মূল্য দিত।

নিজের তৈরি চাদরে ও টুপিতে শরীরটা জড়িয়ে বালিশের উপর ভর রেখে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত সে পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলল, কখনও থামল না। গরীবদের দেবার মত কিছু না থাকায় সে পুরোহিতের হাতে দশটি রুবল দিয়ে তাকে অনুরোধ করল, সেটা যেন গ্রামের লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়। তারপর নিজের বুকের উপর ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল, চিৎ হয়ে শুয়ে শেষ বারের মত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, আনন্দিত স্বরে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করল।

জীবনকে ছেড়ে যেতে তার কোন অনুশোচনা ছিল না; মৃত্যুকে সে ভয় করে না, তাকে গ্রহণ করল আশীর্বাদের মত। এ কথা অনেকেই বলে, কিন্তু তারা কদাচিৎ সত্য বলে! নাতালিয়া সাবিশ্‌না মৃত্যুকে ভয় করে না, কারণ ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাস নিয়ে এবং "কথামৃত"-এর সব বিধান পুর্ণভাবে মেনেই সে মারা গেছে। তার সারাটা জীবনই ছিল পবিত্র, এবং নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও আত্মত্যাগে পূর্ণ।

তার ধর্মবিশ্বাস যদি মহত্তর হত, যদি তার জীবন পরিচালিত হত উচ্চতর কোন লক্ষ্যে, তাতেই বা কি? সে জন্য সেই পবিত্র মানুষটির ভালবাসা ও প্রশংসা পাবার যোগ্যতা কি কিছু কম?

এ জীবনে একটি শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম কাজ সে করে গেছে: কোন রকম অনুশোচনা না করে ভয় না করে সে মারা গেছে।

তারই ইচ্ছা অনুসারে, মামণির সমাধির উপরে যে ভজনালয়টি তৈরি হয়েছে তার অনতিদূরেই তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। আলকুশি ও চোরকাঁটায় ঢাকা যে ছোট পাহাড়টার নীচে সে ঘুমিয়ে আছে তার চারপাশে কালো লোহার বেড়া দেওয়া হয়েছে; ভজনালয় থেকে সেই বেড়ার ধারে গিয়ে মাটিতে নত হয়ে শ্রদ্ধা জানাতে আমি কখনও ভুলি না।

অনেক সময় ভজনালয় ও কালো বেড়াটার মাঝামাঝি জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। বেদনাবিধুর স্মৃতিগুলো মনের মধ্যে ভিড় করে। ভাবি: ঈশ্বর কি এই দুটি বস্তুর সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে রেখেছেন চিরকাল তাদের জন্য শুধু শোক করবার জন্যই?

———

: কৈশোর :

অধ্যায়—১

বিরতিহীন যাত্রা

পেত্রভস্কয়ে ভবনের সামনে আবার দুটি গাড়ি এসে দাঁড়াল : একটা পাল্কি গাড়ি ; তাতে বসেছে মিমি, কাতেংকা, লিউবচ্কা, আর বক্সে বসেছে আমাদের করণিক ইয়াকভের সঙ্গে দাসীটি ; অন্যটি বৃৎস্কা ; সেটায় পরিচারক ভাসিলির সঙ্গে ভলদিয়া ও আমি।

বাপি কয়েকদিন পরে মস্কোতে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে ; টুপিহীন মাথায় ফটকে দাঁড়িয়ে সে পাল্কি-গাড়ি ও বৃৎচ্কার জানালায় ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল।

"খৃস্ট তোমাদের সহায় হোন ! যাত্রা কর !" ইয়াকভ ও কোচয়ানরা টুপি খুলে যার যার মত ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল। "ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন ! আগে বাড় ! আগে বাড় ।"

পাল্কি-গাড়ি ও বৃৎচ্কা অসমান পথে ঠোক্কর খেতে খেতে এগিয়ে চলল ; পথের দু'ধারে বার্চগাছগুলো একে একে পিছনে সরে যেতে লাগল। আমার মনে কোন দুঃখ নেই : মনের চোখে আমি যা ছেড়ে যাচ্ছি তাকে দেখছি না, দেখছি যা আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। এই মুহূর্ত পর্যন্ত যে সব জিনিস আমার মনকে বিষণ্ণ স্মৃতিতে ভরিয়ে রেখেছিল সেগুলি যত দূরে সরে যেতে লাগল ততই সে স্মৃতির জোর কমে এল, মনে জাগল একটা সুন্দর অনুভূতি : জীবনটা শক্তি, সজীবতা ও আশায় ভরা।

যে চারটি দিন ধরে আমাদের যাত্রা চলল সেই ক'টা দিন যে রকম মনের মত করে সুখে কাটালাম তেমন সুখের দিন আমার জীবনে খুব অল্পই এসেছে।

মামণির ঘরের যে বন্ধ দরজার পাশ দিয়ে আমি সভয়ে শিউরে না উঠে যেতেই পারতাম না সে দরজাটা আর আমার চোখে ভাসছে না ; যে বন্ধ পিয়ানোটা খোলা দূরে থাক কেউ তার দিকে তাকাতেই সাহস করত না সেটাও আর চোখে পড়ছে না ; এমন কি শোকের পোশাক (এখন আমাদের পরনে ভ্রমণোপযোগী সাধারণ স্যুট) বা অন্য যে সব জিনিস এই অপূরণীয় ক্ষতির কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিত সে সব কিছুই আর মনে পড়ছে না। অপর দিকে, এখানে নতুন নতুন সুন্দর সব জায়গা ও জিনিস আমার মনোযোগ আকর্ষণ করছে ; বসন্ত-প্রকৃতি আমার মনে জাগিয়ে তুলছে বর্তমানকে নিয়ে সানন্দ সন্তোষ এবং ভবিষ্যতের উজ্জ্বল প্রত্যাশা।

সকালে, খুব সকালে নির্দয় ভাসিলি আমাদের গায়ের কম্বল টেনে ফেলে জানিয়ে দেয় যে যাত্রার সময় হয়ে গেছে, সব কিছু প্রস্তুত। সকাল বেলাকার মধুর ঘুমের আমেজটাকে আরও পনেরো মিনিট বাড়িয়ে নিতে ফন্দি-ফিকির ও রাগ যতই কর, ভাসিলির কঠোর মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে যে সে অবিচল, দরকার হলে সে বিশ বার তোমার কম্বলটা টেনে সরিয়ে দেবে ; কাজেই এক লাফে উঠে হাতমুখ ধুয়ে নিতে উঠোনে ছুটতে হবে।

সামনের ঘরে সামোভারে এর মধ্যেই জল ফুটতে শুরু করেছে, মিংকা তাতে ফুঁ দিতে দিতে গলদা চিংড়ির মত লাল হয়ে উঠেছে। বাইরেটা ভেজা-ভেজা ও কুয়াশা-ঢাকা, পূবের আকাশে ভোরের সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে ; উঠোনের চারদিককার গো-শালার খড়ের চালের উপর শিশির-কণা চিকচিক করছে। তার নীচে আমাদের ঘোড়াগুলো বাঁধা অবস্থায় খড় চিবুচ্ছে।

ভোর হবার আগে যে লোমশ কালো কুকুরটা শুকনো গোবরের স্তূপের উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল সেটা এবার আলস্যভরে শরীরটা টান-টান করে লেজ নাড়তে নাড়তে উঠোনটা পার হয়ে গেল। কর্মব্যস্ত চাকরানি গরুগুলোকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল। জামার আস্তিন গুটিয়ে ফিলিপ গভীর কুয়ো থেকে জল তুলে কাঠের টবে ঢালছে ; তার চারপাশের ডোবার জলে হাঁসগুলো সকালবেলাকার স্নান সেরে নিচ্ছে ; আমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ফিলিপের সুন্দর মুখ, ঝাকড়া দাড়ি এবং সবল স্নায়ু ও মাংসপেশীর দিকে।

বেড়ার ওপার থেকে চলাফেরার শব্দ আসছে ; মিমি ও মেয়েরা সেখানে ঘুমিয়েছে ; কাল রাতে বেড়ার এপাশ থেকেই আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। দাসী মাশা দরজা খুলে আমাদের চা খেতে ডাকল।

ঘন সাদা মেঘে ঢাকা পূবের আকাশে সবে সূর্য উঠেছে ; প্রশান্ত আলোয় চারদিকটা আলোকিত হয়ে গেছে। আমার কাছে সব কিছুই সুন্দর লাগছে ; মনটা খুশিতে কত হাল্কা হয়ে উঠেছে। শিশির-ভেজা শুকনো খড় ও সবুজ ঘাসে ভরা দূর-বিস্তার মাঠের ভিতর দিয়ে রাস্তাটা এঁকে-বেঁকে সামনের দিকে চলে গেছে। রাস্তার পাশে মাঝে মাঝেই একটা অন্ধকার উইলোগাছ অথবা সবুজ পাতায় ভরা ছোটখাট বার্চ গাছ পথের উপর একটানা ছায়া ফেলেছে। গাড়ির চাকা ও ঘণ্টার একঘেয়ে শব্দে উড়ন্ত চাতক পাখিদের ডাক চাপা পড়ে নি। পোকায় কাটা কাপড়, ধুলো, বৃৎচ্‌কার টক-টক গন্ধ—সবই সকাল বেলাকার সৌগন্ধের মধ্যে হারিয়ে গেছে। আমার কেমন যেন একটা অস্বস্তিবোধ হচ্ছে, একটা কিছু করতে ইচ্ছা করছে ; সত্যিকারের ভালবাসার এটাই তো লক্ষণ।

"ডাক-ঘাঁটিতে থাকার সময় আমার প্রার্থনা করা হয় নি ; কিন্তু যেহেতু অতীতে একাধিকবার দেখেছি যে যখনই প্রার্থনা করতে ভুলে যাই তখনই আমার কপালে একটা না একটা দুর্ভাগ্য দেখা দেয়, তাই সে ভুলটা শুধরে নিতে

চেষ্টা করলাম। টুপি খুলে বৃৎচ্কার এক কোণে গিয়ে প্রার্থনা করলাম; যাতে কেউ দেখতে না পায় সেজন্য পোশাকের তলায় ক্রুশ-চিহ্ন আঁকলাম। তবু বাইরের হাজার রকম জিনিস এমনভাবে আমার মনকে টানতে লাগল যে অন্যমনস্ক হয়ে একই প্রার্থনা বার বার উচ্চারণ করতে লাগলাম।

রাস্তার পাশে ফুটপাথে কিছু ধীরগতি মূর্তি চোখে পড়ল: তারা তীর্থযাত্রী। নোংরা রুমালে মাথা ঢাকা; পিঠে বার্চ গাছের বাকলের থলে; নোংরা, ছেঁড়া পট্টিবাঁধা, পায়ে কাঠের ভারী জুতো। একতালে লাঠি ফেলতে ফেলতে কোন দিকে না তাকিয়ে তারা সারি বেঁধে আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। অবাক হয়ে ভাবলাম: ওরা কোথায় যাচ্ছে? কেন যাচ্ছে? ওরা কি অনেক দিন পথ চলবে? পথের ধারের উইলো গাছের ছায়ার সাথে তাদের ক্ষীণ ছায়াগুলি কি অচিরেই মিশে যাবে?

নানাধরনের লোকজন দেখতে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে ভার্স্ট-খুঁটিগুলোর উপর আঁকাবাঁকা করে খোদাই করা সংখ্যাগুলো চোখেই পড়ে নি। এখন রোদে মাথা ও পিঠ পুড়ে যাচ্ছে, রাস্তায় ধুলো আরও বেড়েছে, তিন-কোণা চায়ের বাক্সের উপর বসতে কষ্ট হচ্ছে, বার বার আসন বদলাচ্ছি। ক্রমেই গরম লাগছে, অস্বস্তি লাগছে, একঘেয়ে লাগছে। এবার আমার সব মনোযোগ পড়ল ভার্স্ট-খুঁটি ও তার সংখ্যাগুলোর উপর। পরের ঘাঁটিতে কতক্ষণে পৌছতে পারব তা নিয়ে নানারকম গাণিতিক হিসাব কসতে লাগলাম।

"বারো ভার্স্ট হচ্ছে ছত্রিশ ভার্স্টের এক-তৃতীয়াংশ; লিপেৎস্ হচ্ছে একচল্লিশ ভার্স্ট; ফলে মোট পথের এক-তৃতীয়াংশ আমরা পার হয়ে এসেছি।" ইত্যাদি।

ভাসিলি বক্সে বসে ঝিমুচ্ছে দেখে বললাম, "ভাসিলি, আমাকে একটু বক্সে বসতে দাও।" ভাসিলি রাজী হল; আমরা স্থান-পরিবর্তন করলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে এমনভাবে হাত-পা ছড়িয়ে নাক ডাকাতে লাগল যেন বৃৎচ্কার মধ্যে আর কারও জায়গাই রইল না।

এক সময় ফিলিপকে অনুরোধ করলাম, সে যেন আমাকে একটু গাড়ি চালাতে দেয়। ফিলিপ প্রথমে আমাকে একটা লাগাম দিল, তারপর আর একটা, শেষ পর্যন্ত ছ'টা লাগাম ও চাবুক সবই আমার হাতে দিল; আমি খুব খুশি। সব রকম ভাবে ফিলিপের নকল করতে লাগলাম; তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন চালাচ্ছি; কিন্তু সে খুব সন্তোষপ্রকাশ করল না; সব ক'টা ঘোড়া সমানতালে চলছে না; সে আমার হাত থেকে লাগামগুলো নিয়ে নিল। ক্রমেই গরম বাড়ছে। পেঁজা তুলোর মত টুকরো টুকরো মেঘগুলো সাবানের বুদ্বুদের মত ক্রমেই উপরের দিকে উড়ে যাচ্ছে, তারপর মিলেমিশে গাঢ় ধূসর রং ধারণ করছে। পাল্কি-গাড়ির জানালা দিয়ে একটা বোতল ও একটা ছোট পুঁটুলি সহ একখানা হাত বেরিয়ে এল। অদ্ভুত ভঙ্গীতে চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে ভাসিলি আমাদের জন্য মাখন-পিঠে ও ক্ভাস এনে দিল।

একটা খাড়া উৎরাইয়ে পৌঁছে আমরা গাড়ি থেকে নেমে সেতু পর্যন্ত দৌড়ে গেলাম। ভাসিলি ও ইয়াকভ গাড়ির ব্রেক চেপে পাল্কি-গাড়িটাকে দুদিক থেকে এমনভাবে ঠেলে ধরল যেন দরকার হলে তারা দুজনই গাড়িটাকে উল্টে যাওয়া থেকে বাঁচাতে পারবে। তারপর মিমির অনুমতি পাওয়া গেল, ভলদিয়া বা আমি পাল্কি-গাড়িতে চাপব, আর লিউবচ্‌কা বা কাতেংকা বৃৎচ্‌কাতে উঠবে। এই পরিবর্তনে মেয়েরা খুব খুশি হল, কারণ তাদের মতে বৃৎচকায় চড়া অনেক বেশী মজার ব্যাপার। মাঝে মাঝে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে কচি ডালপালা ছিঁড়ে আমরা বৃৎচ্‌কার মধ্যেই একটা কুঞ্জবন বানিয়ে ফেললাম। এই চলমান কুঞ্জবনটা পাল্কি-গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল, আর লিউবচ্‌কা খুশিতে একটা চড়া সুরের শিস দিয়ে উঠল।

যে গ্রামে আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম করব সেটা এসে পড়ল। গ্রাম, তার তামাক, আলকাতরা ও রুটি সেঁকার গন্ধ এর মধ্যেই আমাদের নাকে এসেছে। নানা কণ্ঠস্বর, পায়ের শব্দ ও গাড়ির চাকার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। ঘোড়ার গলার ঘণ্টার শব্দ এখন আর খোলা মাঠের মত স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না; দুই দিকে খড়ের চালের কুঁড়ে ঘর, কাঠের খোদাই করা ফটক, লাল ও সবুজ পাল্লার ছোট ছোট জানালা, তা দিয়ে কোন কৌতূহলী স্ত্রীলোক মুখ বের করে দেখছে। চাষীদের ছেলেমেয়েরা একটিমাত্র ঢিলে জামা পরে খালি পায়ে গাড়ির পিছনে ছুটছে, কখনও বা ফিলিপের বকুনি সত্ত্বেও গাড়ির পিছনে চড়ে বসার চেষ্টা করছে। আদা-রঙের চুলের সরাইওয়ালারা খদ্দের ধরবার জন্য নানা রকম লোভনীয় প্রস্তাব করছে। আহা! ক্যাচর-ক্যাচর শব্দ করে গেটটা খুলে গেল। আমরা উঠোনে প্রবেশ করলাম। এবার চার ঘণ্টার বিশ্রাম ও মুক্তি!

অধ্যায়—২

বজ্র ও ঝড়

সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে; রোদের তাপে আমার গলা ও গাল পুড়ে যাচ্ছে। বৃৎচ্‌কাটা এত গরম হয়েছে যে তাতে হাত দেওয়া অসম্ভব। রাস্তার ঘন ধুলোয় বাতাস ভরে গেছে। ধুলো উড়িয়ে দেবার মত এতটুকু হাওয়া নেই। আমাদের সামনে সমান দূরত্ব বজায় রেখে ধুলোয় ঢাকা পাল্কি-গাড়িটা হেলে দুলে এগিয়ে চলেছে; তার উপর দিয়ে মাঝে মাঝে কোচয়ানের চাবুক, তার টুপি ও ইয়াকভের টুপিটা দেখা যাচ্ছে। কি যে করব বুঝতে পারছি না; ধুলোয় ঢাকা মুখে ভলদিয়া পাশে বসে ঝিমুচ্ছে; ফিলিপের চলমান পিঠটা, অথবা আমাদের বৃৎচ্‌কার দীর্ঘ বাঁকা ছায়া—কিছুই দেখতে ভাল লাগছে না। আমার সব মনোযোগ পড়েছে ভার্স্ট-খুঁটিগুলো আর ইতস্তত ছড়ানো মেঘের

দিকে। মেঘগুলো ক্রমেই কালো হয়ে একত্র জমছে। মাঝে মাঝে দূর থেকে বজ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ডাক-ঘাঁটিতে পৌঁছবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। বজ্রের ডাকের সঙ্গে ঝড় উঠলেই আমার মনে কেমন যেন ভয় ও বিষণ্ণতার একটা অবর্ণনীয় কাঁপা অনুভূতি জাগে।

নিকটবর্তী গ্রাম এখনও দশ ভার্স্ট দূরে; কিন্তু কোথা হতে জানিনা গাঢ় লাল রংয়ের একটা বড় মেঘ অতি দ্রুত আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। সূর্য এখনও মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে নি; মেঘের উপর রোদ পড়ে তার বিচ্ছুরিত কিরণ-রেখাগুলি দিগন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। দূরে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে; মেঘের ডাক ক্রমেই উচ্চতর হচ্ছে। ভাসিলি বৃৎচ্কার উপর উঠে ঢাকনাটা তুলে দিল। কোচয়ানরা তাদের "আর্মিয়াক" পরে নিয়েছে; বজ্রের গর্জন শুনলেই তারা টুপি খুলে ক্রুশ চিহ্ন আঁকছে। ঘোড়াগুলো কান খাড়া করে ঝড়ের বাতাসে শ্বাস টানছে; ধূলোভরা পথে বৃৎচ্কার গতি ক্রমেই বাড়ছে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে পেয়ে বসল। বুঝতে পারছি, আমার শিরার মধ্যে রক্ত দপ্‌দপ্ করছে। ইতিমধ্যে এই প্রথম মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়ল; তার শেষ রশ্মি রেখা শেষবারের মত মেঘের ফাঁক দিকে উঁকি দিয়েই দিগন্তের বুকে হারিয়ে গেল। গোটা দৃশ্যপট সহসা বদলে গিয়ে কেমন যেন বিষণ্ণতায় ভরে গেল। অ্যাস্পেন গাছের ডাল-পালাগুলি কাঁপছে; পাতাগুলোতে লেগেছে ধূসরের আভা; সেগুলোও কাঁপছে; বার্চ গাছের মাথায় দোলা লেগেছে; ঘাসের বুকে জেগেছে শিহরণ। সাদাগলা চাতকপাখিরা বৃত্তাকারে দল বেঁধে বৃৎচ্কাটাকে ঘিরে উড়ছে; যেন আমাদের থামিয়ে দিতে চাইছে; দাঁড়কাকগুলো বাতাসে পাখা ছড়িয়ে উড়ে যাচ্ছে; আমাদের গায়ে জড়ানো চামড়ার এপ্রন বাতাসে উড়ছে, আর তার ফাঁকে ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগছে। বিদ্যুৎ যেন আমাদের বৃৎচ্কার মধ্যেই ঝল্‌সে উঠল; মুহূর্তের জন্য সব কিছু আলোকিত হল; এককোণে ভলদিয়া উবু হয়ে বসে আছে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড বজ্রের শব্দ আমাদের একেবারে মাথার উপরেই যেন ফেটে পড়ে প্রথমে উঁচুতে উঠতে উঠতে এক সময় কান-ফাটানো শব্দ করে দূর হতে দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল। আমরা শিউরে উঠলাম; দম বন্ধ হবার উপক্রম। ঈশ্বরের রোষ! সাধারণের এই ধারণার মধ্যে কতখানি কাব্য আছে!

চাকাগুলি দ্রুততর গতিতে ঘুরছে। ভাসিলি ও ফিলিপের পিঠ দেখেই বুঝতে পারছি, তারাও ভয় পেয়েছে। পাহাড় বেয়ে নামতে নামতে বৃৎচ্কাটা সশব্দে একটা কাঠের সেতুর উপর উঠল। আমি নড়তেও পারছি না; কেবল ভয় হচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে ধ্বংস নেমে আসবে আমাদের সকলের মাথায়।

এই যা! গাড়ির দড়িটা ছিঁড়ে গেল; মুহুর্মুহু কান-ফাটানো বজ্রের গর্জন সত্ত্বেও সেতুটার উপরেই আমাদের থামতে হল।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে বৃৎচ্কার এক কোণে মাথাটা রেখে বসে রইলাম ; ফিলিপের কালো কালো মোটা আঙুলগুলো নড়ছে ; সেই দিকে তাকিয়ে আছি ; হতাশা যেন বুকটাকে চেপে ধরেছে। ধীরে ধীরে একটা গিঁট দিয়ে দড়িটাকে বেঁধে ফিলিপ হাতের তালু ও চাবুকের বাঁট দিয়ে ঘোড়াটার পিঠ ঠুকে দিল।

ঝড় যত বাড়ছে আমার মনের ভয় ও বিপদও ততই বাড়ছে ; যেকোন বজ্রসহ ঝড়ের আগে যে প্রচণ্ড নিস্তব্ধতা নামে সেই নিস্তব্ধতার সময় আমার ভয় ও বিষণ্ণতার অনুভূতি এতদূর তীব্র হয়ে উঠল যে সে অবস্থা যদি পনেরো মিনিট চলত তাহলে উত্তেজনায় আমি মারাই যেতাম। ঠিক সেই সময় সেতুর নীচ থেকে একটি মনুষ্যমূর্তি বেরিয়ে এল ; পরনে ময়লা, ছেঁড়া শার্ট ; ফোলা-ফোলা ভাবহীন মুখ, কামানো খালি মাথা, স্নায়ুবিহীন বাঁকানো পা ; একটা হাতের বদলে চকচকে লাল কাঠের দণ্ডটা বৃৎচ্কার মধ্যে বাড়িয়ে দিল।

প্রতিটি শব্দের সঙ্গে ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে মাথাটা অনেকখানি নুইয়ে ভিক্ষুকটি কাঁপা গলায় বলল, "খৃস্টের প্রেমের দোহাই, একজন পঙ্গুকে সাহায্য করুন।"

সেই মুহূর্তে আমার বুকের ভিতরটা আতংকে এমন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল যে তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। প্রতিটি লোমকূপের ভিতর দিয়ে একটা কাঁপুনি বয়ে গেল ; আতংকে স্তম্ভিত চোখে ভিখারিটির দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

যাত্রাপথে ভাসিলিই ভিক্ষা দিয়ে থাকে ; এতক্ষণ সে ফিলিপকে গাড়িটা ঠিক করার ব্যাপারে নির্দেশাদি দিচ্ছিল ; এবার সে পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াতে লাগল। কিন্তু নতুন করে যাত্রা শুরু করা মাত্রই দৃষ্টিরোধকারী একটা বিদ্যুতের ঝলকানি মুহূর্তের জন্য পুরো গাড়িটাকেই আলোকিত করে তুলল ; ঘোড়াগুলোও থেমে গেল ; সঙ্গে সঙ্গেই বজ্রের এমন একটা কান-ফাটানো শব্দ শোনা গেল যে মনে হল গোটা আকাশটাই বুঝি আমাদের মাথায় ভেঙে পড়বে। আরও জোরে বাতাস বইতে লাগল ; সেই উন্মত্ত ঝোড়ো হাওয়ার বেগে ঘোড়াগুলোর কেশর ও লেজ, ভাসিলির জোব্বা এবং এপ্রনের কোণগুলো একই দিকে ভীষণভাবে উড়তে লাগল। বৃৎচ্কার চামড়ার ছাউনির উপর বৃষ্টির একটা ফোঁটা পড়ল ; তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ফোঁটা ; আর তারপরেই শুরু হল ঢাকের বাজনার মত বৃষ্টি পড়ার শব্দ ; চারদিক জুড়ে শোনা যেতে লাগল তারই প্রতিধ্বনি। ভাসিলির কনুইয়ের নড়াচড়া দেখে বুঝতে পারলাম যে তার থলিটা খুলছে ; ভিখারিটি তখনও ক্রুশ-চিহ্ন আঁকতে আঁকতে মাথা নুইয়ে গাড়ির চাকার পাশে পাশে ছুটছে ; মনে হল, বুঝিবা চাপাই পড়বে। "খৃস্টের প্রেমের দোহাই!" অবশেষে একটা তামার মুদ্রা ছুঁড়ে দেওয়া হল ; বেচারি একটু থেমে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করল, বৃষ্টি-ভেজা ঢিলে জামাটা শুটকো শরীরের সঙ্গে লেপ্টে গেছে ; তারপরই সে

অদৃশ্য হয় গেল।

প্রচণ্ড বাতাসে তাড়িত হয়ে বৃষ্টির তির্যক ধারাগুলি মুষলধারে নেমে আসছে; ভাসিলির কোট বেয়ে জলের ধারা স্রোতের মত গড়িয়ে পড়ছে। রাস্তার ধুলো প্রথমে ময়দা-মাখা হয়ে এখন তরল কাদায় পরিণত হয়েছে; তার ভিতর দিয়েই সশব্দে চলেছে গাড়ির চাকা; গাড়ির ঝাঁকুনি অনেকটা কমেছে; চাকার দাগের ভিতর দিয়ে জলের স্রোত বইছে। বিদ্যুৎ চমকের তীব্রতা কমেছে; বৃষ্টির ঝম্-ঝম্ শব্দকে ছাপিয়ে বজ্রের গর্জন এখন আর ততটা পিলে-চমকানো মনে হচ্ছে না।

বৃষ্টি কমে এল; বজ্র-মেঘ কেটে যেতে লাগল! যেখানে সূর্য রয়েছে সেখানে কিছুটা আলো দেখা দিল; ধূসর-সাদা মেঘের প্রান্তে একটুকরো পরিষ্কার নীল আকাশ চোখে পড়ল। আরও একমুহূর্ত, তারপরেই এক ঝলক ভীরু রোদ ছড়িয়ে পড়ল রাস্তার ডোবার জলে, রাস্তার পাশের নতুন-ধোয়া ঘাসের বুকে পড়ে চিকচিক করতে লাগল।

আকাশের বিপরীত দিকে তখনও কালো ঝড়ের মেঘের আনাগোনা কম ভীতিপ্রদ নয়, কিন্তু আমার ভয় তখন কেটে গেছে। জীবনের জন্য একটা অনুচ্চারিত আনন্দের অনুভূতি জেগেছে আমার মনে। ভয়ের চাপ গেছে দূরে। প্রকৃতির মতই আমার মনও নতুন করে তাজা হয়ে, জীবন্ত হয়ে হেসে উঠেছে।

ভাসিলি কোটের কলারটা নামিয়ে দিল। টুপিটা খুলে ঝাড়তে লাগল। ভলদিয়া এপ্রনটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। বৃংচ্কা থেকে মুখ বের করে আমি সাগ্রহে তাজা, সুগন্ধ বাতাসে শ্বাস টানলাম। বৃষ্টি-ধোয়া চকচকে পাল্কি-গাড়িটা আমাদের আগে আগে চলেছে; ঘোড়ার পিঠ, লাগাম, গাড়ির চাকা, সব কিছুই বৃষ্টিতে ভিজে চকচক করছে। রাস্তার এক পাশে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত শীত-ফসলের মাঠ, আর অন্য পাশে আস্পেন কুঞ্জ, এবং বাদাম ও বুনো চেরির ঝোঁপ যেন আনন্দে মশগুল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; ঝড়ে-ধোয়া ডালপালা থেকে বৃষ্টির ফোঁটা ঝরে পড়ছে গত বছরের শুকনো পাতার বুকে। ঝুঁটিবাঁধা ভরতপক্ষীর দল আনন্দে গান গেয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। আবার তখনই নেমে আসছে; জলে ভেজা ঝোঁপের ভিতর থেকে ছোট পাখিদের কিচির-মিচির শোনা যাচ্ছে; আর জঙ্গলের মাঝখান থেকে ভেসে আসছে কোকিলের স্পষ্ট ডাক। বসন্তকালের ঝড়ের পরে বনের সুগন্ধ-বার্চ, ভায়োলেট, পচা পাতা, ব্যাঙের ছাতা ও বুনো চেরির গন্ধ—আমার মনকে এমন মাতিয়ে তুলল যে আমি আর বৃংচ্কায় বসে থাকতে পারলাম না। এক লাফে ছুটে গেলাম ঝোঁপ-ঝাড়ের মধ্যে; বৃষ্টির ফোঁটাকে অগ্রাহ্য করে চেরিফুলের ডাল ভেঙে মুখে বুলিয়ে নিলাম। তার আশ্চর্য গন্ধকে আকণ্ঠ পান করলাম।

কাদায় মাখা বুট ও জলে ভেজা মোজার দিকে দৃকপাত না করে কাদার

ভিতর দিয়ে ছুটে গেলাম পাল্কি-গাড়ির জানালায়।

চেরিফুলের কয়েকটা ডাল এগিয়ে দিয়ে বললাম, "লিউবচ্‌কা! কাতেংকা! দেখ, কী সুন্দর ফুল!"

মেয়েরা ভয়ে ঢোক গিলে চেঁচিয়ে উঠল। মিমি চেঁচিয়ে আমাকে সরে যেতে বলল, নইলে আমি হয় তো চাকার নীচে চাপা পড়ে যাব।

"কিন্তু একবার শুঁকেই দেখ। কী মিষ্টি গন্ধ!" আমি চেঁচিয়ে বললাম।

অধ্যায়—৩

নতুন দৃষ্টিকোণ

কাতেংকা বৃৎচ্‌কায় আমার পাশেই বসে ছিল; সুন্দর মাথাটা নুইয়ে চাকার নীচ দিয়ে সরে-যাওয়া ধূলো-ঢাকা রাস্তাটার দিকে চিন্তিত মুখে তাকিয়ে ছিল। আমিও নীরবে তার দিকেই তাকিয়ে ছিলাম: তার গোলাপী মুখের উপর এই প্রথম একটা বিষণ্ন অশিশুসুলভ ভাব দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম, "আমরা শিগ্‌গিরই মস্কো পৌঁছে যাব। তোমার কেমন লাগছে?"

"জানি না," সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিল।

"কিন্তু তুমি কি মনে কর? এটা কি সেরপুকভ থেকে বড়, না ছোট?"

"কি?"

"কিছু না।"

কিন্তু যে সহজাত বুদ্ধিবলে একজন আর একজনের মনের কথা বুঝতে পারে এবং যা আলোচনার সূত্র যোগায়, তারই বলে কাতেংকা বুঝতে পারল যে তার উদাসীনতা আমাকে ব্যথা দিয়েছে; সে মাথা তুলে আমার দিকে তাকাল।

"তোমার বাপি কি বলেছেন যে আমরাও দিদিমার কাছে থাকব?"

"হ্যাঁ; দিদিমার ইচ্ছা আমরা তার কাছেই থাকি।"

"আমরা সকলেই সেখানে থাকব?"

"নিশ্চয়; বাড়ির দোতলার অর্ধেকটায় আমরা থাকব, অপর অর্ধেক অংশে তোমরা থাকবে, আর বাপি থাকবে পাশের অংশে; কিন্তু আমরা সকলেই একতলায় দিদিমার সঙ্গে বসে খাব।"

"মামণি বলত, তোমাদের দিদিমা ভয়ংকর রকমের মর্যাদাশীলা—আর বদমেজাজী।"

"না, না, মোটেই তা নয়! প্রথমে তাই মনে হয় বটে। দিদিমা মর্যাদা-

শীলা, কিন্তু মোটেই বদমেজাজী নয়; বরং খুবই দয়ালু ও হাসিখুশি। তার নামকরণ-দিবসে কী নাচটাই যে হয়েছিল যদি দেখতে!"

"তবু তাকে আমার খুব ভয় করে; তাছাড়া, ঈশ্বর জানেন যদি আমরা—"

কাতেংকা হঠাৎ থেমে গিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

"ব্যাপার কি?"

"কিছু না।"

"নিশ্চয় কিছু; তুমিই বললে, 'ঈশ্বর জানেন—"

"আর তুমি বললে, 'দিদিমার বাড়িতে কী বল-নাচটাই না হয়েছিল!"

"সত্যি, তুমি সেখানে ছিলে না বলে আমার দুঃখ হচ্ছে: কত অতিথি এসেছিল—শয়ে শয়ে। আর গান, আর সেনাপতিরা—আমিও নেচেছিলাম।" হঠাৎ থেমে গিয়ে বললাম: "কাতেংকা, তুমি আমার কথা শুনছ না।"

"হ্যাঁ শুনছি; তুমি বলেছ তুমি নেচেছিলে।"

"তুমি এত মনমরা হয়ে আছ কেন?"

"কেউ তো সব সময় হাসিখুশি থাকতে পারে না।"

"কিন্তু আমার মস্কো থেকে ফিরে আসার পর থেকেই তুমি কত বদলে গেছ। আমাকে সত্যি করে বল, কেন তুমি এরকম অদ্ভুত হয়েছ?"

কাতেংকা সোৎসাহে জবাব দিল, "আমি অদ্ভুত? আমি তা নই। মোটেই না।"

আমি বলতে লাগলাম, "তুমি যা ছিলে সে রকমটা আর নেই। এতদিন স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, সব ব্যাপারেই আমাদের সঙ্গে তুমি একমত ছিলে, আমাদের আত্মীয় বলে মনে করতে, আমরা যেমন তোমাকে ভালবাসি তেমনি তুমিও আমাদের ভালবাসতে; কিন্তু এখন তুমি এত গম্ভীর হয়েছ, এত স্বা—র্থপর—"

"না। আমি তা নই..."

"আমাকে শেষ করতে দাও। তুমি আমাদের কাছ থেকে দূরে-দূরে থাক; মিমি ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বল না; আমাদের উপেক্ষা করতে চাও।"

"দেখ, মানুষ সব সময় একরকম থাকতে পারে না; কখনও না কখনও সে বদলাবেই," কাতেংকা জবাব দিল। কি বলতে হবে বুঝতে না পারলেই সব কিছুরই একটা অনিবার্য ব্যাখ্যা দেওয়া তার স্বভাব।

মনে পড়ে একবার লিউবচকা যখন তাকে বোকা বলেছিল তখন সে জবাব দিয়েছিল, "সব মানুষই বুদ্ধিমান হতে পারে না; কিছু মানুষতো বোকা হবেই।" কিন্তু মানুষকে যে বদলে যেতেই হবে তার এই জবাব আমার মনঃপুত হল না; কাজেই আবার প্রশ্ন করলাম।

"কেন তোমাকে বদলে যেতে হবেই?"

"কেন? আমরা তো চিরদিন এক সঙ্গে থাকবে না," ঈষৎ লাল হয়ে ফিলিপের পিঠের দিকে চোখ রেখে কাতেংকা জবাব দিল। "আমার মামণি

তোমার মামণির কাছে ছিল কারণ তারা দুজন ছিল বন্ধু ; কিন্তু ঈশ্বর জানেন, সে কাউণ্টেসের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে কিনা ; সকলে বলে তিনি খুব বদমেজাজী। তাছাড়া ; একদিন না একদিন তো আমাদের ছাড়াছাড়ি হবেই। তোমরা ধনী, তোমাদের প্রেত্রভ্স্কয়ে আছে ; কিন্তু আমরা গরীব, আমার মামণির কিছুই নেই।"

তোমরা ধনী ; আমরা গরীব। এই কথাগুলি আর তার সঙ্গে যুক্ত ধারণাগুলি আমার কাছ খুব অদ্ভুত মনে হল। সেকালে আমি জানতাম কেবলমাত্র ভিখারি আর মুঝিকরাই গরীব হয় ; দারিদ্র্যের সেই ধারণার সঙ্গে সুন্দরী কাতিয়াকে যুক্ত করার কথা আমি কল্পনাও করতে পারতাম না। আমি ভাবতাম, মিমি ও কাতিয়া যখন আমাদের সঙ্গেই এতকাল বাস করছে, তখন চিরকাল আমাদের সঙ্গেই থাকবে এবং আমাদের সব কিছুরই অংশীদার হবে। তার অন্যথা হতে পারে না। কিন্তু এখন তাদের কেন্দ্র করে হাজারটা নতুন অস্পষ্ট ধারণা আমার মনে দেখা দিতে লাগল ; আমরা ধনী আর তারা গরীব এই চিন্তায় লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে উঠল ; কাতেংকার মুখের দিকে চাইতে পর্যন্ত পারলাম না।

ভাবলাম ; আমরা ধনী আর তারা গরীব ; একথার অর্থ কি ? আবার আমাদের ছাড়াছাড়ি হবেই এ কথাটাই বা এল কেন ? আমাদের যা কিছু আছে সব সমানভাবে ভোগ করতে পারব না কেন ? কিন্তু এটা বুঝলাম যে একথা কাতেংকাকে বলা যাবে না : নিজের সহজ বুদ্ধিতেই বুঝতে পারলাম যে সে *ঠিক* কথাই বলেছে ; আমার নিজের কথা তাকে বলাটাই অবান্তর।

শুধালাম, "এ কথা কি সত্যি যে তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে ? পরস্পরের কাছ থেকে দূরে গিয়ে আমরা বাঁচব কেমন করে ?"

"কিন্তু উপায়ই বা কি ? দুঃখ আমিও পাব ; তবু এ যদি ঘটেই তাহলে আমি কি করব তা আমি জানি।"

সে যে সব সময়ই অভিনেত্রী হবার স্বপ্ন দেখে সেটা জানি বলেই বললাম, "অভিনেত্রী হবে তো ! যত সব বাজে কথা !"

"না ; যখন ছোট ছিলাম তখন সে কথা বলতাম।"

"তাহলে তুমি কি করতে চাও ?"

"আমি সন্ন্যাসিনী হব, মঠে বাস করব ; গাউন আর ভেলভেটের মস্তকাবরণ পরে ঘুরে বেড়াব।"

কাতেংকা কেঁদে উঠল।

পাঠক, আপনার কি এ রকমটা কখনও ঘটেছে যে জীবনের কোন একটা বিশেষ অধ্যায়ে হঠাৎ বুঝতে পারলেন যে সব কিছু সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিকোণটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে ; যেন যে সব জিনিস এতকাল দেখে এসেছেন তাদের অপর দিকটা হঠাৎ আপনার চোখে পড়ে গেছে, অথচ অতদিন সেদিকটার

কথা আপনি কিছুই জানতেন না। সেবারকার পথযাত্রায় আমার মধ্যে প্রথম এই রকম একটা নৈতিক পরিবর্তন দেখা দিল। সেদিন থেকেই হল আমার কৈশোরের শুরু।

সেই প্রথম আমি বুঝতে পারলাম যে শুধু আমরা—আমাদের পরিবারটাই—এ পৃথিবীতে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করি না; আমাদের কেন্দ্র করেই অন্য সব রকম স্বার্থ আবর্তিত হচ্ছে না, আরও একটা জীবন আছে—সেই সব মানুষের জীবন আমাদের সঙ্গে যাদের কোন যোগ নেই, যারা আমাদের নিয়ে মাথা ঘামায় না, এমন কি যারা আমাদের অস্তিত্বের খবরও রাখে না। আগেও এসব আমি যে জানতাম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এখন যে রকম জেনেছি সেরকম তাকে জানতাম না। ঠিক প্রাণ দিয়ে অনুভব করতাম না।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও স্বতন্ত্র কোন পথ ধরেই কোন ধারণা একটি দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হয়। কাতেংকার সঙ্গে এই যে আলোচনা আমাকে প্রবল ভাবে নাড়া দিল, তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাকে অনেক ভাবাল, সেটা আমার কাছে সেই প্রত্যয়ে উপনীত হবার একটা পথ। চলতে চলতে যখন সেই সব দু পাশের গ্রাম ও শহরের দিকে তাকালাম যার প্রতিটি বাড়িতেই আমাদের মত অন্তত একটি পরিবার বাস করে; দেখলাম সেই সব নারী ও শিশু যারা ক্ষণিক কৌতূহলবশে আমাদের গাড়ির দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই চিরতরে আমাদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল; সেই সব দোকানী ও চাষী যারা একবার চোখ তুলেও আমাদের দেখল না—তখনই সর্বপ্রথম আমার মনে এই একটি প্রশ্নই দেখা দিল: আমাদের কথা না ভাবলে তারা কি ভাবনা নিয়ে থাকে? এই প্রশ্ন থেকেই আর একটা প্রশ্ন দেখা দিল! তারা কি নিয়ে কেমন করে বেঁচে থাকে? ছেলেমেয়েদের মানুষ করে? তাদের কি লেখাপড়া শেখায়, না শুধুই খেলা করতে দেয়? কি ভাবে তাদের শাস্তি দেয়? ইত্যাদি।

অধ্যায়—৪

মস্কোতে

মস্কোতে পৌঁছবার পরে পৃথিবী, মানুষ ও তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের ব্যাপারে আমার দৃষ্টিকোণের এই পরিবর্তন আরও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। দিদিমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় তার শীর্ণ, বলীরেখাংকিত মুখ ও অস্পষ্ট চোখের দিকে তাকিয়ে ঘৃণ্য শ্রদ্ধা ও আতংকের পরিবর্তে মনে জাগল তার প্রতি সহানুভূতি। আর যখন লউবচ্‌কার মাথার উপর নিজের মুখটা চেপে ধরে সে এমনভাবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল যেন আদরের মেয়ের মৃতদেহকেই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, তখন আমার সে সহানুভূতি ভালবাসা হয়ে উঠল। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে তার দুঃখ দেখে অস্বস্তি বোধ হল। আমি যেন দেখলাম, তার

চোখে আমরা কিছুই নই ! স্মৃতি হিসাবেই আমরা তার প্রিয়। সে যখন চুমোয় চুমোয় আমার গাল দুটি ভরে দিল তখন মনে হল তার প্রতিটি চুমো যেন বলছে ; "সে চলে গেছে ; সে মরে গেছে ; তাকে আর কোনদিন দেখতে পাব না।"

আমাদের সঙ্গে মস্কো আসার পরে বাপির কিছুই কাজ ছিল না ; তার মুখে সব সময় একটা দুশ্চিন্তা লেগেই আছে ; কালো কোট বা ড্রেস-সুট পরে সে যখন ডিনারে এসে বসে তখন সে যেন আমার চোখে অনেক ছোট হয়ে দেখা দেয় ; তার উঁচু কলার, ড্রেসিং-গাউন, নায়েব, করণিক, তার খামার পরিদর্শন ও শিকার—সে সব কিছুরই ওই এক দশা। কার্ল আই-ভানিচকে দিদিমা "দিয়াদ্‌কা" বলে ডাকে ; ঈশ্বর জানেন কেন হঠাৎ তার মাথায় ঢুকল যে তার অতিপরিচিত, শ্রদ্ধার্হ টাক মাথাটির বদলে তিনি বেছে নিয়েছেন মাথার ঠিক মাঝখান দিয়ে সিঁথি করা একটা লাল পরচুল ; ব্যাপারটা আমার কাছে এতই অদ্ভুত ও হাস্যকর মনে হল যে সেটা এতদিন কেমন করে আমার নজর এড়িয়ে গিয়েছিল তাই ভেবে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

মেয়েদের ও আমাদের মধ্যেও একটা অদৃশ্য প্রাচীর উঠে দাঁড়াল। তাদের গোপন কথা রইল তাদের কাছে, আমাদেরটা আমাদের কাছে। লম্বা ঝুলের পেটিকোট পরে তারা যেন আমাদের সামনে সভ্যভব্য হয়ে উঠল, আর আমরাও পটিবাঁধা ট্রাউজার পরে গর্বিত বোধ করলাম। আর প্রথম রবিবাসরীয় ডিনারে মিমি এমন একটা সুন্দর গাউন পরে, মাথায় এমন ফিতে বেঁধে আমাদের সামনে এসে হাজির হল যে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম আমরা আর গ্রামে নেই, এখানে সব কিছুই হবে আলাদা রকমের।

অধ্যায়—৫
বড় ভাই

আমি ভলদিয়ার চাইতে এক বছর কয়েক মাসের ছোট ; কিন্তু আমরা এক-সঙ্গে বড় হয়েছি, কি পড়াশুনায় কি খেলাধূলায় কখনও আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয় নি। আমাদের মধ্যে কখনও ছোট-বড়র পার্থক্য করা হয় নি। কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি তখনই প্রথম বুঝতে শুরু করলাম কি বয়সে, কি প্রবণতায়, কি যোগ্যতায় কোন দিক থেকেই আমি ভলদিয়ার সমকক্ষ নই। এমন কি কল্পনায় ধরে নিলাম, সে যে বড় এ বিষয়ে ভলদিয়া বেশ সচেতন এবং তা নিয়ে সে গর্ববোধ করে। এ প্রত্যয় হয় তো ভুল, তবু তার ফলে আমার মনে জাগল আত্মপ্রীতি ; তার সঙ্গে প্রতিটি সাক্ষাৎকারেই সে আত্মপ্রীতিতে ঘা লাগতে লাগল। খেলাধূলা, লেখাপড়া। ঝগড়া-বিবাদ, আচরণ সংক্রান্ত জ্ঞান—সব ব্যাপারেই সে আমার চাইতে বড় ! এর ফলে তার

ও আমার মধ্যে একটা বিভেদের সৃষ্টি হয়ে কেন জানি না আমাকে খুব মানসিক কষ্ট দিতে লাগল। প্রথম যেদিন ভলদিয়া একটা চুনট-করা সুতীর শার্ট পরে এল সেদিন যদি আমি খোলাখুলি বলতাম যে ওই রকম একটা শার্ট না পেয়ে আমি দুঃখ পেয়েছি, তাহলে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা আমার পক্ষে অনেকটা সহজ হয়ে যেত, এবং যতবার সে শার্টের কলারটা ঠিক করল ততবারই আমার মনে হত না যে আমাকে আঘাত দেবার জন্যই সে ওরকম করছে।

অনেক সময়ই আমার মনে হত যে ভলদিয়া আমার মনের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু সেটা লুকোতে চেষ্টা করছে; তাতেই আমার কষ্ট হত সব চাইতে বেশী।

ভাই, বন্ধু, স্বামী-স্ত্রী, মনিব ও ভৃত্য—এই ধরনের যে সব মানুষকে এক সঙ্গে বাস করতে হয় তাদের মধ্যে শুধু একটি মাত্র প্রত্যক্ষগোচর হাসি যে কী রহস্যময়, বাক্যাতীত সম্পর্কে প্রকাশ করতে পারে তা কে না জানে! যখন চোখে চোখে ভীরু অথচ সংকল্পে দৃঢ় দৃষ্টি-বিনিময় হয় তখন পারস্পরিক বোঝাপড়ার কত অনুচ্চারিত বাসনা, ভাবনা ও আশংকাই না প্রকাশ পায়!

একসময় ছবি আঁকার নেশা ভলদিয়াকে পেয়ে বসেছিল; নিজের ছবি আঁকত, নিজের সব টাকা তাতে খরচ করত, এবং অংকণ-শিক্ষক, বাপি ও দিদিমার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিত। তারপর নানা জিনিস দিয়ে টেবিল সাজাবার নেশা হল; বাড়ির সব জায়গা থেকে সে সব সংগ্রহ করে আনত। তারপর ধরল উপন্যাসের নেশায়; লুকিয়ে সে সব বই এনে দিন-রাত পড়ত। তার এইসব শখ আমাকেও টানত; কিন্তু তার পদাংক অনুসরণ করতে আমার অহংকারে বাধত, আর অন্য কারও উপর নির্ভর করতেও পারতাম না। কিন্তু আমার সব চাইতে বেশী ঈর্ষা হত যখন দুজনের মধ্যে ঝগড়া হত তখন ভলদিয়ার সুখী, দিলখোলা, মহৎ চরিত্র দেখে। সে যে ঠিক আচরণ করছে সেটা বুঝতাম কিন্তু তাকে অনুসরণ করতে মন চাইত না।

এক সময় যখন তার প্রাচীন বস্তু সংগ্রহের নেশা চরমে উঠেছিল তখন একদিন তার টেবিল থেকে একটা বহুবর্ণের ছোট খালি গন্ধদ্রব্যের বোতল আমি হঠাৎ ভেঙে ফেলেছিলাম।

সেই সময় ঘরে ঢুকে ভলদিয়া বলেছিল, "আমার জিনিসপত্রে হাত দেবার অনুমতি তোমাকে কে দিয়েছে? ছোট আতরের বোতলটাই বা গেল কোথায়? সব সময় তুমি—"

"আমি হঠাৎ ফেলে দিয়ে ভেঙে ফেলেছি। তাতে ক্ষতি কি হয়েছে?"

বোতলের ভাঙা টুকরোগুলি জুড়তে জুড়তে দুঃখিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, "দয়া করে আর কোন দিন আমার জিনিসে হাত দিও না।"

আমিও পাল্টা বলে উঠলাম, "আর তুমিও দয়া করে হুকুম চালিও না। ভেঙে গেছে—গেছে। তা নিয়ে এত হৈ-চৈ করছ কেন?"

হাসবার তিলমাত্র ইচ্ছা আমার ছিল না, তবু হেসে ফেললাম।

"ওঃ, তোমার কাছে এটা তুচ্ছ হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে অনেকখানি," কাঁধ দুটিতে ঝাঁকুনি দিয়ে (এ অভ্যাসটা বাপির কাছ থেকে পাওয়া) ভলদিয়া বলতে লাগল। "তুমি এসে আমার জিনিসও ভাঙবে, আবার হাসবে। বাজে ছোকরা কোথাকার!"

"আমি ছোকরা, কিন্তু তুমি যেমন বড় তেমনি বোকা।"

আমাকে একটু ঠেলে দিয়ে ভলদিয়া বলল, "তোমার সঙ্গে ঝগড়া করার ইচ্ছা আমার নেই! এখান থেকে চলে যাও!"

"আমাকে ধাক্কা দিও না।"

"চলে যাও।"

"আবার বলছি, আমাকে ধাক্কা দিও না!"

ভলদিয়া আমার হাত ধরে টেবিলের কাছ থেকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করল; আমি রাগে জ্বলে উঠলাম। টেবিলের একটা পায়া চেপে ধরতেই টেবিলের সব চীনা মাটির ও কাট-গ্লাসের জিনিস মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেল। "এই নাও!"

কিছু কিছু মূল্যবান জিনিস বাঁচাবার চেষ্টা করে ভলদিয়া গর্জে উঠল, "তবে রে বেহায়া ছোকরা!"

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে ভাবলাম, "আমাদের সব সম্পর্কের এখানেই ইতি। এ ঝগড়া চিরদিনের।"

সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ কারও সঙ্গে কথা বললাম না। বুঝতে পারলাম দোষটা আমার, তার মুখের দিকে তাকাতে ভয় হল, সারা দিন কোন কাজে মন বসাতে পারলাম না। ওদিকে ভলদিয়া কিন্তু ঠিকমত লেখাপড়া করল, ডিনারের পরে যথারীতি মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলল, হাসিঠাট্টা করল।

পড়া শেষ হতেই আমি ঘর থেকে চলে যাই। আমি ভয় পেয়েছি, বিব্রত বোধ করছি, বিবেকের দংশন অনুভব করছি; তাই দাদার সঙ্গে একাকি ঘরে থাকতে পারছি না। সন্ধ্যায় ইতিহাস পড়ার পরে নোট-বই হাতে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালাম। ভলদিয়ার সঙ্গে একটা মিটমাট করে নেবার ইচ্ছা থাকলেও অভিমানভরে আমি খুব রাগ দেখাতে চেষ্টা করলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে ভলদিয়া মাথাটা তুলে প্রায় অদৃশ্য ভালমানুষী হাসি হেসে নির্ভীকভাবে আমার দিকে তাকাল। চোখে চোখে মিলন হল; আমি জানলাম সে আমাকে বুঝতে পেরেছে; তবু আমার নিজের থেকেও শক্তিশালী আবেগের তাড়নায় মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

আবেগহীন সম্পূর্ণ সহজ গলায় সে ডাকল; নিকোলেংকা! অনেকক্ষণ তো রাগ করে আছ। আমি যদি তোমাকে আঘাত দিয়ে থাকি তো আমাকে ক্ষমা কর।"

আমার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে কী একটা যেন আমার বুকের ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে এক সময় আমার কণ্ঠরোধ করে দেবার উপক্রম করল। কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র; তারপরেই চোখ জলে ভরে এল; অনেকটা স্বস্তি পেলাম।

তার হাতটা চেপে ধরে বললাম, "আমি দুঃখিত ভলদিয়া।"

কিন্তু ভলদিয়া এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যেন আমার চোখে কেন জল এসেছে তা সে বুঝতেই পারছে না।

অধ্যায়—৬

মাশা

যাইহোক, আমার দৃষ্টিকোণের যে সব পরিবর্তন দেখা গেল তার মধ্যে সব চাইতে বিস্ময়কর পরিবর্তন সেটাই যার ফলে আমাদের জনৈকা দাসীকে আর শুধুমাত্র দাসী বলে গণ্য না করা এবং তাকে এমন একটি নারীরূপে গণ্য করা যার উপর আমার সুখ ও শান্তি কিছু পরিমাণে নির্ভর করছে।

যত দূর অতীত পর্যন্ত আমার স্মৃতিকে প্রসারিত করতে পারি ততদিন থেকেই মাশাকে আমাদের বাড়িতে দেখে আসছি; যে ঘটনার ফলে তার সম্পর্কে আমার মনোভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল এবং যে ঘটনার কথা আমি বলতে যাচ্ছি তার আগে পর্যন্ত আমার তিলমাত্র মনোযোগ তার দিকে আকৃষ্ট হয় নি। আমার বয়স যখন চোদ্দ, তখন মাশার বয়স ছিল পঁচিশ; সে ছিল খুব সুন্দরী। কিন্তু তার বর্ণনা করতে আমি ভয় পাই, পাছে তার প্রতি আমার ভালবাসার সেই সময়টাতে তার যে রমণীয় ও মিথ্যা ছবি আমার মনে আঁকা পড়েছিল সেটাই কল্পনায় আবার আঁকতে বসি। যাতে কোন রকম ভুল না হয় সেজন্য শুধু এইটুকুই বলব যে তার চামড়া ছিল অস্বাভাবিক রকমের সাদা, তার গড়ন ছিল সতেজ ও ঠাসা, সে ছিল একটি নারী। আর আমার বয়স তখন চোদ্দ।

জীবনে অনেক সময় এমন মুহূর্ত আসে যখন মন কাজ করতে চায় না, কল্পনার জাল বুনতে চায়। তেমনি এক মুহূর্তে স্কুল-ঘর থেকে বেরিয়ে কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম।

কেউ যেন চটি পায়ে সিঁড়ির পায়ের ধাপগুলি বেয়ে উঠছে। লোকটি কে তা জানবার ইচ্ছা অবশ্য আমার হয়েছিল; কিন্তু পায়ের শব্দ হঠাৎ থেমে গেল; মাশার গলা শুনতে পেলাম।

"তোমার সঙ্গে যাব! মারিয়া আইভানভ্না এসে পড়লে কি মনে করবেন?"

ভলদিয়ার গলা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "আঃ, তিনি আসবেন না!"

তারপরই একটা শব্দ কানে এল, যেন ভলদিয়া তাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করছে।

"হেই! হাত সরাও, দুষ্টু কোথাকার!" মাশা ছুটে আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল; তার রুমালটা একদিকে সরানো; তার ফাঁক দিয়ে মাশার ফোলা সাদা গলাটা দেখা যাচ্ছে।

এই আবিষ্কারের ফলে আমি যে কতদূর বিস্মিত হয়েছিলাম তা বলতে পারব না; কিন্তু অচিরেই বিস্ময় কেটে গিয়ে ভলদিয়ার এই খেলার প্রতি আমার মনে সহানুভূতি জাগল। সে যা করেছিল তার জন্য আমি বিস্মিত হই নি; আমার বিস্ময় এই ভেবে যে একাজটা যে খুশির সেটা তার মাথায় এল কেমন করে। আপনা থেকেই তাকে অনুকরণ করার ইচ্ছা জাগল আমার মনে।

কোন কিছু না ভেবেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে থাকি; উপরের এতটুকু চলা ফেরার শব্দ শুনবার জন্য সাগ্রহে কান পেতে রাখি। যদিও ভলদিয়া যা করেছে সেটা করবার ইচ্ছা আমার ষোল আনা, তবু কিছুতেই ভলদিয়াকে অনুকরণ করতে পারছি না। অনেক সময় দরজার পিছনে লুকিয়ে থেকে অপরাধী মন নিয়ে দাসীদের ঘরের হট্টগোল শুনি, আর ভাবি, আমি যদি উপরে উঠে ভলদিয়ার মত মাশাকে চুমো খাই তাহলে আমার অবস্থাটা কি হবে? সে যখন জিজ্ঞাসা করবে আমি কি চাই, আমার চওড়া নাক ও এলোমেলো চুল নিয়ে তখন আমি কি বলব? কখনও শুনি মাশা ভলদিয়াকে বলছে, "কী রোগরে বাবা! কেন আমাকে নিয়ে পড়েছ? চলে যাও, দুষ্টু কোথাকার! নিকলাই পেত্রভিচ তো কখনও এখানে এসে এমন খুনসুটি করে না?" হায়, সে তো জানে না যে এই মুহূর্তে নিকলাই পেত্রভিচ সিঁড়িতে বসে আছে, আর দুষ্টু ভলদিয়ার জায়গাটা পাবার জন্য পৃথিবীর যে কোন জিনিস দিতে সে প্রস্তুত।

আমি স্বভাবতই ভীরু, আমার বিশ্রী চেহারার দরুণ সেই ভীরুতা আরও বেড়েছে। আমার নিশ্চিত ধারণা, একটি জীবনযাত্রার উপরে তার ব্যক্তিগত চেহারার প্রভাবই সব চাইতে বেশী; আর চেহারার চাইতেও তার আকর্ষণীয়ত্ব বা অনাকর্ষণীয়ত্ব সম্পর্কে তার বিশ্বাসের মূল্যটাই বেশী।

আত্ম-গর্বের জন্যই নিজের অবস্থার সঙ্গে আমি খাপ খাওয়াতে পারি নি, আর এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছি যে আঙুর বড় টক; অর্থাৎ আমার বিচারে মনোরম বাহ্যিক চেহারার দৌলতে ভলদিয়া যে সব সুখ ভোগ করতে পারছে সে সব কিছুকেই আমি ঘৃণা করতে চেষ্টা করলাম, এবং গর্বিত একাকিত্বের মধ্যেই কল্পনায় শান্তিলাভের চেষ্টা করতে লাগলাম।

অধ্যায়—৭

বোমা

আতংকে হাঁপাতে হাঁপাতে মিমি চীৎকার করে উঠল, "হায় ঈশ্বর, বারুদ! তোমরা কি করছ? তোমরা কি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে আমাদের সব্বাইকে পুড়িয়ে মারতে চাও?"

অবর্ণনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে মিমি সব্বাইকে সরে যেতে হুকুম দিল, বড় বড় পা ফেলে ছড়ানো বোমার দিকে এগিয়ে গেল এবং হঠাৎ ফেটে গেলে যে বিপদ হতে পারে তাকে উপেক্ষা করে সেটাকে পা দিয়ে সরিয়ে দিতে লাগল। তার মতে যখন বিপদটা কেটে গেল তখন হুকুম দিল, যতদূর সম্ভব দূরে নিয়ে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে; আরও ভাল হয় যদি জলের মধ্যে ফেলা হয়। তারপর টুপিটা ঠিক করে সে বসার ঘরের দিকে পা বাড়াল। বক্‌বক্ করতে লাগল, দেখাশুনা যে খুব হচ্ছে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই।"

বাপি তার ঘর থেকে এলে তার সঙ্গে আমরা দিদিমার ঘরে গেলাম। মিমি ততক্ষণে জানালার কাছে একটা আসনে বসে পড়েছে; মুখের উপর একটা রহস্যময় ভাব এনে সে সভয়ে দরজাটার দিকে তাকিয়ে আছে। তার হাতে কাগজে মোড়া একটা কিছু। বুঝলাম সেই বোমাটা, আর দিদিমা এর মধ্যেই ব্যাপারটা জেনে গেছে।

দিদিমার ঘরে মিমি ছাড়াও রয়েছে দাসী গাশা; তার রক্তিম, ক্রুদ্ধ মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে খুব উত্তেজিত; আর আছে ডাঃ ব্লুমেন্থল; ছোটখাট লোকটির মুখভর্তি ছিটছিট দাগ; চোখ ও মাথা নেড়ে নানা রকম রহস্যময় ইঙ্গিত করে সে গাশাকে শান্ত করতে বৃথাই চেষ্টা করছে।

পেশেন্স খেলার তাস ছড়িয়ে রেখে দিদিমা একটু কাৎ হয়ে বসেছে; এটাই তার অপ্রসন্ন মনের লক্ষণ।

ভক্তিভরে দিদিমার হাতে চুমো খেয়ে বাপি শুধাল, "আজ কেমন আছেন মামন? ভাল ঘুম হয়েছিল তো?"

বাপির প্রশ্নটা যে যতদূর সম্ভব বেঠিক ও অসম্মানকর হয়েছে সেটা বোঝাবার মত স্বরে দিদিমা জবাব দিল, "খুব ভাল আছি বাছা; আশা করি তুমি জান যে আমি সব সময়ই ভাল থাকি।" গাশার দিকে ফিরে বল, "আচ্ছা, আমাকে একটা পরিষ্কার রুমাল এনে দেবে কি?"

চেয়ারের হাতলের উপরে রাখা ক্যাম্ব্রিকের বরফ-সাদা রুমালটা দেখিয়ে গাশা বলল, "এনে দিয়েছি তো।"

"ওই নোংরাটা নিয়ে একটা পরিষ্কার এনে দাও তো বাছা।"

সুসজ্জিত তাকটার কাছে গিয়ে একটা টানা খুলে আবার এমন শব্দ করে গাশা সেটা বন্ধ করল যে ঘরের সবগুলো কাঁচ ঝন্ ঝন্ করে উঠল। দিদিমা

ভীতিপ্রদ চোখে চারদিকে একবার তাকিয়ে দাসীটির দিকে মনোযোগ দিল। দাসী সেই আগেকার রুমালটাই এনে দিলে দিদিমা বলল :

"আমার নস্যিটা কখন গুঁড়ো করবে বাছা ?"

"সময় পেলেই করে দেব।"

"কি বললে ?"

"আজই করে দেব।"

"আমার কাছে চাকরি করার ইচ্ছা যদি না থাকে বাছা, তাহলে ও কথা বলতে পার ; অনেক আগেই তোমাকে ছাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল।"

দাসী নীচু গলায় অস্ফুটে বলল, "ছাড়িয়ে দিলে আমি কাঁদতে বসব না।"

সেই মুহূর্তে ডাক্তার তাকে চোখ টিপল, কিন্তু গাশা এমন ভাবে কড়া চোখে তার দিকে তাকাল যে ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে তার ঘড়ির চাবিতে মন দিল।

গাশা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে দিদিমা বাপিকে বলল, "দেখলে তো বাছা, আমার নিজের বাড়িতেই সকলে কেমন মুখের উপর কথা বলে।"

দাসীর এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে বিব্রত হয়ে বাপি বলল, "যদি অনুমতি করেন মামন, তাহলে আপনার নস্যিটা আমিই গুঁড়ো করে দেব।"

"না, ধন্যবাদ ; আমার পছন্দমাফিক নস্যি গুঁড়ো করতে ও ছাড়া আর কেউ পারে না—এ কথাটা জানে বলেই ওর এই ধৃষ্টতা।" একটু থেমে দিদিমা বলল, "জান বাছা, তোমার ছেলেমেয়েরা আজ বাড়িতে একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে বসেছিল ?"

সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে বাপি দিদিমার দিকে তাকাল।

"হ্যাঁ, ঐ দেখ ওরা কি নিয়ে খেলা করে। দেখাও না," মিমির দিকে ফিরে বলল।

বাপি বোমাটা হাতে নিয়ে না হেসে পারল না।

বলল, "সে কি, এটা তো ছর্‌রা মামন ; এটা মোটেই বিপজ্জনক কিছু নয়।"

"আমায় জ্ঞান দেবার জন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ বাছা ; তবে জ্ঞান লাভ করার বয়স আমার চলে গেছে।"

ডাক্তার ফিস্ ফিস্ করে বলল, "মাথা ঠাণ্ডা রাখুন ! মাথা ঠাণ্ডা রাখুন !"

সঙ্গে সঙ্গে বাপি আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

"এটা কোথায় পেলে তোমরা আর এটা নিয়ে দুষ্টুমি করার সাহসই বা তোমাদের হল কেমন করে ?"

"ওদের জিজ্ঞাসা করার বদলে দিয়াদ্‌কাকে জিজ্ঞাসা কর," দিয়াদ্‌কা কথাটাকে বিশেষ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উচ্চারণ করে দিদিমা বলল, "ছেলেদের সে কি রকম দেখাশুনা করছে।"

মিমি ফোঁড়ন কাটল, "ভলদিমার বলেছে কার্ল আইভানিচ স্বয়ং ঐ বারুদটা দিয়েছে।"

দিদিমা আবার বলল, "দেখ, সে কেমন ভাল লোক। আর সে কোথায়, সেই দিয়াদ্‌কো, কি যেন তার নাম? তাকে এখানে ডেকে পাঠাও।"

বাপি বলল, "একটু বেড়াতে যাবার জন্য আমি তাকে ছুটি দিয়েছি।"

"ওসব মোটেই চলবে না। তাকে সরাক্ষণ এখানেই থাকতে হবে। ছেলেমেয়েরা তোমার, আমার নয়; আর তোমাকে পরামর্শ দেবার অধিকারও আমার নেই, কারণ তুমি আমার চাইতে বিজ্ঞ। আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের জন্য একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করার সময় হয়েছে, একটা খানসামাকে দিয়ে, জার্মান চাষীকে দিয়ে কাজ চলবে না—হ্যাঁ, একটা নির্বোধ চাষী যে তাদের অসদাচারণ ও টাইরলীয় সঙ্গীত ছাড়া আর কিছুই শেখাতে পারে না। তোমাকেই শুধাই, টাইরলীয় গান গাওয়া কি তোমার ছেলেদের পক্ষে একান্তই দরকারী? যাই হোক, এসব নিয়ে এখন আর কেউ ভাবে না; তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার।"

"এখন" কথাটার মানে হল এখন তাদের মা নেই; অনেক দুঃখের স্মৃতি দিদিমার মনে পড়ে গেল। প্রতিকৃতিসহ নস্যির কৌটোটার উপর তার দৃষ্টি আনত হল; সে চিন্তায় ডুবে গেল।

বাপি তাড়াতাড়ি বলল, "আমিও অনেক দিন থেকেই কথাটা ভাবছিলাম, আর আপনার পরামর্শ চাইবার ইচ্ছাও ছিল মামন। সেণ্ট জেরোম তো এখন তাদের দিনের বেলা পড়াচ্ছেন, তাকেই বলব কি?"

এবার দিদিমা খুশি হয়ে বলল, "সেটা খুব ভাল হবে বাপু। ছোট ছেলেদের কি ভাবে চলা উচিত সেটা অন্তত সেণ্ট জেরোম জানে; সে তো এমন একটা বাজে খানসামা নয় যে শুধু ছেলেদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই জানে না।"

"কালই তার সঙ্গে কথা বলব," বাপি বলল।

আর কার্যত এই কথাবার্তার দুদিন পরেই কার্ল আইভানিচ সেই ফরাসী যুবক ফুলবাবুটিকে তার আসনটি ছেড়ে দিলেন।

অধ্যায়—৮

কার্ল আইভানিচের ইতিকথা

যে দিনটিতে কার্ল আইভানিচ চিরদিনের মত আমাদের ছেড়ে যাবেন তার আগের দিন সন্ধ্যার কিছু পরে তার বিচিত্র গাউন ও লাল টুপি পরে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ট্রাংকটার উপর ঝুঁকে তিনি তার জিনিসপত্র সযত্নে গুছিয়ে নিচ্ছিলেন।

ইদানীং আমাদের প্রতি কার্ল আইভানিচের মনোভাব একটু বিশেষ রকমের কঠোর মনে হচ্ছে; আমাদের সঙ্গে মেলামেশা একরকম বন্ধই করে দিয়েছেন। আজও আমি যখন ঘরে ঢুকলাম তখন তিনি বিষণ্ণ চোখে একবার আমার দিকে চেয়েই নিজের কাজে মন দিলেন। তার বিছানায় শুয়ে পড়লাম; আগে আগে এ ব্যাপারে তার কঠোর নিষেধ ছিল, কিন্তু আজ তিনি কিছুই বললেন না। তিনি যে আর কোন দিন আমাদের বকবেন না, কোন কাজে বাধা দেবেন না, আমাদের নিয়ে তার আর কোন কিছু করবার নেই, এই চিন্তাই চকিতে মনে করিয়ে দিল যে তিনি আমাদের ছেড়ে যাবেন। তিনি যে আমাদের আর ভালবাসেন না এতে আমার দুঃখ হল, তাকে কথাটা জানাতেও চাইলাম। তার কাছে গিয়ে বললাম, "কার্ল আইভানিচ, আমি আপনাকে সাহায্য করি।" কার্ল আইভানিচ আমার দিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলেন; কিন্তু তার সেই ক্ষণিকের দৃষ্টিতে আমি দেখতে পেলাম, উদাসীনতার পরিবর্তে সত্যিকারের ঘনীভূত বিষাদ।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "ঈশ্বর সর্বতশ্চক্ষু, তিনি সবই জানেন; সর্ববিষয়ে তাঁর পবিত্র ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। হ্যাঁ নিকোলেংকা, শিশুকাল থেকে কবরে যাবার দিনটি পর্যন্ত দুঃখই আমার নিয়তি। লোকের যত ভাল করেছি তার বিনিময়ে পেয়েছি অন্যায়; আমার পুরস্কার এখানে নয়, ঐ ওখানে," আকাশের দিকে আঙুল তুলে তিনি বললেন। "আমার ইতিহাস, যা কিছু আমি পার হয়ে এসেছি তা যদি তুমি জানতে! আমি মুচির কাজ করেছি, সৈনিক হয়েছি, পলাতক হয়েছি, কারখানার শ্রমিক হয়েছি, শিক্ষক হয়েছি, আর আজ আমি কিছুই নই; আর ঈশ্বর-পুত্রের মত আমারও মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই।" কথা শেষ করে একটা চেয়ারে বসে তিনি চোখ বুজলেন।

আমি বুঝতে পারলাম, স্পর্শকাতর মনের অতলে পৌছে আত্মসন্তুষ্টির জন্যই কার্ল আইভানিচ তার অতি প্রিয় কথাগুলি বলছেন; শ্রোতা এখানে অবান্তর। নিঃশব্দে তার বিছানায় বসে রইলাম; তার সদয় মুখখানির উপর থেকে চোখ ফেরালাম না।

"তুমি আর শিশু নও, সব বুঝতে পার। আমার কাহিনী, এ জীবনে যা কিছু সহ্য করেছি, সব তোমাকে বলব। যে বুড়ো বন্ধুটি তোমাদের বড় বেশী ভালবাসত, একদিন তার কথা তোমাদের মনে পড়বে।"

পাশের টেবিলটার উপর কনুই রেখে একটিপ নস্যি নিলেন; আকাশের দিকে চোখ ঘুরিয়ে সেই সহজ সমতালের স্বরে তার কাহিনী বলতে লাগলেন ঠিক যে ভাবে আমাদের শ্রুতিলিপি লেখাতেন।

গভীর আবেগে বললেন, "এমন কি জন্মের আগে থেকেই আমি দুঃখী। **Das Ungluck verfolgte mich schon im Schosse meiner Mutter!"**

কার্ল আইভানিচ ঠিক একই ভাষায় একাধিকবার তার ইতিহাস আমাকে শুনিয়েছেন ঠিক একই উচ্চারণে ; কাজেই প্রায় আক্ষরিক যথার্থতার সঙ্গেই তার পুনরুক্তি করতে পারব বলে আশা করি ; অবশ্য তার রুশ ভাষার ভুলগুলি বাদ দিয়ে। এ কাহিনী তার সত্যিকারের ইতিহাস, না কি আমাদের বাড়িতে নির্জন বাসের সময় তার কল্পনার সৃষ্টি, অথবা তার জীবনের প্রকৃত ঘটনাগুলিকে তিনি অদ্ভুত সব ঘটনার রং লাগিয়ে অতিরঞ্জিত করেছেন, তা আমি আজও পর্যন্ত বুঝতে পারি নি। একদিকে, তার কাহিনীকে এমন প্রাণের আবেগ মিশিয়ে সঠিক পারম্পর্য রক্ষা করে তিনি বলেছেন যে তার সত্যতায় সন্দেহ করবার কোন অবকাশই নেই ; আবার অন্যদিকে তার ইতিহাসের মধ্যে কাব্যময় বিবরণের প্রাচুর্যই সন্দেহের অবকাশ ঘটিয়ে দেয়।

"আমার শিরায় শিরায় বয়ে চলেছে সোমারব্লাট-এর কাউণ্টের মহান রক্তধারা! বিয়ের ছ'মাস পরেই আমার জন্ম হয়েছিল। আমার মায়ের স্বামী (তাকে আমি ড্যাডি বলতাম) ছিল কাউণ্ট সোমারব্লাট-এর অধীনে একজন জোতদার। মায়ের লজ্জার কথা কোনদিন ভুলতে পারে নি; আমাকে সে কোনদিন ভালবাসে নি। আমার একটি ছোট ভাই ছিল, তার নাম যোহান ; আর ছিল দুটি বোন ; কিন্তু পরিবারের মধ্যে থেকেও আমি ছিলাম অপরিচিত। যোহান কোন বোকামি করলে ড্যাডি বলত, "এই কার্ল ছেলেটার জন্য আমার মনে মুহূর্তের জন্যও শান্তি নেই!" অমনি ড্যাডি আমাকে বকত আর শাস্তি দিত। বোনরা নিজেদের মধ্যে রাগারাগি করলে ড্যাডি বলত, "কার্ল কোন দিন বাধ্য ছেলে হবে না!" আবার বকুনি ও শাস্তি।

"শুধু মামণি আমাকে ভালবাসত আর আদর করত। প্রায়ই বলত, 'কার্ল, তুমি আমার ঘরে চল, তারপর লুকিয়ে আমাকে চুমো খেত। বলত, 'বেচারি, বেচারি কার্ল! কেউ তোমাকে ভালবাসে না, কিন্তু তোমার বিনিময়ে আমি কাউকে চাই না। শুধু তোমার মামণির একটা মিনতি তুমি রেখো: ভাল করে লেখাপড়া করো, একজন সম্মানিত মানুষ হয়ো, তাহলে ঈশ্বর তোমাকে ত্যাগ করবেন না!' সেই চেষ্টাই আমি করেছি। যখন চোদ্দ বছর বয়স হল, খৃস্টের শেষ ভোজন-অনুষ্ঠানে যেতে শিখলাম, তখন মামণি ড্যাডিকে বলল, 'কার্ল এখন বড় হয়েছে গুস্তাভ, ওকে নিয়ে কি করা যায় বল তো?' ড্যাডি বলল, 'আমি জানি না।' তখন মামণি বলল, 'ওকে শহরে হের শুল্জ-এর কাছে পাঠানো যাক, তাহলে ও একজন মুচি হতে পারবে।' ড্যাডি বলল, 'খুব ভাল। ছ'বছর সাত মাস বড় মুচির সঙ্গে শহরে কাটালাম ; বড় মুচি আমাকে ভালবেসে ফেলল। বলল, 'কার্ল ভাল কাজ করে, শীঘ্রই সে আমার Geselle (ঠিকে শ্রমিক) হবে।' কিন্তু মানুষ গড়ে আর ঈশ্বর ভাঙেন। ১৭৯৬-তে বাধ্যতামূলক সৈনিকদলভূক্তির হুকুম জারি হল ; আঠারো থেকে একুশ বছরের প্রতিটি সক্ষম মানুষকে শহরে যেতে হবে।

"বাপি ও যোহান ভাই শহরে এল; আমরা এক সঙ্গে Loos (ভাগ্য) পরীক্ষা করতে গেলাম; দেখা যাক কে সৈনিক হবে। আর কে সৈনিক হবে না। যোহান একটা খারাপ সংখ্যা টানল; তাকে সৈনিক হতেই হবে। আমি একটা ভাল সংখ্যা টানলাম; সৈনিক হওয়া আমার পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। আর ড্যাডি বলল, 'আমার একটিই ছেলে। তাকেও ছাড়তে হবে!'

"তার হাতটা ধরে আমি বললাম, 'ও কথা বললে কেন ড্যাডি? আমার সঙ্গে এস, তোমাকে কিছু বলতে চাই।' ড্যাডি এল। একটা সরাইখানায় গিয়ে একটা ছোট টেবিলে আমরা বসলাম। 'দুটো Bier Krug (বীয়ারের ভাঁড়) দাও,' আমি বললাম; তারাও এনে দিল। দুজনে খেলাম। ভাই যোহানও খেল।

"আমি বললাম, 'ড্যাডি, তুমি বলো না যে তোমার একটিই ছেলে। সে কথা শুনলে আমার হৃৎপিণ্ডটা একলাফে বেরিয়ে যেতে চায়। ভাই যোহান সেনাদলে যাবে না; সৈনিক হব আমি। এখানে কেউ কার্লকে চায় না, তাই কার্ল সৈনিক হবে।'

"তুমি বড় সৎ লোক কার্ল," বলে ড্যাডি আমাকে চুমো খেল।

"আর আমি সৈনিক হলাম।"

অধ্যায়—৯

পূর্বানুস্মৃতি

কার্ল আইভানিচ বলতে লাগলেন, "সে কি ভয়ংকর দিন ছিল নিকো-লেংকা। নেপোলিয়ন তখন জীবিত। সে চাইল জার্মেনীকে জয় করতে, আর আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দেশকে রক্ষা করলাম। উল্‌ম্‌-এ ছিলাম, অস্তারলিজে ছিলাম, ওয়াগ্রামে ছিলাম।"

অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে শুধালাম, "আপনি যুদ্ধ করেছেন? মানুষও মেরেছেন?"

কার্ল আইভানিচ সঙ্গে সঙ্গে আমার সে আশংকা দূর করলেন।

"একবার এক ফরাসী গোলন্দাজ কমরেডদের থেকে অনেক পিছনে রাস্তার উপর পড়ে ছিল। আমি বন্দুক নিয়ে ছুটে গেলাম, তাকে মারতে উদ্যত হলাম, কিন্তু ফরাসী লোকটি হাতের বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চীৎকার করে বলল, 'দয়া কর!' আর আমিও তাকে ছেড়ে দিলাম।

"ওয়াগ্রামে নেপোলিয়ন দ্বীপ পর্যন্ত আমাদের তাড়া করে নিয়ে গেল, এমন ভাবে ঘিরে ফেলল যে পালাবার কোন পথ রইল না। তিন দিন আমাদের কোন রসদ ছিল না; হাঁটু পর্যন্ত জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দিন কাটিয়েছি।

"শয়তান আমাদের না বন্দী করল, না পালাতে দিল।

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, চতুর্থ দিনে আমাদের বন্দী করে একটা দুর্গে নিয়ে যাওয়া হল। আমার পরনে নীল ট্রাউজার, ভাল কাপড়ের ইউনিফর্ম, সঙ্গে নগদ পনেরো থেলার, আর একটা ঘড়ি—বাবার দেওয়া উপহার। একটা ফরাসী সৈনিক সব কেড়ে নিল। সৌভাগ্যক্রমে তখনও আমার কাছে তিন দুকাত্ ছিল ; মামণি সেটা আমার অন্তর্বাসের মধ্যে সেলাই করে দিয়েছিল ; কেউ দেখতে পায় নি।

"দুর্গের মধ্যে বেশীদিন থাকতে ইচ্ছা করল না ; স্থির করলাম পালাব। একটা বড় উৎসবের দিন যে সার্জেণ্টটি আমাদের দেখাশুনা করত তাকে বললাম, 'হের সার্জেণ্ট, এটা তো খুব বড় উৎসব, আমি ভাল করে পালন করতে চাই। দয়া করে দুই বোতল মদিরা নিয়ে এস, দুজন একসঙ্গে খাই।' সার্জেণ্ট বলল, 'খুব ভাল কথা।' সার্জেণ্ট মদিরা নিয়ে এল, দুজনে একগ্লাস করে খেলাম ; তারপর তার হাতটা ধরে বললাম, 'হের সার্জেণ্ট, তোমার বাবা-মা আছেন কি ?' সে বলল, 'আছেন হের ময়ের।' আমি বললাম, 'আট বছর আমার বাবা ও মা আমাকে দেখেন নি, আমি বেঁচে আছি না আমার হাড়গুলো মাটির নীচে শুয়ে আছে তাও তারা জানেন না। ও: হের সার্জেণ্ট, আমার কাছে দুই দুকাত আছে ; আমার অন্তর্বাসের মধ্যে লুকনো ছিল ; সেগুলো নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও। আমার এই উপরকারটুকু কর ; আমার মামণি জীবনভোর তোমার জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবেন।'

"সার্জেণ্ট আর এক গ্লাস মদিরা খেয়ে বলল, 'হের ময়ের, আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার জন্য আমার খুব করুণা হয় ; কিন্তু তুমি বন্দী, আর আমি একজন সৈনিক।' তার হাতটা চেপে ধরে বললাম, 'হের সার্জেণ্ট।'

"আর সার্জেণ্ট বলল, 'তুমি গরীব মানুষ, তোমার টাকা আমি নেব না, কিন্তু তোমাকে সাহায্য করব। আমি শুতে গেলে এক ঝুড়ি ব্রাণ্ডি কিনে সৈন্যদের দিও ; তাহলেই তারা ঘুমিয়ে পড়বে। আমি তোমাকে পাহারা দেব না।'

"লোকটি ভাল ছিল। এক ঝুড়ি ব্রাণ্ডি কিনলাম ; সৈন্যরা তা খেয়ে মাতাল হয়ে পড়লে আমি বুট ও পুরনো গ্রেটকোটটা পরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। টপ্‌কে পার হবার উদ্দেশ্যে দেয়ালের ধারে গেলাম ; কিন্তু সেখানে জল ছিল, আর আমার শেষ পোশাকটাও নষ্ট করার ইচ্ছা আমার ছিল না। ফটকের দিকে এগিয়ে গেলাম।

"শান্ত্রী বন্দুক নিয়ে auf and ab (একবার এদিকে, একবার ওদিকে) পায়চারি করছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'qui vive ? (কে যায় ?)' আমি জবাব দিলাম না ; সে দ্বিতীয়বার বলল, 'qui vive ?' কোন

জবাব দিলাম না ; 'que vive ?' সে তৃতীয়বার বলল, আর আমিও দৌড় দিলাম। জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে দেয়াল টপকে ওপারে পৌঁছে দিলাম ছুট।

"সারা রাত রাস্তা ধরে ছুটলাম ; ভোর হয়ে এলে ভয় হল। তারা যদি চিনতে পারে ; তাই উঁচু যবের ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম। তারপর দুই হাত এক করে নতজানু হয়ে আমাকে রক্ষা করার জন্য স্বর্গীয় পরম পিতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে শান্ত মনে ঘুমিয়ে পড়লাম।

"সন্ধ্যায় ঘুম ভাঙলে আবার চলতে লাগলাম। হঠাৎ দুটো কালো ঘোড়ায় টানা মস্ত বড় একটা জার্মান মালগাড়ি আমাকে ধরে ফেলল। একটি সুসজ্জিত লোক গাড়িতে বসে পাইপ টানতে টানতে আমাকে দেখতে লাগল। আমি জোরে হাঁটতে শুরু করলাম, আর গাড়িটাও গতি বাড়িয়ে দিল ; লোকটিও সারাক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি পথের পাশে বসে পড়লাম, লোকটিও ঘোড়া থামিয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'যুবক, এত রাতে তুমি কোথায় যাচ্ছ ?' আমি বললাম, 'ফ্রাংকফোর্টে যাচ্ছি।' 'গাড়িতে উঠে বস ; এখানে জায়গা আছে ; আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব। তোমার সঙ্গে মালপত্র কিছুই নেই কেন ? দাড়ি কামাও নি কেন ? তোমার জামায়ই বা কাদা লেগেছে কেন ?' তার পাশে বসলে সে আমাকে প্রশ্নগুলি করল। আমি বললাম, 'আমি গরীব মানুষ, কোথাও মজুর হিসাবে ভাড়া খাটতে চাই ; আর রাস্তায় পড়ে গিয়ে পোশাকে কাদা লেগেছে।' সে বলল, 'তুমি মিথ্যা কথা বলছ যুবক, রাস্তা তো এখন শুকনো।'

"চুপ করে রইলাম।

"ভাল মানুষটি বলল, 'আমাকে সব সত্য কথা বল। তুমি কে, কোথা থেকে এসেছ ? তোমার চাউনি আমার ভাল লেগেছে ; তুমি যদি সৎ লোক হও আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

"সব কথাই তাকে বললাম। সে বলল, 'ঠিক আছে যুবক, তুমি আমার দড়ির কারখানায় চল, আমি তোমাকে কাজ দেব, টাকা দেব ; তুমি আমার সঙ্গেই থাকবে।'

"আর আমি বললাম, 'খুব ভাল কথা।'

"আমরা দড়ির কারখানায় গেলাম ; ভাল মানুষটি তার স্ত্রীকে বলল, 'এই যুবকটি তার দেশের জন্য লড়াই করেছে এবং বন্দীদশা থেকে পালিয়ে এসেছে ; তার বাড়ি নেই, পোশাক নেই, রুটি নেই। সে আমার সঙ্গে থাকবে। তাকে কিছু পরিষ্কার কাপড় দাও। আর খাবার দাও।'

"দেড় বছর সেই দড়ির কারখানায় কাটালাম ; মনিব আমাকে এত ভালবাসত যে কিছুতেই চলে আসতে দেবে না। তখন আমি একজন সুদর্শন পুরুষ ; যুবক, লম্বা, নীল চোখ ও রোমক নাক। মনিবের স্ত্রী মাদাম এল, (তার নাম করব না) ছিল যুবতী ও সুন্দরী ; সে আমার প্রেমে পড়ে গেল।

আমাকে দেখেই সে বলল, 'হের ময়ের, তোমার মামণি তোমাকে কি বলে ডাকে?' আমি বললাম, 'কার্লচেন।'

"আর সে বলল, 'কার্লচেন, এখানে আমার পাশে বস।'

"আমি তার পাশে বসলাম, আর সে বলল, 'কার্লচেন। আমাকে চুমো খাও।'

"আমি তাকে চুমো খেলাম, আর সে বলল, 'কার্লচেন, আমি তোমাকে এত ভালবাসি যে আমি আর সইতে পারছি না।' তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল।"

এইখানে কার্ল আইভানিচ অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন; মধুর স্মৃতি মনে জাগলে মানুষ যে রকম করে সেইভাবে তিনিও সুন্দর নীল চোখ দুটি উপরে তুলে মাথাটা নাড়তে নাড়তে হাসতে লাগলেন।

হাতল-চেয়ারে ভাল করে বসে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, "হ্যাঁ, জীবনে ভাল-মন্দ অনেক কিছুই দেখেছি; কিন্তু"—বিছানার উপরে ঝোলানো ক্যানভাসের উপর সেলাই করে আঁকা ত্রাণকর্তা প্রভুর মূর্তিটি দেখিয়ে বললেন, "কিন্তু উনি আমার সাক্ষী, একথা কেউ বলতে পারবেন না যে কার্ল আইভানিচ কখনও অসাধু ছিল! জঘন্য অকৃতজ্ঞতা দিয়ে হের এল.-এর দয়ার প্রতিদান দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না; স্থির করলাম, তার কাছ থেকেও পালাব। সন্ধ্যায় সকলে শুতে গেলে মনিবকে একটা চিঠি লিখলাম, আমার ঘরে টেবিলের উপর সেটা রাখলাম, তারপর আমার পোশাক ও তিন থেলার সঙ্গে নিয়ে নিঃশব্দে পথে নেমে এলাম। কেউ দেখতে পেল না; পথ ধরে চলতে লাগলাম।

অধ্যায়—১০

তারপর

"ন' বছর মামণিকে দেখি নি; সে বেঁচে আছে, না কি তার হাড়গুলো ঠাণ্ডা মাটির তলায় শুয়ে আছে তাও জানি না। পিতৃভূমিতে ফিরে গেলাম। শহরে পৌঁছে খোঁজ করলাম, কাউণ্ট সোমারব্লাত-এর জোতদার গুস্তাভ ময়ের কোথায় থাকে। তারা বলল, 'কাউণ্ট সোমারব্লাত মারা গেছে, আর গুস্তাভ ময়ের বড় রাস্তায়ই থাকে, তার একটা মদের দোকান আছে। নতুন কোর্তা ও ভাল কোটটা (কারখানা-মালিকের উপহার) পরলাম। ভাল করে চুল আঁচড়ালাম, তারপর ড্যাডের মদের দোকানের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। আমার বোন মারিয়েচেন দোকানেই বসেছিল; সে জানতে চাইল, আমি কি চাই। বললাম, 'এক গ্লাস মদ পেতে পারি কি?' বোন বলল, 'ভাতের (বাপ), একটি যুবক এক গ্লাস মদ চাইছে।' ড্যাড বলল, 'দিয়ে দাও।' টেবিলে বসে এক গ্লাস খেলাম, পাইপ টানলাম। আর ড্যাড, মারিয়েচেন ও যোহানকে দেখতে লাগলাম। কথাপ্রসঙ্গে ড্যাড আমাকে বলল, 'আচ্ছা যুবক, তুমি

হয় তো জান আমাদের সেনাবাহিনী এখন কোথায় আছে ?' আমি বললাম, 'আমি তো সেনাবাহিনী থেকেই আসছি ; বাহিনী আছে ভিয়েনার কাছে।' ড্যাড বলল, 'আমাদের ছেলেটি সৈনিক ; ন' বছর আগে তার চিঠি পেয়েছিলাম ; এখনও সে বেঁচে আছে কি না তাও জানি না। আমার স্ত্রী তারজন্য সব সময় কাঁদে।' পাইপ টানা শেষ করে বললাম, 'তোমার ছেলের নাম কি, কোথায় চাকরি করে ? আমি হয় তো তাকে চিনি।' বাপি বলল, 'তার নাম কার্ল ময়ের, অস্ট্রীয় "জার্গেস"-এ কাজ করত।' বোন বলল, 'দেখতে সুন্দর, লম্বা, তোমার মত।'

"বললাম, 'তোমাদের কার্লকে আমি চিনি।' 'আমালিয়া !' আমার ভাতের হঠাৎ বলে উঠল, 'এখানে এস ; একটি যুবক এসেছে, সে আমাদের কার্লকে চেনে।' পিছনের দরজা দিয়ে আমার আদরের মামণি ঘরে ঢুকল। দেখেই তাকে চিনতে পারলাম। 'তুমি আমার কার্লকে চেন ;' বলে সে আমার দিকে তাকাল, কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেল, তারপরই কাঁপতে লাগল। 'হ্যাঁ, আমি তাকে দেখেছি' আমি বললাম, কিন্তু চোখ তুলে তার দিকে তাকাবার সাহস হল না ; আমার অন্তর তখন লাফিয়ে উঠতে চাইছে। মামণি বলল, 'আমার কার্ল বেঁচে আছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ! কোথায় আছে আমার কার্ল সোনা ? আর একটি বার যদি তাকে দেখতে পেতাম তো শান্তিতে মরতে পারতাম ; কিন্তু ঈশ্বরের তা ইচ্ছা নয়' ; সে কাঁদতে লাগল। আমি আর সইতে পারলাম না। বললাম 'মামণি, আমিই তোমার কার্ল।' সে আমার দুই হাতের মধ্যে পড়ে গেল।"

কার্ল আইভানিচ চোখ বুজল ; তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। দুই গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। তারপর কিছুটা আত্মস্থ হয়ে চোখের জল মুছে ফেলল।

"কিন্তু আমার জীবনটা দেশের মাটিতেই শেষ হোক এটা বোধ হয় ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল না। দুঃখ যে আমার নিয়তি। **Das ungluck ver volgte mich uberall** ' (দুর্ভাগ্য আমাকে সর্বত্র তাড়া করে ফিরেছে !) মাত্র তিন মাস স্বদেশে ছিলাম ; এক রবিবারে এক জগ বীয়ার কিনতে একটা কফি-হাউসে গিয়েছিলাম, সেখানে বসে পাইপ টানতে টানতে বন্ধুদের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে, সম্রাট ফ্রাঞ্জ, নেপোলিয়ন ও যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করছিলাম ; সকলেই যার যার মতামত প্রকাশ করছিল। আমাদের পাশেই একটি অপরিচিত লোক বসেছিল ; কফি খেতে খেতে পাইপ টানছিল, কিন্তু একটা কথাও বলছিল না। রাতের পাহারাদার যখন হাঁক দিয়ে জানাল রাত দশটা বেজে গেছে, তখন টুপিটা হাতে নিয়ে, দামটা মিটিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেলাম। মাঝ রাতে কে যেন দরজায় ধাক্কা দিল। জেগে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে ওখানে ?' '**Macht auf** ! (দরজা খোল !)' বললাম, 'আগে বল তুমি কে, তবে দরজা খুলব।' 'আইনের দোহাই দিয়ে বলছি, দরজা

খোল।' খুললাম। দুটি বন্দুকধারী সৈনিক দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, আর যে অপরিচিত লোকটি কফি-হাউসে আমাদের পাশে বসেছিল সে ঘরে ঢুকল। লোকটা গুপ্তচর। সে বলল, 'আমার সঙ্গে চল।' আমি বললাম, 'বেশ তো।' বুট পরলাম, ট্রাউজার পরলাম, ব্রেস্ গায়ে চড়ালাম, তারপর ঘরের মধ্যে ঘুরতে লাগলাম। রাগে ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে। মনে মনে বললাম, 'লোকটা শয়তান।' দেয়ালে আমার তলোয়ারটা ঝোলানো ছিল। হঠাৎ সেটা হাতে নিয়ে বললাম, 'তুমি একটা গুপ্তচর: আত্মরক্ষা কর!' তার ডান দিকে আঘাত করলাম, বাঁ দিকে আঘাত করলাম, তারপর মারলাম মাথায়। গুপ্তচরটা পড়ে গেল। আমার ম্যাণ্টলস্যাক (স্যুটকেস) ও বিউতেল (টাকার থলি) হাতে নিয়ে জানালা দিয়ে লাফ দিলাম। চলে গেলাম এম্‌স্-এ। সেখানে জেনারেল সাজিন-এর সঙ্গে পরিচয় হল। আমাকে তার ভাল লাগল, রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে পাসপোর্ট যোগাড় হল, আমাকে সঙ্গে করে তিনি রাশিয়ায় নিয়ে এলেন তার ছেলেদের পড়াবার জন্য। জেনারেল সাজিন মারা গেলে তোমার মামণি আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'কার্ল আইভানিচ, আমার ছেলেদের আপনার হাতে ছেড়ে দিলাম; ওদের ভালবাসবেন; আমি কোন দিন আপনাকে বরখাস্ত করব না; শেষ জীবনে যাতে আরামে থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করব।' তিনি মারা গেলেন, আর সকলে সব কথাই ভুলে গেলেন। বিশ বছর চাকরির পরে এখন আমাকে একটুকরো রুটির জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হবে। ঈশ্বর সবই দেখেন, সবই জানেন, তাঁর পবিত্র ইচ্ছাই পূর্ণ হোক; শুধু তোমাদের জন্যই আমার দুঃখ হয় ছেলেরা।" কার্ল আইভানিচ তার কথা শেষ করলেন; হাত বাড়িয়ে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে আমার মাথায় চুমো খেলেন।

অধ্যায়—১১

খারাপ নম্বর

শোক-বর্ষ শেষ হল; দিদিমা তার দুঃখ কিছুটা কাটিয়ে উঠল; মাসে মাসে অতিথিরাও আসতে লাগল; বিশেষ করে আমাদের বয়সের ছেলেমেয়েরা।

১৩ই ডিসেম্বর লিউবচ্‌কার জন্মদিনে প্রিন্সেস কর্নাকভা ও তার মেয়েরা, ভালাখিনা ও সোনেচ্‌কা, ইলেংকা গ্রাপ ও ছোট আইভিন ভ্রাতৃদ্বয় ডিনারের আগেই এসে হাজির হল।

নীচে বসার ঘরে তাদের কথা, হাসি ও দৌড়ঝাঁপের শব্দ শুনতে পেলেও সকালবেলাকার পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারলাম না। স্কুল-ঘরে সময়-সরণিতে লেখা আছে: "সোমবার ২ থেকে ৩, ইতিহাস ও ভূগোলের শিক্ষক। সেই ইতিহাসের শিক্ষকের জন্যই

আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হল। ছুটো বেজে বিশ মিনিট হয়ে গেল; কিন্তু এখনও তার দেখা নেই।”

ভলদিয়া স্মারাগ্‌দভ-এর বই থেকে পড়া মুখস্ত করছিল; মুহূর্তের জন্য মুখ তুলে বলল, “লেবেদেভ আজ আসবেন বলে মনে হচ্ছে না।”

“ঈশ্বরের কাছে কামনা করছি তিনি যেন না আসেন, কারণ আমি কিছুই জানি না। কিন্তু ঐ তো তিনি,” হতাশ সুরে আমি বলে উঠলাম।

ভলদিয়া উঠে দরজার কাছে গেল।

বলল, “না, তিনি নন; অন্য কোন ভদ্রলোক। আড়াইটে পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক; তখনও যদি না আসেন তো সেণ্ট জেরোমকে বলব আমাদের নোট-বইগুলো তুলে রাখতে।”

কাইদানভ-এর বইটা ছুই হাতে মাথার উপর তুলে নাড়তে নাড়তে আমি বললাম, “তিনি যে কেনই আসেন।”

কোন কাজ না থাকায় পড়ার জায়গাটা খুলে আবার পড়তে শুরু করলাম পড়াটা যেমন বড়, তেমনি শক্ত। আমি কিছুই জানি না; বেশ বুঝতে পারছি একটা পংক্তিও মুখস্ত করতে পারব না, কারণ এ রকম স্নায়বিক চঞ্চলতার মধ্যে কোন কিছুতেই মন দেওয়া যায় না।

গত ইতিহাস-পরীক্ষার পরে লেবেদেভ সেণ্ট জেরোমের কাছে নালিশ করেছেন এবং প্রতিবেদনে আমাকে দিয়েছেন মাত্র ছু'নম্বর; সেটা খুবই খারাপ। সেণ্ট জেরোম বলেছেন, পরের পরীক্ষায় যদি তিনের কম পাই তাহলে আমাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। এবার তো পরবর্তী পাঠ এগিয়ে আসছে; তাই আমার খুব ভয় করছে।

পড়া নিয়ে আমি এতই মেতে ছিলাম যে বাইরের ঘরে রবারের বড় জুতো খোলার শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। চোখ ফেরাবার আগেই ছিট্‌ছিট্‌ দাগে ভর্তি সেই বিরক্তিকর মুখ ও পণ্ডিতি বোতাম-আঁটা নীল রঙের কোট-পরা সেই অতি পরিচিত মূর্তিটি দরজায় দেখা দিল।

ধীরে ধীরে জানালার উপর টুপিটা রেখে, টেবিলের উপর নোট-বইগুলো রেখে, কোটের লেজটাকে এক পাশে সরিয়ে, আসনে একটা ফুঁ দিয়ে তবে তিনি বসলেন।

ঘামে-ভেজা একটা হাত দিয়ে অন্য হাতটা ঘসতে ঘসতে বললেন, “মশাইরা প্রথমে আগের পাঠটার পর্যালোচনা শেষ করে তারপরে আমরা মধ্যযুগের ঘটনাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে চেষ্টা করব।”

তার অর্থ: তোমাদের পড়া আগে বল।

ভলদিয়া যখন বেশ সহজে ও নিশ্চয়তার সঙ্গে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগল সেই ফাঁকে আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে সিঁড়ির কাছে চলে গেলাম। যেহেতু আমাদের নীচে নামবার হুকুম নেই, তাই স্বভাবতই আমি সিঁড়ির

চাতালে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়বার আগেই আমার সকল দুর্ভাগ্যের উৎসরূপা মিমির সঙ্গে আমার ধাক্কা লাগল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে, একবার দাদীদের ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে মিমি বলে উঠল, "তুমি এখানে?"

সব দোষ আমার; একে তো আমি স্কুল-ঘর থেকে চলে এসেছি, তার উপর আবার এমন জায়গায় এসেছি যেখানে আমার কোন কাজই থাকতে পারে না। কাজেই মূর্তিমান অনুতাপ হয়ে মাথাটা ঝুলিয়ে চুপ করে রইলাম। মিমি বলল, "এটা খুব খারাপ! এখানে তুমি কি করছ?" আমি নিশ্চুপ। "না। এখানেই শেষ হবে না; সব কথা আমি কাউণ্টেসকে বলে দেব।"

যখন স্কুল-ঘরে ফিরে গেলাম তখন তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। আমার কথা একেবারেই ভুলে গিয়ে মাস্টারমশাই ভলদিয়াকে পরের পাঠটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সে কাজ শেষ করে তিনি নিজের নোট-বইগুলো গুছিয়ে নিতে লাগলেন; ভলদিয়া পাশের ঘরে গেল পাঠ-টিকিটটা আনতে; আমার ভাবতে ভাল লাগল যে পড়াশুনার পাট চুকে গেছে আর সকলে আমার কথা ভুলেই গেছে।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ শিক্ষকমশাই আমার দিকে ঘুরে বিদ্রূপের কাষ্ঠহাসি হাসলেন। হাত ঘস্‌তে ঘস্‌তে বললেন, "আশা করি আপনার পড়াটা শেখা হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ স্যার," আমি জবাব দিলাম।

চেয়ারের উপর ভর রেখে চিন্তিত মুখে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'সেণ্ট লুইয়ের ধর্মযুদ্ধ সম্পর্কে কিছু বলবে কি? প্রথমে বল কি কি কারণে ফরাসী-রাজ ক্রুশ কাঁধে নিয়েছিলেন। তারপর আমাকে বুঝিয়ে বল সেই অভিযানের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি। আর সকলের শেষে বল ইওরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের উপর এবং বিশেষভাবে ফরাসী রাজ্যের উপর এই ধর্মযুদ্ধের প্রভাবের কথা।"

আমি বার কয়েক ঢোক গিললাম, কাশলাম, এক পাশে মাথাটা নোয়ালাম, তারপর চুপ করে রইলাম। তারপর টেবিলের উপর থেকে পাখের কলমটা তুলে নিয়ে নীরবে সেটার পালকগুলোকে ছিঁড়তে লাগলাম।

হাত বাড়িয়ে মাস্টারমশাই বললেন, "দয়া করে পাখের কলমটা আমার হাতে দাও; এটা কাজের জিনিস। এবার বলতো স্যার?"

"লুই—অ্যাঁ—রাজা—সেণ্ট লুই—ছিলেন—ছিলেন—অ্যাঁ—একজন সৎ ও বিজ্ঞ জার।"

"কি বললেন স্যার?"

"জার। তিনি জেরুজালেমে যাওয়া স্থির করলেন এবং রাজ্যের শাসন-ভার তুলে দিলেন তার মার হাতে।"

"তার নাম কি ছিল ?"

"ব-ব-লাংকা ।"

"কি বললে ? বুলাংকা (একটা মাখন-রং ঘোড়ার নাম) ?"

আমার মুখে বিকৃত হাসি দেখা দিল ।

"হুম । আর কিছু জানা আছে ?" তিনি শুধালেন ।

এখন আর আমার হারাবার কিছু নেই, কাজেই আমি কাশলাম, যা মাথায় এল তাই বলতে লাগলাম। মাস্টারমশাই আমার কানের পাশ দিয়ে সোজা পিছন দিকে তাকিয়ে বারবার বলতে লাগলেন, "ভাল, খুব ভাল স্যার।" আমি তো জানি যে আমি কিছুই জানি না, আমি যা বলে যাচ্ছি তা বলা উচিত নয়; অথচ তিনি আমাকে থামিয়েও দিচ্ছেন না বা আমার ভুলও শুধরে দিচ্ছেন না দেখে ভয় পেয়ে গেলাম।

আমার কথার পুনরাবৃত্তি করেই তিনি বললেন, "তিনি জেরুজালেম যাওয়া স্থির করেছিলেন কেন ?"

"কারণ-যেহেতু—উদ্দেশ্য ছিল—কারণ—" আমি এমন থতমত খেয়ে গেলাম যে আর একটা কথাও বলতে পারলাম না মাস্টারমশাইকে। তিন মিনিট একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন ; তারপর তার মুখে গভীর দুঃখের ছায়া নেমে এল। ঠিক সেই সময় ভলদিয়া ঘরে ঢুকলে তিনি তাকে বললেন :

"দয়া করে রেকর্ড-খাতাটা এনে দাও তো।"

ভলদিয়া খাতাটা এনে দিল ; টিকিটটাও সযত্নে তার পাশে রেখে দিল।

মাস্টারমশাই খাতাটা খুললেন, সাবধানে কলমটা ডুবিয়ে আবৃত্তি ও আচরণের খাতে ভলদিয়ার নামের পাশে সুন্দর হস্তাক্ষরে পাঁচ লিখলেন। তারপর আমার নম্বরগুলির উপর কলমটা ধরে রেখে আমার দিকে তাকালেন, কলমের কালি ঝারলেন, এবং চিন্তায় ডুবে গেলেন।

হঠাৎ তার হাতটা যেন অজান্তেই চলতে লাগল, আর একটা সুদৃশ্য এক ও একটা পূর্ণচ্ছেদ দেখা দিল ; হাতটা আবার চলল, এবং আচরণের খাতে আর একটা এক ও পূর্ণচ্ছেদ দেখা দিল।

সযত্নে রেকর্ড-খাতাটা বন্ধ করে তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন ; আমার চোখে যে তখন হতাশা, মিনতি ও তিরস্কার ফুটে উঠেছে সেদিকে ফিরেও তাকালেন না।

"মিখাইল ইলারিওনভিচ," আমি বললাম।

আমি কি বলতে চাই সেটা বুঝতে পেরে তিনি বললেন, "না ; এভাবে লেখাপড়া হয় না। বিনা কাজে আমি মাইনে নিতে পারি না।"

মাস্টারমশাই রবারের বড় জুতোজোড়া ও লোমের জোব্বাটা পরলেন। সযত্নে স্কার্ফটা বাঁধলেন। যেন আমার কপালে যা ঘটে গেছে তারপর যার যা খুশি তাই করতে পারে ! তার তো কলমের একটা আঁচড়, কিন্তু আমার

যে চরম দুর্ভাগ্য!

ঘরে ঢুকে সেন্ট জেরোম শুধালেন, "পড়া শেষ হয়েছে ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার মাস্টারমশাই সন্তুষ্ট হয়েছেন ?"

"হ্যাঁ," ভলদিয়া জবাব দিল।

"কত নম্বর পেয়েছ ?"

"পাঁচ।"

"আর নিকলাস ?"

আমি কথা বললাম না।

"মনে হয় চার," ভলদিয়া বলল।

সে জানত, অন্তত সেদিনটার জন্য আমাকে বাঁচাতেই হবে। আমাকে যদি শাস্তি পেতেই হয়, সেটা যেন আজ না হয়; আজ যে বাড়িতে অনেক অতিথি এসেছে।

অধ্যায়—১২

ছোট চাবিটা

আমরা নীচে নেমে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে না জানাতেই জানানো হল, ডিনার প্রস্তুত। বাপির মেজাজ খুব ভাল ছিল ঠিক (সেই সময়ে তার তাসের ভাগ্যটা ভালই চলছিল; লিউবচকাকে বাপি সুন্দর একটা উপহার দিল, আর ডিনারের পরে তার মনে পড়ে গেল যে লিউবচকার জন্য সে আগেই একটা বনবনের বাক্স এনে রেখেছিল।

আমাকে বলল, "আবার একটা চাকর কেন পাঠাব? ফোকো, তুমি যদি যাও তো ভাল হয়। বড় ডেস্কের উপরে একটা খোলার মধ্যে চাবি থাকে তুমি তো জান। চাবিগুলো নিয়ে সবচাইতে বড় চাবিটা দিয়ে ডান দিকের দু'নম্বর টানাটা খুলবে। সেখানেই একটা বাক্স ও কাগজে জড়ানো কিছু মিষ্টি দেখতে পাবে; সে সব এখানে নিয়ে এস।" ডিনারের পরে বাপি সব সময়ই চুরুট এনে দিতে বলে; সে কথা জানি বলেই আমি শুধালাম, "আর তোমার চুরুটও আনব কি ?'

"তা এনো, কিন্তু আর কিছুতে হাত দিও না," পিছন থেকে বাপি বলে দিল।

চাবিগুলো যথাস্থানেই পেলাম; টানাটা খুলতে যাচ্ছি এমন সময় সেই একই গোছার একেবারে ছোট্ট চাবিটা কিসের সেকথা জানবার কৌতূহল হওয়ায় থেমে গেলাম। ডেস্কের উপর অন্য অনেক জিনিসপত্রের মধ্যে কুলুপ-আঁটা একটা কাজ-করা পোর্টফোলিও ছিল; আমার মনে হল একবার

দেখি ছোট চাবিটা সেই কুলুপে লাগে কিনা। আমার চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হল : পোর্টফোলিওটা খুলে গেল, আর তার মধ্যে দেখতে পেলাম একগাদা কাগজপত্র। কাগজগুলো কিসের সেটা জানবার কৌতূহল এত বেশী হয়ে দেখা দিল যে বিবেকের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, আমি ফোর্টফোলিওটা ঘাঁটতে শুরু করে দিলাম।

বড়দের প্রতি—বিশেষত বাপির প্রতি, আমার শিশুসুলভ অবিসংবাদী ভক্তি এতই বেশী ছিল যে সেখানে যা কিছু দেখতে পেলাম তা থেকে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে আমার মন রাজী হল না। মন বলল, তার নিজস্ব, সুন্দর, অনধিগম্য ও দুর্বোধ্য জগতেই বাপি চিরদিন বাস করবে, তার জীবনের গোপনীয়তাকে উদ্ঘাটনের যে কোন চেষ্টাই হবে আমার পক্ষে পাপের কাজ।

সুতরাং বাপির পোর্টফোলিওতে যা কিছু দেখতে পেলাম তাতে আমার মনে কোন স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠল না ; শুধু এইটুকু বুঝলাম যে আমার কাজটা অন্যায় হয়েছে। আমি লজ্জা ও অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম।

এই অনুভূতির ফলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পোর্টফোলিওটা বন্ধ করবার ইচ্ছাই জাগল আমার মনে, কিন্তু সেই স্মরণীয় দিনটিতে সব রকম দুর্ভাগ্য সহ্য করাটাই বুঝি ছিল আমার নিয়তি। কুলুপের ছিদ্রের ভিতর চাবিটা ঢুকিয়ে উল্টো দিকে মোচড় দিলাম ; তালাটা বন্ধ হয়েছে মনে করে চাবিটা টান দিতেই—কী সর্বনাশ! চাবির মাথাটা আমার হাতে উঠে এল। কুলুপের ভিতরকার বাকি অংশটার সঙ্গে হাতের অংশটাকে মিলিয়ে যাদুবিদ্যার মত সেটাকেও বের করে আনবার বৃথা চেষ্টায় অনেক সময় কেটে গেল। মনে আরও ভয় হল, আমি একটা নতুন অপরাধ করে বসেছি, আর বাপি পড়ার ঘরে এলেই আজই সেটা ধরা পড়ে যাবে।

মিমির নালিশ, খারাপ নম্বর। আর তার উপর এই ছোট চাবি! এর চাইতে খারাপ আর কি ঘটতে পারে! দিদিমা মিমির নালিশ নিয়ে ; সেণ্ট জেরোম খারাপ নম্বর নিয়ে, বাপি চাবিটা নিয়ে—সকলেই আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, আর সেটা ঘটবে আজ সন্ধ্যার মধ্যেই।

"আমার কি হবে? আঃ, আমি কি করেছি? নরম কার্পেটের উপর হাঁটতে হাঁটতে আমি গলা খুলেই বলে উঠলাম। তারপর মিষ্টি ও চুরুট নিয়ে নিজের মনেই বললাম, "যা হবে তাতো হবেই।" বাড়ির ভিতরে ছুটে চলে গেলাম।

ছেলেবেলায় নিকলাইয়ের মুখে এই নিয়তিবাদী কথাটা অনেকবার শুনেছি। জীবনের অনেক সংকট-মুহূর্তে এই কথাটা আমাকে সাময়িক সান্ত্বনা জুগিয়েছে। যখন হল-ঘরে ফিরে গেলাম তখন কিছুটা উত্তেজনা ও অস্বাভাবিকতা বোধ করলেও আমার মন তখন খুশিতে ভরপুর।

অধ্যায়—১৩

বিশ্বাসঘাতিনী

ডিনারের পরে শুরু হল খেলাধুলা। আমিও তাতে যোগ দিলাম। "চোর চোর" খেলতে গিয়ে আমাদের সঙ্গে ক্রীড়ারত কর্ণাকভদের গভর্নেসের সঙ্গে আমার ধাক্কা লাগল, আর হঠাৎই তার পোশাকের উপর আমার পা পড়ে খানিকটা ছিঁড়ে গেল। পোশাকটা সেলাই করে নেবার জন্য গভর্নেস মুখ কালো করে দাসীদের ঘরে ঢুকল। তার এই অবস্থা দেখে মেয়েদের বিশেষ করে সোনেচ্‌কার খুব মজা লাগল দেখে আমি স্থির করলাম, ঐ রকম মজা আরও একবার তাদের উপহার দেব। ফলে গভর্নেস ঘরে ফিরে আসামাত্রই সেই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি তার চার পাশে লাফাতে শুরু করে দিলাম এবং সুযোগ বুঝে পুনরায় তার ঘাঘরায় গোড়ালি ঢুকিয়ে সেটা ছিঁড়ে দিলাম। সোনেচ্‌কা ও প্রিন্সেস হো-হো করে হেসে উঠল; তাতে আমার অহংকারে সুড়সুড়ি লাগল; কিন্তু সেণ্ট জেরোম নিশ্চয় এতক্ষণ আমার কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করছিলেন; এগিয়ে এসে ভ্রূকুটি করে আমাকে বললেন যে আমার এই ফুর্তি অনেক দুঃখ ডেকে আনবে; আমি যদি নিজেকে শুধ্‌রে না নেই তাহলে আজ উৎসবের দিন হলেও আমাকে অনুতাপ করতে হবে।

কিন্তু আমার মনে তখন সেই মানুষের উত্তেজনা যে সাধ্যের অতিরিক্ত টাকা বাজি ধরে জুয়া খেলেছে। যে হিসাব মেলাতে ভয় পাচ্ছে এবং বাস্তব অবস্থা থেকে মনটাকে সরিয়ে রাখবার জন্য উদ্ধারের কোন আশা নেই জেনেও বেপরোয়াভাবে বাজী ধরে চলেছে। উদ্ধত হাসি হেসে আমি তার কাছ থেকে সরে গেলাম।

"চোর-চোর" খেলার পরে একজন কেউ এমন একটা খেলা শুরু করল যাকে আমরা বলি **Large Nose** (লম্বা নাক)। দুই সারি চেয়ার মুখোমুখি সাজানো হয়; ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে বসে পর পর যার যার জুটি বেছে নেয়।

ছোট প্রিন্সেস প্রতিবারই আইভিনদের ছোট ভাইকে বেছে নিল; কাতেংকা পছন্দ করল হয় ভলদিয়াকে, নয়তো ইলেংকাকে; সোনেচ্‌কা প্রতিবারই বেছে নিল সেরিওঝাকে। একবারও কেউ আমাকে বেছে নিল না; এতে আমার অহংকারে ঘা লাগল; আমি তাহলে বাড়তি, বাতিল হয়ে গেছি; প্রতিবারই তারা বলে: "আর কে বাকি আছে? হ্যাঁ, নিকোলেংকা; বেশ তো, ওকে নাও।"

কাজেই আমার পালা যখন এল তখন আমি সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গেলাম হয় আমার বোনের দিকে, আর নয় তো কুশ্রী প্রিন্সেসদের একজনের দিকে।

সোনেচ্‌কা সেরিওঝাকে নিয়ে এতই জমে গেল যে আমার অস্তিত্বটাই ভুলে গেল। কি কারণে যে মনে মনে তাকে "বিশ্বাসঘাতিনী" বলেছিলাম তা জানি না, কারণ সে তো কখনও বলে নি যে সেরিওঝার বদলে আমাকে বেছে নেবে; কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা হল যে অত্যন্ত আপত্তিকর ব্যবহার সে করেছে।

খেলার পরে দেখলাম সেই "বিশ্বাসঘাতিনী"—তাকে ঘৃণা করলেও তার উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারি নি—সেরিওঝা ও কাতেংকাকে নিয়ে এক কোণে সরে গিয়ে কী এক রহস্যময় আলোচনায় মেতে উঠেছে। তাদের গোপন ব্যাপারটা আবিষ্কার করার জন্য আমি পিয়ানোটার আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম আর সেখান থেকে দেখলাম: একখানা ক্যাম্ব্রিকের রুমালের দুই কোণ ধরে কাতেংকা সোনেচ্‌কার মাথা ও সেরিওঝার মাথার মাঝখানে একটা পর্দা সৃষ্টি করেছে। সেরিওঝা বলল, "না, তুমি হেরে গেছ; তোমাকে জরিমানা দিতেই হবে!" সোনেচ্‌কা অপরাধীর মত দুই হাত ঝুলিয়ে লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল, "না, আমি হারি নি; হেরেছি কি মাদ্‌ময়জেল ক্যাথারিন?" কাতেংকা জবাব দিল, "আমি ন্যায় বিচারই করব; সত্যি তুমি হেরে গেছ।"

কাতেংকা কথাটা বলতে না বলতেই সোনেচ্‌কার উপর ঝুঁকে পড়ে সেরিওঝা তাকে চুমো খেল। চুমো খেল তার গোলাপী ঠোঁট জুড়ে। যেন কিছুই হয় নি, অথবা ব্যাপারটা খুব মজার, এমনিভাবে সোনেচ্‌কা হেসে উঠল। কী ভীষণ! হায় শঠ বিশ্বাসঘাতিনী!

অধ্যায়—১৪

গ্রহণ

হঠাৎ নারী জাতির প্রতি, বিশেষ করে সোনেচ্‌কার প্রতি আমার মনে ঘৃণা জাগল; নিজেকে বোঝালাম যে এ সব খেলায় কোন আমোদ নেই, এগুলো আসলে মেয়েদের খেলা; আমার ইচ্ছা হল এমন একটা সোরগোল তুলি, এমন দুঃসাহসিক কিছু করি যা সব্বাইকে চমকে দেবে। সুযোগ পেতেও দেরী হল না।

মিমির সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলে সেণ্ট জেরোম ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন; তার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম প্রথমে সিঁড়িতে, তারপর আমাদের মাথার উপরে স্কুল-ঘরের দিকে। ভাবলাম, পড়ার সময় মিমি আমাকে কোথায় দেখেছিল সে কথা তাকে বলে দিয়েছে, আর তিনিও রেজিস্ট্রি-খাতাটা দেখতে গেছেন। আমাকে শাস্তি দেবার বাসনা ছাড়া তখন সেণ্ট জেরোমের জীবনে আর কোন উদ্দেশ্য যে থাকতে পারে সেটা আমার মনেই হয় নি। কোথায়

যেন পড়েছি, বারো থেকে চোদ্দ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা, অর্থাৎ যারা কৈশোরের সন্ধিস্থলে উপনীত হয়েছে তারাই বিশেষ করে অগ্নিকাণ্ড ও হত্যাকাণ্ডের দিকে ঝুঁকে থাকে। যখনই কৈশোরের কথা মনে করি, বিশেষ করে সেই দুর্ভাগা দিনটিতে আমার মনের অবস্থা স্মরণ করি, তখনই সেই ভয়াবহ অপরাধের সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে যায়; কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বা কারও ক্ষতি করবার জন্য নয়, কৌতূহলবশতঃ, একটা কিছু করার সহজাত তাগিদ থেকেই সে সম্ভাবনা আমার মনে সেদিন জেগেছিল। সেই সব মুহূর্তে চিন্তা যখন আগে থেকে বাসনার সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন করতে পাবে না, দৈহিক প্রবৃত্তিসমূহই জীবনের একমাত্র নিয়ামক হয়ে দেখা দেয়, তখনই একটি শিশু তার অনভিজ্ঞতার দরুণ ঐ রকম একটা মানসিকতার শিকার হয়ে পড়ে। তখন সে কৌতুকের হাসি হেসে তিলমাত্র ভয় বা দ্বিধা না করে সেই ঘরেই আগুন দিতে পারে যেখানে ঘুমিয়ে আছে তার প্রিয়জনরা, তার ভাই, তার বাবা, তার মা। সেই একই বিবেচনার সাময়িক অনুপস্থিতিতে—তখন হয় তো মনটাই অনুপস্থিত থাকে—সতেরো বছরের একটা চাষীছেলে যে বেঞ্চিটার উপর তার বুড়ো বাবা উপুড় হয়ে ঘুমিয়ে আছে তার পাশেই রাখা সদ্য শান-দেওয়া কুড়ুলটার দিকে তাকিয়ে থাকে, হঠাৎ কুড়ুলটা চালিয়ে দেয়, আর ঘুমন্ত মানুষটার গলা থেকে যে রক্তের ধারা ফিনকি দিয়ে ছোটে নির্বোধ কৌতূহলের সঙ্গে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে; সেই একই বিবেচনার অভাব ও সহজাত কৌতূহল বশেই একটা মানুষ পাহাড়ের একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এই ভেবে এক ধরনের আনন্দ পায়: "এখান থেকে লাফিয়ে পড়লে কেমন হয়?" অথবা একটা গুলি-ভরা পিস্তল কপালে ঠেকিয়ে ভাবে; "এখন ঘোড়াটা টিপলে কেমন হয়?" অথবা সমাজে সর্বজনশ্রদ্ধেয় একটি লোকের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ভাবে; "যদি তার কাছে গিয়ে নাকটা চেপে ধরে বলি, 'এবার তাহলে যাওয়া যাক মশাই', তো কেমন হয়।"

আমার মনে যখন এই রকম উত্তেজনা এবং বিবেচনার অভাব দেখা দিয়েছে, তখন সেণ্ট জেরোম নীচে নেমে এসে আমাকে বললেন যে আমার সেখানে যাবার কোন অধিকারই ছিল না, আমার আচরণ ও লেখাপড়া খুবই খারাপ, এবং আমাকে তক্ষুনি দোতলায় যেতে হবে; আমিও তার দিকে জিভ্‌টা বের করে বলে দিলাম, যেখানে আছি সেখান থেকে নড়ব না।

বিস্ময়ে ও ক্রোধে মুহূর্তকাল সেণ্ট জেরোমের মুখে একটা কথাও যোগাল না।

আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন "**C'est bien**, ইতিমধ্যেই অনেকবার তোমাকে শাস্তি দেবার কথা ভেবেছি, তোমার দিদিমার ইচ্ছা তোমাকে বাঁচিয়েছে; কিন্তু এখন দেখছি বার্চের লাঠি ছাড়া তোমার কর্তব্যজ্ঞান হবে না, আর সেটাই তোমার প্রাপ্য।"

তিনি এত জোরে কথা বললেন যে সকলেই শুনতে পেল। অস্বাভাবিক

হিংস্রতায় সমস্ত রক্ত আমার হৃৎপিণ্ডে ছুটে এল, বুকের ভিতরটা দপ্ দপ্ করতে লাগল, মুখ থেকে সব রক্ত মুছে গেল। ঠোঁট দুটো থর্থর্ করে কাঁপতে লাগল। সেই মুহূর্তে আমাকে নিশ্চয়ই ভয়ংকর দেখাচ্ছিল, কারণ আমার দৃষ্টিকে এড়িয়ে সেণ্ট জেরোম দ্রুত পায়ে আমার কাছে এগিয়ে এসে হাতটা চেপে ধরলেন; কিন্তু তার হাতের ছোঁয়া লাগতেই রাগে আত্মহারা হয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম এবং শরীরের সব শক্তি দিয়ে তাকে আঘাত করলাম।

আমার কাণ্ড দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে ছুটে এসে ভলদিয়া বলল, "তোমাকে আজ কিসে পেয়েছে?"

চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমি চেঁচিয়ে বললাম, "আমার কথা ছেড়ে দাও! তোমরা কেউ আমাকে ভালবাস না, আমি যে কত দুঃখী তা বুঝতেও চাও না। তোমরা সব্বাই দুষ্ট বিরক্তিকর," রাগে কাঁপতে কাঁপতে সকলের দিকে তাকিয়ে বললাম।

কিন্তু ইতিমধ্যেই বিবর্ণ কঠিন মুখে সেণ্ট জেরোম আমার কাছে এগিয়ে এলেন এবং আমি সুবিধামত জায়গা নেবার আগেই দুই হাতে সাঁড়াশির মত আমাকে চেপে ধরে টেনে নিয়ে চললেন। রাগে আমার মাথাটা ঘুরতে লাগল। শুধু এইটুকু মনে আছে যে যতক্ষণ শক্তি ছিল আমি মাথা ও হাঁটু দিয়ে বেপরোয়াভাবে লড়াই চালিয়েছিলাম। মনে পড়ে, আমার নাকটা অনেকবার কার যেন উরুতে ঘস্টে গেল, কারও কোট ঢুকে গেল আমার মুখে, কার পা যেন আমার সারা দেহকে ছুঁয়ে গেল, আর ধুলোর গন্ধ এবং সেণ্ট জেরোমের ভায়োলেট আতরের গন্ধও টের পেলাম।

পাঁচ মিনিট পরে আমাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে চিলে-কোঠার দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

বিজয় গর্বে তিনি হাঁক দিলেন, "ভাসিলি, বার্চের ডালটা নিয়ে এস।"…

অধ্যায়—১৫

দিবাস্বপ্ন

সেদিন কি আমি কল্পনাও করতে পেরেছিলাম যে একদিন এই সব কাটিয়ে উঠতে পারব এবং এমন দিন কখনও আসবে যখন শান্তভাবে তাকে স্মরণ করতে পারব?

আমি যা করেছি তা চিন্তা করে আমি কল্পনাও করতে পারি নি আমার কপালে কি আছে; তবে অস্পষ্টভাবে এটুকু বুঝেছি যে আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

প্রথমে নীচে সব কিছু চুপচাপ। ধীরে ধীরে নানারকমের শব্দ আমার

কাছে বোধগম্য হয়ে উঠল। ভাসিলি এসে জানালার গোবরাটে শুয়ে পড়ে হাই তুলল। নীচে সেণ্ট জেরোমের চড়া গলা শোনা গেল, তারপর ছোটদের গলা, হাসি, দৌড়ঝাঁপ; কয়েক মিনিট পরে সব কিছুই স্বাভাবিক হয়ে গেল; আমি যে অন্ধকার চিলে-কোঠায় বসে আছি সে কথা কেউ জানলও না, ভাবলও না।

আমি মোটেই কাঁদি নি; কিন্তু পাথরের মত কি একটা যেন আমার বুকের উপর চেপে রইল। উত্তপ্ত কল্পনায় নানা চিন্তা ও দৃশ্য মনের সামনে ভাসতে লাগল।

একসময় মনে হল; সকলেই যে আমাকে অপছন্দ করে, এমন কি ঘৃণা করে, নিশ্চয়ই তার কোন কারণ আছে। (সে সময় আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে দিদিমা থেকে আরম্ভ করে কোচয়ান ফিলিপ পর্যন্ত সকলেই আমাকে ঘৃণা করে, আমার দুঃখে মজা পায়।) মনে হত, হয়তো আমি আমার বাবা-মার সন্তান নই, ভলদিয়ার ভাই নই, আমি কোন দুঃখী অনাথ। কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেকে এরা দয়া করে মানুষ করেছে; এই অবাস্তব ধারণা আমাকে যে কিছুটা বিষণ্ন সান্ত্বনা এনে দিত তাই নয়, এটাকেই সম্ভবপর বলে মনে হত। এই ভেবে আমি খুশি হতাম যে আমার দুঃখের জন্য আমি নিজে দায়ী নই, জন্ম থেকে এটাই আমার নিয়তি, আমার কপালও ভাগ্যহীন কার্ল আইভানিচেরই মত।

নিজের মনে বললাম, "এখন তো আমি সবই জেনেছি, তাহলে আর এই গোপন কথাটি লুকিয়ে রাখা হচ্ছে কেন? কালই বাপির কাছে গিয়ে বলব 'বাপি, আমার জন্মের গোপন কথাটা বৃথাই তোমরা আমার কাছে গোপন করেছ; আমি সেটা জেনেছি।' সে বলবে, 'দেখ—যখন জেনেছ—আজ হোক কাল হোক একদিন তো জানতেই। তুমি আমার ছেলে নও; কিন্তু আমি তোমাকে ছেলে হিসেবে গ্রহণ করেছি। আর নিজেকে যদি আমার উপযুক্ত করে তুলতে পার তাহলে আমি তোমাকে কোনদিন ত্যাগ করব না।' আর আমি তাকে বলব, 'বাপি, যদিও তোমাকে এ নামে ডাকার কোন অধিকার আমার নেই, এবং এই শেষ বারের মতই ডাকছি,—আমি তোমাকে এতদিন ভালবেসেছি, চিরদিন ভালবাসব, আর তুমি যে আমার আশ্রয়দাতা সে কথা কোনদিন ভুলব না; কিন্তু তোমার বাড়িতে আমি আর থাকব না। এখানে কেউ আমাকে ভালবাসে না, আর সেণ্ট জেরোম তো আমাকে ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞাই করেছে। হয় তাকে না হয় আমাকে—একজনকে এ বাড়ি ছাড়তেই হবে। সে লোকটিকে আমি এতদূর ঘৃণা করি যে যা কিছু করতে আমি প্রস্তুত। আমি তাকে খুন করব—সেই কথাই বলব—'বাপি, আমি তাকে খুন করব।' বাপি আমাকে অনুনয়-বিনয় করবে, কিন্তু আমি তাকে সরিয়ে দিয়ে বলব, 'তুমি আমার বন্ধু, আমার আশ্রয়দাতা, কিন্তু আমরা দুজন একত্রে

থাকতে পারব না; আমাকে চলে যেতে দাও।' তারপর তাকে আলিঙ্গন করে ফরাসীতে বলব, 'হে আমার পিতা! হে আমার আশ্রয়দাতা! শেষ বারের মত তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর। ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' অন্ধকার ভাঁড়ার-ঘরে একটা সিন্দুকের উপর বসে আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। তার পরমুহূর্তেই মনে পড়ে গেল আসন্ন শাস্তির কথা! বাস্তব আমার সামনে মূর্ত হয়ে উঠল সত্যরূপে, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন পালিয়ে গেল দূরে।

তারপর আবার কল্পনা করলাম, মুক্তি পেয়ে বাড়ি থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। হুজারদের দলে ভিড়ে চলে গেলাম যুদ্ধে। শত্রুরা চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে ধরল; তলোয়ার উঁচিয়ে প্রথমে একজনকে মেরে ফেললাম, তারপর আর একজনকে, আরও একজনকে। শেষ পর্যন্ত আঘাতে জর্জরিত হয়ে ক্লান্তিতে মাটিতে পড়ে গেলাম; চীৎকার করে বললাম, "বিজয়!" সেনাপতি এসে শুধাল, "কোথায় আমাদের রক্ষাকর্তা?" সকলে আমাকে দেখিয়ে দিল; সেনাপতি আমার পাশে বসে আনন্দে চোখের জল ফেলে চেঁচিয়ে উঠল, "বিজয়!" ভাল হয়ে উঠলাম; কালো পট্টিতে হাত ঝুলিয়ে ত্ভিারস্কয় বুলভার্দে হেঁটে বেড়াই। সেনাপতি হলাম। সম্রাটের সঙ্গে দেখা হলে তিনি শুধালেন, 'তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তুমি যা চাইবে আমি তাই করব।' সসম্মানে অভিবাদন করে তলোয়ারের উপর ভর দিয়ে বললাম, "মহান সম্রাট, আমার পিতৃভূমির জন্যে নিজের রক্তপাত করতে পেরেছি বলে আমি আনন্দিত; প্রয়োজন হলে পিতৃভূমির জন্য সানন্দে মরব: তবু আপনি সদয় হয়েছেন বলেই একটি জিনিস চাইছি—আমার শত্রু, বিদেশী সেণ্ট জেরোমকে নিশ্চিহ্ন করবার অনুমতি আমাকে দিন।" ভয়ংকর মূর্তি ধরে সেণ্ট জেরোমের সামনে উপস্থিত হয়ে বললাম, "তুমি আমার দুর্ভাগ্য ঘটিয়েছ। নতজানু হও।" কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল, আসল সেণ্ট জেরোম যে কোন মুহূর্তে বার্চের ডাল নিয়ে হাজির হতে পারে; আবার দেখতে পেলাম, দেশের মুক্তিদাতা সেনাপতির বদলে আমি একটি করুণ, ক্রন্দনরত জীবে পরিণত হয়েছি।

ঈশ্বরের চিন্তা মাথায় এল; উদ্ধতভাবে তাঁকে শুধালাম, কেন তিনি আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন। সকাল-সন্ধ্যা কখনও তো প্রার্থনা করতে ভুলে যাই নি; তাহলে আমার এত কষ্ট কেন? আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, কিশোর বয়সে যে ধর্মীয় সন্দেহ আমার মনকে বিভ্রান্ত করেছিল এই সময়কার ঈশ্বরের অন্যায় বিচারের চিন্তা থেকেই তার সূচনা হয়েছিল। সারা দিনের নির্জনতার সুযোগে সেই সন্দেহের অংকুর দ্রুত বেড়ে গিয়ে শিকড় ছড়িয়ে দিয়েছিল মনের গভীরে। তারপরই কল্পনায় দেখতে পেলাম, আমি মরতে চলেছি; আরও

স্পষ্ট দেখলাম আমার বদলে চিলে-কোঠায় একটা নিষ্প্রাণ দেহ দেখতে পেয়ে সেণ্ট জেরোমের সে কী বিমূঢ় অবস্থা। নাতালিয়া সাবিশ্‌নার কথা মনে পড়ল; সে বলেছিল, মৃত মানুষের আত্মা চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাড়ি ছেড়ে যায় না। কল্পনায় দেখলাম, সকলের অলক্ষ্যে আমি দিদিমার বাড়ির নানা ঘরের ভিতর দিয়ে উড়ে চলেছি; আর দেখতে পাচ্ছি লিউবচ্‌কার চোখের জল, দিদিমার শোক, শুনতে পাচ্ছি সেণ্ট জেরোমের সঙ্গে বাপির কথোপকথন। চোখের জল ফেলে বাপি বলছে, "সে বড় ভাল ছেলে ছিল।" সেণ্ট জেরোম জবাব দিল, "হ্যাঁ, কিন্তু ভীষণ দুরন্ত ও দুশ্চরিত্র।" বাপি বলল, "মৃতের প্রতি সম্মান দেখানো কর্তব্য। তুমিই তার মৃত্যুর কারণ; তুমি তাকে ভয় দেখিয়েছ; তার জন্য যে অসম্মানের আয়োজন করেছিলে তা সে সহ্য করতে পারে নি। তুমি এখান থেকে দূর হও শয়তান।"

সেণ্ট জেরোম তার পায়ের উপর পড়ে কাঁদতে কাঁদতে ক্ষমা ভিক্ষা করল। চল্লিশ দিন পরে আমার আত্মা স্বর্গে উড়ে চলল; সেখানে আশ্চর্যরকমের সুন্দর, সাদা, স্বচ্ছ একটা কিছু দেখতে পেলাম; বুঝতে পারলাম সেই আমার মামণি। সেই সাদা বস্তুটি আমাকে ঘিরে ধরল, কত আদর করল, কিন্তু তাকে সঠিক চিনতে না পেরে আমার বড়ই অস্বস্তি হল। বললাম, "সত্যি যদি তুমি হও তাহলে আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দাও যাতে আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরতে পারি।" তার কণ্ঠস্বর জবাব দিল, "এখানে আমরা সকলেই এই রকম। এর চাইতে ভাল করে তোমাকে জড়িয়ে ধরতে পারি না। এতে কি তুমি সুখী হও নি?" "হ্যাঁ, নিশ্চয় সুখী! কিন্তু তুমি আমাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছ না, আমি তোমার হাতে চুমো খেতে পারছি না।" "তার কোন দরকার নেই। এখানে যা আছে তাই সুন্দর।" আমারও মনে হল, সত্যি সব কিছুই সুন্দর। তারপর দুজনে উড়তে লাগলাম, উঁচুতে, আরও উঁচুতে। তারপরই হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল; অন্ধকার চিলে-কোঠায় সিন্দুকের উপর শুয়ে আছি; দুটি গাল জলে ভিজে গেছে, মনটা ফাঁকা, বার বার শুধু বলছি, "উড়ে চলেছি উঁচুতে, আরও উঁচুতে।" প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করলাম; কিন্তু সেই মুহূর্তে কল্পনায় ধরা দিল একটি অসীম বিস্তার, বিষণ্ণতায় দুর্ভেদ্য ও ভয়ংকর। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে স্বপ্নের যে আনন্দময় চেতনা খণ্ডিত হয়েছিল তাকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলাম; কিন্তু হায়, আগেকার সেই দিবাস্বপ্নের পথে পা রাখতে গিয়েই বুঝলাম যে সে পথে চলা আর সম্ভব নয়; তাছাড়া যেটা আরও বিস্ময়কর, সে স্বপ্নচারণা আর বুঝি আমাকে সুখের সন্ধানও দিতে পারবে না।

অধ্যায়—১৬
কষ্ট না করলে

রাতটা চিলে-কোঠাতেই কাটালাম; আমার কাছে কেউ এল না। পরদিন অর্থাৎ রবিবারে আমাকে স্কুল-ঘরের পাশের ছোট ঘরটাতে নিয়ে গিয়ে আবার তালাবন্ধ করে রাখা হল। মনে আশা জাগল, আমার শাস্তি তালাবন্ধ করে রাখাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। একটানা ঘুমের পরে মন কিছুটা শান্ত হয়ে উঠলেও এই নির্জনতা বড়ই কষ্ট দিতে লাগল; ইচ্ছা হল একটু ঘুরে বেড়াই, কাউকে মনের কথা বলি, অথচ আশেপাশে কেউ নেই। তাছাড়া, সেণ্ট জেরোম তার ঘরে হাঁটতে হাঁটতে যে রকম খুশিতে শিস দিচ্ছেন তা শুনেও মনটা উত্যক্ত হয়ে উঠল; বুঝতে পারলাম, শিস দেবার ইচ্ছা না থাকলেও শুধু আমাকে যন্ত্রণা দেবার জন্যই তিনি শিস দিচ্ছেন।

দুটোর সময় সেণ্ট জেরোম ও ভলদিয়া নীচে নেমে গেল। নিকলাই আমার খাবার নিয়ে এল; আমি কি করেছি এবং আমার কি হবে সে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করাতে সে বলল:

"শস্‌স স্যার! দুঃখু করবেন না; কষ্ট না করলে তো ইষ্ট মেলে না।"

এই প্রবচনটি আমাকে কিছুটা সান্ত্বনা দিল; পরবর্তীকালেও এ কথাটি আমার মনকে শক্ত রাখতে অনেক সাহায্য করেছে। কিন্তু যখন দেখলাম আমার জন্য শুধু রুটি ও জল না পাঠিয়ে ওরা ভাল কেক সমেত একটা পুরো ডিনারই পাঠিয়েছে তখন আমার বড়ই চিন্তা হল। কেক না পাঠালে বুঝতাম যে তালাবন্দী করে রেখেই ওরা আমাকে শাস্তি দেবে, কিন্তু এখন মনে হল যে আমার শাস্তি এখনও বাকি আছে; শুধু আমার সঙ্গ অন্যের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে ভেবেই আমাকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। এই সব কথা ভাবছি এমন সময় চাবি ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকল সেণ্ট জেরোম; কঠোর, থমথমে মুখ।

আমার দিকে না তাকিয়েই বলল, "নীচে গিয়ে দিদিমার সঙ্গে দেখা কর।"

সেণ্ট জেরোম যখন হাতটা ধরে আমাকে হল-ঘরের ভিতর দিয়ে নিয়ে চলল, তখন কাতেংকা, লিউবচ্‌কা ও ভলদিয়া ঠিক সেই দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল যেভাবে প্রতি সোমবার আমাদের জানালার পাশ দিয়ে কয়েদিদের নিয়ে যাবার সময় আমরা তাদের দিকে তাকিয়ে থাকি। দিদিমার হাতে চুমো খাবার জন্য তার দিকে এগিয়ে গেলে দিদিমা চাদরের নীচে হাতটা সরিয়ে নিল।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে নিঃশব্দে আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে দিদিমা বলল, "দেখ সোনা, আমি জানি যে আমার ভালবাসা তুমি চাও, আর আমার

জীবনের তুমিই সান্ত্বনাস্থল। আমার অনুরোধেই মসিয় সেণ্ট জেরোম তোমার লেখাপড়ার ভার নিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তিনি আর আমার বাড়িতে থাকতে চাইছেন না। কেন? কারণ তুমি।" একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগল, "আশা করেছিলাম তার চেষ্টা ও যত্নের জন্য তুমি কৃতজ্ঞ থাকবে, তার কাজের মূল্য বুঝবে; কিন্তু এতটুকু ছেলে হয়ে তুমি তার গায়ে হাত তুলতে সাহস করলে। ভাল! খুব ভাল! আমিও এবার ভাবছি যে ভাল ব্যবহারের মূল্য তুমি বুঝবে না, তোমার জন্য দরকার আরও কঠোর ব্যবস্থা। এই মুহূর্তে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও," সেণ্ট জেরোমকে দেখিয়ে কড়া হুকুমের ভঙ্গীতে দিদিমা বলল, "শুনতে পাচ্ছ?"

তার আঙুলের নির্দেশ মত তাকিয়ে সেণ্ট জেরোমের কোটটা নজরে পড়তেই আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম; নিজের জায়গা থেকে একটুও নড়লাম না; আবার মনে হল, আমার বুকের ভিতরটা বুঝি জমে যাচ্ছে।

"আমি যা বলছি তা কি কানে যাচ্ছে না?"

আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল, কিন্তু একটুও নড়লাম না।

আমার মানসিক যন্ত্রণা বুঝতে পেরে দিদিমা বলল, "ফোকো! তুমি কি····।"

"দিদিমা, কিছুতেই আমি ওর কাছে ক্ষমা চাইব না"। এই পর্যন্ত বলেই আমি চুপ করে গেলাম; চোখের জলে আমার গলা আটকে গেল; মনে হল, আর একটা কথা বলে চোখ বেয়ে ধারা নামবে।

"আমার হুকুম; আমি বলছি। অতএব—"

"না—না, আমি পারব না।" আমি হাঁপাতে লাগলাম; অবরুদ্ধ অশ্রু-ধারা হঠাৎ হতাশার বন্যায় মুখ ভাসিয়ে দিল।

সেণ্ট জেরোম আর্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "তুমি কি এইভাবে তোমার মাতৃস্থানীয়াকে মান্য কর। এই কি তার দয়ার প্রতিদান? ···নতজানু হও।"

আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চোখের জল ফেলে দিদিমা বলল, "হা ঈশ্বর, সে যদি এসব দেখত। ভাল হয়েছে যে এ সব দেখতে সে বেঁচে নেই। না, এ কষ্ট সে সহ্য করতে পারত না, কখনও না।"

দিদিমা আরও বেশী করে কাঁদতে লাগল। আমিও কাঁদলাম। কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার ইচ্ছা আমার নেই।

সেণ্ট জেরোম বললেন, "ঈশ্বরের দোহাই, আপনি শান্ত হোন মা-ম লা কোঁতেস।"

কিন্তু দিদিমা তার কথায় কান দিল না; দুই হাতে মুখ ঢেকে রইল; চাপা কান্না ক্রমে হিক্কা ও বিকারে পরিণত হল। ভয়ার্ত মুখে মিমি ও গাশা ছুটে এল. নিশাদল শুকতে দিল; সারা বাড়িতে অচিরেই ছুটাছুটি ও ফিসফিস কথা শুরু হয়ে গেল।

আমাকে উপরে নিয়ে যেতে যেতে সেণ্ট জেরোম বললেন, "খুব প্রশংসার

কাজ করেছ।"

"হা ঈশ্বর, আমি কি করেছি? আমি কী খারাপ ছেলে!"

আমাকে ঘরে থাকতে বলে সেণ্ট জেরোম দিদিমার কাছে ফিরে যেতে না যেতেই কোন কিছু না বুঝেই আমি রাস্তায় যাবার বড় সিঁড়িটার দিকে ছুটে গেলাম।

পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, না জলে ডুবতে চেয়েছিলাম, আজ আর তা মনে নেই; শুধু এইটুকু জানি যে দুই হাতে মুখ ঢেকে অন্ধের মত ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ একটা পরিচিত গলার প্রশ্ন শুনতে পেলাম, "তুমি কোথায় চলেছ? তোমাকেই যে আমি খুঁজছি।"

পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করতেই বাপি আমার হাতটা ধরে ফেলে কড়া গলায় বলল:

"আমার সঙ্গে এসে আমাকে উদ্ধার কর। পড়ার ঘরে আমার পোর্ট-ফোলিওতে হাত দিয়েছ কোন্ সাহসে?" আমাকে ছোট বসার ঘরটাতে ঢুকিয়ে দিয়ে বাপি প্রশ্ন করল। তারপর আমার কান ধরে বলল, "কি হল! জবাব দিচ্ছ না কেন?"

বললাম, "আমি দুঃখিত; আমাকে যে কিসে পেয়েছিল জানি না।"

"ওঃ, কিসে পেয়েছিল তা জান না! জান না, তাই না? জান না, কি বল? সত্যি জান না!" প্রতিটি কথার সঙ্গে একবার করে কান মুলে দিয়ে বাপি বলতে লাগল। "ভবিষ্যতে আর কখনও অকাজে নাক গলাবে? গলাবে? গলাবে?"

কানে খুব ব্যথা লাগলেও আমি মোটেই কাঁদলাম না, বরং একটা নৈতিক খুশির অনুভূতিই হল। বাপি আমার কানটা ছেড়ে দেওয়া মাত্রই তার হাত চেপে ধরে চোখের জলে ও চুমোয় চুমোয় ভরে দিলাম।

কাঁদতে কাঁদতেই বললাম, "আমাকে আরও মার। এমন জোরে মার যাতে আমি ব্যথা পাই; আমি খারাপ ছেলে, একটা হতভাগা, বাজে ছেলে।"

আমাকে ঈষৎ ঠেলে দিয়ে বাপি বলল, "তোমার কি হয়েছে?"

তার কোটটা চেপে ধরে বললাম, "না! আমি যাব না। আমি জানি, সকলেই আমাকে ঘৃণা করে; কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, তুমি আমার কথা শোন, আমাকে বাঁচাও, না হয় তো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দাও। তার সঙ্গে আমি থাকব না; আমাকে ছোট করতে সে সবকিছু করতে পারে। তার সামনে আমাকে হাঁটু ভেঙে বসতে বাধ্য করে। আমাকে পিটুনি দিতে চায়। আমি তা মানব না; আমি এখন আর ছোট শিশুটি নই। এ আমি সইতে পারি না, আমি মরে যাব; নিজেকেই শেষ করে ফেলব। সে দিদিমাকে বলেছে আমি খুব খারাপ ছেলে। আর তাই দিদিমা অসুস্থ হয়ে পড়েছে,

আমার জন্যই সে মারা যাবে। আমি—ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে চাবুক মার! কেন সকলে আমাকে এত কষ্ট দেবে?"

কান্নায় গলা বন্ধ হয়ে আসছে। ডিভানে বসে পড়ে তার হাঁটুতে মাথা রেখে এমনভাবে কাঁদতে লাগলাম যে মনে হল বুঝি সেই মুহূর্তেই আমি মারা যাব।

আমার উপর ঝুঁকে পড়ে বাপি আদর করে বলল, "কিসের জন্য তুমি কাঁদছ বাবা?"

"সে স্বেচ্ছাচারী—সে আমাকে কষ্ট দেয়। আমি মরে যাব; কেউ আমাকে ভালবাসে না।" আর কিছু বলতে পারলাম না। সারা শরীরে খিঁচুনি শুরু হয়ে গেল।

আমাকে দুই হাতে তুলে বাপি আমাকে শোবার ঘরে নিয়ে গেল। ঘুমিয়ে পড়লাম। অনেক দেরীতে ঘুম ভাঙল। বিছানার পাশে একটিমাত্র মোমবাতি জ্বলছে; পারিবারিক চিকিৎসক, মিমি ও লিউবচ্কা ঘরের মধ্যে বসে আছে। তাদের মুখ দেখে বুঝতে পারলাম, আমার স্বাস্থ্য নিয়ে তারা শংকিত; কিন্তু বারো ঘণ্টা ঘুমের পরে আমি এত ভাল ও হাল্কা বোধ করছিলাম যে আমার অসুস্থতা নিয়ে তাদের উদ্বেগটা দূর করার অনিচ্ছা না থাকলে আমি হয়তো এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তাম।

অধ্যায়—১৭

বিদ্বেষ

হ্যাঁ, সত্যিকারের বিদ্বেষ। উপন্যাসে যে বিদ্বেষের কথা লেখা হয় সে বিদ্বেষ নয়; যে বিদ্বেষ অন্যের ক্ষতি করে আনন্দ পায় সে-বিদ্বেষে আমি বিশ্বাস করি না। যে বিদ্বেষ কোন মানুষের প্রতি দুরতিক্রমণীয় বিতৃষ্ণা জাগালেও সে সম্মানের পাত্রই থাকে, যে বিদ্বেষ তার চুল, তার গলা, তার হাঁটাচলা, তার কণ্ঠস্বর, তার প্রতিটি অঙ্গ, প্রতিটি গতিভঙ্গী, বিরক্তিকর হয়েও এক দুর্বোধ্য শক্তিতে মনকে আকর্ষণ করে, তার তুচ্ছতম কাজের দিকেও নজর দিতে বাধ্য করে, সেই বিদ্বেষই আমি অনুভব করতাম সেণ্ট জেরোমের প্রতি।

সেণ্ট জেরোম দেড় বছর আমাদের বাড়িতে ছিলেন। এখন ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করে বুঝি তিনি ছিলেন একজন চমৎকার ফরাসী ভদ্রলোক, কিন্তু আগাগোড়া ফরাসী। তিনি বোকা নন; মোটামুটি উচ্চ শিক্ষিত; আমাদের প্রতি তার যা কর্তব্য সেটাকে বিবেকবুদ্ধি অনুসারেই পালন করতেন; কিন্তু রুশ চরিত্রের বিপরীত যেসব বৈশিষ্ট্য তার দেশবাসীর চরিত্রের লক্ষণ সেসবই

তার মধ্যে ছিল—অস্থিরমতি, আত্মম্ভরিতা, অহংকার, অবিবেচনা ও অজ্ঞ আত্ম-বিশ্বাস। এ সবকিছুই ছিল আমার অপছন্দ।

দৈহিক শাস্তিদান সম্পর্কে দিদিমা তার মতামত ব্যক্ত করায় তিনি আমাদের চাবুক মারতে সাহস করতেন না; তা সত্ত্বেও প্রায়ই একটা বার্চের ডাল হাতে নিয়ে আমাদের, বিশেষ করে আমাকে ভয় দেখাতেন, আর বলতেন "ফুতের" (চাবুক মারব।)।

দৈহিক শাস্তি কখনও ভোগ করি নি, তাই তার ভয়ও ছিল না; কিন্তু সেণ্ট জেরোম হয় তো আমাকে মারতে পারেন এই চিন্তাই আমার মনে একটা চাপা ক্রোধ ও হতাশার সৃষ্টি করেছিল।

কার্ল আইভানিচও কখনও কখনও বিরক্ত হয়ে তার রুলার বা বেল্ট দিয়ে আমাদের উপর ঝাল ঝাড়তেন, কিন্তু সে কথা মনে করে আমার মনে এতটুকু রাগ হত না। এমন কি যে সময়কার কথা বলছি (তখন আমার বয়স চোদ্দ বছর) তখন যদি কার্ল আইভানিচ আমাকে মারতেনও তাহলেও শান্ত-ভাবে আমি তা সহ্য করতাম। কার্ল আইভানিচকে আমি ভালবাসতাম। বহুদূর অতীত পর্যন্ত তার কথা আমার মনে পড়ে; তাকে আমাদের পরিবারের একজন বলেই মনে করতাম। কিন্তু সেণ্ট জেরোম ছিলেন উদ্ধত ও আত্মম্ভরী মানুষ; একজন বয়স্ক লোকের প্রাপ্য শ্রদ্ধা ছাড়া তার প্রতি আমার আর কোন অনুরাগ ছিল না। কার্ল আইভানিচ ছিলেন একটি হাস্যকর বৃদ্ধ, অনেকটা ভৃত্যের মত, তাকে আমি ভালবাসতাম কিন্তু শিশুসুলভ ধারণায় তাকে সামাজিক মর্যাদার ব্যাপারে আমার চাইতে ছোট বলে মনে করতাম।

অপর পক্ষে, সেণ্ট জেরোম ছিলেন সুদর্শন, সুশিক্ষিত, ফুলবাবুটি; সব সময় সকলের সঙ্গেই তিনি সমানভালে পা ফেলে চলতে চেষ্টা করতেন।

কার্ল আইভানিচ ঠাণ্ডা মাথায় আমাদের বকতেন, শাস্তি দিতেন। সেটাকে তিনি প্রয়োজনীয় অথচ বেদনাদায়ক কর্তব্য বলে মনে করতেন। অপর দিকে, সেণ্ট জেবোম সর্বদাই তাব গুরুমশাইগিরি ফলাতে চাইতেন। পরিষ্কার বুঝতে পারতাম, তিনি আমাদের শাস্তি দিতেন যতটা আমাদের ভালর জন্য তার চাইতে অনেক বেশী তার আত্মতুষ্টির জন্য। নিজের মহত্ত্বের ধারণায়ই তিনি ফুলে-ফেঁপে থাকতেন। তার বড় বড় ফরাসী বাক্য, অকারণ জোর দিয়ে ভুল উচ্চারণ—এ সবেতেই আমি খুব বিরক্ত হতাম। কার্ল আইভানিচ রেগে গেলে বলতেন, "যাত্রার সং, দুষ্টু ছেলে, বা স্পেনের মাছি।" সেণ্ট জেরোম আমাদের বলতেন, "শয়তান, দুষ্টু বদমাস" ইত্যাদি—তাতে আমাদের অহংকারে ঘা লাগত।

কার্ল আইভানিচ আমাদের ঘরের কোণে নিয়ে হাঁটু ভেঙে বসিয়ে রাখতেন; শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যটাই ছিল শাস্তি। সেণ্ট জেরোম বুক চিতিয়ে হাত নেড়ে কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলতেন, "A genoux, Mauvais sujet!" (নতজানু হও,

শয়তান।); তারপর তার সামনে নতজানু হয়ে আমাদের ক্ষমা চাইতে হত। অসম্মানটাই ছিল শাস্তি।

আমাকে শাস্তি দেওয়া হলনা—কি হয়েছে তাও কেউ আমাকে বলল না; তবু এই দুটি দিনের হতাশা, লজ্জা আতংক ও বিদ্বেষের কথা আমি ভুলতে পারি নি। যদিও সেদিন থেকে সেণ্ট জেরোমও আমার সম্পর্কে সব আশা ছেড়ে দিলেন, আমাকে নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতেন না, তবু তার প্রতি আমি উদাসীন থাকতে পারলাম না। যখনই আমাদের চোখাচোখি হত তখনই বুঝতে পারতাম যে আমার চোখে একটা শত্রুতার ভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে; তাড়াতাড়ি আমি উদাস ভাব দেখাতে চেষ্টা করতাম; কিন্তু তখনই মনে হত, আমার এই ফাঁকি তার চোখে ধরা পড়েছে; আর সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় লাল হয়ে সেখান থেকে চলে যেতাম।

এককথায়, তার প্রতি আমার যেকোন আচরণেই এমন ঘৃণা প্রকাশ পেত যে আমি তা বুঝিয়ে বলতে পারব না।

অধ্যায়—১৮

দাসীদের ঘরে

ক্রমেই একলা হয়ে পড়লাম; তখন নির্জনে চিন্তা করা আর চারদিকে নজর রাখাই যেন আমার প্রধান বিলাস হয়ে উঠল। চিন্তার বিষয়বস্তুর কথা পরবর্তী কোন অধ্যায়ে বলব; আমার নজর পড়ল প্রধানত দাসীদের ঘরে; সেখানে তখন যে প্রেমের খেলাটি চলেছে তা আমার মনকে গভীর ভাবে টানল। সে প্রেম-লীলার নায়িকা অবশ্যই মাশা। পাঁচ বছর আগেই সে ভাসিলিকে ভালবাসত; ভাসিলিও তাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিল। নিয়তি পাঁচটি বছর তাদের মধ্যে বিরহ ঘটিয়ে দিলেও দিদিমার বাড়িতেই আবার তাদের মিলন হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে একটি মূর্তিমান প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে নিকলাই (মাশার খুড়ো); ভাসিলির মত একটা বোকা ও লম্পট-প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে ভাই-ঝির বিয়ের কথা সে কানেই তুলল না।

ফলে যে ভাসিলি ছিল ঠাণ্ডা মাথা ও উদাসীন, সেই এত গভীরভাবে মাশার প্রেমে ডুবে গেল যা একমাত্র গোলাপী শার্ট-পরা ও চুলে পমেড-মাখা একজন ভূমিদাস দর্জির পক্ষেই সম্ভব।

তার প্রেমের ধরণ-ধারণ অবশ্য একটু বিচিত্র ও বদ-খেয়ালি (যেমন, মাশার সঙ্গে দেখা হলেই সে তাকে কষ্ট দেয়, হয় একটু চিমটি কাটে, নয় তো থাপ্পড় কষায়, নয় তো এত জোরে জড়িয়ে ধরে যে বেচারির দম আটকাবার উপক্রম

হয়); কিন্তু তার প্রেম যে খাঁটি তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন নিকলাই শেষ পর্যন্ত তার ভাইঝিকে ভাসিলির সঙ্গে বিয়ে দিতে অস্বীকার করল, আর ভাসিলিও মনের দুঃখে মদ খেতে শুরু করে দিল, শুঁড়িখানায় গিয়ে নানারকম গোলমাল পাকাতে লাগল, আর তার ফলে একাধিকবার পুলিশের হাতে ধোলাই খেল। আবার এইসব আচরণের ফলেই মাশার চোখে প্রেমিক হিসাবে তার যোগ্যতা আরও বেড়ে গেল, মাশার ভালবাসায়ও জোয়ার এল। ভাসিলি যখনই থানায় আটক হত তখনই সে দিনের পর দিন একটানা কাঁদত, তার মন্দ ভাগ্য নিয়ে গাশার সঙ্গে আলোচনা করত, আর খুড়োর সবরকম তিরস্কার ও পিটুনিকে উপেক্ষা করে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে লুকিয়ে থানায় যেত।

হে পাঠক, যে সমাজে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি তাকে ঘৃণা করবেন না। আপনার অন্তরের ভালবাসা ও সহানুভূতির তারগুলো যদি দুর্বল না হয়ে থাকে তাহলে যে সুরে তারা বেজে ওঠে তার সাক্ষাৎ আপনি দাসীদের ঘরেই পাবেন। আপনি আমার সঙ্গে যেতে চান আর নাই চান' আমি আপনাকে সিঁড়ির সেই চাতালের উপর নিয়ে যাব যেখান থেকে দাসীদের ঘরের সব কিছুই আমি দেখতে পাব। সেখানে আছে একটা বেঞ্চ, তার উপর একটা ইস্ত্রি, নাক-ভাঙা একটা কাগজের পুতুল, ছোট বালতি ও একটা হাত-মুখ ধোবার পাত্র; জানালার গোবরাটের উপর আছে একগাদা কালো মোম, একটা রেশমের গুলি, আধ-খাওয়া কাঁচা কাঁকুড় একটা, আর একটা বনবন; আর আছে একটা বড় লাল টেবিল, ও টেবিলের উপর ক্যালিকোতে মোড়া কিছু সেলাইয়ের কাজ; আমার প্রিয় লাল পোশাক ও নীল রুমালে সেজে মাশা সেই টেবিলের পিছনে বসে আছে। সেলাই করতে করতে মাঝে মাঝে সে সূঁচ দিয়ে মাথাটা চুলকোচ্ছে, অথবা মোমবাতির পলতেটা কেটে ঠিক করে দিচ্ছে; আর তাকে দেখে দেখে আমি শুধু ভাবি; ঐ দুটি উজ্জ্বল নীল চোখ, ঐ সোনালী চুলের রাশি, আর ঐ উন্নত বুক নিয়ে সে কেন একটি মহিলা হয়ে জন্মাল না? মিমির মত নয়, ভিভার্ক্সয় ব্লুলভার্দে যেমনটি দেখেছি সেই রকম গোলাপী ফিতে বসানো টুপি ও গাঢ় লাল রঙের গাউন পরে কোন ড্রয়িং-রুমে বসলে তাকে কেমন মানাত।

আর আঁটো কোট ও নোংরা গোলাপী শার্ট-পরা ভাসিলির বিরক্তিকর মূর্তি ও মাতালের মত মুখটা কী বিশ্রী দেখতে! তার শরীরের প্রতিটি ভঙ্গীতে, শিরদাঁড়ার প্রতিটি নোয়ানো অবস্থার মধ্যে অত্যধিক ধোলাইয়ের চিহ্ন তর্কাতীতভাবে প্রকট।

ভাসিলি ঘরে ঢুকলে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে মাথা না তুলেই সূঁচটা কুশনে ফুটিয়ে দিয়ে মাশা বলে উঠল, "আঃ, ভাসিয়া! আবার—"

ভাসিলি পাল্টা জবাব দিল, "হ্যাঁ; হলটা কি? তার কাছ থেকে কী ভাল তুমি আশা করতে পার? শুধু এই ব্যাপারটার একটা হিল্লে যদি হয়ে যেত!

অথচ আমার সব চেষ্টা বরবাদ হয়ে গেল শুধু ওই লোকটার জন্য।”

অপর দাসী নাদেঝ্দা বলল, “চা খাবে?”

“অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার ঐ ডাকাত খুড়োটা আমাকে ঘেন্না করে কেন? কেন? আমার পোশাকের জন্য, আমার অহংকারের জন্য। আমার চালচলনের জন্য। ওঃ, সব চুলোয় যাক!” হাত নেড়ে নেড়ে ভাসিলি বলতে লাগল।

দাঁত দিয়ে সুতোটা কেটে মাশা বলল, “লোককে মান্য করে চলা উচিত, আর তুমি কি না—”

“এ আর আমার সহ্য হচ্ছে না, তাই!”

ঠিক সেই সময় দিদিমার ঘরের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল, আর কানে এল সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে গাশার বকবকানি।

“নাও! তিনি তো নিজেই জানেন না কি চান; কে তাকে খুশি করতে পারবে! কী দুর্ভাগা জীবন—খালি খাটুনি আর খাটুনি! এর চাইতে— হে প্রভু, আমাকে মার্জনা কর—” দুই হাত তুলে গাশা বকতে লাগল।

ভাসিলি দাঁড়িয়ে বলল, “অভিবাদন আগাফিয়া মিখায়লভ্না।”

গাশা গর্জে উঠল, “খুব হয়েছে! তোমার ভক্তিতে আমার দরকার নেই! কেন এখানে এসেছ? দাসীদের ঘরটা কি পুরুষদের আসার জায়গা?”

“ভাসিলি ভীরু গলায় বলল, “তোমরা কেমন আছ তাই দেখতে এসেছি।”

রাগে গলা ফাটিয়ে আগাফিয়া মিখায়লভ্না বলল, “অচিরেই শেষ টান উঠবে—এই হল আমার হাল।”

ভাসিলি হাসল।

“হাসবার কিছু নেই; তোমাকে যদি এখান থেকে চলে যেতে বলি তো যাবে! ওর দিকে তাকাও! ওকে বিয়ে কর, করবে কি? নোংরা বদমাস! যাও, বেরিয়ে যাও!”

থপ্ থপ্ করে নিজের ঘরে ঢুকে আগাফিয়া মিখায়লভ্না এত জোরে দরজাটা বন্ধ করে দিল যে জানালাগুলো ঝন্ঝন্ করে উঠল।

ভাসিলি চুপি চুপি বলল, “মনে হচ্ছে, চায়ের জন্য অন্য সময়ে আসা ভাল; চলি, পরে দেখা হবে।”

নাদেঝ্দা চোখ টিপে বলল, “কিছু মনে করো না; আমি বরং সামোভারটার খোঁজ নিয়ে আসি।”

নাদেঝ্দা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই মাশার গা ঘেঁসে বসে ভাসিলি বলল, “আমি এর একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে চাই। হয় সোজা কাউন্টেসের কাছে গিয়ে বলি, ‘এই হচ্ছে অবস্থা,’ আর নয় তো—সব ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে চলে যাই; ঈশ্বরের নামে বলছি, তাই আমি করব।”

"আর আমি এখানে একলা থাকব কেমন করে ?"

"তোমার জন্যই তো আমার যত দুঃখ। তুমি না থাকলে কবে এখান থেকে পালিয়ে চলে যেতাম।"

একটু চুপ করে থেকে মাশা বলল, "ধোলাই করার জন্য তোমার শার্টটা নিয়ে আস নি কেন ভাসিয়া ; দেখ তো কলারটা কেমন ময়লা হয়ে গেছে।"

সেই সময় নীচে দিদিমার ছোট ঘণ্টাটা বেজে উঠল ; গাশা তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

তাকে দেখে উঠে দাঁড়াতেই ভাসিলিকে দরজার দিকে ধাক্কা দিয়ে গাশা বলল, "ওকে দিয়ে তোমার কি দরকার, শয়তান কোথাকার ? তুমিই তো ওর এই হাল করেছ, আর আবার ওকে জ্বালাতে এসেছ। নির্লজ্জ বেহায়া। ওকে কাঁদাতেই বুঝি তোমার ভাল লাগে ! পালাও এখান থেকে। আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও !" মাশার দিকে ঘুরে বলল, "ওর মধ্যে তুমিই বা কি দেখেছ ? ওর জন্য আজই খুড়োর হাতে পিটুনি খাও নি ? কিন্তু তোমার ওই এক গোঁ : 'ভাসিলি গ্রুস্কভ ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।' বোকার হদ্দ !"

হঠাৎ কেঁদে উঠে ভাসিলি বলল, "ওর জন্য মেরে ফেললেও আমি অন্য কাউকে বিয়ে করব না। আর কাউকে আমি ভালবাসি না।"

হাঁ করে মাশার দিকে তাকিয়ে রইলাম ; সিন্দুকের উপর বসে সে রুমালে চোখ মুচছে। ভাসিলি সম্পর্কে আমার মনোভাব বদলাতে চেষ্টা করলাম ; এমন একটা দৃষ্টিকোণ খুঁজে বের করতে চাইলাম যেখান থেকে দেখলে তাকে মাশার কাছে আকর্ষণীয় মনে হতে পারে। কিন্তু তার দুঃখে আন্তরিক সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না যে মাশার মত মেয়ে কেমন করে ভাসিলিকে ভালবাসতে পারে।

উপরে আমার ঘরে যেতে যেতে ভাবলাম, "আমি যখন বড় হব, তখন পেত্রস্কয়ের মালিক হব, মাশা ও ভাসিলি হবে আমার ভূমিদাস। পড়ার ঘরে বসে আমি পাইপ টানব। আর মাশা ইস্ত্রিটা নিয়ে রান্নাঘরে যাবে। আমি বলব, 'মাশাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।' সে ঘরে ঢুকবে ; তখন ঘরে আর কেউ থাকবে না। হঠাৎ ভাসিলি ঘরে ঢুকবে ; মাশাকে দেখে বলে উঠবে, 'এবার আমার সর্বনাশ হল !' মাশা কেঁদে উঠবে ; আমি বলব, 'ভাসিলি, আমি জানি তুমি ওকে ভালবাস। আর ও তোমাকে ভালবাসে ; এই নাও এক হাজার রুবল ; ওকে বিয়ে কর ; ঈশ্বর তোমাদের সুখে রাখুন।' তারপর আমি অন্য ঘরে চলে যাব। অসংখ্য চিন্তা ও কল্পনা মনের মধ্যে আসে আর মিলিয়ে যায় ; আবার অনেক চিন্তা ও কল্পনা মনের ক্ষেতে গভীর, স্পর্শকাতর শিরালি কেটে যায় ; কিসের সে চিন্তা তা ভুলে গেলেও তার মধুর স্মৃতি মনের মধ্যে জেগে থাকে, তাকে আর একবার

স্মরণ করতে ইচ্ছা করে। ভাসিলির সঙ্গে বিয়ে হলে মাশার জীবনে যে সুখ নেমে আসবে তার জন্য আমার স্বার্থকে বিসর্জন দেবার চিন্তা তেমনই গভীর দাগ রেখে গেছে আমার মনে।

অধ্যায়—১৯
কৈশোর

কিশোর বয়সে যে সব বিষয়ের ভাবনা-চিন্তা ছিল আমার প্রিয় ও সারাক্ষণের সঙ্গী সেগুলি আমার বয়স ও মর্যাদার সঙ্গে এতই বেমানান ছিল যে সেসব কথা বললে কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না।

যখন একটা পুরো বছর আমি সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক একটি নির্জন নৈতিক জীবন যাপন করছিলাম সেই সময়ে মানুষের নিয়তি, পরজন্ম, আত্মার অমরতা প্রভৃতি বিমূর্ত চিন্তা নিয়েই আমার দিন কাটত; আর অনভিজ্ঞতাপ্রসূত উৎসাহ নিয়ে আমার দুর্বল শিশু-মন সেই সব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতাম; তাকেই জীবনের সর্বোচ্চ প্রাপ্য বলে মনে করতাম, কিন্তু সেই সমাধান কখনও খুঁজে পেতাম না।

এক সময় আমার মনে হল, সুখ কোন বাহ্যিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার প্রতি আমাদের মনোভাবের উপর; যে লোক দুঃখ-কষ্ট সইতে অভ্যস্ত সে অসুখী হতে পারে না; তাই শারীরিক পরিশ্রমে নিজেকে অভ্যস্ত করার জন্য তীব্র যন্ত্রণাবোধ করা সত্ত্বেও আমি প্রসারিত হাতের উপর তাতিশ্চেভ-এর শব্দকোষখানা পাঁচ মিনিট পর্যন্ত ধরে রাখতাম, অথবা চিলে-কোঠায় গিয়ে একটা দড়ি দিয়ে নিজের খোলা পিঠকে এমনভাবে আঘাত করতাম যে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসত।

অন্য সময়ে হঠাৎ মনে হত যে কোন মুহূর্তে আমার মৃত্যু ঘটতে পারে; তাই স্থির করলাম, ভবিষ্যতের কথা না ভেবে শুধুমাত্র বর্তমানকে নিয়ে বেঁচে থাকলেই মানুষ সুখী হতে পারে এবং এই ভাবনার প্রভাবে তিন দিন পড়াশুনা না করে, অন্য কোন কাজ না করে কেবল বিছানায় শুয়ে এবং আদা-রুটি ও মধু খেয়ে একটা উপন্যাস পড়েই কাটিয়ে দিলাম।

আবার অন্য একদিন খড়ি দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের উপর নানা রকম মূর্তি আঁকতে আঁকতে হঠাৎ মনে হল: সামঞ্জস্য চোখের পক্ষে প্রীতিপ্রদ হয় কেন? সামঞ্জস্য কি?

জবাব দিলাম, একটা সহজাত অনুভূতি। কিন্তু সেটা কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত? জীবনের সব কিছুর মধ্যেই কি সামঞ্জস্য আছে? বরং বলা যায়, সামঞ্জস্যই তো জীবন। একটা ডিম্বাকৃত ছবি আঁকলাম। জীবনের পর আত্মা

অনন্তে মিশে যায়। ডিম্বের একদিকে বোর্ডের শেষ পর্যন্ত প্রসারিত একটা রেখা টানলাম। অপর দিকে অপরূপ আর একটা রেখা নেই কেন? ভাবলাম, শুধু একটা দিকই আছে সে আবার কেমন অনন্ত? আজ ভুলে গেলেও এই জীবনের আগেও তো আমরা ছিলাম।

ঠিক সেই সময় ভলদিয়া ঘরের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে আমাকে চিন্তা করতে দেখে একটু হাসল; আর তাতেই আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে যত সব বাজে চিন্তা নিয়ে আমি মেতে আছি।

পাঠক যাতে আমার তৎকালীন চিন্তা-ভাবনার স্বরূপটা বুঝতে পারেন সেই জন্যই এই স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ করলাম।

কিন্তু অন্য কোন দার্শনিক চিন্তাধারাই আমাকে সংশয়বাদের মত এত বেশী করে আকর্ষণ করতে পারে নি; তার প্রভাবে এক সময় তো আমার পাগল হবারই উপক্রম হয়েছিল। আমি মনে করতাম, সারা বিশ্বে আমি ছাড়া আর কারও কোন অস্তিত্ব নেই; বস্তু বলে কিছু নেই, সেগুলি আমার মনের ধারণামাত্র; যে মুহূর্তে আমি তাদের সম্বন্ধে চিন্তা বন্ধ করব, অমনি তারা উধাও হয়ে যাবে।

এক কথায় শেলিং-এর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত হলাম যে বস্তুর কোন অস্তিত্ব নেই, কেবলমাত্র তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটাই সত্য।

নৈতিক কর্মের দিক থেকে মানুষের মন একটি সকরুণ, অক্ষম উৎসমাত্র।

আমার দুর্বল মন দুর্ভেদ্যকে ভেদ করতে পারত না, কিন্তু আমার শক্তির অতীত সেই প্রচেষ্টার ফলে একটার পর একটা মনের সেই সব প্রত্যয়কে হারাতে লাগলাম যেগুলিকে নিজের জীবনের সুখের জন্য স্পর্শ করাও আমার পক্ষে উচিত হয় নি।

তথাপি এই সব দার্শনিক আবিষ্কার আমার আত্মপ্রবঞ্চনাকে বিলক্ষণ বাড়িয়ে দিল। প্রায়ই নিজেকে এমন একজন মহাপুরুষ বলে কল্পনা করতাম যে মানুষের কল্যাণের জন্য নতুন নতুন সত্যকে আবিষ্কার করছে, এবং নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন গর্বের সঙ্গে অন্য সব মানুষদের দিকে তাকাতাম। কিন্তু কী আশ্চর্য, যখন সেই সব সাধারণ মানুষদের সামনে উপস্থিত হতাম তখন আমি বড়ই লজ্জাবোধ করতাম এবং নিজের যোগ্যতার কোন প্রমাণই তাদের সামনে তুলে ধরতে পারতাম না; এমন কি যত সহজ, সরল হোক না কেন আমার প্রতিটি কথা ও কাজের জন্য লজ্জাবোধ না করার অভ্যাসটি পর্যন্ত গড়ে তুলতে পারতাম না।

অধ্যায়—২০

ভলদিয়া

হ্যাঁ, জীবনের এই অধ্যায়টির বিবরণ দিতে যতই এগিয়ে যাই ততই কাজটি আমার পক্ষে বেদনাদায়ক ও কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। সত্যিকারের ভালবাসার উষ্ণস্পর্শের যে মুহূর্তগুলি আমার জীবনের সূচনাকালকে অবিরাম উজ্জ্বলতায় আলোকিত করে রেখেছিল, এই অধ্যায়ের স্মৃতি-চারণে কদাচিৎ তাদের দেখা মেলে। কৈশোরের এই মরুভূমি-দিনগুলিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পার হতে পারলেই আমি খুশি হব; তবেই তো পৌছতে পারব সেই সময়টাতে যখন প্রকৃত বন্ধুত্বের আলোয় মহৎ অনুভূতির আলোয় এই অধ্যায়ের শেষ অংশটি আলোকিত হয়ে উঠেছিল এবং মায়াময় কাব্যের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল—যার নাম যৌবন।

ঘণ্টা ধরে ধরে স্মৃতির পথ ধরে আমি হাঁটব না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বিশিষ্ট মানুষটির সঙ্গে আমার যোগাযোগের কালটিতে উপনীত না হব যার স্থির, কল্যাণময় প্রভাবে আমার জীবন ও চরিত্র গড়ে উঠেছে, ততক্ষণ কেবলমাত্র প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির উপর চকিত দৃষ্টিপাত করেই এগিয়ে যাব।

কয়েক দিনের মধ্যেই ভলদিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে। বিশেষ সব শিক্ষক তাকে পড়াতে আসে; সে যখন খড়ি হাতে নিয়ে সাহসের সঙ্গে ব্ল্যাকবোর্ডের উপর নানা রকম আঁকাজোকা করে, নানা রকম কথা বলে, তখন আমি ঈর্ষা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে কান পেতে শুনি, কারণ আমার কাছে সে সব কিছুই এক দুর্জ্ঞেয় জ্ঞানের দ্যোতক। অবশেষে এক রবিবারে ডিনারের পরে সব শিক্ষক ও দুজন অধ্যাপক দিদিমার ঘরে সমবেত হল, এবং বাপি ও কয়েকজন অতিথির উপস্থিতিতে ভলদিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার একটা মহলা হল। সেই সময় প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে সে দিদিমাসহ সকলেরই মনোরঞ্জন করল। আমাকেও নানা বিষয়ে প্রশ্ন করা হল; কিন্তু আমি খুব খারাপ ফল দেখালাম; অধ্যাপকরা অবশ্য আমার অজ্ঞতার ব্যাপারটা দিদিমার কাছে চেপে গেল। যাই হোক, এখন আমার বয়স মাত্র পনেরো বছর; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে আমি আরও এক বছর সময় পাব। ভলদিয়া শুধু ডিনারের সময় নীচে নামে, বাকি সময়টা, এমন কি সন্ধ্যাটাও উপরে পড়াশুনা করে কাটায়। সে অত্যন্ত অহংকারী; শুধু পাশ করলেই হবে না; পরীক্ষায় তাকে বিশিষ্টতা অর্জন করতে হবে।

অবশেষে প্রথম পরীক্ষার দিনটি এল। ভলদিয়া পিতলের বোতাম-আঁটা নীল কোট, সোনার ঘড়ি ও পেটেন্ট লেদারের বুট পরেছে। বাপির ফিটন দরজায় দাঁড়িয়ে। তাতে চেপে ভলদিয়া ও সেন্ট জেরোম বিশ্ববিদ্যালয়ের

উদ্দেশে যাত্রা করল। মেয়েরা, বিশেষ করে কাতেংকা, ভলদিয়ার আনন্দে উদ্ভাসিত মুখখানি দেখতে জানালা দিয়ে উঁকি দিল। বাপি বলল, "ঈশ্বর ভাল করুন! ঈশ্বর ভাল করুন।" দিদিমাও অনেক কষ্টে জানালায় গিয়ে অশ্রুপূর্ণ চোখে ভলদিয়াকে আশীর্বাদ করল; ফিটনটা গলির মোড়ে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত সেই দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলতে লাগল।

ভলদিয়া ফিরে এল। সকলে সাগ্রহে তাকে ঘিরে দাঁড়াল: "কি খবর? ভাল তো? কি রকম নম্বর হল?" আনন্দ-উজ্জ্বল মুখখানিই জবাব দিল। ভলদিয়া পুরো নম্বর পেয়েছে। পরদিন সেই একই উৎকণ্ঠা ও শুভকামনা নিয়ে সে যাত্রা করল এবং একই আগ্রহ ও আনন্দের মধ্যে ফিরে এল। নটা দিন কেটে গেল। দশম দিনে তার শেষ ও সবচেয়ে শক্ত পরীক্ষা—ধর্মবিষয়ক জ্ঞান; আমরা সকলেই জানালায় দাঁড়িয়ে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছি। দুটো বেজে গেল; ভলদিয়ার দেখা নেই।

জানালার কাঁচে মুখটা চেপে ধরে লিউবচ্‌কা চেঁচিয়ে বলল, "হে ভগবান! আরে! ঐ তো তারা আসছে! ঐ তো তারা আসছে!"

সত্যি তো; ফিটনের মধ্যে সেণ্ট জেরোমের পাশে বসে আছে ভলদিয়া; পরনে সেই নীল কোট ও ধূসর টুপির পরিবর্তে ছাত্রের ইউনিফর্ম—নীল কাজ-করা কলার, তে-কোণা টুপি, পাশে ঝোলানো গিল্টি-করা ছবি।

ইউনিফর্ম-পরিহিত ভলদিয়াকে দেখে "আহা, আজ সে যদি বেঁচে থাকত" বলেই দিদিমা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

উদ্ভাসিত মুখে ভলদিয়া বারান্দায় ছুটে এসে আমাকে, লিউবচ্‌কাকে, মিমিকে ও কাতেংকাকে চুমো খেল। কাতেংকার কান দুটো রাঙা হয়ে উঠল। ভলদিয়া আনন্দে আত্মহারা। ইউনিফর্মে তাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে! সদ্যউদ্ভিন্ন কালো জুলফির সঙ্গে নীল কলারটা কী সুন্দর মানিয়েছে! তার লম্বা, সরু কোমরের চলনই বা কত সুন্দর! সেই স্মরণীয় দিনটিতে সকলেই দিদিমার ঘরে ডিনার খেল। ডিনারের পরে মদ পরিবেশনের সময় খানসামাটি গুরুগম্ভীর চালে তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে এক বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে এল। মামণির মৃত্যুর পরে দিদিমা এই প্রথম শ্যাম্পেন খেল; ভলদিয়াকে অভিনন্দন জানাতে পুরো এক গ্লাস শ্যাম্পেন শেষ করে সে আবার ভলদিয়ার দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলল। সেই থেকে ভলদিয়া নতুন পোশাকে সেজে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়, নিজের বাসায় বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হয়, ধূমপান করে, বল-নাচে যায়। কিন্তু ডিনারটা নিয়মিতভাবে বাড়িতেই খায়, আর সন্ধ্যাবেলাটা বাড়িতেই কাটায়; কাতেংকার সঙ্গে রহস্যজনক আলোচনায় মেতে ওঠে; সে আলোচনায় আমি যোগ দেই না, কিন্তু যতটা কানে আসে তাতে বুঝতে পারি যে যে সব উপন্যাস তারা পড়েছে তার নায়ক-নায়িকাদের কথা, প্রেম ও ঈর্ষার কথা নিয়েই তারা আলোচনা করে; এ সব আলোচনায় যে তারা

কী আনন্দ পায়, অথবা কেনই বা এত সূক্ষ্ম হাসি হাসে আর এমন উত্তপ্তভাবে তর্ক করে তা আমি বুঝতে পারি না।

সাধারণভাবে এইটুকু বুঝতে পারি যে শৈশবের সাথীদের স্বাভাবিক বন্ধুত্ব ছাড়াও কাতেংকা ও ভলদিয়ার মধ্যে এমন একটা বিচিত্র সম্পর্ক আছে যা তাদের দুজনকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছে আর তাদের দুজনকে বেঁধেছে এক রহস্যময় বাঁধনে।

অধ্যায়—২১

কাতেংকা ও লিউবচ্‌কা

কাতেংকার বয়স এখন ষোল; সে বড় হয়েছে; দেহ-গঠনের যে ঋজুতা ও চলনের যে সলজ্জতা শৈশব থেকে কুমারীত্বে উত্তীর্ণ মেয়েদের বৈশিষ্ট্য তার জায়গায় দেখা দিয়েছে নবজাত পুষ্পের সতেজ মাধুর্য। কিন্তু সে বদলে যায় নি; সেই একই উজ্জ্বল নীল চোখ ও হাসিভরা চাউনি; ভুরুর সঙ্গে প্রায় একই রেখায় গড়ে-ওঠা সেই ছোট সোজা নাক ও বড় নাসারন্ধ্র; একই ছোট মুখের উজ্জ্বল হাসি, গোলাপী গালের টোল; ছোট্ট দুখানি হাত; যে কারণেই হোক "পরিপাটি মেয়েটি" কথাটা এখনও তার বেলায় বিশেষভাবেই প্রযোজ্য। তার বেলায় কেবলমাত্র নতুন বৈশিষ্ট্য বড়দের মত বিনুনি করে চুল বাঁধা এবং উন্নত বক্ষ যা একাধারে তার লজ্জা ও গর্ব।

যদিও লিউবচ্‌কা তার সঙ্গেই বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, তবু সব বিষয়েই সে স্বতন্ত্র।

ছোটখাট গড়ন, কাঠি-কাঠি পা দুটো এখনও বাঁকা, কুৎসিত চেহারা। তার মুখে ভালর মধ্যে চোখ দুটি সত্যি বড় সুন্দর; দুটি বড় বড় কালো চোখে এমন একটি অবর্ণনীয় মর্যাদা ও সরলতার প্রকাশ যা মনকে টানে। সব ব্যাপারেই লিউবচ্‌কা স্বাভাবিক ও সরল, আর কাতেংকা চায় সর্বদাই অন্যের ধাঁচে নিজেকে গড়ে তুলতে। লিউবচ্‌কা সব সময়ই সোজাসুজি তাকায়; আর কাতেংকা চোখের পাতা নামিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গীতে তাকায়; দেখে মনে হবে তার দৃষ্টিশক্তি বুঝি ক্ষীণ, কিন্তু আসলে তা নয়। লিউবচ্‌কা সহজেই হেসে ওঠে, এবং অনেক সময়ই আনন্দ প্রকাশ করতে দুই হাত দুলিয়ে ঘরময় ছুটতে থাকে। অন্যদিকে কাতেংকা যখন হাসে হাত বা রুমাল দিয়ে মুখটা ঢেকে নেয়। লিউবচ্‌কা সোজা হয়ে বসে এবং হাঁটবার সময় হাত দুটিকে দুই পাশে ঝুলিয়ে রাখে; কাতেংকা মাথাটাকে একপাশে হেলিয়ে দুই হাত এক করে হাঁটে। লিউবচ্‌কা ভালবাসে মাথা আঁকতে, আর কাতেংকা আঁকে শুধু ফুল ও প্রজাপতি।

লিউবচ্‌কা চমৎকার বাজায় ফিল্ড-এর কনসার্টো, আর বীঠোভেন-এর কিছু সোনাতা। কাতেংকা নানা সুর ও ওয়াল্‌জ্‌ বাজায়, সুরের রেশ অনেকক্ষণ রাখে, রীডে খুব জোরে ঘা দেয়, আর পাদানিটা অনবরত চালায়।

আমার তখন মনে হত কাতেংকা অনেকটাই একজন প্রাপ্তবয়স্কার মত, আর তাই তাকেই আমার বেশী ভাল লাগত।

অধ্যায়—২২
বাপি

ভলদিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার পর থেকেই বাপি অনেক বেশী হাসি-খুশি হয়েছে; আগের চাইতে অনেক বেশীদিন সে দিদিমার সঙ্গে ডিনারে বসে। অবশ্য নিকলাইর কাছে শুনেছি যে সম্প্রতি অনেক টাকার বাজি জেতাই তার এই খুশির কারণ। ক্লাবে যাবার আগে সন্ধ্যাবেলা বাপি মাঝে মাঝে আমাদের দেখতে আসে, আমাদের চারদিকে নিয়ে পিয়ানোতে বসে, জিপ্‌সিদের গান গায়, আর নরম জুতো ঠুকে তাল দেয়। কখনও বা স্কুল-ঘরে এসে মুখ শক্ত করে আমার পড়া শোনে; কিন্তু মাঝে মাঝে আমার ভুল শুধ্‌রে দেবার জন্য যেসব কথা বলে তা থেকেই আমি বুঝতে পারি যে আমার পড়ার বিষয়ে বাপিও বিশেষ কিছু জানে না। অনেক সময় দিদিমা যখন অকারণে রেগে গিয়ে হৈ-চৈ শুরু করে দেয় তখন বাপি লুকিয়ে চোখ টিপে আমাদের ইসারা করে। মোট কথা, শৈশব কল্পনায় তাকে যে দুরধিগম্য উচ্চাসনে বসিয়েছিলাম আমার চোখে সেখান থেকে সে অনেকটা নেমে এসেছে। এখনও সেই একই সত্যিকারের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সঙ্গেই তার মস্ত বড় সাদা হাতে আমি চুমো খাই; কিন্তু এখন আমি তার কথা চিন্তা করি, তার কাজের বিচার করি, আর এমন সব চিন্তা মনে আসে যাতে আমি ভয় পাই। যে ঘটনাটি এই রকম অনেক চিন্তা আমার মনে জাগিয়েছিল এবং অনেক নৈতিক দুঃখ আমাকে দিয়েছিল তার কথা আমি কোনদিন ভুলব না।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ভলদিয়াকে একটা বল-নাচে নিয়ে যাবার জন্য বাপি ঘরে ঢুকল; তার পরনে কালো ড্রেস-কোট ও সাদা ওয়েস্ট-কোট। ভলদিয়া গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে যাবে বলে দিদিমা তার শোবার ঘরে অপেক্ষা করে আছে। মিমি ও কাতেংকা হল-ঘরে পায়চারি করছে। ঘরে একটিমাত্র মোমবাতি জ্বলছে। লিউবচ্‌কা পিয়ানোয় বসে মামণির প্রিয় সুর ফিল্ড-এর দ্বিতীয় কনসার্টো শিখছে।

আমার বোন ও মায়ের মধ্যে যে গভীর সাদৃশ্য দেখেছি এমনটি আর কোথাও দেখি নি। সে সাদৃশ্য মুখের বা গঠন-ভঙ্গীর নয়, আরও অনেক বেশী সূক্ষ্ম—হাতে, হাঁটা-চলায়, কণ্ঠস্বরে, এবং কতকগুলি বাক-বিন্যাসে। লিউবচ্‌কা যখন রেগে গিয়ে বলে, "সারা জীবনেও এটা করতে দেওয়া হবে না," তখন "সারা জীবনেও" কথাটা কেশে এমনভাবে উচ্চারণ করে যে মনে হয় বুঝি মামণির গলায়ই শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু সে সাদৃশ্য আরও বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন সে পিয়ানো বাজায়; বসবার সময় সেই একই ভঙ্গীতে পোশাকটা ঠিক করে নেয়, বাঁ হাত দিয়ে উপরের দিক থেকে পাতাটা ওল্টায়, ঠিকমত বাজাতে না পারলে বিরক্ত হয়ে রীডের উপর আঘাত করে আর বলে ওঠে, "আঃ, আমার ঈশ্বর!"

ছোট ছোট পা ফেলে বাপি ঘরে ঢুকে লিউবচ্‌কার দিকে এগিয়ে যেতেই সে বাজনা বন্ধ করল।

তাঁকে আবার বসিয়ে দিয়ে বাপি বলল, "না, বাজিয়ে যাও লিউবা। বাজিয়ে যাও। তুমি তো জান, তোমার বাজনা শুনতে আমি কত ভালবাসি।"

লিউবচ্‌কা বাজাতে লাগল; হাতের উপর মাথা রেখে বাপি অনেকক্ষণ তার উল্টো দিকে বসে রইল; হঠাৎ ঘাড়টা বেঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর পায়চারি করতে লাগল। যতবার পিয়ানোর কাছে যায় ততবারই থেমে লিউবচ্‌কার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তার ভাবভঙ্গী ও হাঁটাচলা দেখেই বুঝতে পারলাম ভিতরে ভিতরে বাপি খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বার কয়েক পায়চারি করে সে লিউবচ্‌কার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। তার কালো চুলে চুমো খেল, তারপর আবার পায়চারি শুরু করল। বাজনা শেষ করে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে লিউবচ্‌কা শুধাল: "তোমার ভাল লেগেছে?" বাপি কোন কথা না বলে নিঃশব্দে দুই হাতে তার মাথাটা চেপে ধরে এমন গভীর মমতায় তার ভুরু ও চোখে চুমো খেতে লাগল যে রকম ব্যবহার করতে তাকে আর কখনও দেখি নি।

অবাক হয়ে বাপির মুখের দিকে তাকিয়ে লিউবচ্‌কা বলল, "সে কি! তুমি কাঁদছ! আমাকে ক্ষমা কর বাপি-সোনা; আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে এটা মামণির প্রিয় সুর।"

আবেগকম্পিত গলায় বাপি বলল, "না, সোনা, এটা বাজিয়ো, মাঝে-মাঝেই বাজিয়ো। তোমার সঙ্গে কাঁদতে যে আমার কত ভাল লাগে তা যদি জানতে!"

তাকে আর একবার চুমো খেয়ে মনের আবেগকে চেপে রাখার চেষ্টায় ঘাড়টা ঘোরাতে ঘোরাতে বাপি বারান্দায় যাবার দরজা দিয়ে বেরিয়ে ভলদিয়ার ঘরের দিকে চলে গেল।

অর্ধেক বারান্দা পার হয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, "ওয়াল্ডেমার, তোমার তৈরি

হতে কত দেরী?” ঠিক সেই সময় দাসী মাশা সেখান দিয়ে যাবার সময় মনিবকে দেখে চোখ নামিয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করল। বাপি তাকে থামাল; তার উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, “সত্যি, তুমি দিন দিন-দিন আরও সুন্দরী হচ্ছ।”

মাশা লাল হয়ে মাথাটা আরও নুইয়ে অভিবাদন করল। চাপা স্বরে বলল, “অনুমতি করুন।”

কাশতে কাশতে বাপি আবার হাঁক দিল, “ওয়াল্ডেমার, তোমার হল?” মাশা চলে গেল। বাপি আমাকে দেখতে পেল।

বাবাকে আমি ভালবাসি; কিন্তু মানুষের মন হৃদয়ের অনুশাসন মানে না; অনেক সময় এমন সব চিন্তা সেখানে ঠাঁই পায় যা তার ভালবাসার পক্ষে অপমানকর, যা দুর্বোধ্য ও কঠোর। সে চিন্তাকে মন থেকে তাড়াবার যত চেষ্টাই করি না কেন, তা বার বার মনের মধ্যে ফিরে আসতে থাকে।

অধ্যায়—২৩
দিদিমা

দিদিমা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে; তার ঘণ্টা, গাশার গজর গজর, আর দরজা বন্ধ করার শব্দ ক্রমেই ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে। দিদিমা এখন আর লাইব্রেরিতে আরাম-কেদারাটায় শুয়ে আমাদের ডাকে না তার কাছে; শোবার ঘরে উঁচু বিছানায় লেস-লাগানো বালিশে মাথা রেখে সে আমাদের সঙ্গে কথা বলে। যখনই তাকে শুভেচ্ছা জানাই তখনই তার হাতে একটা হল্‌দেটে চকচকে ফোলা ভাব চোখে পড়ে, আর ঘরে ঢুকলেই নাকে আসে সেই আপত্তিকর গন্ধ যা পাঁচ বছর আগে মামণির ঘরে ঢুকলে নাকে আসত। দিনে তিনবার ডাক্তার আসে, আর বারকয়েক সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে। কিন্তু তার চরিত্র, বাড়ির সকলের প্রতি তার উদ্ধত, জাঁকজমকপূর্ণ আচরণ, বিশেষ করে বাপির প্রতি আচরণের তিলমাত্র পরিবর্তন ঘটে নি; এখনও দিদিমা টেনে টেনে কথা বলে, ভুরু তুলে তাকায় এবং একইভাবে “সোনা” বলে ডাকে।

তারপর দিন কয়েক আমাদের তার কাছে যেতে দেওয়া হল না; একদিন সকালে সেণ্ট জেরোম বললেন, পড়ার সময়টাতে আমি যেন লিউবচ্‌কা ও কাতেংকাকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি। স্লেজে উঠবার সময় যদিও লক্ষ্য করলাম যে দিদিমার জানালার সামনে রাস্তায় খড় বিছানো রয়েছে এবং নীল ওভারকোট-পরা কয়েকটি লোক আমাদের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, তবু এমন অসময়ে কেন যে আমাদের বেড়াতে পাঠানো হচ্ছে সেটা

আমি বুঝতে পারলাম না। কোন কারণে লিউবচ্‌কা ও আমার মন-মেজাজ এতই ভাল ছিল যে সব কিছুতেই আমাদের হাসি পাচ্ছিল।

একজন ফেরিওয়ালা বাক্স নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে; তাকে দেখে আমাদের হাসি পেল। একজন কোচয়ান লাগাম তুলিয়ে জোর কদমে এসে আমাদের স্লেজটাকে ধরে ফেলল; অমনি আমরা হো-হো করে হেসে উঠলাম। ফিলিপের লাগামটা স্লেজে আটকে গেল; সে মুখ ঘুরিয়ে বলে উঠল, "যত সব!" আর আমাদের হাসতে হাসতে মরবার দশা। একটু শান্ত হতে না হতেই আমি লিউবচ্‌কার দিকে তাকালাম, আর এমন একটা রহস্যময় শব্দ উচ্চারণ করলাম যেটা কয়েকদিন যাবৎ আমাদের মধ্যে খুব চালু হয়ে উঠেছিল, আর যেটা বললেই আমাদের হাসি পেত; আবার আমরা হো-হো করে হেসে উঠলাম।

বাইরের দরজায় গাড়িটা থামাবার ঠিক আগেই আমি লিউবচ্‌কাকে লক্ষ্য করে একটা সুন্দর মুখভঙ্গী করতে যাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ দরজার গায়ে ঠেস দেওয়া শবাধারের কালো ঢাকনাটা নজরে পড়তেই চমকে উঠলাম; মুখের ভঙ্গীটা মুখেই জমাট বেঁধে গেল।

বিবর্ণ মুখে বেরিয়ে এসে সেণ্ট জেরোম বললেন, **Votre grande mere est mortel.** (তোমাদের দিদিমা মারা গেছেন!)

যতক্ষণ দিদিমার মৃতদেহটা বাড়িতে থাকল ততক্ষণই একটা মৃত্যুভয় আমার বুকের উপর চেপে বসে রইল, যেন মৃতদেহটা জীবিতই আছে; সেটা আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে আমাকেও একদিন মরতে হবেই। যদিও শোকার্ত অতিথিতে বাড়িটা ভরে উঠল, তবু দিদিমার জন্য আমার দুঃখ হল না; আমার মনে হল, একটিমাত্র মানুষ ছাড়া এখানে আর কারও দুঃখই আন্তরিক নয়; সেই মানুষটির তীব্র শোক আমাকে খুব অবাক করে দিল। সে আমাদের দাসী গাশা। সে চিলে-কোঠায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল, অনবরত কাঁদতে লাগল, নিজেকে শাপান্ত করল, চুল ছিঁড়ল, কোনরকম সান্ত্বনা মানল না—কেবলই বলতে লাগল, তার কর্ত্রীঠাকরুণ মারা গেলেন, এবার সে নিজে মরতে পারলেই বাঁচে।

আমি আবার বলছি, অনুভূতির ক্ষেত্রে অসম্ভবতাই আন্তরিকতার সব চাইতে নির্ভরযোগ্য লক্ষণ।

দিদিমা আর আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু বাড়িতে তার স্মৃতি-চারণা, তার কথা নিয়ে আলোচনা চলতেই থাকল। বিশেষ রকমের আলোচনা চলল তার উইলকে কেন্দ্র করে; মরবার আগেই দিদিমা উইল করে গেছে, কিন্তু উইলের অছি প্রিন্স আইভান আইভানিচ ছাড়া আর কেউই সে উইলে কি লেখা আছে তা জানে না। দিদিমার লোকজনদের মধ্যে খুব উত্তেজনা লক্ষ্য করলাম; কে যে কার সম্পত্তি হবে তাই নিয়ে নানা মন্তব্য

প্রায়ই কানে আসতে লাগল; আর একথাও স্বীকার করছি যে আমরাও উত্তরাধিকারসূত্রে কিছু পাব সেকথা ভেবে আমিও সেদিন খুশি না হয়ে পারি নি।

ছ'সপ্তাহ পরে আমাদের বাড়ির দৈনিক সংবাদপত্রস্বরূপ নিকলাই আমাকে খবর দিল যে দিদিমা তার সব সম্পত্তি লিউবচ্‌কাকে দিয়ে গেছে, এবং তার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তার অভিভাবক হিসাবে কাজ করবেন প্রিন্স আইভান আইভানিচ, বাপি নয়।

অধ্যায়—২৪

আমি

আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার আর মাত্র কয়েক মাস বাকি আছে। ভালভাবে পড়াশোনা করছি। এখন আর শিক্ষকদের অপেক্ষায় ভয়ে ভয়ে তো থাকিই না, বরং পড়াশুনায় বেশ একটা সুখ অনুভব করি।

যে পড়াটা ভালভাবে শিখেছি সেটাকে আবৃত্তি করতে ভাল লাগে। আমি গণিত বিভাগের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি; সত্যি কথা বলতে কি, গণিত-শাস্ত্রের কতকগুলি শব্দ অসাধারণ ভাল লাগার জন্যই আমি এ বিভাগটা বেছে নিয়েছি।

আমি ভলদিয়ার চাইতে অনেক বেঁটে; কিন্তু আমার কাঁধ চওড়া ও মাংসল। নাদুস-নুদুস শরীর নিয়েই আমার যত ভাবনা। তবে আমার একটা সান্ত্বনা: একসময় বাপি বলেছিল আমার দেহটা সুঠাম; তার সে কথা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি।

সেণ্ট জেরোম আমাকে নিয়ে সন্তুষ্ট; আমিও আর তাকে ঘৃণা করি না; বস্তুত, মাঝে মাঝে তিনি যখন বলেন যে আমার ক্ষমতা ও আমার বুদ্ধি নিয়ে আমি যদি এটা বা ওটা না করি তো সেটা লজ্জার কথা, তখন মনে হয় আমি হয় তো তাকে পছন্দই করি।

দাসীদের ঘরের উপর নজর রাখা অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। এখন দরজার পাশে লুকিয়ে থাকতে আমার লজ্জা করে; তাছাড়া আমি স্বীকার করছি, মাশা যে ভাসিলিকে ভালবাসে এই প্রত্যয়ই আমাকে অনেকটা শান্ত করেছে। ভাসিলির অনুরোধে আমিই বাপির কাছ থেকে তার বিয়ের অনুমতি এনে দিয়েছিলাম; আর তাদের বিয়ের পর থেকেই আমার সেই বাজে নেশাটা কেটে গেছে।

নববিবাহিত দম্পতি যখন বাপিকে ধন্যবাদ জানাতে থালায় করে মিষ্টি নিয়ে আসে, আর নীল ফিতে বসানো টুপি পরে মাশা আমাদের প্রত্যেকের

কাঁধে চুমো খায়, কোন না কোন কারণে সকলকে ধন্যবাদ দেয়, তখন আমার মনে পড়ে শুধু পমেড-মাখা চুলের কথা, আর কোন আবেগ মনে সঞ্চারিত হয় না।

মোটামুটিভাবে, বালকসুলভ ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকে আমি ক্রমে ক্রমে কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছি; অবশ্য প্রধান ত্রুটিটি বাদে; সেটা এখনও আমার জীবনে অনেক ক্ষতি ডেকে আনবে—আমার দর্শনমনস্কতা।

অধ্যায়—২৫

ভলদিয়ার বন্ধুরা

যদিও ভলদিয়ার বন্ধুমহলে আমার যে ভূমিকা তাতে আমার অহংকারে ঘা লাগে, তবু তার বন্ধুরা এলে তার ঘরে বসে নিঃশব্দে তাদের কাজকর্ম দেখতে আমার ভাল লাগে।

ভলদিয়ার যেসব অতিথি প্রায়ই আসে তাদের মধ্যে একজন এড-ডি-কং, নাম দুব্‌কভ্‌, আর একজন ছাত্র, নাম প্রিন্স নেখ্‌লুদভ। দুব্‌কভ্‌, ছোটখাট, পেশীবহুল মানুষ, গায়ের রং ঘোর, প্রথম যৌবন পেরিয়ে এসেছে; পা দুটি ছোট হলেও দেখতে খারাপ নয়, সর্বদাই হাসি-খুশি। যে মানুষ অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও মনের মত হয় সেও তাদেরই একজন। তাছাড়া, ভলদিয়া ও আমার দিক থেকে দুব্‌কভের মধ্যে দুটো স্বতন্ত্র আকর্ষণ আছে—একটা তার সৈনিকোচিত চেহারা, আর সব চাইতে বড় কথা, তার সেই বয়স যা যুবকদের চোখে স্বভাবতই শ্রদ্ধার সঙ্গে যুক্ত—যাকে বলা হয় **Comme il fant**—যাকে আমাদের বয়সের লোকরা খুব মূল্য দেয়। সত্যি, দুব্‌কভ সেই জাতের মানুষ যাকে বলা হয় **Comme il fant.**

নেখ্‌লুদভ সুদর্শন নয়: ছোট ধূসর চোখ, ঠেলে-ওঠা কপাল, অনুপাতহীন লম্বা হাত-পা—সব মিলিয়ে তাকে সুন্দর বলা চলে না। তার মধ্যে যেটুকু সুন্দর তা হল তার অসাধারণ দীর্ঘ দেহ, মুখের নম্র রং এবং ভারি সুন্দর দাঁত। কিন্তু তার মুখে এমন একটা মৌলিকতা ও কর্মোদ্যমের ছাপ আছে যা দেখে মোহিত না হয়ে থাকা যায় না।

লোকটি অতিমাত্রায় লাজুক, কারণ যে কোন তুচ্ছ ব্যাপারেই তার কান পর্যন্ত লাল হয়ে ওঠে, কিন্তু তার লাজুকতা আমার মত নয়। যত লাল হয় তত তার মুখে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে। মনে হয় নিজের এই দুর্বলতাকে নিয়ে সে ক্রুদ্ধ।

যদিও দেখে মনে হয় দুব্‌কভ্‌ ও ভলদিয়ার প্রতি তার আচরণ খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ, তবু একথাও ঠিক যে ঘটনাচক্রেই তাদের মিলন ঘটেছে। তাদের

স্বভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভলদিয়া ও দুব্‌কভ্‌ গুরুতর আলোচনা ও অনুভূতিকে বড়ই ভয় পায়; কিন্তু নেখ্‌ল্যুদভ অত্যন্ত উদ্যমী স্বভাবের মানুষ; প্রায়ই সে সবরকম ঠাট্টা-বিদ্রূপকে অগ্রাহ্য করে দার্শনিক আলোচনার মধ্যে ডুবে যায়। ভলদিয়া ও দুব্‌কভ তাদের ভালবাসার কথা বলতে ভালবাসে (হঠাৎই তারা বেশ কয়েকজনের প্রেমে পড়তে পারে, এবং দুজন একই মানুষের প্রেমেও পড়তে পারে); অন্যদিকে, তারা যদি কখনও ইঙ্গিতেও একটি লাল-চুলওয়ালার সঙ্গে তার প্রেমের কথা উল্লেখ করে তাহলে নেখ্‌ল্যুদভ ভীষণ রেগে যায়।

কি কথাবার্তায়, কি চেহারায়, প্রিন্স নেখ্‌ল্যুদভ প্রথম থেকেই আমার মনকে টানল। যদিও তার ও আমার মধ্যে স্বভাবের অনেক মিল আছে, তবু প্রথম দর্শনে তার সম্পর্কে আমার মনে যে ভাবের উদয় হল সেটা মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়।

তার দ্রুত দৃষ্টিপাত, তার দৃঢ় কণ্ঠস্বর, তার উদ্ধত চাউনি, আর বিশেষ করে আমার প্রতি তার একান্ত উদাসীনতা—এর কিছুই আমার ভাল লাগে নি। আলোচনা প্রসঙ্গে প্রায়ই আমার মনে তীব্র বাসনা জাগত তার কথার প্রতিবাদ করি, তার গর্বকে আঘাত করবার জন্য তার উপর এক হাত নেই, তাকে বুঝিয়ে দেই যে তার উপেক্ষা সত্ত্বেও আমি যথেষ্ট বুদ্ধির অধিকারী। কিন্তু আমার লজ্জাই আমাকে বাধা দিত।

অধ্যায়—২৬

আলোচনা

সন্ধ্যাবেলার লেখাপড়া শেষ করে যথারীতি ভলদিয়ার ঘরে গিয়ে দেখি, ডিভানে পা রেখে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে শুয়ে সে একটা ফরাসী উপন্যাস পড়ছে। এক সেকেণ্ড আমার দিকে তাকিয়ে আবার পড়ায় মন দিল। কাজটা এমন কিছু নয়, কিন্তু তাতেই আমার মুখটা লাল হয়ে উঠল। আমিও টেবিলের কাছে গিয়ে একটা বই তুলে নিলাম; কিন্তু পড়ায় মন দেবার আগেই আমার মনে হল, সারাটা দিন দুজনের দেখা হয় নি, অথচ এখন দেখা হবার পরেও যদি আমরা কোন কথা না বলি তো ব্যাপারটা বড়ই হাস্যকর হবে।

"আজ সন্ধ্যায় কি তুমি বাড়িতেই থাকবে?"

"জানি না। কেন?"

"আমি ভাবছিলাম," এইটুকু বলে যখন বুঝতে পারলাম আমার দ্বারা কোন আলোচনার সূত্রপাত করা হবে না, তখন বইটা নিয়ে পড়তে শুরু করলাম।

আশ্চর্যের কথা এই যে ভলদিয়া ও আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দে কাটিয়ে দিতে পারি, কিন্তু কোন তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত হলেই সে কিছু বলুক আর নাই বলুক সঙ্গে সঙ্গে জমাট আলোচনা শুরু হয়ে যায়। বুঝলাম, আমাদের দুজনের পরিচয় বড় বেশী ঘনিষ্ঠ; আর যেমন স্বল্প-পরিচয় তেমনই অতি-পরিচয়ও প্রকৃত ঘনিষ্ঠতার পথে বাধাস্বরূপ।

"ভলদিয়া বাড়ি আছ?" বারান্দায় দুব্‌কভের গলা শোনা গেল।

পা নামিয়ে বইটা টেবিলে রেখে ভলদিয়া বলল, "আছি।"

হ্যাট-কোট পরে দুব্‌কভ ও নেখ্‌লয়ুদভ ঘরে ঢুকল।

"থিয়েটারে যাচ্ছ তো?"

"না, সময় নেই," ভলদিয়া লাল হয়ে বলল।

"কী যে বল! দয়া করে চল।"

"তাছাড়া, আমার তো টিকিটও নেই।"

"টিকিট যত চাও তত পাওয়া যাবে।"

"অপেক্ষা কর, আমি এখনই আসছি," বলে ভলদিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি জানি, থিয়েটারে যাবার ইচ্ছা ভলদিয়ার ষোল আনা, কিন্তু হাতে টাকা নেই বলেই আপত্তি করছে। এখন গেল খানসামার কাছ থেকে পাঁচ রুবল ধার করতে।

আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দুব্‌কভ বলল, "কেমন আছ কূটনীতিক?"

ভলদিয়ার বন্ধুরা আমাকে কূটনীতিক বলে ডাকে, কারণ একদিন ডিনারের পরে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে দিদিমা বলেছিল, ভলদিয়া হবে সৈনিক, আর আমাকে সে কূটনীতিকরূপেই দেখতে চায়।

নেখ্‌লয়ুদভ শুধাল, "ভলদিয়া কোথায় গেল?"

ওরা হয় তো ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছে এই কথা ভেবে লজ্জায় লাল হয়ে জবাব দিলাম, "জানি না।"

"মনে হচ্ছে ওর হাতে টাকা নেই, কি বল কূটনীতিক? আরে, টাকা তো আমারও নেই। তোমার আছে দুব্‌কভ?"

"দেখা যাক," বলে দুব্‌কভ থলিটা বের করে আঙুলে গুণতে গুণতে বলল, "এই পাঁচ-কোপেক, আর এই একটা বিশ-কোপেক—ফুঃ!" সে হাতের একটা হাস্যকর মুদ্রা করল।

সেই সময় ভলদিয়া ঘরে ঢুকল।

"আচ্ছা, তাহলে যাওয়া যাক?"

"না।"

নেখ্‌লয়ুদভ বলল, "তুমি তো আচ্ছা বেরসিক লোক হে! কেন বলছ না যে তোমার টাকা নেই? যদি চাও তো আমার টিকিটটাই নাও।"

"আর তুমি ?"

"ওর ভাইয়ের বক্সেই ও যেতে পারবে," ভুব্‌কভ বলল।

"না, আমি মোটেই যাচ্ছি না।"

"কেন ?"

"কারণ, তুমি তো যান, বক্সে বসতে আমার ভাল লাগে না।"

"কেন ?"

"আমার ভাল লাগে না ; কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়।"

"আবার সেই পুরনো কথা ! সকলে তোমাকে পেলে খুশি হয়, আর তোমার যে কেন অস্বস্তি বোধ হয় তাতো বুঝতে পারি না। এ যে অবাস্তব কথা ভাই।"

"আমার স্বভাবটাই যদি লাজুক হয় তার আমি কি করতে পারি ? আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে তুমি জীবনে কখনও লজ্জায় লাল হও নি, কিন্তু যে কোন তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েই আমি লজ্জা পাই," কথাটা বলতে বলতেই তার মুখ লাল হয়ে উঠল।

ভুব্‌কভ মাতব্বরী চালে বলল, "তোমার এই অতিলাজুকতার কারণ জান কি ? অতিরিক্ত অহংকারই এর কারণ হে বাপু।"

নেখ্‌লয়ুদভ আহতস্বরে বলল, "অতিরিক্ত অহংকারই বটে। বরং আমার মধ্যে তিলমাত্র অহংকার নেই বলেই এটা ঘটে। আমার সব সময় মনে হয় আমি অপ্রীতিকর, বিরক্তিকর।"

কাঁধে হাত রেখে কোটটা টেনে খুলে ভুব্‌কভ বলল, "ভলদিয়া, তৈরি হয়ে নাও। ইগ্‌নাত, তোমার মনিবকে তৈরি করে দাও।"

"প্রায়ই হয় কি—" নেখ্‌লয়ুদভ বলতে শুরু করল।

কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে ভুব্‌কভ সুর ভাঁজতে লাগল, "ট্রা-লা-লা-লা।"

নেখ্‌লয়ুদভ বলল, "এভাবে এড়িয়ে গেলে চলবে না। আমি প্রমাণ করে দেব যে লাজুকতা আত্মপ্রীতি থেকে আসে না।"

"আমাদের সঙ্গে এলেই সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে।"

"বলে দিয়েছি তো, আমি যাচ্ছি না।"

"বেশ, তাহলে থেকে যাও। আর কূটনীতিকের কাছে কথাটা প্রমাণ কর ; ফিরে এসে আমরা তার কাছ থেকেই শুনব।"

"আমিও বলতে পারব," শিশুর মত একগুঁয়েভাবে নেখ্‌লয়ুদভ বলল। 'এখন জলদি যাও, আর জলদি ফিরে এস।'

আমার পাশে বসে শুধাল, "তুমি কি মনে কর ? আমি কি অহংকারী ?"

এ বিষয়ে একটা মতামত থাকলেও এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে আমি এতই হকচকিয়ে গেলাম যে জবাব দিতে বেশ কিছুটা সময় লাগল।

"হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি," আমি বললাম ; আমারও যে বুদ্ধিশুদ্ধি

আছে সেটা প্রমাণ করবার সময় যে এসেছে এটা ভেবে আমার গলা কেঁপে গেল, মুখ লাল হয়ে উঠল— "আমি মনে করি, সব মানুষই অহংকারের বশেই করে।"

"তোমার মতে অহংকারটা কি?" নেখ্‌ল্যুদভ বলল; আমার মনে হল, তার হাসির সঙ্গে কিছুটা ঘৃণা মিশে আছে।

বললাম, "অহংকার হচ্ছে এই প্রত্যয় যে আমি অন্য সকলের চাইতে বেশী ভাল ও বিজ্ঞতর।"

"কিন্তু প্রত্যেকেরই এ প্রত্যয় থাকবে কেমন করে?"

"এটা ঠিক কি না আমি জানি না, কিন্তু এ কথা কেউ স্বীকার করে না; এখন, আমার দৃঢ় প্রত্যয় যে জগতের অন্য যে কোন লোকের চাইতে আমি বিজ্ঞতর, আর আমি ঠিক জানি যে তোমারও সেই একই প্রত্যয়।"

"না; অন্তত নিজের কথা আমি বলতে পারি যে এমন লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে যাকে আমার চাইতে বিজ্ঞতর বলে মনে করি।"

"অসম্ভব," আমি দৃঢ়স্বরে বললাম।

আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, "তুমি কি সত্যি তাই মনে কর?"

তখনই একটা কথা আমার মনে এল, আর সেটাই আমি ব্যক্ত করলাম।

"তোমার কাছে সেটাই প্রমাণ করব। কেন আমরা অন্যের চাইতে নিজেকে বেশী ভালবাসি? কারণ আমরা নিজেকে অন্যের চাইতে ভাল এবং ভালবাসার অধিকতর যোগ্য বলে মনে করি। অন্যকে যদি নিজের চাইতে ভাল মনে করতাম তাহলে তো তাদেরই বেশী ভালবাসতাম, কিন্তু সেটা কখনই ঘটে না। আর যদি ঘটেও তাহলেও আমার কথাই ঠিক।" আমি আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলাম।

নেখ্‌ল্যুদভ একমুহূর্ত চুপ করে রইল।

"আমি কখনও ভাবতেই পারি নি যে তুমি এত বুদ্ধিমান!" এমন মিষ্টি, ভালমানুষী হাসি হেসে সে কথাটা বলল যে হঠাৎ আমি খুব খুশি হয়ে উঠলাম।

শুধু অনুভূতির উপর নয়, মানুষের মনের উপরেও প্রশংসা এত প্রবলভাবে কাজ করে যে, আমার মনে হল; তার মধুর প্রভাবে আমি যেন আরও বেশী বুদ্ধিমান হয়ে উঠলাম, অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একটার পর একটা নতুন ধারণা আমার মনে গড়ে উঠতে লাগল। নিজেদের অজ্ঞাতেই আমরা অহংকার থেকে ভালবাসায় চলে গেলাম; আর সে পথে তো আলোচনার কোন শেষ নেই। আমাদের বিচারগুলি এতই অস্পষ্ট ও একপেশে যে কোন অনাগ্রহী যে কোন শ্রোতার কাছেই সেগুলি একেবারেই অর্থহীন বলে মনে হতে পারে; কিন্তু আমাদের কাছে তাদের তাৎপর্য অত্যন্ত গগনস্পর্শী। দুজনের মনের সুর তখন এতই একতালে বাঁধা হয়েছে যে একজনের একটি তন্ত্রীতে

সামান্যমাত্র ছোঁয়া লাগলেই অপরের তন্ত্রীতে বেজে উঠছে তার প্রতিধ্বনি। আলোচনাপ্রসঙ্গে মনের বিভিন্ন তন্ত্রীর এই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি দুজনকেই খুশিতে ভরে তুলল। মনে হল, দুজনের মনের যে সব চিন্তাভাবনা প্রকাশের ভাষা খুঁজছে তাকে প্রকাশ করবার মত সময় ও বাণী দুইয়েরই একান্ত অভাব।

অধ্যায়—২৭
সৌহার্দ্যের সূচনা

সেই সময় থেকেই আমার ও দিমিত্রি নেখ্‌ল্যুদভের মধ্যে একটা বিচিত্র অথচ পরম প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠল। অপরিচিত লোকজনের সামনে সে আমার প্রতি বড় একটা নজর দেয় না; কিন্তু দুজনে একলা হলেই কোন নির্জন কোণে বসে আমরা আলোচনা শুরু করি; তখন সময় ও চারদিককার সবকিছুই ভুলে যাই।

পরকাল, শিল্প-কলা, সরকারী চাকরি, বিয়ে, শিশু-শিক্ষা—সব কিছু নিয়েই আমরা আলোচনা করি। আমরা যে ভয়ংকর রকমের সব বাজে কথা বলে চলেছি সেটা আমাদের মনেই হয় না। মনে হয় না তার কারণ, আমাদের কথাগুলি অর্থহীন হলেও জ্ঞানের কথা, সুন্দর কথা, আর যৌবনকালে জ্ঞানকে সকলেই মূল্য দেয়, বিশ্বাস করে। যৌবনে আত্মার সব শক্তি ভবিষ্যতের লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়; এবং আশার প্রভাবে ভবিষ্যৎ তখন এতই বিচিত্র, সুস্পষ্ট ও মোহময় রূপে দেখা দেয় যে ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্ন ও মনকে সত্যিকার আনন্দে ভরে তোলে।

একদা কার্নিভালের সময় নেখ্‌ল্যুদভ নানা আমোদ-প্রমোদে এতই মত্ত হয়ে ছিল যে দিনের মধ্যে বেশ কয়েক বার বাড়িতে এলেও সে আমার সঙ্গে একটি কথাও বলে নি; এতে আমি এতই অসন্তুষ্ট হলাম যে আবার আমার মনে হল যে লোকটি উদ্ধত ও অপ্রীতিকর। তার সঙ্গকে আমি যে কোন মূল্য দেই না, তার প্রতি যে আমার বিশেষ কোন ভালবাসা নেই, এ কথাটা তাকে বুঝিয়ে দেবার একটা সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে রইলাম।

কার্নিভাল শেষ হয়ে গেলে প্রথম যেদিন সে আমার সঙ্গে কথা বলতে এল সেই দিনই তাকে বললাম যে আমাকে এখন লেখাপড়া করতে হবে, আর তখনই উপরে উঠে গেলাম; কিন্তু পনেরো মিনিট পরেই কে যেন স্কুল-ঘরের দরজাটা খুলল; ঘরে ঢুকল নেখ্‌ল্যুদভ।

"তোমাকে বিরক্ত করলাম কি?" সে শুধাল।

আমি খুব ব্যস্ত আছি বলার ইচ্ছা থাকলেও মুখে বললাম, "না।"

"তাহলে তুমি ভলদিয়ার ঘর ছেড়ে চলে এলে কেন? অনেক দিন দুজনে

কথাবার্তা বলি নি। আর তাতে এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে মনে হচ্ছে কি যেন হারিয়ে গেছে।"

মুহূর্তের মধ্যে আমার সব বিরক্তি দূর হয়ে গেল; আমার চোখে দিমিত্রি আবার সেই সদয়, মনোরম মানুষটি হয়ে দেখা দিল।

"কেন চলে এলাম তা হয় তো তুমি জান," আমি বললাম।

আমার পাশে বসে সে জবাব দিল, "হয় তো জানি। সেটা অনুমান করতে পারলেও মুখে বলতে পারব না, কিন্তু তুমি পারবে।"

"আমিই বলছি: চলে এসেছিলাম কারণ তোমার উপর রাগ করেছিলাম—ঠিক রাগ নয়, বিরক্তি। খোলাখুলিই বলছি, আমার সবসময় ভয় হয় যে আমার বয়স এত অল্প বলে তুমি আমাকে তাচ্ছিল্য করবে।"

আমার কথায় অর্থপূর্ণ হাসি হেসে সে বলল, "তোমার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হয়েছি কেন তা কি তুমি জান? যাদের সঙ্গে আমার অনেক বেশী পরিচয়, যাদের সঙ্গে আমার অনেক বেশী মিল, তাদের চাইতে তোমাকে কেন বেশী ভালবাসি, তা জান কি? সেটা এইমাত্র বুঝেছি। একটা আশ্চর্য বিরল গুণ তোমার আছে—অকপটতা।"

আমি স্বীকার করলাম, "ঠিক; যা স্বীকার করতে লজ্জা হয় ঠিক সেই কথাগুলিই আমি বলে ফেলি; কিন্তু শুধু তাদেরই বলি যাদের আমি বিশ্বাস করি।"

"ঠিক কথা; কিন্তু কোন মানুষকে বিশ্বাস করতে হলে আগে তার সত্যিকারের বন্ধু হতে হয়, কিন্তু নিকলাস, আমরা তো এখনও বন্ধু হই নি। তোমার মনে পড়ে, বন্ধুত্ব নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি; প্রকৃত বন্ধু হতে হলে পরস্পরকে বিশ্বাস করা প্রয়োজন।"

আমি বললাম, "এই বিশ্বাস রাখা যে আমি তোমাকে যা বলব তা তুমি অন্য কাউকে বলবে না। কিন্তু যে চিন্তা-ভাবনার কথা কোনক্রমেই আমরা পরস্পরকে বলব না সেটাই তো সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক।"

সে বলে উঠল, "আর কী ঘৃণ্য সে চিন্তা! যদি জানা থাকত সে চিন্তার কথা কোনদিন স্বীকার করতে আমরা বাধ্য হব, তাহলে সে চিন্তাকে মনে আনতেও সাহস করতাম না।"

চেয়ার থেকে উঠে দুই হাত ঘসতে ঘসতে সে হেসে আরও বলল, "তুমি কি জান নিকলাস, আজ আমার কি হয়েছে? এস, সেই কাজটি করা যাক, তাহলেই দেখবে সেটা আমাদের দুজনের পক্ষেই কত কল্যাণকর। এস আমরা কথা দেই, পরস্পরকে আমরা সব কথা বলব; পরস্পরকে জানব, কোন কিছুতেই লজ্জা পাব না; কিন্তু যাতে অপরিচিত জনদের ভয় করতে না হয় সেজন্য আমরা প্রতিজ্ঞা করি; পরস্পরের সম্পর্কে কোনদিন কাউকে কোন কথা বলব না। ঠিক এই কাজটিই আমরা করব।"

সত্যি তাই আমরা করলাম। তার ফল কি হল সে কথা পরে বলব।

কার বলেন, প্রত্যেক অনুরাগেরই দুটি দিক : একজন ভালবাসে, অপরজন ভালবাসতে দেয়; একজন চুমো খায়, অপরজন গাল বাড়িয়ে দেয়। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য; আমাদের বন্ধুত্বের বেলা আমি চুমো খেয়েছি। আর দিমিত্রি গাল বাড়িয়ে দিয়েছে; কিন্তু সেও আমাকে চুমো খেতে সদাই প্রস্তুত। দুজন দুজনকে সমান ভালবাসি, কারণ আমরা পরস্পরকে জানি, মূল্য দেই; কিন্তু তার ফলে তার পক্ষে আমার উপর প্রভাববিস্তার করতে এবং আমার পক্ষে তার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে কোন বাধা হয় নি।

অবশ্য নেখ্লয়ুদভের প্রভাবে আমি নিজের অজ্ঞাতেই তার মতবাদকে গ্রহণ করেছি; সে মতবাদের সার কথা হল : ধর্মের আদর্শকে সর্বান্তঃকরণে পূজা করা এবং অবিরাম পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলাই যে মানুষের কাম্য সেই বিশ্বাসে অতন্দ্র থাকা। তখনই মনে হল, মানব জাতির সংস্কারসাধন, সব মানবিক পাপ ও দুঃখের বিনাশ বাস্তবিকই সম্ভব। নিজেকে শুদ্ধ করা সর্বগুণের আধার হওয়া, সুখী হওয়া—এসবই সহজ ও সরল বলে মনে হল।

কিন্তু যৌবনের এই উচ্চাভিলাষ নেহাৎই হাস্যকর কিনা, সে উচ্চাভিলাষ যদি পূর্ণ না হয়ে থাকে তো সে দোষই বা কার—তা জানেন একমাত্র ঈশ্বর।

———

যৌবন

অধ্যায়—১

আমার চোখে যৌবনের আরম্ভ

আগেই বলেছি দিমিত্রির সঙ্গে বন্ধুত্ব আমার সম্মুখে জীবন ও তার লক্ষ্য ও প্রভাব সম্পর্কে একটা নতুন দৃষ্টিকোণ খুলে দিয়েছে। নৈতিক পূর্ণতার জন্য সংগ্রাম করাই মানুষের নিয়তি, আর সেই পূর্ণতা সহজলভ্য, সম্ভবপর ও চিরন্তন—এই বিশ্বাসই সেই দৃষ্টিকোণের মূল কথা। কিন্তু এই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত নতুন চিন্তাধারার আবিষ্কার এবং একটি সক্রিয় নৈতিক ভবিষ্যতের উজ্জ্বল পরিকল্পনা গড়ে তোলা—এই নিয়েই আমি এতকাল মেতে ছিলাম; অথচ আমার গোটা জীবনটাই চলছিল সেই একই সংকীর্ণ, অসংলগ্ন ও একঘেয়ে পুরনো পথে।

প্রিয় বন্ধু দিমিত্রির—যাকে আমি মনে মনে আশ্চর্য মিত্‍য়া বলে ডাকি—সঙ্গে যে সব ধর্ম-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করি তাতে এখনও আমার মন খুশি হলেও অনুভূতি তৃপ্ত হয় না। যাই হোক, এমন একটা সময় এল যখন এই সব নৈতিক আবিষ্কারের চিন্তা এত প্রচণ্ড বেগে আমার মাথায় ঢুকতে লাগল যে এতদিন ধরে বেশী সময় নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমি খুবই আতংকিত হয়ে পড়লাম! স্থির করলাম আর কাল বিলম্ব না করে এই মুহূর্তে সেই সব চিন্তাকে জীবনে প্রয়োগ করতে হবে।

সেই সময় থেকেই আমার যৌবনের শুরু হয়েছে বলে আমি মনে করি। তখন আমার বয়স প্রায় ষোল। মাস্টারমশায়রা তখনও আমাকে পড়ান। সেণ্ট জেরোম তখনও আমার লেখাপড়ার তদারকি করেন; অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। লেখাপড়ার বাইরে তখন আমার কাজ ছিল নির্জনে দিবাস্বপ্ন দেখা ও ধ্যান করা; নিজেকে জগতের সেরা শক্তিশালী মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য খেলাধূলা ও ব্যায়াম করা; উদ্দেশ্যহীনভাবে এ-ঘরে, ও-ঘরে, বিশেষ করে পরিচারিকাদের ঘরের বারান্দায় ঘুরে বেড়ানো; আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে থাকা আর হতাশ হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। আমার চেহারাটা ছিল খুবই সাধারণ, আর তা নিয়ে কোন সান্ত্বনাতেই আমার মন উঠত না। আমার মুখখানা যে বুদ্ধিদীপ্ত বা মহৎ তাও বলতে পারতাম না। ক্ষুদে ক্ষুদে ধূসর চোখ দুটি বুদ্ধিদীপ্ত তো নয়ই, বরং কেমন যেন বোকা-বোকা; অন্তত আয়নায় সেই রকমই

দেখাত। তাতে পৌরুষের কোন ছোঁয়াই থাকত না। যদিও আমি দেখতে ছোটখাট ছিলাম না, বয়সের তুলনায় বেশ শক্তপোক্তই ছিলাম, তবু আমার চোখ-নাক-মুখ ছিল নরম, ফোলা-ফোলা ও বোঁচা-বোঁচা। তাতে মর্যাদার কোন ছাপ ছিল না; বরং মুখটা দেখতে মুঝিকের মুখের মত, হাত-পাগুলো বড় বড়; সেটাকে তখন খুবই লজ্জাকর মনে হত।

অধ্যায়—২

বসন্তে

যে বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলাম সেবার ঈস্টার উৎসব পড়ল এপ্রিলের শেষ দিকে; ফলে পরীক্ষাগুলি পড়ল কোয়াসিমদো সপ্তাহে, আর আমাকে প্রস্তুতি শেষ করতে হল অনেক দেরীতে।

তুষার-বৃষ্টির তিন দিন পরে তখন আবহাওয়া বেশ নরম, গরম আর পরিষ্কার। রাস্তায় এক চাপ জমাট বরফও নেই; তার বদলে ভিজে পথঘাট রোদে চকচক করছে, ছোট ছোট স্রোত বয়ে চলেছে। সূর্যের আলোয় গলে-যাওয়া বরফের শেষ বিন্দুগুলি ছাদ থেকে ঝরে পড়ছে; সামনের বাগানে গাছগুলি সদ্য-ফোটা ফুলে-ফুলে ভরে গেছে। উঠোনের রাস্তাটা শুকনো। জানালা দিয়ে সকালের সূর্যের আলো পড়ে স্কুল-ঘরের মেঝেতে আলপনা এঁকেছে। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আমি ব্ল্যাকবোর্ডের বীজগণিতের একটা সমীকরণ করতে ব্যস্ত। এক হাতে ফ্র্যাংকার-এর "বীজগণিত"-এর একখানা বই, অপর হাতে একটুকরো খড়ি। ইতিমধ্যেই আমার দুই হাত, মুখ, ও কোটের কনুইতে খড়ির দাগ লেগেছে। নিকলাই একটা এপ্রণ পরে আস্তিন গুটিয়ে জানালার কাঁচের পুটিন তুলে পেরেকগুলি খুলে খুলে বাইরের বাগানে ছুঁড়ে ফেলছে। সেই সব শব্দে আমার মনোযোগ বিঘ্নিত হচ্ছে। তাছাড়া, আমার মেজাজও ভাল ছিল না; অংকটার গোড়াতেই একটা ভুল হওয়াতে সবটাই আবার নতুন করে কষতে হচ্ছে। চকটা দু'বার হাত থেকে পড়ে গেছে। হাত ও মুখ নোংরা হয়ে গেছে। স্পঞ্জটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তার উপর নিকলাইয়ের একঘেয়ে শব্দ। মনে হল রাগের মাথায় কারও উপর মনের ঝাল মেটাই।. খড়ি ও বীজ গণিতের বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলাম। তখনই মনে পড়ল আজ আমাকে "কনফেশন"-এ যেতে হবে; কাজেই কোন রকম অন্যায় কাজ করা চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে মেজাজটা ভাল হয়ে গেল।

গলার স্বর নরম করে নিকলাইকে বললাম, "নিকলাই, আমি বরং তোমাকে সাহায্য করছি।"

ততক্ষণে সে ফ্রেমটা খুলে ফেলেছে। আমি বললাম, "এটাকে কোথায় নিয়ে

যেতে হবে?"

নিকলাই কোন রকম উৎসাহ না দেখিয়ে বলল, "সে আমি একাই পারব। নম্বর লাগিয়ে চিলে-কোঠায় রেখে দেব।"

ফ্রেমটা তুলে ধরে বললাম, "নম্বরটা আমিই লাগিয়ে দেব।"

খুশি মনে চিলে-কোঠা থেকে ফিরে এসে দেখি, নিকলাই সব কিছু সাফ-সুতরো করে ফেলেছে। মিষ্টি তাজা বাতাসে ঘরটা ভরে গেছে। বাইরে থেকে ভেসে আসছে শহরের হৈ-চৈ আর চাতক পাখির কিচিরমিচির।

সব কিছু রোদে ধোয়া; ঘরটা খুশিতে ভরে উঠেছে; বসন্তের মৃদু বাতাসে আমার বীজগণিতের পাতা ও নিকলাইয়ের চুল উড়ছে। জানালার কাছে গিয়ে গোবরাটের উপর বসে বাগানের দিকে ঝুঁকে বাইরে তাকালাম।

চারদিকে সব কিছুই সুন্দর; সব কিছুতেই লেখা সুন্দরের, সুখের, আর গুণের কথা। "এতদিন কেন এসব বুঝতে পারি নি? এতদিন আমি কত খারাপ ছিলাম! আরও কত বেশী সুখী হতে পারতাম; ভবিষ্যতে আরও কত বেশী সুখী হতে পারব।" নিজের মনেই বলতে লাগলাম। "তাড়াতাড়ি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এই মুহূর্তেই আমাকে অন্য মানুষ হতে হবে, অন্য জীবন শুরু করতে হবে।" কিন্তু এতসব চিন্তা সত্ত্বেও দীর্ঘ সময় জানালায় বসে স্বপ্নই শুধু দেখলাম, কাজে কিছুই করলাম না।

অধ্যায়—৩

দিবাস্বপ্ন

ভাবতে লাগলাম, "আজ আমি 'কনফেশন'-এ যাব; সব পাপ ধুয়ে পবিত্র হব; আর কখনও কোন পাপ করব না। (এখানে মনে পড়ল সেইসব পাপের কথা যা আমাকে বেশী বিব্রত করে।) প্রতি রবিবার গির্জায় যাব, তারপর এক ঘণ্টা ধরে ধর্মগ্রন্থ পড়ব; বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার পরে প্রতি মাসে যে পঁচিশ রুবলের নোট পাব তা থেকে আড়াই রুবল (অর্থাৎ এক-দশমাংশ) এমনভাবে গরিব-দুঃখীকে (ভিক্ষুকদের নয়) দান করব যাতে কেউ জানতে না পারে; এমন সব গরিব, বাপ-মা-হারা শিশু, বা বুড়িকে খুঁজে বার করব যাদের কেউ চেনে না।

নিজের জন্য একটা ঘর থাকবে; নিজেই সেটার দেখাশুনা করব, খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখব, যাতে আমার জন্য চাকরকে কিছু করতে না হয়, কারণ সেও তো আমার মতই মানুষ। তখন থেকে হেঁটেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যাব (আমাকে যদি একটা 'দ্রশ্‌কি' দেওয়া হয় তো সেটাও বেচে দেব এবং টাকাটা গরিবদের দিয়ে দেব); সব কাজ ঠিক-ঠিক মত করব। ভালভাবে লেখাপড়া করব; অন্য সকলের চাইতে পড়ায় এগিয়ে

থাকব; ফলে দুটো স্বর্ণপদকসহ প্রথম স্থান অধিকার করে গ্র্যাজুয়েট হব; তারপর মাস্টার-ডিগ্রির জন্ম পরীক্ষা দেব, ডক্টর হব, রাশিয়ার অন্যতম পণ্ডিত লোক হব; এমন কি ইয়োরোপের অন্যতম পণ্ডিতও হতে পারি। আর তারপর?" এখানে মনে পড়ে গেল এসবই স্বপ্ন। তবু স্বপ্ন এবার অন্য পথ নিল। "পড়া তৈরি করতে চলে যাব স্প্যারো হিল্‌স্‌-এ। সেখানে একটা গাছের ছায়ায় বসে পড়ব। তারপর সেও (স্ত্রী) বেড়াতে আসবে স্প্যারো হিল্‌স্‌-এ। একদিন আমার কাছে এসে জানতে চাইবে আমি কে। ক্রমে দুজনের পরিচয় হবে, বন্ধুত্ব হবে, আমি তাকে চুমো খাব। না, সেটা ঠিক হবে না; বরং আজ থেকে আমি কোন নারীর মুখের দিকে তাকাব না। কখনও পরিচারিকাদের ঘরে ঢুকব না, এমন কি তাদের ঘরের পাশ দিয়েও যাব না। তিন বছর পরে যখন অভিভাবকের হাত থেকে মুক্তি পাব, তখন বিয়ে করব, অবশ্যই করব।"

যৌবনের এই সব স্বপ্ন শৈশব ও কৈশোরের স্বপ্নের মতই ছেলেমানুষি বলে কেউ যেন আমাকে তিরস্কার করো না। আমি জানি, অতি বার্ধক্য অবধি বেঁচে থাকলে সত্তর বছরের বৃদ্ধ হয়েও আজকের মত ছেলেমানুষি স্বপ্নই আমি সেদিনও দেখব। স্বপ্ন দেখব, কোন মনোরমা মারিয়া যেমন মাজেপ্পাকে ভালবাসত (পুশ্‌কিনের কবিতা "পল্‌তাভা" স্মর্তব্য), তেমনি দন্তহীন বৃদ্ধ আমাকেও ভালবাসবে; আমার অস্থির-মন ছেলেটি হঠাৎ মন্ত্রী হয়ে বসবে; অথবা লাখ-লাখ টাকার সম্পদ সহসা আমার হাতে আসবে। আমার বিশ্বাস, এমন কোন মানুষ নেই; এমন কোন বয়স নেই, যখন এই সব স্বপ্ন দেখার সুখ থেকে সে বঞ্চিত থাকতে পারে। কৈশোর ও যৌবনের সীমান্তে দাঁড়িয়ে সকলেই স্বপ্ন দেখে এক কাল্পনিক নারীর ভালবাসার। আমিও দেখেছি। আশা করেছি যেকোন মুহূর্তে তার সঙ্গে আমার দেখা হবে। আমার সেই প্রেমিকা হবে কিছুটা সোনেচ্‌কার মত; কিছুটা ভাসিলির স্ত্রী মাশার মত; অনেক দিন আগে থিয়েটারে পাশের বক্সে বসা সেই নারীটির মত যার শুভ্র গলায় দুলছিল মুক্তোর হার।

অধ্যায়—৪

আমাদের পারিবারিক পরিবেশ

সেই বসন্তকালটা বাপি কদাচিৎ বাড়িতে থাকত। কিন্তু যখনই থাকত খুবই খোস মেজাজে কাটাত। পিয়ানোতে প্রিয় সুরগুলি বাজাত, আমাদের দিকে চোরা দৃষ্টিতে তাকাত, মিমিকে নিয়ে, আমাদের সব্বাইকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত; বলত জর্জিয়ার জারেভিস মিমিকে ঘোড়ায় চড়ে যেতে

দেখে তার সঙ্গে এমন প্রেমে পড়েছে যে সাইনভের কাছে বিবাহ-বিচ্ছেদের দরখাস্তই করে দিয়েছে—অথবা আমাকে ভিয়েনার রাষ্ট্রদূতের সহকারী সচিবের পদে নিযুক্ত করা হয়েছে; আবার কখনও বা মাকড়শা দেখিয়ে কাতেংকাকে ভয় দেখাত; বেচারি তো ভয়েই সারা। আমাদের বন্ধু দুব্‌কভ ও নেখ্‌ল্‌-উদভের সঙ্গেও বাপি খুব ভাল ব্যবহার করত; আমাদের ও অতিথিদের সামনেই আগামী বছরের পরিকল্পনার সব কথা বলত। যদিও সে সব পরিকল্পনা প্রায় প্রতিদিনই বদলে যেত, কখনও বা পরস্পরবিরোধী হত, তবু পরিকল্পনা-গুলি এতই আকর্ষণীয় থাকত যে আমরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে কথাগুলি শুনতাম; আর পাছে একটা শব্দও বাদ পড়ে যায় এই আশংকায় লুবচ্‌কা তো অপলক চোখে তাকিয়ে থাকত বাপির মুখের দিকে। বাপি কখনও বলত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে রেখে সে লুবচ্‌কাকে নিয়ে দু'বছরের জন্য ইতালীতে যাবে, তারপর ক্রিমিয়াতে একটা জমিদারি কিনবে, প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে সপরিবারে সেখানে যাবে, এবং সেখান থেকে যাবে সেণ্ট পিতার্সবুর্গে। এই সব হৈ-হুল্লোড় ছাড়াও বাপির মধ্যে আর একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল যেটা আমাকে খুবই অবাক করে দিয়েছিল। তার নিজের জন্য কিছু কেতাদুরস্ত পোশাক কেনা হয়েছিল—একটা অলিভ রংয়ের কোট, ফিতে-লাগানো ট্রাউজার, আর একটা লম্বা ওভারকোট; সেগুলো তাকে খুব মানাত। তাছাড়া, কোথাও যাবার আগে সে গায়ে সুগন্ধি মাখত, বিশেষকরে সে যখন একটি মহিলার কাছে যেত। তার কথা উঠলেই মিমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলত, তার মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠত যেন বলতে চাইছে, "বেচারি বাপ-মাহারার দল! কী দুর্ভাগ্যজনক কামনা। ভালই হয়েছে যে সে নিজে আর থাকছে না।" ইত্যাদি। নিকলাইর কাছে জেনেছিলাম, সেবার শীতকালে তাসের আড্ডায় বাপির ভাগ্য ফিরেছে; সে মোটা টাকা কামিয়েছে, আর তার সবটাই ব্যাংকে রেখে দিয়েছে। স্থির করেছে সে বছর বসন্তকালে আর তাস খেলবে না। তাই সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে কেটে পড়তে চাইছে।

সারা শীতকাল, এমন কি বসন্তকাল পর্যন্ত ভলদিয়া ও দুব্‌কভ যেন হরিহরাত্মা হয়ে কাটাল। কথাবার্তায় যতদূর বুঝতে পারছিলাম, তাদের প্রধান ফূর্তিই ছিল অনবরত শ্যাম্পেন খাওয়া আর স্লেজে চেপে সেই সব তরুণীদের জানালার পাশ দিয়ে যাওয়া যাদের তারা ভালবাসত আর জড়িয়ে ধরে নাচত—ছেলেমানুষি নাচ নয়, সত্যিকারের বল-নাচ।

এই শেষের ব্যাপারটার জন্যই ভলদিয়া ও আমার মধ্যে একটু মন-কষা-কষি হল। কাতেংকা এরই মধ্যে বেশ বড় হয়ে উঠেছে। একগাদা উপন্যাস পড়ে ফেলেছে। সাধারণত বাড়িতে থাকলেই সে একটা উপন্যাস নিয়ে পড়ে থাকে। লুবচ্‌কাও বেশ বড় হয়ে উঠেছে; লম্বা পোশাক পরে; এখন

তার স্বপ্ন কোন গায়ক বা বাদককে বিয়ে করবে, একজন হুজারকে নয়। তাই সব সময় সে গান-বাজনা নিয়েই থাকে। সেণ্ট জেরোম জানে, আমার পরীক্ষা পর্যন্তই সে এ বাড়িতে আছে; তাই কোন কাউণ্টের বাড়িতে একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে, আর আমাদের বাড়িটাকে কেমন যেন তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে। বাড়িতে প্রায় থাকেই না; ফুলবাবুদের মত সিগারেট ফুঁকতেও শিখেছে। মিমি প্রতিদিনই খিটখিটে হয়ে উঠছে; আমরা বড় হয়ে ওঠায় এখন আর আমাদের উপর তার কোন ভরসাই নেই।

ডিনারের জন্য নীচে নেমে দেখি মিমি একা। কাতেংকা, লুবচ্‌কা ও সেণ্ট জেরোম খাবার ঘরে; বাপি বাড়িতে নেই; ভলদিয়া বন্ধুদের নিয়ে তার ঘরে পরীক্ষার পড়া করছে; হুকুম করেছে, তার ডিনারটা যেন সেখানেই দিয়ে আসা হয়। আজকাল ডিনার খাওয়ার মজাটাই চলে গেছে। মামণি ও দিদিমার আমলের মত ডিনার এখন আর একটা শুভ অনুষ্ঠান নয় যেখানে একটা নির্দিষ্ট সময়ে পরিবারে সকলেই এসে একত্র হত। এখন যার যখন খুশি আসে, ডিনার শেষ হবার আগেই টেবিল থেকে উঠে পড়ে। ডিনারের সেই আগেকার পারিবারিক গাম্ভীর্য আর মজা এখন আর নেই।

সাবেককালে পেত্রভ্‌স্কয়েতে থাকতে সকলে হাত-মুখ ধুয়ে সুসজ্জিতভাবে ডিনারের জন্য নামত, বৈঠকখানায় বসে দুটো পর্যন্ত গল্প-গুজব করত। রান্নাঘরের ঘড়িতে যেই দুটো বাজার উপক্রম হত তখনই ফোকা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকত; তার কাঁধের উপর থাকত একটা তোয়ালে; গম্ভীর অথচ কঠিন মুখে সে ঘোষণা করত: "ডিনার প্রস্তুত!" তখন সকলে ঘরে ঢুকত; বড়রা আগে, আর ছোটরা তাদের পিছনে।

এখন আর ডিনারে এসে সেই আনন্দ বা উত্তেজনা কোনটাই পাই না।

ডিনারের পরে লুবচ্‌কা আমাকে একটা কাগজ দেখাল; তাতে সে তার সব পাপের কথা লিখেছে। আমি বললাম, "ভালই হয়েছে, তবে আরও ভাল হয় যদি কেউ তার পাপের কথা নিজের মনের পাতায় লিখে রাখে। তুমি যা করেছ সেটা ঠিক নয়।"

"কেন নয়?" লুবচকা শুধাল।

"তুমি কিছু মনে করো না—এটাও ঠিকই করেছ। আমার কথা তুমি বুঝতে পারবে না।" দোতলায় আমার ঘরে উঠে গেলাম। সেণ্ট জেরোমকে বলে গেলাম, পড়তে যাচ্ছি, কিন্তু আসলে গেলাম সময়টা কাটাতে। আর দেড় ঘণ্টা পরেই আমার "কনফেশন" শুরু হবে। তাই বসে বসে আমার সারা জীবনের কর্তব্য ও কাজ-কর্মের একটা তালিকা লিখতে বসলাম; আমার জীবনের লক্ষ্য এবং চিরদিন যে সব বিধান মেনে চলব তারই একটা খসড়া তৈরি করলাম।

অধ্যায়—৫
বিধানাবলী

একপাতা কাগজ নিয়ে প্রথমেই আগামী বছরে আমাকে যে সব কাজ করতে হবে তার একটা ফিরিস্তি লিখে ফেলার চেষ্টা করলাম। এ কাজের জন্য কাগজটাতে লাইন টানা দরকার; কিন্তু রুলারটা না পাওয়ায় লাতিন অভিধানটাই কাজে লাগালাম। আমার কর্তব্যকর্মকে তিন ভাগে ভাগ করে—আমার প্রতি কর্তব্য, প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য, এবং ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য—প্রথমটা লিখতে শুরু করলাম; কিন্তু দেখা গেল সেগুলি সংখ্যায় এত বেশী এবং এত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর যে প্রথমেই "জীবনের বিধানাবলী" লিখে নিয়ে তারপর সেগুলির একটা তালিকা তৈরি করা দরকার বলে মনে হল। এক তা কাগজ নিয়ে সেগুলিকে সেলাই করে একটা বই তৈরি করে তার উপরে লিখলাম "জীবনের বিধানাবলী।" কিন্তু কথাগুলি লিখতে গিয়ে হরফগুলি এত আঁকাবাঁকা হয়ে গেল যে সেগুলি নতুন করে লিখব কিনা অনেকক্ষণ ধরে সেটাই ভাবলাম; ভাবতে ভাবতে মন খারাপ হয়ে গেল। মনের মধ্যে যা ছিল এত সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন তাকেই কাগজে লিখতে গিয়ে, এবং সাধারণভাবে জীবনে প্রয়োগ করতে গিয়ে, কেন এমন বিরক্তিকর হয়ে ওঠে?

নিকলাই এসে জানাল, "পুরোহিত এসে গেছে; তার নির্দেশ শুনবার জন্য নীচে নেমে এস।"

বইটাকে টেবিলের মধ্যে লুকিয়ে রেখে আয়নায় মুখ দেখে চুলটাকে বুরুশ করে বৈঠকখানায় নেমে গেলাম। সেখানে একটা ঢাকা টেবিলে মূর্তি ও জলন্ত মোমবাতি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আমার সঙ্গে সঙ্গে বাপিও আর একটা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল। পুরোহিতের মাথাভর্তি পাকা চুল, বার্দ্ধক্যজীর্ণ কঠিন মুখ। সে বাপিকে আশীর্বাদ করল। বাপি তার শুকনো, চওড়া হাতে চুমো খেল; আমিও খেলাম।

বাপি বলল, "ওয়াল্ডেমারকে ডাক; সে কোথায়? ওহো, সে তো বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছে সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিতে।"

"সে প্রিন্সের সঙ্গে পড়া করছে," বলে কাতেংকা লুবচ্‌কার দিকে তাকাল। লুবচ্‌কার মুখখানি হঠাৎ লাল হয়ে উঠল; যেন আঘাত পেয়েছে। সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি তার পিছু পিছু গেলাম। বৈঠকখানায় থেমে একটা কাগজে কি যেন লিখল।

"আরে, আবার নতুন কোন পাপ করেছ নাকি?" আমি শুধালাম।

"না, সে রকম কিছু নয়।" তার মুখটা আরও লাল হল।

সেই মুহূর্তে পাশের ঘরে দিমিত্রির গলা শুনতে পেলাম; সে ভলদিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে।

কাতেংকা ঘরে ঢুকে লুবচ্‌কাকে বলল, "তোমার কাছে সব কিছুই লোভের বস্তু।"

আমার বোনের কি যে হয়েছে তা বুঝতে পারলাম না; সে এতই বিচলিত হয়ে পড়েছে যে তার চোখে জল এসে গেছে। কাতেংকা নিশ্চয় তাকে ক্ষেপাচ্ছিল, তাই সে রেগে গেছে।

কাতেংকাকে আঘাত দেবার জন্য লুবচ্‌কা বলল, "তুমি তো দেখছি একেবারে 'অচেনা' মানুষ হয়ে গেছ। তোমার বোঝা উচিত যে এটা কোন ঠাট্টার ব্যাপার নয়।"

কাতেংকাও রেগে বলল, "নিকলেংকা, জান ও কি লিখেছে? লিখেছে—"

লুবচ্‌কাও তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল, "তুমি যে এতটা হিংসুটি হবে তা আমি আশা করি নি। এই রকম একটা সময়ে ইচ্ছা করে ও আমাকে পাপের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার সুখ-দুঃখ নিয়ে আমি তো ঠাট্টা করি না; করি কি?"

অধ্যায়—৬

স্বীকারোক্তি

এই সব চিন্তা-ভাবনা মাথায় নিয়ে বৈঠকখানায় ফিরে গিয়ে দেখি, সকলেই সেখানে সমবেত হয়েছে; পুরোহিত প্রার্থনা-বাণী উচ্চারণ করতে প্রস্তুত। চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে ধ্বনিত হল সন্ন্যাসীর উদাত্ত কণ্ঠ: "কোন রকম লজ্জা না করে, কোন কিছু গোপন না করে, বা কোন কিছুকে হাল্কা না করে তোমার সব পাপ স্বীকার কর তাহলেই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তোমার আত্মা পাপমুক্ত হবে; কিন্তু যদি তুমি কিছুমাত্র গোপন কর তাহলে তোমার পাপের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে।"

স্বীকারোক্তি দিতে প্রথম গেল বাপি, দিদিমার ঘরে সে অনেকক্ষণ কাটাল, আমরা সকলেই চুপচাপ বসে থাকলাম। অবশেষে সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর আবার ভেসে এল। তারপরেই শোনা গেল বাপির পায়ের শব্দ। দরজা খোলার শব্দ করে বাপি ঘরে ঢুকল, কিন্তু কারও দিকে তাকাল না।

"এবার তুমি যাও লুবা। সব কথা বলো কিন্তু। জান তো, তুমি হলে সকলের বড় পাপী," তার গালে টোকা মেরে বাপি হাসতে হাসতে বলল।

লুবচ্‌কার মুখটা একবার লাল একবার ফ্যাকাসে হতে লাগল। এপ্রনের

ভিতর থেকে লেখা কাগজটা বের করে আবার লুকিয়ে ফেলল। তারপর মাথা নীচু করে দরজা পার হয়ে গেল। বেশীক্ষণ থাকল না, কিন্তু যখন ফিরে এল তখন তার দুই কাঁধ চাপা কান্নার আবেগে কাঁপতে লাগল।

অবশেষে কাতেংকার পরে এল আমার পালা। অর্ধ-আলোকিত ঘরটাতে ঢুকতেই আমার কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল। বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে পুরোহিত ধীরে ধীরে আমার দিকে মুখ ফেরাল।

দিদিমার ঘরে আমাকে পাঁচ মিনিটের বেশী থাকতে হল না, কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম একটি সুখী নতুন মানুষ হয়ে। চারদিকেই জীবনের পুরনো পরিবেশ; একই ঘর, একই আসবাব, আমারও সেই একই মুখ— (ইচ্ছা করছিল, আমার ভিতরটা যেমন বদলে গেছে বাইরেটাও সেই রকম বদলে যাক)—তবু কেন জানি না ঘুমতে যাবার আগে পর্যন্ত মনের সেই খুশি-খুশি ভাবটা রয়েই গেল।

ঘুমে ঢুলু-ঢুলু অবস্থায় হঠাৎ মনে পড়ে গেল স্বীকারোক্তির সময় একটা লজ্জাজনক পাপের কথা আমি চেপে গিয়েছি। মুহূর্তের মধ্যে মনের স্বস্তির ভাবটা কেটে গেল। মনে হল, আমার এত বড় পাপের পক্ষে কোন শাস্তিই যথেষ্ট নয়। অনেকক্ষণ ধরে বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে প্রতিটি মুহূর্তে ঈশ্বরের শাস্তি, এমন কি আকস্মিক মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপরই হঠাৎ মনে হল, আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গেই পায়ে হেঁটে বা গাড়িতে চেপে মঠে গিয়ে পুরোহিতের কাছে পুনরায় স্বীকারোক্তি করব। মনে আবার শান্তি ফিরে এল।

অধ্যায়—৭
মঠের পথে

পাছে বিশীক্ষণ ঘুমিয়ে থাকি এই আশংকায় রাতে বারে বারে ঘুম ভেঙে গেল। ছ'টা বাজতেই উঠে পড়লাম। জানালায় তখনও আলো ফোটে নি। জামা-জুতো পরে হাত-মুখ না ধুয়ে এবং প্রার্থনা না করেই জীবনে এই প্রথম একলা পথে নেমে গেলাম।

রাস্তার ওপারের সবুজছাদওয়ালা বাড়িটার পিছন থেকে শীতার্ত ভোরের প্রথম রাঙা আলো সবে উঁকি দিয়েছে।

পথে একটাও কোচয়ান চোখে পড়ল না। শুধু কয়েকটা গরুর গাড়ি পথে চলেছে, আর দুটি পাথর-মিস্ত্রি কথা বলতে বলতে হাঁটছে। হাজার খানেক পা চলবার পরে দেখতে পেলাম ঝুড়ি মাথায় নিয়ে স্ত্রী-পুরুষ বাজারে চলেছে, অথবা কলসি নিয়ে জল আনতে যাচ্ছে। মোড়ের কাছে বসেছে

একটা ছোলা-মটরওয়ালা; একটা রুটির দোকান খুলেছে, আর আর্বাৎস্কি ফটকের কাছে একটা বুড়ো কোচয়ান তার নীল রংয়ের পুরনো জোড়া-তালি দেওয়া দ্রশ্‌কির ভিতর ঘুমিয়ে আছে। ঘুমের ঘোরেই সে কুড়ি কোপেক ভাড়ায় মঠ পর্যন্ত যাতায়াতে রাজী হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ কি ভেবে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসিয়ে বলল, "ঘোড়াটা এখন দানা-পানি খাবে; সওয়ারি নিতে পারব না সার।"

অনেক কষ্টে চল্লিশ কোপেক ভাড়ায় তাকে রাজী করালাম। আমাকে ভাল করে দেখে বলল, "উঠে পড়ুন।" স্বীকার করছি, প্রথমে আমার ভয় হয়েছিল একটা কোন নির্জ্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে সে আমার সব কিছু ছিনতাই করে নেবে। কিন্তু তার কোটের ছেঁড়া কলার, কুঁচকানো মুখ, কুঁজো পিঠ দেখে সে ভয়টা কেটে গেল।

যখন মঠে পৌছলাম তখন সূর্য অনেকটা উঠে এসেছে; গির্জার গম্বুজে সোনালী আভা লেগেছে। গির্জার ভিতরে ঢুকে প্রথম যাকে দেখতে পেলাম তার কাছেই পুরোহিতের খোঁজ করতে সে একটা ক্ষুদে বারান্দাওয়ালা ছোট বাড়ি দেখিয়ে বলল, "ওইটে তার ঘর।"

"খুবই বাধিত হলাম," আমি বললাম।

গির্জা থেকে বেরিয়ে আসা সন্ন্যাসীরা সকলে আমার দিকে তাকাতে লাগল। আমি যথেষ্ট বড় হই নি, আবার শিশুও নই; মুখ ধোয়া হয় নি; পোশাক নোংরা, জুতোয় কালি লাগানো হয় নি, পথে আসতে কাদা লেগেছে।

কালো পোশাক পরা ঘন পাকা দাড়িওয়ালা একটি বুড়ো আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কি চাই।

সেই মুহূর্তে মনে হল "কিছু না" বলে দিয়ে ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠে বাড়ি চলে যাই। কিন্তু কুঁচকানো ভুরু সত্বেও মুখ দেখে কেমন যেন ভরসা পেলাম; পুরোহিতের নাম করে তার সঙ্গে দেখা করার কথা বললাম।

"আমার সঙ্গে এস, আমি পথ দেখিয়ে দিচ্ছি," বলে বুড়ো আমাকে নিয়ে সেই ছোট ঘরটায় ঢুকে বলল, "ফাদার প্রাতঃকালীন উপাসনায় বসেছেন; এখনি এসে পড়বেন। তুমি এখানে অপেক্ষা কর।"

বুড়ো চলে গেল। ছোট ঘরটায় একলা বসে চারদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ অতীত জীবনের সব চিন্তা, সব স্মৃতি যেন আমার মন থেকে মুছে গেল; একটা অবর্ণনীয় সুখ-স্বপ্নের মধ্যে আমি যেন সম্পূর্ণ ডুবে গেলাম। চার-দিকের সব কিছু যেন আমার কাছে বয়ে নিয়ে এল একটি অজ্ঞাতপূর্ব নতুন জীবনের বার্তা—নির্জনতা, প্রার্থনা ও শান্ত সুখে ভরা এক নতুন জীবন।

ভাবতে লাগলাম, "মাস চলে যায়, বছর চলে যায়। এই মানুষটি সব সময়ই একা, সব সময়ই শান্ত; সর্বদাই সে অনুভব করে ঈশ্বরের চোখে তার বিবেক নিষ্কলুষ; তিনি তার সব প্রার্থনা শোনেন।" যে ঐকতান আমাকে

এত কথা শোনাল পাছে তা বিস্মিত হয় তাই আধ ঘণ্টা সময় আমি সেই চেয়ারেই বসে রইলাম, একটু নড়লাম না, জোরে জোরে শ্বাসও ফেললাম না। ঘড়ির পেণ্ডুলামটা আগের মতই টিক-টিক করে তুলতে লাগল—ডান দিকে সশব্দে, বাঁ দিকে নরম শব্দ করে।

অধ্যায়—৮
দ্বিতীয় স্বীকারোক্তি

পুরোহিতের পায়ের শব্দে দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেল।

হাত দিয়ে মাথার পাকা চুল ঠিক করতে করতে সে বলল, "স্বাগত। তোমার জন্য কি করতে পারি।"

তার কাছে আশীর্বাদ চাইলাম; তার ছোট হলুদ হাতটাতে চুমো খেলাম।

সব কথা জানালে সে কোন কথা না বলে দেবমূর্তির কাছে গিয়ে আমার স্বীকারোক্তি শুনতে লাগল।

সব লজ্জা কাটিয়ে সব কথা স্বীকার করলাম। আমার মাথায় হাত রেখে পুরোহিত সুরেলা শান্ত গলায় বলল, "বাছা আমার, আমাদের স্বর্গস্থ পিতার আশীর্বাদ তোমার উপর বর্ষিত হোক; তোমার অন্তরের বিশ্বাস, শান্তি ও নম্রতাকে তিনি চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখুন। আমেন।"

খুশিতে মন ভরে গেল; আনন্দের অশ্রুতে কণ্ঠ রুদ্ধ হল; তার আলখাল্লায় চুমো খেয়ে মুখ তুললাম; সন্ন্যাসীর মুখে গভীর প্রশান্তি।

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দ্রশ্‌কিতে চেপে বসলাম। কারও সঙ্গে কথা বলতে ভীষণ ইচ্ছা করছিল। কিন্তু হাতের কাছে কাউকে না পেয়ে কোচয়ানের দিকে ফিরে বললাম, "আচ্ছা, আমি কি খুব বেশী দেরী করেছি?"

কোচয়ান বলল, "খুব বেশী নয়, তবে ঘোড়াটাকে দানা-পানি খাওয়াবার সময় তো অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে।"

"আমার কিন্তু মনে হয় এক মিনিটের বেশী সেখানে ছিলাম না। তুমি কি জান কেন আমি মঠে গিয়েছিলাম?"

"সেটা আমার কোন ব্যাপারই নয়। যাত্রীরা যেখানে যেতে বলে আমি সেখানেই যাই।"

"না, মানে তবু তোমার কি মনে হয়?"

"তা—হয় তো কাউকে কবর দিতে হবে, তাই একটা জমি কিনতে এসেছিলে।"

"না বন্ধু; তুমি কি জান কেন সেখানে গিয়েছিলাম?"

"আমি তা জানতে পারি না সার," কোচয়ান আবার বলল।

"যদি শুনতে চাও তো আমি তোমাকে সব বলব। কি জান—"

সব কথাই তাকে খুলে বললাম, এমন কি মনের সুখ-দুঃখের কথাও। সে কথা মনে হলে এখনও লজ্জা করে।

অবিশ্বাসের সুরে সে বলল, "হ্যাঁ সার। ভদ্রলোকরা এই রকমটাই করে থাকে।"

"কি রকম ?"

"ঠিক ভদ্রলোকদের মত।"

"না, সে আমার কথাগুলি কিছুই বোঝে নি," আমি ভাবলাম; তবু বাড়িতে পৌঁছা পর্যন্ত তাকে আর কিছুই বললাম না।

তখনও বাড়িতে কারও ঘুম ভাঙে নি। চাকর-বাকর ছাড়া চল্লিশ কোপেক ধার করার মত আর কাউকে পেলাম না। শেষ পর্যন্ত অনেক বলে কয়ে ভাসিলির কাছ থেকে টাকাটা ধার করলাম। তারপর তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিতে গির্জার পথে পা বাড়ালাম।

অধ্যায়—৯
পরীক্ষার প্রস্তুতি

ঈস্টারের পরবর্তী শুক্রবারে বাপি, আমার বোন, মিমি ও কাতেংকা দেশে চলে গেল; দিদিমার বড় বাড়িটাতে থাকলাম শুধু ভলদিয়া, আমি ও সেণ্ট জেরোম। স্বীকারোক্তির দিন এবং মঠে যাবার দিন মনের যে অবস্থা হয়েছিল সেটা সম্পূর্ণ কেটে গেছে, রেখে গেছে মাত্র একটা অস্পষ্ট স্মৃতি; তাও স্বাধীন জীবনের নানা চিন্তা-ভাবনার নীচে ক্রমেই চাপা পড়ে যাচ্ছে।

"জীবনের বিধানাবলী" শীর্ষক কপি-বইটা একগাদা নোট-বইয়ের নীচে চাপা পড়ে রইল। সদ্যপাওয়া স্বাধীনতার চেতনা এবং কাউকে পাবার প্রত্যাশা আমাকে এত বেশী উত্তেজিত করে তুলল যে অন্য কোনভাবে নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে পরীক্ষার প্রস্তুতিতেই বেশী করে ডুব দিলাম। মনে কর, সকালবেলা তুমি স্কুল-ঘরে খুব ব্যস্ত; তোমাকে অনেক খাটতে হবে কারণ আগামীকাল এমন একটা বিষয়ের পরীক্ষা যার দুটো প্রশ্ন তুমি একেবারেই পড় নি; এমন সময় হঠাৎ জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকল বসন্তের সুগন্ধ; মনে হল একটা কথা তোমার অতি অবশ্য মনে পড়বে; আপনা থেকেই হাত দুটি ঢলে পড়বে, পা দুটি চলতে শুরু করবে, শুরু হবে ঘরময় পায়চারি; বসন্ত ঋতুটাই যেন তোমার মাথার মধ্যে ঢুকে গোটা যন্ত্রটাকেই চালিয়ে দেবে: মনটা হাল্কা খুশিতে ভরে যাবে, উজ্জ্বল দিবাস্বপ্নের স্রোত বয়ে যাবে

মনের পর্দায়। এইভাবে কেটে যাবে এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা—তোমার কোন খেয়ালই থাকবে না। অথবা, একটা বইয়ের উপর ঝুঁকে পড়ে মনোনিবেশের চেষ্টা করছ; হঠাৎ শুনতে পেলে বারান্দায় একটি নারীর পায়ের শব্দ, তার পোশাকের খস্‌খসানি; অমনি মন থেকে সব কিছু সরে গেল, আর বসে থাকতেই পারলে না; অথচ তুমি ভাল করেই জান যে দিদিমার বুড়ি দাসী গাশা ছাড়া আর কেউ বারান্দা দিয়ে চলতেই পারে না। তবু তোমার মনে হল, "কিন্তু ধর যদি সেই হয়? ধর, ব্যাপারটা এখনই শুরু হবে অথচ তুমি সে সুযোগটা হারালে?" ছুটে বারান্দায় গেলে, সত্যি গাশা; তথাপি অনেকক্ষণ পর্যন্ত তোমার মাথার ঠিক থাকে না—বসন্ত আবার এসে জুটেছে, আবার শুরু হয়েছে সেই ভয়াবহ বিশৃংখলা।

এ হেন পরিস্থিতিতে যদি মাস্টারমশায়রা আমার কাছে না আসত, যদি সেণ্ট জেরোম না থাকত, পরীক্ষায় ভাল ফল করে বন্ধু নেখ্‌লুদভকে তাক লাগিয়ে দেবার ইচ্ছাটা আমার মনে না আসত—তাহলে এই বসন্তকাল ও স্বাধীন জীবন যা কিছু জেনেছিলাম সব আমাকে ভুলিয়ে দিত, কোন মতেই আমি পরীক্ষায় পাশ করতে পারতাম না।

অধ্যায়—১০
ইতিহাস পরীক্ষা

১৬ই এপ্রিল তারিখে আমি সেণ্ট জেরোমের সঙ্গে প্রথম বার বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় হলটাতে প্রবেশ করলাম। আমাদের সুসজ্জিত ফিটনে চড়েই আমরা গেলাম। জীবনে এই প্রথম একটা ড্রেস-কোট পরেছি, অন্য সব পোশাকই আনকোরা নতুন এবং সেরা মানের। কিন্তু আলোকিত হল ঘরটার পালিশ-করা মেঝেতে পা ফেলে যখন দেখলাম শত শত জিম্‌নাসিয়াম-ইউনিফর্ম এবং ড্রেস-কোট পরিহিত যুবকে ঘরটা ভর্তি, আর গম্ভীর অধ্যাপকরা ঘরের অপরপ্রান্তে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াচ্ছে অথবা বড় বড় হাতল-চেয়ারে বসে আছে, তখনই সকলের মনোযোগ কেবল আমার উপরেই পড়বে বলে যে আশা করেছিলাম তা মুহূর্তে বিলীন হয়ে গেল। আমি কেমন যেন মনমরা হয়ে গেলাম। কিন্তু পরমুহূর্তেই অন্য সকলের থেকে দূরে একেবারে শেষ বেঞ্চিটাতে উপবিষ্ট একটি অতি কুৎসিত, নোংরা পোশাক-পরা, বুড়ো না হয়েও আমার মাথার চুল সব পাকা একটি ভদ্রলোককে দেখতে পেয়ে আমার মনটা আবার খুশি হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমি তার পাশে গিয়ে বসে পড়লাম এবং অন্য সব পরীক্ষার্থীদের ভাল করে দেখতে লাগলাম। তাদের বিচিত্র চেহারা ও মুখ দেখে অতি সহজেই তাদের তিনভাগে ভাগ করে ফেললাম। প্রথম

দলে পড়ে সেই সব পরীক্ষার্থী যারা আমার মতই গৃহ-শিক্ষক বা বাবা-মার সঙ্গে এসেছে; তাদের মধ্যে দেখতে পেলাম সকলের চাইতে ছোট আইভিনকে পরিচিত ফ্রস্টের সঙ্গে; আর দেখলাম আইলেংকা গ্র্যাপকে তার বুড়ো বাবার সঙ্গে। দ্বিতীয় দলে আছে সেই সব যুবক যাদের পরনে জিম্‌নাসিয়াম-ইউনিফর্ম, যাদের অনেকেরই দাড়ি-গোফ কামানো। তারা প্রায় সকলেই পরস্পরকে চেনে, গলা ছেড়ে কথা বলছে, অধ্যাপকদের নাম বা নকল নাম ধরে কথা বলছে, পরস্পরের মধ্যে নোট-চালাচালি করছে, প্যাটিস ও স্যাণ্ডুইচ এনে খাচ্ছে। তৃতীয় দলে আছে—সংখ্যায় তারা অল্প—সেই সব পরীক্ষার্থী যাদের বয়স বেশী, আর পরনে সাদাসিদে পোশাক। তারা সকলেই গোমড়া মুখে চুপচাপ বসে আছে। নোংরা পোশাক-পরা যে লোকটিকে আমার ভাল লেগেছে সেও এই দলেই পড়ে।

একে একে পরীক্ষার্থীদের ডাক পড়তে লাগল। জিম্‌নাসিয়াম দলের ছেলেরা সাহসভরে এগিয়ে গেল, অধিকাংশই ভাল জবাব দিল, আর খুশি হয়ে ফিরল। আমাদের দল অনেক বেশী ভীরু, জবাব দিল খারাপ। বুড়োদের দলের অনেকেই চমৎকার জবাব দিল, আবার অনেকে খুব খারাপ করল। সেমেনভ বলে ডাকতেই আমার পাশের পাকা-চুল লোকটি আমাকে ধাক্কা মেরে, পা মাড়িয়ে পরীক্ষকের টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। অধ্যাপকদের মুখ দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম সে বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খুব ভালই জবাব দিল। ফিরে এসে নিজের খাতাপত্র নিয়ে সে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল; কত নম্বর পেল সেটা জানবার কোন চেষ্টাই করল না।

চশমা-পরা অধ্যাপকটি যখন উদাস দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করল, তখন প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও ক্রমেই আমি সহজ হয়ে উঠলাম, এবং যেহেতু প্রশ্নগুলি ছিল রুশ ইতিহাসের আর সেটা আমার খুব ভাল করেই জানা তাই আমি বেশ ভালভাবেই সব প্রশ্নের উত্তর দিলাম। "ঠিক আছে," বলে অধ্যাপক খাতায় কি যেন লিখল। বেঞ্চিতে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই জিম্‌নাসিয়াম-দলের ছেলেদের কাছে জানতে পারলাম আমি পুরো নম্বর পেয়েছি। ওরা সব সবজান্তা; ঈশ্বরই জানেন সেটা কেমন করে হয়।

অধ্যায়—১১
গণিত পরীক্ষা

পরবর্তী পরীক্ষাগুলি চলাকালে গ্র্যাপ ও আইভিন ছাড়াও আরও অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় হল। সেমেনভ বেশ ভালভাবে পাশ

করল ; পেল দ্বিতীয় স্থান। আর জিম্‌নাসিয়াম দলের একটি ছেলে পেল প্রথম স্থান।

গণিত পরীক্ষার দিন একটু আগেই পৌঁছে গিয়েছিলাম। বিষয়টি আমার ভালই জানা ; একমাত্র নিউটনের বাইনোমিয়াল থিয়োরেমটা নিয়েই ছিল গোলমাল। পিছনের ডেস্কে বসে পাতা উল্টে সেটাই পড়ছিলাম, কিন্তু সেই হট্টগোলে কিছুই মাথায় ঢুকছিল না।

"ঐ যে সে। এদিকে এস নেখ্‌লুয়ুদভ," পিছন থেকে ভলদিয়ার পরিচিত গলা কানে এল।

মুখ ফিরিয়ে দেখি আমার দাদা ও দিমিত্রি—তাদের কোটের বোতাম খোলা, হাত নাচিয়ে আমাকে ডাকছে—বেঞ্চির ফাঁক দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। মনে পড়ল, তারা দু'জন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়টা তাদের কাছে নিজেদের বাড়ির মত।

উঠে দাঁড়াতেই ভলদিয়া ভারিক্কি চালে বলল, "হায়রে বেচারি। এখনও তোমার পরীক্ষা হয় নি ?"

"না।"

"কি পড়ছ ? তুমি কি তৈরি হয়ে আস নি ?"

"তা এসেছি, তবে এই এটা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"কি ! এইটে তো ?" বলে ভলদিয়া এমন জগা-খিচুড়ি পাকিয়ে আমাকে নিউটনের বাইনোমিয়াল থিয়োরি বোঝাতে শুরু করল যে আমি তার বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারলাম না।

দিমিত্রি বলল, "ভলদিয়া, তুমি থাম ; আমি দেখছি।" অধ্যাপকদের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "এখনও যথেষ্ট সময় আছে।"

দিমিত্রি অংকে খুব পাকা। সে বেশ সহজ করে আমাকে উপপাদ্যটা ভাল করে বুঝিয়ে দিল।

পরীক্ষার আসনে বসে দেখলাম জিম্‌নাসিয়াম দলের আইকনিন নামক একটি ছেলে আমার পাশেই বসেছে। টিকিটটা হাতে পেয়ে সে আমাকে শুধাল, "তুমি কি পেয়েছ ?"

আমার কার্ডটা দেখালাম—"থিয়োরি অব কম্বিনেশন্‌স্‌।"

"ওটা আমার জানা," আইকনিন বলল।

"আমার সঙ্গে পাল্টাবে ?"

"না, সেরকম কোন বাসনা আমার নেই।"

"সর্বনাশ !" আমার মন বলল। "যে ভাল ফলের স্বপ্ন আমি দেখে-ছিলাম—তার বদলে কপালে জুটবে অশেষ লাঞ্ছনা। আমার পরীক্ষার ফল তো আইকনিনের চাইতেও খারাপ হবে।"

কিন্তু হঠাৎ ঘটল এক কাণ্ড। অধ্যাপকের প্রায় চোখের সামনেই

আইকনিন আমার হাত থেকে কার্ডটা ছোঁ মেরে টেনে নিল, আর তার কার্ডটা আমাকে দিল। কার্ডটার দিকে তাকালাম। নিউটনের বাইনোমিয়াল থিয়োরেম।

অধ্যাপকটি বুড়ো নয়; মুখের ভাবটি প্রীতিপ্রদ। সে বলে উঠল, "হচ্ছেটা কি? তোমরা কি টিকিট বদল করছ?"

আইকনিন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "না তো; ওর টিকিটটা আমাকে দেখতে দিয়েছিল স্যার।"

প্রশ্নটা আমি সবেমাত্র পড়ে এসেছিলাম; তাই খুব ভালভাবেই জবাব দিলাম, এবং পুরো নম্বর পেলাম।

অধ্যায়—১২
লাতিন পরীক্ষা

লাতিন পরীক্ষার আগে পর্যন্ত ভালয় ভালয় কাটল। সে পর্যন্ত জিম্‌নাসিয়াম দলের ছেলেটি প্রথম, সেমেনভ দ্বিতীয়, আমি তৃতীয়। আমার বেশ গর্ব হতে লাগল; বয়সে ছোট হয়েও আমি একজন কেউকেটা হয়ে উঠেছি। প্রথম পরীক্ষার দিন থেকেই সকলে বলাবলি করছে, লাতিনের অধ্যাপকটি একটি জন্তুবিশেষ; ছেলেদের ফেল করাতেই তার আনন্দ; লাতিন বা গ্রীক ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কথাই বলে না। আমার লাতিনের শিক্ষক সেণ্ট জেরোম আমাকে ভরসা দিতে লাগল; আমারও মনে হল আমি যখন অভিধান ছাড়াই সিসেরো ও হোরেস-এর কবিতা থেকে অনুবাদ করতে পারি, এবং জুম্পত্‌ও খুব ভালই জানি, তখন আমার প্রস্তুতি অন্যদের তুলনায় খারাপ হয় নি।

প্রথমেই এগিয়ে গেল সেমেনভ ও জিম্‌নাসিয়াম দলের প্রথম হওয়া যুবকটি। দুজনই পুরো নম্বর পেয়ে খুশি মনে ফিরে এল। আমাকে ডাকা হল আইকনিনের সঙ্গে। ছোট টেবিলটা সামনে নিয়ে বসে আছে সেই ভয়ংকর অধ্যাপক।

সিসেরোর "বক্তৃতামালা"র একটি খণ্ড আইকনিনকে দিয়ে তাকে বলা হল অনুবাদ করতে।

কী আশ্চর্য, আইকনিন যে সেটা পড়তে পারল তাই নয়, অধ্যাপকের সহায়তায় কয়েকটা পংক্তি অনুবাদও করে ফেলল। আমি তো ওর থেকে অনেক ভাল জানি এই আত্মপ্রসাদে আমার মুখে হাসি ফুটে উঠল। সেটা লক্ষ্য করে অধ্যাপক খুব বাজে ভাষায় আমাকে বলল, "মনে হচ্ছে তুমি আরও ভাল জান। বেশ তো, দেখাই যাক। পদ-পরিচয়ের যে প্রশ্নটা ওকে করেছি তার জবাব দাও তো।"

পরে জেনেছিলাম লাতিনের অধ্যাপকটি আইকনিনের আশ্রয়দাতা, এমন কি আইকনিন তার বাড়িতেই থাকে। আমি তড়িঘড়ি প্রশ্নটার উত্তর দিলাম, কিন্তু অধ্যাপক মুখটা কালো করে মাথাটা ঘুরিয়ে নিল। বলল, "খুব ভাল ; তোমার পালাও আসবে ; তখন দেখব তুমি কত বড় পণ্ডিত।" তারপর আইকনিনকে বলল, "তুমি যেতে পার।" দেখলাম আইকনিনের খাতায় চার নম্বর বসানো হল। ভাবলাম, "তাহলে তো ওরা যে রকম বলছিল ততটা কড়া লোক নয়।"

আইকনিন চলে যাবার পরে আমার উপস্থিতিটাকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে অধ্যাপক এটা-ওটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আমি কাশলাম।

"ওঃ, হ্যাঁ। তুমি তো রয়েছ। আচ্ছা, কিছুটা অনুবাদ কর," বলে অধ্যাপক আমাকে একটা বই দিল। হোরেসের বই থেকে যে অংশটা সে আমাকে অনুবাদ করতে বলল সেটা অনুবাদ করা কারও পক্ষেই সম্ভব বলে আমার মনে হল না।

বললাম, "এটা আমি তৈরি করি নি।"

"তার মানে তুমি চাও মুখস্ত করে এসে সেটা উগড়ে দিতে, তাই না? খুব ভাল কথা ; তাহলে এটা অনুবাদ কর।"

কোন রকমে তার অর্থটা বুঝতে পারলাম ; কিন্তু যতবারই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অধ্যাপকের দিকে তাকালাম ততবারই মাথাটা নেড়ে সে বলতে লাগল, "না"। তারপর ব্যাকরণের একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে চেয়ারে হেলান দিয়ে আবার চুপ করে গেল। উত্তর দিতে গিয়েও তার মুখের কুটিল ভঙ্গী দেখে আমার জিভটা আটকে গেল। যা কিছু বললাম সবই ভুল বলে মনে হতে লাগল।

হঠাৎ ভয়ংকর উচ্চারণে সে বলে উঠল, "হচ্ছে না! কিচ্ছু হচ্ছে না। কোন উচ্চতর পরীক্ষার জন্য এ ভাবে তৈরি হলে চলে না সার। তোমরা শুধু চাও নীল কলারের ইউনিফর্ম গায়ে চড়াতে, বড় বড় বাত কপ্চাতে, আর তাই নিয়ে নিজেদের ছাত্র বলে জাহির করতে। না, তা চলবে না মশায়রা : নিজের বিষয়ের উপর পূর্ণ দখল থাকা চাই।"

ভাঙা-ভাঙা ভাষায় অধ্যাপক এমন আরও অনেক কথাই বলল। ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে আমার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, দুই চোখ জলে ভরে উঠল। হয় তো আমার সেই অবস্থা দেখে তার দয়া হল। আমাকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে সে বলল, আমার নম্বর বাড়িয়ে দেবে, আর সেটা বলল অপর এক অধ্যাপকের উপস্থিতিতে।

"ঠিক আছে ; তোমার প্রাপ্য না হলেও তোমাকে পাশ করিয়ে দিচ্ছি। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার পরেও তুমি এ রকম মাথা-মোটা থাকবে না।"

অধ্যাপকের এই অন্যায় আচরণ সে সময় আমাকে এত বেশী আঘাত

করেছিল যে একবার মনে হয়েছিল আর কোন পরীক্ষাই দেব না। আমার সব অহংকার চূর্ণ হয়ে গেল (তৃতীয় তো হতেই পারব না) ; কোনরকম চেষ্টা-যত্ন না করেই বাকি পরীক্ষাগুলো দিয়ে দিলাম। অবশ্য আমার গড় নম্বর চারের উপরেই ছিল ; কিন্তু তা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথাই ছিল না। ততদিনে আমি মনস্থির করে ফেলেছি : প্রথম হতে চেষ্টা করাটা ভাল নয় ; ভলদিয়ার মত আমাদের সকলেরই উচিত মাঝারি হওয়া—না খুব ভাল, না খুব মন্দ ; বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নীতিই মেনে চলব। অবশ্য এই নিয়ে জীবনে এই প্রথম বন্ধু দিমিত্রির সঙ্গে আমার মতের অমিল হল।

তখন আমি কেবল ভাবছি আমার ইউনিফর্ম, আমার তিন-কোণা টুপি, আমার দ্রশ্‌কি, আমার নিজের ঘর, আর সর্বোপরি আমার মুক্তির কথা।

অধ্যায়—১৩
আমি বড় হলাম

এ সব চিন্তারও একটা আকর্ষণ ছিল।

মে মাসের ৮ই তারিখে শেষ পরীক্ষাটা দিয়ে বাড়ি ফিরে দেখি একটি দর্জির লোক বাড়িতে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কাগজে মুড়ে কালো কাপড়ে তৈরি গিল্টি-করা ঝকঝকে বোতাম লাগানো আমার নতুন ইউনিফর্মটা নিয়ে এসেছে।

সেটা গায়ে দিয়ে মনে হল পোশাকটা খুব ভাল। মুখে আত্ম-তুষ্টির হাসি নিয়ে নীচে নেমে গেলাম ভলদিয়ার খোঁজে।

ভলদিয়ার ঘরে ঢুকে দুব্‌কভ ও নেখ্‌লুদভের গলা শুনতে পেলাম। তারা এসেছে আমাকে অভিনন্দন জানাতে। তারা প্রস্তাব করল, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সম্মানে সকলে মিলে কোথাও গিয়ে রাতের ভোজন ও শ্যাম্পেন পান করা হোক। সেণ্ট জেরোম কিন্তু উদ্ধত গলায় জানাল, এবার তো তার কাজ শেষ হয়েছে, তাই সে পরদিনই কাউণ্টের বাড়ি চলে যাবে।

অতএব এখন থেকে আমার কোন গৃহ-শিক্ষক থাকবে না ; নিজস্ব একটা দ্রশ্‌কি থাকবে ; ছাত্রদের খাতায় আমার নাম উঠবে না ; আমার বেল্ট থেকে একটা ছবি ঝুলবে ; শান্ত্রীরা মাঝে মাঝে আমাকে সেলাম ঠুকবে। এতদিনে আমি বড় হলাম ; সুখী হলাম।

ঠিক হল পাঁচটার সময় আমরা ইয়ার-এ খেতে যাব। কিন্তু ভলদিয়া দুব্‌কভকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। দিমিত্রিও যথারীতি উধাও হয়ে গেছে ; বলে গেছে ডিনারের আগে বিশেষ কাজে তাকে এক জায়গায় যেতে হবে। কাজেই আমার হাতে দু'ঘণ্টা সময়। কিছুক্ষণ সব ক'টা ঘরে ঘুরে ঘুরে

কাটালাম। আয়নার সামনে বার বার দাঁড়ালাম—কখনও কোটের বোতামগুলো বন্ধ করে, কখনও খুলে দিয়ে, আবার কখনও কেবল উপরের বোতামটা আটকে। সব রকমেই আমাকে চমৎকার দেখাল। সময় আর কাটে না। তখন দ্রশ্‌কি আনতে বললাম; স্থির করলাম, কিছু কেনাকাটা করতে "কুজ্‌নেৎস্কি মোস্ট"-এ যাব।

মনে পড়ল, বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার পরে ভলদিয়া কিনেছিল ভিক্টর অ্যাডাম-এর একটা ঘোড়ার লিথোগ্রাফ, কিছু তামাক ও একটা পাইপ। মনে হল, আমার পক্ষেও সেটা অনিবার্য করণীয়।

দোকানে গিয়ে কেনাকাটা সেরে দ্রশ্‌কিতে ওঠার মুখে দেখতে পেলাম সাধারণ ভদ্রলোকের পোশাকে সেমেনভ মাথা নীচু করে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে। সে আমাকে চিনতে পারল না দেখে বিরক্ত হয়ে জোর গলায় "চালাও!" বলে দ্রশ্‌কিতে চড়ে বসলাম।

অচিরেই সেমেনভকে ধরে ফেলে বললাম, "কেমন আছেন?"

চলতে চলতেই সে বলল, "নমস্কার।"

"ইউনিফর্ম পরেন নি কেন?"

সেমেনভ থামল। চোখ কুঁচকে আমার দিকে একবার তাকিয়ে আবার হাঁটতে লাগল। ত্ভের্স্কায়াতে একটা রুটির দোকানে ঢুকে পর পর আটটা কেক খেয়ে ফেললাম।

বাড়িতে পৌঁছে বুকের মধ্যে একটা জ্বালা বোধ করলাম; কিন্তু সেটাকে আমল না দিয়ে কিনে আনা জিনিসগুলো ভাল করে দেখতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, তামাকটা তখনই পরীক্ষা করে দেখা যাক।

একটা সিকি-পাউণ্ডের প্যাক খুলে তুর্কী পাইপে হলুদ রংয়ের চিকন করে কাটা সুলতান তামাক ভরে তাতে আগুন দিয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ আঙুলের মাঝখানে পাইপটাকে ধরে টানতে শুরু করলাম।

তামাকের গন্ধটা খুব সুন্দর, কিন্তু স্বাদটা তেতো, আমার দম আটকে এল; তবু অনেকক্ষণ ধরে টেনে টেনে ধোঁয়ার বৃত্ত আঁকতে লাগলাম। দেখতে দেখতে সারা ঘর নীলচে ধোঁয়ায় ভরে গেল। ক্রমে মুখের তেতো স্বাদটা বেড়ে গেল; মাথার ভিতরটা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল। পাইপশুদ্ধ মুখটা আয়নায় দেখার জন্য উঠতে গিয়েই পা টলতে লাগল, ঘরটা ঘুরতে শুরু করল, কোনমতে আয়নার কাছে পৌঁছে দেখলাম, মুখটা কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে। অনেক চেষ্টায় ডিভানটাতে বসে পড়েই এত বেশী অসুস্থ ও দুর্বল বোধ হল যে আমার ধারণা হল তামাকটাই আমার পক্ষে মারাত্মক, আমি মরতে বসেছি। খুব ভয় পেয়ে গেলাম; ভাবলাম কাউকে ডেকে ডাক্তার আনতে বলি।

কিন্তু আতংকের ভাবটা বেশীক্ষণ রইল না। কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে

কাটিয়ে দিলাম। মনে মনে বললাম, "যখন অন্যদের মত ধূমপান করতে পারছি না তখন নিশ্চয় আমি বড় হই নি ; পরিষ্কার বুঝতে পারছি, অন্যদের মত দুই আঙুলের ফাঁকে পাইপটাকে ধরে ধোঁয়া গিলবার এবং গোঁফের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়বার কপাল আমার নয়।"

পাঁচটার সময় দিমিত্রি ফিরে এলে এক গ্লাস জল খেয়ে প্রায় সুস্থ হয়ে তার সঙ্গে বের হওয়ার জন্য তৈরি হলাম।

ধূমপানের চিহ্নগুলি দেখতে পেয়ে দিমিত্রি বলল, "হঠাৎ ধূমপানের শখ হল কেন? যত সব অর্থহীন, অকারণ খরচ। আমি তো প্রতিজ্ঞা করেছি কখনও ধূমপান করব না। কিন্তু তাড়াতাড়ি কর—দুব্‌কভকে ধরতে হবে।

অধ্যায়—১৪

ভলদিয়া ও দুব্‌কভ কি করে

দিমিত্রি ঘরে ঢোকামাত্রই তার মুখ, তার হাঁটাচলা, চোখ মিটমিট করে একটা বিশেষ ভঙ্গীতে মাথা নাড়া—এসব কিছু থেকেই আমার মনে হল তার মেজাজ ভাল নেই। ইদানিং আমি বন্ধুর চরিত্রের দিকে নজর রাখছি, তার বিচারও করছি, কিন্তু তাতে আমাদের বন্ধুত্বের কোন পরিবর্তন ঘটে নি ; যে দিক থেকেই দেখি না কেন তার পূর্ণতা ছাড়া আর কিছুই আমার চোখে পড়ে না। তার চরিত্রের দুটো দিক, আর সে দুটো দিকই আমার চোখে সুন্দর। একদিকে সে ভদ্র, সৎ, শান্ত, ফূর্তিবাজ। অন্যদিকে সে নিরাসক্ত, নিজের ও অন্যের প্রতি কঠোর, অহংকারী, ধর্মান্ধ এবং অতি-মাত্রায় নীতিবাগীশ। এখন সে সেই দ্বিতীয় মানুষ।

দ্রশ্‌কিতে যেতে যেতে বললাম, আজকের আনন্দের দিনে তাকে এ রকম মনমরা দেখে আমার খুব খারাপ লাগছে।

শুধালাম, "নিশ্চয় কোন কিছু তোমাকে বিচলিত করেছে ; কিন্তু কেন তা কি তুমি বলবে না?"

গাল কুঁচকে মাথাটাকে একদিকে ঘুরিয়ে সে জবাব দিল, "নিকলেংকা তোমাকে যখন কথা দিয়েছি কিছুই তোমার কাছে গোপন করব না, তখন সে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। সব সময়ে মন-মেজাজ একরকম থাকা সম্ভব নয় ; যদি কোন কারণে বিচলিত হয়েও থাকি, আমি নিজেই তা বুঝতে পারছি না।"

"কী আশ্চর্য দিলখোলা মানুষ!" আমি আর কোন কথা বললাম না।

বাকি পথটা নীরবে কাটিয়ে দুব্‌কভের বাসায় পৌঁছলাম। বাসাটা খুব সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো। ভলদিয়া ও দুব্‌কভ তাস খেলছিল। আর

একটি ভদ্রলোক নিবিষ্ট মনে খেলা দেখছিল। ডুব্‌কভের পরনে রেশমি ড্রেসিং-গাউন ও নরম জুতো; ভলদিয়া বসেছে তার উল্টো দিকে। আমাকে দেখেই তার মুখটা লাল হয়ে উঠল। মনে হল, আমি যে তার তাস খেলার কথা জানতে পেরেছি তাতে সে অসন্তুষ্ট হয়েছে।

যাই হোক, উঠে দাঁড়িয়ে সে আমাদের সঙ্গে করমর্দন করল, বসতে দিল, পাইপ বাড়িয়ে দিল, কিন্তু আমরা তা ফিরিয়ে দিলাম।

ডুব্‌কভ বলে উঠল, "এই যে আমাদের কূটনীতিবিদ হাজির—সেই তো আজকের নায়ক। কী আশ্চর্য, তোমাকে ভীষণভাবে একজন কর্ণেলের মতই দেখাচ্ছে।"

"হুম!" বুঝতে পারলাম সেই বোকা-বোকা আত্মতৃপ্তির হাসিটা আমার মুখময় ছড়িয়ে পড়েছে।

বাপির মত একটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাতের তাস বাঁটতে বাঁটতে ভলদিয়া বলল, "আর একদান খেলা যাক।"

ডুব্‌কভ বলল, "তার হাত থেকে আর নিস্তার নেই। পরে খেলব। আচ্ছা, এক হাত হোক। তোমার ডিল।"

তারা খেলতে শুরু করল। আমি তাদের হাতের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ডুব্‌কভ উঠল ভলদিয়ার গাড়িতে। দিমিত্রি আমাকে তুলে নিল তার ফিটনে।

'আমি বললাম, "ওরা কি খেলছিল?"

"পিকেত। বাজে খেলা, আর জুয়া মাত্রই তো বাজে।"

"ওরা কি অনেক টাকা নিয়ে খেলে?"

"তা খেলে না; তবু এটা ঠিক না।"

"তুমি খেল না?"

"না; আমি কথা দিয়েছি খেলব না। ডুব্‌কভ তো যাকে পায় তার সঙ্গেই খেলে, আর প্রায়ই জেতে।"

আমি বললাম, "কিন্তু এটা তো ঠিক নয়। ভলদিয়া নিশ্চয়ই তার মত ভাল খেলে না।"

"ঠিক তো নয়ই; তবে বিশেষ খারাপও কিছু নয়। ডুব্‌কভ তাস খেলা পছন্দ করে, ভাল খেলে, কিন্তু তাহলেও সে খুব ভাল মানুষ।"

"দেখ, আমার কোন ধারণা ছিল না—"

'ওর সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা করো না, কারণ সত্যি ও চমৎকার লোক। আমি ওকে পছন্দ করি, আর এই দুর্বলতাটুকু সত্ত্বেও চিরদিন পছন্দ করব।"

যে কারণেই হোক আমার মনে হল, দিমিত্রি যখন ডুব্‌কভকে নিয়ে এত মাতামাতি করছে তখন সে আমাকে আগের মত ভালবাসে না, বা

সমীহ করে না ; কিন্তু পাছে কেউ তাকে অস্থিরমতি ভাবে তাই সে কথাকে মুখে স্বীকার করতে নারাজ। সেও তাদেরই একজন যারা বন্ধুদের সারা জীবন ভালবাসে, বন্ধুদের চিরকাল ভাল লাগে' বলে নয়, ভুল করে হলেও একবার যাকে ভালবেসেছে, তাকে অপছন্দ করাটাকে অসম্মানজনক মনে করে বলে।

অধ্যায়—১৫
আমার সাফল্যের উৎস

দুব্‌কভ ও ভলদিয়া ইয়ার-এর সবাইকে চেনে, তাদের নাম জানে ; আবার দারোয়ান থেকে মালিক পর্যন্ত সকলেই তাদের দুজনকে প্রচুর শ্রদ্ধা করে। পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের একটা আলাদা ঘরে নিয়ে গেল, ফরাসী মেনু থেকে দুব্‌কভের পছন্দমত চমৎকার ডিনার পরিবেশন করল। এক বোতল ঠাণ্ডা শ্যাম্পেন আগে থেকেই তৈরি করা ছিল। ডিনার-পর্ব বেশ ভালভাবেই চুকল ; দুব্‌কভ যথারীতি অদ্ভুত সব গল্প বলতে লাগল—যেমন, একবার তার দিদিমা একটা গাঁদা বন্দুক দিয়ে তিনটে ডাকাতকে বেধড়ক ঠেঙিয়েছিল। তারপর যখন শ্যাম্পেন পরিবেশন করা হল তখন সকলেই আমাকে অভিনন্দন জানাল, আর আমিও তাদের হাত থেকে শ্যাম্পেন নিয়ে পান করে তাদের সঙ্গে চুম্বন-বিনিময় করলাম।

তারপরই দুব্‌কভ বলল; "শোন হে মশাইরা, এবার কূটনীতিবিদকে নিয়ে আমাদের মাসির কাছে গেলে কেমন হয়? ওর জন্য সেখানে একটা পাকা ব্যবস্থা করা দরকার।"

"নেখ্‌লুদভ যাবে না," ভলদিয়া বলল।

"এই এক অসহ্য ভালমানুষ। সত্যি, তুমি অসহ্য হে!" তার দিকে ফিরে দুব্‌কভ বলল। "আমাদের সঙ্গে চল ; গেলেই বুঝতে পারবে মাসি কি রকম মনোরমা মহিলা।"

মুখ লাল করে দিমিত্রি বলল, "আমি তো যাবই না, ওকেও যেতে দেব না।"

"কাকে? কূটনীতিবিদকে? কি হে, তুমি যাবে নাকি? দেখ, মাসির কথা বলতেই ওর মুখটা কেমন ঝলমল করে উঠেছে।"

আসন থেকে উঠে দিমিত্রি বলল, "ওকে যেতে দেব না এমন কথা আমি বলছি না। কিন্তু আমি চাই না যে ও সেখানে যায়। এখন তো ও আর ছেলেমানুষটি নয়, ইচ্ছা থাকলে ও তো একাই সেখানে যেতে পারে। কিন্তু তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত দুব্‌কভ ; তুমি যা করছ সেটা ঠিক নয়,

আবার অন্যকেও তাই করতে বলছ।"

ভলদিয়াকে চোখ টিপে ডুব্‌কভ বলল, "তোমাদের যদি মাসির বাড়িতে এক কাপ চায়ের নেমন্তন্ন করি তাতে ক্ষতি বা কি? বেশ তো, আমাদের সঙ্গে যেতে যদি তোমাদের ভাল না লাগে তাহলে ভলদিয়া ও আমিই যাব। তুমি যাবে তো ভলদিয়া?"

"হুম, হুম!" ভলদিয়া সম্মতি জানাল। "আমরা সেখানে যাব, তারপর আমার ঘরে এসে তাস খেলব—পিকেত চলবে।"

আমার কাছে এসে দিমিত্রি শুধাল, "তুমি ওদের সঙ্গে যেতে চাও কি না?"

"না। ওদের সঙ্গে আমি এমনিতেই যেতে চাই না; আর তুমি নিষেধ করলে তো কোনমতেই যাব না।" তারপর আবার বললাম, "না, ওদের সঙ্গে যেতে চাই না তা বলছি না; তবে আমি যাচ্ছি না।"

সে বলল, "ঠিক আছে। নিজের মত করে চলবে, কখনও অন্যের বাঁশীর সুরে নাচবে না; সেটাই জীবনের সেরা পথ।"

এই সামান্য বিতর্কের ফলে দিমিত্রি তার স্বাভাবিক খুশির মেজাজে ফিরে গেল। আমি না যাওয়াতে খুবই খুশি হয়ে আর এক বোতল শ্যাম্পেনের হুকুম দিল। বলল, "এস সকলে মিলে ফুর্তি করি। ওর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশের সম্মানে আজই প্রথম আমি মাতাল হব; না হয়ে কি পারি?" এই চপলতাও যেন দিদিত্রির চরিত্রের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মানিয়ে গেল। তার এই অপ্রত্যাশিত হুল্লোড় আমাদের মধ্যেও সংক্রামিত হল। আমরা প্রত্যেকেই তখন প্রায় আধ বোতল করে শ্যাম্পেন গলায় ঢেলেছি।

মনের সেই মৌজের অবস্থায় আমি ডুব্‌কভের দেওয়া একটা সিগারেট টানতে বাইরের ঘরে গেলাম।

অধ্যায়—১৬
বিবাদ

সেই ঘরে নাগরিকের পোশাক-পরা লাল গোঁফওয়ালা একটি বেঁটেখাটো শক্তপোক্ত ভদ্রলোক বসে খাচ্ছিল। তার পাশে বসেছিল একটি গোঁফহীন ঢ্যাঙা, কালো লোক। তারা ফরাসী ভাষায় কথা বলছিল। তাদের টেবিলে একটা মোমবাতি জ্বলছিল। সেখানে এগিয়ে গিয়ে সিগারেটটা ধরালাম। ফিরে আসার মুখেই ভদ্রলোকটির লাল গোঁফজোড়া নড়ে উঠল; সে ফরাসীতে বলল, "প্রিয় মহাশয়, আমার খাবার সময় কেউ ধূমপান করবে সেটা আমি পছন্দ করি না।"

আমি কি যেন একটা দুর্বোধ্য জবাব দিলাম।

ভদ্রলোক পাশের গোঁফবিহীন লোকটির দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলল, "না মশায়, আমি এটা পছন্দ করি না। কেউ এসে আমার নাকের উপর ধোঁয়া ছাড়বে সেটাও আমি পছন্দ করি না; এসবই আমার না-পছন্দ।"

আমি বললাম, "এতে আপনার কোনরকম অসুবিধা হতে পারে তা ভাবি নি।"

ভদ্রলোক চীৎকার করে বলল, "তুমি যে সহবত শেখ নি সেটাও তো ভাব নি; কিন্তু আমি ভেবেছি।"

লোকটি আমাকে অপমান করছে দেখে আমার রাগ হল। বললাম, "আমার সঙ্গে এভাবে চেঁচিয়ে কথা বলার কী অধিকার আপনার আছে?"

"এই অধিকার আছে যে আমি কাউকে আমার প্রতি অশালীন আচরণ করতে দেই না; তোমার মত যুবকদের উচিত শিক্ষা দিতে আমি জানি। তোমার নাম কি? কোথায় থাক?"

আমি ভীষণ রেগে গেলাম; আমার ঠোঁট কাঁপতে লাগল ও ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। তবু নিজেকেই যেন দোষী মনে হল, হয়তো বেশী মাত্রায় শ্যাম্পেন খাওয়ার জন্যই। ভদ্রলোকটিকে অপমানকর কিছুই বললাম না; বরং বিনীতভাবে আমার নাম ও ঠিকানাটাই উচ্চারণ করলাম।

"আমার নাম কল্পিকভ। ভবিষ্যতে ভদ্র আচরণ করতে শিখো। আমার চিঠি তুমি পাবে।" সব কথাবার্তাই ফরাসীতে হল।

যথাসম্ভব কড়া গলায় "আমি আনন্দিত হব" বলে মুখ ফিরিয়ে আমাদের ঘরে ফিরে গেলাম। সিগারেটটা ততক্ষণে নিভে গেছে।

এই ঘটনার কথা আমার দাদা বা বন্ধু কাউকেই বললাম না। এক কোণে বসে একটু আগেকার ঘটনার কথাই ভাবতে লাগলাম। ভদ্রলোকের মুখের "তুমি সহবত শেখো নি" কথাটাই কানে বাজতে লাগল। নেশা কেটে গেছে। মনে হল, আমি ভীরুর মত ব্যবহার করেছি। আমাকে ও কথা বলার কোন অধিকার তার নেই। না, ব্যাপারটাকে এখানেই শেষ হতে দেওয়া চলবে না। উঠে পাশের ঘরে গেলাম। মনে মনে স্থির করলাম, তাকে কিছু কড়া কথা শোনাতে হবে, দরকার হলে তার মাথায় মোমবাতিটা ভাঙতে হবে। কিন্তু কল্পিকভ ঘরে নেই; চলে গেছে। বিষণ্ন মনে আবার নিজেদের ঘরে ফিরে গেলাম।

দুব্‌কভ বলল, "আমাদের কূটনীতিবিদের হল কি? মনে হচ্ছে, গোটা ইয়োরোপের ভাগ্য সে নির্ধারণ করছে।"

রেগে বলে উঠলাম, "আঃ, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।" ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে যে কারণেই হোক মনে হল যে দুব্‌কভ মোটেই ভাল মানুষ নয়। সব সময় কেবল ঠাট্টা। আর এই "কূটনীতিবিদ"

বলে ডাকা। তার তো একমাত্র কাজ ভলদিয়ার কাছ থেকে টাকা জোতা আর কোন্ এক মাসির কাছে যাওয়া।

এই সব ভাবতেই পাঁচ মিনিট কেটে গেল। দুব্কভের প্রতি রাগের মাত্রা ক্রমেই চড়তে লাগল। এমন কি ভলদিয়া ও দিমিত্রি তার সঙ্গে কথা বলছে দেখে তাদের প্রতিও বিরক্ত হয়ে উঠলাম।

হঠাৎ দুব্কভ বলে উঠল, "কূটনীতিবিদের মাথায় জল ঢালতে হবে দেখছি। ওর অবস্থা খারাপ। ঈশ্বরের দোহাই, সত্যি খারাপ!"

"তোমাকেই জলে চুবানো দরকার; তোমার নিজের অবস্থাই খারাপ," আমিও পাল্টা টিপ্পনি কাটলাম।

জবাব শুনে দুব্কভের অবাক হবারই কথা, কিন্তু তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সে ভলদিয়া ও দিমিত্রির সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল।

বিলের টাকা মিটিয়ে দিয়ে ওভারকোট পরতে পরতে দুব্কভ দিমিত্রিকে বলল, "আচ্ছা, ওরেস্তেস ও পাইলেদেস কোথায় যাবে? হয় তো প্রেমের কথা বলতে বাড়িতেই যাবে। আমরা বরং মাসির কাছেই যাই; তোমাদের বাসি বন্ধুত্বের চাইতে সেটাই বেশী ভাল লাগবে।"

হাত গুটিয়ে তার দিকে এগিয়ে আমি রাগে ফেটে পড়লাম, "এ সব কথা বলে তামাসা করার সাহস তোমার হল কেমন করে? যা বোঝ না তা নিয়ে ঠাট্টা করার সাহস হল কিসে? এ সব চলবে না। জিভ বন্ধ কর!" বলেই আমি চুপ করে গেলাম। আর কোন কথা খুঁজে পেলাম না। দুব্কভ প্রথমে হকচকিয়ে গেল; তারপর ঠাট্টা মনে করে হাসতে চেষ্টা করল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেমন যেন ভয় পেয়ে চোখ নীচু করল।

ব্যাপারটা এড়িয়ে যাবার ভঙ্গীতে বলল, "তোমার বা তোমাদের অনুভূতি নিয়ে মোটেই ঠাট্টা করি নি। আমার কথা বলার ধরনই এই রকম।"

"তাহলেও এটা ভাল নয়," চীৎকার করে কথাটা বলে আমি নিজেই লজ্জিত বোধ করলাম।

ভলদিয়া ও দিমিত্রি এক সঙ্গে বলে উঠল, "তোমার হল কি? কেউ তোমাকে অপমান করতে চায় নি।"

"হ্যাঁ, ও তাই করেছে।"

"তোমার ভাইটি বড়ই বেপরোয়া," বলে দুব্কভ বেরিয়ে গেল; আমার বক্তব্য শুনবার জন্য অপেক্ষা করল না।

পরদিন যখন ভলদিয়ার ঘরে দুব্কভের সঙ্গে দেখা হল তখন এ প্রসঙ্গটা উঠল না বটে, কিন্তু আমরা কেউ কারও মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না।

দিমিত্রিকে কল্পিকভের সঙ্গে ঝগড়ার কথা বলে যখন তার চেহারার বর্ণনা দিলাম তখন দিমিত্রি খুবই বিস্মিত হল।

বলল, "আরে, এ তো সেই লোকটা। কল্পনা করতে পার। এই কল্পিকভ

একজন নামকরা জোচ্চোর, তাস-চুরির রাজা। আর ভীষণ ভীরু; রেজিমেন্টে থাকার সময় একজন সহকর্মী তাকে চড় মারা সত্ত্বেও সে তার সঙ্গে লড়াই করতে চায় নি বলে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এত সাহস তার হল কেমন করে ?"

অনেককাল পরে যখনই ব্যাপারটার কথা মনে হত তখনই ধরে নিতাম, অনেক বছর আগে যে চপেটাঘাত তার মুখে পড়েছিল গোঁফবিহীন লোক-টির সামনে তার প্রতিশোধ নিতেই কল্‌পিকভ হয় তো আমার সঙ্গে এ রকম রূঢ় ব্যবহার করেছিল।

অধ্যায়—১৭
কিছু দেখা-সাক্ষাতের প্রস্তুতি

পরদিন ঘুম ভাঙতে প্রথমেই মনে পড়ল কল্‌পিকভ প্রসঙ্গ। কিন্তু সেটাই আমার মস্কো-প্রবাসের শেষ দিন; বাবার হুকুমমত আমাকে বেশ কিছু লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। বাবা নিজেই তার একটা তালিকাও পাঠিয়ে দিয়েছে। তার দ্রুত, তীক্ষ্ণ হস্তাক্ষরে কাগজে লেখা হয়েছে; "(১) প্রিন্স আইভান আইভানিচ—অতি অবশ্য; (২) আইভিন-পরিবার—অতি অবশ্য; (৩) প্রিন্স মিখাইলো; (৪) প্রিন্সেস নেখ্‌লয়ুদভা ও মাদাম ভালাখিনা—সম্ভব হলে; তাছাড়া আছে কিউরেটর, রেক্টর ও অধ্যাপক বর্গ।"

শেষের সাক্ষাৎকারগুলো থেকে দিমিত্রিই আমাকে নিবৃত্ত করল; বলল যে সেগুলি দরকারী তো নয়ই, বরং অনুচিত; কিন্তু বাকিগুলি সেই দিনেই সারতে হবে। তার মধ্যে অতি অবশ্য বলে চিহ্নিত প্রথম দুটিই আমাকে বিশেষভাবে ভীত করে তুলল। প্রিন্স আইভান আইভানিচ প্রধান সেনাপতি, বৃদ্ধ মানুষ, ধনবান ও একক; আর আমি ষোল বছরের একটি ছাত্র তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে বাধ্য হব। আইভিনরাও ধনবান, তাদের বাবা একজন গুরুত্বপূর্ণ অসামরিক সেনাপতি; দিদিমার আমলে মাত্র একবার তারা আমাদের বাড়িতে এসেছিল।

যে সমস্ত লোক নিজেদের আমার চাইতে উঁচুদরের লোক বলে মনে করত যৌবনকালে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করাটা আমি পছন্দ করতাম না; সে ধরনের সাক্ষাৎ আমার পক্ষে বেদনাদায়ক হয়ে উঠত। কিন্তু যেহেতু বাপির শেষের হুকুমগুলি মানতে পারছি না, সেই হেতু প্রথমটা মেনে নিয়ে আমাকে ব্যাপারটাকে মিটিয়ে নিতে হবে। বেরিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করতেই আইলেংকাকে সঙ্গে নিয়ে বুড়ো গ্রাপ এসে হাজির হল আমাকে অভিনন্দন জানাতে। ফাদার গ্রাপ একজন রুশপ্রভাবিত জার্মান, অসহ্য রকমের মিষ্টিমুখ ও তোষামুদে; তাছাড়া প্রায়ই মাতাল হয়ে আসে। যদিও বাপি

তাকে পড়ার ঘরে ডেকে বসাত, তবু কখনও আমাদের সঙ্গে খেতে বলত না। যে কারণেই হোক, তাকে আমার পছন্দ হত না।

অতিথিদের আগমনে খুবই অসন্তুষ্ট হলাম, সেটা প্রকাশ করতেও কসুর করলাম না। ঠাণ্ডা গলায় তাদের অভ্যর্থনা জানালাম, কিন্তু বসতে পর্যন্ত বললাম না। গাড়ি হাজির করার হুকুমও দিলাম।

আমি যখন পোশাক পরছিলাম তখন সে ঘরে ঢুকে দিদিমার দেওয়া রূপোর নস্যদানিটা আঙুলে ধরে বলল, "কি জান নিকলাই পেত্রভিচ, যখনই ছেলের কাছে শুনলাম যে তুমি খুব ভালভাবে পরীক্ষায় পাশ করেছ তখনই চলে এসেছি তোমাকে অভিনন্দন জানাতে। আরে, আমি তো তোমাকে কাঁধে চড়িয়েছি, ঈশ্বর জানেন তোমাদের বাড়ির লোকজনদের আমি আত্মীয়ের মত ভালবাসি। আর আমার আইলেংকাও বার বার আমাকে বলেছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে। এর মধ্যে সেও তোমাকে খুব পছন্দ করে ফেলেছে।"

একটু থেমে বৃদ্ধ আবার বলল, "এবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাইছি নিকলাই পেত্রভিচ, আমার আইলেংকাও কি ভালভাবে পাশ করেছে? সে তো বলছে তোমার সঙ্গে একই ফ্যাকাল্টিতে পড়বে—কাজেই দয়া করে তার উপর একটু নজর রেখো, দরকার হলে পরামর্শ দিও।"

"কেন, সে তো খুব ভাল ফলই করেছে," আমি বললাম।

ভীরু হাসি হেসে বুড়ো বলল, "আর আজকের দিনটা সে কি তোমার সঙ্গে কাটাতে পারে?"

আমি তাড়াতাড়ি তাকে বললাম যে প্রিন্স আইভান আইভানিচ, প্রিন্সেস কর্ণাকভা ও আইভিনের সঙ্গে দেখা করতে আমাকে এখনই বেরিয়ে যেতে হচ্ছে, আর সম্ভবত প্রিন্সেস নেখ্‌লুয়ুদভার সঙ্গেই আহারটা সারব। অগত্যা তারা ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলে আমি আইলেংকাকে আবার আসতে বললাম। বিড়বিড় করে কি যেন বলে সে এমনভাবে হাসল যাতে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম সে আর কোনদিন এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়াবে না।

তারা চলে যেতেই আমিও বেরিয়ে পড়লাম। পাছে একা একা বড় বেশী লজ্জা বোধ করি তাই ভলদিয়াকে বলেছিলাম আমার সঙ্গে যেতে, কিন্তু সে রাজী হয় নি; বলেছে একটা ছোট গাড়িতে চেপে দুই ভাই একসঙ্গে গেলে সেটা বড় বেশী ভাবপ্রবণতার ব্যাপার হয়ে উঠবে।

অধ্যায়—১৮

ভালাখিন-পরিবার

কাজেই একাই বেরিয়ে পড়লাম। পথে প্রথমেই পড়ল সিভ্‌ৎসেভ ভ্রাঝেক-এ ভালাখিনদের বাড়ি। তিন বছর সোনেচ্‌কাকে দেখি নি; অবশ্য তার প্রতি আমার ভালবাসা এখন অতীতের বস্তু হয়ে গেছে; তবু সেই ছেলেমানুষি ভালবাসার একটা জীবন্ত স্মৃতি এখন মনের মধ্যে রয়ে গেছে। গত তিন বছরে অনেকবারই এত তীব্রভাবে তার কথা মনে হয়েছে যে চোখে জল এসে গেছে, আবার তার প্রতি ভালবাসা মনে জেগেছে; কিন্তু সেসব ক্ষণস্থায়ী মনোভাব পুনরায় ফিরে এসেছে অনেক বিলম্বে।

আমি জানতাম সোনেচ্‌কা তার মার সঙ্গে বিদেশে গিয়ে দু'বছর কাটিয়ে এসেছে; সেখানে গাড়ির দুর্ঘটনায় পড়ে কাঁচের আঘাতে সোনেচ্‌কার মুখ কেটে যায়; ফলে তার মুখের সৌন্দর্য আর আগের মত নেই।

ভালাখিনরা বাস করত একটা ছোট কাঠের বাড়িতে। সামনে একটা উঠোন। ঘণ্টা বাজাতেই একটি সুবেশ ছোট ছেলে দরজা খুলে দিল। কিছু না বলেই আমাকে অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে রেখে সে ছুটে আরও অন্ধকার বারান্দায় চলে গেল।

অন্ধকার ঘরে বেশ কিছুক্ষণ একা দাঁড়িয়ে থাকার পরে সেই ছেলেটিই হলের দরজা খুলে আমাকে একটা পরিচ্ছন্ন কিন্তু সাধারণভাবে সাজানো বৈঠকখানায় নিয়ে বসাল। আমার পিছনেই ঘরে ঢুকল সোনেচ্‌কা।

সে এখন সপ্তদশী। বেঁটে চেহারা, ক্ষীণকায়া, মুখের রং অস্বাস্থ্যকর ও হলদেটে। মুখের ক্ষতচিহ্নগুলি স্পষ্ট চোখে পড়ে; তবু বড় বড় সুন্দর দুটি চোখ আর উজ্জ্বল মিষ্টি হাসি যা দেখে শৈশবে তাকে ভালবেসেছিলাম তা এখনও অক্ষুণ্ণই আছে।

হাসি মুখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "প্রিয় নিকলাস, তোমাকে দেখে কত যে খুশি হয়েছি। কিন্তু তুমি কত বদলে গেছ। একেবারে যুবকটি হয়েছ। আচ্ছা, আর আমি—আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে বল তো।"

"ও হো, তোমাকে একেবারে চিনতেই পারা যায় না," আমি বললাম; কিন্তু মন বলল, তোমাকে যেখানে দেখতাম সেখানেই চিনতে পারতাম। পাঁচ বছর আগেকার খুশির ভাবটা আবার ফিরে এল—সেই যখন দিদিমার বল-নাচের আসরে ঠাকুরদা সেজে নেচেছিলাম তার সঙ্গে।

মাথা নেড়ে সে বলল, "কেন, আমি কি খুব কুৎসিত হয়ে গেছি?"

তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, "না, মোটেই তা নয়; তুমি একটু লম্বা হয়েছ,

একটু বড় হয়েছ ; কিন্তু তবু এখনও—"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভুরু দুটো ঈষৎ তুলে সে বলল, "সবই পাল্টে গেছে ; মনে হয় সব কিছুই আগের চাইতে খারাপ হয়েছে ; আমরাও খারাপ হয়ে গেছি। তাই না নিকলাস ?"

কোন জবাব দিতে পারলাম না ; নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে বলতে লাগল, "কোথায় গেল সেই সব আইভিন আর কর্ণাকভরা ? তোমার মনে আছে ? কী সব দিনই না ছিল !"

আমি তবু কোন জবাব দিতে পারলাম না।

মাদাম ভালাখিনা ঘরে ঢোকায় আমি সেই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে রেহাই পেলাম। উঠে তাকে অভিবাদন জানালাম। মুখে কথা ফুটল। কিন্তু সোনেচ্‌কার মধ্যে দেখা দিল আশ্চর্য পরিবর্তন। হঠাৎ তার হাসিখুশি ভাবটা উধাও হয়ে গেল ; মুখের হাসিটা পর্যন্ত বদলে গেল। তার মার মুখে কিন্তু পুরনো দিনের সেই হাসি, চলনে-বলনে সেই একই মাধুর্য। একটা বড় হাতল-চেয়ারে বসে ভালাখিনা আমাকে তার আরও কাছে এগিয়ে বসতে বলল। মেয়েকে ইংরেজিতে কিছু বলায় সোনেচ্‌কা সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি যেন কিছুটা স্বস্তি পেলাম। ভালাখিনা আমার আত্মীয়-স্বজন, দাদা, ও বাবার কথা জিজ্ঞাসা করার পরে নিজের দুঃখের কথা বলতে শুরু করল—স্বামীর মৃত্যুর কথাও বলল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর কিছু বলার মত না পেয়ে নিঃশব্দে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ; যেন বলতে চাইল—"তুমি যদি এখন বিদায় হও তাহলেই ভাল হয় বাছা।" কিন্তু আমার দিক থেকে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। সোনেচ্‌কা হাতের কাজ নিয়ে ফিরে এসে ঘরের এক কোণে গিয়ে বসল। বেশ বুঝতে পারলাম তার দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ। সেই মুহূর্তে আমি যেন আবার তার প্রেমে পড়ে গেলাম ; কেমন যেন জড়ভরতের মত হয়ে গেলাম। আমার সেই অবস্থা ও মুখের রক্তিমভাব দেখে ভালাখিনাও বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

সেই পরিস্থিতিতে একটি তুচ্ছ সাধারণ যুবক ঘরে ঢুকে আমাকে অভিবাদন জানাল। ভালাখিনা চেয়ার ছেড়ে উঠে সাংসারিক কাজের অছিলার কথা শুনিয়ে আমার দিকে তাকাল। আমিও একটু ইতস্তত করে উঠে পড়লাম।

পরবর্তীকালে বাবাকে ঘটনাটা শুনিয়ে যখন বললাম যে মাদাম ভালাখিনা ও তার মেয়ের মধ্যে মনকষাকষি চলছে, তখন সে বলল :

"ঠিকই ; তার কৃপণ স্বভাবের জন্য মেয়েটা খুবই কষ্টে আছে। অথচ মহিলাটির স্বভাব কত মিষ্টিই না ছিল। কেন যে এমন বদলে গেল বুঝতে পারি না। সেখানে একজন সেক্রেটারিকে দেখ নি ? একটি রুশ মহিলার সেক্রেটারির প্রয়োজন হয়—এটা আবার কোন্ ফ্যাশান ?"

আমি বললাম, "তাকেও দেখেছি।"

"আচ্ছা, খুব সুন্দর দেখতে কি ?"

"না, মোটেই না !"

একটু কেশে বিরক্তিভরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাপি বলল, "সবই দুর্বোধ্য !"

দ্রশ্‌কি চালিয়ে যাবার পথে ভাবলাম, "এদিকে আমিও প্রেমে পড়েছি !"

অধ্যায়—১৯

কর্ণাকভ-পরিবার

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার কর্ণাকভ-পরিবারে। আরবাত-এর একটা বড় বাড়ির একতলায় তারা থাকে। সিঁড়িটা দেখবার মত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কিন্তু বিলাসবহুল নয়। বৈঠকখানাটাও সুন্দর, সুসজ্জিত; আসবাবপত্রগুলি ঝকঝকে ও মজবুত হলেও মোটেই নতুন নয়; কোন ছবি, পর্দা বা সাজগোজ চোখে পড়ল না। জনাকয় প্রিন্সেস আগে থেকেই সেখানে বসেছিল। দেখে মনে হল, কোন অতিথির জন্যই তারা অপেক্ষা করছিল।

তাদের মধ্যে যে বড় সে আমাকে বলল, "মামণি এখনই এসে যাবে।" এগিয়ে এসে আমার পাশে বসে বেশ সহজভাবে মিনিট পনেরো ধরে সে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলল।

প্রিন্সেস ঘরে ঢুকল। আগের মতই শুকনো চেহারা, চঞ্চল চোখ; কথা বলার সময় অন্য দিকে তাকানোর অভ্যাসটি এখনও আছে। আমার হাতটা ধরে তার ঠোঁটের কাছে তুলে ধরাতে আমি বাধ্য হয়েই তার হাতে চুমো খেলাম।

মেয়েদের দিকে চোখ রেখে সে বলে উঠল, "তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম। ওকে দেখতে একেবারে ওর মার মত, তাই না লিজে ?"

লিজে বলল, "ঠিক তাই, যদিও আমি ভাল করেই জানি যে সাথে সাথে আমার চেহারার কোন মিল নেই।

কিছুক্ষণ কথা বলার পরে আমি উঠতে চাইলে প্রিন্সেস বাধা দিয়ে বলল, "না, এক মিনিট অপেক্ষা কর। তোমার বাবা কোথায় লিজে ? তাকে এখানে ডাক। তোমাকে দেখলে সে খুব খুশি হবে।" শেষের কথাটা প্রিন্সেস আমার দিকে ফিরে বলল।

মিনিট দুইয়েকের মধ্যেই প্রিন্স মিথাইলো এসে হাজির হল। বেঁটে, শক্ত-পোক্ত মানুষ, পোশাক সম্পর্কে উদাসীন, মুখভর্তি দাড়ি, কেমন যেন বোকা-বোকা চেহারা। আমাকে দেখে সে মোটেই খুশি হল না; অন্তত মুখে সে কথা বলল না।

প্রিন্সেস রাগী গলায় তাকে বলল, "তুমি এখনও সাজগোজ কর নি;

অথচ এখনই তোমাকে বেরুতে হবে।”

“এক মিনিট, এক মিনিটের মধ্যেই করছি গো,” বলে প্রিন্স মিখাইলো বেরিয়ে গেল। আমিও অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

কথা প্রসঙ্গে প্রিন্সেসের মুখেই প্রথম শুনলাম যে আমরা প্রিন্স আইভান আইভানিচের উত্তরাধিকারী; খবরটা আমার কাছে একটা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়।

অধ্যায়—২০

আইভিন পরিবার

সফরসূচীর পরবর্তী অনিবার্য স্থানটির চিন্তাই আমাকে বিচলিত করে তুলল। যাই হোক, এরপরেই প্রথম পড়বে আইভিনদের বাড়ি। ত্ভের্স্কয় বুল্‌ভার্দের একটা সুন্দর বড় বাড়িতে তারা থাকে। ফটকে দণ্ডহাতে দারোয়ান দাঁড়িয়েছিল। একটু ভয়ে ভয়েই গাড়ি থেকে নামলাম। জানতে চাইলাম, পরিবারের লোকজন বাড়ি আছে কি না।

“আপনি কার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন স্যার? জেনারেলের ছেলে বাড়িতেই আছেন।”

“আর জেনারেল স্বয়ং?”

“খোঁজ নিতে হবে। কি নাম তাকে বলব?”

কিছুটা হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, প্রথমে জেনারেলের ছেলের সঙ্গেই দেখা করতে চাই। আমাকে উপরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে জেনারেলের ছেলে সামনে একটা বই রেখে তখনও ঘুমিয়ে আছে। তার গৃহ-শিক্ষক হের ফ্রস্ট ছাত্রকে ডেকে তুলল। আমাকে দেখে তার চোখে কোনরকম আনন্দের ছোঁয়া লাগল না। আমার ভুরুর দিকে তাকিয়ে সে কথা বলতে লাগল। কয়েকটা কথা বলেই সে বলল, তার বাবা ও মা বাড়িতেই আছে, আর সে আমাকে নিয়ে তাদের কাছে যাবে কি না।

দুজনে আবার নীচে নেমে গেলাম। অভ্যর্থনা-ঘরটি খুব উঁচু, আর তার সাজসজ্জাও ব্যয়বহুল—শ্বেতপাথর ও সোনায় মোড়া; মসলিন ও আয়নার ছড়াছড়ি। পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল আইভিনা। আত্মীয়ের মত আমাকে পাশে বসিয়ে পরিবারের সকলের খোঁজখবর নিল।

মাদাম আইভিনাকে আমার খুব ভাল লাগল। লম্বা, একহারা, খুব সাদা; মনে হল যেন সর্বদাই বিষণ্ণ ও ক্লান্ত। একটু পরেই তার ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নীরবে আমার দিকে মিনিট দুই তাকিয়ে থেকে ভদ্রমহিলা হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল। তার সামনে বসে আমি একা। কি বলব বা

করব কিছুই বুঝতে পারছি না। সে কেঁদেই চলল। আমার দিকে তাকিয়েও দেখছে না। "ওকে কি সান্ত্বনা দেব? কিন্তু কেমন করে?"

একসময় কান্না থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করে সে বলল, "ওঃ, আমি কি বোকা! এমন অনেক সময় আসে যখন অকারণেই কান্না পায়।"

বলেই সে আবার কেঁদে উঠল। "আহা বাছা, এভাবে কাঁদাটা খুবই হাস্যকর! তোমার মাকে কী ভালই বাসতাম; আমরা এত বন্ধু ছিলাম—আর—"

রুমালে মুখ চেপে ভদ্রমহিলা কাঁদতে লাগল। আমি খুবই অস্বস্তিতে পড়লাম। বিরক্ত বোধ করলেও তার প্রতি করুণাও হল। মনে হল, এ কান্না যতটা আমার মার জন্য তার চাইতে অনেক বেশী তার নিজস্ব দুঃখের জন্য।

এভাবে কতক্ষণ চলত কে জানে, এমন সময় স্বয়ং আইভিন ঘরে ঢুকল। বেঁটে, শক্ত, পাকা-চুল ভদ্রলোক; ঘন কালো ভুরু, ছোট করে ছাঁটা চুল, কঠিন ও কঠোর মুখ।

উঠে অভিবাদন জানালাম, কিন্তু সবুজ কোটের উপর তিনটে তারকা-চিহ্নিত আইভিন অভ্যর্থনা দূরে থাক আমার দিকে ফিরেও তাকাল না; আমাকে যেন একটা মানুষ বলেই গণ্য করল না। রূঢ় কঠিন কণ্ঠে স্ত্রীকে ফরাসীতে বলল, "তুমি কিন্তু আজও কাউন্টেসকে চিঠি লেখ নি।"

সঙ্গে সঙ্গে একটু উদ্ধতভাবে ঘাড়টা বাঁকিয়ে মাদাম আইভিনা বলল, "গুড-বাই মঁসিয় ইর্তেনেভ। আমি পুনরায় দুজনকেই অভিবাদন করলাম, আর এবারও বৃদ্ধ আইভিনের উপর তার প্রতিক্রিয়া হল একটা জানালা খোলা বা বন্ধ করার মতই। ছাত্র আইভিন কিন্তু দরজা পর্যন্ত আমার সঙ্গে এল; পথে আমাকে জানাল যে সে পিতার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাচ্ছে কারণ তার বাবা সেখানে একটা উঁচু পদে চাকরি পেয়েছে।

দ্রশ্‌কিতে বসে চলতে চলতে নিজের মনেই বললাম, "বাপি পছন্দ করুক আর নাই করুক, আমি ও বাড়িতে আর ঢুকছি না।"

পরবর্তীকালে বাপির অনেক কথা আমাকে শুনতে হয়েছে; বাপি বলেছে, এ ধরনের লোকের সঙ্গে পরিচয় রাখা দরকার; আমার মত ছেলের দিকে যদি আইভিনের মত মানুষের নজর পড়ে তো সেটাই ঢের। কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত আমি সংকল্পে অটল ছিলাম।

অধ্যায়—২১

প্রিন্স আইভান আইভানিচ

"এবার আমাদের শেষ সাক্ষাৎকার নিকিৎঙ্কায়ার সঙ্গে," কুজ্‌মাকে কথাটা বলে আমরা গাড়ি হাঁকিয়ে দিলাম প্রিন্স আইভান আইভানিচের বাড়ির দিকে।

পর পর কয়েকটি দেখা-সাক্ষাতের ফলে আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে; তবু আমি তার উত্তরাধিকারী প্রিন্সেস কর্ণাকভার এই কথাগুলি মনে পড়তেই আবার লজ্জা এসে আমার মনকে ঘিরে ধরল।

মনে হল, যে বুড়ো দারোয়ান দরজা খুলে দিল, যে পরিচারক আমার কোটটা খুলে নিল, যে তিনটি মহিলা ও দুটি ভদ্রলোক বৈঠকখানায় বসেছিল, এমন কি প্রিন্স আইভান আইভানিচ পর্যন্ত—সকলেই আমাকে উত্তরাধিকারী মনে করে অপছন্দের চোখেই দেখছে। প্রিন্স কিন্তু আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করল; আমাকে চুমো খেল অর্থাৎ এক মুহূর্তের জন্য তার নরম, শুকনো, ঠাণ্ডা ঠোঁট আমার গালে ছোঁয়াল, আমার কাজকর্মের কথা জিজ্ঞাসা করল, ঠাট্টা-তামাসা করল, জানতে চাইল দিদিমার নামকরণ-দিবসে যেমন কবিতা লিখেছিলাম এখনও আমি সেইরকম কবিতা লিখি কি না; সেদিন আমাকে ডিনারে নিমন্ত্রণও করল। কিন্তু প্রিন্স আমার সঙ্গে যত বেশী ভদ্রতা করতে লাগল ততই আমার বেশী করে মনে হতে লাগল যে আমি তার উত্তরাধিকারী এই চিন্তাটা যেন তার কাছে অপ্রীতিকর সেটা ঢাকতেই তার এত সব বাহানা।

ছেলেবেলায় প্রিন্স আইভান আইভানিচকে আমরা "দাদু" বলে ডাকতাম, কিন্তু এখন উত্তরাধিকারী হিসাবে সে ডাকটা আমার জিভে এল না, আবার অন্যদের মত তাকে "হিজ এক্সেলেন্সি" বলে ডাকাটাও অপমানজনক মনে হল। কিন্তু আমি সবচাইতে অস্বস্তি বোধ করলাম বৃদ্ধা প্রিন্সেসকে নিয়ে। সেও প্রিন্সের একজন উত্তরাধিকারিণী এবং এই বাড়িতেই থাকে। মনে হল, সেও আমাকে ঘৃণা করে বলেই আমার সঙ্গে কথাই বলছে না।

সেদিন সন্ধ্যায় এই প্রসঙ্গে দিমিত্রিকে বললাম, "কি জান, বুড়ো লোক খুব ভাল; সকলের প্রতি সদয় ও প্রীতিপূর্ণ; কিন্তু প্রিন্সেসের প্রতি তার ব্যবহার বেদনাদায়ক। আসলে টাকা-পয়সার গন্ধ থাকলেই সব সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। তাই তো এখন আমার মনে হচ্ছে, প্রিন্সকে খোলাখুলি বললেই হত যে মানুষ হিসাবে তাকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তার উত্তরাধিকারী হতে চাই না, আর তিনিও যেন আমার জন্য কিছু রেখে না যান। একমাত্র সেই শর্তেই আমি তার বাড়ি গিয়ে বাস করতে পারি।"

টাকাই সব সম্পর্ক নষ্ট করে—বন্ধু দিমিত্রিকে এ কথা মুখে বললেও পরদিন সকালে দেশে যাবার আগে তার কাছ থেকে পঁচিশ রুবল ধার করলাম, কারণ নানা রকম ছবি ও পাইপ কিনতে আমার সব টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল। তারপর অনেক দিন পর্যন্ত তার কাছে আমি ঋণী ছিলাম।

অধ্যায়—২২

বন্ধুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলোচনা

কুন্ত্সভো যাবার পথে ফিটনেই আলোচনাটা উঠল। সকালে তার মার সঙ্গে দেখা করতে দিমিত্রিই আমাকে বারণ করেছিল; কিন্তু মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে সেই এসে সারা বিকেলের জন্য আমাকে নিয়ে গেল; এমন কি তাদের দেশের বাড়িতেই রাতটাও কাটাতে হল। শহরের হৈ-হল্লা ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলের খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে ধুলোভর্তি রাস্তায় গাড়ির চাকার নরম শব্দ শুনতে শুনতে যত এগোতে লাগলাম ততই বসন্তের সুবাসিত বাতাস ও উন্মুক্ত আকাশ যেন আমাকে আচ্ছন্ন করে তুলল। দুই বন্ধু মনের আনন্দে নানা আলোচনায় মেতে উঠলাম। দিমিত্রির পরিবারকে তখনও আমি চিনতাম না; সেই বলতে লাগল তার মা, পিসি, সেই প্রাণীটির কথা যাকে ভলদিয়া ও দুব্কভ বন্ধুটির মনের মানুষ বলে জানত এবং "ছোট্ট লাল মাথা" বলে ডাকত। "ছোট্ট লাল মাথা"র আসল নাম ল্যুবভ সের্গেয়েভ্না। পারিবারিক সম্পর্কের সূত্রে সে নেখ্ল্যুদভদের বাড়িতেই থাকে। তার কথা বলতে গিয়ে দিমিত্রি একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

"সত্যি, সে এক আশ্চর্য মেয়ে," লজ্জায় রাঙা হয়েও সোজা আমার চোখে চোখ রেখে সে বলতে লাগল, "এখন সে আর ছোট মেয়েটি নয়—বরং বয়সটা একটু বেশীই হয়েছে, আর মোটেই সুন্দরীও নয়; কিন্তু কোন সুন্দরীকে বিয়ে করা তো একটা অর্থহীন ব্যাপার। আমি তো সেটা বুঝতেই পারি না। তার মত হৃদয়, তার মত মন, তার মত নীতিপরায়ণ—আমার স্থির বিশ্বাস আজকালকার দিনে তার মত আর একটা মেয়ে তুমি খুঁজে পাবে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু এখন তুমি তাকে নিয়ে কি করতে চাও?"

"তুমি বলতে চাইছ তাকে বিয়ে করার কথা ভাবছি কি না?"

"কেন ভাবব না? সেটাই তো আমার লক্ষ্য; সব ভাল মানুষের লক্ষ্যই তো সৎভাবে থেকে সুখী হওয়া। আর ওকে পেলে তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে পাওয়ার চাইতেও আমি বেশী সুখী হব, ভাল থাকব।"

এই সব কথায় ডুবে থাকায় আমরা খেয়াল করি নি যে আমরা কুন্ত্সেভো পৌঁছে গেছি; আকাশে মেঘ জমেছে; বৃষ্টি হবে। সূর্য এখন কুন্ত্সেভো বাগানের প্রাচীন গাছগুলির মাথায় বেশী উঁচুতে নেই; তার অর্ধেকটা

মেঘে ঢেকে গেছে।

সে দিকে তাকিয়ে আমি শুধু বললাম, "দেখ দিমিত্রি, কী সুন্দর।"

দিমিত্রি কোন কথা বলল না। তার প্রেয়সী সম্পর্কে কোন কথা না বলে আমি প্রকৃতির সৌন্দর্যের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় সে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবু আমার নিজের মনের কথাটা তাকে বলবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। বললাম, "দেখ, আজ আমিও খুব সুখী। আশা করি তোমাকে বলেছি যে ছেলেবেলায় একটি মেয়েকে আমি ভালবাসতাম। আজ আবার তাকে দেখলাম; এবার সত্যি সত্যি আমি তার প্রেমে পড়েছি।"

বাড়িতে ঢুকবার বার্চগাছে-ঢাকা পথে পা দেবার পরেই বৃষ্টি নামল। গাড়ি থেকে নেমে আমরা বাগানের ভিতর দিয়ে ছুটতে লাগলাম। বাড়িতে ঢোকার মুখেই চারজন মহিলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দিমিত্রি সঙ্গে সঙ্গে তার মা, পিসি, বোন ও লুবভ সের্গেয়েভ্‌নার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল।

মুহূর্তের জন্য তারা থামল, কিন্তু বৃষ্টি আরও জোরে নামল।

দিমিত্রির মা বলল, "আগে বারান্দায় উঠি, তারপর আবার ওকে পরিচয় করিয়ে দিও।" মহিলাদের সঙ্গে আমরাও সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে গেলাম।

অধ্যায়—২৩

নেখ্‌লুয়ুদভ পরিবার

প্রথম দর্শনে দলের মধ্যে আমার সব চাইতে ভাল লাগল লুবভ সের্গেয়েভ্‌নাকে; কোলে একটা পোষা কুকুর, পায়ে হাতে-বোনা পুরু মোজা, সিঁড়ি দিয়ে সকলের শেষে উঠতে উঠতে প্রতিবার আমার দিকে তাকিয়ে কুকুরটাকে চুমো খেল। দেখতে মোটেই ভাল নয়, লাল চুল, শুকনো দেহ, বেঁটে, আর কেমন যেন এক-পেশে। চুলটাও একদিকে টেনে বাঁধা। বন্ধুকে খুশি করার জন্যও তার মধ্যে ভাল কিছুই আবিষ্কার করতে পারলাম না। এমন কি বাদামি ভুরু দুটিও বড় বেশী ছোট ও গতানুগতিক; হাত দু'খানিও লাল ও কর্কশ।

বারান্দায় ওঠার পরে দিমিত্রির বোন ভারেংকা ছাড়া বাকি মহিলারা প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে দু'একটা কথা বলল; ভারেংকা হাঁটুর উপর একটা বই রেখে পড়তে শুরু করে দিল।

প্রিন্সেস মারিয়া আইভানভ্‌না চল্লিশ বছর বয়সের এক দীর্ঘাঙ্গী সম্ভ্রান্ত মহিলা। টুপির নীচ থেকে যেটুকু পাক-ধরা কোকরা চুল চোখে পড়ল তাতে তার বয়সটা আরও বেশী বলে ধরা যেত; কিন্তু তার সুন্দর তাজা মুখে একটা ভাঁজও পড়ে নি; বিশেষ করে তার বড় বড় দুটি চোখের ঝলকানি

দেখে তাকে আরও ছোট বলেই মনে হয়। তার চোখ দুটি বাদামি ও বিস্ফারিত; ঠোঁট দুটি একটু বেশী চাপা; নাকটা খাড়া, বাঁদিকে ঈষৎ বাঁকা; পুরুষালি হাতের সরু আঙুলে একটাও আংটি নেই।

বারান্দায় ঢুকতেই সে আমাকে হাত ধরে কাছে টেনে নিল; ভাল করে দেখে বললাম যে দিমিত্রির মুখে আমার কথা শুনে শুনে অনেক আগে থেকেই সে আমাকে চেনে, আর তাই একটা পুরো দিন এখানে কাটিয়ে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। শেষে বলল, "আমাদের কথা না ভেবে তোমার যা ইচ্ছা তাই করবে, ঠিক যেমন তুমি এসেছ বলে আমরাও খোলাখুলিভাবেই চলব। বেড়াও, খেল, পড়, গল্প কর, ঘুমাও— ভাল লাগে তো সবই করতে পার।"

সোফিয়া আইভানভ্না একজন বয়স্ক কুমারী, প্রিন্সেসের ছোট বোন, কিন্তু দেখে তাকেই বড় বলে মনে হয়। দুই বোন অনেকটা একই রকম দেখতে, শুধু মারিয়া আইভানভ্নার চুল কালো, চোখও কালো, আর সোফিয়া আইভানভ্না নীলকেশী ও নীলনয়না।

মহিলাটি যে ভাবে আমার দিকে তাকাল এবং যেরকম ভাব দেখাল তাতে প্রথমে তাকে খুব উদ্ধত প্রকৃতির মনে হওয়াতে আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে সে যখন বলল, "আমাদের বন্ধুর বন্ধুরা আমাদেরও বন্ধু" তখন আমি যেন লজ্জা রাখার আর জায়গা পেলাম না। তার সম্পর্কে আমার মনোভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল। কথাগুলি বলার পরেই সে যখন মুখটা একটু ফাঁক করে নীল চোখ দুটি ঘুরিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, অমনি কেন জানি না তার সম্পর্কে আমার সব ভয় কেটে গেল, আমি অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠলাম। তার চোখ দুটি আকর্ষণীয়, কণ্ঠস্বর সুরেলা ও প্রীতিপ্রদ; এমন কি সেই সময়ে তার গোলগাল গড়ণটাও আমার কাছে একেবারে খারাপ মনে হল না।

ভাবলাম, আমার বন্ধুর বন্ধু ল্যুবভ সের্গেয়েভ্না তখনই কোন বন্ধুত্বপূর্ণ গোপন কথা আমাকে বলবে; সে আমার দিকে নীরবে অনেকক্ষণ তাকিয়েও রইল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেবল জানতে চাইল আমি কোন্ ফ্যাকাল্টিতে পড়ছি। আবারও সে এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল; নিশ্চয় সেই গোপন কথাটি বলবে কি বলবে না তাই নিয়ে ইতস্তত করছে। শেষ পর্যন্ত বলল, "শুনেছি আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞানের দিকে সে রকম নজর দেওয়াই হয় না।"

সারাটা সন্ধ্যাই ল্যুবভ সের্গেয়েভ্না এই ধরনের আবোল-তাবোল অসংলগ্ন কথা বলে গেল। দিমিত্রি যতই জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাক, আমি কিন্তু ল্যুবভ সের্গেয়েভ্নার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যই দেখতে পেলাম না।

পরিবারের শেষ সদস্য ভায়েংকা একটি গোলগাল ষোল বছরের মেয়ে।

গুণের মধ্যে বড় বড় কালো চোখ, লম্বা নীল চুলের রাশি। আর অত্যন্ত নরম দুখানি সুন্দর হাত।

প্রিন্সেস জিজ্ঞাসা করল, "এখানে বেশ কিছুদিন থাকছ তো নিকলাস? কবে যাবে?"

"ঠিক জানি না, হয় তো কাল, আবার বেশ কিছুদিন থাকতেও পারি।" মুখে বললাম বটে, কিন্তু ঠিকই জানি যে পরদিনই চলে যাব।

দূরে চোখ রেখে প্রিন্সেস বলল, "আমার তো ইচ্ছা, আমাদের এবং দিমিত্রির খাতিরে তুমি কিছুদিন এখানে থেকে যাও। তোমাদের বয়সের বন্ধুত্ব এক আশ্চর্য জিনিস।"

"হ্যাঁ, আমার কাছে তাই," আমি বললাম। "দিমিত্রির বন্ধুত্ব খুবই প্রয়োজনীয়, কিন্তু তার কাছে আমার বন্ধুত্বে কোন প্রয়োজন নেই; আমার তুলনায় সে হাজার গুণ ভাল।"

প্রিন্সেস পুনরায় সেই অস্বাভাবিক হাসি হেসে উঠল যেটা তার পক্ষে স্বাভাবিক।

বলল, "কথাগুলি শুনতেও চমৎকার।"

অধ্যায়—২৪

প্রেম

পরে জেনেছিলাম, সোফিয়া আইভানভ্‌না সেই সব বিরল বয়স্কা নারীদের অন্যতম যারা পারিবারিক জীবন যাপনের জন্য জন্মগ্রহণ করলেও সে সুখ থেকে বঞ্চিত হয় এবং তার ফলে সহসা মনস্থির করে ফেলে যে অন্তরের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ও লালিত ভালবাসার সম্পদকে কয়েকজন মনের মত প্রিয় পাত্রের মধ্যে বিতরণ করে দেবে। আর এ ধরনের কুমারীদের ভালবাসার ভাণ্ডার এতই অফুরন্ত যে মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা অনেক হলেও সে ভালবাসার অনেকটাই বাকি থাকে, ফলে ভাল বা মন্দ যাদের সংস্পর্শেই তারা আসে তাদের উপরেই তা বর্ষিত হয়।

ভালবাসা তিন রকমের হয়:—

১) মনোহরণ ভালবাসা;

২) আত্মোৎসর্গকারী ভালবাসা; এবং

৩) সক্রিয় ভালবাসা।

একটি মেয়ের প্রতি যুবকের ভালবাসা, অথবা যুবকের প্রতি মেয়ের ভালবাসার কথা আমি বলছি না; এই সব মনোবৃত্তিকে আমি বড় ভয় করি; আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে এই ধরনের ভালবাসার মধ্যে সত্যের

একটু স্ফুলিঙ্গমাত্রও কখনও আমার চোখে পড়ে নি; দেখেছি কেবল সেই মিথ্যাচারকে যেখানে কাম-প্রবৃত্তি, বিবাহঘটিত সম্পর্ক, অর্থ, বন্ধনলাভ বা বন্ধনমুক্তির বাসনাই এত প্রবল থাকে যে মূল মনোভাবের তলাতল খুঁজে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। আমি বলছি মানবজাতির প্রতি সেই ভালবাসার কথা যেখানে মানুষ মানসিক শক্তির তারতম্য অনুযায়ী এক বা একাধিক লোককে বেছে নেয়, অথবা অনেকের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেয়: বলছি সহকর্মী, বন্ধু, বা দেশবাসীদের প্রতি মা, বা ভাই, বা ছেলে-মেয়েদের ভালবাসার কথা—মানুষের প্রতি ভালবাসার কথা।

উপরে উল্লেখিত তৃতীয় পর্যায়ের ভালবাসার আলোকই আমি দেখলাম সোফিয়া আইভানভ্‌নার চোখে, তার প্রতিটি কথায় ও কাজে। বোন-পোর প্রতি দিদির প্রতি, ল্যুবভ সের্গেয়েভ্‌নার প্রতি, এমন কি দিমিত্রির বন্ধু হিসাবে আমার প্রতিও তার এই সক্রিয় ভালবাসাই আত্মপ্রকাশ করেছে।

সোফিয়া আইভানভ্‌নার পরিপূর্ণ মূল্য আমি উপলব্ধি করেছিলাম আরও অনেক পরে, কিন্তু তখনও একটা প্রশ্ন আমার মনে থেকেই গিয়েছিল: চোখের সামনে সোফিয়া আইভানভ্‌নার মত মিষ্টি ও স্নেহময়ী মেয়েটি থাকতে দিমিত্রি হঠাৎ দুর্বোধ্য ল্যুবভ সের্গেয়েভানভ্‌নারকে ভালবাসতে গেল কেন? অবশ্য একথা তো ঠিক যে "গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না।" সে যাই হোক, ল্যুবভ সের্গেয়েভ্‌নার সঙ্গে দিমিত্রির পরিচয় তো খুব বেশীদিনের নয়, অথচ মাসির ভালবাসার স্বাদ তো সে পেয়েছে জন্ম থেকেই।

অধ্যায়—২৫
পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হল

আবার যখন বারান্দায় ফিরে গেলাম তখন কেউ আর আমার কথা বলছে না; অথচ ভারেংকা তখন পড়ছে না, বইটাকে একপাশে সরিয়ে রেখে অনেক আইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ ও কুসংস্কার। বিষয়টি খুবই তুচ্ছ, আর পরিবারটির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িতও নয়; তবু তাকে ঘিরেই বাকবিতণ্ডা চরমে উঠেছে এবং অন্য সকলে সক্রিয়ভাবে তাতে যোগ না দিলেও কোন না কোন পক্ষকে সমর্থন করছে।

যাই হোক, একসময় বিতণ্ডা যথারীতি থেকে গেল। কারও মনে বিশেষ কোন রেশও থাকল না। সোফিয়া আইভানভ্‌না একবার বোন-পোর দিকে, একবার বোন-ঝির দিকে, একবার আমার দিকে তাকিয়ে বইটা তুলে নিয়ে ভারেংকার হাতে দিয়ে বলল, "ভারিয়া, তুমি বরং পড়া শুরু কর; আমার খুব ভাল লেগেছে। আর মিত্‌য়া, তুমি বরং গানের উপর কিছু একটা

জড়িয়ে নাও গে, নইলে যে রকম হাওয়া দিচ্ছে তাতে তোমার দাঁতের ব্যথাটা নতুন করে দেখা দিতে পারে।”

পড়া শুরু হল। তার সুরেলা গলা শুনতে শুনতে আমি একবার তার দিকে তাকালাম, তারপর ফুলবাগানের পথের দিকে; পথের বালির উপর এবং গাছের পাতায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে; মেঘের ফাঁক দিয়ে এসে অস্ত-সূর্যের রাঙা আলো বুড়ো বার্চ গাছের ভেজা পাতার উপর পড়ে ঝিকমিক করছে। তারপর তাকালাম ভারেংকার দিকে; মনে হল প্রথম দর্শনে তাকে যতটা সাদাসিদে মনে হয়েছিল তা সে নয়।

আরও মনে হল, “আমি ওর প্রেমে পড়েছি, আর ভারেংকা সোনেচ্‌কা নয়। আহা! হঠাৎ যদি আমি এই পরিবারের একজন হতে পারতাম! তাহলেই তো পেয়ে যেতাম মাকে, মাসিকে, আর স্ত্রীকে।” ভারেংকা তখনও পড়েই চলেছে। তার দিকে চোখ ফিরিয়ে ভাবলাম, চুম্বকের মত আকর্ষণ করে ওর চোখ দুটিকে যদি আমার দিকে ফেরাতে পারতাম! বই থেকে মুখ তুলে ভারেংকা আমার দিকে একবার তাকিয়েই আমার সঙ্গে চোখে চোখ পড়াতে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

অকারণেই বলে উঠল, “বৃষ্টি এখনও থামে নি।”

সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য অনুভূতি জাগল আমার মনে। হঠাৎ মনে পড়ল, এইমাত্র আমার মনে যা ঘটছে সেটা যেন আগেকার আর একটি ঘটনার হুবহু পুনরাবৃত্তি; তখনও ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছিল, বার্চ গাছের আড়ালে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, আমি তার দিকে তাকিয়েছিলাম, মেয়েটিও পড়ছিল, চুম্বকের মত আমি তাকে আকর্ষণ করলাম, সে মুখ তুলে তাকাল; মনে পড়ল, এসবই আগে ঘটেছিল।

ভাবলাম, “এই কি সেই? সেই মেয়ে? এই কি তবে শুরু?” কিন্তু তখনই মনে হল, এ তো সে নয়, আর এটা শুরুও নয়। “প্রথমত এ সুরূপা নয়; তাছাড়া, এ তো একটি অতি সাধারণ মেয়ে, আর এর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে অত্যন্ত গতানুগতিকভাবে; অথচ সে হবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটবে কোন এক অসাধারণ পরিবেশে; আরও একটা কথা, এই পরিবারটি আমাকে এত খুশি করেছে কারণ এখনও আমি বিশেষ কিছুই দেখি নি; নিশ্চয় এ ধরনের আরও অনেক পরিবার আছে, আর জীবনের পথে চলতে আরও অনেকের সঙ্গেই আমার দেখাও হবে।”

অধ্যায়—২৬
আমিও একজন

বই পড়া শেষ হল চায়ের সময়। মহিলারা এমন সব মানুষ ও বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করল যার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় ছিল না; তাই চুপচাপ বসে থাকলাম। অবশ্য সাধারণ আলোচনার সময় আমি বেশ ভালভাবেই মুখ খুললাম, এবং আমার বিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও মৌলিকতা দেখাতে চেষ্টা করলাম। আমিও যে একজন সেটা তাদের বোঝাতেই হবে। বিশেষ করে আমার ইউনিফর্মের মর্যাদা তো রাখতে হবে। গ্রামাঞ্চলের বাড়ির কথা উঠতেই আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, মস্কোর কাছে প্রিন্স আইভান আইভানিচের এমন একটা পল্লী-ভবন আছে যেটা দেখতে লণ্ডন ও প্যারিস থেকেও লোক আসে; সেখানে এমন একটা রেলিং দিয়ে ঘেরা জায়গা আছে যেটা বানাতে তিন শ' আশী হাজার রুবল খরচ হয়েছে; প্রিন্স আইভান আইভানিচ আমার খুব নিকট আত্মীয়, আজই তার সঙ্গে ডিনার খেয়েছি, আর সারা গ্রীষ্মকালটা সেই ভিলাতে কাটাবার জন্য প্রিন্স আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছি, কারণ সে বাড়িটা আমার চেনা, অনেকবার সে বাড়িতে গিয়েছি; তাছাড়া ওইসব ঘেরা জায়গা, নকল সেতু আমার মোটেই পছন্দ নয়; আমি চাই গ্রামের বাড়ি গ্রামের মতই হবে। এইসব ভয়ানক মিথ্যা কথাগুলি বলতে গিয়ে আমি কেমন যেন ঘাবড়ে গেলাম, এমনভাবে চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল যে আমার মনে হল সকলেই মিথ্যাটা ধরে ফেলেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ভারেংকা এক কাপ চা এনে আমার হাতে দিল, আর সোফিয়া আইভানভ্নাও সেখান থেকে সরে গিয়ে অন্যের সঙ্গে গল্প শুরু করে দিল।

তবু যে মিথ্যা কথাগুলি বললাম তার কারণ প্রিন্স আইভান আইভানিচ যে আমার আত্মীয় এবং সেইদিনই যে তার সঙ্গে আমি ডিনার খেয়েছি সেটা জানাবার আর কোন অজুহাত আমি খুঁজে পাই নি।

চায়ের পরে বৃষ্টি থেমে গেল। আকাশ পরিষ্কার ও শান্ত। প্রিন্সেস প্রস্তাব করল, সকলে মিলে নীচের বাগানে বেড়াতে যাওয়া হোক। পুনরায় মৌলিকতা দেখাবার লোভে আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ আমি ঘৃণা করি, আর বেড়াতে হলে একলা বেড়ানো পছন্দ করি। কথাটা যে অত্যন্ত রুক্ষ ও কঠোর এবং শালীনতাবিরুদ্ধ সেটা একদম বুঝতেই পারলাম না। যাই হোক, মনের মত একটা জবাব দিতে পারার আনন্দে সকলের সঙ্গেই বেড়াতে বের হলাম।

প্রিন্সেসের মনোমত জায়গাটাতে পৌঁছে মাথা নেড়ে সে বলল, "আঃ কী চমৎকার!"

সব বিষয়েই যে আমার একটা নিজস্ব বক্তব্য আছে সেটা বোঝাতে আমি বললাম, "হ্যাঁ, খুব সুন্দর, কিন্তু বড় বেশী থিয়েটারের সিনের মত দেখাচ্ছে।"

প্রিন্সেস কিন্তু আমার কথায় কান না দিয়ে পরিবেশ বর্ণনাই চালিয়ে যেতে লাগল। দিমিত্রি মার কথায় বাধা দিয়ে বলল, দিগন্ত যেখানে সীমিত সে স্থান কখনও সুন্দর হতে পারে না। ভারেংকা কোন কথা না বলে নীচের জলের দিকে তাকিয়েছিল। দেখতে ছোটখাট হলেও সেই ভঙ্গীতে তাকে আবার ভাল লাগল। মনে মনে বললাম, এই কি তাহলে শুরু? কিন্তু নিজেই উত্তর দিলাম, আমি তো সোনেচ্‌কাকে ভালবাসি, আর ভারেংকা একটি সাদা-সিদে মহিলা, আমার বন্ধুর বোন। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাকে আমার ভাল লাগল; একটা কিছু করার বা বলার ইচ্ছা হল।

যাতে ভারেংকা শুনতে পায় সেজন্য তার আরও কাছে গিয়ে বন্ধুকে বললাম, "দেখ দিদিত্রি, মশা যদি বা না থাকে তবু জায়গাটা এমন কিছু আহা-মরি নয়। আর—" বলেই কপালে চড় মেরে একটা মশাকে বধ করে বললাম, "কী ভয়ংকর রে বাবা!"

মুখ না ফিরিয়েই ভারেংকা আমাকে বলল, "তাহলে প্রকৃতিকে তুমি ভালবাস না?"

আমি বললাম, "প্রকৃতির পূজা করা একটা অলস, অদরকারি কাজ।"

এই মৌলিক অথচ কড়া কথাটা বলতে পারায় আমি খুব খুশি হলাম। মুহূর্তের জন্য ভারেংকা ভুরু তুলে সোজা আমার দিকে তাকাল।

পরবর্তীকালে একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এই ছবিটি অনেকবারই কল্পনায় আমার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে।

অধ্যায়—২৭
দিমিত্রি

বেড়িয়ে ফিরে এসে সন্ধ্যাবেলা ভারেংকা সাধারণত গান করে, কিন্তু সেদিন গাইতে চাইল না; আমার নিশ্চিত ধারণা তার কারণটা আমি; নীচের বাগানে সেতুর উপর দাঁড়িয়ে আমি তাকে যে কথা বলেছিলাম সেটাই কারণ। নেখ্‌লুদভ পরিবারে রাতের আহারের ব্যবস্থা নেই; সকলেই সকাল-সকাল শুতে যায়। দাঁতের ব্যথাটা বেড়ে যাওয়ায় দিমিত্রি সেদিন আরও সকালে তার ঘরে চলে গেল। নীল কলার ও বোতামের মর্যাদা অনুযায়ী কাজ করে সকলকে খুশি করতে পেরেছি ভেবে আমি বেশ খোস-মেজাজেই ছিলাম। কিন্তু বিকেলের ঝগড়া আর দাঁতের ব্যথার জন্য দিমিত্রির মেজাজটা ছিল খিটখিটে। টেবিলে বসে সে খাতাপত্র বের করে নিল—দিন-পঞ্জীতে অতীত ও ভবিষ্যতের

সব কাজের কথা সে লিখে রাখে। ভুরু কুঁচকে হাতটা গালে চেপে সে অনেকক্ষণ ধরে লিখল।

দাসী এসে জানতে চাইল তার দাঁতে সেঁক দিতে হবে কি না। "আঃ, আমাকে একটু একলা থাকতে দাও।" বলে দাসীকে তাড়িয়ে দিল। আমাকে বলল, একটু পরেই তোমার বিছানা করে দেওয়া হবে। বলেই সে ল্যুভব সের্গেয়েভ্না‌র কাছে গেল।

একা বসে আমি ভাবতে লাগলাম, "কী দুঃখের কথা যে ভারেংকা সুন্দরী নয়—সোনেচ্‌কা নয়! বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে এসে যদি এদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারতাম তাহলে কী খুশি হতাম। বলতাম, 'প্রিন্সেস, আমি আর যুবকটি নই, গভীরভাবে ভালবাসতেও অক্ষম, তবু চিরদিন তোমাকে প্রিয় বোনটির মতই দেখব।' তার মাকে বলতাম, "আর তোমাকে তো আমি খুবই শ্রদ্ধা করি। আর তুমি সোফিয়া আইভান্‌ভনা, বিশ্বাস কর তোমাকেও আমি বড় বলেই মনে করি।' তারপরই সহজভাবে সরাসরি বলতাম: 'তুমি কি আমার স্ত্রী হবে?' 'হ্যাঁ' বলে সে তার হাতটা বাড়িয়ে দিত, আর আমিও সে হাতখানি চেপে ধরে বলতাম, 'আমার ভালবাসার প্রকাশ কথায় নয়, কাজে।" এইসব স্বপ্ন দেখতে এতই ভাললাগত যে ইচ্ছা হল বন্ধুকে সব কথা খুলে বলি। কিন্তু সেটা যে একেবারেই অসম্ভব।

দাঁতে কয়েক ফোঁটা ওষুধ লাগিয়ে দিমিত্রি ফিরে এল যন্ত্রণায় আরও বেশী খিটখিটে হয়ে। আমার বিছানা তখনও করা হয় নি। দিমিত্রির চাকর ছেলেটা এসে জানতে চাইল আমি কোথায় শোব।

"ওঃ, উচ্ছন্নে যাও সব!" মেঝেতে লাথি মেরে দিমিত্রি চেঁচিয়ে ডাকল, "ভাস্কা, ভাস্কা, ভাস্কা!' ভাস্কা, আমার বিছানাটা মেঝেতে করে দাও।"

আমি বললাম, "না, মেঝেতে আমি শোব।"

"তাতে কিছু যায়-আসে না। যেখানে হোক কর।" দিমিত্রি রাগী গলায় বলল।

কি করবে বুঝতে না পেরে ভাস্কা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তা দেখে রাগে ফেটে পড়ে দিমিত্রি চেঁচিয়ে বলল, "কি হল তোমার? শুনতে পাচ্ছ না? আমি যা বলছি তাই কর।"

ভাস্কা তবু চুপ করে আছে দেখে দিমিত্রি বলে উঠল, "তোমরা আমাকে কি খুন—পাগল করে ছাড়বে?" লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে ছুটে গিয়ে ভাস্কার মাথায় কয়েকটা ঘুষি মারল। সে বেচারি ছুটে পালিয়ে গেল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দিমিত্রি আমার দিকে তাকাল। মুহূর্ত আগে তার মুখে যে ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতা ফুটে উঠেছিল তা বদলে গিয়ে এখন সেখানে ফুটে উঠেছে এমনি এক শান্ত, লজ্জিত, ও ছেলেমানুষি ভাব যে তা দেখে আমারই দুঃখ হল। সেখান থেকে সরে যেতে চাইলাম, কিন্তু কিছুতেই পারলাম না।

সে বার বার আমার দিকে তাকাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আমি হেসে ফেললাম। সেও হাসল।

বলল, "কেন বলছ না যে আমি একটা জঘন্য কাজ করেছি? সেটাই তো তুমি ভেবেছ।"

"হ্যাঁ, কাজটা ভাল কর নি। তোমার কাছে এটা আশা করি নি। ভাল কথা, তোমার দাঁত কেমন আছে?"

"অনেক ভাল। হায় বন্ধু নিকলেংকা—" অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে দিমিত্রি বলতে লাগল; তার দুই চোখে অশ্রুবিন্দু টলমল করে উঠল। "আমি জানি, আমি বুঝি আমি খারাপ; ঈশ্বর জানেন ভাল হতে আমি কত চেষ্টা করি, তাঁকে কত বলি আমাকে ভাল করে দাও। কিন্তু আমার মেজাজ যদি এত ভয়ানক খারাপ হয় তার আমি কি করতে পারি? আমি তো নিজেকে সংযত করতে, সংশোধন করতে চেষ্টা করি। কিন্তু একা একা আমি যে কিছুই করতে পারি না। একজন কারও সাহায্য ও সমর্থন আমার বড় দরকার। অবশ্য ল্যুবভ সের্গেয়েভ্‌না আমাকে বুঝতে পারে, এ ব্যাপারে অনেক সাহায্য করে। দিন-পঞ্জী দেখেই বুঝতে পারি, গত এক বছরে আমার অনেক উন্নতি হয়েছে। আঃ, বন্ধু নিকলেংকা! তার মত একটি নারীর প্রভাব যে কত দামী! হে ঈশ্বর! আমি যখন স্বাধীন হব তখন তার মত বন্ধুকে কাছে পেলে আমার কত ভালই না হবে! তাকে কাছে পেলে আমি একটি আলাদা মানুষ হয়ে যাই।"

তারপরেই তার ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা—বিয়ে, পল্লী-জীবন ও অবিরাম আত্ম-উন্নতির কথা দিমিত্রি আমার কাছে খুলে বলল।

"আমি গ্রামেই বাস করব। তুমি হয় তো মাঝে মাঝে দেখা করতে আসবে। তখন তো তুমি সোনেচ্‌কাকে বিয়ে করবে। আমাদের ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে খেলা করবে। অবশ্য এ সবই এখন হাস্যকর শোনাচ্ছে, কিন্তু একদিন তো সত্যি হতেও পারে।"

হেসে বললাম, "তা তো বটেই। কেন হবে না?" সঙ্গে সঙ্গেই ভাবলাম, তোমার বোনকে বিয়ে করলে তো আরও ভাল হয়।

একটু চুপ করে থেকে সে বলল, "তবু বলি, তুমি তো ভাবছ যে সোনেচ্‌কাকে ভালবাস, কিন্তু আমার ধারণা সেটা গুরুতর কিছু নয়: সত্যিকারের ভালবাসা কি তা তুমি জানই না।"

কোন জবাব দিলাম না; এ বিষয়ে তার সঙ্গে আমি একমত।

দিমিত্রিই আবার বলল, "তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ, আজ আবার আমার মাথায় সেই জঘন্য রাগের ভূত চেপেছিল; তোমার সামনেই ভারিয়ার সঙ্গে একচোট ঝগড়া হয়ে গেল। যদিও অনেক ব্যাপারেই সে এমন সব কথা ভাবে যেটা ঠিক নয়, তবু সে চমৎকার মেয়ে; ঘনিষ্ঠভাবে মিশলে বুঝতে পারবে সে

কত ভাল।”

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে সে যে বোনের গুণ-কীর্তন শুরু করল তাতে আমি খুবই খুশি হলাম। তবু তার বোন সম্পর্কে কিছু না বলে অন্য প্রসঙ্গ শুরু করলাম।

কথা বলতে বলতে দ্বিতীয়বার মোরগ ডেকে উঠল। জানালায় ভোরের ম্লান আলো দেখা দিল। তখন দিমিত্রি বিছানায় উঠে আলো নিভিয়ে দিল।

বলল, “এবার শুয়ে পড়।”

বললাম, “যাচ্ছি ; আর একটা কথা।”

“বল

“জীবন এক মহান বস্তু, তাই না ?”

“হ্যাঁ, তাই,” এমন গলায় সে জবাব দিল যে অন্ধকারেও আমি যেন দেখতে পেলাম তার চোখের অনুরাগসিক্ত দৃষ্টি আর ছেলেমানুষি হাসি।

অধ্যায়—২৮

গ্রামে

পরদিন ভলদিয়া ও আমি একটা ডাক-গাড়িতে চেপে গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। পথে যেতে যেতে মস্কোর সব স্মৃতি মনে পড়তে লাগল। মনে পড়ল সোনেচ্‌কাকেও। ভাবলাম, “কী আশ্চর্য, ভালবেসেও আমি সেকথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম ; তার কথা তো আমাকে ভাবতেই হবে।” এই সব ভাবতে ভাবতে গ্রামে পৌঁছবার পরেও দুদিন পর্যন্ত সকলের সামনে অনবরত চিন্তিত ও বিষণ্ণ হয়ে কাটালাম। বিশেষকরে সন্ধ্যার পরেই ভালবাসার কথাগুলি মনে পড়ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রাম্য জীবনের নতুন পরিবেশে ও কাজকর্মে এতই ডুবে গেলাম যে সোনেচ্‌কার প্রতি ভালবাসার কথাটা সম্পূর্ণ ভুলে গেলাম।

আমরা পেত্রভ্‌স্কয়েতে পৌঁছলাম রাতে। তখন আমি এত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন যে বাড়ি-ঘর, বার্চগাছে ঢাকা পথটা, বা বাড়ির অন্য লোকজন কারও দিকে তাকাই নি। সকলেই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কুব্জদেহ বুড়ো ফোকা খালি পায়ে মেয়েদের মত একটা ড্রেসিং গাউন পরে মোমবাতি নিয়ে এসে দরজা খুলে দিল। আমাদের দেখে সে তো আনন্দে নেচে উঠল। আমাদের কাঁধে চুমো খেল। ঘুমের মধ্যেই বারান্দা ও সিঁড়ি পার হয়ে গেলাম। কিন্তু পাশের ঘরের দরজার তালা, হুড়কো, বাঁকানো বোর্ডগুলো, ইস্ত্রি, পুরনো মোমবাতিদান—এ সব কিছুই আমার এত পরিচিত, এত বেশী স্মৃতি-সুধায় ভরা যে হঠাৎ এই অতি প্রিয় পুরনো বাড়িটাকে বড়ই ভাল লেগে গেল।

অবাক হয়ে ভাবলাম, 'এতকাল আমরা দুজন—বাড়িটা ও আমি—পরস্পরের কাছ থেকে দূরে ছিলাম কেমন করে?' অন্য ঘরগুলিও সেই রকমই আছে কিনা দেখতে ছুটে বেরিয়ে গেলাম। সবই এক আছে, কেবল সব কিছুই কেমন যেন ছোট হয়ে গেছে, আর আমি হয়ে গেছি অনেক লম্বা ও ভারী। কিন্তু বাড়িটা যেন সানন্দে সেই আগেকার আমাকেই বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। প্রতিটি মেঝে, প্রতিটি জানালা, সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ, প্রতিটি শব্দ আমার মনের মধ্যে মধুর অতীতের একটা জগতকেই জাগিয়ে তুলল—যে জগত আর কোনদিন ফিরে আসবে না।

আমরা শুয়ে পড়লাম। শুভরাত্রি জানিয়ে ফোকা চলে গেল।

ভলদিয়া বলল, "এই ঘরেই মামণি মারা গিয়েছিল, তাই না?"

আমি জবাব দিলাম না; ঘুমের ভান করে চুপ করে রইলাম। কোন কথা বলতে গেলেই আমি চীৎকার করে কেঁদে উঠতাম। সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি বাপি ড্রেসিন-গাউন পরে, ফ্যান্সি চটি পায়ে ভলদিয়ার বিছানায় বসে তার সঙ্গে হেসে হেসে আলাপ করছে। খুশিতে লাফিয়ে উঠে আমার কাছে এসে সে আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে গালটা এগিয়ে দিল; আমার ঠোঁটের উপর চেপে ধরল।

ছোট ঝক্‌ঝকে চোখ দুটি তুলে আমার দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠল, "খুব ভাল করেছ কূটনীতিবিদ, ধন্যবাদ। ভলদিয়া বলছিল তুমি ভালভাবে পাশ করেছ; খুব ভাল কথা। দেখ, এখানে দিনগুলি খুব আনন্দে কাটছে; শীতকালে আমরা হয় তো সেণ্ট পিতার্সবুর্গে চলে যাব। তবে একটা দুঃখের কথা, শিকারের সময়টা পার হয়ে গেছে; নইলে তোমাদের নিয়ে অনেক আনন্দ করা যেত। যাই হোক, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তোমরা এখন বড় হয়েছ, এবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখ। আমার কর্তব্য শেষ, এবার তোমরা একাই পথ চলতে পারবে। কিন্তু যদি কখনও কোন পরামর্শ চাও তো বলো—এখন আর আমি তোমাদের বাপি নই, তোমাদের বন্ধু, কমরেড, পরামর্শদাতা, তার বেশী কিছু নয়।"

একটু থেমে আবার বলল, "এবার বল আমাদের সব আত্মীয়জনের সঙ্গে, আইভিনদের সঙ্গে দেখা করেছ তো? বুড়ো মানুষটির সঙ্গে দেখা করেছ? সে কি বলল? প্রিন্স আইভান আইভানিচের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে তো?"

কথা বলতে বলতে সূর্য জানালা ছাড়িয়ে উঠে গেল। ঘরে ঢুকল ইয়াকভ। সে তো চিরকালের বুড়ো; পিঠের উপর হাত রেখে আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতে বলতে থাকে "এবং তার পরে—"। সে বাবাকে জানাল, কালাশ প্রস্তুত।

বাপিকে শুধালাম, "তুমি কোথায় যাবে?"

"ওহো, ভুলেই গিয়েছিলাম আজ এপিফানভদের বাড়ি যাব বলে কথা দিয়েছিলাম। এপিফানভাকে মনে আছে তো? তোমার মামণির সঙ্গে দেখা করতে আসত। ওরা খুব ভাল লোক।" অভ্যাসমত কাঁধটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বাপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাপি চলে যেতেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্টুডেন্ট-কোটটা গায়ে চড়িয়ে আমি বৈঠকখানার দিকে চললাম। ভলদিয়ার কিন্তু কোন তাড়া নেই; অনেকক্ষণ ধরে সে ইয়াকভের সঙ্গে কাদাখোঁচা ও কাঠ-ঠোকরা পাখি কোথায় ভাল পাওয়া যায় তাই নিয়ে কথা বলতে লাগল।

পাশের ঘরেই বাপির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দ্রুত পা ফেলে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। পরনে কেতাদুরস্ত মস্কো কোট, গায়ে সুবাস। আমাকে দেখে হেসে মাথা নাড়ল। সকালে তার চোখে যে সুখের আভাসটুকু দেখেছিলাম সেটা এখনও চোখে পড়ায় আমি অবাক হলাম।

বৈঠকখানাটা আগের মতই ঝক্‌ঝকে আছে। ঘরটা খুব উঁচু, এক পাশে একটা হল্‌দেটে ইংলিশ পিয়ানো, বড় বড় জানালাগুলি খোলা, তার ভিতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সবুজ গাছের সারি আর বাগানের লাল-হলুদ পথ। মিমি ও ল্যুবচ্‌কাকে চুমো খেয়ে কাতেংকার দিকে পা বাড়াতে গিয়েই হঠাৎ মনে হল তাকে চুমো খাওয়াটা ঠিক হবে না; হঠাৎ থেমে চুপ করে গেলাম। কাতেংকা কিন্তু মোটেই বিব্রত হল না; সাদা হাতটা বাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার জন্য আমাকে অভিনন্দন জানাল। ভলদিয়া ঘরে ঢুকতেও সেই একই ব্যাপার ঘটল। বস্তুত, যাদের সঙ্গে একত্রে বড় হয়ে উঠেছি, দিনের পর দিন যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, প্রথম বিচ্ছেদের পরে তাদের সঙ্গে আবার দেখা হলে কিভাবে যে পরস্পরকে গ্রহণ করা উচিত সেটা স্থির করা বেশ শক্ত। ভলদিয়া কিন্তু কোনরকম বিব্রত বোধ করল না; তার দিকে তাকিয়ে মাথাটা একটু নুইয়ে ল্যুবচ্‌কার দিকে এগিয়ে গেল; কয়েকটি হাল্কা কথা বলে বেড়াতে বেরিয়ে গেল।

অধ্যায়—২৯
মেয়েদের প্রতি আমাদের মনোভাব

মেয়েদের সম্পর্কে ভলদিয়ার এমন সব অদ্ভুত ধারণা ছিল যার ফলে বিচিত্র সব প্রশ্ন নিয়েও সে মাথা ঘামাত; যেমন: তাদের কি ক্ষিধে পায়? তারা কি অনেক বেশী ঘুমোয়? তারা কি ঠিকমত পোশাক পরে? তারাও কি ফরাসী ভাষায় ভুল করে? কিন্তু সে কখনও স্বীকার করত না যে মেয়েরা কোন মানবিক বিষয় নিয়ে ভাবতে পারে বা অনুভব করতে পারে। তাদের

সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে বলেও সে মনে করত না। কেউ যদি কালে-ভদ্রে কোন গুরুতর প্রশ্ন নিয়ে তার কাছে আসত, কোন উপন্যাস বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার ব্যাপারে তার মতামত জানতে চাইত, তাহলে সে ঠোঁট বেঁকিয়ে নিঃশব্দে সরে যেত, অথবা ভাঙা ফরাসীতে জবাব দিত comme ci tri joli (কী সুন্দর), অথবা অনুরূপ কোন কথা। ল্যুবচ্‌কা বা কাতেংকার কাছ থেকে কথাগুলি জেনে নিয়ে আমি যদি কখনও তার সামনে তার পুনরাবৃত্তি করি তাহলেই সে বলে ওঠেঃ "হুম। তুমি দেখছি এসব নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা কর। তুমিও দেখছি আজকাল বাজে কাজের ব্যাপারি হয়ে উঠেছ।"

সারা গ্রীষ্মকালটা ভলদিয়া বিরক্তি নিয়েই কাটাল। আমাদের প্রতি তাচ্ছিল্যই তার এই বিরক্তির কারণ, আর সে ব্যাপারে তার কোন লুকোচুরিও ছিল না। তার মুখের ভাবই যেন বলে দিতঃ "উঃ! কী বিরক্তিকর! কথা বলার মত একটা লোক পর্যন্ত নেই।"

সকালে সে হয় শিকারে বের হত, না হয় নিজের ঘরে বসে বই পড়ত। বাপি বাড়ি না থাকলে একটা বই সঙ্গে নিয়েই খেতে বসত, আর আমাদের সঙ্গে কোনরকম বাক্যালাপ না করে বইটা পড়ে যেত। সন্ধ্যায়ও বৈঠকখানায় সোফায় টান-টান হয়ে শুয়ে কনুইতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ত, অথবা অদ্ভুত সব গল্প শোনাত—অনেক সময়ই গল্পগুলি রুচিসম্মত হত না; মিমি ভীষণ রেগে যেত আর আমরা হেসে খুন হতাম; কিন্তু একমাত্র বাপি এবং কখনও-সখনও আমি ছাড়া আর কারও সঙ্গে সে কখনও কোন গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনাই করত না।

নিজের অজান্তেই মেয়েদের সম্পর্কে তার এই মনোভাবকে আমিও অনেক সময় অনুকরণ করতাম। যেমন, যেমন, ল্যুবচ্‌কা যখন প্রতি রাত্রে বাপির সামনে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকত, ভজনালয়ে মামণির জন্য সমবেত প্রার্থনার সময় সে ও কাতেংকা যখন চোখের জল ফেলত, অথবা পিয়ানো বাজাবার সময় কাতেংকা যখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ দুটি ঘোরাত, তখন আমি নিজেকেই প্রশ্ন করতামঃ কবে থেকে এরা বড়দের মত ভান করতে শিখল? কেনই বা সেজন্য এরা লজ্জাও বোধ করে না?

অধ্যায়—৩০

আমার নতুন কাজকর্ম

তথাপি অন্যান্য বছরের তুলনায় সেই গ্রীষ্মকালটাই আমাকে এইসব তরুণীদের অনেক বেশী কাছে নিয়ে গেল আর তার কারণ আমার সদ্য-জাগ্রত সঙ্গীত-

পিপাসা। সেই বসন্তকালে একটি প্রতিবেশী যুবক আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে; বৈঠকখানায় ঢুকেই সে পিয়ানোটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, এবং মিমি ও কাতেংকার সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে চেয়ারটাকে টেনে-টেনে পিয়ানোর কাছে নিয়ে গেল। অল্প কিছুক্ষণ আবহাওয়া এবং পল্লী-জীবনের সুখ-সুবিধার কথা বলেই সে কৌশলে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে পিয়ানোর সুরকার, বাজনা, ও পিয়ানোর প্রসঙ্গ তুলে শেষ পর্যন্ত জানাল যে সে নিজেও পিয়ানো বাজায়। সত্যি সত্যি সে তিনটে ওয়াল্‌জ্‌ বাজাল। ল্যুবচ্‌কা, মিমি ও কাতেংকা পিয়ানোটা ঘিরে দাঁড়িয়ে বাজনা শুনল। যুবকটি আর কোনদিন আসে নি; কিন্তু তার বাজনা আমার খুব ভাল লেগেছিল; বিশেষ করে ভাল লেগেছিল তার বাজাবার ভঙ্গীটা। আর সেই থেকেই পিয়ানো বাজাবার বাসনা জাগল আমার মনে। ভাবলাম, সে প্রতিভা তো আমার আছে, আছে সঙ্গীতের প্রতি ভালবাসা। অতএব পিয়ানো শেখা শুরু করে দিলাম। আসলে কিন্তু পিয়ানো বাজানোটা আমার কাছে ছিল মেয়েদের মনোযোগ আকর্ষণ করার একটা উপায় মাত্র। কাতেংকার কাছেই শুরু হল আমার প্রথম পাঠ। দু'মাসের একাগ্র চেষ্টাতেই আমি বেশ কয়েকটা গৎ বাজাতে শিখলাম। ক্রমে নিজেই বিঠোভেন বাজাতে লাগলাম। কিন্তু আমার পিয়ানো শেখার পিছনে আসল উদ্দেশ্য যাই থাকুক, এখন মনে হয় আমার মধ্যেই কিছুটা সঙ্গীত-প্রতিভা ছিল, কারণ বাজনা শুনে অনেক সময় চোখে জল আসত, আর বাজনা আমার মনকে ভরিয়ে দিত। তাই এখন মনে হয় জগা-খিচুড়ি ঢঙে বাজনা না শিখে, সেটাকে মেয়েদের মন ভোলানোর যন্ত্র হিসাবে না দেখে, তখন যদি কেউ আমাকে বাজনাকে মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করার শিক্ষা দিত তাহলে আমি হয় তো একজন ভাল সঙ্গীতবিদ্‌ হতে পারতাম।

ভলদিয়া অনেক ফরাসী উপন্যাস সঙ্গে এনেছিল। সেগুলো পড়াও আমার আর একটা কাজ হয়ে উঠল। সেই সময় "মন্টি ক্রিস্টো" এবং নানা রহস্য-উপন্যাস সবে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। সু, ডুমা ও পল দ কক-এর উপন্যাস-সাগরে ডুবে গেলাম। পড়তে পড়তে এমন অবস্থা হল যে উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্র, তাদের অনুভূতি, এবং ঘটনার সঙ্গে আমি যেন একাত্ম হয়ে উঠতাম।

সেই গ্রীষ্মে যে শ'খানেক উপন্যাস পড়েছিলাম তার একটিতে একজন উগ্র স্বভাবের নায়ক ছিল; তার ভুরু দুটি ছিল খুব ঘন। আমার ইচ্ছা হল, নিজের চেহারাটাকে ঠিক তার মত বানাব। আয়নায় নিজের ভুরু দেখে মনে হল, কিছুটা ছাঁটলেই ভুরু আরও ঘন হয়ে উঠবে। ছাঁটতে গিয়ে এক জায়গায় একটু বেশী ছাঁটা হয়ে যাওয়াতে সবটাই সেই মাপে কাটতে হল। তারপর আয়নায় মুখ দেখে আমি তো ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম; ভুরু যে একেবারেই নেই; ফলে মুখটা কুৎসিত দেখাচ্ছে। বাড়ির লোকরা এ

অবস্থায় আমাকে দেখলে কী বলবে। যাই হোক, ভলদিয়ার কাছ থেকে খানিকটা পাউডার এনে ভুরুতে ঘসে দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলাম। পাউডারটা জলে উঠল না বটে, কিন্তু আমাকে দেখতে হল মুখ-পোড়া মানুষের মত। আমার কৌশলটা কেউ ধরতে পারল না। একসময় নায়কটির কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেলাম। পরে অবশ্য আমার ভুরু দুটো বেশ ঘন হয়েই গজিয়েছিল।

অধ্যায়—৩১

ভদ্দরলোক

নানাভাবে মানবজাতির শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে— ধনী ও দরিদ্র, ভাল ও মন্দ, সৈনিক ও নাগরিক, বুদ্ধিমান ও বোকা ইত্যাদি। অবশ্য প্রত্যেক মানুষই তার পছন্দমত নীতি অনুসারে শ্রেণীবিভাগের কাজটি করে থাকে। যে সময়ের কথা লিখছি তখন আমার প্রধান ও মনোমত নীতি ছিল, যারা ভদ্দবলোক এবং যারা ভদ্দবলোক নয়। যারা ভদ্দরলোক তাদেরই আমি মেলামেশার যোগ্য বলে মনে কবতাম; অপব শ্রেণীটিকে ঘৃণা করতাম, এমন কি তাদের ক্ষতিকর বলে মনে করতাম। এই ভদ্দরলোক হবার প্রথম ও প্রধান মাপকাঠি ছিল ফরাসী ভাষার উৎকৃষ্ট জ্ঞান, বিশেষ করে শুদ্ধ উচ্চাবণ। যে লোক ফরাসী উচ্চারণ শুদ্ধভাবে করতে না পারে তার প্রতি আমার মনে ঘৃণাব উদ্রেক হয়। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সঙ্গে আমি তাকে মনে মনে প্রশ্ন করি: “যখন জান না তখন আমাদেব মত কথা বলতে চাও কেন?” ভদ্দরলোক হবার দ্বিতীয় শর্ত—লম্বা, পবিষ্কার, পালিশ-করা নখ, তৃতীয়—অভিবাদন, নৃত্য ও সংলাপের জ্ঞান, চতুর্থটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ—সমস্ত কিছুব প্রতি ঔদাসিন্য ও নির্বিকারতা। এ ছাড়া, কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ থেকেও আমি একটি লোকের শ্রেণী নির্ধারণ করতে পারতাম। তার মধ্যে ঘবের সাজসজ্জা, তার মোহর, তার হস্তাক্ষর, গাড়ি ও ঘোড়া ছাড়াও প্রধান লক্ষণ ছিল তার পদযুগল। ট্রাউজারের সঙ্গে বুটেব মিল কতটা তা থেকেই একটি লোকের মর্যাদা আমার চোখে ধবা পড়ত।

এটা খুবই আশ্চর্য যে নিজের ভদ্দরলোক হবার কোন যোগ্যতা না থাকলেও এই ধারণাটা আমাব মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। হয় তো ভদ্দর-লোক সাজবার জন্য তখন আমাকে যে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হত তার জন্যই ধারণাটা আমার মনের এত গভীরে শিকড় গাড়তে পেরেছিল। এখন মনে করতেও ভয় হয় যে জীবনের শ্রেষ্ঠকাল ষোল বছর বয়সে এই গুণটি অর্জন করতে কত অমূল্য সময়ই ব্যয় করেছি। আমি যাদের অনুকরণ করতাম—যেমন ভলদিয়া, দুব্‌কভ ও আরও অনেক পরিচিত জন—তাদের কাছে

কিন্তু ব্যাপারটা খুব সহজেই ঘটত বলে আমার মনে হত। তাদের আমি ঈর্ষার চোখে দেখতাম, আর গোপনে অবিরাম চেষ্টা করতাম ফরাসী শিখতে, অভিবাদনের রীতি আয়ত্ত করতে, সংলাপ, নাচ ও ঔদাসিন্য আয়ত্ত করতে। সুচারুভাবে নখ কাটতে গিয়ে কতদিন কাঁচিতে আঙুল কেটে ফেলেছি, অথচ মনে হত যেন কিছুই শেখা হয় নি। কেবলই মনে হত, এই ভদ্দরলোকত্ব আয়ত্ত করতে না পারলে জীবনে কোন ভাল জিনিসই করায়ত্ত হবে না—সুখ নয়, গৌরব নয়। একজন খ্যাতনামা শিল্পী, বা পণ্ডিত, বা মানব-কল্যাণকারীকেও আমি শ্রদ্ধা করতে পারি না যদি সে ভদ্দরলোক না হয়। যে লোক ভদ্দরলোক হতে পেরেছে সে তাদের সকলের চাইতে বড়; সে কখনও তাদের সঙ্গে একই সমতলে দাঁড়াতে পারে না: সে ভদ্দরলোক আর তারা কেউ তা নয়—সেটাই যথেষ্ট। এমনকি আমার মনে হত, আমার ভাই, বা বাবা-মাও যদি ভদ্দরলোক না হয় তাহলে সেটাকে আমি দুর্ভাগ্য বলেই মনে করতাম, তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই থাকত না।

যৌবনের কোন এক সময়ে অনেক ভুল-ভ্রান্তির পরে প্রত্যেক মানুষই মনে করে যে এবার তাকে সমাজ-জীবনে একটা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে, শিল্পের কোন একটা শাখাকে বেছে নিয়ে তাতেই আত্মনিয়োগ করতে হবে; কিন্তু ভদ্দরলোক শ্রেণীর মানুষদের বেলায় সেটা কদাচিৎ ঘটে। এমন অনেক অনেক বৃদ্ধ লোককে দেখেছি, এখনও দেখছি, যারা গর্বিত, আত্মবিশ্বাসী, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির অধিকারী হলেও লোকান্তরে যদি তাদের প্রশ্ন করা হয়: "তুমি কে? নীচে থাকতে তুমি কি কাজ করেছ?" তাহলে "আমি একজন পাক্কা ভদ্দরলোক" একথা ছাড়া আর কোন জবাবই তারা দিতে পারবে না।

সেই একই নিয়তি আমার জন্যও অপেক্ষা করে ছিল।

অধ্যায়—৩২
যৌবন

সেই গ্রীষ্মে নানান ধারণা আমার মাথার মধ্যে তালগোল পাকালেও তখন আমি যুবক, নির্দোষ, স্বাধীন ও প্রায় সুখী। প্রায়ই ভোরে ঘুম ভাঙত। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে একটা তোয়ালে নিয়ে, একখানা বই বগলে ফেলে বাড়ি থেকে আধা ভার্স্ট দূরে বার্চগাছের ছায়া-ঢাকা পথে চলে যেতাম নদীতে স্নান করতে। তারপর ঘাসের উপর টান-টান হয়ে শুয়ে পড়তাম; মাঝে মাঝে বই থেকে চোখ তুলে নদীর দিকে তাকাতাম; ভোরের বাতাসে নদীর ঢেউ লেগে সবুজ গাছপালার ছায়াগুলি কাঁপত; কখনও চোখ পড়ত

ওপারের হলুদ শস্য ক্ষেত; কখনও বা গাছের ডালে ছড়িয়ে পড়া প্রাতঃ সূর্যের লাল আভা।

ফিরতাম এগারোটা নাগাদ। মহিলারা সাধারণত চা খাওয়া শেষ করে যার যার কাজে হাত দিত। আমি বৈঠকখানায় গিয়ে বসতাম। জানালা দিয়ে কড়া রোদ এসে পড়ত। রোদের তাপ এড়াতে মিমি জানালা থেকে অপর জানালায় সরে সরে বসত। সোফায় বসে কাতেংকা হয় সেলাই করত, নয় তো পড়ত। ল্যুবচ্‌কা হয় ঘরের ভিতর পায়চারি করত, নয় তো বাগানে চলে যেত; গুন গুন করে পরিচিত সুর ভাঁজত।

নৈশ ভোজনের পরে কারও সঙ্গে বাগানে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে অন্ধকার গলি দিয়ে একলা যেতে ভয় করত—এসে বারান্দায় চলে যেতাম ঘুমতে; লাখ লাখ মশার কামড় সত্ত্বেও তাতে কী সুখই যে পেতাম! আকাশে যখন ভরা চাঁদ থাকত তখন বিছানায় বসে কত রাত যে কাটিয়েছি আলো-আঁধারির দিকে চোখ রেখে; কান পেতে শুনেছি নৈঃশব্দ্য ও শব্দের সুর; কত স্বপ্ন দেখেছি কাব্যময় সুখের, আর এই ভেবে কষ্ট পেয়েছি যে এখনও পর্যন্ত সে জীবন বাস্তবে রূপায়িত হয় নি।

ক্রমে রাত বাড়ে। ঘরে ঘরে আলো নিভে যায়। বাগানের দিকে মুখ রেখে বিছানায় শুয়ে পড়ি। মশা ও মাছির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য নিজেকে যথাসম্ভব ঢাকাঢুকি দিয়ে রাখি। বাগানের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রাতের শব্দ শুনতে শুনতে ভালবাসা ও সুখের স্বপ্ন দেখতে থাকি।

তখন সবকিছুই যেন নতুন এক তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিত। তারপরই সে দেখা দিত: মাথায় এক ঢাল কালো চুল, উদ্ধত বুক, সর্বদাই বিষণ্ণ অথচ সুন্দর, দুই বাহুতে উচ্ছ্বসিত আলিঙ্গন। সে আমাকে ভালবাসত, আর তার মুহূর্তের ভালবাসার জন্য আমার সারা জীবনটাই বিসর্জন দিতাম। কিন্তু চাঁদ ক্রমেই আরও উপরে উঠে আসত, উজ্জ্বলতর হত; ছায়ারা হত ঘনতর, আলো স্বচ্ছতর। সেদিকে চেয়ে চেয়েই শুনতে পেতাম কে যেন বলছে—তার উন্মুক্ত বাহুর অগ্নিময় আলিঙ্গন সত্ত্বেও সে যে সুখ থেকে অনেক অনেক দূরে; তার ভালবাসা আনন্দ হতে অনেক অনেক দূরে; যতই বেশী করে তাকাতাম মাথার উপরকার ভরা চাঁদের দিকে, যতই পৌঁছে যেতাম তাঁর সন্নিকটে যিনি সব রূপ ও আনন্দের উৎস, ততই যেন সত্যিকারের রূপ ও আনন্দ আমার কাছে ধরা দিত; অতৃপ্ত অথচ উচ্ছ্বসিত এক আনন্দের অশ্রুতে ভরে উঠত দুই চোখ।

কিন্তু তবু তো আমি একা; তবু মনে হত অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র পার্থিব কামনা-বাসনায় জর্জরিত হলেও আমার অন্তরেই আছে কল্পনা ও ভালবাসার এক অসীম শক্তি—সেইসব মুহূর্তে মনে হত যেন এই প্রকৃতি, ঐ চাঁদ, আর আমি মিলে-মিশে একাকার।

অধ্যায়—৩৩
প্রতিবেশীরা

আমরা গ্রামের বাড়িতে আসার প্রথম দিনেই বাপি এপিফানভ পরিবারের এত প্রশংসা করায় এবং তাদের বাড়িতে যাওয়ায় আমি খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। তাদের ও আমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে একটা মামলা চলছিল। ছোট বেলায় এই মামলার ব্যাপারে বাপিকে অনেকবার রাগারাগি করতে শুনেছি; ইয়াকভকে বলতে শুনেছি তারা আমাদের শত্রু, "খারাপ লোক"; মনে পড়ে মামণি সকলকেই অনুরোধ করত। এ-বাড়িতে বা তার সমুখে কেউ যেন তাদের নাম উচ্চারণ না করে।

আন্না দিমিত্রিয়েভ্না এপিফানভা স্বামীর মৃত্যুর বিশ বছর আগে থেকেই তার থেকে আলাদাভাবে বাস করত—কখনও সেন্ট পিতার্সবুর্গে, কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই স্বগ্রাম মাইতিশ্চিতে, আমাদের গ্রাম থেকে তিন ভার্স্ট দূরে। তার জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেক ভয়ংকর কথাই চারদিকে বলাবলি করা হত। আর সেই জন্যই মামণি সকলকে বলে দিয়েছিল তার বাড়িতে যেন এপিফানভার নামও কেউ উচ্চারণ না করে। কিন্তু আন্না দিমিত্রিয়েভ্নার সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হল, তখন তার বাড়িতে মিত্যুশা নামক একজন চাষী-ম্যানেজার বাস করত। লোকটির চুল সব সময়ই কোঁকড়ানো ও পমেড-লাগানো থাকত, পরনে থাকত একটা সার্কাসীয় কোট; বাড়ির সব নৈশ ভোজের আসরেই সে দাঁড়িয়ে থাকত আন্না দিমিত্রিয়েভনার চেয়ারের পিছনে। তবু যে সব গুজব শুনেছিলাম সে রকম কিছুই মনে হয় নি। বস্তুত, তার কর্তব্যপরায়ণ ছেলে পেক্রুশাকে চাকরি থেকে ফিরিয়ে আনার পর থেকে গত দশ বছর ধরে আন্না দিমিত্রিয়েভ্না তার জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

আন্না দিমিত্রিয়েভ্নার জমিদারিটি ছোট; সর্বসাকুল্যে একশ'টি প্রাণী। অথচ আগেকার দশ বছরের ফূর্তিসর্বস্ব জীবনযাত্রার খরচ এতই বেড়ে গিয়েছিল যে জমিদারির উপর বর্তেছিল, মর্টগেজ ও দ্বিতীয় মর্টগেজের দায় এবং তার ফলে জমিদারিটি নিলামে বিক্রি হয়ে যাওয়া প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ছেলে তখন সেনাদলে চাকরি করে। একা মেয়েমানুষ সবদিক সামলাতে না পেরে এই পরিস্থিতিতে আন্না দিমিত্রিয়েভ্না ছেলেকে লিখল নিজে এসে জমিদারির হাল ধরতে।

পিয়তর ভাসিলেভিচ তখন চাকরিতে বেশ নাম করেছে; অচিরেই পদোন্নতির আশা করছে; তবু সবকিছু ছেড়ে দিয়ে অবসরভোগীদের তালিকায় নাম লিখিয়ে মায়ের কাছে ফিরে এল বৃদ্ধবয়সে তার সেবা করতে।

সাদাসিদে দেখতে হলেও পিয়তর ভাসিলেভিচ সুদৃঢ় নীতি ও উল্লেখযোগ্য বাস্তববোধসম্পন্ন মানুষ। ছোটখাট ঋণ, সাময়িক মীমাংসা, অনুরোধ ও প্রতিশ্রুতির সাহায্যে কোনরকমে সম্পত্তির দখলটা হাতে নিল। তারপর বাবার লোমের পাড়-বসানো কোটটা গায়ে চড়িয়ে গাড়ি ও ঘোড়া ছাড়িয়ে দিল, মাইতিশ্চিতে অতিথি-অভ্যাগতের আসা কমিয়ে দিল, নালা কাটাল, চাষের জমির পরিমাণ বাড়াল, চাষীদের জমির পরিমাণ কমিয়ে দিল, গাছ কাটিয়ে পাকা ব্যবসায়ীর মত বিক্রি করল; আর এইভাবে জমিদারিতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনল।

এইভাবে তিন বছরের মধ্যে সব ঋণ শোধ হয়ে গেল। এখানে পৌছেই সে প্রতিজ্ঞা করেছিল সব ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত বাবার "বেকেশা" ও নিজের ক্যানভাসের কোট ছাড়া আর কিছু পরবে না, এবং চাষীদের মাল-গাড়ি ছাড়া অন্য কোন গাড়িতে চড়বে না। ঋণ শোধ হবার পরে সেই প্রথম সে মস্কো থেকে ফিরল নতুন পোশাক পরে একটা "তারান্তা" গাড়ি চেপে। অবশ্য অবস্থার উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও সে কিন্তু কঠোর জীবনযাত্রাই চালাতে লাগল।

মা ও মেয়ের চরিত্র কিন্তু তার থেকে একেবারেই আলাদা। মা খুব আমুদে স্বভাবের মানুষ; হৈ-হল্লা করতে ভালবাসে। মেয়ে আভ্দোতিয়া ভাসিলেভ্না একটু গম্ভীর প্রকৃতির; উদাসীন ও স্বপ্নপ্রবণ; অকারণেই এক একসময় উদ্ধত হয়ে ওঠে।

দুজনের চরিত্রের এই পার্থক্য সত্ত্বেও কেমন করে যেন আমরা বুঝতে পারলাম অতীতের খোসমেজাজে হৈ-হল্লা করার জীবনকে ছাড়া আর কোন কিছুকেই মা কোনদিন ভালবাসে নি, কিন্তু আভ্দোতিয়া ভাসিলেভ্না সেই প্রকৃতির মানুষ যারা একবার ভালবাসলে সেই ভালবাসার মানুষটির জন্য সারা জীবনটাই বিসর্জন দিতে পারে।

অধ্যায়—৩৪

বাবার বিয়ে

বাবা যখন আভ্দোতিয়া ভাসিলেভ্না এপিফানভাকে দ্বিতীয় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করল তখন তার বয়স আটচল্লিশ বছর।

মনে হয়, বসন্তকালে বাবা যখন মেয়েদের নিয়ে একা গ্রামের বাড়িতে এসেছিল তখন তার মনের অবস্থা ছিল সেইসব জুয়ারির মত যারা অনেক টাকা জিতে খেলা ছেড়ে দিয়েছে। তার মনে হত, ভাগ্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার তখনও তার জন্য অপেক্ষা করে আছে, আর জুয়া খেলে সব উড়িয়ে না দিলে

সে জীবনে সফল হতে পারবে। তাছাড়া, তখন বসন্তকাল, অপ্রত্যাশিতভাবে তার হাতে এসেছে অনেক টাকা, আর সে নিজেও একেবারে একা; তাই খুবই একঘেয়ে লাগত। ইয়াকভের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে এপিফানভদের সঙ্গে মামলার কথা এবং সুন্দরী আভ্দোতিয়া এপিফানভার কথা মনে পড়াতে বাবা নিশ্চয় ইয়াকভকে বলেছিল, "তুমি তো সবই জান ইয়াকভ খারিয়ামিচ; আমার মনে হয় ওই অভিশপ্ত জমিটা চলে যাওয়াই ভাল। অ্যা? তুমি কি মনে কর?"

পিছন দিকে ইয়াকভের আঙুলগুলো যে নেতিবাচকভাবেই নড়েছিল সেটা আমি সহজেই কল্পনা করতে পারি। বাপি কিন্তু কালাস হাজির করার হুকুম দিয়ে কেতাদুরস্ত পুরনো কোটটা পরেছিল, মাথার বাকি ক'গাছা চুলে বুরুশ লাগিয়েছিল, রুমালে আতর ঢেলেছিল, এবং একটি সুন্দরী নারীর সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় প্রতিবেশীর বাড়ির দিকে গাড়ি ছুটিয়েছিল।

পরবর্তীকালে এপিফানভদের সঙ্গে বাপিকে অনেকবার দেখেছি। ল্যুবচ্কাও বলেছে, আমরা গ্রামে পৌঁছবার আগে রোজই এপিফানভদের সঙ্গে তার দেখাশুনা হত; খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হত; আতসবাজি পোড়ানো হত; মেলামেশাটা বেশ জমজমাট হত। আমরা পৌঁছবার পরে তারা মাত্র দু'বার আমাদের বাড়িতে এসেছে, আর আমরা তাদের বাড়িতে গিয়েছি মাত্র একবার। বাপির নামকরণ দিবস সন্ত পিতরের ভোজসভার দিন অন্য অনেক আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে এপিফানভরাও আমাদের বাড়িতে এসেছিল; কিন্তু তারপর থেকেই তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে পুরোপুরি ছেদ পড়ল, কারণ তখন থেকে বাবা একাই তাদের সঙ্গে দেখা করতে যেত।

অল্পকালের মধ্যে বাপি ও দুনেচ্কাকে (মা তাকে ঐ নামেই ডাকত) একত্রে দেখার যে সামান্য সুযোগ আমি পেয়েছি তাতে আমি মোটামুটি লক্ষ্য করেছি যে, বাপি সর্বদাই যেন সুখে ভাসছে। সে তখন এত বেশী খুশি ও যুবক হয়ে উঠত, এত বেশী জীবন্ত ও সুখী হয়ে উঠত যে চারদিকের সকলের প্রাণেই যেন তার ছোঁয়াচ লাগত। আভ্দোতিয়া ভাসিলেভ্না ঘরে থাকলে বাপি সেখান থেকে এক পাও নড়ত না, একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকত, তার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠত। দেখেশুনে মাঝে মাঝে আমারই কেমন যেন লজ্জা করত।

ইতিমধ্যে পিয়তর ভাসিলেভিচের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে বাপি খুবই মনমরা হয়ে পড়ল। তারপর থেকে অগস্ট মাস পর্যন্ত সে এপিফানভদের বাড়িতে যাওয়াই ছেড়ে দিল।

অগস্টের শেষে বাপি আবার সেই প্রতিবেশীদের বাড়ি যাতায়াত শুরু করল; ভদলিয়া ও আমি যেদিন মস্কোর উদ্দেশে যাত্রা করলাম তার আগের দিন

বাপি আমাদের জানাল যে সে শীঘ্রই আভ্‌দোতিয়া ভাসিলেভ্‌নাকে বিয়ে করবে।

অধ্যায়—৩৫
আমাদের প্রতিক্রিয়া

বিয়ের খবরটা ঘোষণা করার আগের দিনই বাড়ির সকলেই সেটা জানতে পেরেছিল, আর তা নিয়ে আলোচনাও হচ্ছিল। মিমি তো সারাদিন ঘর থেকেই বের হল না, কেবল কাঁদতে লাগল। কাতেংকা তার কাছেই বসেছিল, শুধু খাবার সময় বিষণ্ণ মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ল্যুবচ্‌কাকে কিন্তু বেশ খুশি-খুশি দেখাচ্ছিল। খাবার সময় জানাল, একটা চমৎকার গোপন কথা সে জানে, কিন্তু কাউকে বলবে না।

ডিনারের পরে ভলদিয়া আমার কনুইটা ছুঁয়ে ইঙ্গিত করে আমাকে নিয়ে হল-ঘরে ঢুকল। বলল, ল্যুবচ্‌কার গোপন কথাটা কি তা কি তুমি জান? জান কি যে বাপি এপিফানভাকে বিয়ে করবে?"

আমি মাথা নাড়লাম, কারণ কথাটা আগেই শুনেছি।

"ব্যাপারটা মোটেই ভাল হচ্ছে না।" ভলদিয়া বলল।

"কেন?"

"কেন? একটি তোত্‌লা কর্ণেল মামা ও অন্য আত্মীয় পাওয়া মজার কথাই বটে। আর ওনাকেও তো এখন বেশ ভালই মনে হচ্ছে, অন্তত খারাপ কিছু নয়, কিন্তু পরে কোন্ মূর্তি ধরবেন কে জানে। মানলাম যে তাতে আমাদের কিছু যায়-আসে না, কিন্তু ল্যুবচ্‌কা? এরকম একটি সৎ-মার সঙ্গে চলাটা খুব সুখের ব্যাপার নয়। সে তো ফরাসীও বলে খুব বাজে। আসলে সে তো একটি জেলেনী ছাড়া কিছু নয়। যদি ভালও হয় তবু তো জেলেনী।" ভলদিয়া বক্তব্য শেষ করল। "জেলেনী" কথাটা ব্যবহার করতে পেরে সে খুব খুশি।

আমি প্রশ্ন করলাম, "বাপি বিয়ে করছে কেন?"

"সে এক কেচ্ছা; ঈশ্বরই জানেন। আমি যতদূর জানি পিয়তর ভাসিলেভিচই তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছে; বাপির বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল না। সে এক কেচ্ছা; পিতাঠাকুরকে আমি তো সবে বুঝতে শিখছি ("বাপির" বদলে "পিতাঠাকুর" বলায় আমি খুব আঘাত পেলাম)। সে খুব ভাল মানুষ, সৎ, বুদ্ধিমান; কিন্তু বড়ই লঘুচিত্ত ও অস্থিরমতি; সেটাই আশ্চর্য! মেয়েমানুষ দেখলে তার মাথার ঠিক থাকে না। তুমি তো জান, মেয়ে-মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলেই সে তার প্রেমে পড়ে যায়। এমনকি মিমির

সত্ত্বেও—তুমি তো জান।"

"কি বলতে চাও তুমি?"

"আমি বলছি, ইদানীং আমি আবিষ্কার করেছি মিমি যখন যুবতী ছিল তখন সে তার প্রেমে পড়েছিল, তাকে উদ্দেশ্য করে কবিতা লিখত, তাদের মধ্যে কিছু ব্যাপারও ছিল। তাই তো মিমি আজও পর্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে।" ভলদিয়া হেসে উঠল।

"তা হতেই পারে না!" আমি সবিস্ময়ে বললাম।

ভলদিয়া এবার গম্ভীর হয়ে ফরাসীতে বলে উঠল, "কিন্তু আসল কথা হল, আমাদের আত্মীয়রা এ বিয়েকে কি চোখে দেখবে? তার তো ছেলে-মেয়ে ও হবে।"

ঠিক সেইসময় ল্যুবচ্‌কা ঘরে ঢুকল।

খুশি মুখে শুধাল, "তাহলে তোমরাও জেনেছ?"

ভলদিয়া বলল, "হ্যাঁ; কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেছি ল্যুবচ্‌কা। তুমি আর কচি খুকিটি নও; বাপি এমন একটা বাজে মেয়েকে বিয়ে করছে শুনে তোমার এত আহ্লাদ হচ্ছে কেমন করে।"

ল্যুবচ্‌কা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, "ও হো ভলদিয়া! বাজে মেয়ে! আভ্‌দোতিয়া ভাসিলেভ্‌না সম্পর্কে তুমি একথা বলতে পারলে? বাপি যখন তাকে বিয়ে করছে তখন সে বাজে মেয়ে হতে পারে না।"

"দেখ, না—মানে আমি ঐভাবে বলেছি আর কি; কিন্তু তবু—"

ল্যুবচ্‌কা রাগে জ্বলে উঠে বলল, "না, এ ব্যাপারে 'কিন্তু তবু' চলবে না। তুমি যে মেয়েকে ভালবাস তাকে তো আমি কখনও বাজে মেয়ে বলি নি। বাপি ও একটি ভাল মহিলা সম্পর্কে একথা তুমি বললে কেমন করে? দাদা হলেও আমার কাছে একথা বলো না; কখনও না।"

"আমার মতামতও প্রকাশ করতে পারব না—"

"না! আমাদের বাবার মত লোক সম্পর্কে নয়। মিমি বলতে পারে, কিন্তু আমার দাদা হয়ে তুমি বলতে পার না।"

ভলদিয়া এবার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "ওঃ, তুমি কিচ্ছু বোঝ না। শোন। কোন এক এপিফানভা, ত্থনেচ্‌কা, তোমার মৃত মায়ের আসনে বসবে সেটা কি ভাল?"

ল্যুবচ্‌কা এক মিনিট চুপ করে রইল; হঠাৎ তার চোখ জল ভরে উঠল।

"আমি জানতাম তুমি দাম্ভিক, কিন্তু এমন পাপিষ্ঠ তা জানতাম না," বলে সে চলে গেল।

পরদিন সকালে আবহাওয়া ছিল খারাপ। আমি যখন বৈঠকখানায় ঢুকলাম তখন বাপি এবং মেয়েরা কেউই চা খেতে নামে নি। রাতে হেমন্ত-

কালীন বৃষ্টি হয়ে গেছে। সারা রাত বর্ষণের পরেও কিছু মেঘের আনাগোনা চলেছে আকাশে। বাইরে বাতাস, ঠাণ্ডা, শীত। বাগানের দিককার খোলা দরজার পাল্লা বাতাসে একবার খুলছে, একব্যার বন্ধ হচ্ছে।

বসে বসে বাবার দ্বিতীয়বার বিয়ের কথাই ভাবছিলাম ভলদিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে। আমার বোনের ভবিষ্যৎ, আমাদের ভবিষ্যৎ, এমনকি বাবার ভবিষ্যৎ—কোনটাই ভাল মনে হচ্ছিল না। একটি অপরিচিত বাইরের মানুষ, সব চাইতে বড় কথা একটি অনধিকারী সাধারণ যুবতী মহিলা হঠাৎ এসে জুড়ে বসবে—কার জায়গা? আমার মৃত মায়ের! মনটা ভারী হয়ে উঠল; বাবাকে ক্রমেই দোষী বলে মনে হতে লাগল। ঠিক সেইসময় রান্না ঘরে বাবার ও ভলদিয়ার গলা শুনতে পেলাম। সেই মুহূর্তে বাবার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা আমার ছিল না, কিন্তু ল্যুবচ্‌কা এসে জানাল, বাপি আমাকে ডাকছে।

পিয়ানোর উপর একটা হাত রেখে দাঁড়িয়ে বাবা বিজয়ীর ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকাল। এতদিন তার মুখে যৌবন ও সুখের যে ছাপ দেখেছি তা আর নেই। তাকে বিচলিত দেখাচ্ছে। একটা পাইপ হাতে নিয়ে ভলদিয়া ঘরময় হাঁটছে। বাবার কাছে এগিয়ে গিয়ে আমি সুপ্রভাত জানালাম।

স্থির সংকল্পে বাবা বলল, "দেখ বন্ধুগণ, তোমরা নিশ্চয় জেনেছ যে আমি আভ্‌দোতিয়া ভাসিলেভ্‌নাকে বিয়ে করতে চলেছি। (কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।) তোমাদের মামণির মৃত্যুর পরে আর বিয়ে করার ইচ্ছা আমার ছিল না, কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু এটাই বোধ হয় নিয়তি। দুনেচ্‌কা ভাল মেয়ে, আর একেবারে যুবতীও নয়। আমি আশা করি, তোমরা তাকে ভালবাসবে; সেও তোমাদের অন্তর দিয়েই ভালবাসে।" তারপর ভলদিয়া ও আমার দিকে ফিরে বলল, "তোমাদের এখান থেকে চলে যাবার সময় হয়েছে; কিন্তু আমি নববর্ষ পর্যন্ত এখানেই থাকব তারপর আমার স্ত্রী ও ল্যুবচ্‌কাকে নিয়ে মস্কো যাব।

"অতএব বন্ধুরা, এটাই তোমাদের বুড়ো বাবার পরিকল্পনা।" বাপি কাশতে শুরু করল; তার মুখ লাল হয়ে উঠল। কথা শেষ করে সে ভলদিয়া ও আমার হাত চেপে ধরল। তার চোখে জল; হাত কাঁপছে। আমার খুব কষ্ট হল। মনে পড়ল, ১৮১২ সালে বাপি সেনাদলে ছিল, একজন সাহসী অফিসার হয়েছিল, সুনামও হয়েছিল। তার পেশীবহুল হাতটা চেপে ধরে চুমো খেলাম। সজোরে আমার হাতটা চেপে ধরে চোখের জল চেপে হঠাৎ বাপি ল্যুবচ্‌কার কালো মাথাটাকে দুই হাতে চেপে ধরে তার চোখে চুমো খেতে লাগল। ভলদিয়া পাইপটা নামাবার অছিলায় নীচু হয়ে হাতের উল্টো-পিঠে চোখ মুছে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অধ্যায়—৩৬

বিশ্ববিদ্যালয়

দু'সপ্তাহের মধ্যেই বিয়েটা হবে; কিন্তু আমাদের লেকচার শুরু হয়ে গেছে, তাই ভলদিয়া ও আমি সেপ্টেম্বরের গোড়াতেই মস্কো ফিরে গেলাম। নেখ্‌লয়ুদভরাও গ্রাম থেকে ফিরেছে। খবর পেয়েই দিমিত্রি এসে আমার সঙ্গে দেখা করল; স্থির হল, প্রথম লেকচারের দিন সেই আমাকে সঙ্গে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাবে।

উজ্জ্বল রৌদ্রস্নাত দিন।

বক্তৃতা-কক্ষে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই হাসিখুশিতে ভরা যুবকদের ভিড়ে আমার ব্যক্তিত্ব যেন কোথায় হারিয়ে গেল। আমিও এদেরই একজন—একথা ভাবতেও ভাল লাগছে। কিন্তু এদের মধ্যে খুব অল্প ছেলেই আমার পরিচিত; আর সে পরিচয়ও একটু মাথা নাড়া ও "কেমন আছ ইর্তেনেভ"-এই সীমাবদ্ধ। কিন্তু চারদিকেই কর-মর্দন ও গল্পগুজবের ঢেউ—বন্ধুত্ব, হাসি, শুভেচ্ছা, ঠাট্টার ফুলঝুরি ছুটছে।

আমাদের সঙ্গেই একটি ছেলে সরকারী খরচে পড়ত; তার নাম অপেরভ। ছেলেটি বিনয়ী, প্রতিভাবান, পরিশ্রমী। সব ছেলেদের দিকেই সে তার কাঠের মত শক্ত হাতটা বাড়িয়ে দিত; সঙ্গীরা অনেকেই ঠাট্টা করে বলত—কাষ্ঠ কর-মর্দন। আমি প্রায় সব সময়ই তার পাশে বসতাম; প্রায়ই কথা বলতাম। অধ্যাপকদের সম্পর্কে অপেরভের স্বাধীন মতামতগুলি আমার খুব ভাল লাগত। প্রতিটি অধ্যাপকের পড়ানোর দোষ-গুণের চুল-চেরা বিচার সে করতে পারত; অনেক সময় তাদের নিয়ে ঠাট্টা-মস্করাও করত। আবার সকলের সব লেকচারই সে যত্নসহকারে টুকে নিত। ক্রমে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল; স্থির করলাম, আমরা একসঙ্গে পড়াশুনা করব।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাকে বললাম, মা মৃত্যুশয্যায় বাবাকে বলে গিয়েছিল, আমাকে যেন কোন সরকার-চালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পাঠানো না হয়; যারা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পড়াশুনা করে তারা লেখাপড়ায় ভাল হলেও ঠিকমত মানুষ হয়ে ওঠে না। সে কথা শুনে অপেরভ আমাকে কিছুই বলল না; কিন্তু তারপর থেকেই সে নিজে থেকে আমাকে ডাকত না, কাঠের মত হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিত না, তার পাশে গিয়ে বসলেও মাথাটা বইয়ের উপর এত বেশী ঝুঁকিয়ে বসে থাকত যে অপেরভের এই আকস্মিক পরিবর্তনে আমি অবাক হয়ে যেতাম।

একদিন আমি লেকচার শুনতে তার আগেই হলে পৌঁছে অপেরভের জায়গাতেই বসলাম। সেখানে ডেস্কের উপর খাতাপত্র রেখে বেরিয়ে গেলাম।

ফিরে এসে দেখি, আমার খাতাগুলি পিছনের বেঞ্চিতে রাখা হয়েছে, আর অপেরভ তার নিজের আসনে সমাসীন। আমি তাকে বললাম, ওখানে আমার খাতাপত্র রেখে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ রেগে উঠে আমার দিকে না তাকিয়েই সে বলে উঠল, "আমি সে সব জানি না।"

জোর গলায় আমি বললাম, "আমি বলছি ওখানেই আমার খাতাপত্র রেখেছিলাম। সকলেই দেখেছে।" পাশের ছাত্রদের দিকে তাকালাম। তারা সকৌতুকে আমার দিকে তাকাল, কিন্তু কেউ কোন জবাব দিল না।

উদ্ধত ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকিয়ে অপেরভ রাগত স্বরে বলল, "এখানে আসন বুক করা যায় না; যারা আগে আসে তারাই পায়।"

"তার মানে তোমার শিক্ষা-দীক্ষা ভাল হয় নি," আমি বললাম।

অপেরভ বিড়-বিড় করে কি যেন বলল, আমি ঠিক শুনতে পেলাম না। হয় তো আরও কিছু বলতাম, কিন্তু ঠিক তখনই দরজায় ধাক্কা মেরে অধ্যাপক ঘরে ঢুকল এবং জুতোর শব্দ তুলে ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল।

যাই হোক, পরীক্ষার আগে যখন আমার নোট বইয়ের দরকার হল তখন আগেকার প্রতিশ্রুতি মত অপেরভ তার নোট বইগুলি আমাকে দিল, এবং একসঙ্গে পড়াশুনা করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করল।

অধ্যায়—৩৭

হৃদয়-ঘটিত

পুরো শীতকালটা হৃদয়-ঘটিত ব্যাপার নিয়েই মেতে রইলাম। তিন তিনবার প্রেমে পড়লাম। প্রথমে ভীষণভাবে প্রেমে পড়লাম এক মোটাসোটা মহিলার। প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার সে ঘোড়ায় চড়া শিখতে যেত ক্রেতাগ অশ্বারোহণ বিদ্যালয়ে—তাই তাকে দেখতে সেই দুই দিনই আমি সেখানে যেতাম; কিন্তু পাছে সে আমাকে দেখতে পায় এই ভয়ে আমি অনেক দূরে দাঁড়িয়ে থাকতাম; তাই আজও পর্যন্ত আমি জানি না সে সুন্দরী ছিল কি না।

সোনেচ্কাকে আমার বোনের সঙ্গে দেখে পুনরায় তাকে ভালবেসে ফেললাম। তার সঙ্গে আমার দ্বিতীয় ভালবাসা অনেক দিন আগেই মিলিয়ে গেছে। কিন্তু ল্যুবচ্কা যখন সোনেচ্কার হাতে লেখা একখণ্ড কবিতার বই আমাকে এনে দিল তখন আমি তৃতীয়বার তার প্রেমে পড়লাম। তাতে লারমন্টভের "দানব" কবিতার অনেকগুলি প্রেমের বর্ণনা লাল কালিতে নীচে দাগ দেওয়া ছিল, আর সেই পাতাগুলি ফুল দিয়ে চিহ্নিত করা ছিল। আগের বছর দেখেছিলাম ভলদিয়া তার প্রেমিকার ছোট টাকার থলিটাতে চুমো

খেত। সেই কথা মনে পড়ায় আমিও তাই করতে চেষ্টা করলাম। সন্ধ্যাবেলা নিজের ঘরে একাকি দিবাস্বপ্নের ঘোরে সেই ফুলগুলির উপর ঠোঁট চেপে ধরলাম, আর বেশ কয়েক দিন ধরে মনকে বুঝালাম যে এই তো আমি প্রেমে পড়েছি।

তৃতীয় এবং শেষবারের মত প্রেমে পড়লাম সেই তরুণীটির সঙ্গে যাকে ভলদিয়া ভালবাসত, আর সেই সুবাদে সে আমাদের বাড়িতে আসত। যতদূর মনে পড়ে সেই তরুণীটি মোটেই সুন্দরী ছিল না; আমাকে খুশি করার মত কোন গুণও তার ছিল না। সে ছিল মস্কোর একটি বিদগ্ধ পণ্ডিত মহিলার মেয়ে। তার সঙ্গে মাত্র একটিবার আমার কথাবার্তা হয়েছিল। কিন্তু দুই ভাই একই মেয়ের প্রেমে পড়েছি এ খবর ভলদিয়ার কাছে খুব প্রীতিপ্রদ হবে না বুঝে আমার প্রেমের কথা তাকে কিছুই বললাম না; বরং এই ভেবে প্রচুর আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম: যেহেতু আমাদের ভালবাসা চির পবিত্র তাই সে ভালবাসার পাত্রী একজন হলেও তাতে আমাদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণই থাকবে, আর প্রয়োজন হলে একে অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকারে সর্বদাই প্রস্তুত থাকব। অবশ্য পরে বুঝলাম যে ত্যাগের ব্যাপারে ভলদিয়া আমার মত উদার নয়, কারণ তার প্রেম এতই ভীষণ ছিল যে অপর এক কূটনীতিবিদ তার প্রেমিকাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে শুনে তার গালে সে এক চপেটাঘাত কসিয়ে তাকে দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান জানিয়ে বসল। ফলে আমার মনের ভালবাসাকে জিইয়ে রাখার সর্বরকমের চেষ্টা সত্ত্বেও পরের সপ্তাহেই সেই প্রেমের সমাধি ঘটল।

অধ্যায়—৩৮
সমাজ

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার পরে দাদার দেখাদেখি যেসব মজাদার আনন্দের স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম সে ব্যাপারে পুরো শীতকালটা হতাশায় কাটল। ভলদিয়া অনেক নাচের আসরে যোগ দিত; বাপিও তার নতুন স্ত্রীকে নিয়ে বল-নাচের আসরে যেত; কিন্তু আমাকে এখনও ছোট ও এসব আনন্দের অনুপযুক্ত মনে করে কেউ কোথাও নিয়ে যেত না। কিন্তু বল-নাচের আসরে যেতে আমার খুবই ইচ্ছা করত।

যাই হোক, শীতের সময় প্রিন্সেস কর্ণাকভার বাড়িতে একটা বল-নাচের আসর বসল। সে নিজে এসে আমাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে গেল; আমিও তাদের মধ্যে একজন; জীবনে এই প্রথম আমি বল-নাচে যাবার সুযোগ পেলাম।

ভলদিয়ার সঙ্গে সদর্পে কর্ণাকভাদের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকলাম। কিন্তু প্রিন্সেস যখন আমাকে নাচতে ডাকল তখন যে কারণেই হোক আমি তাকে বললাম যে আমি নাচ জানি না, অথচ প্রাণ ভরে নাচবার আশা নিয়েই আমি সেখানে গিয়েছিলাম। আমার কেমন যেন ভয় হল। কাজেই সারাটা সন্ধ্যা অপরিচিত লোকদের সঙ্গে বসে বসেই কেটে গেল।

একটা ওয়াল্‌জ্‌ নাচের সময় একজন প্রিন্সেস এসে শুধাল আমি কেন নাচতে যাই নি। এ প্রশ্নে আমি এতই লজ্জা পেলাম অথচ মুখে একটা আত্ম-তৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে প্যাঁচালো বড় বড় ফরাসী শব্দ জুড়ে এমন সব আজে-বাজে বকে গেলাম, যে অনেক অনেক বছর পরেও সেকথা মনে হলে আজও আমি লজ্জায় মরে যাই।

সহৃদয়া প্রিন্সেসটি পর্যন্ত বিচলিত হয়ে তিরস্কারের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। আমি হাসতে লাগলাম। প্রিন্সেস উঠে চলে গেল।

কিন্তু কারণ যাই হোক, বিদায় নেবার শক্তিটুকুও তখন আমি হারিয়ে ফেলেছি। নাচের আসর ভাঙা পর্যন্ত সেখানেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর যখন একে একে সকলেই সে ঘর ছেড়ে হলে গিয়ে ভিড় জমাতে লাগল, তখন আমি অশ্রুপূর্ণ চোখে হো-হো করে হেসে উঠলাম।

অধ্যায়—৩৯

পানোৎসব

যদিও দিমিত্রির প্রভাব তখন পর্যন্ত ছাত্র জীবনের সাধারণ প্রমোদ-ব্যবস্থা পানোৎসব থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল তবু সেই শীতের সময়ে একবার আমি সেই আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম, এবং সেখান থেকে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছিলাম সেটা খুব সুখকর নয়। ঘটনাটা এই রকম।

বছরের গোড়ায় একদিন লেকচার চলার সময় বারণ জেড নামক একটি লম্বা যুবক আমাদের সকলকেই আমন্ত্রণ করল তাদের বাড়িতে একটি সন্ধ্যা কাটিয়ে আসতে। সকলে মানে অবশ্য আমাদের ক্লাসের যেসব ছাত্র মোটামুটি "ভদ্দরলোক"; সে দলে অবশ্য গ্র্যাপ, সেমেনভ, অপেরভ, বা ঐ জাতীয় সাধারণ ছাত্ররা ছিল না। আমি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের পানোৎসবে যাচ্ছি শুনে ভলদিয়া তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। আমি কিন্তু অনেক প্রত্যাশা নিয়ে নির্দিষ্ট সময় ঠিক আটটায় বারণ জেড-এর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম।

সাদা ফতুয়া ও বোতাম-খোলা কোট পরে বারণ জেড, তাদের ছোট বাড়িটার আলোকোজ্জ্বল হল ও বৈঠকখানায় অতিথিদের অভ্যর্থনা করল।

সেই সন্ধ্যার উৎসবের জন্য বাবা-মা তাকে ঘরদুটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল।

অতিথির সংখ্যা বিশ। আইভিনের সঙ্গী হের ফ্রস্ট এবং বারণ-পরিবারের বন্ধু ও দরপাত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র একটি দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক ছাড়া বাকি সকলেই ছাত্র।

নানা রকম আলোচনা চলতে লাগল। এক সময় সকলেরই মনে হল—এবার শুরু করা যাক। আমিও বসে বসে ভাবছি, কখন শুরু হবে।

পরিচারক এক দফা চা দিয়ে গেল। তারপরেই দরপাত-ছাত্রটি রুশ ভাষায় ফ্রস্টকে বলল, "তুমি 'পাঞ্চ' করতে জান তো ফ্রস্ট?"

পায়ের পেশী নাচিয়ে ফ্রস্ট সম্মতি জানাল।

"তাহলে কাজে হাত লাগাও।"

ফ্রস্ট উঠে গিয়ে টেবিল সাজিয়ে ফেলল। বারণ জেড তাকে সাহায্য করল। তারপর সবিনয়ে বলল, "মশাইরা চলে এস; সত্যিকারের কমরেডদের মত গলা ভেজাতে শুরু করে দাও, অবশ্য ছাত্রদের কেতা অনুসারে। ওয়েস্ট কোটের বোতাম খুলে নাও, নাকি অন্যদের মত ওটাকে খুলেই ফেলবে?"

দরপাত-ছাত্রটি হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, 'মশাইরা, আলোগুলি নিভিয়ে দাও।"

সকলেই বুঝলাম, শুভ মুহূর্তটি সমাগত।

শুরু হল গ্লাসের ঠোকাঠুকি, হৈ-হল্লা, আর জার্মান সঙ্গীত; মাঝে মাঝেই সমবেত কণ্ঠের ধুয়া—"জুচ্চে!"

পানোৎসব পুরোদমে চলতে লাগল। এর মধ্যেই একটা পুরো গ্লাস আমার পেটে পড়েছে; আর এক গ্লাস ঢেলে দেওয়া হল; আমার কপালটা দপ্ দপ্ করছে, আগুনটাকে রঙিন দেখাচ্ছে, চারদিকে সকলে চেঁচাচ্ছে আর হাসছে। আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগছে না; বরং বিরক্ত লাগছে; তবু আমার মতই অন্য সকলেও মনে করছে এটা অপরিহার্য।

মনে পড়ে, এক সময় আমরা সকলেই মেঝেতে বসে পড়ে বৈঠা চালাবার ভঙ্গীতে হাত চালিয়ে চালিয়ে গাইতে শুরু করলাম "মাতা ভল্‌গার স্রোতে ভাসতে ভাসতে।" তখনই কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, এ সবের কোন দরকার ছিল না। সারাটা সন্ধ্যা আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, সুখের নামে আমরা খুবই বোকার মত কাজ করছি।

কিন্তু পরের দিন লেকচারের সময় সেই সব বন্ধুরা যখন অন্য সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে আমাদের বারণ জেড-এর বাড়িতে যাওয়ার কথা এবং বোতল-বোতল "রাম" খাওয়ার কথা অনেক অতিরঞ্জিত করে বলতে লাগল, তখন আমি বুঝতেই পারলাম না তাঁরা এত সব মিথ্যা কথা বলছে কেন।

অধ্যায়—৪০

নেখ্‌লুদভ-পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব

পুরো শীতকালটা দিমিত্রি প্রায়শই আমাদের বাড়িতে আসত; ফলে তাকে আরও ভাল করে জানবার সুযোগ পেলাম। শুধু তাই নয়, তার গোটা পরিবারের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

নেখ্‌লুদভ পরিবার—মা, মাসি ও মেয়ে—সন্ধ্যাটা বাড়িতেই কাটাত; অল্পবয়সী ছেলেরা এসে সন্ধ্যাবেলায় তার সঙ্গে দেখা করুক এটা সে পছন্দ করত, বিশেষ করে যারা তাস খেলে বা নেচে সন্ধ্যাটা কাটাতে ভালবাসে না। কিন্তু সে রকম লোক বোধ হয় খুব বেশী পাওয়া যায় না, কারণ সন্ধ্যাবেলায় নিয়মিত সে বাড়িতে গেলেও কোন অতিথিকে সেখানে কদাচিৎ দেখতে পেতাম। ক্রমে সে পরিবারের সকলের সঙ্গে পরিচয় হল, প্রত্যেকের মেজাজ বুঝতে পারলাম, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ছবিটাও পরিষ্কার ধরতে পারলাম। বেশ অসংকোচেই সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতাম; কেবল ভারেংকার সঙ্গে একা ঘরে থাকতে হলেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতাম। তবে সেটা ক্রমেই কেটে যেতে লাগল। দীর্ঘ পরিচয়-কালের মধ্যে তাকে কখনও খুব কুৎসিত মনে হত, আবার কখনও মনে হত সে ততটা কুৎসিত নয়; কিন্তু তার সম্পর্কে কখনও নিজেকে প্রশ্ন করি নি: "আমি তার প্রেমে পড়েছি কি না?"

নেখ্‌লুদভরা সকলেই আমাকে পছন্দ করত—একমাত্র ল্যুবভ সের্গেয়েভ্‌না ছাড়া; সে মনে করত আমি আত্মম্ভরী, নিরীশ্বরবাদী ও নাক-উঁচু প্রকৃতির মানুষ; তাই সে আমাকে পছন্দ করত না, প্রায়ই আমার সঙ্গে ঝগড়া করত, রেগে যেত, এবং অবাস্তব কথাবার্তা বলত। কিন্তু দিমিত্রি তার সঙ্গে বন্ধুর অধিক একটা সম্পর্কই রক্ষা করে চলত। সে বলত, কেউ তাকে বুঝতে পারে না, অথচ তার কাছ থেকে অনেক কিছু সে পেয়েছে। মেয়েটির সঙ্গে তার এই বন্ধুত্ব পরিবারের অন্য সকলের পক্ষে দুঃখের কারণ হয়ে উঠেছিল।

এই প্রসঙ্গে ভারেংকা একদিন আমাকে বলল, "দিমিত্রি আত্মম্ভরী ও অহংকারী; প্রশংসা ও চাটুবাক্য খুব পছন্দ করে সব কিছুতেই প্রথম হতে চায়।"

নেখ্‌লুদভ পরিবারের অন্য অতিথিরা হাজির থাকলে আমি সাধারণত পিছনের দিকে গিয়ে বসতাম, এবং নিজে কিছু না বলে অন্য সকলের বক্তব্যই মন দিয়ে শুনতাম। এই সব অতিথিরা যে সব কথা বলত সেগুলি এতই অবিশ্বাস্য রকমের নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত যে আমি মনে মনে অবাক হয়ে ভাবতাম

প্রিন্সেসের মত একজন বুদ্ধিমতী মহিলা ও তার পরিবারের অন্য সকলে এ সব বাজে কথা শোনেই বা কি করে, আর তার জবাই বা দেয় কেমন করে।

অধ্যায়—৪১

নেখ্‌লুয়ুদভের সঙ্গে বন্ধুত্ব

ঠিক এই সময় দিমিত্রির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব যেন একটা চুলের সঙ্গে ঝুলছিল। প্রথম যৌবনে আমরা ভালবাসি কেবল আবেগের তাড়নায়, আর তাই ভালবাসার মানুষটিকে মনে হয় পরিপূর্ণ মানুষ বলে। কিন্তু আবেগের কুয়াসা যখন কাটতে আরম্ভ করে, বিচারের সূর্যরশ্মি যখন তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে, তখন ভালবাসার মানুষটির প্রকৃত স্বরূপ আমাদের চোখে ধরা পড়ে, ধরা পড়ে তার ভাল ও মন্দ দুটি দিকই, বরং মন্দ দিকটাই তখন বড় হয়ে দেখা দেয়। তাছাড়া, দিমিত্রির প্রতি আমার আকর্ষণের ভিত্তি একটা আত্মম্ভরী বুদ্ধিদীপ্ত অনুরাগ, কোন হার্দিক অনুরাগ নয়; তাই সেটাকে অস্বীকারও করা যায় না।

সেই শীতকালে আমি যখনই দিমিত্রির কাছে যেতাম তখনই তাকে দেখতাম বেজবেদভ নামক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুর সঙ্গে; দুজন এক সঙ্গে পড়ত। ছেলেটি ছোটখাট, মুখময় ফুট-ফুট দাগ, এক-মাথা এলোমেলো লাল চুল; সে সর্বদাই উস্কোখুস্কো আর নোংরা থাকত; পড়াশুনায়ও ভাল ছিল না। তাই বেজবেদভের সঙ্গে দিমিত্রির ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না। তবে তাকে বন্ধু হিসাবে বেছে নেবার একটিমাত্র কারণ হতে পারে—সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেজবেদভের মত কদাকার দেখতে আর কেউ ছিল না; আর সেই কারণেই দিমিত্রি আগ বাড়িয়ে তার সঙ্গে ভাব জমিয়েছে।

একদিন সন্ধ্যায় দিমিত্রির মার বৈঠকখানায় গেলাম তার সঙ্গে কথা বলে ও ভারেংকার গান বা পাঠ শুনে সময়টা কাটাতে, কিন্তু বেজবেদভ তখন দোতলায় বসে ছিল। দিমিত্রি কড়া গলায় আমাকে জানিয়ে দিল যে সে নীচে নামতে পারবে না, কারণ তার একজন সঙ্গী এসেছে। সে আরও বলল, "তাছাড়া, নীচে বসে থেকেই বা কী মজাটা পাব? তার চাইতে এখানে বসে গল্প-গুজব করা অনেক ভাল।" কী আর করা যাবে? অগত্যা বন্ধুর উপর বিরক্ত হয়েও তার ঘরের দোলনা-চেয়ারটায় বসে নীরবে দোল খেতে লাগলাম।

দিমিত্রি ও বেজবেদভের উপর তার খুব রাগ হতে লাগল। মনে মনে বললাম, "কী এক মজার অতিথিই জুটিয়েছ।"

শেষ পর্যন্ত বেজবেদভ উঠে দাঁড়াল। দিমিত্রি তাকে রাতটা থেকে যেতে বললেও সে রাজী না হয়ে বেরিয়েই গেল।

তাকে নীচে নামিয়ে দিয়ে ফিরে এসে দিমিত্রি কিছুক্ষণ ঘরময় পায়চারি করল। তারপর হঠাৎই আমার সামনে থেমে বলে উঠল. "তুমি রাগ করেছ কেন?"

আমি জবাব দিলাম, "মোটেই রাগ করি নি তো; তবে বিরক্ত হয়েছি এটা দেখে যে তুমি আমার সঙ্গে, বেজবেদভের সঙ্গে, এমনকি নিজের সঙ্গেও লুকোচুরি খেলছ।"

"কী বাজে কথা বলছ! আমি কারও সঙ্গে লুকোচুরি করি না।"

"পরস্পরের কাছে যে খোলা মনের প্রতিশ্রুতি আমরা নিয়েছি আমি কিন্তু তা ভুলি নি; আমি তোমার সঙ্গে মন খুলেই কথা বলি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বেজবেদভ আমার কাছে যেমন অসহ্য তোমার কাছেও তাই, কারণ সে বোকা; অথচ তুমি চাও তার চোখে নিজেকে দেবতা বানাতে।"

"সেটা মোটেই সত্যি নয়; তাছাড়া, বেজবেদভ খুব চমৎকার ছেলে—"

"কিন্তু আমি বলছি সে বোকার ডিম। আমি আরও বলতে চাই ল্যুবভ সের্গেয়েভ্‌নার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্বের আসল ভিত্তিও এই যে সে তোমাকে দেবতার মত দেখে।"

"কিন্তু আমি বলছি সেটা ঠিক কথা নয়।"

"আমি বলছি সেটাই ঠিক। আগেও তোমাকে বলেছি, আবার বলছি, যারা আমার কাছে ভাল ভাল কথা বলে তাদের আমি পছন্দ করি; কিন্তু পরে ভাল করে বিচার করে বুঝতে পারি তার মধ্যে সত্যিকারের অনুরাগ বলে কিছু থাকেনা।"

রাগে গলাটা নেড়ে নেক-টাইটা ঠিক করে নিয়ে দিমিত্রি বলল, "না; আমি যখন ভালবাসি তখন প্রশংসা ও নিন্দায় তার কোন পরিবর্তন ঘটে না।"

"একথা সত্যি নয়। আমি তো তোমার কাছে স্বীকার করেছি, বাপি যখন আমাকে অকর্মের ধাড়ি বলেছিল তখন সেই মুহূর্তে আমি তাকে ঘৃণা করেছিলাম, তার মৃত্যু কামনা করেছিলাম, ঠিক যেমন তুমি—"

"নিজের কথা বল। কী দুঃখের কথা যে তুমি এমন একটা—"

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে বললাম, "ঠিক উল্টো; তুমি যা বলছ সেটা ভাল কথা নয়; আমার দাদার কথা তুমি আমাকে বল নি? সে কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই না, কারণ তাতে তোমার সম্মান বাড়বে না। তুমি কি আমাকে বল নি—তোমার সম্পর্কে আমার কি ধারণা হয়েছে সেটা তোমাকে বলব—"

সে আমাকে যতটা আঘাত করেছে তার চাইতে বড় আঘাত তাকে দেবার জ্বালায় আমি প্রমাণ করতে শুরু করলাম যে সে কাউকে ভালবাসে

না, আর তাই তাকে কটু কথা শোনাবার অধিকার আমার আছে।

বিতর্ক বাড়তে বাড়তে ঝগড়ায় পরিণত হতে লাগল। হঠাৎ দিমিত্রি চুপ করে গেল; ঘর ছেড়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

অতএব "আমরা যা কিছু ভাবি সবই পরস্পরকে বলব, নিজেদের সম্পর্কে কোন কথাই কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে বলব না" এই মর্মে যে নীতিকে আমরা মেনে নিয়েছিলাম, এটাই হল তার পরিণতি। খোলা মনের তাগিদে অনেক সময় অনেক লজ্জাকর স্বীকারোক্তি আমরা করতাম। তার ফলে আমাদের মিলনের বন্ধন দৃঢ়তর তো হইনি, বরং পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ক্রমেই শুকিয়ে এল; আমরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম।

অধ্যায়—৩২

বিমাতা

যদিও নতুন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নববর্ষের আগে মস্কো আসার ইচ্ছা বাপির ছিল না, তবু হেমন্তকালে কুকুর সঙ্গে নিয়ে শিকারটা ভাল জমবে এই আশায় অক্টোবরেই বাপি এসে হাজির হল। বাপি এসেই জানাল, এই সময় সিনেটে তার মামলার শুনানি হবে বলেই সে মত পাল্টেছে; কিন্তু মিমি আমাদের জানাল, আভ্‌দোতিয়া ভাসিলেভ্‌নার গ্রামাঞ্চলে থাকতে মোটেই ভাল লাগছিল না, আর প্রায়ই অসুখের ভান করে মস্কোর কথা বলছিল; তাই তার ইচ্ছানুসারেই বাপি এ সময় চলে এসেছে।" সে তো কোনদিন ওকে ভালবাসে নি, কেবল ভালবাসার কথা বলে বেড়িয়েছে একটি ধনবান পুরুষকে বিয়ে করার আশায়।" বলেই মিমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল; যেন বলতে চাইল, "ভেবে দেখ তো, ও যদি আর একজনকে খুশি করতে চাইত তাহলে সে ওর জন্য কী না করত।"

তথাপি "সেই আর একজন" কিন্তু আভ্‌দতিয়া ভাসিলেভনার প্রতি অবিচারই করেছিল। বাপিকে সে সত্যি ভালবাসত। কাতেংকা গোড়া থেকেই মার পক্ষ নিল, আর বিমাতা ও আমাদের মধ্যে গড়ে উঠল একটা বিচিত্র হাল্কা সম্পর্ক। সে গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই গম্ভীর বোকা-বোকা মুখ করে ভলদিয়া তার হাতে চুমো খাবার জন্য এগিয়ে গিয়ে বলল:

"আমাদের প্রিয় মামণির আগমন উপলক্ষ্যে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এবং তার হাতে চুমো খেতে পাবার জন্য আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করছি।"

সুন্দর হাসি হেসে আভ্‌দোতিয়া ভাসিলেভ্‌না বলল, "আচ্ছা বাছা আমার!"

তার হাতে চুমো খেতে এগিয়ে গিয়ে আমিও বললাম, "তোমার দ্বিতীয় ছেলেটিকেও ভুলে যেয়ো না।"

প্রথম প্রথম আভ্‌দতিয়া ভাসিলেভ্‌না নিজেকে বিমাতা বলে উল্লেখ করতেই ভালবাসত; প্রায়ই বলত, পরিবারের ছেলেমেয়েরা এবং অন্য সকলেই বিমাতাকে এমন একটা খারাপ চোখে দেখে যে তার অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে ওঠে। অথচ এই পরিস্থিতিটাকে এড়াবার জন্য সে কিন্তু কিছুই করত না; বরং চুপচাপ থেকে সবকিছু সহ্য করে চলত। কিন্তু তার ফল ভাল না হয়ে তার পক্ষে আরও খারাপ হল; সকলেই তার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠল।

পৃথিবীতে সে সকলের চাইতে বেশী ভালবাসত তার স্বামীকে; আর স্বামীটিও তাকে ভালবাসত। আভ্‌দোতিয়া ভাসিলেভ্‌না সাজগোজ করতে খুব ভালবাসত; বাবাও চাইত সে সমাজে সুন্দরী হিসাবে খ্যাত হোক, তার প্রশংসায় সকলের পঞ্চমুখ হয়ে উঠুক। বাবার জন্যই সে উৎসব-অনুষ্ঠানে যাওয়া ছেড়ে দিল; বেশীর ভাগ সময় একটা ধূসর রংয়ের ব্লাউজ পরে বাড়িতেই বসে থাকত। পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও সাম্যকেই বাবা অপরিহার্য শর্ত বলে মনে করত, তাই সে আশা করেছিল, তার আদরের ল্যুবচ্‌কা এবং তরুণী স্ত্রীটি আন্তরিক বন্ধুত্বের সূত্রেই মিলিত হবে; কিন্তু আভ্‌দতিয়া ভাসিলেভ্‌না যেন ত্যাগ স্বীকার করতেই এ বাড়িতে এসেছে; তাই সে ল্যুবচ্‌কাকেই ধরে নিল বাড়ির আসল কর্ত্রীরূপে, এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই চলতে লাগল। এতে বাপি মনে খুব ব্যথা পেল। সে বছর শীতকালে বাবা জুয়া খেলা শুরু করল এবং শেষ পর্যন্ত অনেক টাকা হেরে গেল। জুয়া খেলার কথাটা সে সকলের কাছেই লুকিয়ে রাখত। জুয়ার সঙ্গে পারিবারিক জীবনকে জড়িয়ে ফেলতে সে চাইত না। শীতের শেষের দিকে অন্তঃস্বত্তা অবস্থায় আভ্‌দোতিয়া ভাসিলেভ্‌না ভোরের দিকে বাবার সঙ্গে দেখা করতে যেত; তখন ক্লান্ত দেহে খেলায় হারের জন্য লজ্জিত মনে বাবা সবে ক্লাব থেকে ফিরত।

উদাসীনতাকে বজায় রেখেই সে বাবাকে জিজ্ঞাসা করত খেলায় তার জিত হয়েছে কি না; বাবাও তাকে সব কথা খুলে বলত, আর বার বার অনুরোধ করত, সে যেন কখনও তার জন্য রাত জেগে বসে না থাকে। তবু প্রতিদিন রাতে বাবা যখন ক্লাব থেকে ফিরত তখনই সে তার সঙ্গে দেখা করতে যেত। শুধু যে ত্যাগ-স্বীকারের তাগিদেই সে একাজ করত তা নয়, তার মনে তখন ধিকি-ধিকি জ্বলতে শুরু করেছে ঈর্ষার আগুন। কেউ তাকে বোঝাতে পারত না যে সে ক্লাব থেকেই ফেরে, কোন প্রেমিকার কাছ থেকে নয়। বাপির চোখে-মুখে গোপন প্রেমের চিহ্নই সে খুঁজে বেড়াত; কিন্তু সেটা না পেয়ে আরও বেশী করে দুঃখ পেত, আর সেই দুঃখকে মনের

মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়াত।

এইসব ছোটখাট ঘটনার ফলে শীতের শেষের মাসগুলিতে বাপির মনে তার স্ত্রীর প্রতি একটা চাপা ঘৃণা জেগে উঠতে লাগল। একে জুয়াতে হেরে হেরে তার মন-মেজাজ খারাপ হয়েই ছিল, তার উপর স্ত্রীর এই অকারণ সন্দেহ-বাতিক একটা চাপা অনীহার ভাব জাগিয়ে তুলল তার মনে; ফলে দুজনের মধ্যে খিটিমিটি দেখা দিতে লাগল।

অধ্যায়—৪৩

নতুন বন্ধুর দল

সকলের অলক্ষ্যে শীত পার হয়ে গেল। বরফ গলতে শুরু করেছে; বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার তালিকা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ মনে পড়ল, যে আঠারোটা বিষয়ের উপর বক্তৃতা আমি শুনেছি তার সবগুলির জবাব আমাকে লিখতে হবে, অথচ তার একটা বক্তৃতাও আমি মন দিয়ে শুনি নি, বা লিখে নেই নি, বা তৈরি করি নি। কী আশ্চর্য "কেমন করে পরীক্ষায় পাশ করতে পারব?" এই সোজা প্রশ্নটাও কোনদিন আমার মাথায় আসে নি। কিন্তু বড় হয়ে ওঠার আনন্দে এবং "ভদ্দরলোক" হবার খুশিতে মশগুল হয়ে সারা শীতকালটা এতই আলস্যে কাটিয়েছি যে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে ভাবলাম: "তারা তো পাশ করবে, কিন্তু তাদের অনেকেই এখনও 'ভদ্দরলোক' হয়েই ওঠে নি; কাজেই তাদের তুলনায় এখনও আমার কিছুটা বাড়িতে সুবিধা আছে; আমি পাশ করবই।" আমি তখন বক্তৃতা শুনতে যেতাম অভ্যাসবশত, আর বাপি আমাকে বাড়ি থেকে ঠেলে পাঠিয়ে দিত বলে। তাছাড়া, ইতিমধ্যে অনেক বন্ধুবান্ধব জুটে গিয়েছিল; তাদের সঙ্গে হৈ-চৈ করেই কাটিয়ে দিতাম। পিছনের বেঞ্চিতে বসে অধ্যাপকের বক্তৃতা শোনার চাইতে অন্য নানা স্বপ্ন দেখতেই ভালবাসতাম।

যাই হোক, সকলেই যখন নিয়মিতভাবে বক্তৃতা শুনতে শুরু করল, এবং পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক কোর্স শেষ করে পরীক্ষা পর্যন্ত ছুটি নিয়ে চলে গেল, তখন সব ছাত্রই নোট-বই সংগ্রহ করে পড়া তৈরী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমিও সেইদিকে মন দিলাম। অপেরভ তার নোট-বইগুলি আমাকে দিল এবং তার ও অন্য ছাত্রদের সঙ্গে একত্রে পড়া করতে আমন্ত্রণ জানাল। আমিও তাতে সম্মতি জানালাম, তবে একটি শর্তে—সকলে মিলে পড়াশুনাটা চলবে আমার বাড়িতে। কারণ আমি একটি চমৎকার বাসস্থান পেয়ে গিয়েছিলাম।

কিন্তু তারা জবাব দিল, তারা স্থির করেছে পর্যায়ক্রমে এক একজনের বাড়িতে তাদের পাঠশালা বসবে। প্রথম বসা হল জুখিনের বাড়িতে।

ক্রব্‌নি বুলভার্দের একটা বড় বাড়ির পার্টিশনের পিছনকার একটা ছোট ঘর। আমার যেতে একটু দেরী হয়েছিল। ততক্ষণে পড়া হয়ে গেছে। সারা ঘর কড়া তামাকের গন্ধে ভরপুর। টেবিলের উপর ভদ্‌কার একটা চৌকো বোতল, কয়েকটা গ্লাস, রুটি, নুন আর মাংসের হাড়।

না দাঁড়িয়েই জুখিন আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। কোট খুলে ভদ্‌কায় চুমুক দিতে বলল।

আরও বলল, "এ রকম ব্যবস্থায় তুমি হয় তো অভ্যস্ত নও।"

সকলেরই পরনে নোংরা ক্যালিকো শার্ট। সেদিকে না তাকিয়ে কোটটা খুলে আমি বন্ধুর মতই সোফাটায় শুয়ে পড়লাম। জুখিন জোরে জোরে পড়তে লাগল, আর কেউ কোন প্রশ্ন করলে সংক্ষেপে বেশ প্রাঞ্জলভাবে সেটা বুঝিয়ে দিতে লাগল। আগে কি পড়া হয়েছে তা না জানায় আমি প্রায় কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তাই একসময় একটা প্রশ্ন করলাম।

জুখিন বলল, "ওটাও না জানলে তো এসব শুনে তোমার কোন লাভ হবে না বাপু। আমি তোমাকে নোট-বইগুলো দিয়ে দেব যাতে কালকের মধ্যে তুমি সবটা পড়ে ফেলতে পার।"

নিজের অজ্ঞতায় লজ্জাবোধ করলেও জুখিনের কথাগুলি সঠিক মনে হওয়ায় বইপড়ার দিকে মন না দিয়ে নতুন সঙ্গী-সাথীদের দিকে চোখ ফেরালাম। এরা সকলেই "ভদ্দরলোক নয়" এ রকম শ্রেণীর মানুষ; ফলে তাদের প্রতি একটা ঘৃণা ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ভাব জাগল মনে। তাদের নোংরা হাত-পা, দাঁত দিয়ে নখ কাটা, অপেরভের কনিষ্ঠায় একটা লম্বা নখ, পরস্পরকে ডাকাডাকির বিশ্রী ধরণ, নোংরা ঘর, জুখিনের অনবরত নাক ঝাড়ার অভ্যাস—সব কিছুই ভদ্দরলোকের পক্ষে একান্ত অনুপযুক্ত। কিন্তু আমার কাছে সব চাইতে অভদ্রোচিত বলে মনে হচ্ছিল কতকগুলি রুশ শব্দের উপর, বিশেষ করে বিদেশী শব্দগুলির উপর একটা অকারণ জোর দিয়ে উচ্চারণ করার রীতি।

কিন্তু তাদের বাইরের আচার-আচরণ অত্যন্ত ঘৃণ্য বলে মনে হলেও তাদের মধ্যে কিছু ভাল জিনিসও আমার চোখে পড়ল। বিশেষ করে ভাল লাগল তাদের আনন্দময় বন্ধুত্ব। তাদের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আগ্রহ জাগল। আর সেটা আমার পক্ষে বেশী শক্তও নয়। ভদ্র ও ন্যায়পরায়ণ অপেরভকে তো আমি আগেই চিনতাম। এখন এই দলটির পাণ্ডা জুখিনকেও আমার বেশ ভাল লেগে গেল। সে দেখতে ছোটখাট, শক্ত দেহ, গায়ের রং ঘোর, ফোলা-ফোলা বুদ্ধিদীপ্ত মুখ।

জমায়েৎ শেষ হবার মুখে জুখিন, অন্য ছাত্ররা, ও আমি নতুন বন্ধুত্বের খাতিরে প্রত্যেকে এক গ্লাস করে ভদ্‌কা খেলাম। পাত্রটি শূন্য হয়ে গেল। তখন জুখিন জানতে চাইল কারও কাছে সিকি-রুবল আছে কিনা; থাকলে বুড়িটাকে আরও কিছুটা ভদ্‌কার ফরমাশ করা যেতে পারে। আমি টাকাটা

দিতে চাইলাম, কিন্তু আমার কথা না শুনেই জুখিন অপেরভের দিকে মুখ ফিরাল। একটা ছোট থলে বের করে অপেরভ টাকাটা দিয়ে দিল। সে নিজে মোটেই মদ খায় না। বলল, "দেখ, যেন বেশী গিলো না।

জুখিন বলল, "আরে না, না, সে ভয় করো না। আর একটু বেশী টানলেই বা ক্ষতি কি? এখনও আমি এখানকার যে কোন শুক্‌নো মশায়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়তে পারি। কিন্তু সেমেনেভ বড় বেশী ঝুঁকি নিচ্ছে; যে হারে সে মদ গিলছে—"

সত্যি, যে পাকা-চুল সেমেনেভ প্রবেশিকা পরীক্ষার দিনই বাজে পোশাকের জন্য আমার নজরে পড়েছিল, সে পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার পরে প্রথম এক মাস যে নিয়মিত বক্তৃতার সময় উপস্থিত থেকেছে, সেই এখন পাড় মাতাল হয়ে গেছে; বছরের শেষের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তার টিকিটিও আর দেখা যায় নি।

"সে কোথায় আছে?" একজন প্রশ্ন করল।

জুখিন বলতে লাগল, "তার তো দেখাই নেই। সর্বশেষ যেদিন তাকে সঙ্গে পেয়েছিলাম সেদিন লিস্‌বনে একটা রাত কাটিয়েছিলাম বটে। আঃ, তোফা! শুনেছি, তারপরে নাকি কি একটা কেলেংকারী ঘটছিল। একটা লোকের মত লোক বটে। ভিতরে কী আগুন! কী মন! বেচারি যদি কষ্টে পড়ে থাকে তো সেটা খুবই দুঃখের কথা। কিন্তু কষ্ট সে পাবেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকার ছেলে সে নয়।"

আরও কিছু কথাবার্তার পরে সকলে উঠে পড়ল। স্থির হল, পরবর্তী দিনগুলোতে সকলে জুখিনের বাড়িতে একত্র হবে, কারণ সেটাই সব চাইতে কাছে। উঠোনে নেমে আমার বিবেকে খুবই বাধল যে অন্য সকলে যাবে পায়ে হেঁটে আর আমি যাব দ্রস্‌কি হাঁকিয়ে; তাই অপেরভকে বললাম আমার গাড়িতে চাপতে; তাকে বাড়ি পৌঁছে দেব। জুখিনও আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল; অপেরভের কাছ থেকে একটা রৌপ্য রুবল ধার করে সে বন্ধুদের সঙ্গে চলে গেল রাতটা ফূর্তিতে কাটাতে। গাড়িতে চলতে চলতে জুখিনের চরিত্র ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেক কথাই অপেরভ আমাকে শোনাল। বাড়িতে পৌঁছে নবপরিচিতদের কথা ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ আমার চোখে ঘুম এল না। একদিকে তাদের পাণ্ডিত্য, সরলতা, সততা, যৌবনের কাব্যময়তা ও সাহসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যদিকে তাদের অভদ্রজনোচিত বহিরঙ্গের প্রতি বিতৃষ্ণা—এই দুইয়ের মধ্যে দুলতে লাগল আমার মন। যত ইচ্ছাই হোক, ঠিক সেই সময়ে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা সত্যি আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দেখা দিয়েছিল। আমাদের ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তবু জুখিনকে আমার ভাল লেগে গেল।

দু'সপ্তাহ ধরে প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় আমি তার বাড়িতে পড়তে গেলাম।

বাড়িতে পড়াশুনা বিশেষ কিছু না করায় তাদের অনেক পাঠই আমি বুঝতে পারতাম না; তবু তাদের সঙ্গে তাল রাখতে বোঝার ভান করতাম; আর সেটা যে তারা ধরতে পারত না তাও নয়।

ক্রমেই এই দলটির শৃংখলাহীন জীবনের প্রতি আমার আকর্ষণ বাড়তে লাগল। তাদের সাহচর্য আমাকে জীবনের কাব্যময়তার একটা স্বাদ এনে দিল। অবশ্য দিমিত্রির কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকার ফলে তাদের জীবনের অন্ধকার দিকগুলির প্রতি আকর্ষণকে আমি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিলাম।

একসময় ভাবলাম, আমার সাহিত্যের জ্ঞান, বিশেষ করে ফরাসী সাহিত্যের জ্ঞানের বহর দেখিয়ে তাদের তাক লাগিয়ে দেব। আলোচনার মোড়টাকে সেইদিকে ঘুরিয়েই অবাক হয়ে দেখলাম যে বিদেশী বইয়ের নামগুলিকে রুশ কায়দায় উচ্চারণ করলেও তারা আমার চাইতে অনেক বেশী পড়েছে; এমনকি ইংরেজ ও স্পেনীয় সাহিত্যিকদের খোঁজ-খবরও তারা রাখে। সঙ্গীতের জ্ঞানেও তারা আমার উপর টেক্কা দিতে পারে। আরও বেশী অবাক হলাম যখন জানতে পারলাম যে অপেরভ বেহালা বাজায়, অপর একজন ছেলেও পিয়ানো বাজায়; তারা দুজনই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্কেস্ট্রায় নিয়মিত বাজায়; গান-বাজনাটা ভালই জানে।

আমার মনে নতুন চিন্তা ঢুকল: তাহলে কোন্ গুণে আমি ওদের ছোট বলে ভাবব?—প্রিন্স আইভান আইভানিচের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে বলে? আমার ফরাসী উচ্চারণের জন্য? আমার দ্রস্‌কি আছে বলে? আমার নখগুলি সুন্দর আর শার্টগুলি ভাল বলে? সে সবই কি তুচ্ছ, অর্থহীন ব্যাপার নয়? এরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় কিছু অশালীন শব্দ ব্যবহার করে; আমার কানে সেগুলি কটু শোনায়; কিন্তু ওরা ভাল মনেই শব্দগুলি বলে; তাতে ওদের বন্ধুত্বে কখনও চিড় ধরে না। ক্রমে আমার মনে হতে লাগল, বারণ জেভ-এর বাড়িতে পানোৎসবে রাম ও শ্যাম্পেনের যে স্রোত বয়েছিল এদের পানোৎসব হয় তো তার থেকে কিছুটা অন্যরকম হবে।

অধ্যায়—৪৪

জুখিন ও সেমেনভ

জুখিন কোন্ সমাজের মানুষ তা আমি জানি না; কিন্তু এটা জানি যে সে এসেছে এস্, জিম্‌নাসিয়াম থেকে, তার কোন টাকা-পয়সা নেই, আর স্পষ্টতই ভদ্রঘরের ছেলেও সে নয়। তখন তার বয়স আঠারো, কিন্তু তাকে আরও বড় দেখায়। সে খুবই বুদ্ধিমান, কোন নতুন চিন্তাকে খুব তাড়াতাড়ি ধরতে পারে, একটা জটিল বিষয়কে সহজে আয়ত্ত করতে পারে।

পরীক্ষার ঠিক আগে অপেরভের ভবিষ্যদ্বাণীই ফলে গেল। সপ্তাহ দুইয়েকের জন্য জুখিন কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। আমরা নিজেদের মত করে পরীক্ষার জন্য তৈরি হলাম। প্রথম পরীক্ষার দিন সে হলে এসে হাজির হল; বিবর্ণ, উস্কখুস্ক চেহারা, হাত কাঁপছে। কিন্তু বেশ ভালভাবে পাশ করে সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হল।

শুরুতে পানোৎসবের দলে ছিল আটজন; তাদের শিরোমণি জুখিন। আইকনিন ও সেমেনভ ছিল প্রথম সারিতে। আইকনিন দল ছেড়ে দিল, কারণ এত হৈ-হুল্লোড় তার পোষাল না। পরে সেমেনভও দল ছেড়ে দিল।

একদিন সন্ধ্যায় আমরা জুখিনের বাড়িতে সমবেত হয়েছি। অপেরভ মোমবাতির আলোয় কর্কশ গলায় পদার্থবিদ্যার নোট-বই থেকে পড়ে চলেছে। এমন সময় বাড়িওয়ালি ঘরে ঢুকে জানাল, জুখিনের জন্য চিঠি নিয়ে একটি লোক এসেছে।

জুখিন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই মাথা নীচু করে চিন্তিত মুখে ফিরে এল। তার হাতে বালি-কাগজে লেখা একটা চিরকুট ও দুটো দশ-রুবলের ব্যাংক-নোট।

গম্ভীর মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "মশাইরা! একটা অসাধারণ রকমের খবর এসেছে।" নোট-বইয়ের পাতা উল্টে অপেরভ বলল, "তোমার ট্যুইশনির টাকা পেলে বুঝি?" একজন বলল, "পড়া চালিয়ে যাও।" জুখিন বলে উঠল, "না মশাইরা, আমি এখন পড়া শুনতে পারছি না। আগেই বলেছি—একটি অবিশ্বাস্য খবর এসেছে! সেমেনভ একটি সৈন্যের হাতে আমাকে এই বিশ রুবল পাঠিয়েছে; এটা সে আমার কাছ থেকে ধার করেছিল; সেই সঙ্গে লিখেছে, তার সঙ্গে দেখা করতে হলে আমাকে ব্যারাকে যেতে হবে। এর কি অর্থ তা বুঝতে পারছ?" সে একে একে আমাদের সকলের দিকে তাকাল। আমরা কেউ কিছু বললাম না। জুখিনই আবার কথা বলল, "আমি এখনই সোজা তার কাছে যাচ্ছি। ইচ্ছা করলে তোমরাও আসতে পার।" সকলেই কোট পরে সেমেনভের কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। অপেরভ বলল, "আমরা সকলে হাজির হয়ে তার দিকে একটা প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুর মত তাকালে সেটা কি খুব বিসদৃশ লাগবে না?"

জবাব দিল জুখিন। "বাজে কথা! একজন কমরেডের কাছ থেকে বিদায় নিতে যাব এর মধ্যে বিসদৃশ কি থাকতে পারে? সে কোথায় আছে তাতে কি যায়-আসে? সত্যি, এটা বাজে চিন্তা। যেতে ইচ্ছা হলে চলে এস।"

একটা গাড়ি ভাড়া করে সৈন্যটিকে নিয়ে আমরা রওনা হলাম। কর্তব্যরত নন-কমিশণ্ড অফিসারটি আমাদের ব্যারাকে ঢুকতে দিতে চাইল না; কিন্তু জুখিন কোনরকমে একটা বোঝাপড়া করে নিল, আর সঙ্গী সৈনিকটি

আমাদের একটা বড় ঘরে নিয়ে হাজির করল। কয়েকটা ছোট বাতি জলতে থাকায় ঘরটা স্বল্পালোকিত। দুই পাশে সারি সারি বাংক। ধূসর গ্রেটকোট-পরা নতুন রিক্রুটরা তাতে শুয়ে-বসে আছে। তাদের সকলেরই মাথা অর্ধেক কামানো। ঘরটার গুমোট ভাব আর কয়েক শ' লোকের নাক ডাকার শব্দ আমার খুব খারাপ লাগল।

আগে আগে চলেছে আমাদের গাইড ও জুখিন। ব্যারাকের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে জুখিন গতি দ্রুততর করেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

"হেলো সেমেনভ," একটি রিক্রুটের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল। অন্য সকলের মতই তারও মাথা কামানো; সৈনিকের মোটা তলবাস পরে ধূসর গ্রেটকোটটা কাঁধের উপর ফেলে সে বাংকের উপর বসে আছে। অপর একটি রিক্রুটের সঙ্গে বসে সে যেন কি খাচ্ছিল। হ্যাঁ, সেই বটে; মাথার পাকা চুল ছোট করে ছাঁটা; সামনের দিকটা কামানোর জন্য নীলাভ দেখাচ্ছে। মুখে সেই স্বাভাবিক গম্ভীর অথচ উৎসাহপূর্ণ ভাব। পাছে আমার চাউনি তাকে আঘাত করে তাই আমি এক পাশে সরে গেলাম। মনে হল অপেরভেরও সেই একই অবস্থা; সেও পিছনে সরে গেল। কিন্তু সেমেনেভ যখন জুখিন ও অন্যদের অভ্যর্থনা জানাল তখন ভরসা পেয়ে আমরাও এগিয়ে গেলাম। আমি হাতটা বাড়িয়ে দিলাম; অপেরভও বাড়িয়ে দিল তার কাঠের মত হাত, কিন্তু আমাদের আগেই সেমেনেভ তার ফোলা-ফোলা হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল, "হেলো জুখিন। তুমি এসেছ বলে ধন্যবাদ। বস মশাইরা। কুদ্রিয়াশ্‌কা, তুমি চলে যাও।" কথাগুলি সে বলল পাশের রিক্রুটটিকে; "আমাদের বাকি কথা পরে হবে। ...এস, তোমরা সবাই বস। তারপর? তুমি খুব অবাক হয়েছ জুখিন, তাই না? তার পাশে বাংকে বসে জুখিন জবাব দিল, "তোমার কোন কাজই আমাকে অবাক করে না। বরং তুমি পরীক্ষা দিতে হাজির হলেই আমি বেশী অবাক হতাম। এবার বল, তুমি কোথায় ছিলে, আর এ সব কেমন করে ঘটল? স্বাভাবিক জোরালো গলায় সে বলল, "কোথায় ছিলাম? মদের দোকানে, মাটির নীচে, এমনি সব জায়গায়। সেই বণিকের গল্প শুনেছ কি? নচ্ছারটা মারা গেছে। তারা আমাকে তাড়িয়ে দিতেই চেয়েছিল। সঙ্গে টাকা-পয়সা যা ছিল সব ফুঁকে দিলাম। তারপর ঋণের পর ঋণ করতে লাগলাম—ধার-কর্জের আর শেষ রইল না। এই আর কি।" "কিন্তু এ মতলব তোমার মাথায় ঢুকল কেমন করে?" জুখিন শুধাল। "খুব সহজে। একজন প্রাক্তন বণিকের সঙ্গে থাকতাম। সে এখন একজন রিক্রুটিং এজেন্ট। তাকে বললাম, 'এক হাজার রুবল দাও, আমি সৈন্যদলে নাম লেখাব।' তাই করলাম।" জুখিন বলল, "কিন্তু ভেবে দেখ, তুমি একজন ভদ্রলোক।" "ওটা কিছু নয়; সেই এজেন্টই ব্যবস্থা করে দিল। সেনেট থেকে একটা অনুমতি-পত্র এনে দিল। তারপর

সব ধার-দেনা শোধ করে দিলাম। চলে এলাম এখানে। বাস। এখানে খারাপ তো নেই। চাবুক চালাবার কোন অধিকার ওদের নেই। পাঁচ রুবল করে পাই।...আর কে বলতে পারে, একটা যুদ্ধ তো বেধে যেতে পারে।"

তারপর এক বিচিত্র অবিশ্বাস্য অভিযানের কাহিনী সে ভুখিনকে শোনাতে লাগল। তার মুখের ভাব অনবরত বদলাতে লাগল ; চোখ দুটি জ্বলতে লাগল।

ব্যারাকে বেশী সময় থাকা চলে না ; আমরা তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। না দাঁড়িয়েই সে আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করে বলল, "মাঝে মাঝে এসো হে মশাইরা। মাসখানের মধ্যেই আমাদের বাইরে পাঠানো হবে।" কয়েক পা এসেই ভুখিন আবার ফিরে গেল। তাদের বিদায়-দৃশ্যটা দেখবার জন্য আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম, ভুখিন পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে সেমেনভকে দিতে গেল, কিন্তু সে ভুখিনের হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল। তারপর তারা পরস্পরকে চুমো খেল। ভুখিন বেশ গলা ছেড়েই বলে উঠল, "বিদায় বড়দা! আমি বাজি রেখে বলতে পারি, আমার পড়া শেষ হবার আগেই তুমি একজন অফিসার বনে যাবে।" সেমেনভ সাধারণত হাসে না ; কিন্তু এবার সে এমন কর্কশ অস্বাভাবিক গলায় অট্টহাসি হেসে উঠল যে আমার খুব কষ্ট হতে লাগল। আমরা বেরিয়ে এলাম।

হেঁটেই বাড়ি ফিরলাম। ভুখিন চুপচাপ, সারাটা পথ নাক ঝাড়তে লাগল ; কখনও এ-নাক, কখনও ও-নাক। বাড়ি আসার পরেই সে আমাদের ছেড়ে চলে গেল ; পরীক্ষা পর্যন্ত চলল তার একটানা মদ টানা।

অধ্যায়—৪৫
আমি ফেল করলাম

অবশেষে প্রথম পরীক্ষার দিন—বিষয় ডিফারেন্সিয়াল ও ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস—এল ; আমার মনের অবস্থা তখনও অস্পষ্ট, ভাগ্যে কি আছে সে সম্পর্কে কোন পরিষ্কার ধারণাই নেই।

মনের এই অবস্থা নিয়েই প্রথম পরীক্ষায় বসতে গেলাম। যে দিকটায় প্রিন্স, কাউন্ট ও ব্যারণরা বসে সেই দিকে একটা বেঞ্চিতে বসে তাদের সঙ্গে ফরাসীতে আলাপ শুরু করে দিলাম। কী আশ্চর্য, একবারও আমার মনে হল না যে একটু পরেই যে বিষয়ের উপর আমাকে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তার কিছুই আমি জানি না। যারা পরীক্ষা দিতে উঠে গেল ঠাণ্ডা মাথায় তাদের দেখতে লাগলাম, এমনকি কয়েকজনকে নিয়ে ঠাট্টা-মস্করাও করলাম।

টেবিল থেকে ফিরে এলে আইলেংকাকে বললাম, "আরে গ্র্যাপ, খুব ভয় পেয়েছিলে কি ?"

আইলেংকা পান্টা জবাব দিল, "দেখাই যাবে তোমার অবস্থাটা কেমন হয়।"

তার কথায় সাময়িকভাবে ক্ষুণ্ণ হলেও তার জবাব শুনে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলাম। কিন্তু কুয়াশা আবার আমার মনকে ঢেকে দিল, সমস্ত ব্যাপারটা সম্পর্কেই আমি উদাসীন থাকতে চেষ্টা করলাম। আইকনিনের সঙ্গে আমার যখন ডাক পড়ল তখন ইউনিফর্মটাকে ঠিকঠাক করে সম্পূর্ণ শান্তভাবে পরীক্ষার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম।

তরুণ অধ্যাপকটি—প্রবেশিকা পরীক্ষার সময়ও যে আমাকে প্রশ্ন করেছিল—যখন সোজাসুজি আমার মুখের দিকে তাকাল, আর আমিও প্রশ্ন-পত্রটা হাতে নিলাম, তখন ভয়ের একটা ছোট ঠাণ্ডা স্রোত যেন আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নামতে লাগল। আইকনিনের পরীক্ষা খুব খারাপ হল। আমার অবস্থাও তথৈবচ। দ্বিতীয় কার্ডটি নিয়েও কোন জবাব দিতে পারলাম না। অধ্যাপক সহানুভূতির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় অথচ শান্ত গলায় বলল—

"দ্বিতীয় কোর্সে তুমি পাশ করতে পারবে না মিঃ ইর্তেনেভ। আর পরীক্ষায় না বসাই তোমার পক্ষে ভাল হবে। মিঃ আইকনিন, তোমার সম্পর্কেও সেই একই কথা।"

আইকনিন পুনঃ পরীক্ষার অনুমতি চাইল; যেন এটা একটা ভিক্ষার ব্যাপার; কিন্তু অধ্যাপক জানিয়ে দিল, এক বছরে সে যা করতে পারে নি দু'দিনে সেটা করা সম্ভব নয়; কাজেই তার পাশ করার কোন সম্ভাবনা নেই। আইকনিন আবারও সকরুণ মিনতি জানাল, কিন্তু অধ্যাপক আবারও তা প্রত্যাখ্যান করল। নীচু অথচ দৃঢ় স্বরে বলল, "তোমরা যেতে পার।"

তখনই আমি টেবিল ছেড়ে চলে আসা স্থির করলাম। আমি যে চুপ করে থেকে আইকনিনের মিনতিকেই সমর্থন করছিলাম সেটা বুঝতে পেরে আমার লজ্জা বোধ হল। তারপর কি ভাবে যে ভিড়ের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম, ছাত্রদের নানা প্রশ্নের কি জবাব দিয়েছিলাম, কিভাবে বাড়ি ফিরেছিলাম—কিছুই মনে নেই। আমি আহত হয়েছিলাম, অপমানিত হয়েছিলাম, সত্যিকারের দুঃখ পেয়েছিলাম।

তিনদিন আমার ঘর থেকে বের হই নি; কারও সঙ্গে দেখা করি নি; শৈশবকালের মত চোখের জলের মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজেছি; অনেক কেঁদেছি। খুব ইচ্ছা হলে যাতে নিজেকে গুলি করতে পারি সেজন্য একটা পিস্তলের খোঁজ করেছি। আমার মনে হতে লাগল, দেখা হলেই আইলেংকা গ্র্যাপ আমার মুখে থুথু দেবে, আর সেটা তার পক্ষে অন্যায় হবে না; আমার দুর্ভাগ্য অপেরভ আনন্দ করবে, সকলকে একথা বলে বেড়াবে; ইয়ার-এ আমাকে অপমানিত করে কল্পিকভ ঠিক কাজই করেছে; ইত্যাদি ইত্যাদি। জীবনের

অনেক দুঃসহ কষ্টের কথাই একের পর এক মনে পড়তে লাগল; আর আমার দুর্ভাগ্যের দায় অন্য কারও ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টা করলাম। ভাবলাম, নিশ্চয় কেউ ইচ্ছা করে একাজ করেছে; আমার বিরুদ্ধে একটা বড় ষড়যন্ত্রের জাল আবিষ্কার করলাম; অধ্যাপক, ছাত্রবন্ধু, ভলদিয়া, দিমিত্রি—সকলকেই দোষী সাব্যস্ত করলাম। এমনকি বাপি আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিল বলে তাকেও রেহাই দিলাম না। এত অসম্মানের মধ্যে আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও নালিশ জানালাম। শেষ পর্যন্ত, পরিচিত সকলের চোখে এত বেশী ছোট হয়ে থাকার ভয়ে বাপিকে মিনতি জানালাম, আমাকে অশ্বারোহী সেনাদলে যোগ দিতে অথবা ককেসাসে যেতে দেওয়া হোক। বাপি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিল; কিন্তু আমার দুঃখ দেখে সান্ত্বনা জানিয়ে বলল, অবস্থা এমন কিছু খারাপ হয় নি; আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোন ফ্যাকাল্টিতে বদলি করলেই একটা সুরাহা হয়ে যাবে।

মেয়েরা এ সবের কিছুই বুঝত না। পরীক্ষাটা কি বস্তু, ফেল করার অর্থ কি—এ সব তারা জানতও না, বুঝতও না; তবু আমার কষ্ট দেখে তারা আমাকে করুণা করত।

দিমিত্রি রোজই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত; আমার সঙ্গে খুবই ভদ্র ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করত; কিন্তু ঠিক সেই কারণেই আমার মনে হত সে যেন আমার সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে উঠেছে। সে যখন আমার ঘরে ঢুকে চুপচাপ বসে থাকত তখন সেটা আমার কাছে অপমানকর বলে মনে হত, আমি কষ্ট পেতাম। সোফিয়া আইভানভ্না ও ভারেংকা তার হাত দিয়ে আমাকে সেই সব বই পাঠিয়ে দিত যেগুলি আমি আগে তাদের কাছে চেয়েছিলাম; কিন্তু তাদের এই অতিমনোযোগকেই আমার মনে হত তাদের উদ্ধত করুণা-প্রদর্শন: আমি আজ এতটা নীচে নেমে গেছি বলে আমার প্রতি অবমাননাকর সহানুভূতি দেখানোর নামান্তর। তিনটে দিন কেটে যাবার পরে আমি অনেকটা সামলে উঠলাম; তবু দেশের বাড়িতে যাবার আগে পর্যন্ত আমি বাড়ি থেকে মোটেই বের হতাম না; পাছে বাড়ির কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সেই ভয়ে বিনা কারণে ঘর থেকে ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

চিন্তার পর চিন্তা; চিন্তার আর শেষ নেই। শেষ পর্যন্ত একদিন সন্ধ্যায় নীচের ঘরে বসে আভ্দোতিয়া ভাসিলেভ্নার ওয়াল্‌জ্ শুনতে শুনতে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে ছুটতে উপরে গিয়ে "জীবনের বিধান" লেখা নোট-বইটা তুলে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরলাম। মুহূর্তের মধ্যে অনুশোচনা ও নৈতিক উচ্ছ্বাস আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। কাঁদতে লাগলাম, কিন্তু সেটা নৈরাশ্যের অশ্রুজল নয়। আবেশ কেটে গেলে স্থির করলাম, নিজের জীবনের বিধানগুলিকে নতুন করে লিখব; মনে দৃঢ় সংকল্প জাগল, এখন থেকে কোন অন্যায় কাজ করব না, একটি মুহূর্তও আলস্যে

কাটাব না, আমার জীবনের বিধান থেকে কখনও বিচ্যুত হব না।

এই নৈতিক প্রেরণা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল কি না, এর ফলে আমার নৈতিক উত্তরণের পথে কোন নতুন বিধান সংযোজিত হয়েছিল কি না, সেকথা লিখব আমার যৌবনের অধিকতর সুখের পরবর্তী পর্যায়ে।

সেপ্টেম্বর ২৪
ইয়াস্‌নায়া পলিয়ানা।

অবসর ভোগীদের আলোচনা

A Talk Among Leisured People

(পরবর্তী গল্পের ভূমিকা)

কোন ধনীর গৃহে সমবেত কিছু অতিথি একদিন জীবন সম্পর্কে একটা গম্ভীর আলোচনা শুরু করে দিল।

বর্তমানের ও অতীতের অনেকের কথাই তারা বলল, কিন্তু এমন একটি লোকও পেল না যে তার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট।

সুখের বড়াই তো কেউ করতে পারলই না, বরং একটি মানুষও বলতে পারল না যে সে একজন খৃস্টানের উপযুক্ত জীবন যাপন করছে। সকলেই স্বীকার করল, নিজেদের লোক ও পরিবারের লোকজনদের নিয়ে তারা পার্থিব জীবনই যাপন করছে; প্রতিবেশীদের কথা কেউ ভাবে না; ঈশ্বরের কথা তো আরও কম ভাবে।

সব অতিথি এই একই কথা বলল, এবং ঈশ্বরবিহীন অখৃষ্টীয় জীবন যাপন করার জন্য নিজেদের উপরেই দোষারোপ করল।

একটি যুবক বলে উঠল, "তাহলে কেন আমরা এভাবে বেঁচে আছি? যে কাজ নিজেরাই সমর্থন করি না সেই কাজই কেন করছি? নিজেরাই স্বীকার করছি, আমাদের বিলাস-ব্যাসন, আমাদের নারীপ্রীতি, আমাদের ধন-সম্পদ, আর সর্বোপরি আমাদের গর্ব—সহকর্মীদের কাছ থেকে দূরে থাকো—এই সবই আমাদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। মহৎ ও ধনী হতে হলে মানুষের সব রকম আনন্দের উপকরণ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করতে হবে। আমরা শহরে ভিড় করি, স্ত্রৈণ হয়ে পড়ি, স্বাস্থ্য নষ্ট করি, আর সব রকম আমোদ-প্রমোদ সত্ত্বেও স্ফূর্তিহীনতা এবং আমাদের জীবন যে রকম হওয়া উচিত ছিল সে রকম না হওয়ার অনুশোচনার ফলে মৃত্যু বরণ করি।

"কেন আমরা এভাবে জীবন কাটাই? কেন আমাদের জীবনকে আমরা নষ্ট করি? ঈশ্বর আমাদের ভাল যা কিছু দিয়েছে তাকেও নষ্ট করি? সেই পুরনো জীবন নিয়ে আমি বাঁচতে চাই না। আমি পড়াশুনা ছেড়ে দেব। আমি সবে শুরু করেছি—কিন্তু পড়াশুনা তো সেই যন্ত্রণাদায়ক জীবনই এনে দেবে যার বিরুদ্ধে আমরা সকলেই নালিশ জানাচ্ছি। সম্পত্তি ত্যাগ করে গ্রামে চলে যাব—গরিবদের মধ্যে বাস করব। তাদের সঙ্গে কাজ করব, নিজের হাতে কাজ করতে শিখব, আর আমার শিক্ষা যদি গরিবদের কোন কাজে লাগে তো সে শিক্ষাকে তাদের সঙ্গে ভাগ করে নেব; কিন্তু সে শিক্ষা লাভ করব কোন প্রতিষ্ঠান বা পুথির সাহায্যে নয়, শিক্ষালাভ করব প্রত্যক্ষভাবে ভাইয়ের মত তাদের সঙ্গে জীবন কাটিয়ে।"

সেখানে উপস্থিত তার বাবার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে আরও বলল, "হ্যা, আমি মনস্থির করে ফেলেছি।"

বাবা বলল, "তোমার অভিলাষটা ভালই, কিন্তু চিন্তাহীন ও অবিবেচনা-প্রসূত। এটা তোমার কাছে এত সহজ মনে হয়েছে কারণ জীবনকে তুমি জান না। এমন অনেক কিছু আছে যা আমাদের ভাল মনে হয়, কিন্তু সেই ভালকে কার্যে রূপান্তর করা জটিল ও কঠিন। চলতি পথে হাঁটাই শক্ত, নতুন পথে চলা তো আরও শক্ত। নতুন পথ একমাত্র তারাই তৈরি করতে পারে যারা যথেষ্ট পরিণত এবং মানুষের পক্ষে যা কিছু পাওয়া সম্ভব সেসব যার অধিগত। জীবনের নতুন পথ তৈরি করার কাজটা তোমার কাছে সহজ মনে হয়েছে কারণ জীবনকে তুমি বোঝ না। এটা চিন্তাহীনতা ও যৌবনসুলভ অহংকারেরই ফল। তাই আপাতত তোমার উচিত জীবনের নতুন পথ খোলার চেষ্টা না করে আমাদের মত প্রবীণ লোক যারা তোমাদের ভালর জন্যই তোমাদের পরিচালিত করছে তাদের মান্য করে চলা।"

যুবকটি চুপ করে রইল। প্রবীণ অতিথিরা সকলেই বাবার কথায় সায় দিল।

একটি মাঝবয়সী বিবাহিত পুরুষ যুবক বাবার দিকে ফিরে বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন। একথা ঠিক যে জীবনের অভিজ্ঞতা না থাকায় জীবনের নতুন পথ খুঁজতে গিয়ে সে ভুল করতে পারে, এবং তার সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় হতে পারে না। কিন্তু আপনি তো জানেন, আমাদের বিবেকবিরোধী জীবন যে আমাদের সুখী করতে পারে'নি সে বিষয়ে আমরা একমত। কাজেই এর হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টার যুক্তিকে তো আমার স্বীকার না করে পারি না।

"ছেলেটি হয় তো ভুল করতে পারে, কিন্তু আজ সন্ধ্যার এই আলোচনা শুনতে শুনতে আমার মনেও এই একই চিন্তার উদ্রেক হয়েছে। আমি পরিষ্কার বুঝেছি, যে-জীবন এখন আমি যাপন করছি তা আমার মনের শান্তি

বা সুখ দিতে পারে না। অভিজ্ঞতা এবং যুক্তি দুইই সে কথা বলে। তাহলে কিসের অপেক্ষায় আমি আছি? সকাল-সন্ধ্যা আমরা নিজ নিজ পরিবারের জন্য সংগ্রাম করি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমরা এবং আমাদের পরিবার নাস্তিকের জীবন যাপন করে ক্রমাগত পাপের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। পরিবারের জন্য আমরা খেটে মরছি, কিন্তু আমাদের পরিবারের কোন ভাল হচ্ছে না, কারণ তাদের জন্য আমরা ঠিক কাজটি করছি না। তাই প্রায়ই মনে হয়, আমি যদি আমার জীবনের পথটা সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলে ওই যুবকটির প্রস্তাব মত কাজ করি—স্ত্রী-পুত্রের কথা না ভেবে আমার আত্মার কথা ভাবতে শুরু করি, তাহলেই বোধ হয় ভাল হয়। পল অকারণে বলে নি: 'যে বিবাহিত সে চায় স্ত্রীকে সুখী করতে, আর যে অবিবাহিত সে চায় কেমন করে প্রভুকে সুখী করবে।'"

তার কথা শেষ হবার আগেই তার স্ত্রী এবং অন্য সব স্ত্রীলোকরা তার উপর আক্রমণ শুরু করল।

একটি প্রবীণা বলল, "একথা তোমার আগে ভাবা উচিত ছিল। জোয়াল যখন কাঁধে নিয়েছ তখন বোঝা তো বইতেই হবে। যখনই পরিবারকে খাওয়ানো-পরানো শক্ত হবে তখনই তো সকলে তোমার মতই বলবে, "আত্মাকে বাঁচাতে সংসার থেকে সরে যাবে। সেটা মিথ্যাচার, ভীরুতা। না! প্রত্যেক পুরুষের উচিত পরিবারকে নিয়ে সৎপথে বেঁচে থাকা। ঈশ্বর আমাদের বলেছে অপরকে ভালবাসতে; কিন্তু ও-পথে চললে ঈশ্বরের নামে তোমরা অপরের প্রতি অন্যায় করবে। না। একজন বিবাহিত লোকের কতকগুলি নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা আছে, আর সেগুলি সে পরিহার করতে পারে না। তোমার পরিবার যদি নিজের পায়ে দাঁড়ায় সেটা স্বতন্ত্র কথা। তখন তুমি যা খুশি করতে পার, কিন্তু পরিবারকে জোর করে পথে বসাবার অধিকার কারও নেই।"

বক্তা কিন্তু সেকথা মানল না। বলল, "আমি তো আমার পরিবারকে ছাড়তে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই, ছোটবেলা থেকেই পরিবারকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা দুঃখ-কষ্ট সইতে, পরিশ্রম করতে, অপরের সেবা করতে এবং সকলের সঙ্গে ভাইচারি করে চলতে পারে। আর সেজন্য আমাদের ত্যাগ করতে হবে সব ধন-সম্পত্তি ও মর্যাদা।"

তার স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বলল, "তুমি নিজেই যখন ঈশ্বরের পবিত্র পথে চল না তখন অপরকে বিব্রত করার কোন দরকার দেখি না। যৌবনে তুমি তো নিজের সুখ নিয়েই বেঁচেছ। তাহলে এখন তোমার ছেলেমেয়েকে, তোমার পরিবারকে জ্বালাচ্ছ কেন? তাদের শান্তভাবে বড় হতে দাও, তারপর তাদের উপর কোন রকম জবরদস্তি না করে তাদের চলতে দাও।"

স্বামীটি চুপ করে গেল, কিন্তু উপস্থিত একটি প্রবীণ লোক তার হয়ে বলল :

"আমি স্বীকার করছি, যে লোকের পরিবার আছে তার পক্ষে জীবন-যাত্রার ধারাকে বদলে ফেলা শক্ত, এমন কি অসম্ভব। কিন্তু যারা আমার মত বৃদ্ধ তাদের তো কর্তব্য ঈশ্বরের নির্দেশ মত কাজ করা। নিজের কথাই বলি : আমার জীবনে এখন কোন দায় নেই ; সত্যি কথা বলতে কি, শুধু পেটের জন্যই আমি খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করি, বিশ্রাম করি, আর নিজেকে নিয়েই বিরক্ত হই, বিদ্রোহ করি। কাজেই আমার তো সময় হয়েছে এ জীবনকে ছেড়ে, সব সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়ে, অন্তত মরবার আগে ঈশ্বর-নির্দেশিত খৃস্ট্রীয় জীবন যাপন করি।"

কিন্তু অন্যরা বৃদ্ধের সঙ্গে একমত হল না। তার বোন-ঝি ও ধর্ম-মেয়ে এবং নিজের ছেলেও সেখানে উপস্থিত ছিল। তারা দুজনই প্রতিবাদ করল।

ছেলে বলল, "না। জীবনে অনেক কাজ তুমি করেছ, এখন বিশ্রাম নেওয়ার সময়, ঝঞ্চট পোহাবার সময় নয়। ষাট বছরের জীবনে যে সব অভ্যাস গড়ে তুলেছ এখন তার পরিবর্তন করা উচিত নয়। তাতে নিজেকেই অকারণে কষ্ট দেওয়া হবে।"

"ঠিক, ঠিক," বোন-ঝি কথাটা সমর্থন করল।

একই বয়সের অপর এক বৃদ্ধ বলল, "ঠিকই তো, কেনই বা তা করবেন ? আপনি—আমি হয় তো আর দুটো দিনই বাঁচব ; কাজেই নতুন করে শুরু করতে যাব কেন ?"

জনৈক শ্রোতা এতক্ষণ চুপ করে ছিল ; এবার সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "আশ্চর্য ব্যাপার তো ! আমরা সকলেই বলছি, ঈশ্বরের নির্দেশমত জীবন চালানোই ভাল ; আমরা খারাপভাবে বেঁচে আছি ; দেহে-মনে কষ্ট পাচ্ছি। অথচ যেই সে কথাকে কার্যে পরিণত করতে চাইছি অমনি দেখা যাচ্ছে, ছেলেমেয়েদের বিচলিত করা উচিত নয়, তাদের পুরনো পথেই মানুষ করতে হবে। যুবকরা তাদের বাবা-মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারবে না, ধর্ম-পথে চলতে পারবে না, পুরনো পথেই চলতে হবে। বিবাহিত পুরুষ স্ত্রী-সন্তানকে বিপদে ফেলতে পারবে না, ধর্ম-পথের পরিবর্তে পুরনো পথেই তাকে চলতে হবে। নতুন কিছু শুরু করার প্রয়োজন কোন বৃদ্ধের নেই ; সে জীবনে তারা অভ্যস্ত নয়, আর মাত্র দুটো দিন তো তারা বাঁচবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে আমাদের কারওই সৎপথে বাঁচার দরকার নেই : তার কথা আমরা কেবল মুখেই বলতে পারি।"

আলো থাকতে আলোয় পথ চল

Walk in the Light While There is Light

(আদি খৃস্টীয় যুগের গল্প)

খৃস্ট-জন্মের এক শ' বছর পরে যে-কালে খৃস্টের শিষ্যদের শিষ্যরা বেঁচেছিল এবং খৃস্টানরা বিধান-বর্ণিত গুরুর বিধানকে কঠোরভাবে মেনে চলত, সেই যুগে রোমক সম্রাট ট্রোজানের রাজত্বকালে ঘটনাটি ঘটেছিল।

বিধানে বর্ণিত আছে :

যে অগণিত মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করত তারা সকলেই ছিল এক মন, এক প্রাণ : তারা কেউ বলত না অমুক জিনিসটা তার নিজস্ব, সব জিনিসই ছিল সকলের। প্রতিটি প্রধান শিষ্য ছিল প্রভু যীশুর পুনরভ্যুত্থানের সাক্ষী-স্বরূপ : তাদের সকলের উপরেই ছিল অপার করুণা। তাদের মধ্যে একজনেরও ছিল না কোন ত্রুটি ; কারণ যে সব লোকের জমি বা বাড়ি-ঘর ছিল সকলেই সে সব বিক্রি করে দামটা এনে দিত প্রধান শিষ্যদের পায়ে : আর সেটা বিলিয়ে দেওয়া হত সকলের মধ্যে যার যার প্রয়োজন অনুসারে। (বিধান iv. ৩২-৫)

সেই আদিকালে সাইলিসিয়া প্রদেশের টারসাস শহরে জুভেনাল নামক এক ধনী যুবক বাস করত। সে ছিল জহুরি, মূল্যবান রত্নের ব্যবসা করত। সাধারণ গরিব ঘরে জন্মেও পরিশ্রম ও কুশলতার সঙ্গে ব্যবসা চালিয়ে প্রভূত ধন-সম্পদ ও প্রতিবেশীদের শ্রদ্ধার অধিকারী হয়েছে। বহু দেশে ভ্রমণ করেছে ; অশিক্ষিত হলেও অনেক কিছু জেনেছে, বুঝেছে ; দক্ষতা ও সাধুতার জন্য শহরের লোকরা তাকে সম্মান করে। রোম সাম্রাজ্যের সব শ্রদ্ধেয় নাগরিকদের মত সেও ছিল পৌত্তলিক রোমক ধর্মে বিশ্বাসী ; সম্রাট অগাস্টাসের আমল থেকে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানই কঠোরভাবে প্রচলিত হয়েছে এবং বর্তমান সম্রাট ট্রোজানও সেটাই মেনে চলেছে। সাইলিসিয়া রোম থেকে অনেক দূরে অবস্থিত, কিন্তু রোমক গভর্ণররাই সে দেশ শাসন করত ; গভর্ণররা তাদের সম্রাটের অনুকরণ করত বলে রোমে যা কিছু করা হত তাই প্রতিফলিত হত সাইলিসিয়াতে।

এক সময় নিরো রোমে যে সব কাণ্ড করেছিল জুভেনাল ছোটবেলায় সে সব গল্প শুনেছে। আর পরবর্তীকালে সে দেখেছে একের পর এক সম্রাটের পতন ঘটেছে ; বুদ্ধিমান মানুষ হিসাবে সে এও বুঝেছে যে রোমক ধর্মে স্বর্গীয় বলে কিছু নেই, সে সবই মানুষের হাতে গড়া। তবু পরিচ্ছন্ন

চিন্তার মানুষ হিসাবে সে এটাও বুঝল যে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে কোন লাভ হবে না; নিজের শান্তির জন্য তাকে মেনে নেওয়াই ভাল। চারদিকে অর্থহীন জীবনযাত্রা, বিশেষ করে রোমে যা ঘটে চলেছে, তা দেখে মাঝে মাঝে সে বিব্রত বোধ করে। মনে সন্দেহ জাগে, সব কিছু বুঝতে পারে না, ভাবে এ সবই তার অশিক্ষার দোষ।

সে বিবাহিত, চারটি সন্তান ছিল, কিন্তু তিনটি অল্প বয়সেই মারা যায়, এখন একমাত্র ছেলে জুলিয়াস বেঁচে আছে।

জুভেনালের সব ভালবাসা, সব যত্ন তার উপরেই পড়ল। সে বিশেষ করে চাইল ছেলেকে শিক্ষিত করে তুলতে যাতে তার মত ছেলেকেও জীবন সম্পর্কিত সন্দেহের দোলায় দুলতে না হয়। জুলিয়াসের বয়স পনেরো বছর পার হবার পরে শহরের একজন দার্শনিকের হাতে তাকে তুলে দিল। জুলিয়াসের সঙ্গে তার বন্ধু পম্‌ফিলিয়াসকেও সেই দার্শনিকের কাছেই পাঠানো হল। পম্‌ফিলিয়াসের বাবা ছিল ক্রীতদাস; জুভেনালই তাকে মুক্তি দিয়েছে।

দুই বন্ধু একই বয়সের, একই রকম সুদর্শন। দুজনই পরিশ্রমসহকারে লেখাপড়া করতে থাকে। জুলিয়াস পারদর্শী হয়ে উঠল কাব্য ও গণিত পাঠে, কিন্তু পম্‌ফিলিয়াস ভালবাসে দর্শনশাস্ত্র। পাঠ সাঙ্গ করার একবছর আগে পম্‌ফিলিয়াস একদিন স্কুলে শিক্ষককে জানাল যে তার বিধবা মা দফ্‌নে শহরে চলে যাচ্ছে, তাই তাকেও পড়াশুনা ছেড়ে দিতে হবে।

একটি ভাল ছাত্র চলে যাবে শুনে শিক্ষক খুব দুঃখিত হল। দুঃখিত হল জুভেনালও। সব চাইতে দুঃখিত হল জুলিয়াস। কিন্তু কিছুতেই পম্‌ফিলিয়াসকে আটকানো গেল না। বন্ধুদের ধন্যবাদ জানিয়ে সে বিদায় নিল।

দু'বছর কাটল। জুলিয়াসের পড়া শেষ হয়ে গেছে। এর মধ্যে বন্ধুর সঙ্গে একবারও তার দেখা হয় নি।

একদিন পথে তাকে দেখতে পেয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এল। পম্‌ফিলিয়াস জানাল, সে ও তার মা সেই জায়গাতেই আছে।

বলল, "আমরা একা থাকি না, বন্ধুদের সঙ্গে থাকি; সেখানে সব কিছুতেই আমাদের সমান ভাগ।"

"সমান ভাগ মানে?"

"কোন কিছুই কারও নিজস্ব নয়।"

"সেরকম ব্যবস্থা কেন?"

"আমরা যে খৃস্টান", পম্‌ফিলিয়াস বলল।

জুলিয়াস বলে উঠল, "তা কি করে সম্ভব? আমরা তো শুনেছি খৃস্টানরা শিশুদের খুন করে খেয়ে ফেলে! তোমরা কি তাতেও অংশ নাও?"

সেকালে খৃস্টান হওয়ার অর্থই ছিল আমাদের কালের নৈরাজ্যবাদী হওয়ার মত। কোন লোক খৃস্টান হওয়ার দায়ে অভিযুক্ত হলেই তাকে কারারুদ্ধ

করা হত, আর সে ধর্মত্যাগ না করলে তার মৃত্যুদণ্ড হত।

পম্‌ফিলিয়াস বলল, "গিয়ে দেখেই এস না। আমরা অদ্ভুত কিছু করি না। সরলভাবে থাকি, খারাপ কিছু না করতেই চেষ্টা করি।"

"কিন্তু কোন কিছুই যদি নিজস্ব না হয় তাহলে তোমরা বাস কর কেমন করে?"

"বেঁচে তো আছি। আমরা যদি ভাইদের কাজ করে দেই, তাহলে তারাও আমাদের কাজ করে দেয়।"

"কিন্তু তোমার ভাইরা যদি তোমাদের কাজ নিয়ে তোমাদের কাজ করে না দেয়—তাহলে?"

"সেরকম কেউ সেখানে থাকে না। সেরকম লোকরা বিলাসী হয়, তারা আমাদের কাছে আসে না। আমাদের জীবন সরল, মোটেই বিলাসী নয়।"

"কিন্তু অনেক আল্‌সে মানুষ আছে যারা কিছু না করে খেতে পেলেই খুশি হয়।"

সেরকম কেউ থাকলে তাদেরও আমরা সানন্দে গ্রহণ করি। সম্প্রতি সেরকম একটি লোক আমাদের কাছে এসেছিল, একটি পলাতক ক্রীতদাস। একথা ঠিক যে প্রথমে সে ছিল অলস, খারাপ জীবন যাপন করত, কিন্তু অচিরেই তার অভ্যাস পাল্টে গেল, এখন সে খুব ভাল হয়ে গেছে।"

"কিন্তু ধর, সে যদি ভাল না হত?"

"সেরকম লোকও আছে; আমাদের বড়দা আইরিল বলে, আমাদের উচিত সেই সব লোককে আরও দামী বলে গণ্য করা, আরও বেশী করে ভালবাসা।"

"কিন্তু কোন নিষ্কর্মা লোককে কি কেউ ভালবাসতে পারে?"

"মানুষকে ভাল না বেসে কি থাকা যায়!"

জুলিয়াস শুধাল, "কিন্তু তারা যা চাইবে তাই কি দেওয়া যায়? আমার বাবা যদি সব প্রার্থীকেই দিত তাহলে তো অচিরেই তার সর্বস্ব ফুরিয়ে যেত।"

পম্‌ফিলিয়াস জবাব দিল, "তা আমি জানি না। প্রয়োজন মেটবার পক্ষে যথেষ্ট আমাদের আছে, আর যদি কখনও এমন ঘটে যে আমাদের খাবার-দাবার কিছু নেই, তাহলে অন্যের কাছে চাইলেই তারা দেবে। কিন্তু সেরকম ঘটনা কদাচিৎ ঘটে।"

জুলিয়াস বলল, "কি করে যে তোমরা চালাও বুঝি না। আমার বাবা তো বলে, তুমি যদি সঞ্চয় না কর, যে যা চায় তাই তাকে দিয়ে দাও, তাহলে তো তুমি নিজেই না খেয়ে মারা যাবে।"

"আমরা মরি না। গিয়েই দেখে এস। আমরা বেঁচে আছি; অভাবের

তাড়নায় কষ্ট তো পাইই না, বরং অন্যকে দেবার মত যথেষ্ট আমাদের আছে।"

"সেটা কি করে হয়?"

"কেন, এইভাবে। আমরা সকলে একই ধর্মে বিশ্বাস করি, তাকে পূর্ণ করার শক্তি সকলের সমান নয়; কারও বেশী আছে, কারও কম। সত্য জীবনের পথে কেউ অনেক দূর এগিয়েছে, কেউ বা সবে যাত্রা শুরু করেছে। আমাদের সকলের সম্মুখেই খৃস্ট দাঁড়িয়ে আছে তার জীবন নিয়ে; আমরা সকলেই তাকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করি, আর সেই পথেই আমাদের কল্যাণকে দেখতে পাই। আবার বড়দা সাইরিল ও তার স্ত্রী পেলাজিয়ার মত কেউ কেউ আমাদের নেতা, অন্যরা আছে তাদের পিছনে, অনেকে আবার আরও পিছনে; কিন্তু আমরা সকলে একই পথের যাত্রী। যারা প্রথম সারিতে থাকে তারা খৃস্টের বিধান—অর্থাৎ সর্বস্ব ত্যাগ এবং জীবনকে হারিয়ে তাকে বাঁচাবার প্রস্তুতির কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তাদের থাকে না অন্য কোন কামনা। বাকিরা দুর্বল, তাই সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে না। আরও অনেকে আছে যারা দুর্বলতর—যারা সবে সে পথে পা দিয়েছে; তারা এখনও পুরনো পন্থায় জীবন চালায়, নিজেদের জন্য অনেক কিছু রেখে কেবল বাড়তিটুকু দান করে।"

জুলিয়াস বলল, "তোমরা যদি সর্বস্ব দান করতে না পার তাহলে তোমার-আমার মধ্যে তো কোন পার্থক্য নেই। আমি তো মনে করি, খৃস্টান হতে হলে তাকে খৃস্টের সমগ্র বিধানটাই মেনে চলতে হবে—সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে ভিখারি হতে হবে।"

পম্‌ফিলিয়াস বলল, "সেটাই তো সব চাইতে ভাল। তোমরা কেন তা কর না?"

"হ্যাঁ, যদি দেখি তুমি করেছ তাহলে আমিও করব।"

পম্‌ফিলিয়াসের কথাগুলি জুলিয়াসের অন্তর স্পর্শ করল। নিজে গিয়ে তাদের জীবনযাত্রা দেখে আসতে পম্‌ফিলিয়াস জুলিয়াসকে আমন্ত্রণ করল সব দেখে-শুনে যদি সে খুশি হয় তাহলে সেখানে থেকে সে তাদের সঙ্গেই বাস করতে পারবে।

জুলিয়াস কথা দিল, কিন্তু পম্‌ফিলিয়াসের সঙ্গে দেখা করতে গেল না। নিজের কাজে ডুবে গিয়ে তার কথা ভুলে গেল।

২

জুলিয়াসের বাবা ধনী মানুষ; একমাত্র ছেলেকে সে ভালবাসত, তার জন্য গর্ববোধ করত; তাই তাকে টাকাপয়সা দিতে আপত্তি করত না। আলস্যে, বিলাসে ও উচ্ছৃংখল আমোদ-প্রমোদের পথে জুলিয়াস একটি ধনী

যুবকের স্বাভাবিক জীবনেই চলতে লাগল; সে জীবন চিরদিনই এক: মদ, জুয়া ও নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষ।

কিন্তু এ পথে চলতে অনেক টাকার দরকার। জুলিয়াস বুঝতে পারল তত টাকা তার নেই। তাই একবার সে বাবার কাছে আরও বেশী টাকা চাইল। বাবা টাকাটা দিল, কিন্তু ছেলেকে তিরস্কারও করল।

বাবার কাছ থেকে যে টাকা পেল অচিরেই তা খরচ হয়ে গেল। আর ঠিক সেই সময়েই একটা কাণ্ড ঘটল। সে আর তার এক মাতাল সঙ্গী একটা ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে একজনকে খুন করে বসল। শহর কোতয়াল তাকে গ্রেপ্তারই করত, কিন্তু তার বাবা এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল। ফূর্তি করার জন্য জুলিয়াসের আরও টাকার দরকার। এবার সে এক সঙ্গীর কাছ থেকে ধার করল। তাছাড়া, তার রক্ষিতা একটা উপহার দাবী করল: তার একটা মুক্তোর নেকলেস চাই।

জুলিয়াস এবার মার কাছে গিয়ে বলল তার কিছু টাকা চাই, আর টাকা না পেলে সে আত্মহত্যা করবে।

মাই ছেলেকে নষ্ট করেছে। সে বাবার কাছে গেল। জুভেনাল ছেলেকে ডেকে এনে মা ও ছেলে দুজনকেই ভর্ৎসনা করতে লাগল। জুলিয়াস বাবার মুখে মুখে তর্ক করায় সে ছেলেকে আঘাত করল। জুলিয়াস বাবার হাত চেপে ধরতেই জুভেনাল চীৎকার করে ক্রীতদাসদের ডেকে ছেলেকে বেঁধে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখার হুকুম দিল।

একা ঘরে জুলিয়াস বাবাকে ও নিজের জীবনকে অভিশাপ দিতে লাগল। সে বুঝতে পারল এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় নিজের অথবা বাবার মৃত্যু।

জুলিয়াসের মার কষ্টের সীমা রইল না। স্বামীর কাছে ছেলের হয়ে কথা বলতে গিয়ে বকুনি ও মারধোর খেল। তখন সে ছেলের কাছে গিয়ে বাবার কাছে ক্ষমা চাইতে ও তার ইচ্ছামত চলতে ছেলেকে রাজী করাল। বিনিময়ে মা তাকে কথা দিল, চুরি করে হলেও সে তাকে টাকাটা এনে দেবে। আবার স্বামীর কাছে গিয়ে ছেলেকে ক্ষমা করতে বলায় প্রথমে সে স্ত্রীকে ও ছেলেকে অনেকক্ষণ ধরে বকল, তারপর ছেলেকে ক্ষমা করতে রাজী হল এই শর্তে যে সে তার উচ্ছৃংখল জীবন পরিত্যাগ করবে এবং জনৈক ধনীর কন্যাকে বিয়ে করবে।

জুভেনাল বলল, "ছেলে তাহলে আমার কাছ থেকে টাকা পাবে, আবার স্ত্রীর দরুণ যৌতুকও পাবে। তখন সে সুস্থ ও সৎ জীবনে ফিরে আসতে পারবে। সে যদি আমার ইচ্ছামত কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেয় তবেই আমি তাকে ক্ষমা করব; কিন্তু এখনই তাকে কিছু দেব না, এবং যে মুহূর্তে সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে সেই মুহূর্তেই তাকে কোতয়ালের হাতে

তুলে দেব।”

জুলিয়াসের বাবার শর্তে রাজী হল; তাকে মুক্তি দেওয়া হল। বিয়ে করার এবং খারাপ জীবন থেকে সরে আসার কথা সে দিল, কিন্তু সে কথা রাখার ইচ্ছা তার মোটেই ছিল না।

বাড়িতে তার জীবন যেন নরক হয়ে উঠল। বাবা তার সঙ্গে কথা বলে না; তার জন্য মাকে মারধোর করে; মা কাঁদে।

একদিন মা ছেলেকে নিজের ঘরে ডেকে এনে গোপনে তার হাতে একটা মূল্যবান পাথর দিল; পাথরটা সে এনেছে স্বামীর ঘর থেকে।

বলল, “যাও, এটা বিক্রি কর; কিন্তু এখানে নয়। অন্য কোন শহরে, তারপর যা খুশি তাই করো। আপাতত ব্যাপারটা চাপা দিয়ে রাখব, তারপর ধরা পড়লে কোন ক্রীতদাসের ঘাড়ে দোষটা চাপিয়ে দেব।”

মার কথা শুনে জুলিযাসের বুকখানা ফেটে গেল। মূল্যবান পাথরটা না নিয়েই সে বাড়ি থেকে চলে গেল।

কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে কিছুই জানে না। শহর ছেড়ে হাঁটছে তো হাঁটছেই। অবশেষে পৌঁছে গেল দেবী ডায়ানার পবিত্র কুঞ্জে। একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে বসে ভাবতে শুরু করল। প্রথমেই ভাবল, দেবী ডায়ানার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। কিন্তু সে তো এখন দেবদেবীতে বিশ্বাস করে না, কাজেই তারা কেউ তাকে সাহায্য করবে না। তা যদি না করে তাহলে কে সাহায্য করবে?

মনের মধ্যে কেবলই অন্ধকার আর এলোমেলো চিন্তা। কেন সে এত যন্ত্রণা সহ্য করছে? কেন সে এভাবে নিজের যৌবনকে নষ্ট করছে? এতে তো সুখ পায় নি, পেয়েছে কেবল দুঃখ-কষ্ট। আজ সে বড় একা। আগে তার মা ছিল, বাবা ছিল, বন্ধুরা ছিল। এখন কেউ নেই। কেউ তাকে ভালবাসে না। সকলের কাছেই সে বোঝা। সকলেরই যন্ত্রণার কারণ।

ভাবতে ভাবতে একসময় তার মনে পড়ল পম্‌ফিলিয়াসকে। সে তাকে আমন্ত্রণ করেছিল তাদের কাছে যেতে, খৃস্টানদের মধ্যে যেতে। তার মনে হল, আর বাড়ি ফিরবে না, সোজা চলে যাবে খৃস্টানদের দেশে, সেখানে তাদের সঙ্গেই থাকবে। পম্‌ফিলিয়াসের কথাগুলি তার মনে পড়ল। সে বলেছিল, খৃস্ট বলেছে: 'যারা মজুর, যাদের কাঁধে অনেক বোঝা, তারা আমার কাছে এস, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।' একথা কি সত্যি?

ভাবতে ভাবতে পম্‌ফিলিয়াসের শান্ত, নির্ভীক, সুখী মুখখানি চোখের সামনে ভেসে উঠল; তার সব কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হল।

নিজের মনে বলল, “আসলে আমি কি? সুখের সন্ধানী। ভোগের মধ্যে সে সুখ খুঁজেছিলাম, পাই নি। যারাই আমার মত বেঁচে থাকে তারা কেউ পায় না। কিন্তু এমন একটি মানুষ আছে যে সর্বদাই আনন্দে ভরপুর, কারণ

সে কিছু চায় না। সে বলে, তার মত আরও অনেকে আছে, আর তার প্রভুর শিক্ষামত চললে সকলেই তার মত হবে। একথা যদি সত্য হয় তাহলে? সত্য হোক আর না হোক, কথাগুলি আমাকে টানছে, আমি সেখানেই যাব।"

নিজেকে এই কথা বলে যে গ্রামে খৃস্টানরা বাস করে সেখানে যাবার সংকল্প নিয়ে সে কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে গেল।

৩

জুলিয়াস মনের আনন্দে দ্রুত ছুটে চলল। যত যায় ততই খৃস্টানদের জীবনের ছবি বেশী করে মনে পড়ে, ততই তার সুখ বাড়ে। সূর্য সন্ধ্যার দিকে ঢলে পড়লে তার মনে বিশ্রামের ইচ্ছা জাগল। দেখতে পেল, একটি লোক পথের পাশে বসে খাবার খাচ্ছে। লোকটি মাঝবয়সী, মুখটা বুদ্ধিদীপ্ত; জলপাই ও পিঠে খাচ্ছে। জুলিয়াসকে দেখে হেসে বলল:

"স্বাগত যুবক! এখনও দীর্ঘ পথ সামনে। এখানে বসে বিশ্রাম কর।"

ধন্যবাদ জানিয়ে জুলিয়াস বসল।

"কোথায় চলেছ?"

"খৃস্টানদের গাঁয়ে।" ক্রমে ক্রমে জুলিয়াস তার জীবনের সব কথা ও সংকল্পের কথা অপরিচিত লোকটিকে খুলে বলল।

সব কথা মন দিয়ে শুনে এবং আরও কিছু প্রশ্ন করে লোকটি বাকি খাবারটা ঝোলায় ভরে পোশাক পরে বলল:

"শোন যুবক, যা স্থির করেছ সে কাজ করো না। তাতে তুমি ভুল করবে। আমি জীবনকে জানি, তুমি জান না। আমি খৃস্টানদের জানি, তুমি জান না। শোন! তোমার জীবন ও চিন্তাধারার একটা পর্যালোচনা আমি করছি; তা শোনার পরে যা তোমার কাছে ভাল মনে হবে তুমি তাই করো। তুমি যুবক, ধনী, সুদর্শন, শক্তিমান; তোমার শিরায় শিরায় জ্বলছে কামনার আগুন। তুমি খুঁজছ একটি শান্তির আশ্রয়; ভেবেছ খৃস্টানদের কাছে গেলে সে আশ্রয় মিলবে।

"প্রিয় যুবক, সেরকম কোন আশ্রয় কোথাও নেই, কারণ যে জ্বালায় তুমি জ্বলছ তার বাস সাইলিসিয়া অথবা রোমে নয়, তার বাস তোমার অন্তরে। একটি গ্রামের শান্ত নির্জনতায় সে জ্বালা আরও শতগুণ বেড়ে তোমাকে জ্বালাবে। খৃস্টানদের প্রতারণা বা তাদের ভ্রান্ত ধারণাই হল মানুষের স্বভাবকে অস্বীকার করা। যে বৃদ্ধ মানুষ সব কামনা-বাসনার অতীত হয়ে গেছে একমাত্র তারাই পারে খৃস্টানদের বাণী পালন করতে। কিন্তু যে

মানুষ যৌবনের তেজে দীপ্ত, অথবা তোমার মত যে যুবক জীবনকে ভোগ করে নি, তার স্বাদ পায় নি, সে কখনও সেই সব বাণীকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ তা মানুষের স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। তাদের কাছে গেলে তুমি যে জ্বালায় এখন জ্বলছ সেই জ্বালায় আরও বেশী করে জ্বলবে।

"খৃস্টানদের কোন ঈশ্বর নেই, স্বাধীন ইচ্ছা নেই, মানবতার বোধ নেই। আছে কেবল এক ক্রুশবিদ্ধ গুরুর প্রতি বিশ্বাস, আর তাঁর বাণীর প্রতি অনুরাগ। এখন চিন্তা করে দেখ কার উপর বেশী ভরসা করবে—ঈশ্বরের অভিপ্রায় ও মানুষের সংঘবদ্ধ জ্ঞানের স্বাধীন কর্মধারা, নাকি একটি মানুষের আবশ্যিক অন্ধ বিশ্বাস?'

অপরিচিত লোকটির কথা, বিশেষ করে তার শেষের কথাগুলি জুলিয়াসের মনে ধরল। খৃস্টানদের কাছে যাবার ইচ্ছায় যে চিড় ধরল তাই নয়, পাগলের মত এ রকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। কিন্তু এখন সে কি করবে, কি করে বর্তমানের সংকট অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবে, সে প্রশ্নটা তবু রয়েই গেল। তাই সে অপরিচিত লোকটির পরামর্শ চাইল।

সে বলল, "সেই কথাই তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম। তুমি কি করবে? আমি যতদূর বুঝি, তোমার পথ খুব পরিষ্কার। যে সব কামনা-বাসনা থেকে তোমার দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত সেগুলি তো মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। ভোগ-বাসনা তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে, আর তুমি তাতে বড় বেশী সাড়া দিয়েছ বলেই দুঃখ পেয়েছ। জীবনের শিক্ষাই এই রকম। সে শিক্ষাকে গ্রহণ করতেই হবে। তুমি অনেক শিখেছ, কোন্‌টা তিক্ত আর কোন্‌টা মধুর তাও বুঝেছ, তাই এখন আর সে ভুল করবে না। অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করবে। তোমাকে সব চাইতে বেশী কষ্ট দিয়েছে বাবার প্রতি তার মনোভাব। তোমাদের অবস্থার জন্যই সে শত্রুতার সূত্রপাত। তুমি যৌবনের ভোগের স্রোতে গা ভাসিয়েছিলে, সেটাই ছিল তোমার পক্ষে স্বাভাবিক, অতএব ভাল। কিন্তু সেটা তোমার পক্ষে ভাল ছিল সেই বয়সে। সে বয়স পার হয়ে গেছে, এখন তুমি পুরোপুরি মানুষ হয়ে উঠেছ, অথচ এখনও তুমি যৌবনের চপলতায় মজেছিলে, আর সেটাই খারাপ। যে বয়সে তুমি পৌঁচেছ তাতে তোমার বোঝা উচিত যে এখন তুমি একজন পুরোদস্তুর মানুষ, একজন নাগরিক, তোমাকে রাষ্ট্রের সেবা করতে হবে, তার জন্য কাজ করতে হবে। তোমার বাবা তোমার বিয়ে দিতে চান। সেটাই সুপরামর্শ। জীবনের একটি অধ্যায় যৌবনকে তুমি পার হয়ে এসেছ। নতুন পথে পা দিয়েছ। বিয়ে কর, যৌবনের আমোদ-প্রমোদ ছাড়, ব্যবসা, জনসেবা, বিজ্ঞান ও কলায় আত্মনিয়োগ কর; তাহলেই বাবার সঙ্গে, বন্ধুদের সঙ্গে নতুন করে মিলন ঘটবে। শুধু তাই নয়, নিজেও শান্তি ও সুখের সন্ধান পাবে। সুতরাং

আমার প্রধান পরামর্শ হচ্ছে ; বাবার ইচ্ছাকে মেনে নাও, বিয়ে কর। তারপরেও যদি তুমি নির্জনতার প্রতি আকর্ষণ বোধ কর, তো সেই পথেই চলো। তখন সেটাই হবে তোমার প্রকৃত বাসনা, এখনকার মত একটা ক্ষণিক আলোর ঝলকানিমাত্র নয়। এবার যাও।"

এই শেষ কথাগুলি জুলিয়াসের খুব ভাল লাগল। লোকটিকে ধন্যবাদ দিয়ে সে বাড়ির পথ ধরল।

মা তাকে সাদরে বুকে টেনে নিল। বাবা যখন শুনল সে বিয়ে করতে রাজী আছে এবং তার পছন্দমত মেয়েকেই বিয়ে করবে তখন সেও ছেলেকে কাছে টেনে নিল।

৪

তিন মাস পরে সুন্দরী ইউলাম্পিয়ার সঙ্গে জুলিয়াসের বিয়ে হয়ে গেল। নব দম্পতি জুলিয়াসের নতুন বাড়িতে বাস করতে লাগল ; বাবার ব্যবসার একটা শাখাও সে নিজের হাতে পেল। তার জীবনযাত্রা এখন সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে।

একদিন ব্যবসার কাজে পার্শ্ববর্তী শহরে গিয়ে একটা দোকানে বসে জুলিয়াস দেখল, একটি অপরিচিত মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে পম্‌ফিলিয়াস রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। দুজনের হাতে আঙুরের দুটো ভারী ঝুড়ি। তারা আঙুর বিক্রি করছে। জুলিয়াস বাইরে গিয়ে বন্ধুকে দোকানের ভিতর নিয়ে এল। মেয়েটি আঙুর বেচার জন্য বাইরেই রয়ে গেল।

দোকানির অনুমতি নিয়ে জুলিয়াস বন্ধুকে নিয়ে ভিতরের একটা ঘরে চলে গেল। একে অন্যের জীবনযাত্রা সম্পর্কে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল।

সব কথা শুনে পম্‌ফিলিয়াস বলল, "আচ্ছা, এখন তুমি সুখী হয়েছ তো? বিয়ে করে সুখ পেয়েছ তো?"

জুলিয়াস বলল, "সুখ? সুখ কাকে বলে? যদি বল বাসনার পরিপূর্ণ তৃপ্তি তাহলে অবশ্য আমি সুখী নই। কিন্তু আমি ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করেছি, লোকে আমাকে সম্মান করে, আর তাতেই আমি তৃপ্তি পাই নি। দার্শনিকরা যথার্থ কথাই বলে। আত্মা যা চায় জীবন তা দিতে পারে না। কিন্তু তার দ্বারা প্রমাণ হয় না যে তোমাদের প্রতারণা তা দিতে পারে।"

"আমাদের 'প্রতারণা' বলতে তুমি কি বোঝ?"

"বিবাহকে তোমরা বাতিল করে দিয়েছ।"

"বিবাহকে আমরা বাতিল করি না।"

"দেখ, বিয়েকে বাতিল না করলেও তোমরা ভালবাসাকে তো বাতিল

করেছ।"

"ঠিক উল্টো; আমরা সব কিছু ছেড়েছি, কেবল ভালবাসাকে নয়। আমাদের কাছে সেটাই তো সব কিছুর ভিত্তি। আমাদের সমাজে বিবাহ নিষিদ্ধ নয়, বরং আমাদের বড়রা এবং গুরুরা বিবাহে উৎসাহই দিয়ে থাকে। তবে তোমাদের ও আমাদের বিয়েতে পার্থক্য আছে। আমাদের কাছে স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা হচ্ছে ভাই-বোনের ভালবাসার মত: মনের যে অনুভূতিকে তোমরা ভালবাসা বল এটা তার চাইতেও শক্তিশালী।"

জুলিয়াস বলল, "তবু এটা তো ঠিক যে সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণকে তোমরা চেপে রাখতে পার না। যেমন ধর, যে সুন্দরী মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে তুমি আঙুর বিক্রি করেছ সে নিশ্চয় তোমার মনের কামনাকে জাগিয়ে তোলে—তা তুমি যতই তাকে পোশাকের আড়ালে ঢেকে রাখ না কেন।"

পম্‌ফিলিয়াস লজ্জা পেয়ে বলল, "আমি এখনও তা বুঝতে পারি নি। ওর রূপের কথা আমি ভাবিই নি। তুমিই প্রথম সে কথা আমাকে শোনালে। আমার কাছে সে তো বোনের মত। আজও আমি বিয়ে করি নি, যদিও হয় তো কালই বিয়ে করব।"

"সেটা কে ঠিক করবে?"

"ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

"সে ইচ্ছাটা তুমি জানবে কেমন করে?"

"জানতে না চাইলে তুমি তা কোন দিনই জানতে পারবে না; আবার যদি সর্বদাই জানতে চাও তাহলে খুব স্পষ্ট করেই জানতে পারবে।"

জুলিয়াস বলল, "এটা খুব ধোঁয়াটে কথা। আমি বলতে চাই, তুমি কখন বিয়ে করবে, কাকে বিয়ে করবে—সেটা কে বলে দেবে? আমার বিয়ের সময় আমাকে বলা হয়েছিল তিনটি মেয়ের ভিতর থেকে একজনকে বেছে নিতে হবে। আমি ইউলাম্পিয়াকে বেছে নিয়েছিলাম কারণ অন্য দুজনের তুলনায় সে ছিল অধিকতর সুন্দরী ও আকর্ষণীয়া। তোমার পছন্দটা ঠিক হবে কি ভাবে?"

পম্‌ফিলিয়াস বলল, "দেখ, খৃস্টানদের চোখে সকলেই দৈহিক ও মানসিক গুণের বিচারে সমান; কাজেই জগতের যে কেউই একজন খৃস্টানের স্বামী বা স্ত্রী হতে পারে।"

দুজনের সমাজ-জীবন ভিন্ন। তাদের বিবাহের রীতি-নীতি ভিন্ন, উদ্দেশ্যও ভিন্ন। তাই নিয়ে দুজনের মধ্যে দীর্ঘ দার্শনিক আলোচনা চলতে লাগল।

৫

অনেকক্ষণ দু'জন চুপচাপ।

একসময় জুলিয়াস শুধাল, "তুমি কি সুখী ?"

পম্‌ফিলিয়াস হেসে বলল, "এর চাইতে বেশী কিছু আমি চাই না। তার চাইতেও বড় কথা, আমি যে এত ভয়ংকর রকমের সুখী সেটা অনেক সময় আমার কাছে অন্যায় বলে মনে হয়।"

জুলিয়াস বলল, "দেখছি পথের মাঝে সেই অপরিচিত লোকটির সঙ্গে দেখা না হয়ে তোমার কাছে গেলেই আমি বেশী সুখী হতে পারতাম।"

"তাই যদি মনে কর তাহলে যাচ্ছ না কেন ?"

"আমার স্ত্রীর কি হবে ?"

"তুমি তো বলছ খৃস্টধর্মের প্রতি তার টান আছে—তাহলে সেও তোমার সঙ্গে আসতে পারে।"

"তা ঠিক, কিন্তু আমরা তো একটা ভিন্ন ধরনের জীবন শুরু করে দিয়েছি। সেটাকে ভাঙি কেমন করে ? একবার যখন শুরু করেছি সেভাবেই তো শেষ করতে হবে।"

সেই সময় পম্‌ফিলিয়াসের সঙ্গী মেয়েটি একটি যুবককে সঙ্গে নিয়ে দরজায় দেখা দিল। পম্‌ফিলিয়াস বেরিয়ে গেল। জুলিয়াসের সামনেই যুবকটি জানাল সাইরিল তাকে পাঠিয়েছে কিছু চামড়া কিনতে। আঙুর বিক্রি শেষ হয়ে গেছে; কিছুটা গমও কেনা হয়েছে। পম্‌ফিলিয়াস বলল, গম নিয়ে ম্যাগ্‌দালেন যুবকটির সঙ্গে বাড়ি চলে যাক; সে নিজে চামড়াটা কিনে বাড়ি যাবে।

"না, ম্যাগ্‌দালেন তোমার সঙ্গেই যাবে," বলে যুবকটি চলে গেল।

পম্‌ফিলিয়াসকে সঙ্গে নিয়ে জুলিয়াস একটি পরিচিত ব্যবসায়ীর কাছে গেল। পম্‌ফিলিয়াস থলেতে গম ভর্তি করে সামান্য কিছু ম্যাগ্‌দালেনের হাত দিয়ে ভারী বোঝাটা নিজে নিল, এবং জুলিয়াসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মেয়েটির সঙ্গে শহর থেকে চলে গেল। রাস্তার মোড়ে একবার ফিরে তাকাল; জুলিয়াসের দিকে মাথা নেড়ে একটু হাসল। তারপর অধিকতর খুশির হাসি হেসে ম্যাগ্‌দালেনকে কি যেন বলল; তারপর চোখের আড়াল হয়ে গেল।

জুলিয়াস ভাবল, "সত্যি, তখন ওদের কাছে গেলেই ভাল হত।" কল্পনায় দুটো ছবি পর পর তার চোখের সামনে ভেসে উঠল: ঝুড়ি মাথায় নিয়ে পম্‌ফিলিয়াস ও মেয়েটির যুগলযাত্রা, এবং বাড়িতে অপেক্ষমানা ব্রেসলেট ও দামী সাজে সজ্জিতা তার মোটাসোটা ক্লান্তিকর স্ত্রী।

কিন্তু সেসব ভাববার সময় তার ছিল না। আরও কয়েকজন ব্যবসায়ী সঙ্গী এসে জুটল; নিজেদের কাজকর্ম সেরে খানাপিনার শেষে তারা মেয়েদের নিয়ে রাত কাটাল।

৬

দশ বছর পার হয়ে গেল। পম্‌ফিলিয়াসের সঙ্গে জুলিয়াসের আর দেখা হয় নি; কাজের চাপে সেদিনের সাক্ষাতের কথাও ভুলে গেছে; খৃস্টান জীবনের টানটাও কেটে গেছে।

জুলিয়াসের জীবন যথারীতিই চলেছে। এই দশ বছরে তার বাবা মারা গেছে; পুরো ব্যবসাটাই তার হাতে এসেছে; কাজের জটিলতা অনেক বেড়েছে। অনেক নতুন কাজের চাপ এসে পড়েছে। একটা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদে সে নির্বাচিত হয়েছে; তাতে তার মর্যাদা বেড়েছে; অহংবোধও বেড়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও এখন তাকে অনেক জনসেবার কাজ করতে হয়। দক্ষ কর্মী এবং সুবক্তা হওয়ার ফলে অচিরেই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল, উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। পারিবারিক জীবনেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তার তিনটি ছেলে হয়েছে; ফলে স্ত্রী তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তার সৌন্দর্যে যেমন ভাঁটা পড়েছে, তেমনি স্বামীর প্রতি টানটাও কমে গেছে; সে এখন ছেলেদের নিয়েই সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকে।

ব্যবসা ও জনসেবার কাজে ব্যস্ত থাকায় আগেকার উচ্ছৃংখল জীবন সে ছেড়ে দিয়েছে; তবু সারাদিন খাটুনির পরে একটু হাল্‌কা আমোদ-ফূর্তির দরকার সে বোধ করে। অথচ স্ত্রীর কাছে সেটা পায় না। ছেলেমেয়ের দেখাশুনা ছাড়াও স্ত্রী এখন তার খৃস্টান ক্রীতদাসীর সঙ্গে নবধর্মের আলোচনা নিয়ে দিন কাটায়। ফলে স্ত্রীকে কাছে না পেয়ে সে হাল্‌কা চরিত্রের মেয়েমানুষের সঙ্গেই বাড়তি সময়টুকু কাটায়।

তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় এই কয় বছরে সে সুখী হয়েছে না অসুখী তার কোন জবাব সে দিতে পারবে না।

এখন সে এত ব্যস্ত। একটা ব্যাপার বা সুখ ছেড়ে সে আর একটা ব্যাপার বা সুখকে আঁকড়ে ধরে, কিন্তু কোনটাতেই পরিপূর্ণ তৃপ্তি পায় না, বা তাকে ধরে থাকতে চায় না।

এইভাবেই জীবন চলছিল; এমন সময় এমন একটা কিছু ঘটল যাতে তার গোটা জীবনটাই বদলে যাবার উপক্রম হল। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দৌড়ে সে অংশ নিল। রথ চালিয়ে সফলতার পৌঁছবার

মুখে আর একটা রথের সঙ্গে ধাক্কা লাগল। রথের চাকা ভেঙে ছিটকে বাইরে গিয়ে তার একটা হাত ভাঙল, দুটো পাঁজর ভাঙল। আঘাত গুরুতর হলেও জীবনহানির কোন আশংকা ছিল না। বাড়িতে নিয়ে তাকে তিনমাস শয্যাশায়ী করে রাখা হল।

এই তিনমাসের দৈহিক যন্ত্রণার মধ্যে তার মনটা সক্রিয় হয়ে উঠল; সেই অবসরে নিজের জীবনকে নিয়ে সে এমনভাবে ভাববার অবসর পেল যেন সেটা অন্য কারও জীবন। আর সে জীবন বিষণ্ণতার ছায়ায় ঢাকা; তার কারণ এই ক'বছরে তিনটে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে।

প্রথমত, তার বাবার আমলের এক বিশ্বাসী ক্রীতদাস কিছু মূল্যবান হীরে-জহরত নিয়ে পালিয়েছে; তাতে তার প্রভূত ক্ষতি হয়েছে, আর ব্যবসাতেও নানা অসুবিধা দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, রক্ষিতাটি তাকে ত্যাগ করে অন্য এক বাবুর কাছে চলে গেছে।

তৃতীয়ত, অসুখের সময় নির্বাচন হওয়ায় তার প্রাপ্য উচ্চ পদটা প্রতিপক্ষ পেয়ে গেছে।

জুলিয়াসের ধারণা, তার রথের চাকাটা আঙুলের মাথার মত একটুখানি বেঁকে যাওয়াতেই তার জীবনে এতগুলি দুর্ঘটনা পরপর ঘটে গেল। কোচে শুয়ে এইসব কথাই সে ভাবতে লাগল। অসুখের সময় থেকে স্ত্রী প্রায়ই তার কাছে আসে; দুজনের অনেক কথা হয়; স্ত্রী বিশেষ করে খৃস্টধর্ম সম্পর্কে সেইসব কথা তাকে বলেছে যা সে শিখেছে ক্রীতদাসীটির কাছে।

ক্রীতদাসটি একসময় পম্‌ফিলিয়াসের সমাজেই ছিল। তাকে বেশ ভাল চেনে। জুলিয়াস তাকে একবার দেখতে চাইল। সে এলে পম্‌ফিলিয়াস সম্পর্কে অনেক কথাই সে তাকে জিজ্ঞাসা করল।

ক্রীতদাসী বলল, পম্‌ফিলিয়াস সেখানকার শ্রেষ্ঠ ভাইদের অন্যতম; সকলেই তাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে। সেই ম্যাগদালেনকেই সে বিয়ে করেছে; তাদের কয়েকটি ছেলেমেয়েও হয়েছে।

ক্রীতদাসী চলে গেলে জুলিয়াস নিজের জীবনের সঙ্গে পম্‌ফিলিয়াসের জীবনের তুলনা করতে বসল। তাতে তার মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। তাই বিষয়ান্তরে মন দেবার জন্য তার স্ত্রীর ফেলে যাওয়া একটা গ্রীক পাণ্ডুলিপি তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল। [আসলে পাণ্ডুলিপিটি ১৮৭৫ সালে কন্‌স্তান্তিনোপ্‌লে আবিষ্কৃত "দ্বাদশ শিষ্যের বাণী"র একটি অনুলিপি মাত্র।]

সবটা পড়ে জুলিয়াস খুবই অভিভূত হল; তার প্রতিটি বক্তব্যের সঙ্গে একমত হল। তার মনে হল, সারাটা জীবন সে ভুলই করেছে—ভয়ঙ্কর ভুল। আপন মনেই বলল, "জীবনটাকে নষ্ট করতে আমি চাই না। আমি

বাঁচতে চাই, বাঁচার পথে চলতে চাই।"

পম্‌ফিলিয়াস যেসব কথা বলেছিল সে সবই তার মনে পড়ল। মনে পড়ল অপরিচিত লোকটি তাকে বলেছিল, "জীবনের অভিজ্ঞতা হলে তখন সেখানে যেও।"

"এখন তো জীবনের অনেক অভিজ্ঞতাই আমার হয়েছে অথচ কিছুই তো পাই নি।"

আরও মনে পড়ল, পম্‌ফিলিয়াস বলেছিল: যখনই সে খৃস্টানদের কাছে যাবে তখনই তারা তাকে সাদরে গ্রহণ করবে।

জুলিয়াস নিজের মনে বলল, "না, যথেষ্ট ভুল করেছি, যথেষ্ট কষ্টও পেয়েছি। সবকিছু ছেড়ে এবার তাদের কাছে চলে যাব; এখানে যা লেখা আছে সেইভাবে জীবন কাটাব।"

স্ত্রীকে সেকথা বলায় সে খুব খুশি হল। স্ত্রী তো সব কিছুর জন্য তৈরি। সমস্যা দেখা দিল ছেলেমেয়েদের নিয়ে। তাদের সঙ্গে যাবে, না ঠাকুরমার কাছে রেখে যাবে? তাদের সঙ্গে নেবেই বা কেমন করে? এত আয়েসে-আরামে মানুষ হয়ে এখন কি তারা সেখানকার দুঃখ-কষ্ট সইতে পারবে? ক্রীতদাসী মেয়েটিও তাদের সঙ্গে যেতে চাইল। মায়ের প্রস্তাব মত শেষ পর্যন্ত স্থির হল, ছেলেমেয়েরা তাদের ঠাকুরমার কাছেই থাকবে।

সবই স্থির হল। কেবল জুলিয়াসের অসুখের জন্যই যা দেরী।

৭

মনের সেই অবস্থায়ই জুলিয়াস ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে তাকে বলা হল, শহরে একজন সুদক্ষ চিকিৎসক এসেছে; সে তাকে দ্রুত নিরাময় করে তুলতে পারবে বলে তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। জুলিয়াস সম্মত হল। দেখা গেল চিকিৎসক আর কেউ নয় সেই অপরিচিত লোক খৃস্টানদের কাছে যাবার পথে যার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। ক্ষতস্থানগুলি পরীক্ষা করে সে কিছু জড়িবুটি ব্যবহারের বিধান দিল।

"আমি কি নিজের হাতে কাজ করতে পারব?" জুলিয়াস শুধাল।

"নিশ্চয়! তুমি লিখতে পারবে, রথ চালাতে পারবে।"

"আর কঠোর শ্রমের কাজ—মাটি কোপানো?"

"সে কথা আমার মনেই আসে নি, কারণ তোমার মত মর্যাদার লোকের পক্ষে সে রকম কাজ করার কোন প্রয়োজনই হতে পারে না।"

"পরন্তু সেটাই আমি চাই," এই কথা বলে জুলিয়াস জানাল, তার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই সে তার পরামর্শ মেনে চলেছে, জীবনের অভিজ্ঞতা

অর্জন করেছে; কিন্তু যা আশা করেছিল জীবন তাকে তা দেয় নি, বরং তার মোহমুক্তি ঘটিয়েছে; তাই এবার সে তার আগেকার ইচ্ছাই পূর্ণ করবে।

"দেখতে পাচ্ছি প্রতারণার দ্বারা তারা তোমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে; তাই এত বড় পদমর্যাদা ও গুরু দায়িত্ব সত্ত্বেও তুমি এখনও তাদের ভুল ধরতে পারছ না।"

যে পাণ্ডুলিপিটা সে পড়ছিল সেটা লোকটির হাতে দিয়ে জুলিয়াস বলল, "এটা পড়ে দেখ।"

চিকিৎসক পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে ভাল করে দেখল।

বলল, "এ সব আমার জানা। এই প্রতারণাও আমার জানা। আমি অবাক হচ্ছি যে তোমার মত মানুষও এই জালে ধরা পড়েছে।"

"তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। এর মধ্যে জাল কোথায় দেখতে পেলে?"

"এ সব তো জীবনের কষ্টি-পাথরে যাচাই করা হয়েছে। এই সব কূটতার্কিক এবং মানুষ ও ঈশ্বরবিরোধীরা এমন এক জীবনের কথা বলে যেখানে সব মানুষ সুখী হবে, যেখানে থাকবে না যুদ্ধ, থাকবে না মৃত্যুদণ্ড, থাকবে না দারিদ্র্য, নীচতা, সংগ্রাম ও ক্রোধ। তারা বারে বারে বলছে, সব মানুষ যেদিন খৃস্টের বিধান পূর্ণ করবে—ঝগড়া করবে না, লালসার বশবর্তী হবে না, শপথ নেবে না, হিংসা করবে না, অন্য জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলবে না—সেই দিনই এই পরিবেশ দেখা দেবে। কিন্তু পথকেই লক্ষ্য বলে ধরে নিয়ে তারা নিজেদের ঠকাচ্ছে, অন্যকেও ঠকাচ্ছে।

"কিন্তু তারা যা বলছে তা যেন ধনুর্বিদ্যার সেই শিক্ষকের কথার মতই শোনাচ্ছে যে বলে: 'তোমার তীর যখন একটি সরল রেখার লক্ষ্যে পৌছবে তখনই তুমি লক্ষ্যভেদ করবে।' আসল সমস্যাই তো তীরটাকে সরল রেখায় ছুঁড়তে পারা যায় কেমন করে। কেমন কি না?"

"হ্যাঁ, সে কথা ঠিক," জুলিয়াস বলল; তার মন হেলতে শুরু করেছে।

চিকিৎসক বলতে লাগল, "দেখ বন্ধু, তোমাকে মানুষ হতে হবে, তোমার সন্তানদের মানুষ করে তুলতে হবে। কর্তব্যে সচেতন হয়ে চল, দেখবে সব সন্দেহ আপনা থেকে দূর হয়ে যাবে। অসুস্থতার জন্যই এইসব সন্দেহ তোমাকে পেয়ে বসেছিল। রাষ্ট্রের সেবা করে কর্তব্য পালন কর, সন্তানদের প্রস্তুত কর রাষ্ট্রের সেবার জন্য। তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখাও যাতে তারা তোমার জায়গা নিতে পারে, তারপর তুমি শান্তির ভিতর দিয়ে সেই জীবনের পথে চলে যেয়ো যে জীবন তোমাকে টানবে। তার আগে সে পথে যাবার কোন অধিকার তোমার নেই; তবু যদি তুমি সে পথে পা বাড়াও তাহলে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই পাবে না।"

৮

জড়িটির ফলেই হোক আর বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শেই হোক, জুলিয়াস দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠল। খৃস্টীয় জীবন যাপনের পরিকল্পনা এখন তার কাছে প্রলাপ বলে মনে হতে লাগল।

কয়েকটা দিন কাটিয়ে চিকিৎসক শহর থেকে চলে গেল। তারপরেই জুলিয়াস রোগশয্যা ছেড়ে উঠে নতুনভাবে জীবন শুরু করে দিল। ছেলে-মেয়েদের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করল, নিজেও তাদের লেখাপড়ার তদারকি করতে লাগল। নিজের বাড়তি সময়টা জনসেবার কাজে নিয়োগ করে অচিরেই শহরে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করল।

এই ভাবে এক বছর কেটে গেল। খৃস্টানদের কথা জুলিয়াস একবার ভাবেও না। কিন্তু এক বছর পরে রোমক সম্রাটের একজন প্রতিনিধি সাইলিসিয়াতে এল খৃস্টীয় আন্দোলন দমন করতে। সেজন্য যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হল সে খবর জেনেও জুলিয়াস তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাল না। একদিন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটি দীনবেশ প্রবীণ লোকের সঙ্গে তার দেখা হল। সে পম্ফিলিয়াস। একটি শিশুর হাত ধরে এগিয়ে এসে লোকটিকে বলল, "অভিবাদন বন্ধু! তোমার কাছে একটি বড় রকমের উপকার চাইতে এসেছি। এখন তো খৃস্টানদের উপর নির্যাতন চলেছে, জানিনা এখন তুমি আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করবে কি না, বা আমার সঙ্গে মেলামেশা করে পদমর্যাদা হারাবার ভয় করবে কি না।"

জুলিয়াস জবাব দিল, "আমি কাউকে ভয় করি না, আর তার প্রমাণ স্বরূপ তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব। তোমার সঙ্গে প্রকাশ্যে কথা বললে, তোমাকে সাহায্য করলে যদি আমার ব্যবসার ক্ষতি হয় তাও করব। এস আমার সঙ্গে। ছেলেটি কার?"

"আমার ছেলে।"

"জিজ্ঞাসা না করলেও হত। চোখ-মুখ দেখেই চিনতে পেরেছি। তোমার স্ত্রীটি যে কে তাও বুঝতে পেরেছি।"

পম্ফিলিয়াস বলল, "তুমি ঠিকই ধরেছ। তোমার সঙ্গে দেখা হবার পরেই আমাদের বিয়ে হয়েছিল।"

বাড়িতে পৌঁছে স্ত্রীকে ডেকে ছেলেটিকে তার হাতে তুলে দিয়ে জুলিয়াস বন্ধুকে নিয়ে তার বিলাসবহুল নিজস্ব ঘরটাতে ঢুকল।

বলল, "এখানে তুমি সব কথা খোলাখুলি বলতে পার। কেউ শুনতে পাবে না।"

পম্‌ফিলিয়াস বলল, "কারও শোনার ভয় আমি করি না। যে সব খৃস্টানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের বিচার হোক, শাস্তি হোক; তা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। আমার অনুরোধ তারা যেন প্রকাশ্যে তাদের ধর্মমত প্রকাশের সুযোগ পায়।"

পম্‌ফিলিয়াসের এই অনুরোধে জুলিয়াস বিস্মিত হল, তবু তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল। বলল, "তোমাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলাম বন্ধুত্বের খাতিরে, সহানুভূতির প্রেরণায়, কিন্তু এ কথা বলতে আমি বাধ্য হলাম যে তোমাদের সব শিক্ষাই অর্থহীন ও ক্ষতিকর।"

"কিন্তু কেন?"

"একটি সরকারের অধীনে বাস করে তোমরা প্রচার কর সেই সরকারের ধ্বংসসাধন। কিন্তু তোমাদের অস্তিত্বই যে সেই সরকারের উপর নির্ভরশীল। সরকার না থাকলে তোমরাও থাকতে না—সকলেই সিদীয়দের অথবা বর্বরদের ক্রীতদাসে পরিণত হতে।"

তারপর দুই বন্ধুর মধ্যে খৃস্টধর্মের গতি-প্রকৃতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হল। এক সময় জুলিয়াস বলল, "সবই বুঝলাম; কিন্তু বল তো তোমাদের মধ্যে ক'জন এমন লোক আছে যারা একান্তভাবে আন্তরিক? তোমাদের বিরুদ্ধে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায় যে তোমরা শহীদ হবার ভান কর, সত্যের জন্য সানন্দে প্রাণ দেবার ভান কর, কিন্তু তোমাদের মধ্যে সত্যই নেই। তোমরা গর্বোদ্ধত উন্মাদ, সমাজ-জীবনের ভিত্তিকেই ধ্বংস করে চলেছ।"

পম্‌ফিলিয়াস কোন জবাব দিল না; সকরুণ দৃষ্টিতে জুলিয়াসের দিকে তাকাল।

ঠিক সেই সময় পম্‌ফিলিয়াসের ছোট্ট ছেলেটি ছুটে এসে বাবার গা ঘেঁসে দাঁড়াল।

জুলিয়াসের স্ত্রী খুব আদর-যত্ন করলেও সে বাবাকে দেখতে ছুটে এসেছে। পম্‌ফিলিয়াস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ছেলেকে আদর করে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াতে জুলিয়াস তাকে বাধা দিয়ে ডিনার খেতে বলল; এ বিষয় নিয়ে আরও আলোচনা করার ইচ্ছাও প্রকাশ করল।

তারপর বলল, "তুমি বিয়ে করেছ, সন্তান হয়েছে দেখে আমি তো অবাক হয়ে গেছি। আমি তো বুঝতেই পারি না কোন রকম বিষয়-সম্পত্তি না থাকলেও তোমরা খৃস্টানরা পরিবারকে প্রতিপালন কর কি ভাবে। সন্তানদের কোন ভবিষ্যতের ব্যবস্থা নেই জেনেও মায়েরা শান্তিতে দিন কাটায় কেমন করে?"

কিন্তু কেন বলছ যে আমার সন্তানদের জন্য ভবিষ্যতের কোন ব্যবস্থা নেই?"

"কারণ তোমার ক্রীতদাস নেই, সম্পত্তি নেই। আমার বিজ্ঞ চিকিৎসক বলেছে, যে খৃস্টীয় জীবন তোমরা যাপন কর সেটা সঠিক হতে পারে,

যার কোন পরিবার নেই তার পক্ষে সম্ভবও হতে পারে, কিন্তু যাদের পরিবার আছে, যে মায়েদের সন্তান আছে তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ; কারণ তোমাদের মতে চললে জীবনের—মানবজাতির অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই তোমার সঙ্গে ছেলেকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।"

"শুধু একটি ছেলে নয়—কোলে আরও একটি আছে, আর আছে একটি তিন বছরের মেয়ে।"

"কিন্তু সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না। বেশী দিনের কথা নয়, সব কিছু ছেড়ে আমিও তোমাদের একজন হবার জন্য তৈরি হয়েছিলাম। কিন্তু আমার তো সন্তান ছিল, আর আমি পরিষ্কার বুঝেছিলাম যে তোমাদের জীবন আমার পক্ষে যত ভালই হোক, তার জন্য সন্তানদের ত্যাগ করার কোন অধিকার আমার নেই। সেই কারণেই আমি এখানেই থেকে গেলাম, যাতে আমি যে ভাবে বড় হয়েছি আমার সন্তানরাও সেইভাবে বড় হয়ে উঠতে পারে।"

পম্‌ফিলিয়াস বলল, "জীবন সম্পর্কে আমাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কত পার্থক্য! আমরা বলি, বয়স্করা যদি প্রচলিত জীবনের পথে চলে তাদের তবু ক্ষমা করা যায় কারণ তারা তো নষ্ট হয়েই গেছে, কিন্তু ছোটদের ক্ষেত্রে সেটা তো ভয়ংকর। তাদের জাগতিক ব্যবস্থায় মানুষ করে লোভের পথে ঠেলে দেওয়ার কথা কি ভাবা যায়! কি জান, আমরা তো বেঁচে থাকার প্রেরণা পাই সেই শিশুদের কাছ থেকে যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'তোমরা যদি ছোট শিশুর মত না হতে পার তাহলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতেই পারবে না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জুলিয়াস বলল, "হয় তো তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু আমার ছেলেরা লেখাপড়া শিখছে, ভাল শিক্ষক পেয়েছে, তারাও আমাদের মতই ভালভাবে সব কিছু শিখুক। তাতে তো কোন ক্ষতি নেই। হাতে তো অনেক সময় আছে। বড় হয়ে দরকার মনে করলে তারাও তোমাদের কাছে যেতে পারবে ; আর তাদের যার যার পায়ে দাঁড় করিয়ে যখন মুক্তি পাব তখন আমিও তোমার কাছে চলে যেতে পারব।"

পম্‌ফিলিয়াস বলল, "সত্যকে জান, সত্যই তোমাকে মুক্তি দেবে। খৃস্ট দেন পরিপূর্ণ মুক্তি—একেবারেই ; জাগতিক শিক্ষা কখনও তা দিতে পারে না। বিদায়!" ছেলেকে ডেকে নিয়ে পম্‌ফিলিয়াস চলে গেল।

খৃস্টানদের প্রাণদণ্ড হল ; প্রকাশ্যে তা কার্যকর হল। জুলিয়াস দেখল, অন্য খৃস্টানদের সঙ্গে পম্‌ফিলিয়াসও শহীদদের মৃতদেহগুলি সরিয়ে নিল।

সে বন্ধুকে দেখল, কিন্তু কর্তৃপক্ষের ভয়ে তার কাছে গেল না, বা তাকে বাড়িতে আমন্ত্রণ করল না।

আরও বিশ বছর কেটে গেল। জুলিয়াসের স্ত্রী মারা গেল। জনসেবার কাজের স্রোতে ভেসে চলল তার জীবন। তার অর্থবল ক্রমাগতই বেড়ে চলল।

ছেলেরা বড় হল; দ্বিতীয়টি উচ্ছৃংখল জীবনের পথ ধরল। যে বালতিতে ছিল তার বাবার সম্পদ তাতে সে অনেক ফুঁটো করে দিল; আর যে পরিমাণে বাবার সম্পদ বাড়তে লাগল তার চাইতে দ্রুততর গতিতে তা বেরিয়ে যেতে লাগল সেই সব ফুঁটো দিয়ে। আর সেখানেই শুরু হল বাপ-বেটার সংঘর্ষ, ঠিক যেমনটি হয়েছিল তার সঙ্গে তার বাবার। দেখা দিল ক্রোধ, বিদ্বেষ ও ঈর্ষা।

সেই সময় নতুন কতোয়াল নিযুক্ত হয়ে জুলিয়াসকে সব রকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করল। পূর্বতন তোষামোদকারীরা তাকে ত্যাগ করল; তার সামনে দেখা দিল নির্বাসনের বিপদ। সে রোমে গেল ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে, কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরে এল।

বাড়িতে এসে দেখল, ছেলে খারাপ সঙ্গীদের নিয়ে ফূর্তিতে ডুবে আছে। সাইলিসিয়াতে গুজব রটে গেছে যে জুলিয়াস মারা গেছে, তাই ছেলে বাবার মৃত্যু পালন করছে। আত্মহারা হয়ে জুলিয়াস ছেলেকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল; তারপর স্ত্রীর ঘরে গিয়ে পেল, "সুভাষিতাবলী"র একটা বই। পড়তে লাগল:

"যারা পরিশ্রম করছ, ভারী বোঝা বহন করছ, তারা আমার কাছে এস, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। আমার জোয়াল কাঁধে তুলে নাও, আমাকে জান; কারণ আমি বিনম্র ও অবনত; তবেই তোমরা পাবে অন্তরের শান্তি। কারণ আমার জোয়াল সহজ, আর আমার বোঝা হাল্কা।"

জুলিয়াস ভাবল, "ঠিক, অনেক দিন ধরে সে আমাকে ডাকছে। আমি তাকে বিশ্বাস করি নি, তাই তো আমার জোয়াল আজ এত ভারী, আমার বোঝা এত কষ্টকর।"

বইখানা হাঁটুর উপর রেখে সে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগল অতীত জীবনের কথা—বিভিন্ন সময়ে পম্‌ফিলিয়াস তাকে যা কিছু বলেছে সব মনে পড়ল। অবশেষে উঠে ছেলের কাছে গেল। ছেলের কোন রকম আঘাত লাগে নি দেখে খুব খুশি হল।

ছেলেকে একটি কথাও না বলে জুলিয়াস পথে নেমে খৃস্টান উপনিবেশের দিকে যাত্রা করল। সারা দিন হেঁটে সন্ধ্যায় এক গ্রামবাসীর বাড়িতে পৌঁছল রাতের আশ্রয়ের জন্য। ঘরে ঢুকে একটি লোককে দেখতে পেল। পায়ের শব্দ শুনে সে উঠে দাঁড়াল। লোকটি তার পূর্ব-পরিচিত চিকিৎসক।

জুলিয়াস বলে উঠল, "না, এবার তুমি আমাকে ফেরাতে পারবে না। এই তৃতীয়বার সেখানে যাবার জন্য যাত্রা করেছি। আমি জানি একমাত্র সেখানেই পাব মনের শান্তি।"

"কোথায়?" চিকিৎসক শুধাল।

"খৃস্টানদের মাঝে।"

"হ্যাঁ, মনের শান্তি হয় তো পাবে, কিন্তু অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তোমার কর্তব্য। পৌরুষের অভাব ঘটেছে তোমার; দুর্ভাগ্য বিচূর্ণিত করেছে তোমার মনকে। সত্যিকারের দার্শনিকরা এ রকম ব্যবহার করে না। দুর্ভাগ্যের আগুনেই হয় সোনার পরীক্ষা। একটা পরীক্ষা তুমি পার হয়ে এসেছ। আর প্রয়োজনের মুহূর্তে এখন তুমি পালিয়ে এসেছ। মানুষকে ও নিজেকে পরীক্ষা করার এই তো সময়। প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করেছ, এবার তাকে তোমার দেশের কল্যাণে কাজে লাগাও। যারা মানুষকে চিনতে শিখেছে, চিনেছে মানুষের কামনা-বাসনা ও জীবনের পরিবেশকে, তারা সকলেই যদি তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত না করে নিজ নিজ মনের শান্তি খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে সাধারণ মানুষের কি হবে? মানুষের মধ্যে থেকেই তুমি জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছ, কাজেই তাদের কল্যাণে তাকে কাজে লাগানোই তোমার কর্তব্য।"

"কিন্তু আমার তো কোন জ্ঞান নেই। আমি তো ভুলের পাঁকে ডুবে আছি। জল যেমন বাসি ও পচা হলেই মদ হয় না, তেমনি প্রাচীন বলেই তো আমার ভুলগুলি জ্ঞান হয়ে উঠবে না।"

জোব্বাটা তুলে জুলিয়াস তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল। আরও একটা দিনের শেষে খৃস্টান বস্তিতে পৌঁছে গেল।

সে পম্‌ফিলিয়াসের বন্ধু তা না জেনেই সকলে তাকে সানন্দে গ্রহণ করল। খাবার ঘরে বন্ধুকে দেখেই পম্‌ফিলিয়াস ছুটে এসে তাকে আলিঙ্গন করল।

জুলিয়াস বলল, "শেষ পর্যন্ত চলেই এলাম। এবার বল কি করতে হবে; আমি তোমার কথামতই চলব।

"ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। আমার সঙ্গে এস।" জুলিয়াসকে অতিথিশালায় নিয়ে গিয়ে একটা বিছানা দেখিয়ে বলল:

"কিছুদিন আমাদের জীবনযাত্রা দেখলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে কি করলে তুমি লোকের কাজে লাগতে পারবে। কিন্তু আপাতত সময় কাটাবার জন্য আগামীকাল আমি তোমাকে কিছু কাজ দেখিয়ে দেব। দ্রাক্ষাক্ষেতে এখন আঙুর তোলা হচ্ছে। সেখানে গিয়ে তাদের কাজে সাহায্য করগে। কি করতে পার সেটা নিজেই বুঝে নেবে।"

জুলিয়াস পরদিন আঙুরের ক্ষেতে গেল। প্রথম ক্ষেতে ছোট ছোট লতায় থোকা থোকা আঙুর ঝুলছে। যুবক-যুবতীরা ফল পেড়ে একত্র করছে। সেখানে সব

জায়গা ভর্তি দেখে জুলিয়াস আরও এগিয়ে গেল। দেখতে পেল একটা পুরনো আঙুরের ক্ষেত; সেখানে ফল অনেক কম; কিন্তু সেখানেও কোন জায়গা নেই। আরও বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পেল একটা অনেক পুরনো বাতিল ক্ষেত; আঙুরের ডাঁটাগুলো শুকিয়ে বাঁকা হয়ে গেছে; একটা আঙুরও চোখে পড়ছে না।

সে নিজের মনে ভাবতে লাগল, "ঐ যে, ওটা আমার জীবনের মত। যদি প্রথমবার আসতাম, তাহলে জীবনটা হত প্রথম ক্ষেতের মত ফলে ভর্তি। দ্বিতীয়বার যদি আসতাম তাহলে জীবনটা হত দ্বিতীয় ক্ষেতের ফলের মত। আর এখন এই তো আমার জীবন—এইসব অকেজো বুড়ো আঙুর গাছের মত, কেবলমাত্র জ্বালানি হবার যোগ্য।" ভাবতে ভাবতে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় তার মনটা ভারী হয়ে উঠল। চেঁচিয়ে বলল:

"এখন আর আমি কোন কাজে লাগব না, কিছুই করতে পারব না।" সেখানেই বসে পড়ে সে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ শুনতে পেল একটি বৃদ্ধ তাকে ডাকছে:

"এস ভাই, কাজ কর!"

চারদিকে তাকিয়ে জুলিয়াস দেখতে পেল, বয়সের ভারে ন্যুব্জদেহ, পাকা-চুল একটি বৃদ্ধ; হাঁটতেও বুঝি তার কষ্ট হয়। এখানে-ওখানে দু'একটি মিষ্টি আঙুরের থোকা যা এখনও আছে সেগুলিই কুড়চ্ছে। জুলিয়াস তার কাছে এগিয়ে গেল।

"কাজ কর দাদাভাই! কাজেই তো আনন্দ!" বৃদ্ধ তাকে আঙুরের কয়েকটা থোকা দেখিয়ে দিল। জুলিয়াস সেগুলো তুলে এনে বুড়োর ঝুড়িতে ভরে দিল। বুড়ো তাকে বলল:

"চেয়ে দেখ, অন্য আঙুরের ক্ষেতে ওরা যা কুড়চ্ছে তার চাইতে এই থোকাগুলো কিসে খারাপ? আমাদের গুরু বলেন: 'আলো থাকতে হাঁটো! যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর বাণীই হচ্ছে—যে তাঁর পুত্রকে দেখতে পায়, তার উপর বিশ্বাস রাখে, সেই হবে অনন্ত জীবনের অধিকারী: শেষ দিন আমি তাকে তুলে নেব। কারণ ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে এ জগতে পাঠিয়েছেন জগৎকে শাস্তি দিতে নয়, তার ভিতর দিয়ে জগৎকে রক্ষা করতে। যেসব মানুষ পাপ করে তারা আলোকে ঘৃণা করে, পাছে তার পাপ কাজ ধরা পড়ে তাই আলোর কাছেই আসে না। কিন্তু যে সত্যকে অনুসরণ করে সে আলোর কাছেই আসে, যাতে তার কাজ প্রকাশ পেতে পারে।" দেখ বাবা, অসুখী হয়ো না! আমরা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র, তাঁর সেবক। সকলে মিলে আমরা একটি বাহিনী। তুমি কি মনে কর যে তুমি ছাড়া আর কোন সেবক নেই, তুমি যদি তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ কর সর্বশক্তি দিয়ে তাহলে তাঁর সব প্রয়োজন—তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যা কিছু

প্রয়োজন সবই তুমি মিটিয়ে দিতে পার? তুমি বল, যা কিছু করেছ তার দ্বিগুণ, দশ গুণ, শত গুণ বেশী তুমি করতে চাও। কিন্তু সব মানুষ মিলে যা করেছে তুমি যদি তার হাজার গুণের হাজার গুণ বেশী কর তাতেই বা ঈশ্বরের কাজের কতটুকু করা হয়? কিছুমাত্র নয়। ঈশ্বরের মতই তাঁর কাজও অসীম। তুমি তো তাঁরই সৃষ্টি। তাঁর কাছে এস, ভৃত্য হয়ে নয়—পুত্র হয়ে, তাহলেই তুমি হবে অসীম ঈশ্বর ও তাঁর বিশ্বের অংশীদার। ঈশ্বরের চোখে ছোট-বড় বলে কিছু নেই, আছে কেবল সোজা ও বাঁকা। জীবনের সোজা পথে পা ফেল, তাহলেই পাবে ঈশ্বরের সঙ্গ, তোমার কাজ হবে ঈশ্বরের কাজ, ছোটও নয় বড়ও নয়। মনে রেখো, স্বর্গে একশ' জন পুণ্যাত্মার চাইতে একটি পাপীর জন্য অধিকতর আনন্দের ব্যবস্থা আছে। জগতের কাজ—যা কিছু তুমি অবহেলাভরে কর নি—তাই তোমাকে দেখিয়েছে তোমার পাপকে, তুমি অনুশোচনা করেছ। আর যখনই অনুশোচনা করেছ তখনই পেয়েছ সোজা পথের সন্ধান। সেই পথ ধরে এগিয়ে যাও, অতীতের কথা ভেবো না, বড়-ছোট বিচার করো না। ঈশ্বরের চোখে সব মানুষ সমান! ঈশ্বর এক, জীবনও এক!"

জুলিয়াস মনে শান্তি পেল। সেদিন থেকেই সে সাধ্যমত ভাইদের জন্য কাজ করে চলল। এইভাবে সে আরও বিশটি বছর আনন্দের সঙ্গে বেঁচে রইল; মৃত্যু যে কখন এসে তার দেহটাকে নিয়ে গেল তা টেরও পেল না।

———

জাল কুপন

The Forged Coupon

প্রথম পর্ব

১

ফিদর মিখাইলভিচ স্মকোভ্‌নিকভ স্থানীয় আয়কর বিভাগের প্রেসিডেণ্ট। নিজের অবিসংবাদী সততার জন্য সে গর্ব বোধ করে—সে বিষণ্ণ উদারনীতিক, স্বাধীন চিন্তার সমর্থক, ধর্মীয় মনোভাবের সব রকম প্রকাশের ঘোর শত্রু। বেশ বিরক্ত হয়ে সে আপিস থেকে বাড়ি ফিরেছে। প্রদেশের শাসনকর্তা তাকে একটা অদ্ভুত অর্থহীন বিবরণ পাঠিয়েছে; তাতে ধরেই নেওয়া হয়েছে যে তার আচরণে সততার অভাব ঘটেছে।

ফিদর মিখাইলভিচের মনটা তিক্ততায় ভরে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গেই একটা কড়া জবাব সে লিখেছে। বাড়ি ফিরে মনে হল, সব কিছুই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলেছে।

পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি; সে আশা করেছিল ডিনার তখনই দেওয়া হবে, কিন্তু তাকে বলা হল ডিনার তৈরী হয় নি। সশব্দে দরজা বন্ধ করে সে পড়ার ঘরে চলে গেল। কে যেন দরজায় টোকা দিল। "আবার কে এল?" ভেবে সে চীৎকার করে বলল, "কে?"

দরজা খুলে ঘরে ঢুকল পনেরো বছরের একটি ছেলে। ফিদর মিখাইলভিচের ছেলে, স্থানীয় স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র।

"তুমি কি চাও?"

"আজ মাসের প্রথম দিন বাবা।"

"আচ্ছা। তুমি টাকা চাইছ?"

ব্যবস্থা করা আছে, হাত-খরচা হিসাবে বাবা ছেলেকে তিন রুবল করে মাসিক ভাতা দেবে। ফিদর মিখাইলভিচ ভুরু কোঁচকাল, পকেট-বইয়ের ভিতর থেকে দুই রুবল পঞ্চাশ কোপেকের একটা কুপন বের করল এবং থলের ভিতর থেকে নগদ পঞ্চাশ কোপেকের রৌপ্যমুদ্রা তার সঙ্গে যোগ করে দিল। ছেলেটি চুপ করে রইল, বাবার দেওয়া টাকাটা নিল না।

"বাবা, দয়া করে আমাকে আরও কিছু আগাম দাও।"

"কি?"

"আমি এটা চাইতাম না, কিন্তু এক বন্ধুর কাছ থেকে সামান্য কিছু টাকা ধার করেছি, আর শোধ করে দেব বলে তাকে কথা দিয়েছি। আমার কাছে আমার সম্মানের দাম অনেক বেশী, তাই আরও তিন রুবল চাইছি। টাকাটা চাইতে আমার ভাল লাগছে না বাবা; তবু দয়া করে আরও তিন রুবল আমাকে দাও।"

"তোমাকে তো বলে দিয়েছি—"

"জানি বাবা, কিন্তু এবারটি দাও।"

"তুমি তিন রুবল ভাতা পাও, আর তাতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তোমার বয়সে আমি পঞ্চাশ কোপেকও পেতাম না।"

"এখন তো আমার সঙ্গীরা অনেক বেশী পায়। পেত্রোভ ও আই-ভানিৎস্কি পায় মাসে পঞ্চাশ রুবল।"

"আর আমি বলছি এ রকম ভাবে চললে তুমি বখে যাবে। মনে থাকে যেন।"

"মনে রাখার কি আছে? আমার অবস্থাটা তুমি কোন দিনই বোঝ না। ঋণ শোধ না করলে আমি অপমানিত হব। তুমি তো কথা বলেই খালাস।"

"বেরিয়ে যাও, বোকা ছেলে! বেরিয়ে যাও!"

ফিদর মিখাইলভিচ আসন থেকে লাফিয়ে উঠে ছেলের দিকে ধেয়ে গেল। চীৎকার করে বলল, "আমি বলছি, বেরিয়ে যাও! তোমাদের মত ছেলেদের আচ্ছা করে ঠেঙানি দেওয়া উচিত!"

ছেলেটি যুগপৎ ভীত ও বিরক্ত হল। ভয় অপেক্ষা বিরক্তিটাই বেশী। মাথা নীচু করে দ্রুত পায়ে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তাকে আঘাত করার ইচ্ছা ফিদর মিখাইলভিচের ছিল না, তবে রাগটা প্রকাশ করতে পারায় সে খুশিই হয়েছে। দরজাটা বন্ধ করা পর্যন্ত সে সমানে চেঁচাতে চেঁচাতে তিরস্কার করে চলল।

দাসী এসে জানাল ডিনার তৈরি। ফিদর মিখাইলভিচ উঠে দাঁড়াল। বলল, "এতক্ষণে! এখন আর আমার ক্ষিধে নেই।"

গোমড়া মুখে সে খাবার ঘরে গেল। খাবার টেবিলে স্ত্রী একটা কথা বললে সে রেগে এমন কাটা-কাটা জবাব দিল যে মহিলাটি আর কোন কথাই বলল না। ছেলেও খাবার পাত্র থেকে মুখ তুলল না, নীরবে খেয়ে গেল। তিনজনই চুপচাপ খাওয়া শেষ করল; টেবিল থেকে উঠে কোন কথা না বলেই যার যার মত চলে গেল।

ডিনারের পরে ছেলে তার ঘরে গেল, পকেট থেকে কুপন ও ভাঙানিটা বের করে টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিল। তারপর ইউনিফর্ম খুলে একটা জ্যাকেট পরে নিল।

তারপর লাতিন ব্যাকরণ পড়তে শুরু করল। কিছুক্ষণ পরে টেবিল থেকে উঠে দরজা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিল, টাকাটা টানায় রেখে দিল, কিছু সিগারেটের কাগজ বের করে একটা পাকিয়ে তার মুখে তুলো ভরে ধূমপান করতে লাগল।

ব্যাকরণ নিয়েই দু'ঘণ্টা কাটিয়ে দিল, কিছু না বুঝেই খানিকটা লিখল, তারপর উঠে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। বাবার গালাগালিগুলি মনে পড়ল। নিজের মনেই বলল, "আমি কি দোষ করেছি তা তো বুঝি না। থিয়েটারে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল তাই পেত্‌য়া গ্রুচেৎস্কির কাছ থেকে টাকা ধার করেছিলাম। তাতেই আমি খারাপ হয়ে গেলাম? অন্য বাবা হলে আমার জন্য তার কষ্ট হত; সব কথা জানতে চাইত, কিন্তু বাবা কেবল গালাগালিই করল। নিজের কথা ছাড়া আর কিছুই সে ভাবতে পারে না। যখন নিজের জন্য কিছু দরকার হয়—তখন আলাদা কথা! তখন তো চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে। আর আমাকে বলে কিনা বখাটে, ঠক? না। বাবা হলেও তাকে আমি ভালবাসি না। কাজটা খারাপ হলেও তাকে আমি ঘৃণা করি।"

দরজায় টোকা পড়ল। চাকর একটা চিঠি দিল—বন্ধুর চিঠি। বলল, "জবাব চেয়েছে।"

চিঠিতে লেখা ছিল: "এই তৃতীয়বার তোমাকে বলছি, যে ছয় রুবল নিয়েছিলে সেটা দিয়ে দাও, আর তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছ। এটা সৎ লোকের মত কাজ নয়। বার্তাবাহকের হাতে দয়া করে টাকাটা ফেরৎ দেবে কি? আমিও খুব গাড্ডায় পড়েছি। কোন জায়গা থেকে কি টাকাটা যোগাড় করতে পার না?—টাকাটা পাঠানো বা না পাঠানো অনুসারে ভালবাসা বা ঘৃণাসহ তোমারই—গ্রুচেৎস্কি।"

"লাও ঠেলা! কী শুয়োরের বাচ্চা রে বাবা! একটু সবুর সইল না? আর একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে।"

মিত্‌য়া মায়ের কাছে গেল। এটা তার শেষ আশা। মা খুব ভাল, কখনও তাকে ফিরিয়ে দেয় না। কিন্তু মার মেজাজ ভাল ছিল না: দুই বছরের ছোট বাচ্চাটা অসুস্থ। তাই মিত্‌য়া হৈ-হৈ করে নার্সারিতে ঢুকে পড়ায় সে খুব রেগে গেল; কোন কথা না শুনেই তাকে ফিরিয়ে দিল। বিড়বিড় করে কি যেন বলে মিত্‌য়া বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াল। তা দেখে মার মনে কষ্ট হল। বলল, "অপেক্ষা কর মিত্‌য়া, এখন আমার কাছে টাকা নেই, কাল তোমাকে এনে দেব।"

কিন্তু মিত্‌য়া তখনও বাবার উপর রেগে আছে।

"কাল পেলে আর কি হবে, টাকাটা যে আজই চাই? এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চললাম। আর কিছুই বলার নেই।"

সশব্দে দরজা বন্ধ করে সে বেরিয়ে গেল।…"আমার কাছে তো কিছুই

নেই'। সে হয় তো ঘড়িটাই বাঁধা রাখতে বলবে।"

মিত্য়া তার ঘরে গেল, কুপন ও ঘড়িটা টানা থেকে বের করল, কোটটা গায়ে দিল, তারপর মাখিনের কাছে চলল।

২

মাখিন তার স্কুলের বন্ধু; উপরের ক্লাসে পড়ে, বাড়ন্ত যুবক, গোঁফ গজিয়েছে। সে জুয়া খেলে, মেয়েদের সঙ্গে মেশে, সব সময়ই সঙ্গে নগদ টাকা থাকে। থাকে পিসির কাছে। মিত্য়া ভাল করেই জানে যে মাখিন সৎ স্বভাবের ছেলে নয়। সে বাড়িতেই ছিল। থিয়েটারে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। নোংরা ঘরটা সুগন্ধি সাবান ও ইউ-ডি-কোলোনের গন্ধে ভর্তি।

মিত্য়া নিজের বিপদের কথা জানালে মাখিন বলল, "বড়ই বিপদের কথা হে ছোকরা। অবশ্য ঘড়িটা বন্ধক রাখা যেতে পারে। কিন্তু তার চাইতে আর একটা ভাল কাজও তো করা যেতে পারে।" মাখিন চোখ টিপল।

"সেটা কি ?"

"খুব সহজ কাজ।" মাখিন কুপনটা হাতে নিল। ২'৫০-এর আগে একটা এক বসিয়ে দাও; তাহলেই ১২'৫০ হয়ে যাবে।

"কিন্তু সেরকম কুপন কি হয় ?"

"নিশ্চয় হয়; দশ হাজার রুবলের সঙ্গে ১২'৫০-এর কুপন থাকে। এইভাবে একটা তো নিজে ভাঙিয়েছি।"

"অমন কথা বলো না।"

"আরে বাবা, হাঁ কি না বল", বাঁ হাতে আঙুল দিয়ে কুপনটাকে মসৃণ করতে করতে মাখিন কলমটা তুলে নিল।

"কিন্তু এ তো অন্যায় !"

"বাজে কথা !"

"বাজে কথাই বটে," মিত্য়া ভাবল; আবার বাবার কথাগুলি মনে পড়ল। "তুমি তো বলেইছ আমি বখাটে। তাই আমি হব।" সে মাখিনের মুখের দিকে তাকাল। মাখিনও হেসে তার দিকে তাকাল।

"কি বল ?"

"ঠিক আছে; তাই হবে।"

মাখিন বেশ যত্ন করে ২'৫০-এর আগে একটা এক লিখল।

"এবার রাস্তা পার হয়ে দোকানে চল; সেখানেই ফটোগ্রাফ বাঁধাইয়ের জিনিসপত্র বিক্রি হয়। এখানকার একটি ছেলের জন্য একটি ফ্রেম কিনতে হবে।" পকেট থেকে একটি তরুণীর ফটোগ্রাফ বের করল; তার বড় বড়

চোখ, এক ঢাল চুল, অসাধারণ উন্নত বুক।

"কি মিষ্টি না? অ্যা!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ।···নিশ্চয়···।"

"পরে দেখো।—এখন চল।"

মাখিন কোটটা নিল। দুজন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

৩

দুটি ছেলে দরজার ঘণ্টা বাজিয়ে শূন্য দোকানে ঢুকল। দেয়াল বরাবর তাকের উপর ফটোগ্রাফের সরঞ্জাম; কাউণ্টারের সঙ্গে শো-কেস। একটি সাদামাটা স্ত্রীলোক ভিতরের দরজা দিয়ে এসে কাউণ্টারের পিছন থেকে জানতে চাইল তারা কি চায়।

"একটা ভাল ফ্রেম যদি দয়া করে দাও ম্যাডাম।"

"কি রকম দামের মধ্যে?" স্ত্রীলোকটি বলল। "এগুলি পঞ্চাশ কোপেক করে; আর এগুলি আর একটু বেশী দামের; এই একটা আছে খুব সুন্দর, একেবারে নতুন স্টাইলের, দাম এক রুবল কুড়ি কোপেক।" নানা রকমের ফ্রেম দেখিয়ে স্ত্রীলোকটি বলল।

"ঠিক আছে, আমি এটাই নিচ্ছি। দামটা একটু সস্তা করা যায় না? এই—এক রুবল।"

"আমাদের দোকানে দর-কষাকষি চলে না," দোকানি বলল।

"ঠিক আছে, এটাই নিলাম," বলে মাখিন কাউণ্টারের উপর কুপনটা রাখল। "ফ্রেমটা জড়িয়ে বেঁধে দাও, আর ভাঙানিটা দাও। একটু জলদি কর। আমরা থিয়েটারে যাব; দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

স্ত্রীলোকটি চোখে ভাল দেখে না; তাই কুপনটা খুব কাছে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল, "এখনও প্রচুর সময় আছে।···কিন্তু তোমাদের কাছে কি খুচরো নেই?"

"আমি দুঃখিত, খুচরো সঙ্গে নেই। বাবা ওটাই দিয়েছে, কাজেই ওটাই ভাঙাতে হবে।"

"এক রুবল বিশ নিশ্চয় তোমার কাছে আছে?"

"আমার কাছে মাত্র পঞ্চাশ কোপেক আছে। কিন্তু তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? তুমি কি ভাবছ আমরা ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খারাপ কুপন গছিয়ে দিচ্ছি?"

"না, না, তা ভাবছি না।"

"তুমি বরং কুপনটা ফিরিয়ে দাও। আমরা অন্য কোথাও ভাঙিয়ে নেব।"

"কত ফেরৎ দিতে হবে? এগারো ও কিছু খুচরো কি?"

কাউন্টারের উপর হিসাব কষে স্ত্রীলোকটি ডেস্ক খুলে একটা দশ-রুবলের নোট ও খুচরো বের করল।

ধীরে সুস্থে টাকাটা নিয়ে মাথিন বলল, "দয়া করে ফ্রেমটা বেঁধে দাও।"

"হ্যা স্যার," বলে স্ত্রীলোকটি ফ্রেমটা জড়িয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল।

পথে নেমে এসে মিত্য়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

"তুমি নাও দশ রুবল ; বাকিটা আমার কাছে থাক। পরে ফেরৎ দেব।"

মাথিন থিয়েটারে চলে গেল। মিত য়া গ্রুচেৎস্কির সঙ্গে দেখা করে টাকাটা ফেরৎ দিল।

৪

এক ঘণ্টা পরে দোকানের মালিক ইউজেন-মিখাইলভিচ বাড়ি ফিরে টাকার হিসাব করতে বসল।

কুপনটা দেখেই বুঝল সেটা জাল। চেঁচিয়ে বউকে ডেকে বলল, "আরে বোকার ডিম! তোমার ঘটে কি এতটুকু বুদ্ধি নেই!"

চেঁচানি শুনে বউটির কেঁদে ফেলার মত অবস্থা। তবু পাল্টা জবাব দিল, "তুমি তো প্রায়ই কুপনে দাম নিয়ে থাক ইউজেন, বিশেষ করে বারো রুবলের কুপনে। আমি তো ভেবেই পাইনে ওরা আমাকে ঠকিয়ে গেল কেমন করে। দুজনই তো ইউনিফর্ম-পরা স্কুলের ছেলে। একটি তো ফুটফুটে বাচ্চা, একেবারে গোবেচারি দেখতে।"

"ঠিক তুমি যেমন গোবেচারি মুখ্খু।" স্বামী বকুনি দিতে দিতেই টাকা-পয়সা গুণতে লাগল।..."আমি যখন কুপন নেই তখন ভাল করে দেখে নেই তাতে কি লেখা আছে। আর তুমি বোধহয় ছেলে দুটোর চাঁদ মুখের দিকেই তাকিয়েছিলে। বুড়ো বয়সে একটু বুদ্ধিশুদ্ধি হবে তো।"

বউ আর সহ্য করতে পারল না, রাগে ফেটে পড়ল।

"তুমি তো ঐ রকমই মানুষ। যাকে কাছে পাও তাকেই এক হাত নাও। আর তুমি যখন তাসের আড্ডায় চুয়াল্ল রুবল হেরে আস—তখন কোন দোষ হয় না।'

"সেটা অন্য ব্যাপার—"

"তোমার সঙ্গে কোন কথা বলতে চাই না," বলে বউ তার ঘরে চলে গেল। অতীতের অনেক দুঃখের কথা তার মনে পড়ে গেল। মনের দুঃখে সে পোশাক বদলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। স্কুলের ফরাসী ভাষার শিক্ষকের বাড়িতে সেদিন তার ও তার স্বামীর নিমন্ত্রণ ছিল।

৫

সান্ধ্য আসরে অতিথিরা চা ও কেকের সদ্ব্যবহার করে অনেকগুলো তাসের টেবিলে হুইস্ট খেলতে বসল।

ইউজেন মিখালভিচের স্ত্রীর সঙ্গে খেলতে বসেছে স্বয়ং গৃহস্বামী, একজন অফিসার ও পরচুলা মাথায় এক বোকা বৃদ্ধ মহিলা। মহিলাটি তাস খেলতে ভালবাসে, খেলেও খুব ভাল। কিন্তু ইউজেন মিখাইলভিচের স্ত্রীই সারাক্ষণ জিততে লাগল। তার হাতে বার বারই খুব ভাল তাস আসছে। তার পাশেই একটা পাত্রে রাখা আছে আঙুর ও ন্যাসপতি। তার মেজাজ খুবই সরিফ।

অন্য টেবিল থেকে গৃহস্বামিনী শুধাল, "আর ইউজেন মিখাইলভিচের কি হল? তার এত দেরী হচ্ছে কেন?"

বৌটি বলল, "হয় তো হিসাবপত্র মেলাতে ব্যস্ত আছে। মজুরদের মাইনে দিতে হবে, জ্বালানি আনতে হবে।"

"আরে, ঐ তো এসে পড়েছে। তোমার কথাই হচ্ছিল। এত দেরী হল কেন?" ঠিক তখনই ইউজেন মিখাইলভিচ ঘরে ঢুকলে গৃহস্বামিনী তাকে কথাগুলি বলল।

হাত কচলাতে কচলাতে খুশিভরা গলায় ইউজেন মিখাইলভিচ বলল, "একটু ব্যস্ত ছিলাম।" বৌয়ের কাছে গিয়ে বলল, "জান, কুপনটা কোন রকমে ঝেড়ে দিয়েছি।"

"না! অমন কথা বলো না।"

"হ্যাঁ গো, একটা চাষীর কাছ থেকে একগাড়ি জ্বালানি কিনে ওই দিয়েই তার দাম মিটিয়ে দিয়েছি।"

তারপরেই ফাঁক পেয়ে একটা হুইস্ট টেবিলে বসে তাস ভাঁজতে লাগল।

৬

ইউজেন মিখাইলভিচ যে চাষীর কাছ থেকে কুপন দিয়ে জ্বালানি কিনেছিল তার নাম আইভান মিরোনভ। কুপনটাকে সযত্নে ভাঁজ করে থলির মধ্যে রেখে সে একটা শুঁড়িখানায় ঢুকল।

সেখানে ভদ্‌কা ও চা নিয়ে বসল। তার টেবিলেই বসেছিল একটি দারোয়ান। কথায় কথায় দুজনের মধ্যে আলাপ জমে উঠল। এক সময় থলির ভিতর থেকে বের করে কুপনটা তাকে দেখাল। লেখাপড়া না

জানলেও দারোয়ান বলল, এখানকার বাসিন্দাদের অনেক কুপন সে ভাঙিয়ে দিয়েছে; তবে মাঝে মাঝে জাল কুপনও ধরা পড়ে; কাজেই এখানকার কাউণ্টার থেকে কুপনটা ভাঙিয়ে নেওয়াই তার পক্ষে ভাল। আইভান মিরোনভ কুপনটা ওয়েটারকে দিয়ে ভাঙানি এনে দিতে বলল। কিন্তু ভাঙানির পরিবর্তে সে সঙ্গে নিয়ে এল ম্যানেজারকে। লোকটির মাথায় টাক, মুখটা চকচকে, মোটা হাতে কুপনটা ধরা।

সেটা দেখিয়ে ম্যানেজার বলল, "তোমার কুপনটা অচল।"

"কুপনটা নিশ্চয় ভাল। একটি ভদ্রলোক আমাকে দিয়েছে।"

"আমি বলছি এটা খারাপ। কুপনটা জাল।"

"জাল? বেশ, আমাকে দিয়ে দাও!"

"তা দেব না। এ ধরনের চালাকির জন্য তোমার মত লোকদের শাস্তি হওয়া দরকার। অবশ্য কাজটা তুমি নিজে কর নি—করেছে তোমার কিছু জোচ্চোর বন্ধু।"

"আমার টাকা দিয়ে দাও। কোন্ অধিকারে—"

"সিদোর! একটা পুলিশ ডাক তো," লোকটি ওয়েটারকে বলল। আইভান মিরোনভের তখন নেশা হয়েছে। ম্যানেজারের কলার চেপে ধরে চেঁচিয়ে বলল, "আমার টাকা ফেরৎ দাও। যে ভদ্রলোক ওটা দিয়েছে আমি তার কাছে যাব। সে কোথায় থাকে আমি জানি।"

ম্যানেজার অনেক কষ্টে আইভান মিরোনভের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করল। তার শার্টটা ছিঁড়ে গেল।

"ওঃ, এই তোমার ব্যবহার! ওকে ধরে রাখ।"

সেই সময় পুলিশ ঘরে ঢুকল। ঘটনা শুনে বেশ গম্ভীর হয়ে বলল:

"ওকে থানায় নিয়ে চল।"

পুলিশ কুপনটাকে পকেটে ফেলল; ঘোড়া সমেত আইভান মিরোনভকে নিকটবর্তী থানায় নিয়ে যাওয়া হল।

৭

সে রাতটা আইভান মিরোনভকে জেল-হাজতেই মাতাল ও চোরদের সঙ্গে কাটাতে হল। পরদিন দুপুরে পুলিশ-অফিসারের কাছে তার ডাক পড়ল। ভালভাবে জেরা করে একজন পুলিশকে সঙ্গে দিয়ে তাকে পাঠানো হল ইউজেন মিখাইলভিচের দোকানে।

পুলিশ দোকানের মালিককে ডেকে কুপনটা দেখিয়ে সব কথা জানাল। ইউজেন মিখাইলভিচ সঙ্গে সঙ্গে অবাক হবার ভান করে বলে উঠল, "তুমি তো দেখছি পাগল হে। এ লোকটাকে আমি জীবনে দেখি নি।"

আইভান মিরোনভ বলল, "এ তো পাপ। যেদিন মরবে সেদিনের কথা ভাব।"

"আরে, তুমি কি স্বপ্ন দেখছ। নিশ্চয় অন্য কারও কাছে কাঠটা বেচেছ। কিন্তু এক মিনিট দাঁড়াও। আমার বউকে জিজ্ঞাসা করে আসি, কাল সে কোন জ্বালানি কিনেছে কি না।" সেখান থেকে সরে গিয়ে দারোয়ান ভাসিলিকে ডেকে বলে দিল, কেউ যদি খোঁজ করে সর্বশেষ জ্বালানি কোথা থেকে আনা হয়েছে তাহলে সে যেন বলে দেয়, জ্বালানি আনা হয়েছে গুদাম থেকে, কোন পথের চাষীর কাছ থেকে নয়।

ভাসিলিকে সে কথা দিল তাকে একটা নতুন কুর্তা কিনে দেবে। আর তখনই নগদ পাঁচ রুবল তাকে বকশিস দিল। ভাসিলি খুশি মনে একবার নোটটার দিকে, একবার ইউজেন মিখাইলভিচের মুখের দিকে তাকিয়ে মাথাটা নেড়ে হেসে ফেলল।

'আমি জানি এই লোকগুলোর মস্তিষ্ক বলে কিছু নেই। মুখ্খু তো। কোন রকম চিন্তা করো না। কি বলতে হবে আমি জানি।"

আইভান মিরোনভ চোখের জলে ইউজেন মিখাইলভিচের কাছে মিনতি জানাতে লাগল, যাতে সে স্বীকার করে যে কুপনটা সেই তাকে দিয়েছে। সে দারোয়নকেও তার কথা বিশ্বাস করতে বলল, কিন্তু সবই বৃথা চেষ্টা; দুজনই একই কথা বলল, কোন পথের চাষীর কাছ থেকে তারা কখনও জ্বালানি কেনে নি। পুলিশ আইভান মিরোনভকে থানায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল; কুপন জাল করার অভিযোগ আনা হল তার বিরুদ্ধে। একই সেলে আটক জনৈক কেরাণীর পরামর্শমত পুলিশ অফিসারকে পাঁচ রুবল ঘুষ দিয়ে ইভান মিরোনভ কুপনটা ছাড়াই জেল থেকে বেরিয়ে এল। আগের দিনের পঁচিশ রুবলের পরিবর্তে তার পকেটে তখন ছিল মাত্র সাত রুবল।

সেই সাত রুবলের তিন রুবল শুঁড়িখানায় খরচ করে পাড় মাতাল অবস্থায় কেটে-ছড়ে যাওয়া ফোলা মুখ নিয়ে সে স্ত্রীর কাছে ফিরে গেল।

তার স্ত্রীর তখন সন্তান সম্ভাবনা; খুব অসুস্থ। সে স্বামীকে বকতে শুরু করল; স্বামী তাকে ধাক্কা দিল; সেও স্বামীকে আঘাত করল। কোন কথা না বলে তক্তার উপর শুয়ে সে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল।

পরদিন সকালে সে স্ত্রীকে সব কথা খুলে বলল। স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে সেকথা বিশ্বাস করল, আর সেই জঘন্য বড় লোকটাকে শাপ-শাপান্ত করতে লাগল। ক্রমে তার মাথা ঠাণ্ডা হল। একজন মদের ইয়ারের পরামর্শ মত স্থির করল, উকিলের কাছে গিয়ে ফটোগ্রাফের দোকানের মালিক তার প্রতি যে অন্যায় করেছে তা খুলে বলবে।

উকিল আইভান মিরোনভের মামলা নিতে রাজী হল ; ফির জন্য যতটা নয় তার চাইতে বেশী সে চাষীটিকে বিশ্বাস করল বলে, এবং তার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তার প্রতিবাদ জানাবে বলে।

বিচারের সময় উভয় পক্ষই আদালতে হাজির হল। দারোয়ান ভাসিলিকে ডাকা হল সাক্ষী হিসাবে। আগে পুলিশ অফিসারের কাছে যে যা বলেছিল তারই পুনরাবৃত্তি করে গেল। ফলে মামলার রায় আইভান মিরোনভের বিরুদ্ধে গেল, খরচ হিসাবে তাকে পাঁচ রুবল দিতে হল। সে টাকাটা অবশ্য ইউজেন মিখাইলভিচই উদারতাবশত তার হয়ে দিয়ে দিল। আইভান মিরোনভকে খালাস দেবার আগে জজসাহেব কঠোর ভাষায় তাকে তিরস্কার করল।

"আমার বিনীত ধন্যবাদ গ্রহণ করুন," বলে আইভান মিরোনভ দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথাটা নাড়তে নাড়তে আদালত থেকে চলে গেল।

মনে হল, ইউজেন মিখাইলভিচ ও দারোয়ান ভাসিলির পক্ষে সব কিছুই ভালয়-ভালয় শেষ হল। কিন্তু আসলে এমন কিছু ঘটে গেল যেটা কারও চোখে পড়ল না, অথচ যা কিছু দেখা গেল তার চাইতে সেটা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

দু'বছর আগে ভাসিলি গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে বসবাস শুরু করেছে। যত দিন যেতে লাগল ততই সে বাবাকে কম টাকা পাঠাতে লাগল, এবং স্ত্রীকেও গ্রাম থেকে নিজের কাছে নিয়ে গেল না। তাকে তার কোন দরকারও ছিল না ; শহরে সে যতগুলি ইচ্ছা স্ত্রী পেতে পারে, আর তারা সকলেই তার সেই নোংরা, গ্রাম্য স্ত্রীর চাইতে অনেক ভাল। ক্রমেই ভাসিলি শহর জীবনের সঙ্গে বেশী করে পরিচিত হতে লাগল। সেখানে সকলেই ছোটলোক, গরিব, নোংরা। এখানে শহরের সকলেই রুচিবান, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও ধনী। ক্রমেই তার মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মাল যে গ্রামের মানুষ তো বন্য পশুর মত বেঁচে থাকে, জীবনের কোন ধারণাই তাদের নেই, শহরের জীবনই খাঁটি জীবন। গ্রামের বুড়োরা বলে, "আইন মেনে চল, স্ত্রীর সঙ্গে থাক, কাজ কর ; অত্যধিক খেয়ো না, ভাল জিনিসপত্রের জন্য মাথা ঘামিও না।" আর শহরে যত গণ্যমান্য লোকরা নিজের নিজের সুখের পিছনেই ছুটে বেড়ায়। আর তার ফলে তারাই তো সুখে আছে।

জাল কুপনের ঘটনাটার আগে ভাসিলি বিশ্বাসই করতে পারত না যে ধনী মানুষরা নীতিহীনভাবে জীবন কাটায়। কিন্তু সেই ঘটনার পরে ভাসিলির দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে আসলে নীতি বলে কিছু নেই। আর সেটাই এখন তার জীবনের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তদনুসারে বাড়ির বাসিন্দাদের জিনিস-

পত্র কিনতে গিয়ে সে যতটা সম্ভব লাভ করে। তারপর সে সুযোগ পেলেই চুরি করতে শুরু করল। একদিন সে ইউজেন মিথাইলভিচের টাকা-ভর্তি থলিটা চুরি করল, কিন্তু ধরা পড়ে গেল। মিথাইলভিচ তাকে পুলিশে দিল না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করল।

ভাসিলির গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাবার কোন ইচ্ছাই ছিল না;. ভালবাসার মানুষের সঙ্গে সে মস্কোতেই রয়ে গেল, আর নতুন চাকরি খুঁজতে লাগল। একটা মুদি-দোকানে দারোয়ানের চাকরি পেল, কিন্তু মাইনে খুবই অল্প। চাকরিতে ঢোকার পরদিনই বস্তা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল। মুদি পুলিশ ডাকল না, কিন্তু তাকে আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে তাড়িয়ে দিল। তারপর থেকে আর কাজ জোটে না। হাতের টাকা ফুরিয়ে গেল; জামাকাপড় সব বেচে দিতে হল; ছেঁড়া পোশাকে দিন কাটতে লাগল। প্রেয়সী তাকে ছেড়ে গেল। তবু সে ভেঙে পড়ল না; বসন্তকাল এলে বাড়ির পথে পা বাড়াল।

৯

পিতর নিকলায়েভিচ স্‌ভেস্তিজ্‌কি মানুষটি ছোটখাট, চোখে কালো চশমা (তার চোখ খারাপ, এক সময় পুরো অন্ধ হবারই উপক্রম হয়েছিল)। সে যথারীতি ভোরে উঠে এক কাপ চা খেল, অস্ত্রাখানের পাড়-বসানো লোমের খাটো কোটটা পরে সম্পত্তির কাজ দেখতে বেরিয়ে গেল।

পিতর নিকলায়েভিচ কাস্টমসের পদস্থ কর্মচারি ছিল; চাকুরিতে থাকা কালে আঠারো হাজার রুবল উপার্জন করেছে। প্রায় বারো বছর আগে সে চাকরি ছেড়েছে—ঠিক নিজের থেকে ছাড়ে নি: আসলে ছাড়তে বাধ্য হয়েছে—তারপর এক বাউণ্ডুলে তরুণ জমিদারের একটা সম্পত্তি কিনে নিয়েছে। অনেক আগেই কাস্টমসের চাকরিতে থাকাকালে পিতর নিক-লায়েভিচ বিয়ে করেছিল। স্ত্রী ছিল এক পুরনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাপ-মাহারা মেয়ে; টাকাপয়সাও কিছু ছিল না। লম্বা, শক্ত-সমর্থ, সুদর্শনা। তাদের কোন সন্তান ছিল না। পিতর নিকলায়েভিচের ছিল যথেষ্ট রাজনৈতিক বুদ্ধি ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি। এক পোলিশ ভদ্রলোকের ছেলে সে; কৃষি ও জমিজমার ব্যাপারে কিছুই জানত না; কিন্তু নিজস্ব সম্পত্তি কিনবার পরে এত ভালভাবে সেটা চালাল যে পনেরো বছর পরে তিন শ' একরের সেই পতিত জমিটা একটা আদর্শ খামার হয়ে উঠল। বাড়ি, ঘর, খামার, গাড়ি, ঘোড়া, হাল, লাঙল—সব কিছু সযত্নরক্ষিত তকতকে, ঝকঝকে। সম্পত্তির এই সুন্দর চেহারা দেখে তার আনন্দের সীমা নেই; আর সব কিছুই নিজের হাতে গড়া বলে তার কত আনন্দ। অথচ এ সবই সে গড়ে তুলেছে চাষীদের

উপর উৎপীড়ন করে নয়, তাদের সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে।

ফেব্রুয়ারি মাস। পিতর নিকলায়েভিচ গলিত বরফের উপর সতর্কভাবে পা ফেলে আস্তাবল ছাড়িয়ে চলেছে শ্রমিকদের বাসস্থানের দিকে। এখনও অন্ধকার রয়েছে; ঘন কুয়াশার জন্য সে অন্ধকার ঘনতর। জানালায় আলো জ্বলছে। লোকজনরা উঠে পড়েছে।

আস্তাবলের দরজা সপাটে খোলা দেখে ভাবল, এটা কি ব্যাপার। চেঁচিয়ে বলল, "হ্যালো, কে ওখানে?"

কোন উত্তর নেই। পিতর নিকলায়েভিচ আস্তাবলের ভিতরে ঢুকল। ঘর অন্ধকার; পায়ের নীচে মাটি নরম; বাতাসে গোবরের গন্ধ; দরজার ডান দিকে দুটো খোলা জায়গা আছে এক জোড়া ঘোড়া থাকার জন্য। হাত বাড়িয়ে দেখল একটা জায়গা ফাঁকা। বাড়িয়ে দেখতে চাইল ঘোড়াটা শুয়ে আছে কি না। কিন্তু শক্ত কিছুই পায়ে লাগল না। "ঘোড়াটাকে কোথায় নিয়ে গেল?" সে ভাবল। আস্তাবল থেকে বাইরে এল।

ডাকল, "স্তেপান, এদিকে এস!"

স্তেপান মজুরদের সর্দার। ঘর থেকে বেরিয়ে এই দিকে আসছিল।

বলল, "আমি এখানে। ওহো, পিতর নিকলায়েভিচ নাকি? লোকজন সব আসছে।"

"আস্তাবলের দরজা খোলা কেন?"

"তাই নাকি? তা তো জানি না। প্রোশ্‌কা, লণ্ঠনটা নিয়ে এস তো।"

প্রোশ্‌কা লণ্ঠন নিয়ে এল। সকলে আস্তাবলে ঢুকল। কি ঘটেছে স্তেপান সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল।

বলে উঠল, "চোর এসেছে পিতর নিকলায়েভিচ। তালাটা ভাঙ্গা।"

"কি বলছ!"

"হ্যা, ডাকাতের দল। মাশ্‌কা'কে দেখছি না। 'হক' এখানে রয়েছে। কিন্তু 'বিউটি' নেই। 'ডাপ্‌ল-গ্রে'ও নেই।"

তিনটে ঘোড়া চুরি হয়ে গেছে।

প্রথমে পিতর নিকলায়েভিচ একটা কথাও বলল না। ভুরু কুঁচকে ঘন ঘন শ্বাস টানল।

কিছুক্ষণ পরে বলল, "ওঃ, যদি ব্যাটাদের ধরতে পারতাম! পাহারায় কে ছিল?"

"পিতর। নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিল।"

পিতর নিকলায়েভিচ পুলিশ ডেকে আনল, সব রকমে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করল, লোকজনকে পাঠাল চোরের খোঁজে। কিন্তু ঘোড়ার হদিস মিলল না।

পিতর নিকলায়েভিচ বলল, "সব পাজি! কি করে তারা এ কাজ করতে

পারল! আমি তো তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহারই করেছি। এবার, সবুর কর। সব ডাকাত! দলকে দল ডাকাত! আর দয়া দেখাব না।"

১০

ইতিমধ্যে সবগুলি ঘোড়াই পাচার করে দেওয়া হয়েছে। মাশ্‌কাকে আঠারো রুবল দামে বিক্রি করা হয়েছে জিপ্‌সিদের কাছে। ড্যাপ্‌ল্‌-গ্রেকে আর একটা ঘোড়ার সঙ্গে বদলি করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে চল্লিশ মাইল দূরের এক চাষীর খামারে। বিউটি পথেই মারা পড়েছে। আর এসব ব্যাপার যে ঘটিয়েছে সে লোকটি আইভান মিরোনভ। তাকে এই খামারে কাজ দেওয়া হয়েছিল, কাজেই পিতর নিকলায়েভিচের সব গতিবিধিই তার জানা ছিল। যে টাকা হেরেছিল সেটা তোলার জন্য সে ঘোড়া চুরি করেছিল।

জাল কুপনের সঙ্গে জড়িত দুদিনের পরে সে মদ ধরল। মদেই তার সর্বস্ব উড়ে যেত, কিন্তু তার বৌ সব পোশাকপত্র, ঘোড়ার কলার ও বাকি জিনিসপত্র তালা বন্ধ করে রেখেছিল বলে সেগুলি বেঁচে গেল। একদিন সে পদোল্‌স্কের কাছাকাছি অঞ্চল থেকে আগত একদল চাষীর সঙ্গে বসে মদ খেল; তাদের সঙ্গেই বাড়ির পথ ধরল। পথে সেইসব মাতাল সহযাত্রী বলল, এক চাষীর বাড়ি থেকে তারা একটা ঘোড়া চুরি করেছে। আইভান মিরোনভ রেগে গিয়ে ঘোড়া-চোরদের তিরস্কার করতে লাগল।

বলল, "কী লজ্জার কথা! চাষীর কাছে একটা ঘোড়া তার ভাইয়ের মত। আর তোমরা সেই ঘোড়া থেকে তাকে বঞ্চিত করলে? যদি ঘোড়া চুরি করতেই হয় তো জমিদারের কাছ থেকে কর। তারা তো কুকুরের অধম; তাদের শাস্তি হওয়া উচিত।"

আলোচনা প্রসঙ্গে চাষীরা বলল, কোন জমিদার বাড়ি থেকে ঘোড়া চুরি করতে অনেক কৌশল জানতে হয়।

"সেখানকার সব অন্ধি-সন্ধি জানতে হয়, আর সেখানে এমন একজন থাকা দরকার যে তোমাকে সাহায্য করবে।"

তখনই আইভান মিরোনভের মনে পড়ল, নিকলায়েভিচ নামক একজন জমিদারকে সে জানে; তার খামারে সে কাজ করেছে, আর মজুরি দেবার সময় একটা যন্ত্র ভেঙে ফেলার দরুণ সে দেড় রুবল কেটে নিয়েছে। তার ঘোড়াগুলির কথাও মনে পড়ল।

তারপরই চাকরি চাওয়ার অজুহাতে পিতর নিকলায়েভিচের সঙ্গে দেখা করল, এবং সব খোঁজ-খবর নিয়ে চোরদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে হাজির হল, এবং তিনটে ঘোড়া তুলে নিয়ে গেল।

যা লাভ হল সেটা ভাগাভাগি করে আইভান মিরোনভ পাঁচ রুবল পকেটে নিয়ে বৌর কাছে ফিরে গেল। মাঠে কাজ করার মত ঘোড়া না থাকায় বাড়িতে তার কিছুই করার ছিল না; তাই ঘোড়া-চোর ও জিপসিদের সঙ্গে মিশে ঘোড়া চুরি করে বেড়াতে লাগল।

১১

ঘোড়া-চোরকে খুঁজে বের করার অনেক চেষ্টা করল পিতর নিকলায়েভিচ। সে বুঝল, নিশ্চয় খামারেরই কেউ চোরদের সাহায্য করেছে; তাই সে সব কাজের লোককেই সে সন্দেহ করতে লাগল। সে খোঁজ নিল, সে রাতে কে ঘুমিয়েছিল। মজুররা একবাক্যে বলল, সারাটা রাত প্রোশ্‌কা বাড়িতে ছিল না। প্রোশ্‌কা ওরফে প্রকোফি নিকলায়েভিচ সত্য সামরিক চাকরি থেকে এসেছে; চালাকচতুর, সুদর্শন যুবক। পিতর নিকলায়েভিচ মাঝে মাঝে তাকে কোচয়ানের কাজ দিত।

জেলা-কনেস্টবল ভদ্রলোক পিতর নিকলায়েভিচের বন্ধু। সব কথা শুনে সে বলল, "তুমি তো সব সময় চাষীদের পক্ষ নাও, এখন দেখলে তো! আমি ঠিকই বলি যে ওরা বুনো জন্তুরও অধম। চাবুকই ওদের ঠাণ্ডা রাখার একমাত্র পথ। আচ্ছা, তুমি বলছ এ সবই প্রোশ্‌কার কাজ। একেই তো তুমি মাঝে মাঝে কোচয়ান রাখ, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"তাকে একবার ডাকবে?"

প্রোশ্‌কা এলে কনেস্টবল তাকে জেরা করতে লাগল।

"সেরাতে তুমি কোথায় ছিলে?"

"বাড়িতে।"

"তা কি করে হয়? সকলেই বলছে তুমি বাড়ি ছিলে না?"

"আপনার যা মর্জি ইয়োর অনার।"

"আমার মর্জির কথা নয়। বল সে রাতে কোথায় ছিলে।"

"বাড়িতে।"

"খুব ভাল কথা। পুলিশ, ওকে থানায় নিয়ে চল।"

আসলে সে রাতটা প্রোশ্‌কা কাটিয়েছিল তার ভালবাসার মানুষ পবাশার কাছে, আর তাকে কথা দিয়েছিল সে কথা কাউকে বলবে না। সে কথা রেখেছে। তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না পাওয়ায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু পিতর নিকলায়েভিচের বদ্ধমূল ধারণা হল প্রশেকাই নাটের গুরু; সে তাকে ঘৃণা করতে শুরু করল। একদিন প্রোশ্‌কা দোকানির কাছ থেকে

দুই ওজনের ষই কিনল। তার থেকে দেড়টা ঘোড়াগুলোকে দিয়ে বাকিটা দোকানিকেই ফিরিয়ে দিল, আর সেই পয়সায় মদ খেল। পিতর নিকলায়েভিচ ব্যাপারটা ধরে ফেলে তার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আনল। জজসাহেব তাকে তিন মাসের কারাদণ্ড দিল।

প্রকোফি ছিল উদ্ধত স্বভাবের মানুষ; নিজেকে সে অন্যের চাইতে বড় বলে মনে করত। কারাবাস তার পক্ষে খুবই অপমানের ব্যাপার। খুবই মনমরা হয়ে সে কারাগার থেকে ফিরে এল; জীবনে গর্ব করার আর কিছু রইল না। তার চাইতেও বড় কথা, কেবল পিতর নিকলায়েভিচের বিরুদ্ধে নয়, গোটা জগতের বিরুদ্ধেই তার মন তিক্ততায় ভরে উঠল।

মোটের উপর সকলেই লক্ষ্য করল কারাবাসের পর থেকেই প্রকোফি যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে; যেমন নির্বিকার তেমনই অলস। মদও ধরল। অচিরেই একটি স্ত্রীলোকের বাড়িতে পোশাক চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে আবার সে জেলে গেল।

১২

কুপনটা হাতছাড়া হবার পরে ইউজেন মিখাইলভিচ ব্যাপারটা ভুলেই গেল; কিন্তু তার বৌ মারিয়া ভাসিলিয়েভ্না প্রতারণার শিকার হওয়ায় নিজেকে ক্ষমা করতে পারল না; বা নিষ্ঠুর বাক্য-বাণের জন্য স্বামীকেও ক্ষমা করল না। তার সবচাইতে বেশী রাগ পড়ল সেই দুটো স্কুলের ছেলের উপর। সেদিন থেকে পথে-ঘাটে স্কুলের ছেলে দেখলেই সে তাদের উপর কড়া নজর রাখে। একদিন মাখিনের সঙ্গে দেখাও হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে এমন ভাবে মুখের আদলটা বদলে ফেলে যে মারিয়া ভাসিলিয়েভ্না তাকে চিনতেই পারে নি। কিন্তু একপক্ষকাল পরে মিত্য়া স্মকোভ্নিকভকে মুখোমুখি দেখেই তাকে চিনে ফেলল।

তাকে এগিয়ে যেতে দিয়ে নিজে তার পিছু নিল। তার বাড়ির কাছে পৌঁছে সে কার ছেলে সে খোঁজও নিল। পরদিন স্কুলে গিয়ে ধর্ম-শিক্ষক পুরোহিত মাইকেল ভেদেন্স্কির সঙ্গে দেখা করে তাকে সব কথা জানাল। মাইকেল ভেদেন্স্কি বিপত্নীক ও উচ্চাভিলাষী। এক বছর আগে মিত্য়া স্মকোভ্নিকভের বাবার সঙ্গে সমাজে তার দেখা হয়েছিল, আর ধর্মসংক্রান্ত এক বিতর্কে তাকে একেবারে কোণঠাসা করে ছেড়েছিল। সেই থেকেই ভদ্রলোকের উপর তার একটা রাগ আছে। এবার তার ছেলের অপকর্মের কথা শুনে তাই সে মনে মনে বেশ খুশিই হল। বলল, "সত্যি, খুব দুঃখের কথা। আমি খুব খুশি হয়েছি যে তুমি আমাকে সব কথা বলেছ। গির্জার

সেবক হিসাবে ছেলেটিকে আমি বকে দেব—অবশ্য যথেষ্ট সদয়ভাবেই সেটা করব। আমার পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেই কাজ করব।"

পরদিন ফাদার মাইকেল যখন মিত্য়া স্মকোভনিকভ্দের ক্লাসে ধর্ম-শিক্ষার পাঠ দিচ্ছিল, তখন জাল কুপনের ঘটনাটার উল্লেখ করে জানাল যে অপরাধী স্কুলেরই ছাত্র। বলল, "কাজটা খুবই গর্হিত, কিন্তু অপরাধ অস্বীকার করা ততোধিক গর্হিত। এ কথা যদি সত্য হয় যে তোমাদেরই একজন এই পাপ করেছে তাহলে অপরাধী সেকথা স্বীকার করুক।" এই কথা বলে ফাদার মাইকেল কড়া চোখে মিত্য়া স্মকোভনিকভের দিকে তাকাল। সব ছেলের চোখও গিয়ে পড়ল মিত্য়ার উপর। মুখ লাল হয়ে উঠল, অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কান্নায় ভেঙে পড়ে সে ক্লাস থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। ছেলের এই অবস্থা দেখে তার মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আসল কথাটা জেনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল ফটোগ্রাফারের দোকানে এবং মারিয়া ভাসিলিয়েভ্নাকে বারো রুবল পঞ্চাশ কোপেক দিয়ে তার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিল যে ছেলেটির দোষ সে অস্বীকার করবে। ছেলেকেও বলে দিল, সে যেন সকলের কাছ থেকে বিশেষ করে তার বাবার কাছ থেকে প্রকৃত সত্য গোপন রাখে।

ফিদর মিখাইলভিচ যখন ধর্ম-ক্লাসের ঘটনাটা শুনল এবং ছেলে সব অপরাধ অস্বীকার করল, তখনই সে স্কুলে ছুটে গিয়ে স্কুলের প্রধানের সঙ্গে দেখা করে ফাদার মাইকেলের ব্যবহারে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলল, ব্যাপারটাকে সে সহজে ছেড়ে দেবে না।

ফাদার মাইকেলকে ডেকে পাঠানো হল।

ফিদর মিখাইলভিচ বলল, "একটা বোকা মেয়ে মানুষ প্রথমে মিথ্যা করে আমার ছেলের নামে অভিযোগ এনে পরে সেটা তুলে নিল, আর তুমিও একটি সৎ, সত্যবাদী ছেলের নামে কুৎসা রটনা করার চাইতে ভাল কিছু করতে পারলে না।"

"আমি তার কুৎসা রটনা করি নি, আর আপনার কাছে আমার অনুরোধ, এ রকম ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। আমার পোশাকের মর্যাদা দিতেও আপনি ভুলে গেছেন।"

"তোমার পোশাকে আমার কিছু যায় আসে না।"

"ধর্মের ব্যাপারে আপনার অশিষ্টতার কথা শহরের সকলেই জানে।" ফাদার মাইকেল বলল; রাগে তার লম্বা সরু মাথাটা কাঁপতে লাগল।

"ভদ্রমহোদয়! ফাদার মাইকেল!" তাদের ক্রোধ প্রশমনের জন্য স্কুলের পরিচালক হেঁকে উঠল। কিন্তু তার কথায় তারা কান দিল না।

"ছাত্রদের ধর্মীয় ও নীতি শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দেওয়া পুরোহিত হিসাবে যে আমার কর্তব্য।"

"ওহো, তোমার ধর্মের বড়াই বন্ধ কর! ধর্মের এই সব বকবকানি থামাও। তুমি যে ঈশ্বর বা শয়তান কাউকেই বিশ্বাস কর না সেটা আমার অজানা নয়।"

শেষের কথাগুলিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ফাদার মাইকেল পাল্টা জবাব দিল, "তোমার মত লোকের সঙ্গে কথা বলতেও আমার মর্যাদায় বাঁধে।"

কার্যকাল শেষ হলে মাইকেল ফেদিন্স্কি স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিল এবং অচিরেই ভল্‌গার তীরবর্তী কোন শহরের একটা সেমিনারিতে রেকটরের চাকরি পেয়ে গেল।

১৩

এদিকে দারোয়ান ভাসিলি খোলা রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে দক্ষিণের দিকে।

সারাদিন সে হাঁটে, আর রাত হলে পুলিশ তার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেয় কোন চাষীর কুটিরে। রুটি প্রতিদিনই জোটে, কখনও বা সান্ধ্য ভোজনের টেবিলেও ডাক পড়ে। একদিন সে ওরিল জেলার একটা গ্রামে রাত কাটাবার সময় শুনল, জনৈক ব্যবসায়ী তার ফলের বাগানের জন্য একজন শক্ত-সমর্থ দারোয়ানের খোঁজ করছে। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে ভাসিলি সেখানে গিয়ে মাসে পাঁচ রুবল মাইনেতে ফল-বাগানের দারোয়ানের চাকরিতে বহাল হয়।

নতুন চাকরিতে বেশ ভালভাবেই তার দিন কাটছিল। একদিন রাতে গ্রামের একদল বড় ছেলে আপেল চুরি করতে চুপিসারে বাগানে ঢুকল। পিছন থেকে নিঃশব্দে এসে ভাসিলি তাদের তাড়া করল; ছেলেরা পালাতে লাগল; কিন্তু সে একজনকে ধরে মনিবের কাছে নিয়ে গেল।

মনিবের জীবনযাত্রা ভাসিলির খুব ভাল লাগত। তাকে দেখলেই তার মস্কোর কথা মনে পড়ত। ক্রমেই তার মনে এই ধারণা জন্মাতে লাগল যে জীবনে টাকাটাই বড় কথা। কেমন করে অনেক টাকা পাওয়া যায় সেই চিন্তাই তার কাছে সার হয়ে উঠল। আগেও সে ছোটখাট লাভের কাজ করত, কিন্তু সেটা কোন কাজের কথা নয়। এবার তাকে একটা বড় রকমের জাল ফেলতে হবে; সব রকম খোঁজ-খবর নিয়ে এমনভাবে কাজ হাসিল করতে হবে যাতে ধরা পড়ার কোন ভয় না থাকে।

কুমারী মেরির উৎসবের পরে আপেলের সব হেমন্তকালীন ফসল সংগৃহীত হয়ে গেলে মনিব খুশি হয়ে ভাসিলির মাইনেপত্তর চুকিয়ে দিল, পুরস্কার স্বরূপ বাড়তি কিছু টাকাও দিল।

ভাসিলি মনিবের ছেলের দেওয়া নতুন কুর্তা ও নতুন টুপি পরল, কিন্তু বাড়িতে ফিরে গেল না। গ্রামের চাষীদের ইতর জীবনযাত্রার কথা ভাবলেই

তার ঘৃণা হয়। কিছু মাতাল সৈনিকের সঙ্গে জুটে সে মস্কো ফিরে গেল। সেখানে পৌঁছেই সে স্থির করল, যে মনিবের কাছে আগে কাজ করত তার দোকানে ঢুকে চুরি করবে। বাড়িটা সে ভালই চেনে, টাকা-পয়সা কোথায় তালাবন্ধ থাকে তাও জানে। সৈন্যদের বাইরে পাহারায় রেখে উঠোনের দরজা ভেঙে সে ভিতরে ঢুকল, এবং হাতের কাছে টাকা-পয়সা যা পেল চুরি করল। দোকান থেকে পাওয়া গেল ৩৭০ রুবল। সহকারীদের একশ' রুবল দিয়ে বাকিটা সঙ্গে করে সে আর একটা শহরে গেল। সেখানে নারী-পুরুষ সবরকম লোকের সঙ্গে মিশে ফূর্তিতে দিন কাটাতে লাগল। পুলিশ তার গতিবিধির খোঁজ করে একদিন তাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দিল। তখন তার কাছে এক কপর্দকও ছিল না।

১৪

আইভান মিরোনভ কুশলী নির্ভিক ও সফল ঘোড়া-চোর হয়ে উঠল। তার বৌ অফিম্য়া প্রথমে এরকম অন্যায় কাজের জন্য তাকে গালমন্দ করত, কিন্তু এখন সে খুব খুশি, আর স্বামীর জন্য গর্বিত। স্বামীর একটা নতুন ভেড়ার লোমের কোট হয়েছে, আর সেও পেয়েছে গরম কুর্তা ও নতুন লোমের আলখাল্লা।

গ্রামে এবং জেলার সর্বত্র সকলেই জানে যে সব ঘোড়া-চুরির পিছনে আছে আইভান মিরোনভ, কিন্তু ভয়ে কেউ তার পিছনে লাগে না। তার উপর কোন রকম সন্দেহ পড়লেই সে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণ করে ফেলে। একদিন রাতের অন্ধকারে সে কলতোভ্‌কা গ্রামের চারণ-ভূমি থেকে ঘোড়া চুরি করল। ঘোড়াগুলো কার সেটা না জেনেই সে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল। ঘটনাস্থলে সে নিজে যায় নি, পাঠিয়েছিল গেরাসিম নামক একটি চালাক যুবককে তার হয়ে চুরি করতে। চাষীরা চুরির খবর জানতে পারল ভোর হলে; চোরের খোঁজে তারা চারদিকে বেরিয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে সরকারি জঙ্গলের একটা খাঁড়ির মধ্যে ঘোড়াগুলিকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

গেরাসিম সেখানে কেমন আছে দেখবার জন্য সে বনের মধ্যে ঢুকেছিল; তাকে কিছু খাবার ও ভদ্‌কা দিয়ে একটা চোরা—পথে ফিরে আসছিল যাতে কারও সঙ্গে দেখা না হয়। কিন্তু কপাল খারাপ, বন-রক্ষক জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

"আরে, তুমি কি ব্যাঙের ছাতা খুঁজতে বেরিয়েছ?" সৈনিক শুধাল।

সঙ্গের ঝুড়িটা দেখিয়ে আইভান মিরোনভ বলল, "কিছুই জোটে নি।"

"তা ঠিক, গ্রীষ্মকালে ব্যাঙের ছাতা গজায় না," বলে সৈনিক কি যেন

ভাবতে ভাবতে চলে গেল। তার কেমন খটকা লাগল। এত ভোরে লোকটা তো প্রাতঃভ্রমণে বনের মধ্যে ঢোকে নি। কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে এসে সে চারদিকে খুঁজতে লাগল। হঠাৎ খাদের ভিতর থেকে ঘোড়ার হ্রেষা শুনতে পেল। শব্দ লক্ষ্য করে কিছুদূর এগিয়েই দেখল, খাদের নীচে বসে গেরাসিম খাবার খাচ্ছে, আর কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে গাছের সঙ্গে।

সৈনিকটি ছুটে গিয়ে বেলিফ, পুলিশ অফিসার ও দুজন সাক্ষীকে গ্রাম থেকে ডেকে নিয়ে এল। তিন দিক থেকে এগিয়ে এসে তারা গেরাসিমকে ধরে ফেলল। গেরাসিম কিছুই লুকল না; মদের নেশায় আরও বলে দিল যে ঘোড়া নিয়ে যেতে আইভান মিরোনভ রাতের বেলা সেখানে আসবে।

আইভান মিরোনভকে ধরবার জন্য চাষীরা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল। অন্ধকার হলে একটা শিস শুনতে পেল। গেরাসিমও অনুরূপ শব্দ করল। যেই আইভান মিরোনভ খাদের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল অমনি চাষীরা তাকে ঘিরে ধরে গ্রামে নিয়ে গেল।

পরদিন সকালে বেলিফের কুটিরের সামনে অনেক লোক জড় হল। সকলেই আইভান মিরোনভকে জেরা করতে লাগল। প্রথমেই জেরা শুরু করল স্তেপান পেলাগুশ্‌কিন নামে একটা ঢ্যাঙা লোক। স্তেপান সামরিক চাকরি ছেড়ে এসেছে। বাবার কাছ থেকে সরে এসে একা থাকে। তার দুটো ঘোড়াই চুরি হয়ে গেছে।

রেগে লাল হয়ে সে চীৎকার করে বলল, "বল্‌, আমার ঘোড়া কোথায়?"

আইভান মিরোনভ দোষ অস্বীকার করল। স্তেপান প্রচণ্ড জোরে তার মুখে একটা ঘুষি মারল; তার নাক ভেঙে রক্ত ঝরতে লাগল।

"সত্যি কথা বল্‌, নইলে তোকে খুন করে ফেলব!"

আইভান মিরোনভ চুপ করে রইল। ঘুষি এড়াবার জন্য মুখ নীচু করল। লম্বা হাত বাড়িয়ে স্তেপান তাকে আরও দুটো ঘুষি মারল। আইভান মিরোনভ তবু চুপ।

"সকলে মিলে ওকে মার!" বেলিফ চীৎকার করে বলল। জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। মাটিতে পড়ে গিয়ে আইভান মিরোনভ চেঁচিয়ে বলল, "সব শয়তান, বনের পশু সব, ইচ্ছা হয় আমাকে মেরে ফেল। আমি তোমাদের ভয় করি না!"

একটা পাথর তুলে নিয়ে স্তেপান এত জোরে সেটা ছুঁড়ে মারল যে আইভান মিরোনভের মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

১৫

আইভান মিরোনভের খুনীদের বিচারের জন্য আনা হল। স্তেপান পেলাগুশ্‌কিন তাদের মধ্যে একজন। তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ; সব সাক্ষীই

বলল যে তার হাতের পাথরেই আইভান মিরোনভের মাথা ভেঙেছে। সে কিন্তু আদালতে কিছুই লুকল না। সে জানাল, ঘোড়া দুটি চুরি হলে সে পুলিশকে খবর দিয়েছিল। তখন চেষ্টা করলে ঘোড়ার হদিস করা সহজ হত। কিন্তু পুলিশ অফিসার তাকেও খোঁজ করতে দিল না, বা সেই মর্মে হুকুমও জারি করল না।

"এ রকম লোককে নিয়ে আর কিছুই করা যায় না। সে আমাদের সকলকে পথে বসিয়েছে।"

"কিন্তু অন্যরা তো তাকে মারে নি। কেবল তুমিই তার মাথা ভেঙেছ।"

"মিথ্যা কথা। সকলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আমি কেবল চরম আঘাতটা করেছি। একটা লোককে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে মেরে কি লাভ হত?"

এমন আশ্চর্য শান্তভাবে স্তেপান পুরো ঘটনাটার বর্ণনা দিল যে জজরা অবাক হয়ে গেল। তাকে মাত্র এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হল। তার গা থেকে চাষীর পোশাক খুলে নিয়ে তাকে পরিয়ে দিল কয়েদির পোশাক।

তার স্ত্রী কারাগারে আসত তার সঙ্গে দেখা করতে। স্বামীহারা হয়ে বেচারি খুবই কষ্টে পড়েছে। তার বাড়িটাও পুড়িয়ে দিয়েছে। ছেলেমেয়ে নিয়ে তাকে ভিক্ষা করতে হচ্ছে। এতে স্তেপানের রাগ আরও বেড়ে গেল। সে সকলের সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করতে লাগল। একদিন তো কুড়ুল নিয়ে রাঁধুনিকে মারতেই গিয়েছিল। সেজন্য তার কারাবাসের মেয়াদ আরও এক বছর বেড়ে গেল। সেই বছরেই খবর এল, তার স্ত্রী মারা গেছে। বাড়ি তো আগেই গেছে।

কারাবাসের মেয়াদ পূর্ণ হলে জেলের পোশাক বদলে তাকে তার নিজের পোশাকটা বের করে দেওয়া হল।

সেই পুরনো পোশাক পরে সে কারাধ্যক্ষকে শুধাল, "এখন আমি কোথায় যাব?"

"কেন, বাড়ি।"

"আমার বাড়ি নেই। আমাকে পথে নামতে হবে। ডাকাতি তো ভাল কাজ নয়।'

"তাহলে তো তোমাকে আবার এখানেই আসতে হবে।"

"সেটা সঠিক করে বলতে পারি না।"

কারাগার থেকে বেরিয়ে স্তেপান বাড়ির পথই ধরল। যাবার মত আর কোন জায়গা তার নেই।

পথে রাতের বিশ্রামের জন্য একটা সরাইখানায় থামল। ভ্লাদিমির নামক

শহরের একটি পেটমোটা লোক সরাইয়ের মালিক। সে স্তেপানকে চিনত, সব জানত, তবু রাতের মত আশ্রয় দিতে আপত্তি করল না। লোকটি ধনী। এক প্রতিবেশীর স্ত্রীকে ফুঁসলে এনে তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করে।

সে রাতে সরাইখানায় আর কোন যাত্রী ছিল না। স্তেপানকে শুতে দেওয়া হল রান্নাঘরে। মাত্রেনা—স্ত্রীলোকটির নাম—টেবিল পরিষ্কার করে তার ঘরে চলে গেল। স্তেপান বড় স্টোভটার উপর শুয়ে পড়ল, কিন্তু ঘুমতে পারল না। তার কেবলি মনে পড়তে লাগল মালিকের কোমরবন্দের নীচ থেকে বেরিয়ে-আসা ভুঁড়িটার কথা। ভুঁড়িটার মধ্যে একটা ছুরি বসিয়ে দিলে কেমন হয়! আর স্ত্রীলোকটির পেটেও। একবার ভাবল কালই এখান থেকে চলে যাবে! কিন্তু খুনের চিন্তাটাকে কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারল না।
"মারতেই হবে, এবং দুজনকেই!"

দ্বিতীয়বার মোরগের ডাক শুনতে পেল।" কাজটা এখনই সারতে হবে, নইলে ভোর হয়ে যাবে।" ঘুমতে যাবার আগেই একটা ছুরি ও কুড়ুল চোখে পড়েছিল। স্টোভ থেকে নেমে সেই দুটো অস্ত্র হাতে নিয়ে রান্নাঘর থেকে বের হল। সেই মুহূর্তে ফটকের তালা খোলার শব্দ হল। সরাইখানার মালিক বেরিয়ে যাচ্ছে। এরকম তো কথা ছিল না। ছুরিটা কাজে লাগাবার সুযোগ আর পাওয়া গেল না। দূর থেকে কুড়ুলটা ছুঁড়ে মেরেই মালিকের মাথাটা দুই ভাগ করে দিল। লোকটি চৌকাঠের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে মাটিতে গড়িয়ে গেল।

স্তেপান শোবার ঘরে ঢুকল। মাত্রেনা লাফিয়ে উঠে খাটের পাশেই দাঁড়িয়ে পড়ল। একই কুড়ুল দিয়ে স্তেপান তাকেও খুন করল।

তারপর মোমবাতি জ্বালিয়ে দেরাজ থেকে টাকাকড়ি বের করে নিয়ে বাড়ি থেকে চলে গেল।

১৬

একটা ছোট জেলা শহরে অন্য সব বাড়িঘর থেকে কিছুটা দূরে প্রাক্তন অফিসার এক বৃদ্ধ দুই মেয়ে ও এক জামাইকে নিয়ে বাস করত। লোকটি নেশা করত। বিবাহিতা মেয়েটিও নেশা করত এবং খারাপ জীবনযাপন করত। পঞ্চাশ বছর বয়স্কা বড় মেয়ে মারিয়া সেমিনভ্‌নাই গোটা সংসারটা চালাত; সে বার্ষিক দুশ' পঞ্চাশ রুবল পেন্সন পেত, আর তাতেই সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন চলত। মারিয়া সেমিনভ্‌না বাড়ির সব কাজ করে, দুর্বল মাতাল বাবার দেখাশুনা করে, ছোট বোনের ছেলেকে দেখে, এবং পরিবারের রান্না ও কাপড়-কাচার ব্যবস্থা করে। বেচারি বাড়ির সব কাজ করে, আবার বাকি তিনজন মানুষের বকুনি খেয়েও মরে। ভগ্নিপতিটি তো মাতাল অবস্থায়

তাকে মারধোরও করে। সে কিন্তু নীরবে সব সহ্য করে নিজের অভাব না মিটিয়ে গরিবদের সাহায্য করে, তাদের পোশাক-আষাক দেয়, প্রাণপণে অসুস্থ লোকের সেবা করে।

একবার অথর্ব, বৃদ্ধ, খোঁড়া গ্রাম্য দর্জিটি মারিয়া সেমিনভ্‌নার বাড়িতে কাজ করতে এসেছিল। বুড়ো বাবার কোট ও মারিয়া সেমিনভ্‌নার লোমের কুর্তাটা মেরামত করতে সে এসেছিল।

খোঁড়া দর্জিটি খুব চালাক-চতুর; সব দিকেই তার নজর। জীবনে অনেক মানুষ সে দেখেছে। মারিয়া সেমিনভ্‌নাকে দেখে সে খুব অবাক হল। সাতদিন সে-বাড়িতে থেকে কাজ করার পরে মারিয়া সেমিনভ্‌না একদিন রান্না ঘরে ঢুকে দর্জিকে সেখানে বসে কাজ করতে দেখে কাজকর্ম কেমন চলছে জানতে চাইল। বুড়ো দর্জি কথাপ্রসঙ্গে জানাল, তার ভাই তার প্রতি দুর্ব্যবহার করায় তাকে ছেড়ে এখন সে নিজের জমিতে আলাদা বাস করে।

বলল, "ভেবেছিলাম এভাবে অবস্থা ফেরাতে পারব, কিন্তু যে গরিব সেই গরিবই আছি।"

মারিয়া সেমিনভ্‌না বলল, "অদল-বদল না করে জীবন যেভাবে আসে সেইভাবে তাকে গ্রহণ করাই ভাল।"

খোঁড়া দর্জি বলল, "তোমাকে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই মারিয়া সেমিনভ্‌না। বাড়িতে একমাত্র তুমিই কাজ কর, সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর, কিন্তু কেউ তার প্রতিদান দেয় না।"

মারিয়া সেমিনভ্‌না একটা কথাও বলল না।

"আমি জোর গলায় বলতে পারি তুমি পুঁথিপত্রে নিশ্চয় পড়েছ যে এখানে ভাল কাজ করলে আমরা স্বর্গে গিয়ে তার পুরস্কার পাই।"

"তা তো জানি না। তবে যথাসাধ্য ভাল কাজ করাই আমাদের কর্তব্য।"

"পুঁথিতে কি তাই লেখা আছে?"

"তাও আছে," বলে সে তাকে "সারমন অন্ দি মাউণ্ট" পড়ে শোনাল। দর্জির খুব ভাল লাগল। কাজ শেষ হলে মজুরি নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েও সে মারিয়া সেমিনভ্‌নার কথা ভাবত; সে যা বলেছিল এবং যা পড়ে শুনিয়েছিল—সব।

১৭

চাষীদের সম্পর্কে পিতর নিকলায়েভিচ সভেস্তিজ্‌কির মনোভাব একেবারেই পাল্টে গেছে; চাষীরাও তাকে খারাপ নজরে দেখে। এক বছরের মধ্যে

তারা জঙ্গলের সাতাশটা ওক গাছ কেটে ফেলল, বীমা না-করা একটা গোলা পুড়িয়ে দিল। পিতর নিকলায়েভিচ স্থির করল, এইসব চাষীদের নিয়ে আর চলা যাবে না।

ঠিক সেই সময় লিভেন্তসভ নামক এক জমিদার তার বিষয়-সম্পত্তি দেখার জন্য একজন ম্যানেজারের খোঁজ করছিল। লিভেন্তসভের জমিদারিটা বেশ বড়; কিন্তু তা থেকে কোন আয়ই তার হয় না; সবই চাষীদের ভোগে লাগে। নিজের জমি-জমা অন্য একজনকে ভাড়া দিয়ে পিতর নিকলায়েভিচ ম্যানেজারের চাকরি নিয়ে ত্রীকে সঙ্গে করে ভল্‌গা নদীর তীরবর্তী এক সুদূর অঞ্চলে লিভেন্তসভের জমিদারিতে চলে গেল।

পিতর নিকলায়েভিচ চিরদিনই আইন-শৃংখলার পক্ষপাতী, সে আইনের পথই ধরল। কাঠ চুরির অপরাধে এক চাষীকে কারাগারে পাঠাল; পথ চলতে তার গাড়িকে পথ ছেড়ে না দেওয়ায় এবং টুপি তুলে অভিবাদন না করায় অপর এক চাষীকে চাবুক মারল। যে সব চাষী বে-আইনীভাবে বিতর্কিত ভূমিতে গো-মহিষাদি চড়াত তাদের সে কাজ করতে নিষেধ করে দিল।

কিন্তু বসন্তকাল আসতেই চাষীরা অন্যান্য বছরের মতই জমিদারের মাঠে গরু-মোষ ছেড়ে দিল। পিতর নিকলায়েভিচ উঠোনে কর্মরত মজুরদের পাঠাল সে সব গরু-মোষ ধরে আনতে। চাষীরা তখন মাঠে কাজ করতে চলে গিয়েছিল। মেয়েদের চেঁচামেচিতে কান না দিয়ে পিতর নিকলায়েভিচের লোক-জনরা সব গরু-মোষ মাঠ থেকে ধরে নিয়ে এল। চাষীরা বাড়ি ফিরে সব কথা শুনে দল বেঁধে জমিদারের বাড়িতে গিয়ে গরু-মোষগুলি ফেরৎ চাইল। পিতর নিকলায়েভিচ তখন সবে জমিদারি তদারকির কাজ সেরে বাড়ি ফিরেছে। বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়েই সে তাদের সঙ্গে কথা বলতে বেরিয়ে এল। সে চাষীদের বলল, উপযুক্ত জরিমানা না দিলে কিছুই ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। চাষীরা হৈ-চৈ করে আপত্তি জানাল; বলল, কারণ ভূমিগুলো তাদের সম্পত্তি, কারণ বাপ-দাদার আমল থেকে তারা সেগুলি ব্যবহার করে আসছে; কাজেই তাদের গরু-ছাগলের গায়ে হাত দেবার কোন অধিকার তার নেই।

একটি বুড়ো মানুষ এগিয়ে গিয়ে বলল, "আমাদের গরু-ছাগল ফিরিয়ে দাও, নইলে পরে তোমাকে পস্তাতে হবে।"

"পস্তাতে হবে? কেমন করে?" বলে পিতর নিকলায়েভিচ বুড়োর আরও কাছে এগিয়ে গেল।

"সব ফিরিয়ে দাও শয়তান, আমাদের খুঁচিও না।"

"কী বললি?" চীৎকার করে উঠে পিতর নিকলায়েভিচ বুড়োর গালে একটা চড় কসিয়ে দিল।

"তুমি আমাকে মারলে? বন্ধুরা, এস আমরা জোর করে আমাদের গরু-ছাগল ফিরিয়ে নিয়ে যাই।"

জনতা আরও কাছে এগিয়ে এল। পিতর নিকলায়েভিচ তাদের ভিতর দিয়ে পথ করে এগোতে চাইল। চাষীরা বাধা দিল। সেও এগোতে চেষ্টা করল।

সেই হট্ট-গোলের মধ্যে হঠাৎই তার বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে যাওয়ায় একজন চাষী নিহত হল। সঙ্গে সঙ্গে লড়াই বেঁধে গেল। সকলের পায়ের নীচে চাপা পড়ে পিতর নিকলায়েভিচ মারা পড়ল। পাঁচ মিনিট পরে তার বিকৃত দেহটাকে টেনে নিয়ে খাদের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল।

সামরিক আইনে খুনীদের বিচার হল; দুজনের ফাঁসির হুকুম হল।

১৮

ভরোনেঝ প্রদেশের জেম্‌লিয়ান্স্ক জেলার যে গ্রামে খোঁড়া দর্জি বাস করত সেখানে পাঁচজন ধনী চাষী জমিদারের কাছ থেকে একশ' পাঁচ একর কয়লার মত কালো চাষের জমি ভাড়া নিয়ে একর প্রতি পনেরো থেকে আঠারো রুবল দরে বাকি চাষীদের কাছে লীজ দিয়ে দিল। এতে তাদের প্রচুর টাকা এল; লীজ দেওয়ার পরেও প্রত্যেকের হাতে যে পাঁচ একর করে জমি রইল সেটা প্রায় বিনামূল্যেই তারা পেয়ে গেল। পাঁচজনের মধ্যে একজন চাষী মারা গেলে খোঁড়া দর্জিকে তার জমিটা দেওয়া হল।

যখন জমি ভাগাভাগি শুরু হল তখন দর্জি ভদ্‌কা খাওয়া ছেড়ে দিল, যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল জমিটা কিভাবে ভাগ করা হবে, তখন সে বলল, সব চাষীকে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হোক, এবং জমিদারের কাছ থেকে জমি পেতে যা দাম পড়েছে প্রতি খণ্ড জমির জন্য সেই হিসাবে দাম নেওয়া হোক।

"তা কেন?"

সে বলল, "আমরা কেউ তো নাস্তিক • ই। মালিকরা অন্যায় কাজ করতে পারে, কিন্তু আমরা খাঁটি খৃস্টান।"

ঈশ্বরের বিধান অনুসারেই আমাদের কাজ করতে হবে। সেটাই তো খৃস্টের বিধান।"

"এ আইন তুমি কোথায় পেলে?"

"ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে। রবিবারে এসো। কিছু কিছু পড়ে শোনাব। পরে আলোচনা করা যাবে।"

রবিবার সকলে এল না; তিনজন এল; তাদের কাছেই সে পড়তে লাগল।

সে পড়ল সন্ত ম্যাথুর উপদেশাবলীর পাঁচটি অধ্যায়। তারপর আলোচনা

হল। তাদের মধ্যে মাত্র একজন আইভান চুয়েভ সে শিক্ষা গ্রহণ করল এবং পুরোপুরি কার্যে পরিণত করল। চাষের জমি থেকে সে শুধু তার প্রাপ্য অংশই নিল, তার বেশী নিতে রাজী হল না।

খোড়া দর্জি ও আইভানের কাছে নানা রকম লোক আসতে লাগল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ধর্মগ্রন্থের মর্ম উপলব্ধি করে ধূমপান, মদ্যপান, দিব্যি করা ও খারাপ ভাষা ব্যবহার করা ছেড়ে দিল; একে অন্যকে সাহায্য করতে লাগল। তারা গির্জায় যাওয়া ছেড়ে দিল, পুরোহিতের কাছে গিয়ে দেবমূর্তি ফিরিয়ে দিয়ে জানাল, তাদের আর ওসবের দরকার নেই। পুরোহিত ভয় পেয়ে বিশপকে সব কথা জানাল। বিশপও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে স্থির করল প্রধান পুরোহিত মিজায়েলকে সেই গ্রামে পাঠিয়ে দেবে। এক সময়ে সেই ছিল মিতয়া স্মকোনিকভের ধর্ম-গুরু।

১৯

ফাদার মিজায়েল বিশপের সঙ্গে দেখা করলে সে তাকে সব ঘটনা খুলে বলল। বলল, "আমার লোকজনদের নিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছি। তুমি তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ধর্মের পথে ফিরিয়ে আন।"

ফাদার মিজায়েল বলল, "আপনি যখন আদেশ করছেন, আশীর্বাদ করুন, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।"

বিশপের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় খরচপত্র চেয়ে নিয়ে এবং দরকার হলে যাতে পুলিশের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যায় সেজন্য তার মারফতে প্রদেশের গভর্ণরের একটা হুকুমনামা আনিয়ে ফাদার মিজায়েল নির্দিষ্ট গ্রামের পথে যাত্রা করল।

২০

গ্রামের পুরোহিত ও তার স্ত্রী ফাদার মিজায়েলকে সসম্মানে গ্রহণ করল। পরদিন গ্রামবাসীরা সকলেই গির্জায় হাজির হল। নতুন রেশমী জোব্বা পরে, বুকের উপর একটা বড় ক্রুশ ঝুলিয়ে, লম্বা চুল পরিপাটি করে আঁচড়ে মিজায়েল বেদীতে উঠে গেল; তার পাশে দাঁড়াল পুরোহিত; ডিয়েকন ও গায়কদল দাঁড়াল পিছনে কিছুটা দূরে; দু পাশের দরজায় পুলিশের পাহারা। ধর্মত্যাগীরাও এসেছে ভেড়ার চামড়ার নোংরা কোট পরে।

প্রার্থনার পরে মিজায়েল বক্তৃতা করল। দলত্যাগীদের ভৎর্সনা করে

তাদের মাতৃস্বরূপ গির্জার কোলে ফিরে আসতে বলল; অন্যথায় তাদের যে নরকে গিয়ে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে সে কথাও বলল।

দলত্যাগীরা প্রথমে চুপ করেই ছিল। কিন্তু যখন প্রশ্ন করা হল কেন তারা দল ছেড়েছে, তখন তারা বলল যে গির্জায় কাঠের তৈরী ঈশ্বরকে পূজা করা হয়; অথচ ধর্মগ্রন্থে তার নিন্দা করা হয়েছে।

মিজায়েল যখন জানতে চাইল সত্যি কি তারা মনে করে যে পবিত্র দেবমূর্তিগুলি কাঠের তৈরীমাত্র, তখন চুয়েভ জবাব দিল,—

"যে কোন দেবমূর্তির পিছন দিকটা দেখলেই বোঝা যায় সেগুলি কিসের তৈরী।"

মিজায়েল রেগে তাদের ভয় দেখাল, কর্তৃপক্ষ তাদের শাস্তি দেবে। তারা জবাব দিল: বলাই তো আছে, আমাকে যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছে, তোমরাও তাই পাবে।

সব আলোচনা নিষ্ফল হল। সব কিছুই হয় তো ভালয় ভালয় শেষ হত, কিন্তু পরদিন মিজায়েল তার বক্তৃতায় বলল, "ধর্মানুরাগীদের যারা ফুঁসলিয়ে দল ছাড়িয়েছে তারা খুব খারাপ প্রকৃতির মানুষ; তাদের কঠিন শাস্তি পাওয়া উচিত।"

গির্জা থেকে বেরিয়ে এসে চাষীরা ভীষণ চটে গেল। দল বেঁধে চুয়েভের কুটিরে গিয়ে তারা জানাল, এই লোকগুলিকে আচ্ছা করে ধোলাই দেওয়া দরকার।

কুটিরে প্রায় জনবিশেক নরনারী সমবেত হল। সন্ধ্যা হয়ে গেল, তবু তারা উঠল না। কি করা হবে সে বিষয়েও সকলে একমত হতে পারল না। দর্জি বলল, "আমাদের প্রতি যাই করা হোক আমরা সহ্য করব, বাধা দেব না।" চুয়েভ বলল, "সে পথে গেলে ওরা সকলকেই পিটিয়ে মেরে ফেলবে।" শেষ পর্যন্ত একটা লোহার শিক নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। চাষীদের আক্রমণ করে সে একজনের চোখটা উপড়ে ফেলল। সেই অবসরে যারা তার বাড়িতে সমবেত হয়েছিল তারা কোন রকমে বাড়ি ফিরে গেল।

চুয়েভকে কারাগারে পাঠানো হল; রাজদ্রোহ ও ঈশ্বরের অমর্যাদার অভিযোগ আনা হল তার বিরুদ্ধে।

২১

এই সব ঘটনার দু'বছর আগে কাতিয়া তুর্চানিনভা নামে পাশ্চাত্য চেহারার একটি বলিষ্ঠ ও সুন্দরী তরুণী ডন সামরিক উপনিবেশ থেকে সেন্ট পিতার্সবুর্গে এল মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে। সেই শহরে সিম্বার্স্ক প্রদেশের জেলা-

গভর্ণরের ছেলে তুরিন নামক একটি ছাত্রের সঙ্গে তার দেখা হয় এবং সে তার প্রেমে পড়ে। কিন্তু সেটা সাধারণ ভালবাসা নয়, আর ছাত্রটির স্ত্রী এবং তার সন্তানের মা হবার কোন বাসনাই তার ছিল না। ছাত্রটিও ছিল তার কমরেড; দুজনের মিলনের প্রধান বন্ধন ছিল প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং সেই ব্যবস্থার যারা প্রতিনিধি তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব এবং তীব্র বিদ্বেষ। আরও এক বিষয়ে দুজনের মধ্যে মিল ছিল: দুজনই মনে করত যে সংস্কৃতি, মস্তিষ্ক, ও নীতি বোধের দিক থেকে শত্রুপক্ষের চাইতে তারা অনেক বড়। কাতিয়া তুর্চামিনভা ছিল প্রতিভার অধিকারী; তার স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। সে পরীক্ষায় ভাল ফল করত, আর সব নতুন বই পড়ে ফেলত। তার স্থির বিশ্বাস ছিল, সন্তানের জন্মদান ও লালন-পালন তার কাজ নয়; এমন কি সে কাজকে সে ঘৃণা করত। সে মনে করত, যে শাসন-ব্যবস্থা জাতির শ্রেষ্ঠ প্রতিভাকে শৃংখলিত করে রেখেছে তাকে ধ্বংস করে জনতার সম্মুখে এক মহত্তর জীবনের মান তুলে ধরতে সে নিয়তি-নির্দিষ্ট। সে সুন্দরী, সবলা; গায়ের রং ফর্সা, ঝকঝকে দুটি কালো চোখ, এক ঢাল কালো চুল।

এতসব বিপ্লবাত্মক ধারণা মাথায় থাকা সত্ত্বেও কাতিয়া তুর্চানিনভার অন্তরে বাস করত একটি করুণাময়ী মেয়ে; অপরের কল্যাণ ও সুখের জন্য নিজেকে বলি দিতে সে সদাই প্রস্তুত; কোন শিশু, বৃদ্ধ, বা অন্য কোন প্রাণীর প্রতি দয়া দেখাতে পারলেই সে আন্তরিকভাবে সুখী হত।

ভলগা নদীর তীরবর্তী একটা ছোট শহরের স্কুলের শিক্ষয়িত্রী এক বান্ধবীর কাছে সে গ্রীষ্মকালে ছুটি কাটাতে গেল। সেই শহরের কাছেই বাবার জমিদারিতে বাস করত তুরিণ। সে প্রায়ই মেয়ে দুটির কাছে আসত; পরস্পর বই দেওয়া-নেওয়া করত, দীর্ঘ আলোচনা প্রসঙ্গে দেশের বর্তমান অবস্থায় ক্ষোভ প্রকাশ করত। তাদের বন্ধু জেলার ডাক্তারও মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে যোগ দিত।

লিভেন্ত্‌সোভের যে জমিদারি পরিচালনার ভার পড়েছিল পিতর নিকলায়েভিচের উপরে তার পাশাপাশিই তুরিনদের জমিদারি অবস্থিত। পিতর নিকলায়েভিচ সেখানে এসে জোর করে শৃংখলা আনার চেষ্টা করার পরেই তুরিণ লক্ষ্য করল যে সেখানকার চাষীদের মধ্যে স্বাধীনতার একটা মনোভাব আছে, নিজেদের স্বাধিকার রক্ষায় তারা কৃতসংকল্প। সে প্রায়ই সেই গ্রামে গিয়ে সেখানকার লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলত; সেখানেই তার সমাজ-তান্ত্রিক ধারণাগুলি, বিশেষ করে জমির জাতীয়করণের ধারণা গড়ে উঠতে লাগল।

পিতর নিকলায়েভিচ খুন হলে খুনীদের যখন বিচারের জন্য পাঠানো হল, তখন ছোট শহরটির বিপ্লবী দলের রক্ত ক্ষোভে টগবগ করতে ফুটতে লাগল;

প্রকাশ্যে সে ক্ষোভ প্রকাশ করতেও সে দ্বিধা করল না। বিচার চলাকালেই তুরিণের গ্রামে গ্রামে ঘোরা এবং ছাত্রদের মধ্যে তার প্রচারকার্যের কথা কর্তৃপক্ষ জানতে পারল। তার বাড়ি খানাতল্লাসী করে পুলিশ কিছু বিপ্লবী কাগজপত্র পেল; ফলে তাকে গ্রেপ্তার করে সেণ্ট পিতার্সবুর্গের কারাগারে পাঠানো হল।

কাতিয়া তুর্চানিনভাও তার পিছনে পিছনে রাজধানী শহরে গেল এবং তার সঙ্গে দেখা করতে কারাগারেও গেল। সেদিন দেখা করার অনুমতি না দিয়ে তাকে অন্য এক দিন যেতে বলা হল। নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হলে তুরিণকে দেখার অনুমতি এবং ডুটো জালের ভিতর দিয়ে তার সঙ্গে কথা বলার অনুমতি তাকে দেওয়া হল। এতে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তার ক্ষোভ আরও বেড়ে গেল। তুরিণের মামলার ভারপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারটির সঙ্গে দেখা করার পরে তার মনের বৈপ্লবিক অনুভূতি তীব্রতর আকার ধারণ করল। সুদর্শন অফিসারটি তাকে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিতে রাজী হল, অবশ্য বিনিময়ে চাইল তার ভালবাসা। বিরক্ত হয়ে সে পুলিশের প্রধান কর্তার কাছে আবেদন করল। সেও অক্ষমতার ভান করে জানাল, মন্ত্রীর কাছ থেকে যে হুকুম আসবে তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে বাধ্য। সাক্ষাৎকারের অনুমতি চেয়ে সে মন্ত্রীর কাছে দরখাস্ত পাঠাল; সে দরখাস্ত ফেরৎ এল।

তখন একটা চরম ব্যবস্থা নেওয়ার সংকল্প করে সে একটা রিভলবার কিনল।

২২

নির্দিষ্ট সময়েই মন্ত্রী সকলের কাছ থেকে দরখাস্ত গ্রহণ করছিল। তিনজনের সঙ্গে অনবরত বকবক করে গেল। এমন সময় একটি সুন্দরী তরুণী দরখাস্ত হাতে নিয়ে এগিয়ে এল। দরখাস্তধারিণীর সুন্দর মুখ দেখে মন্ত্রীর চোখ চকচক করে উঠল। কিন্তু নিজের পদমর্যাদার কথা ভেবে সে গম্ভীর হয়ে গেল।

তরুণীর কাছে নেমে এসে শুধাল, "তুমি কি চাও?" তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তরুণীটি অতি দ্রুত জোব্বার ভিতর থেকে একটা রিভলবার বের করে মন্ত্রীর বুক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল—কিন্তু গুলি তার বুকে লাগল না।

তার হাত চেপে ধরতে মন্ত্রী ছুটে গেল, কিন্তু তরুণী তাকে এড়িয়ে কয়েক পা পিছিয়ে দ্বিতীয়বার গুলি করল। মন্ত্রী দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তরুণী ধরা পড়ল। সে ভীষণভাবে কাঁপতে লাগল, একটা কথাও বলতে পারল না; তারপরেই হঠাৎ সে পাগলের মত হো-হো করে হেসে

উঠল। গুলিতে মন্ত্রী আহতও হয় নি।

তরুণী কাতিয়া তুর্চানিনভা। তাকে হাজতে রাখা হল। নানা জনের কাছ থেকে, এমন কি স্বয়ং সম্রাটের কাছ থেকেও মন্ত্রীর কাছে অভিনন্দন-বার্তা আসতে লাগল। এই হত্যা-চেষ্টার ষড়যন্ত্রের তদন্ত করতে একটা কমিশন নিয়োগ করা হল। আসলে এর পিছনে কোন ষড়যন্ত্রই ছিল না, তবু পুলিশ অফিসার ও গোয়েন্দারা সেই অলীক ষড়যন্ত্রের সূত্র আবিষ্কার করতে উঠে-পড়ে লেগে গেল।

মন্ত্রীটি ভাল স্বভাবের মানুষ; সুন্দরী তরুণীটির জন্য সে আন্তরিক দুঃখিত হল। কিন্তু নিজ কর্তব্যে সে অটল। তুরিণের বন্ধুরা একটা বল-নাচের আসরে তরুণীটির প্রতি মন্ত্রীর মনে করুণা জাগাবার চেষ্টা করায় সে বলল, "অসহায় মেয়েটি মুক্তি পাক সেটা আমি চাই, কিন্তু তোমরা তো জান কর্তব্য বলে একটা কথা আছে।" ওদিকে কাতিয়া তুর্চানিনভা কারাগারে বন্দী হয়ে আছে। সে কখনও শান্ত থাকে, বইপত্র যা পায় তাই পড়ে। আবার কখনও ভয়ংকর রাগে ফেটে পড়ে, পাগলের মত চীৎকার করে দেয়ালে ঘুষি মারতে থাকে।

২৩

একদিন কোষাধ্যক্ষের আপিস থেকে পেন্সন নিয়ে ফিরবার পথে মারিয়া সেমিনভ্না্র সঙ্গে তার এক স্কুল-শিক্ষক বন্ধুর দেখা হয়ে গেল।

পথের অপর দিক থেকে স্কুল শিক্ষকটি হাঁক দিয়ে বলল, "শুভদিন মারিয়া সেমিনভ্না! টাকা পেলে?"

"পেয়েছি; তবে বেশী তো নয়, কোন রকমে পেটটা চলে।"

"গুড-বাই।" বলে শিক্ষকটি চলে যেতেই মারিয়া সেমিনভ্না একটি ঢ্যাঙা লোকের মুখোমুখি হল। তার হাত দুটি খুব লম্বা, আর চোখের দৃষ্টি কঠিন। বাড়িতে পৌঁছে লোকটিকে পুনরায় দেখতে পেয়ে সে চমকে উঠল। লোকটি তার পিছু নিয়েছে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে লোকটি মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

প্রথমে মারিয়া সেমিনভ্না একটু ভয় পেল। কিন্তু বাড়িতে ঢুকে বাবাকে ও বোন-পোকে উপহারগুলো দিয়ে কুকুরটাকে আদর করতে করতেই ভয়ের কথা ভুলে গেল। বাবার হাতে টাকাটা দিয়ে কাজে মন দিল।

যে লোকটির সঙ্গে সে মুখোমুখি হয়েছিল সে স্তেপান।

সরাইওয়ালাকে খুন করার পরে সে আর শহরে ফিরে যায় নি। কী আশ্চর্য, খুনটা করার জন্য তার মনে এতটুকু দুঃখ নেই। পরদিন বার বার সেই খুনের কথাটাই মনে পড়তে লাগল; আর কাজটা বেশ নিপুণ হাতে করতে

পেয়েছে বলে সে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে লাগল। একটা সরাইখানায় চা খেয়ে পরিচিত এক গাড়োয়ানের বাড়ি গেল রাতটা কাটাবে বলে। গাড়োয়ান বাড়ি ছিল না। তার অপেক্ষায় বসে থেকে সে গাড়োয়ানের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে লাগল। কিন্তু স্ত্রীলোকটি স্টোভের কাছে যেতে তার দিকে পিছন ফিরতেই তার মনে হল তাকেও খুন করবে। প্রথমে সে অবাক হয়ে মাথা নাড়াল, কিন্তু পরমুহূর্তেই বুটের ভিতর লুকনো ছুরিটা বের করে স্ত্রীলোকটিকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে গলাটা কেটে ফেলল। ছেলে-মেয়েরা কাঁদতে শুরু করলে তাদেরও খুন করে সেখান থেকে চলে গেল। সেই রাতেই শহরও ছাড়ল। বেশ কিছু দূরের এক গ্রামের সরাইখানায় রাতটা কাটাল। পরদিন জেলা শহরে পৌঁছে পথে স্কুল-শিক্ষকের সঙ্গে মারিয়া সেমিনভ্‌নার কথাগুলি শুনেই সে মনস্থির করে ফেলল, টাকাগুলি চুরি করতে হবে। রাত নেমে এলে সে তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকল। বিবাহিতা ছোট মেয়েই প্রথম তার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে চীৎকার করে উঠল। তার স্বামী জেগে উঠে স্তেপানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলা চেপে ধরল। কিন্তু স্তেপান অনেক বেশী শক্তিশালী ; সহজেই স্বামীটিকে কাবু করে ফেলল। তাকে খুন করে স্তেপান উত্তেজিতভাবে পাশের ঘরে ঢুকল। সেটা মারিয়া সেমিনভ্‌নার শোবার ঘর। বিছানায় উঠে বসে ঈষৎ ভয়চকিত চোখে স্তেপানের দিকে তাকিয়ে সে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল।

তার চোখ দেখে স্তেপান ভয় পেল। চোখ নামিয়ে নিল। মুখ না তুলেই বলল, "তোমার টাকাটা কোথায় ?"

মেয়েটি জবাব দিল না।

ছুরিটা দেখিয়ে স্তেপান আবার বলল, "টাকাটা কোথায় ?"

"কি করে তুমি..." মেয়েটি বলল।

"কি করে তা এখনি দেখতে পাবে।"

তার হাত দুটি চেপে ধরার জন্য স্তেপান মেয়েটির আরও কাছে এগিয়ে গেল ; কিন্তু মেয়েটি হাতও তুলল না, বাধাও দিল না ; হাত দুটি বুকের উপর চেপে ধরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

চেঁচিয়ে বলল, "ওঃ, এ কী মহাপাপ ! কেমন করে তুমি পার। ...নিজেকে করুণা কর। কারও আত্মাকে ধ্বংস করা ..তার চাইতেও খারাপ তোমার নিজের আত্মাকে...।"

মেয়েটির কণ্ঠস্বর স্তেপান আর সহ্য করতে পারল না ; হাতের ছুরিটা তার গলায় বসিয়ে দিল। বলে উঠল, "বক্‌-বক্‌ থামাও।" কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠেই মেয়েটি পড়ে গেল ; রক্তে বালিশ ভিজে গেল। লোকটি ঘরের চারদিকে ঘুরে যা কিছু পেল তুলে নিল। তারপর দামী জিনিসগুলি একটা পুটুলিতে বেঁধে একটা সিগারেট ধরাল, কিছুক্ষণ বসে রইল, তারপর

পোশাকটা ঝেড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু রাতের মত একটা আশ্রয় যোগাড় করার আগেই হঠাৎ সে এত ক্লান্ত বোধ করল যে আর হাঁটতে পারল না। একটা নর্দমার মধ্যে নেমে বাকি রাতটা সেখানে শুয়েই কাটাল; তারপরের দিন ও রাতও সেইভাবেই কাটল।

দ্বিতীয় পর্ব

১

যতক্ষণ নর্দমায় শুয়েছিল ততক্ষণই স্তেপানের চোখের সামনে অনবরত ভেসে উঠছিল মারিয়া সেমিনভ্‌নার শুকনো, সদয়, ভয়ার্ত মুখখানি; তার কণ্ঠস্বরও যেন শুনতে পাচ্ছিল। যা কিছু ঘটেছে বার বার তারই ছবি তার চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল। ভয়ে সে চোখ বুজল, চুলে ভর্তি মাথাটা নাড়তে লাগল; যেন এই সব চিন্তা ও স্মৃতিকে মন থেকে মুছে ফেলতে চাইল। কিন্তু কতকগুলি কালো কালো ভয়ংকর মুখ লাল চোখ মেলে তার সামনে হাজির হয়ে অনবরত তাকে ভয় দেখাতে লাগল। মুচকি হেসে বলতে লাগল, "তুমি মেয়েটিকে শেষ করেছ, এবার নিজেকে শেষ কর, নইলে আমরা তোমাকে ছাড়ব না।" চোখ খুলতেই সে আবার মেয়েটিকে দেখতে পেল, শুনতে পেল তার গলা। আবার চোখ বুজতেই দেখা দিল সেই কালো মুখগুলো। পরদিন সন্ধ্যার দিকে সে উঠে বসল; শরীরে শক্তি নেই, তবু একটা সরাইতে গিয়ে বারবার পানীয় চেয়ে নিল; কিন্তু যতই খাক না কেন কিছুতেই তার নেশা হল না। একটা টেবিলে বসে নিঃশব্দে একটার পর একটা গ্লাস নিঃশেষে গিলতে লাগল।

একজন পুলিশ অফিসার ঢুকল। স্তেপানকে শুধাল, "তুমি কে?"

"আমি সেই লোক যে গতরাতে দত্রৎভোরভের সবগুলি খুন করেছে," সে জবাব দিল।

তাকে গ্রেপ্তার করে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিকটবর্তী থানায় নিয়ে যাওয়া হল। পরদিন পাঠানো হল শহরের কারাগারে। কারাগারের ইন্সপেক্টর তাকে দুর্ধর্ষ পুরনো পাপী বলে চিনতে পারল; যখন শুনল যে এতদিনে সে সত্যিকারের অপরাধী হয়ে উঠেছে তখন কড়া গলায় বলল, "এখানে চুপচাপ থেকো হে। এবার এদিক-ওদিক করলে চাবুক মেরে ঠাণ্ডা করে দেব! পালাবার চেষ্টা করো না—আমার নজর বড় কড়া!"

"পালাবার ইচ্ছা আমার নেই। আমি তো স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছি।"

"চুপ কর! অফিসারের সঙ্গে কথা বলার সময় তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হয়।" চীৎকার করে কথাগুলি বলে ইন্সপেক্টর তাঁর

চোয়ালে একটা ঘুষি মারল।

ঠিক সেই মুহূর্তে স্তেপান আবার সেই নিহত স্ত্রীলোকটিকে চোখের সামনে দেখতে পেল; তার গলাও শুনতে পেল; ইন্সপেক্টরের কথায় কান দিল না।

মুখের উপর ঘুষিটা পড়তে বলল, "কি হল?"

"ভাগো হিয়াসে! শুনতে না পাওয়ার ভান করো না।"

ইন্সপেক্টর ভেবেছিল, স্তেপান হিংস্র হয়ে উঠবে, অন্য বন্দীদের সঙ্গে কথা বলবে, পালাবার চেষ্টা করবে; কিন্তু সেরকম কিছুই সে করল না। যখনই রক্ষী অথবা ইন্সপেক্টর নিজের দরজার ফুঁটো দিয়ে ভিতরে লক্ষ্য করে তখনই দেখে খড়ভর্তি একটা থলের উপর বসে দুই হাতে মাথাটা ধরে নিজের মনেই ফিস্‌ফিস্‌ করে কি যেন বলছে। বিচারকারী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হলে সে সাধারণ কয়েদীদের মত আচরণ করল না। খুবই অন্যমনস্ক থাকে, কোন প্রশ্নেই কান দেয় না, কিন্তু যখন প্রশ্ন কানে আসে তখন সঠিক জবাবই দেয়; তাতে অনেক সময় ম্যাজিস্ট্রেটই বিব্রত বোধ করে। সবগুলি খুনের ঘটনাই সে খোলাখুলি বলে দিল কোনরকম সংকোচ না করে।

একদিন কারাগার পরিদর্শনের সময় ম্যাজিস্ট্রেট স্তেপানের কাছে জানতে চাইল, তার কোন অভিযোগ আছে কিনা, অথবা তার মনে কোন ইচ্ছা আছে কি না। স্তেপান জানাল, তার কোন ইচ্ছাই নেই, আর এখানকার আচরণ সম্পর্কেও কোন অভিযোগ নেই। ফিরবার পথে সঙ্গী গভর্ণর ইন্সপেক্টরকে বলল, "সত্যি আমি অবাক হয়ে গেছি। প্রায় দু'মাস সে আমাদের এখানে আছে; সৎ ব্যবহারের আদর্শ হিসাবে তাকে তুলে ধরা যেতে পারে। আমার ভয় হচ্ছে সে কোন অপকর্মের মতলব আঁটছে। লোকটা দুঃসাহসী আর অসাধারণ শক্তিশালী।"

কারা-জীবনের প্রথম মাসে সেই যন্ত্রণাদায়ক ছবি তাকে বড়ই কষ্ট দিত। সে তাকিয়ে থাকত ঘরের ধূসর দেয়ালের দিকে; কান পেতে শুনত কারাগারের শব্দ, কয়েদীদের শব্দ, ঘড়ির ঘণ্টার শব্দ, শান্ত্রীর পায়ের শব্দ; কিন্তু সেই সঙ্গে দেখতে পেত স্ত্রীলোকটির সেই সদয় মুখখানি পথের পাশে প্রথম দর্শনেই সে মুখ তার অন্তর জয় করেছিল; শুনতে পেত তার ফিস্‌ফিস্‌ করে বলা করুণ কণ্ঠস্বর: "কারও আত্মাকে ধ্বংস করা....বিশেষ করে নিজের আত্মাকে ধ্বংস করা যে বড়ই খারাপ কাজ।....কেমন করে তুমি পারলে?...."

কিছুক্ষণ পরে সে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যেত; আবার দেখা দিত কালো কালো মুখগুলো। চোখ খুলে রাখুক আর বুজে রাখুক, তারা আসতই। চোখ বুজলে যেন তাদের আরও স্পষ্ট দেখতে পেত। চোখ খুললেই মুহূর্তের জন্য মিলিয়ে গিয়ে তারা আবার আসত, তিন দিক থেকে তাকে ঘিরে ধরত,

ঠোঁট বেঁকিয়ে বার বার বলত: "শেষ করে দাও। শেষ করে দাও। ফাঁসিতে ঝুলে পড়। নিজেকে পুড়িয়ে মার।" সে সব শুনে স্তেপানের সারা শরীর কেঁপে উঠত, যত প্রার্থনা জানা ছিল সব আউড়ে যেত। প্রথম প্রথম তাতে কাজ হত। প্রার্থনা করলেই সারা জীবনের কথা মনে পড়ত; বাবা, মা, গ্রামটা, কুকুর "নেকড়ে"টা, স্টোভের উপর উপবিষ্ট ঠাকুর্দা, যে বেঞ্চিটার উপর ছেলেরা খেলা করত—সব। মনে পড়ত ঘোড়া-চোরদের কথা; যে চোরটাকে সে প্রথম ধরেছিল এবং পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলেছিল তার কথা। তারপর আবার মেয়েটির কথা মনে পড়ায় সে ভয় পেয়ে গেল। কারাগারের কোটটা কাঁধের উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এক লাফে বিছানা থেকে নেমে খাঁচায় বন্ধ বুনো জন্তুর মত ঘরময় পায়চারি করতে শুরু করল। আবারও প্রার্থনা করতে চেষ্টা করল, কিন্তু এখন আর তাতে কোন ফল হল না।

দীর্ঘ রাত্রি নিয়ে হেমন্তকাল এল। একদা সন্ধ্যায় বাতাস যখন পাইপের ভিতর দিয়ে শোঁ শোঁ করে বইতে লাগল তখন অনেকক্ষণ ধরে ঘরময় পায়চারি করে স্তেপান বিছানার উপর বসল। তার মনে হল, সে আর লড়াই করতে পারছে না, কালো দানবরা তাকে পরাস্ত করেছে, এবার তাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। উনুনের ফোঁদলটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। সরু সুতো পাকিয়ে একটা ফাঁস বানিয়ে যদি স্টোভের নবটার সঙ্গে আটকানো যায় তাহলে····। কিন্তু খুব নিপুণভাবে কাজটা করতে হবে। সে কাজ শুরু করে দিল, যে সুতোর বস্তার উপর সে ঘুমত তা থেকে সুতো খুলে শক্ত ফিতে বানাতেই দুদিন কেটে গেল। যাতে তার ভার সহ্য করতে পারে সেজন্য ফিতেটাকে দু'ভাঁজ করে নিল। সেই ফিতে দিয়ে একটা ফাঁস তৈরী করে সেটা গলায় পরিয়ে বিছানার উপর উঠে ঝুলে পড়ল। কিন্তু তার জিভটা ঠেলে বের হয়ে আসার মুহূর্তে ফিতেটা ছিঁড়ে নীচে পড়ে গেল। শব্দ শুনে রক্ষী ছুটে এল। ডাক্তার ডাকা হল। স্তেপানকে হাসপাতালে আনা হল। পরদিন সে ভাল হয়ে উঠল; তাকে হাসপাতাল থেকে এনে নির্জন একক ঘরের বদলে অন্য বন্দীদের সঙ্গে একত্রে রাখার ব্যবস্থা করা হল।

বিশজনের সঙ্গে এক ঘরে থাকলেও তার মনে হত সে যেন একলা আছে। অন্যের উপস্থিতির কথা তার মনেই পড়ত না, কারও সঙ্গে কথা বলত না, পুরনো যন্ত্রণায় কষ্ট পেত। সকলে ঘুমিয়ে পড়লে সে যখন একেবারেই ঘুমতে পারত না তখনই কষ্টটা হত সব চাইতে বেশী। সেই স্ত্রীলোকটি বারবার দেখা দেয়, কথা বলে; তারপর আবার সেই কালো দানবরা আসে ভয়ংকর চোখ নিয়ে, যথারীতি তাকে যন্ত্রণা দেয়।

আবার সে প্রার্থনা করতে চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। একদিন সকালে ক্লান্ত দেহে বিছানায় এলিয়ে পড়তেই সে ঘুমিয়ে পড়ল; সেই স্ত্রীলোকটি স্বপ্নের মধ্যে তার শীর্ণ, গলা-কাটা দেহ নিয়ে তার সামনে

এসে হাজির হল। স্তেপান বলল, "তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে?" সে কোন জবাব দিল না। "তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে?" বার বার তিনবার সে তাকে একই প্রশ্ন করল। তবু স্ত্রীলোকটি একটিও কথা না বলায় তার ঘুম ভেঙে গেল। সেই থেকে তার যন্ত্রণা কমতে লাগল। চারদিকে তাকিয়ে এই প্রথম সে ঘরের অন্য বন্দীদের সঙ্গে কথা বলল।

৩

কারা-কক্ষে স্তেপানের সঙ্গীদের মধ্যে আছে দারোয়ান ভাসিলি ও চুয়েভ; দু'জনেরই দ্বীপান্তর হয়েছে। ভাসিলি সুরেলা গলায় সারা দিন গান গায়, তার নানা অভিযানের গল্প শোনায়। চুয়েভ সারা দিন কি যেন করে, পোশাক রিপু করে, ধর্মগ্রন্থ পড়ে। পরিষ্কার ভাষায় সকলকে বলে, মানুষের হাতে তৈরী ঈশ্বরকে পূজা করা প্রকৃত বিধান নয়, আত্মা ও সত্যের পূজাই আসল।

স্তেপান বলে, "আর যারা পাপ করেছে তাদের কি হবে?"

"ধর্মগ্রন্থে তার জবাবও লেখা আছে", বলে চুয়েভ ম্যাথু XXV. ৩১ থেকে পড়ে শোনায়।

চুয়েভের পাশেই বসেছিল ভাসিলি। মাথা নেড়ে সে বলে উঠল, "ঠিক। হে অভিশপ্ত পাপীর দল, তোমার অনন্ত শাস্তি ভোগ করগে, কারণ ক্ষুধার্তকে আহার্য না দিয়ে তোমরা নিজেরা তা আত্মসাৎ করেছ। ঠিকই করা হয়েছে। পবিত্র নিকদিমের লেখা আমি পড়েছি।"

স্তেপান মাথা নীচু করে মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। সে বলল, "তারা কি কোন দিন ক্ষমা পাবে না?"

ধর্মগ্রন্থের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে চুয়েভ বলল, "একটু অপেক্ষা কর।" যা খুঁজছিল সেটা পেয়ে একেবারে সাদা হয়ে যাওয়া ধর্মগ্রন্থের পাতাটা হাত দিয়ে সমান করে নিয়ে চুয়েভ পড়তে লাগল।

"তাঁর সঙ্গে"—অর্থাৎ খৃস্টের সঙ্গে—"আর দুর্জন দুষ্কৃতকারীকে মৃত্যুদণ্ডের জন্য নিয়ে যাওয়া হল। কাল্‌ভারি নামক নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে সকলে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করল; দুই দুষ্কৃতকারীকে ডাইনে ও বাঁয়ে রেখে তাদেরও ক্রুশবিদ্ধ করা হল। তখন যীশু বলল—'পিতা, এদের ক্ষমা কর; কারণ এরা জানে না এরা কি করছে।' জনতা দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। শাসনকর্তারা তাকে পরিহাস করে বলল, "সে অন্যদের রক্ষা করেছে, যদি সে ঈশ্বর-নির্বাচিত যীশু হয়ে থাকে তো এবার নিজেকে রক্ষা করুক।' সৈনিকরা তার দিকে ভিনিগার এগিয়ে দিয়ে ঠাট্টা করে বলল, 'তুমি যদি ইহুদিদের রাজা হও তো নিজেকে বাঁচাও!' দুই দুষ্কৃতকারীর একজন তাঁর উপর রাগ করে বলল, 'তুমি যদি

খৃস্ট হও তো নিজেকে ও আমাদের বাঁচাও।' কিন্তু অপর দুষ্কৃতকারী তাকে তিরস্কার করে বলল, 'নিজে শাস্তি পেয়েও কি তুমি ঈশ্বরকে ভয় কর না? আমাদের তো উচিত শাস্তি হয়েছে, কারণ কৃতকর্মের ন্যায্য পুরস্কারই আমরা পেয়েছি; কিন্তু এই লোকটি তো কোন অন্যায় করে নি।' তারপর সে যীশুকে বলল, "প্রভু, যখন তুমি ফিরে আসবে তোমার রাজ্যে তখন আমাকে মনে রেখো।' আর যীশু তাকে বলল, 'আমি তোমাকে যথার্থই বলছি, আজই তুমি আমার সঙ্গে স্বর্গে যাবে।'

স্তেপান কিছুই বলল না। সত্যধর্ম কি তা সে এতক্ষণে বুঝেছে। যারা দরিদ্রকে খাদ্য ও পানীয় দিয়েছে, বন্দীদের সঙ্গে দেখা করেছে, কেবলমাত্র তাদেরই রক্ষা করা হবে; যারা তা করে নি তারা নরকে যাবে।

সেদিন থেকে সে সময় পেলেই চুয়েভের সঙ্গে কাটায়, তাকে প্রশ্ন করে, তার কথা মন দিয়ে শোনে। চুয়েভের কথা থেকে সে খৃস্টের বাণীর একটিমাত্র মূল সত্যই বুঝতে পেরেছে: সব মানুষই ভাই-ভাই; যাতে সকলে সুখী হতে পারে সেজন্য সকলেরই উচিত পরস্পরকে ভালবাসা, দয়া করা। সেই থেকেই স্তেপান যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল।

৪

কারাগারে আসার পর থেকেই স্তেপান খুব বিনীত ও নম্র হয়ে গেছে; আর এখন তার পরিবর্তন দেখে কারা-কর্তৃপক্ষ ও সহ-কয়েদিরা অবাক হয়ে গেছে। বিনা হুকুমেই সে কারাগারের সব চাইতে কঠিন ও নোংরা কাজগুলি যখন-তখন করে। কিন্তু এত বিনীতভাবে থাকা সত্ত্বেও অন্য বন্দীরা তাকে ভয় করে, কারণ তারা জানে সে খুব স্থির-সংকল্পের মানুষ, আর প্রভূত শক্তির অধিকারী।

ইতিমধ্যে দুজন বাউণ্ডুলে লোকের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করার অপরাধে স্তেপানকে তিন দিনের নির্জন কারাবাসের শাস্তি ভোগ করতে হল।

ছেলেবেলায় সে বর্ণ-পরিচয় শেখা শুরু করেছিল, কিন্তু শব্দ-গঠন শিখতে না পারায় নিরক্ষরই থেকে গেছে। এবার সে স্থির করল নতুন করে লেখাপড়া শিখতে শুরু করবে। রক্ষীকে বলল তাকে ধর্মগ্রন্থ এনে দিতে। সেগুলি হাতে পেয়েই সে কাজে বসে গেল। কিন্তু কিছুতেই শব্দ-গঠনটা আয়ত্ত করতে পারল না। তার ঘুম গেল, খাবার ইচ্ছা চলে গেল, মনটা দুঃখে ভরে উঠল।

একদিন রক্ষী বলল, "আচ্ছা, কিছু লিখতে পারলে?"

"না।"

"তুমি কি 'আমাদের পিতা' পড়তে পার?"

"পারি।"

"তা যদি পার তাহলে ধর্মগ্রন্থ থেকে সেটা পড়ে নিও," বলে সে ধর্মগ্রন্থের প্রার্থনার জায়গাটা দেখিয়ে দিল। স্তেপান অক্ষর ধরে ধরে পড়তে শুরু করল।

হঠাৎই শব্দ-গঠনের রহস্যটা তার কাছে উদ্ঘাটিত হল। সে পড়তে শুরু করল। আনন্দ আর ধরে না। সেই সময় থেকেই সে পড়া শিখল, অনেক কষ্টে বানান করে করে শব্দের অর্থবোধও স্পষ্টতর হতে লাগল।

এখন আর একা থাকতে স্তেপানের কষ্ট হয় না। কাজের মধ্যে সে এতই ডুবে গেল যে নির্জন কারা-কক্ষ ছেড়ে সাধারণ ঘরে স্থানান্তরিত হলে সে মোটেই খুশি হল না।

৫

এদিকে যে স্কুলের ছাত্র মাখিন স্মকোনিকভকে কুপন জাল করতে শিখিয়েছিল সে স্কুলের পড়া শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়াও শেষ করেছে। মেয়েরা তাকে বেশ পছন্দ করে, আর একজন উপমন্ত্রীর প্রাক্তন মেয়ে মানুষের সঙ্গে ভাব হওয়ায় অল্প বয়সেই সে ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হয়েছে। সে অনেক অসৎ কাজ করেছে, ঋণ করেছে, জুয়া খেলেছে, অনেক মেয়েমানুষকে ফুঁসলেছে; কিন্তু সে ছিল চতুর, পরিশ্রমী ও উপযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট। যে জেলায় স্তেপান পেলাগুশ্‌কিনের বিচার হচ্ছিল সেখানকার আদালতেই সে নিযুক্ত হল। স্তেপানকে যখন সাক্ষ্য দেবার জন্য প্রথম তার সামনে হাজির করা হল তখন তার আন্তরিক ও শান্ত কথাবার্তা শুনে ম্যাজিস্ট্রেট বিব্রত বোধ করল। নিজের অজ্ঞাতেই কেমন করে তার মনে এই বোধ জন্মাল—যে লোকটিকে শিকলে বেঁধে মাথা মুড়িয়ে দুজন সৈনিকের পাহারায় তার সামনে হাজির করা হয়েছে সে মুক্ত আত্মার অধিকারী, আর তার নিজের চাইতে অনেক—অনেক বড়।

স্তেপানের মুখে তার অপরাধের কাহিনী শুনে মাখিন প্রশ্ন করল, "তাদের জন্য তোমার করুণা হত না?"

"না। তখন আমি তাদের চিনতাম না।"

"আর এখন?"

"এখন আমি জেনেছি যে সব মানুষ ভাই-ভাই।"

"আর আমি? আমিও কি তোমার ভাই?"

"নিশ্চয়।"

"কিন্তু ভাই হয়ে আমি তোমাকে কঠোর সাজা দিচ্ছি এটা কি রকম ব্যাপার?"

"এটা ঘটছে কারণ আপনি জানেন না।"

"কি জানি না।"

"আপনি বিচারক, আর তার মানেই হল আপনি জানেন না।"

"বলে যাও।....তারপর কি ?"

৬

এখন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে সকলকে শোনায় স্তেপান, চুয়েভ নয়। কিছু বন্দী বাজে গান গায়, অন্যরা স্তেপানের পাঠ শোনে, তা নিয়ে আলোচনা করে। দুটি বন্দী সব চাইতে বেশী মনোযোগ দিয়ে শোনে—একজন ভাসিলি, অপর জন মাখোকিন। মাখোকিন নিজে খুনি আর ফাঁসি দেবার জল্লাদও বটে। এই কারাগারে আসার পরেও সে দু'বার ফাঁসি দিতে গেছে এমন সব দূর দূর জায়গায় যেখানে ফাঁসি দেবার লোক পাওয়া যায় না।

যে চাষীরা পিতর নিকলায়েভিচকে হত্যা করেছিল ; তাদের মধ্যে দুজনের ফাঁসির হুকুম হয়েছে ; আর মাখোকিনের উপর হুকুম হয়েছে, পেন্‌জায় গিয়ে তাদের ফাঁসি দিতে হবে। কিন্তু এবার সে যেতে অস্বীকার করে বলল, সে আর কোন দিন জল্লাদের কাজ করবে না।

কারাধ্যক্ষ চেঁচিয়ে উঠল, "আর চাবুক কসালে কি হবে ?"

"তাও সহ্য করতে হবে, কারণ ঈশ্বরের বিধানে কাউকে হত্যা নিষিদ্ধ।"

"এটা বুঝি পেলাগুশ্‌কিনের কাছে শিখেছ ? আচ্ছা এক কারা-পয়গম্বর জুটেছে। সবুর কর। এর মজা দেখাচ্ছি।"

এই ঘটনার কথা শুনে একটি জল্লাদের উপর স্তেপানের কতখানি প্রভাব সেটা বুঝতে পেরে মাখিন খুবই অবাক হয়ে গেল ; উপরওয়ালার আদেশ অমান্য করে নিজের ফাঁসির ঝুঁকি নিয়েও একটি জল্লাদ কর্তব্য পালন করতে অস্বীকার করেছে।

৭

ইরপ্‌কিন-পরিবারের এক সান্ধ্য আসরে উপস্থিত সকলেই মাখিনের সুন্দর গান ও পিয়ানো বাজনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল। সম্প্রতি ঐ পরিবারের দুটি মেয়ের উপরে তার নজর পড়েছে। দুজনই ধনী এবং সুপাত্রী। আলোচনা প্রসঙ্গে মাখিন সেখানে এমন একটি বিচিত্র কয়েদির কাহিনী শোনাল যে একজন জল্লাদের মতিগতি পাল্টে দিয়েছে। কারাগারে স্তেপানের অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপ, তার ধর্মগ্রন্থ পাঠ, অন্য বন্দীদের উপর প্রচুর প্রভাব প্রভৃতি সব কথাই সে সবিস্তারে বর্ণনা করল। পরিবারের ছোট মেয়ে লিসার বয়স আঠারো। এইসব কাহিনী তার মনের উপর প্রচণ্ড প্রভাব

বিস্তার করল। তার একান্ত অনুরোধে মাখিন পেলাগুশ্‌কিনের সব কথাই বলল। স্তেপান সর্বশেষ যে মহিলাটিকে খুন করেছিল, যার নম্র, নত স্বভাব ও নির্ভীকতা খুনীর মনকে কিভাবে জয় করেছিল, যে তার চোখ খুলে দিয়েছিল—তার কথাও সে খুলে বলল।

লিসা এরপ্‌কিন সে রাতে ঘুমতে পারল না। দু'মাস ধরে তার অন্তরে নিয়ত একটা সংগ্রাম চলতে লাগল,—একদিকে উঁচুমহলের জীবনযাত্রা, অন্য দিকে মাখিনের প্রতি আকর্ষণ ও তার চরিত্র-সংশোধনের বাসনা। দ্বিতীয়টিই তার চোখে বড় হয়ে দেখা দিল। বেচারি সেমিনভ্‌নার কথা শোনার পর থেকেই লিসার মনে তার মত হবার আন্তরিক ইচ্ছা জেগেছে। তার ভয় হচ্ছে, মাখিন হয় তো তার অর্থের লোভেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তাই সে স্থির করল, সব সম্পত্তি গরিবদের দেবে, তার সেকথা মাখিনকে জানিয়েও দিল।

মাখিনও তাকে বলে দিল, সে লিসাকেই ভালবাসে, তার টাকাকে নয়। লিসার সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ব্যাপারেও সে তাকে সাহায্য করতে লাগল। সেকাজে যত আত্মনিয়োগ করছে ততই লিসার অধ্যাত্ম উপলব্ধির এক নতুন জগতের সন্ধান সে পাচ্ছে—অথচ আগে সে জগৎ ছিল তার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

৮

সকলেই চুপচাপ। স্তেপান বিছানায় শুয়ে আছে, এখনও ঘুময় নি। ভাসিলি তার কাছে গিয়ে পা ধরে টেনে ফিসফিস করে তার কাছে যেতে বলল। স্তেপান তাই গেল।

ভাসিলি বলল, "আমাকে দয়া কর ভাই; একটু সাহায্য কর।"

"কিসের সাহায্য?"

"আমি কারাগার থেকে পালাব।"

ভাসিলি বলল, "পলাবার সব ব্যবস্থা সে করেছে।"

যার যার বিছানায় ঘুমন্ত বন্দীদের দেখিয়ে বলল, "কাল ওদের খেপিয়ে তুলব। ওরা আমাকে অফিসারের হাতে তুলে দেবে, আর আমাকে পাঠানো হবে দোতলার ঘরে। সেখান থেকে পালাবার পথ আমার জানা। তোমাকে শুধু লাশ-কাটা ঘরের হুড়কোর স্ক্রুটা খুলে দিতে হবে।"

"সেটা করে দিতে পারব। কিন্তু তুমি যাবে কোথায়?"

"যেখানে হোক। সব জায়গাতেই কি যথেষ্ট খারাপ লোক বাস করে না?"

"তা হয় তো করে ভাই। কিন্তু তাদের বিচার করা তো আমাদের কাজ নয়।"

"আমি তো খুনী নই। সারা জীবনে একটি প্রাণীকেও আমি ধ্বংস করি নি। আর চুরি, তার মধ্যে তো আমি কোন ক্ষতি দেখি না। তারাও তো আমাদের অনেক কিছু চুরি করেছে!"

"দরকার হলে সে জন্য তারাই জবাবদিহি করবে।"

এই সময় একটি বন্দী বিছানায় উঠে বসল। স্তেপান ও ভাসিলি আলোচনা বন্ধ করল। পরদিন ভাসিলি পরিকল্পনামত কাজ শুরু করে দিল। রুটি নিয়ে অভিযোগ করে সে বলল রুটি ভেজা; তাদের এই অসন্তোষের কথা জানাতে সে বন্দীদের পাঠাল গভর্ণরের কাছে। গভর্ণর এসে সকলকে গালমন্দ করল, এবং যখন শুনল যে ভাসিলি তাদের খেপিয়েছে তখন তাকেই উপরতলার নির্জন সেলে পাঠাবার হুকুম দিল। ভাসিলি তো সেটাই চেয়েছিল।

৯

উপরতলার সেলটা ভাসিলির খুবই চেনা। মেঝের খবরও সে রাখে; ঘরে ঢুকেই ইটের টুকরোগুলো খুলতে শুরু করল। নীচে নামবার মত জায়গা করে নিয়েই পরের তলার লাশ-কাটা ঘরে লাফিয়ে নেমে পড়ল। সেদিন মাত্র একটা শব টেবিলে পড়েছিল। ঘরের এক কোণে অনেকগুলি বস্তা মজুদ করে রাখা হয়েছে বন্দীদের খড়ের গদি বানাবার জন্য। দরজার হুড়কোর স্ক্রুটা খুলে আবার বসানো ছিল। সেটাকে তুলে নিয়ে দরজাটা খুলে বারান্দা দিয়ে নির্মীয়মান শৌচাগারের দিকে এগিয়ে গেল। শৌচাগারের মধ্যে একটা বড় গর্তের সাহায্যে চারতলার সঙ্গে নীচের তলাটার সংযোগ রাখা হয়েছে। সে আবার লাশ-কাটা ঘরে ফিরে গিয়ে শবদেহের গায়ের চাদরটা তুলে নিল, বস্তাগুলোকে একসঙ্গে বেঁধে একটা লম্বা দড়ির মত বানাল, এবং সেটাকে নিয়ে শৌচাগারে ফিরে গেল। দড়িটাকে কড়িবরগার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে নিজেও সেটা ধরে নীচে নেমে গেল। দড়িটা কিন্তু মাটি পর্যন্ত পৌছল না; কতটা বাকি আছে তাও সে বুঝতে পারল না। যাই হোক, তাকে তো ঝুঁকি নিতেই হবে। কিছুক্ষণ ঝুলে থেকে সে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল। পায়ে খুব আঘাত লাগলেও কোনরকমে হাঁটতে লাগল।

শহরের উপকণ্ঠে বাড়ি। মলানিয়া দরজাটা খুলে দিল। সে ঘরে ঢুকে নানা রংয়ের কাপড়ের টুকরো সেলাই করে তৈরি ছোট কাঁথাটার ভিতরে ঢুকে পড়ল।

পিতর নিকলায়েভিচ খুনের বিচার শুরু হবার একমাস পরে রায় বের হল। বিচারে আটজনের সশ্রম কারাদণ্ড হল, আর দুজনের—একটি সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ, অপরটি জিপ্‌সি বালক—হল ফাঁসির হুকুম।

ফাঁসির হুকুমটা কার্যকর হবে সেই গ্রামেই। এক রবিবারে চাকর মলানিয়া খবর নিয়ে এল ফাঁসি-কাঠ পোঁতা হয়েছে, আর বুধবারেই মস্কো থেকে জল্লাদ এসে যাবে।

পিতর নিকলায়েভিচের স্ত্রী নতালিয়া আইভানভ্‌না বাড়ি থেকে বের হল না; ফাঁসি-কাঠ দেখতেও গেল না।

মঙ্গলবারে গ্রাম্য কনেস্টবল নতালিয়া আইভানভ্‌নার সঙ্গে দেখা করতে এল। সে পরিবারের বন্ধু, তাই মহিলা তাকে ভদ্‌কা ও ব্যাঙের ছাতার তরকারি পরিবেশন করল। কিছুটা মুখে দিয়ে কনেস্টবল জানাল, পরদিন ফাঁসি হচ্ছে না।

"কেন?"

"সে এক আশ্চর্য ঘটনা। কোন জল্লাদ পাওয়া যাচ্ছে না। আমার ছেলে বলছে, মস্কোতে একজনকে পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু সে ইদানিং প্রচুর ধর্মগ্রন্থ পড়ছে; বলেছে: "আমি খুন করতে পারব না।" খুনের অপরাধেই কিন্তু তার কঠোর সাজা হয়েছে, অথচ এখন আইনের নির্দেশ সত্ত্বেও সে কাউকে ফাঁসি দিতে রাজী নয়। চাবুকের ভয় দেখানো হয়েছিল; তাতে সে বলেছে, "তোমরা আমাকে চাবুক মারতে পার, কিন্তু একাজ আমি কিছুতেই করব না।"

হঠাৎ নতালিয়া আইভানভ্‌নার মাথায় একটা নতুন চিন্তা এল। তার মাথা লাল ও গরম হয়ে উঠল।

"মৃত্যুদণ্ড কি এখন মকুব করানো যায় না?"

"তা কি করে যাবে? এটা তো বিচারকদের রায়। দণ্ড মকুবের ক্ষমতা আছে একমাত্র জারের।"

"কিন্তু জার জানবে কেমন করে?"

"তার কাছে আবেদন করার অধিকার সকলেরই আছে।"

"কিন্তু আমার জন্যই তো তারা মরতে চলেছে। আমি তাদের ক্ষমা করলাম।"

কনেস্টবল হেসে বলল, "বেশ তো—জারের কাছে একটা দরখাস্ত পাঠাও।"

"আমি পাঠাতে পারি?"

"নিশ্চয় পার।"

"কিন্তু খুব দেরী হয়ে যায় নি তো?"

"তার করে দাও।"

"স্বয়ং জারের নামে?"

"হ্যা, জারের নামে।"

জল্লাদ কর্তব্য পালন করতে অস্বীকার করেছে, তার জন্য চাবুক খেতেও রাজী হয়েছে,—এ কথা শুনে নতালিয়া আইভানভ্‌নার মনটা হঠাৎ বদলে গেছে। বলল, "বন্ধু ফিলিপ ভাসিলেভিচ, আমার হয়ে টেলিগ্রামটা লিখে দাও।"

কনেস্টবল ভাবল, "কী দয়ালু নারী। খুবই কোমলহৃদয়া, আমার স্ত্রীর যদি এ রকম হৃদয় হত, তাহলে আমাদের জীবনে স্বর্গ নেমে আসত। তার বদলে এখন—"। সে টেলিগ্রামটা লিখল,—

"ইম্পিরিয়াল ম্যাজিস্টি সম্রাট সমীপেষু, চাষীদের হাতে নিহত পিতর নিকলায়েভিচ স্ভিস্তুজ্‌কির বিধবা পত্নী ইয়োর ম্যাজেস্টির অনুগত প্রজা ইয়োর ইম্পিরিয়াল ম্যাজেস্টির পবিত্র চরণযুগলে আবেদন করিতেছে যে অমুক প্রদেশ, জেলা ও গ্রামের অমুক অমুক চাষীদের—যাদের মৃতুদণ্ড দেওয়া হয়েছে—মুক্তি দেওয়া হোক।"

কনেস্টবল নিজেই টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দিল; নতালিয়া আইভানভ্‌নাও স্বস্তি পেল, সুখী হল। তার ধারণা হল, নিহত লোকটির বিধবা স্ত্রী হয়ে সে যখন খুনীদের ক্ষমা করেছে এবং তাদের মুক্তির জন্য আবেদন করেছে, তখন জার হয় তো আপত্তি করবে না।

১১

লিসা ইরপ্‌কিন একটানা উত্তেজনার মধ্যে দিন কাটাতে লাগল। যত বেশী দিন সে সত্যিকারের খৃস্টানের জীবন যাপন করতে লাগল ততই তার মনে দৃঢ়তর ধারণা জন্মাতে লাগল যে এটাই সত্য পথ, ততই তার মন আনন্দে ভরে উঠল।

তার সামনে তখন দুটো প্রত্যক্ষ লক্ষ্য। একটি মাখিনের চরিত্রের পরিবর্তন; অথবা, তার নিজের ভাষায়, মাখিনের অন্তরনিহিত সৎ ও সদয় স্বভাবটিকে জাগ্রত করে তোলা। অপর লক্ষ্য—সব ধন-সম্পত্তি বর্জন করা। প্রথমে যে যত টাকা চাইত তাকে তত টাকা দান করে সে কাজ শুরু করল। কিন্তু তার বাবা সেটা বন্ধ করে দিল; তাছাড়া রোজ রোজ প্রার্থীর ভিড়ও তাকে বিরক্ত করে তুলল। তখন সে স্থির করল, সন্ত হিসাবে পরিচিত একটি বৃদ্ধকে চিঠি লিখে তাকেই তার সব অর্থ দিয়ে দেবে; সেই

ইচ্ছামত সেটা খরচ করবে। সে কথা শুনে তার বাবা খুব রেগে গেল। প্রচণ্ড কথাকাটাকাটির পরে সে মেয়েকে পাগল, বদ্ধ উন্মাদ বলে গালাগালি দিল; বলল, নিজের এত বড় ক্ষতি করতে সে কিছুতেই দেবে না।

বাবার রাগের ছোঁয়াচ মেয়ের মনেও লাগল। সব সংযম হারিয়ে রাগে কাঁদতে কাঁদতে সেও বাবার প্রতি অত্যন্ত অশোভন আচরণ করল, তাকে অত্যাচারী ও কৃপণ বলে গালাগালি দিল।

পরে সে বাবার কাছে ক্ষমা চাইল। বাবা বলল, মেয়ের কথায় সে কিছু মনে করে নি। কিন্তু মেয়ে বুঝল সে অসন্তুষ্ট হয়েছে; মন থেকে তাকে ক্ষমা করে নি। তাই সে স্থির করল, আসন্ন লেণ্ট উৎসবের সময় সে উপবাস করবে, এবং পুরোহিতের কাছে সব কথা স্বীকার করে তার পরামর্শ চাইবে।

তাদের শহর থেকে কিছুটা দূরে একটা খৃষ্টীয় মঠ ছিল। সেখানে থাকত একটি বুড়ো সন্ন্যাসী। পবিত্র জীবন যাপন, নানা উপদেশ প্রচার, ও ভবিষ্যদ্বাণী, এবং আশ্চর্য সব রোগমুক্তির জন্য সে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছে।

লিসার বাবার কাছ থেকে সন্ন্যাসী একটা চিঠি পেল। তাতে মেয়ের সেখানে যাবার কথা ও তার মানসিক উত্তেজনার কথা উল্লেখ করে সন্ন্যাসীকে অনুরোধ করা হয়েছে সে যেন মেয়েটিকে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে বলে, বর্তমান জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন না করে সে যেন সৎ খৃস্টানের জীবন যাপন করেই চলে।

সন্ন্যাসী লিসাকে সাদরে কাছে ডেকে প্রথমে তার বাবার কথাগুলিই তাকে বলল। লিসা নীরবে সব কথা শুনে অশ্রুভরা চোখে বলল, খৃস্ট তো বলেছে বাবা-মাকে ছেড়ে তাকেই অনুগমন করতে। ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে সে খৃস্ট-সম্পর্কে নিজের ধারণার কথা বলল। সন্ন্যাসী মৃদু হাসল। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বারবার বলতে লাগল, "হা ঈশ্বর!" তারপর বলল, "বেশ, কাল স্বীকারোক্তির সময় এসো।"

পরদিন লিসা এলে সন্ন্যাসী তাকে সব বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিল; কোন কারণ না দেখিয়ে তার সম্পত্তি বিলিয়ে দেওয়ায় আপত্তি জানাল।

লিসার পবিত্রতা, তার ঈশ্বরানুরাগ, তার মনের আন্তরিকতা সন্ন্যাসীকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। অনেক দিন থেকেই সে এ জগৎকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে চেয়েছে, কিন্তু পারে নি। লিসা আসার পরেই সে সাধুর জীবন যাপন করতে একটা নির্জন ঘরে চলে গেল, তিন সপ্তাহ গির্জার কোন কাজই করল না। প্রার্থনা অনুষ্ঠানের পরে একটি বক্তৃতায় সে নিজের ও জগতের সব পাপের নিন্দা করে সকলকেই অনুতাপ করতে বলল।

সেদিন থেকে সে প্রতিটি পক্ষে একবার করে প্রচার-বক্তৃতা করতে শুরু করল; তার সেই সব বক্তৃতা শুনতে মানুষের ভিড় ক্রমেই বাড়তে লাগল। প্রচারক হিসাবে তার খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল। তার উপদেশগুলি

ছিল অসাধারণ নির্ভীক ও আন্তরিক ; তাই যে শুনত তার মনেই গভীর রেখাপাত করত।

১২

যে উদ্দেশ্যে ভাসিলি কারাগার ছেড়েছিল সেই কাজই সে করে চলেছে। কয়েকটি বন্ধুর সহায়তায় সে ধনী ব্যবসায়ী ক্রাসনপুজভের বাড়িতে ঢোকে। লোকটি কৃপণ ও চরিত্রহীন। তার লেখার ডেস্ক থেকে ত্রিশ হাজার রুবল বের করে এনে সে যেমন ভাল বুঝেছে খরচ করেছে। পাছে নিজের জন্য টাকাটা খরচ হয় তাই সে মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে ; খরচ করেছে গরিবদের মধ্যে : দরিদ্র মেয়েদের বিয়ে দিতে, ঋণ শোধ করছে ; অথচ কোথাও নিজের নাম প্রকাশ করে নি। পুলিশকেও কিছু ঘুষ দেওয়ায় সে নিরুপদ্রবেই আছে।

আনন্দে তার মনটা গান গেয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত যখন তাকে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য হাজির করা হল তখন সে সগর্বে জানাল, পেট-মোটা ব্যবসায়ীর টাকা সেই চুরি করেছে। বলল, "বোকারামের ডেস্কে টাকাটা বেকার পড়েছিল ; কত টাকা ছিল তাও সে জানত না ; আমি টাকাটা বিলিয়ে দিয়েছি ; অনেক ভাল মানুষকে সাহায্য করেছি।"

কৌঁসুলি এমনভাবে সওয়াল করল যে জুরি ভাসিলিকে খালাস দিতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত তাকে কারাদণ্ডই দিল। জুরিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে বলল, অচিরেই কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পথ সে খুঁজে নেবে।

১৩

নতালিয়া আইভানভ্‌নার টেলিগ্রামে কোন কাজ হল না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য নিযুক্ত কমিটি জারের কাছে কোন প্রতিবেদনই পাঠালো না। একদিন সম্রাটের খাবার টেবিলে বসে কমিটির সভাপতি কথাপ্রসঙ্গে টেলিগ্রামটার উল্লেখ করায় রাজ-পরিবারের জনৈক মহিলা বলল, "মহিলা তার উপযুক্ত কাজই করেছে।"

সম্রাট একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "আইন" ; তারপর হাতের গ্লাসটা তুলে ধরল।

ওদিকে কাজান থেকে আগত এক নির্মম খুনি কয়েদি তাতার জল্লাদের হাতে দুটি চাষী, একটি বৃদ্ধ, ও একটি বালকের ফাঁসি হয়ে গেল।

সম্রাটের জননী বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী একদিন ছেলেকে বলল, "প্রিন্সেস সোফিয়া ভ্লাদিমিরভ্না আমাকে বলেছে, লোকটি খুব দক্ষ প্রচারক। তাকে নিয়ে এস; আমাদের ভজনালয়ে প্রচারকের কাজ করতে পারবে।"

"না, তাকে রাজপ্রাসাদের গির্জার জন্য আনাই ভাল।" সম্রাট হুকুম দিল, সাধু ইসিদরকে আমন্ত্রণ করা হোক।

রাজপ্রাসাদের গির্জায় সব সেনাপতি ও জাঁদরেল অফিসাররা সমবেত হল; বিখ্যাত বক্তাটির কথা শুনবার মত।

একটি শীর্ণদেহ পলিতকেশ বৃদ্ধ এসে সকলের দিকে তাকিয়ে "ঈশ্বর-পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে" বলে বক্তৃতা শুরু করল।

শুরুটা ভালই হল, কিন্তু বক্তৃতা যত চলতে লাগল ততই ব্যাপারটা সঙ্গীণ হয়ে উঠল। পরবর্তীকালে সম্রাজ্ঞী বলেছিল, "লোকটা ক্রমেই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল।" সকলের বিরুদ্ধেই সে আক্রমণ চালাতে লাগল। মৃত্যুদণ্ড প্রসঙ্গে বলল, "বহু অকারণ মৃত্যুদণ্ড ঘটেছে। একটি খৃস্টধর্মী দেশে সরকার কি করে মানুষ খুন করতে পারে?"

সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। এ যে বড়ই খারাপ বক্তৃতা; এসব কথা শুনতে সম্রাটের নিশ্চয় ভাল লাগছে না। কিন্তু মুখে কেউ কোন কথা বলল না।

ইসিদর যখন বক্তৃতার শেষে "আমেন" বলল, তখন মেট্রোপলিটান এগিয়ে গিয়ে তাকে দেখা করতে বলল।

মেট্রোপলিটান ও এটর্নি-জেনারেলের সঙ্গে কিছু কথাবার্তার পরে ইসিদরকে পাঠিয়ে দেওয়া হল সুজ্দালের মঠে। সে মঠের সঙ্গে একটা কারাগার ছিল, আর তখন সে মঠের অধ্যক্ষ ছিল ফাদার মিজায়েল।

১৪

দিনমানে দু'একবার সম্রাটের মনে পড়ল সেই দুটি চাষীর কথা যাদের ফাঁসি হয়ে গেল, এবং সেই বিধবাটির কথা যে লোকগুলির মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিল। সেদিন সম্রাট একটা প্যারেডে হাজির হল, তারপর অশ্বচালনায় গেল; তার মন্ত্রীদের স্বাগত-সভা, ডিনার, এবং ডিনারের পরে থিয়েটার। যথারীতি বালিশে মাথা রাখামাত্রই সম্রাট ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু একটা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে তার ঘুম ভেঙে গেল: দেখল মস্তবড় মাঠের মধ্যে একটা ফাঁসি-কাঠে মৃতদেহগুলি ঝুলছে, তাদের জিভ বেরিয়ে আছে, শরীর দুলছে। কে যেন চীৎকার করে বলল, "তুমি—এসবই তুমি করেছ।" জারের ঘুম ভেঙে গেল। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। সে ভাবতে লাগল। তখনই

বৃদ্ধ ইসিদরের কথাগুলি তার মনে পড়ে গেল।....

কিন্তু সে যে একটা মানুষ সে ছবিও তার চোখে ঝাঁপসা হয়ে গেল; মানুষ হিসাবে কি তার পাওয়া উচিত, কি তার কর্তব্য সে চিন্তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল জার হিসাবে তার কর্তব্য বোধ। মানবিক কর্তব্য যে জারের কর্তব্যের চাইতে অনেক বড়—সেকথা স্বীকার করার মত শক্তি তার ছিল না।

১৫

দ্বিতীয় দফায় কারাদণ্ড ভোগের পরে প্রকোফি আর আগের মত চটপটে, উচ্চাভিলাষী ও সুবেশ মানুষটি রইল না। সে যেন একটা সম্পূর্ণ ভেঙে-পড়া মানুষ। মন-মেজাজ ভাল থাকলে সে চুপচাপ বসে থাকে। কোন কাজ করে না। বাবা বকাঝকা করে। যখন যা পায় তাই লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে মদ খায়। ফিরে এসে আবার চুপচাপ বসে অনবরত কাশে ও থুথু ফেলে। ডাক্তারকে দেখালে সে ভাল করে পরীক্ষা করে মাথা নাড়তে লাগল।

"দেখ হে, এখন অনেক কিছুই তোমার চাই যা তোমার নেই।"

"সাধারণত তাই তো হয়ে থাকে, তাই না?"

"প্রচুর দুধ খাবে, আর ধূমপান করবে না।"

"এখন তো উপোসেই দিন কাটে; তাছাড়া আমাদের গরু নেই।"

একদা বসন্তকালে সে মোটেই ঘুমতে পারছিল না; একটু মদ খেতে ইচ্ছা করছিল। ঘরে এমন কিছু নেই যা নিয়ে শুঁড়িখানায় যাবে। টুপিটা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। হাঁটতে হাঁটতে একটা বাড়ির সামনে পৌঁছল। পুরোহিত ও ডিয়েকন সে বাড়িতে একত্রে থাকত। ডিয়েকনের বিদে মইটা বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে রাখা ছিল। একটু এগিয়ে প্রকোফি সেটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে শুঁড়িখানার দিকে চলল। এটার বদলে হয় তো ছোট এক গ্লাস ভদ্‌কা পাওয়া যাবে। কিন্তু কয়েক পা এগোতেই ডিয়েকন এল। তখন ভোর হয়-হয়। প্রকোফিকে বিদে মইটা কাঁধে করে চলতে দেখে সে চেঁচিয়ে ডাকল, "হেই, কে ওখানে?"

প্রতিবেশীরা ছুটে বেরিয়ে এসে প্রকোফিকে ধরে থানায় নিয়ে গেল। তার এগারো মাস কারাদণ্ড হল। হেমন্তকালে তাকে কারা-হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হল। ভীষণ কাশি দেখা দিল; বুকটা উঠছে-নামছে; শরীর কিছুতেই গরম হচ্ছে না। দিনরাত সমানে কাঁপতে থাকে। খরচ বাঁচাবার জন্য সুপারিন্টেণ্ডেন্টও নভেম্বরের আগে হাসপাতালে আগুন জ্বালাতে দেবে না।

দেহে ও মনে প্রকোফির কষ্টের শেষ নেই। এই পরিবেশে সে হাঁপিয়ে উঠল। ডিয়েকন, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, রক্ষী, পাশের রোগী—সকলকেই সে ঘৃণা

করে। হাসপাতালে নতুন আমদানি কয়েদিটিকেও সে ঘৃণা করতে শুরু করল। কয়েদিটি স্তেপান। মাথার রোগের জন্য তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রাখা হয়েছে তার ঠিক পাশের বেডে। প্রথমে ঘৃণা করলেও ক্রমেই স্তেপানকে তার ভাল লাগতে লাগল। তার সঙ্গে কথা বলে সে খুব আনন্দ পেত। স্তেপানের সঙ্গে কথা বললে তার যন্ত্রণার সাময়িক উপশম হত। স্তেপানও কারও সঙ্গে দেখা হলেই তার প্রথম খুনের গল্প করত।

প্রকোফিকেও বলল, "মহিলাটি আর্তনাদ করল না, সে রকম কিছুই করল না, নড়ল না পর্যন্ত। শুধু বলল, 'মার! এই তো আমি। কিন্তু আমার আত্মাকে তুমি মারছ না, মারছ নিজের আত্মাকে।' "

"দেখ, খুন করা খুবই ভয়ংকর কাজ। একদিন একটা ভেড়াকে জবাই করেই আমি আধ-পাগলা হয়ে গিয়েছিলাম। কোন জীবিত প্রাণীকে আমি আজ পর্যন্ত হত্যা করি নি; তাহলে ঐ শয়তানরা আমাকে খুন করবে কেন? আমি তো কারও কোন ক্ষতি করি নি..."

"সে সবেরই বিচার হবে।"

"কে বিচার করবে?"

"অবশ্যই ঈশ্বর।"

"ঈশ্বর আছে একথা বুঝবার মত কিছুই আমি দেখি নি, তাই তাকে তো আমি বিশ্বাস করি না ভাই। আমি মনে করি, মানুষ মরলে তার উপর ঘাস গজাবে, আর সেখানেই সব শেষ।"

"একথা ভাবা তোমার ভুল। আমি কত মানুষ খুন করেছি, আর সে বেচারি তো সকলকেই সাহায্য করেছে। আর তুমি মনে কর তার ও আমার একই পরিণতি হবে? না, না।"

"তাহলে তুমি বিশ্বাস কর যে মানুষ মরার পরেও আত্মা বেঁচে থাকে?"

"নিশ্চয়; সেটাই তো সত্যিকারের বাঁচা।"

মৃত্যু আসন্ন হলে প্রকোফি খুবই কষ্ট পেতে লাগল। শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট দেখা দিল। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে সে যেন সহসা সব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেল। স্তেপানকে পাশে ডাকল। বলল, "বিদায় ভাই। বুঝতে পারছি মরণ আসছে। আগে আমি তাকে কত ভয় পেতাম। এখন আমার কোন ভয় নেই। সে যত তাড়াতাড়ি আসে ততই ভাল।"

১৬

ইতিমধ্যে ইউজেন মিখাইলভিচের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। ব্যবসায় মন্দা চলেছে। শহরে একটা নতুন দোকান হয়েছে; ফলে তার খদ্দের কমে

আসছেন, অথচ টাকার সুদ যথারীতি দিতে হচ্ছে। সে আবার মোটা সুদে টাকা ধার করল। তবু শেষ পর্যন্ত দোকান ও জিনিসপত্র বেঁচে দেবার মত অবস্থা হল। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে অনেকের কাছে ঘুরল, কিন্তু দোকানটাকে বাঁচাবার জন্য প্রয়োজনীয় চার শ' রুবল যোগাড় করতে পারল না।

একমাত্র ভরসা ছিল ব্যবসায়ী ক্রাস্‌নোপুজভ; কিন্তু খবর পাওয়া গেল, তার সব টাকা চুরি হয়ে গেছে, আর সে চুরি করেছে তাদেরই আগেকার দারোয়ান ভাসিলি।

ইউজেন মিখাইলভিচ স্ত্রীকে বলল, "আমি জানতাম সে একটা শয়তান। কিন্তু সে যে এতদূর যাবে তা ভাবি নি।"

স্ত্রী বলল, "কিন্তু শুনেছি সে নাকি গরিব মেয়েদের বিয়েতে টাকা দিয়ে সাহায্য করে।"

"লোকে ও রকম অনেক কথা রটায়; আমি সে কথা বিশ্বাস করি না।"

এমন সময় নোংরা পোশাক পরা একটি অপরিচিত লোক দোকানে ঢুকল।

"তুমি কি চাও?"

"তোমার একটা চিঠি আছে।"

"কে পাঠিয়েছে?"

"নিজেই দেখ।"

"তোমার কি এ চিঠির জবাব চাই? তাহলে একটু অপেক্ষা কর।"

"আমি অপেক্ষা করতে পারব না।" চিঠি দিয়ে লোকটি চলে গেল।

"কী আশ্চর্য!" বলে ইউজেন মিখাইলভিচ খামটা ছিঁড়ল। সে তো অবাক—খাম থেকে বের হল কয়েক শ' রুবলের নোট। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারল না। "চার শ' রুবল! এর অর্থ কি?"

খামের মধ্যে ইউজেনের নামে কাঁচা-হাতে লেখা একটা চিঠিও ছিল। চিঠিতে লেখা—"ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে, ক্ষতির বদলে ভাল কর। তুমি আমার অনেক ক্ষতি করেছ, কুপনের ব্যাপারে তোমার জন্য আমি চাষীদের প্রতি অনেক অন্যায় করেছি; কিন্তু তোমার জন্য আমার করুণা হয়। এই সঙ্গে চার শ' নোট আছে। সেগুলি তুমি নিও, আর তোমার দারোয়ান ভাসিলিকে মনে রেখো।"

ইউজেন মিখাইলভিচ স্ত্রীকে ও নিজেকে বলল, "খুবই আশ্চর্য!" যতবার সেই ঘটনার কথা তার মনে পড়ে, যতবার সে কথা তার স্ত্রীকে শোনায়, ততবারই তার চোখে জল ঝরতে থাকে।

১৭

সুজ্‌দাল মঠের কারাগারে চোদ্দজন পুরোহিতকে বন্দী করা হয়েছে প্রধানত ধর্মের প্রতি অবহেলার অপরাধে। ইসিদরকেও সেখানেই পাঠানো হয়েছে। একপক্ষকাল পরে ফাদার মিজায়েল কারাগার ঘুরে দেখে ইসিদরের সেলে ঢুকল। তাকে জিজ্ঞাসা করল, তার মনে কোন বাসনা আছে কি না।

ইসিদর জবাব দিল, "বাসনা তো অনেক কিছুই আছে, কিন্তু অন্য কারও উপস্থিতিতে তো সে কথা তোমাকে বলতে পারি না। তোমার সঙ্গে গোপনে কথা বলতে চাই।'

তারা পরস্পরের দিকে তাকাল; মিজায়েল দেখল, ইসিদরের সঙ্গে একলা থাকায় ভয়ের কিছু নেই। ইসিদরকে তার ঘরে নিয়ে যাবার হুকুম দিল। ঘরে শুধু দুজন। তখন সে বলল,—

"বেশ তো, এখন বল।"

ইসিদর নতজানু হয়ে বলল, "ভাই, এ তুমি কি করছ। নিজের আত্মাকে করুণা কর। তুমি তো জগতের সেরা শয়তান। যাকিছু পবিত্র তার বিরুদ্ধাচরণ করেছ তুমি—"

এক মাস পরে সে প্রতিবেদন পাঠিয়ে জানাল, ইসিদরকে মুক্তি দেওয়া উচিত, কারণ সে অনুতপ্ত হয়েছে। বাকি বন্দীদেরও সে মুক্তি দিতে বলল। তারপর সে নিজে পদত্যাগ করল।

১৮

দশ বছর পার হয়ে গেল। মিত্‌য়া স্মকোনিকভ টেকনিক্যাল কলেজের লেখাপড়া শেষ করেছে; এখন সে সাইবেরিয়ার সোনার খনিতে একজন ইঞ্জিনীয়ার। তার অনেক টাকা মাইনে। একদিন সে জেলাটা ঘুরে দেখতে বের হল। গভর্ণর প্রস্তাব করল, স্তেপান পেলাগুশ্‌কিন নামক একটি কয়েদিকে তার সঙ্গে দেওয়া হোক।

"বলছ একটি কয়েদি? সেটা কি বিপজ্জনক হবে না?"

"একে নিয়ে কোন বিপদ হবে না। লোকটি ধার্মিক। যাকে জিজ্ঞাসা করবে সেই এ-কথা বলবে।"

"তাকে এখানে পাঠানো হয়েছে কেন?"

গভর্ণর হাসল। "সে ছয়টি খুন করেছে, তবু সে ধার্মিক। আমি তার জামিন রইলাম।"

মিত্য়া স্মকোনিকভ স্তেপানকে যাত্রার সঙ্গী করে নিল। এখন সে একজন টাক-মাথা, শীর্ণকায়, রোদে-পোড়া মানুষ। পথ চলতে স্তেপান নিজের ছেলের মত স্মকোনিকভের যত্ন করতে লাগল; তাকে নিজের সব কথা খুলে বলল—কেন তাকে এখানে পাঠানো হয়েছে, আর এখন কিসে তার জীবনটা পূর্ণ হয়ে আছে।

আর, কী আশ্চর্য, যে মিত্য়া স্মকোনিকভ এতদিন পর্যন্ত খাদ্য, পানীয় ও জুয়া খেলা নিয়ে দিন কাটাত এই প্রথম সে জীবনের কথা ভাবতে শুরু করল। এ ছাড়া অন্য কোন চিন্তা তার নেই; ফলে তার স্বভাবের একটা আমূল পরিবর্তন ঘটল। কিছুদিন পরে তাকে একটা ভাল জায়গায় পাঠাবার প্রস্তাব দেওয়া হল। সে তা প্রত্যাখ্যান করে স্থির করল, সেখানেই একটা জমিদারি কিনবে, বিয়ে করবে, এবং চাষীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে, সাধ্যমত তাদের সাহায্য করবে।

১৯

সেই ইচ্ছা মত কাজই সে করল। কিন্তু নিজের জমিদারিতে চলে যাবার আগে বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেল। আগে বাবার সঙ্গে তার বনিবনা ছিল না; সে তার নতুন পরিবার নিয়ে আলাদাভাবে বাস করছিল। মিত্য়া স্মকোনিকভ সে বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে চাইল। বুড়ো প্রথমে অবাক হয়ে গেল, ছেলের পরিবর্তন লক্ষ্য করে হাসতে লাগল; কিন্তু কিছু পরেই ছেলের দোষ না ধরে মনে মনে ভাবল, অনেক সময় দোষটা তো সে নিজেই করছে।

———

হাজি মুরাদ

১

মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়, খড় কাটা শেষ হয়েছে; যব কাটা সবে শুরু হয়েছে। বছরের এই সময়টাতে নানা ধরনের ফুল ফোটে—লাল, সাদা ও গোলাপি সুগন্ধি ঘাস-ফুল; মাঝখানটা হলুদ আর মশলার গন্ধেভরা ষাঁড়ের চোখের মত দুধ-সাদা ডেইজি; মধুগন্ধ হলুদ

তিলফুল ; সকালের রোদে ঝলমলানো ভুট্টার নতুন ফোটা নীল ফুলগুলি সন্ধ্যার দিকে হয়ে ওঠে বিবর্ণ ও লাল ; আর আছে বাদামগন্ধী ডভার ফুল—সেগুলি বড় তাড়াতাড়ি ঝরে যায়। একটা বড় ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম, এমন সময় চোখে পড়ল নালাটার ভিতরে ফুটে আছে লাল রংয়ের একটা সুন্দর কাঁটা-ফুল ; এ অঞ্চলে সেটাকে বলে "টার্টার" ঘাসকাটার সময় সকলেই এই গাছগুলিকে এড়িয়ে চলে হাতে কাঁটা ফুটে যাওয়ার ভয়ে। কাঁটা-ফুলটাকে তুলে এনে হাতের তোড়াটার মাঝখানে বসিয়ে দেওয়ার জন্য নালাটার ভিতর নেমে গেলাম এবং ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়া মৌমাছিটাকে তাড়িয়ে দিয়ে ফুলটা তুলে নেবার চেষ্টা করলাম। কাজটা কিন্তু সহজে হল না। হাতে রুমাল নেওয়া সত্ত্বেও সবদিক থেকে হাতে কাঁটা ফুটতে লাগল, আর ডাঁটাটা খুব শক্ত হওয়ায় সেটা ভাঙতেও পাঁচ মিনিট লেগে গেল। অনেক কষ্টে যখন ফুলটা ছিঁড়ে আনলাম অনেকগুলি পাপড়ি ঝরে পড়ায় ফুলটাকে তখন আর তত তাজা ও সুন্দর মনে হল না। তাছাড়া, আমার হাতের সুন্দর ফুলের তোড়ার মধ্যে সেটাকে বেশ মানানসই মনে না হওয়াতে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। অকারণে একটা সুন্দর ফুলকে নষ্ট করার জন্য মনে বেশ দুঃখও হল।

মনে মনে চিন্তা করলায়, "কী শক্তি ও অধ্যবসায়! কী স্থির সংকল্পে ফুলটা আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়েছিল, আর কী মূল্যেই না সে নিজেকে বিক্রি করে দিল!" সদ্য-চষা কালো মাটির মাঠ পেরিয়ে ধুলোভরা পথে উঠে এলাম। জনৈক জমিদারের এই চষা মাঠটা এত বড় যে আমার দুই পাশে এবং সামনে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত যতদূর চোখ যায় চষা ভিজে মাঠ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। জমিটা এত ভাল করে চষা হয়েছে যে কোথাও একটা ঘাস বা গাছপালা চোখে পড়ে না—শুধু কালো আর কালো মাটি। এই নিষ্প্রাণ কালো মাঠের মধ্যে জীবন্ত কিছু আছে কিনা দেখার আশায় চারদিকে তাকিয়ে ভাবলাম, "হায়, মানুষ কী সর্বধ্বংসী জীব।....নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কত উদ্ভিদ-প্রাণকেই না সে হত্যা করছে! আমার সম্মুখে রাস্তার ডান পাশে কিছু ঝোপঝাড় চোখে পড়ল ; আরও কাছে গিয়ে দেখলাম এটাও সেই রকমই একটা কাঁটাগাছ যার ফুলটা আমি অকারণেই ছিঁড়ে নিয়ে ফেলে দিয়েছি। এই "টার্টার" গাছটার তিনটে ডাল ; একটা ডাল ভাঙা, কাটা হাঁতের মত দেখাচ্ছে। বাকি দুটো ডালেই একটা করে ফুল ফুটে আছে ; এক সময় লাল থাকলেও এখন কালো হয়ে গেছে। একটা বোঁটা ভাঙা, শুকনো ফুলটাকে নিয়ে ঝুলে আছে। গায়ে কালো কাদা লাগলেও অপর ফুলটা দাঁড়িয়েই আছে। নিশ্চয় কোন গাড়ির চাকা গাছটার উপর দিয়ে চলে গেছে ; তবু গাছটা আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু একটা দিক দুমড়ে গেছে, যেন তার শরীর থেকে একটা

অংশ কেউ ছিঁড়ে নিয়েছে, নাড়িভুড়ি বেরিয়ে পড়েছে, একটা হাত ছিঁড়ে গেছে, একটা চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছে। তথাপি গাছটা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; চারদিকের অন্য সব ভাইকে ধ্বংস করা সত্ত্বেও সে মানুষের কাছে হার স্বীকার করে নি···।

ভাবলাম, "কী প্রাণশক্তি! মানুষ সবকিছু জয় করেছে, লক্ষ লক্ষ গাছ নষ্ট করেছে, তবু এই গাছটা নতি স্বীকার করে নি।" সঙ্গে সঙ্গে অনেকদিন আগেকার একটি ককেসীয় ঘটনা মনে পড়ে গেল; ঘটনাটির কিছুটা আমি নিজে দেখেছি, কিছুটা প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনেছি, আর কিছুটা কল্পনা করে নিয়েছি।

আমার স্মৃতি ও কল্পনায় ঘটনাটি এইভাবে গড়ে উঠেছে।

* * *

ঘটেছিল ১৮৫১-র শেষের দিকে।

নভেম্বর মাসের এক শীতার্ত সন্ধ্যায় রুশ সীমান্ত থেকে মাইল পনেরো দূরে অবস্থিত শত্রুপক্ষ চেচেনদের "আওল"-এ (তাতার গ্রাম) ঘোড়ায় চড়ে হাজির হয়েছিল হাজি মুরাদ। তখন জ্বলন্ত ঘুঁটের গন্ধে চারদিক ভরে উঠেছে। মুয়াজ্জিনের একটানা আজানের শব্দ সবে থেমেছে; ঘুঁটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন তাজা পাহাড়ী বাতাসে ভেসে আসছে পুরুষদের জোরালো কণ্ঠস্বর, আর নীচের ঝর্ণাতলা থেকে নারী ও শিশুদের কথাবার্তা।

হাজি মুরাদ শামিল-এর নায়েব। লোকটি লুণ্ঠতরাজের জন্য বিখ্যাত। নিজের পতাকা ও ডজন খানেক মুরিদ (অনুগামী) পরিবৃত না হলে সে কখনও ঘোড়ায় চড়ে বাইরে বের হয় না। কিন্তু এখন সে পলাতক; ঘোড়ায় চেপে চলে এসেছে একটিমাত্র মুরিদকে সঙ্গে নিয়ে। পরনে শিরস্ত্রাণ ও বুর্কা; তার নীচ থেকে মাথা বের করে আছে একটা রাইফেল। যথাসম্ভব অন্যের দৃষ্টি এড়িয়েই সে চলেছে; পথে যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তার দিকেই সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

আওলে পৌঁছে খোলা স্কোয়ারের পথে না গিয়ে সে বাঁদিকে মোড় নিয়ে একটা সরু গলিতে ঢুকল এবং দ্বিতীয় সাক্লিয়াতে (মাটির বাড়ি) পৌঁছে থেমে গিয়ে চারদিকে তাকাল। সামনে পরচালার নীচে কোন লোক নেই, কিন্তু সাক্লিয়ার ছাদের উপরে ভেড়ার চামড়ায় শরীর ঢেকে শুয়ে আছে একটি লোক। চামড়ার চাবুকের হাতল দিয়ে হাজি মুরাদ লোকটিকে স্পর্শ করল; তার জিভের চুক্-চুক্ শব্দ শুনে তেলচিটে পুরনো বেশমেত (পুরোহাতা জামা) ও নৈশ টুপি পরা একটি বুড়ো ভেড়ার চামড়ার নীচ থেকে বেরিয়ে এল। তার ভেজা-ভেজা লাল চোখের পাতায় কোন লোম নেই;

তাই সে মিটমিট করে তাকাতে লাগল। হাজি মুরাদ রীতিমাফিক "সেলাম আলেইকুম!" বলে মুখটা খুলল। তাকে চিনতে পেরে দাঁতহীন মুখ হাসিতে ভরে বুড়ো বলল, "আলেইকুম সেলাম!" তারপর কাঠের গোড়ালি-লাগানো চটিতে পা গলিয়ে ভেড়ার চামড়ার তুমড়ানো জামাটা গায়ে চড়িয়ে মই বেয়ে নীচে নেমে এল। মাটিতে নেমেই অতিথির প্রতি কর্তব্য হিসাবে হাজি মুরাদের জিন ও ডান পা-দানিটাতে হাত রাখল। কিন্তু শক্তিশালী মুরিদটি তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে বুড়ো লোকটিকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই তার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। হাজি মুরাদও ঘোড়া থেকে নেমে ঈষৎ খুঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে পরচালাটার নীচে ঢুকল। বছর পনেরো বয়সের একটি ছেলে তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে বেড়িয়ে এসে তাকে দেখেই পাকা বুনো কুলের মত কালো চোখ মেলে সবিস্ময়ে নবাগতদের দিকে তাকিয়ে রইল।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সাক্লিয়ার দরজাটা সশব্দে খুলে দিতে দিতে বুড়ো বলল, "ছুটে মসজিদে গিয়ে তোমার বাবাকে ডেকে নিয়ে এস।"

হাজি মুরাদ বাইরের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই একটি মাঝবয়সী স্ত্রীলোক বসবার আসন নিয়ে ভিতরের দরজা দিয়ে ঢুকল।

সামনের দেয়াল বরাবর আসনটা পেতে দিতে দিতেই স্ত্রীলোকটি বলল, "তোমার আগমন সুখ নিয়ে আসুক।"

হাজি মুরাদ বুর্কা, রাইফেল ও তলোয়ার খুলে বুড়ো লোকটির হাতে দিয়ে বলল, "তোমার ছেলেরা দীর্ঘায়ু হোক!" বুড়ো লোকটি বাড়ির মালিকের অস্ত্রশস্ত্রের পাশেই অতিথির অস্ত্রগুলি ঝুলিয়ে রাখল।

পিস্তলটাকে পিঠের উপর ঠিকমত রেখে হাজি মুরাদ আসনের দিকে এগিয়ে গেল; কোটটাকে ভাল করে গায়ে জড়িয়ে বসে পড়ল। বুড়ো লোকটি খোলা হাঁটুর উপর বসে পড়ে চোখ বুজে দুই হাত উপরে তুলে ধরল। হাজি মুরাদও তাই করল। তারপর প্রার্থনা করতে করতে দুজনই মুখের উপর দুই হাতের তালি বাজাতে বাজাতে নীচে নামিয়ে এনে এক সময় দাঁড়ির নীচে এসে দুই হাতের তালু এক সাথে মেলে দিল।

হাজি মুরাদ বুড়োকে শুধাল, "নে হবর?" (নতুন খবর কিছু আছে?)

দুটি নিষ্প্রাণ লাল চোখ মেলে হাজি মুরাদের মুখের বদলে তার বুকের দিকে তাকিয়ে বুড়ো লোকটি বলল, "আমি থাকি মৌমাছি-পালন কেন্দ্রে; আজই ছেলেকে দেখতে এসেছি ...... সে জানে।"

হাজি মুরাদ বুঝল, বুড়ো কিছু বলতে চাইছে না। সে মাথা নেড়ে চুপ করে গেল, আর কিছু প্রশ্ন করল না।

বুড়ো বলল, "ভাল খবর কিছু নেই। একমাত্র খবর, একমাত্র খবর—খরগোসরা ভাবছে কেমন করে ঈগলদের তাড়িয়ে দেওয়া যায়, আর ঈগলরা একের পর এক তাদের ছিঁড়ে খাচ্ছে। এই তো সেদিন রুশ কুকুররা এসে

মিৎচিৎ আগুনের খড়ের গাদা পুড়িয়ে দিয়ে গেল ··· তাদের মুখগুলো ছিঁড়ে ফেলা হোক!"

হাজি মুরাদের মুরিদটি ঘরে ঢুকল মাটির মেঝেতে ভারী পা ফেলে। শুধু ছুরি আর পিস্তলটা রেখে হাজি মুরাদের মতই নিজের বুর্কা, রাইফেল, ও তরবারি খুলে পেরেকে ঝুলিয়ে রাখল।

নবাগতকে দেখিয়ে বুড়ো শুধাল, "এ কে?"

হাজি মুরাদ বলল, "আমার মুরিদ। নাম এল্‌ডার।"

"ভাল কথা," বলে বুড়ো এল্‌ডারকে একটা আসন দেখিয়ে দিল। দুই পা ভেঙে বসে পড়ে এল্‌ডার ভেড়ার মত চোখ তুলে বুড়োর দিকে তাকাল। সে তখন অনর্গল বলে যাচ্ছে—আগের সপ্তাহেই তাদের সাহসী লোকরা দুজন রুশ সৈনিককে ধরে এনেছে; তাদের একজনকে মেরে ফেলেছে, আর অপরজনকে পাঠিয়ে দিয়েছে ভেদিনের শামিলে।

হাজি মুরাদ অন্যমনস্কভাবে তার কথাগুলি শুনল; তার চোখ দরজার দিকে আর কান রয়েছে বাইরের শব্দের দিকে। পরচালার নীচে পায়ের শব্দ শোনা গেল, শব্দ করে দরজা খুলে গেল. ঘরে ঢুকল বাড়ির মালিক সাডো। বয়স বছর চল্লিশ, ছোট দাড়ি, লম্বা নাক, চোখ দুটি তার পনেরো বছরের ছেলের চোখের মতই কালো, কিন্তু ততটা চকচকে নয়। ছেলেটিও বাবার সঙ্গে ঘরে ঢুকে দরজার পাশে বসল। বাড়িক মালিক খড়মজোড়া দরজার কাছে রেখে পুরনো ছেঁড়া টুপিটাকে মাথার পিছনে ঠেলে দিয়ে (তার মাথাভর্তি কালো চুল অনেকদিন কাটা হয় নি) হাজি মুরাদের সামনে বসে পড়ল।

সেও বুড়োর মতই দুই হাত উপরে তুলে প্রার্থনা করল, তারপর দুই হাত মুখের উপর ঠুকতে ঠুকতে নীচে নামিয়ে আনল। তবে তারপরেই সে কিন্তু কথা বলতে শুরু করল। বলল—শামিলের কাছ থেকে হুকুম এসেছে জীবিত অথবা মৃত হাজি মুরাদকে ধরতে হবে; মাত্র একদিন আগে শামিলের লোকজন এখান থেকে চলে গেছে, এখানকার লোকরা শামিলের হুকুম অমান্য করতে ভয় পাচ্ছে, আর তাই সাবধান হওয়া দরকার।

সাডো বলল, "আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি আমার বাড়িতে কেউ আমার কুনাকের (প্রিয় বন্ধু) ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু খোলা মাঠের মধ্যে কি হবে?···সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে।"

মন দিয়ে সব কথা শুনে হাজি মুরাদ বলল, "খুব ভাল কথা। এখনই কোন লোককে দিয়ে একটা চিঠি পাঠাতে হবে রুশদের কাছে। আমার মুরিদই যাবে, কিন্তু তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য একটি লোক চাই।"

সাডো বলল, "আমার ভাই বাটাকে পাঠাব।" ছেলের দিকে ফিরে বলল,

"বাটাকে ডেকে নিয়ে এস।"

দুই হাত দুলিয়ে ছেলেটি দম-দেওয়া পুতুলের মত সঙ্গে সঙ্গে সাক্লিয়া থেকে বেরিয়ে গেল। মিনিট দশেক পরেই ফিরে এল। সঙ্গে একটি পেশীবহুল খাটো পাওয়ালা লোক ; রোদে পুড়ে একেবারে কালো হয়ে গেছে, পরনে পুরনো ছেঁড়া হলুদ রংয়ের সার্কাসীয় কোট, পায়ে ছেঁড়া পট্টি জড়ানো।

নবাগতকে যথারীতি সম্ভাষণ জানিয়ে হাজি মুরাদ সরাসরি প্রশ্ন করল, "তুমি কি আমার মুরিদকে রুশদের কাছে নিয়ে যেতে পারবে ?"

বাটা খুশি মনে বলল, "পারব, নিশ্চয় পারব। আর কোন চেচেন আমার মত পারবে না। তারা স্বীকার করবে, বড় বড় কথা বলবে, কিন্তু কিছুই করবে না ; কিন্তু আমি করব।"

হাজি মুরাদ বলল, "খুব ভাল।" তিনটে আঙুল দেখিয়ে বলল, "এ কাজের জন্য তুমি তিনটি পাবে।"

বাটা মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল সে বুঝতে পেরেছে ; তবে টাকাটা তার কাছে বড় কথা নয়, হাজি মুরাদের কাজ করে দেবার সম্মানের জন্যই সে কাজটা করবে। পাহাড়ি অঞ্চলের সকলেই হাজি মুরাদকে চেনে ; রুশ শুয়োরকে সে কিভাবে মেরেছিল তাও সকলে জানে।

হাজি মুরাদ বলল, "খুব ভাল কথা।....দড়ি লম্বা হওয়া ভাল, কিন্তু কথা হবে সংক্ষিপ্ত।"

"বেশ, তাহলে আমি মুখ বন্ধ করলাম," বলল বাটা।

হাজি মুরাদ বলল, "আরগুম নদী যেখানে পাহাড়ের পাশ দিয়ে বেঁকে গেছে সেখানে বনের মধ্যেকার খোলা জায়গায় দুটো গাদা আছে—জান তো ?"

"জানি।"

"সেখানে চারজন অশ্বারোহী আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।"

"বেশ," বাটা মাথা নাড়ল।

"সেখানে খান মাহোমার খোঁজ করবে। সে জানে কি করতে হবে এবং বলতে হবে। তুমি কি তাকে রুশ সেনাপতি প্রিন্স ভরন্তভের কাছে নিয়ে যেতে পারবে না ?"

"হ্যাঁ, নিয়ে যাব।"

"তাকে নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়ে আনতে পারবে তো ?"

"পারব।"

"তাহলে তাকে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে ফিরে এসো। আমিও সেখানেই থাকব।"

"সব কিছুই করব," বলে বাটা চলে গেল।

হাজি মুরাদ গৃহস্বামীর দিকে মুখ ফেরাল।

"চেখিতেও একজনকে পাঠাতে হবে," বলে নিজের কোটের ভিতর থেকে

একটা কার্তুজের থলে তুলতে গিয়েও আবার রেখে দিল। দুটি স্ত্রীলোককে সাক্লিয়াতে ঢুকতে দেখে চুপ করে গেল।

সরু চেহারার মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকটি সাডোর স্ত্রী। অপরটি তরুণী, পরনে লাল ট্রাউজার ও সবুজ বেশ্‌মেত্‌। তার পোশাকের সামনের দিকটা জুড়ে রয়েছে রূপোর মুদ্রার একটা হার; ঘন কালো চুলের গোড়া থেকে ঝুলছে একটা রূপোর রুশ মুদ্রা। চোখ দুটি বাবা ও ভাইয়ের মতই ঘন কালো। অতিথিদের দিকে না তাকালেও স্পষ্টই তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে সে সচেতন।

সাডোর স্ত্রী একটা নীচু গোল টেবিল নিয়ে এল। তার উপর সাজানো রয়েছে চা, মাখন-মাখা কেক, পনির, চুরেক (জড়ানো পাতলা রুটি), আর মধু। মেয়েটির হাতে একটা পাত্র, বদনা, ও তোয়ালে।

মেয়েরা যতক্ষণ খাবার-দাবার গুছিয়ে দিতে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াল ততক্ষণ সাডো ও হাজি মুরাদ মুখ খুলল না। এল্‌ডারও দুই পা ভেঙে বসে পাথরের মূর্তির মত চুপ করে রইল। মেয়েরা বেরিয়ে যেতে সে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

কোটের ভিতরকার কার্তুজের থলে থেকে একটা বুলেট ও একটা পাকানো হাত-চিঠি বের করে হাজি মুরাদ বলল, "এটা আমার ছেলের হাতে দিও।"

"উত্তরটা কোথায় দিতে হবে?"

"তোমাকে; আর তুমি সেটা দেবে আমাকে।"

সাডো বলল, "তাই হবে।" হাত-চিঠিটা নিজের কোটের কার্তুজ-পকেটে রেখে দিল। তারপর পাত্রটাকে হাজি মুরাদের দিকে এগিয়ে বদনাটা হাতে নিল।

হাজি মুরাদ পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে হাত-মুখ ধুয়ে তোয়ালেতে হাত-মুখ মুছে টেবিলে গিয়ে বসল। এল্ডারও তাই করল। অতিথিরা খেতে শুরু করল। উল্টো দিকে বসে সাডো তাদের আগমনের জন্য বার বার ধন্যবাদ জানাতে লাগল। ছেলেটি দরজার কাছে বসে হাজি মুরাদের মুখের দিকেই তাকিয়ে রইল; বাবার কথার সমর্থনেই বুঝি ঈষৎ হাসল।

গত চব্বিশ ঘণ্টায় কিছু না খেলেও হাজি মুরাদ খুব সামান্যই খেল। শুধু একটুকরো রুটি ও পনির মুখে দিয়ে একটা ছোট ছুরি বের করে একটুকরো রুটিতে মধু মাখিয়ে নিল।

খুশি মুখে বুড়ো বলল, "আমাদের মধু খুব ভাল। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার অনেক বেশী ভাল মধু পাওয়া গেছে।"

"ধন্যবাদ" বলে হাজি মুরাদ টেবিল থেকে উঠে পড়ল। আরও কিছু খাবার ইচ্ছা থাকলেও এল্‌ডার ও তার নেতাকে অনুসরণ করল।

সাডো জানে, এ রকম একজন অতিথিকে স্বগৃহে আপ্যায়ন করে সে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে, কারণ তার সঙ্গে শামিলের ঝগড়া

হবার পরেই শামিল চেচনিয়ার অধিবাসীদের কাছে এক ঘোষণায় হাজি মুরাদকে অভ্যর্থনা করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে ; তার এ আদেশ অমান্য করলে শাস্তি হবে প্রাণদণ্ড। সে জানে, আওলের অধিবাসীরা যে কোন মুহূর্তে তার বাড়িতে হাজি মুরাদের উপস্থিতি জানতে পারবে এবং তার আত্ম-সমর্পণ দাবী করবে। কিন্তু এতে ভয় পাওয়া দূরে থাক, সাডো বেশ খুশিই হয়েছে। জীবন দিয়েও অতিথিকে রক্ষা করা তার কর্তব্য, আর সে কর্তব্যই করছে বলে সে গর্ব ও আনন্দ অনুভব করছে।

হাজি মুরাদকে বলল, "যতক্ষণ তুমি আমার বাড়িতে আছ আর আমার ঘাড়ের উপর আমার মাথাটা আছে, ততক্ষণ কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।"

তার উজ্জ্বল চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে হাজি মুরাদও অনুভব করল যে সে সত্য কথাই বলেছে। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "তুমি আনন্দ ও দীর্ঘ জীবন লাভ কর।"

সদয় কথাগুলির জন্য ধন্যবাদ জানাবার চিহ্নস্বরূপ সাডো নীরবে নিজের বুকের উপর হাতটা রাখল।

সাক্লিয়ার খড়খড়িগুলি বন্ধ করে দিয়ে অগ্নিকুণ্ডে কিছু কাঠ ফেলে খুশি মনে সাডো অন্দরমহলের দিকে চলে গেল। পরিবারের সকলেই সেই মহলে বাস করে। মেয়েরা তখনও ঘুমোয় নি ; অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে যে বিপজ্জনক অতিথিরা রাতের জন্য আশ্রয় নিয়েছে তাদের সম্পর্কেই আলোচনা করছে।

২

হাজি মুরাদ যে আওলে রাত কাটাচ্ছিল সেখান থেকে মাইল দশেক দূরে অবস্থিত ভজ্‌ভিজেন্সক্‌ দুর্গ থেকে বেরিয়ে তিনটি সৈনিক ও একজন নন-কমিশণ্ড অফিসার শাহগিরিনিস্ক ফটক পার হয়ে গেল। তৎকালীন রীতি অনুসারে তাদের পরনে ছিল ককেসীয় সৈনিকদের পোশাক, তার উপর ভেড়ার চামড়ার কোট ও টুপি, হাঁটু পর্যন্ত উঁচু বুট, আলখাল্লাগুলি শক্ত করে জড়িয়ে কাঁধের উপরে বাঁধা। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রথমে সোজা পথে পাঁচ শ' পা এগিয়ে তারা বিশ পা হাঁটল ডান দিকে ঝরা পাতা মাড়িয়ে, তারপর অন্ধকারেই একটা ভাঙা গাছের গুঁড়ির কাছে পৌঁছে গেল। সেখানেই থেমে গেল। সাধারণত গুপ্ত সেনাদল এই গাছের কাছেই ঘাঁটি করে ওৎ পেতে থাকে।

আকাশের তারারা এতক্ষণ সৈনিকদের সঙ্গে সঙ্গেই গাছের উপর দিয়ে ছুটে

আসছিল। এবার তারাও দাঁড়িয়ে গেল। পত্রহীন ডালপালার ফাঁক দিয়ে তাদের উজ্জ্বল আলো নীচে ছড়িয়ে পড়ল।

নন-কমিশণ্ড অফিসার পানভ তার লম্বা বন্দুক ও সঙ্গীন সশব্দে কাঁধ থেকে নামিয়ে গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে বলল, "ভালই হল; জায়গাটা বেশ শুকনো।"

সৈনিক তিনটিও তাই করল।

পানভ এবার বিরক্তির সঙ্গে বলল, "নির্ঘাৎ হারিয়ে ফেলেছি। হয় ফেলে এসেছি, নয় তো পথে কোথাও পড়ে গেছে।"

উৎফুল্ল কণ্ঠে একটি সৈনিক শুধাল, "কি খুঁজছ?"

"পাইপের মুখটা। কোথায় যে গেল?"

গুপ্ত ঘাঁটিতে ধূমপান নিষিদ্ধ; কিন্তু এ জায়গাটাকে ঠিক গুপ্ত ঘাঁটি বলা যায় না। পর্বতারোহীরা যাতে সকলের অলক্ষ্যে পাহাড়ের উপর উঠে দুর্গ লক্ষ্য করে কামান দাগতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্যই এটাকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কাজেই এখানে পৌঁছে পানভ পাইপ টানার সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় না। যাই হোক, সৈনিকটির চেষ্টায় পাইপে তামাক ভরার একটা ব্যবস্থাও হয়ে গেল।

পানভ বলল, "তুমি একটি করিৎকর্মা ছেলে হে আভ্‌দীভ্‌! ....বিচারকের মত জ্ঞানী।" চিৎ হয়ে শুয়ে সে পাইপটা টানতে লাগল।

পানভের পরে মন-মরা সৈনিক নিকিতিন পাইপ টানতে টানতে আলখাল্লাটা মাটিতে বিছিয়ে গুঁড়িটাতে ঠেসান দিয়ে বসল। সকলেই চুপচাপ। মাথার উপরে গাছের পাতায় শন্‌-শন্‌ শব্দ উঠল; তাকেও ছাড়িয়ে ভেসে এল শেয়ালের একটানা হুক্কা-হুয়া।

আবার সব চুপ। বাতাসে ডালপালাগুলো নড়ছে। ফলে তারাগুলো একবার দেখা যাচ্ছে, একবার ঢাকা পড়ছে।

হঠাৎ কথা বলল আভ্‌দীভ্‌, "আচ্ছা পানভ, তোমার কি কখনও একঘেয়ে লাগে?"

"একঘেয়ে, কেন? পানভ অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিল।

"আমার তো লাগে। .... একএক সময় এত একঘেয়ে লাগে যে নিজেকে নিয়ে কী যে করব তাই বুঝে উঠতে পারি না।"

"আবার সেই কথা!" পানভ বলল।

"আরে, সেবার যখন মদ খেয়ে সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছিলাম সেও তো একঘেয়েমির জন্যই। ...আমাকে যেন পেয়ে বসেছিল।"

"কিন্তু কেন তোমার এত একঘেয়ে লাগে?"

"কেন লাগে? .... কেন আবার? বাড়ির জন্য মন কেমন করে।"

"তোমার বাড়ি কি খুব অবস্থাপন্ন?"

"না, আমরা ধনী নই, তবে আমাদের বেশ ভালভাবেই চলে যায়— আমরা সুখেই ছিলাম।" যে কথাগুলি পানভকে অনেকবার বলেছে আভ্‌দীভ্‌ সেই কথাই আর একবার বলতে শুরু করল। "কি জান, আমি স্বেচ্ছায় সৈনিক হয়ে এসেছিলাম দাদার বদলে। তার ছেলেমেয়ে আছে। তার পরিবারে পাঁচজন মানুষ, আর আমি সদ্য বিয়ে করেছি। মা আমাকে ধরে বসল। কাজেই ভাবলাম, আমি যা করছি সে কথা তারা নিশ্চয় মনে রাখবে। তাই আমি মালিকের কাছে গেলাম।···· সে লোক খুব ভাল, বলল, 'তুমি তো খাসা ছেলে, চলে যাও।' কাজেই দাদার বদলে আমিই চলে গেলাম।"

"তুমি ঠিকই করেছিলে," পানভ বলল।

"অথচ তুমি কি বিশ্বাস করবে পানভ যে এখন সেজন্য আমার এত বাজে লাগছে। নিজেকেই প্রশ্ন করি, 'দাদার বদলে কেন তুমি গেলে? সে তো সেখানে রাজার হালে আছে, আর তুমি এখানে কষ্ট ভোগ করছ'। এ কথা যত ভাবি ততই খারাপ লাগে। ···· এটাকে দুর্ভাগ্য বলে মনে হয়।"

আভ্‌দীভ্‌ চুপ করল।

একটু পরে বলল, "তুমি বরং আর একবার পাইপটা ধরাও।"

"বেশতো, পাইপটা ঠিক করে দাও।"

ঠিক তখনই গাছের শন্‌-শন্‌ শব্দকে ছাপিয়ে কানে এল পায়ের শব্দ। নিজের বন্দুকটা হাতে নিয়ে পানভ পা দিয়ে নিকিতিনকে ঠেলে দিল।

নিকিতিন উঠে আলখাল্লাটা তুলে নিল।

তৃতীয় সৈনিক বন্দারেংকোও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এমন একখানা স্বপ্ন দেখছিলাম·········"

আভ্‌দীভ্‌ বলল, "শ্‌-স্‌!" আর অন্য সকলে রুদ্ধশ্বাসে কান পাতল। নরম সুখতলার বুট-পরা মানুষের পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। অন্ধকারে ঝরা পাতা ও শুকনো ডালের শব্দ ক্রমেই স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। তারপরেই শোনা গেল চেচেনদের চড়াগলার বিশেষ ধরনের শব্দ। শুধু যে শব্দ শোনা যাচ্ছে তাই না, গাছের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে আসা দুটি ছায়ামূর্তিকে দেখাও যাচ্ছে; একজন অপরের তুলনায় লম্বা। তারা কাছে এলে পানভ বন্দুকটা নিয়ে রাস্তায় উঠে গেল। সঙ্গীরা তাকে অনুসরণ করল।

পানভ চীৎকার করে বলল, "কে যায়?"

বেটে লোকটি বলল, "আমি, চেচেন বন্ধু।" লোকটি বাটা। নিজেকে দেখিয়ে বলল, "বন্দুক ইয়োক (নেই)!······ তরবারি ইয়োক। প্রিন্সকে চাই!"

দীর্ঘতর লোকটি পাশে এসে দাঁড়াল। সেও নিরস্ত্র।

পানভ সঙ্গীদের বলল, "ও বলছে ও একজন স্কাউট, কর্নেলকে খুঁজছে।"

বাটা বলল, "প্রিন্স ভরনৎসভ!·······খুব দরকার! অনেক কাজ।"

পানভ বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাব। আভ্দীভ্, তুমি আর বন্দারেংকা বরং ওকে কর্তব্যরত অফিসারের কাছে পৌছে দিয়ে এস। মনে রেখো, ওদের দুজনকে সামনে রেখে যাবে।"

লোকটিকে নিয়ে সৈনিক দুটি চলে যেতেই পানভ ও নিকিতিন তাদের ঘাঁটিতে ফিরে গেল।

নিকিতিন বলল, "এত রাতে ওরা কেন এসেছে?"

"হয় তো কোন দরকার আছে; কিন্তু বড়ই ঠাণ্ডা পড়েছে," বলে পানভ আলখাল্লাটা বিছিয়ে গাছের পাশে বসে পড়ল।

প্রায় দু'ঘণ্টা পরে আভ্দীভ্ ও বন্দারেংকো ফিরে এল।

"ওদের দিয়ে এসেছ?"

"হ্যাঁ। কর্ণেলের একজন এখনও ঘুমোয় নি।"

পানভ বলল, "কিছুক্ষণ পরেই আলো ফুটবে।"

আরাম করে বসে আভ্দীভ্ বলল, "হ্যাঁ, তারারা একে একে ডুবে যাচ্ছে।"

সৈনিকরা আবার চুপচাপ হয়ে গেল।

৩

দুর্গের সেনা-বারিক ও সৈনিকদের ঘরের জানালাগুলি অনেকক্ষণ অন্ধকার হয়ে গেছে; কিন্তু সবচাইতে ভাল ঘরটার জানালায় এখনও আলো দেখা যাচ্ছে।

কুরিন রেজিমেণ্টের সেনাপতি, সম্রাটের এড-ডি-কং, ও প্রধান সেনাপতির ছেলে প্রিন্স সাইমন মিখাইলেভিচ ভরন্ত্সভ ঐ ঘরেই থাকে। ভরন্ত্সভের স্ত্রী পিতার্সবুর্গের বিখ্যাত সুন্দরী মারিয়া ভাসিলেভ্না তার সঙ্গেই থাকে। এই ছোট ককেসীয় দুর্গটাতে তারা যে রকম জাঁকজমকের সঙ্গে বাস করে তেমনটি আগে কেউ কখনও করে নি। ভরন্ত্সভ এবং তার স্ত্রী মনে করে তারা খুবই সাদাসিদে ভাবে, এমন কি বেশ কষ্টেসৃষ্টেই এখানে দিন কাটায়, আর স্থানীয় অধিবাসীদের চোখে তাদের জাঁকজমক ও বিলাসিতা যেমন বিস্ময়কর তেমনই অসাধারণ।

মধ্যরাতের এই মুহূর্তে গৃহস্বামী ও স্বামিনী প্রশস্ত বসবার ঘরে চারটি মোমবাতির আলোয় কার্ড-টেবিলে বসে অতিথিদের সঙ্গে তাস খেলছে। মেঝেতে কার্পেট পাতা, জানালায় দামী পর্দা ঝোলানো। ভরন্ত্সভের সঙ্গে খেলছে পিতার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট বিষণ্ণদর্শন একটি যুবক; সম্প্রতি প্রিন্সেস ভরন্ত্সভ তাকে ককেসাসে পাঠিয়েছে তার ছোট ছেলের (প্রথম বিবাহের সন্তান) টিউটর হিসাবে। তাদের বিপক্ষে খেলছে দুজন অফিসার;

চওড়া লাল-মুখো কোম্পানি-কম্যাণ্ডার পল্‌তোরাৎস্কি এবং জনৈক রেজিমেণ্ট-অ্যাডজুটাণ্ট।

প্রিন্সেস মারিয়া ভাসিলেভ্‌না পল্‌তোরাৎস্কির পাশে বসে তার তাসের দিকে নজর রাখছে। কিন্তু আসলে তার কথা, তার চাউনি, তার সুগন্ধ, তার দেহের প্রতিটি চলন পল্‌তোরাৎস্কিকে অন্য সব কিছু ভুলিয়ে দিয়ে তার মনে জাগিয়ে রেখেছে একমাত্র নিজের উপস্থিতিটুকুর চেতনা; ফলে সে খেলায় ভুলের পর ভুল করছে, আর তার পার্টনার ক্রমে চটে যাচ্ছে।

পল্‌তোরৎস্কি আবার একটা টেক্কা ফেলতেই অ্যাডজুটাণ্টটি সক্ষোভে বলে উঠল, "না……এটা খুব খারাপ করলে। আবার একটা টেক্কা জলে ফেলে দিলে।"

পল্‌তোরাৎস্কি ঘুম থেকে জেগে-ওঠা মানুষের মত হাঁ করে সঙ্গীর দিকে তাকাল।

মারিয়া ভাসিলেভ্‌না হেসে বলল, "ক্ষমা করে দাও।"

প্রিন্সের খানসামা ঘরে ঢুকে জানাল, কর্তব্যরত অফিসার দেখা করতে চায়।

ইংরেজি উচ্চারণে রুশ ভাষায় প্রিন্স বলল, "মশাইরা ক্ষমা কর। তুমি কি আমার জায়গায় বসবে মারিয়া?"

"কারও আপত্তি নেই তো?" বলে প্রিন্সেস উঠে দাঁড়াল।

অ্যাড্‌জুটাণ্ট বলল, "আমি সবেতেই রাজী।"

পল্‌তোরাৎস্কি হেসে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

রবার প্রায় শেষ হবার মুখে প্রিন্স ফিরে এল। তাকে খুব খুশি দেখাচ্ছে।

"আমি কি প্রস্তাব করতে চাই জান?"

"কি?"

"একটু শ্যাম্পেন চলুক।"

"সেজন্য আমি তো সর্বদাই তৈরী," পল্‌তোরাৎস্কি বলল।

"তৈরী না হবার কি আছে? তাতে আমরা সকলেই খুশি হব," অ্যাড্‌জুটাণ্ট বলল।

"ভাসিলি, নিয়ে এস," প্রিন্স বলল।

মারিয়া ভাসিলেভ্‌না শুধাল, "ওরা কি জন্যে এসেছিল?"

"এসেছিল কর্তব্যরত অফিসার ও অপর একজন।"

"সে কে? কেন এসেছিল?" মারিয়া ভাসিলেভ্‌না সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল।

"তা বলব না," কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে ভরন্ত্‌সভ বলল।

"বলবে না!" মারিয়া ভাসিলেভ্‌না বলল। "বেশ, দেখা যাবে।"

শ্যাম্পেন এলে অতিথিরা এক গ্লাস করে খেল; তারপর খেলা শেষ করে হিসাবপত্র মিটিয়ে একে একে বিদায় নিতে লাগল।

বিদায় নেবার সময় প্রিন্স পল্‌তোরাৎস্কিকে বলল, "তোমার কোম্পানির

উপরই কি কাল জঙ্গলে যাবার হুকুম হয়েছে?"

"হ্যাঁ, আমার .... কেন?"

ঈষৎ হেসে প্রিন্স বলল, "তাহলে কাল আমাদের দেখা হবে।"

ভরন্তসভের কথার অর্থ ঠিক না বুঝেই পল্‌তোরাৎস্কি বলল, "খুব খুশি হলাম।" আসলে তার মনে তখন একটিই চিন্তা—কতক্ষণে মারিয়া ভাসিলেভ্‌নার হাতটা চেপে ধরবে। মারিয়া ভাসিলেভ্‌নাও খুশির হাসি হেসে সজোরে তার হাতটা চেপে ধরল।

একজন সহকর্মীকে নিয়ে পল্‌তোরাৎস্কি যে ছোট বাড়িটাতে থাকে সেখানে পৌঁছে দরজায় ধাক্কা দিতেই বুঝল সেটা তালাবন্ধ। কড়া নাড়ল, তাতেও কিছু হল না। বিরক্ত হয়ে দরজায় লাথি মারল, তরবারি দিয়ে শব্দ করল। তখন পায়ের শব্দ কানে এল। গৃহ-ভৃত্য ভোভিলো ভিতর থেকে দরজা খুলে দিল।

"এ ভাবে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করার মানে কি হে হাঁদারাম?"

"কিন্তু স্যার, এটা কি করে সম্ভব .... ?"

"আবার মাতলামি শুরু করেছ! 'কি করে সম্ভব তোমাকে দেখাচ্ছি!" ভোভিলোকে মারতে গিয়েও পল্‌তোরাৎস্কি মনের ইচ্ছাটা বদলে ফেলল। "তুমি জাহান্নামে যাও! .... 'এখন মোমবাতিটা জ্বালাও।'

"এখনি জ্বালাচ্ছি।"

ভোভিলো সত্যি মদ টেনেছে। অর্ড্‌ন্যান্স-সার্জেন্ট আইভান পেত্রভিচের বাড়িতে মদের আসর বসেছিল। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে তার সঙ্গে নিজের জীবনের তুলনা করছিল। আইভান পেত্রভিচ মাস-মাইনে পায়, বিয়ে করেছে, এক বছরের মধ্যেই ক্রীতদাসত্ব থেকে ছাড়া পাবার আশা রাখে। ভোভিলো তার মালিকের পরিবারে ঢুকেছে ছেলে-বেলায়; এখন চল্লিশের বেশী বয়স হলেও সে বিয়ে করে নি, বাউণ্ডুলে মালিকের সঙ্গে কাছা-কাছি মুল্লুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মালিক লোক ভাল, কদাচিৎ মারধোর করে, তবু এ কেমন জীবন? "সে কথা দিয়েছে ককেসাস থেকে ফিরে গিয়ে আমাকে মুক্তি দেবে, কিন্তু মুক্তি পেয়ে আমি কোথায় যাব? .... এ তো কুকুরের জীবন!' ভাবতে ভাবতে ভোভিলোর ঘুম পায়; কিন্তু পাছে কেউ ঘরে ঢুকে চুরি করে সেই ভয়ে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ে।

* * *

পল্‌তোরাৎস্কি শোবার ঘরে ঢুকল। সহকর্মী তিখনভ ও সে একই শোবার ঘরে থাকে।

জেগে উঠে তিখনভ বলল, "বেশ কিছু হেরে এলে তো?"

"না, মোটেই হারি নি, বরং সতেরো রুবল জিতেছি, আর এক বোতল ক্লিকোৎ খেয়েছি।"

"আর মারিয়া ভাসিলভ্‌নাকে দেখেছ?"

"তা দেখেছি।"

তিখনভ বলল, "একটু পরেই উঠতে হবে। ছ'টায় যাত্রা শুরু হবে।"

পল্‌তোরাৎস্কি চেঁচিয়ে বলল, "ভোভিলো! কাল ঠিক পাঁচটায় আমাকে ডেকে দিও।"

"তুমি লড়াই করলে জাগাব কেমন করে?"

"আমি বলছি জাগিয়ে দিও। শুনতে পাচ্ছ?"

"ঠিক আছে।" পল্‌তোরাৎস্কির বুট ও পোশাক নিয়ে ভোভিলো বেরিয়ে গেল। পল্‌তোরাৎস্কি বিছানায় ঢুকে একটা সিগারেট খেল; তারপর মৃদু হেসে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল। অন্ধকারে মারিয়া ভাসিলভ্‌নার হাসি মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

* * *

ভরন্তসভ-দম্পতি সঙ্গে সঙ্গেই শুতে গেল না। অতিথিরা চলে যেতেই মারিয়া ভাসিলভ্‌না স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কঠোর কণ্ঠে বলল—

"এবার! সব কথা আমাকে বলতেই হবে।"

"কিন্তু লক্ষীটি ..."

"ও সব ছাড়। কোন সংবাদবাহক কি?"

"যদি তাই হয়, তবু তোমাকে বলব না।"

"বলবে না? বেশ, তাহলে আমিই বলছি।"

"তুমি?"

"লোকটা তো হাজি মুরাদ, তাই নয় কি?" মারিয়া ভাসিলভ্‌না প্রশ্ন করল। ভরন্ত্‌সব কথাটাকে একেবারে অস্বীকার করতে পারল না; জানাল, লোকটি হাজি মুরাদ নয়, তারই সংবাদবাহক; জানিয়ে গেল, কাল যেখানে কাঠুরেরা জমায়েত হবে বলে কথা আছে সেখানে সে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

সংবাদটা পেয়ে দুর্গের একঘেয়ে জীবনে বিরক্ত ভরন্ত্‌সব দম্পতি বেশ খুশি হল। দুটো বেজে যাওয়ায় তারা শুতে গেল।

৪

শামিল যে সব মুরিদকে পাঠিয়েছিল তাকে গ্রেপ্তার করতে তাদের হাত থেকে পালিয়ে তিনটি বিনিদ্র রাত কাটিয়েছে হাজি মুরাদ। তাই সাডো বিদায় নিয়ে সাক্লিয়া থেকে বেরিয়ে যেতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

একটু দূরে দেয়ালের পাশে ঘুমিয়ে পড়ল এল্ডার। লোকটি চিৎ হয়ে শুয়েছে; কার্তুজের কালো থলেটা সাদা সার্কাসীয় কোটের সামনে সেলাই করে বসানো থাকায় তার সদ্য-কামানো নীলাভ মাথার চাইতে বুকটাকে উঁচু দেখাচ্ছে। হাজি মুরাদের মতই সেও ঘুমচ্ছে পিস্তল ও ছুরি সঙ্গে নিয়ে; অগ্নিকুণ্ডের আগুন জ্বলছে নিভু-নিভু হয়ে, আর দেয়ালের কুলুঙ্গিতে একটা নৈশ বাতি আবছা আলো ছড়াচ্ছে।

মাঝরাতে ঘরের মেঝেতে শব্দ হল। হাজি মুরাদ সঙ্গে সঙ্গে উঠে পিস্তলে হাত রাখল। ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল সাডো।

হাজি মুরাদ বলল, "ব্যাপার কি?"

তার সামনে বসে পড়ে সাডো বলল, "ভাবনার কথা আছে। একটি স্ত্রীলোক ছাদ থেকে তোমাকে আসতে দেখে স্বামীকে বলে দিয়েছে, আর এতক্ষণে গোটা আওল জেনে ফেলেছে। এইমাত্র একজন প্রতিবেশী এসে আমার স্ত্রীকে বলে গেল, গ্রাম-প্রধানরা মস্‌জিদে সমবেত হয়েছে; তোমাকে এখানে আটক করতে চাইছে।"

"আমি এখনই চলে যাচ্ছি," হাজি মুরাদ বলল।

দ্রুত পায়ে সাক্লিয়া থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সাডো বলল, "ঘোড়ায় জিন পরানো হয়েছে।"

হাজি মুরাদ ফিস্‌ফিস্ করে ডাকল, "এল্ডার!" নিজের নাম শুনে, বিশেষ করে মনিবের গলা শুনে এল্ডার এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে মাথার টুপিটা সোজা করে নিল।

অস্ত্রশস্ত্রগুলি নিয়ে হাজি মুরাদ বুর্কাটা পরে নিল। এল্ডারও তাই করল। নিঃশব্দে সাক্লিয়া থেকে বেরিয়ে দুজনে পরচালার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। কালো-চোখ ছেলেটা তাদের ঘোড়া নিয়ে এল। রাস্তায় ক্ষুরের শব্দ শুনে পাশের সাক্লিয়ার দরজা দিয়ে একজন মুখ বের করল, আর অন্য একটি লোক খড়মের শব্দ করতে করতে পাহাড় বেয়ে মসজিদের দিকে ছুটে গেল। আকাশে চাঁদ নেই, কিন্তু তারাগুলো জ্বল্‌জ্বল্ করছে। মসজিদ থেকে অনেক কণ্ঠের গুঞ্জন ভেসে আসছে।

তাড়াতাড়ি বন্দুকটা হাতে নিয়ে হাজি মুরাদ সরু পা-দানিতে পা রেখে

এক লাফে সহজেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল।

গৃহস্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলল, "ঈশ্বর তোমাকে পুরস্কৃত করুন!" তার ইঙ্গিতে ছেলেটা সরে দাঁড়াল, আর ঘোড়াটা দ্রুত পায়ে গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ল। এল্ডারও ঘোড়ায় চেপে তার পিছন পিছন চলল। সাডো হাত দোলাতে দোলাতে ছুটতে লাগল তাদের পিছনে। রাস্তার মোড়ে প্রথমে একটা, তারপর আর একটা ছায়ামূর্তি দেখা দিল।

"থাম···কে যায়? থাম!" একজন চীৎকার করে বলল, আর অপর কয়েকজন পথ আটকে দাঁড়াল।

হাজি মুরাদ না থেমে কোমরবন্ধ থেকে পিস্তলটা টেনে বের করে দ্রুততর গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল লোকগুলির দিকে। তারা সরে দাঁড়াতে সে সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল। পিছনে এল্ডার। পিছনে দুটো গুলির শব্দ হল, দুটো বুলেট তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল, কারও গায়ে লাগল না। শ'তিনেক গজ ছোটার পরে হাজি মুরাদ ঘোড়া থামিয়ে কান পাতল।

সম্মুখে অনেক নীচে বয়ে যাচ্ছে একটা খরস্রোতা নদী। পিছনের আওলে মোরগরা ডাকাডাকি শুরু করেছে। সে শব্দ ছাপিয়ে কানে এল ঘোড়ার পায়ের শব্দ ও লোকজনের কথাবার্তা। হাজি মুরাদ আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। কিন্তু পিছনের লোকরা জোর কদমে এসে তাকে ধরে ফেলল। তারা সকলেই আওলের বাসিন্দা। জন বিশেক হবে। তারা স্থির করেছে হাজি মুরাদকে আটক করবে, অথবা শামিলের চোখে নিজেদের নিরপরাধ প্রমাণ করতে আটক করার ভান করবে। তারা কাছে এসে পড়লে হাজি মুরাদ থামল, লাগাম নামিয়ে রেখে বা হাতে রাইফেলের ঢাকনাটা খুলে ডান হাতে সেটা বাগিয়ে ধরল। এল্ডারও তাই করল।

হাজি মুরাদ চীৎকার করে বলল, "কি চাও তোমরা? আমাকে ধরতে চাও?···বেশ ধর!" রাইফেলটা তাক করল। আওলের লোকগুলো থেমে গেল। হাজি মুরাদ রাইফেল হাতে খাদের মধ্যে নেমে গেল। অশ্বারোহীরা তার পিছু নিল, কিন্তু কাছে গেল না। হাজি মুরাদ নদী পার হয়ে ওপারে গেলে লোকগুলো চীৎকার করে তাকে কি যেন বলতে লাগল; জবাবে রাইফেলের গুলি ছুঁড়ে সে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। যখন লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল তখন অনুসরণকারীদের কোন শব্দই শুনতে পেল না; মোরগের ডাকও না; শুধু শোনা যাচ্ছে জলস্রোতের শব্দ, আর মাঝে মাঝে পেঁচার ডাক। বনের কালো প্রাচীরটা অনেক কাছে এসে গেছে। সেই বনেই তার জন্য অপেক্ষা করে আছে তার মুরিদরা।

বনের কাছে পৌঁছে সে বুক ভরে প্রশ্বাস নিল; তারপর একটা শিস দিয়ে নিঃশব্দে কান পাতল। এক মিনিট পরেই বনের ভিতর থেকে ভেসে এল অনুরূপ একটা শিস। হাজি মুরাদ পথ থেকে নেমে বনে ঢুকল। শ' খানেক পা

যাবার পরে দেখল একটা আগুন জলছে, তাকে ঘিরে বসে আছে কয়েকটি ছায়ামূর্তি, একটা জিন-বাঁধা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। আগুনের চারপাশে বসে আছে চারটি লোক।

তাদের একজন তাড়াতাড়ি উঠে এসে হাজি মুরাদের লাগাম ও পা-দানি ধরল। সে হাজি মুরাদের অনুগত ভাই ; তার গৃহস্থালির কাজকর্ম করে।

ঘোড়া থেকে নেমে হাজি মুরাদ বলল, "আগুন নিভিয়ে ফেল।"

লোকরা কাঠ সরিয়ে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলল।

মাটিতে বিছানো বুর্কাটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হাজি মুরাদ শুধাল, "বাটা এখানে ছিল কি ?"

"হ্যাঁ, অনেকক্ষণ আগে খান মাহোমার সঙ্গে চলে গেছে।"

"কোন্ পথে তারা গেছে ?"

হাজি মুরাদ যেদিক থেকে এসেছে তার উল্টো দিকটা দেখিয়ে খানেফি বলল, "ওই পথে।"

"ঠিক আছে," বলে হাজি মুরাদ রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে গুলি ভরতে লাগল।

একজনকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আমাদের সাবধান থাকতে হবে—ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে।"

লোকটির নাম গম্‌জালো, একজন চেচেন। বুর্কার উপর থেকে খাপে ঢাকা রাইফেলটা তুলে নিয়ে বনের সেই দিকটাতে চলে গেল যেদিক থেকে হাজি মুরাদ এসেছে।

এল্ডার ঘোড়া থেকে নেমে দুটো ঘোড়াকে গাছের সঙ্গে বেঁধে দিল। তারপর রাইফেলটা কাঁধে ফেলে অন্যদিকে চলে গেল। আগুন নিভে গেছে ; বনের ভিতরটা এখন আর আগের মত অন্ধকার নয় ; আকাশে তারাগুলি মিটমিট করে জলছে।

হাজি মুরাদ চোখ তুলে তাকাল। সপ্তর্ষিমণ্ডল আকাশের মাঝপথে উঠে এসেছে। হাজি মুরাদ হিসাব করে দেখল, মধ্যরাত অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, কাজেই রাতের নামাজের সময়ও অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। খানেফির কাছ থেকে একটা বদনা চেয়ে নিয়ে বুর্কা পরে সে জলের দিকে চলে গেল।

জুতো খুলে 'উজু' শেষ করে খালি পায়ে বুর্কার উপরে হাঁটু ভেঙে বসল, দুই কানে আঙুল রেখে দক্ষিণমুখী হয়ে নামাজ পড়তে শুরু করল।

সেখান থেকে ফিরে এসে বুর্কার উপর বসে হাঁটুর উপর কনুই রেখে মাথা নীচু করে গভীর চিন্তায় ডুব দিল।

হাজি মুরাদ সব সময়ই নিজের সৌভাগ্যে বিশ্বাস করে। ভাগ্য সর্বদাই তার উপর প্রসন্ন। তাই এখনও সে যেন চোখের সামনে দেখতে পেল—ভরন্‌ত্‌সভের দেওয়া সেনাদল নিয়ে সে শামিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছে,

তাঁকে বন্দী করেছে, প্রতিশোধ নিয়েছে; রাশিয়ার জার তাঁকে পুরস্কৃত করেছে, আর শুধুমাত্র এভারিয়া নয়, গোটা চেচ্‌নিয়া তার শাসনাধীনে এসেছে। এইসব ভাবতে ভাবতে একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

খান মাহোমার খুশিভরা গলার শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। কার্যোদ্ধার করে সে বাটাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসেছে। হাজি মুরাদের পাশে বসে সব কথা সে খুলে বলল। সৈন্যরা তাকে স্বয়ং প্রিন্সের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, প্রিন্স খুব খুশি হয়ে কথা দিয়েছে, শামিলের জঙ্গলে মিৎচিক ছাড়িয়ে যেখানে রুশরা কাঠ কাটছে সেখানে সে সকাল বেলায় তাদের সঙ্গে দেখা করবে। বাটাও সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করল।

হাজি মুরাদ বিশেষ করে জানতে চাইল, সে যে রুশদের সঙ্গে যোগদানের প্রস্তাব করেছে সে সম্পর্কে ভরন্ত্‌সভ কি বলেছে। খান মাহোমা ও বাটা একবাক্যে বলল, প্রিন্স কথা দিয়েছে হাজি মুরাদকে অতিথি হিসাবে সাদরে গ্রহণ করা হবে, এবং তার যাতে ভাল হয় তাই করা হবে।

আগের কথামত হাজি মুরাদ টাকা বের করে বাটাকে তিন রুবল দিল। তারপর সৈনিকদের হুকুম দিল, তার জরির কাজ-করা পাগড়ি ও অস্ত্রশস্ত্রগুলো বের করতে এবং নিজেদের এমনভাবে সাফ-সুতরো করবে যাতে রুশদের কাছে যাবার পরে তাদের বেশ সভ্যভব্য দেখায়।

সকলে যখন সেই সব কাজে ব্যস্ত তখন ধীরে ধীরে তারাগুলি নিভে এল, চারদিকে আলো ফুটল, আর ভোরবেলার মৃদু বাতাস বইতে লাগল।

৫

ভোরবেলা। তখনও আঁধার কাটে নি। দুটি কুড়ুলধারী সেনাদল পল্‌তোরাৎস্কির পরিচালনায় শাহ্‌গিরিনিস্ক ফটক ছাড়িয়ে ছ'মাইল পথ পার হয়ে দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে গাছ কাটতে শুরু করে দিল। বেলা আটটা নাগাদ ধুনিতে ফেলা সবুজ ডালপালা পোড়ার গন্ধ মেশানো কুয়াসা কেটে যেতে লাগল। যে কাঠুরেরা এতক্ষণ পাঁচ পা দূরের কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না, শুধু পরস্পরের কথা শুনতে পাচ্ছিল, তারাই এখন বেশ স্পষ্ট দেখতে পেল ধুনির আগুন আর কাটা গাছে বোঝাই বনের পথ। সূর্যটা কুয়াশার মধ্যে একটা উজ্জ্বল বৃত্তের মত হয়ে আবার ঢাকা পড়ে গেল।

খোলা জায়গাটাতে পল্‌তোরাৎস্কি, তার অধীনস্থ তিখনভ, থার্ড কোম্পানির দুজন অফিসার, রক্ষী-বাহিনীর প্রাক্তন অফিসার ও ক্যাডেট কলেজে পল্‌তোরাৎস্কির সহপাঠী ব্যারন ফ্রেজ পিপেগুলির উপর বসে আছে। চারদিকে ছড়িয়ে আছে খাবারের ঠোঙা, সিগারেটের টুকরো ও খালি বোতল।

অফিসাররা খানিকটা করে ভদ্‌কা খেয়ে এখন খানা খাচ্ছে ও পোর্টার পান করছে। অনেক ঢাকবাদক তাদের জন্ম তৃতীয় বোতলটি খুলছে।

সকলে মিলে নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলছে, এমন সময় রাস্তার বাঁ দিক থেকে রাইফেলের গুলির শব্দ ভেসে এল; আর একটা বুলেট কুয়াসার বুক চিরে তাদের পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে একটা গাছে বিঁধে গেল।

পল্‌তোরাৎস্কি খুশিভরা গলায় চেঁচিয়ে বলল, "আরে! এ তো আমাদের লক্ষ্য করেই ছুঁড়ছে।......" ফ্রেজের দিকে ফিরে বলল, "এই যে কোস্ত্য়া, এবার তোমার পালা। সেনাদলে চলে যাও; আমি এদিকটা দেখছি। একখানা জব্বর যুদ্ধের ব্যবস্থা হচ্ছে। ......তারপরই একটা প্রতিবেদন পাঠাব।

ফ্রেজ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল; দ্রুত পায়ে ধোঁয়ায় ঢাকা জায়গাটাতে তার সৈন্যদের কাছে চলে গেল।

ছোট কর্বর্দা ঘোড়াটায় চেপে পল্‌তোরাৎস্কি সেনাদল নিয়ে গুলির শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল। বনের প্রান্তে একটা খাদের ঢালুর উপর একদল সৈন্য ঘাঁটি বানিয়েছে। বাতাসটা বনের দিকেই বইছে। শুধু যে খাদের ঢালু জায়গাটা দেখা যাচ্ছে তাই নয়, খাদের ওপারটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পল্‌তোরাৎস্কি যখন সেখানে পৌঁছল তখনই কুয়াসার ভিতর থেকে সূর্য বেরিয়ে আসায় দেখা গেল, খাদের ওপারে প্রায় সিকি মাইল দূরে একটা ছোট জংলার পাশে কয়েকজন অশ্বারোহী দাঁড়িয়ে আছে। হাজি মুরাদকে অনুসরণ করেই এই চেচেনরা সেখানে এসে পড়েছে। তাদেরই একজন গুলি ছুঁড়ল। কয়েকজন সৈনিক এদিক থেকে পাল্টা গুলি ছুঁড়ল। চেচেনরা পিছু হটে গেল। গুলিও বন্ধ হল।

কিন্তু পল্‌তোরাৎস্কি তবু গুলি চালাবার হুকুম দিল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল অবিরাম গুলিবর্ষণ। চেচেনরাও উত্তেজিত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল; লাফিয়ে এগিয়ে এসে পর পর গুলি ছুঁড়তে লাগল। এ পক্ষের একটি সৈনিক-বেচারি আভ্‌দীভ্‌ আহত হল।

দলের অপর সৈনিকরা এগিয়ে এসে দেখল, দুই হাতে তলপেট চেপে ধরে সে গোঙাচ্ছে আর ছটফট করছে। সেও পল্‌তোরাৎস্কির সেনাদলের লোক। ঘোড়া ছুটিয়ে এসে সে শুধাল, "কি হয়েছে হে ছোকরা? আঘাত পেয়েছ? কোথায়?"

আভ্‌দীভ্‌ জবাব দিল না।

তার সঙ্গীটি বলল, "আমি বন্দুকে গুলি ভরতে যাচ্ছি এমন সময় ক্লিক করে শব্দ হল, আর তাকিয়ে দেখি ওর হাত থেকে বন্দুকটা খসে পড়েছে।"

জিভ দিয়ে শব্দ করে পল্‌তোরাৎস্কি বলল, "আঘাতটা কি খুব বেশী আভ্‌দীভ্‌?"

"আজ্ঞে না, তবে হাঁটতে পারছি না। এক ফোঁটা ভদ্‌কা পেলে ভাল হত।"

কিছুটা ভদ্‌কা পাওয়া গেল। পানভ একটা ঢাকনা-ভর্তি ভদ্‌কা এনে দিল। আভ্‌দীভ্‌ খাবার চেষ্টা করেও ঢাকনাটা ফেরৎ দিল। বলল, "আমার ভাল লাগছে না। তুমি এটা খেয়ে ফেল।"

পানভ সেটা গলায় ঢেলে দিল।

আভ্‌দীভ্‌ উঠতে চেষ্টা করে আবার এলিয়ে পড়ল। একটা আলখাল্লা বিছিয়ে সকলে তাকে শুইয়ে দিল।

সার্জেণ্ট-মেজর পল্‌তোরাৎস্কিকে বলল, "ইয়োর অনার, কর্ণেল আসছেন।"

"ঠিক আছে; তাহলে তোমরাই ওকে দেখ," বলে পল্‌তোরাৎস্কি চাবুক হাঁকিয়ে জোর কদমে ছুটে গেল ভরন্তসভের সঙ্গে দেখা করতে।

ভরন্ত্‌সভ সওয়ার হয়েছে একটা বাদামী ইংলিশ ঘোড়ার পিঠে; তার সঙ্গে একজন অ্যাডজুটাণ্ট, একজন কসাক ও একজন চেচেন দো-ভাষী।

"এখানে কি ঘটেছে?" ভরন্তসভ শুধাল।

পল্‌তোরাৎস্কি জবাব দিল, "একটা ছোট দল এসে আমাদের উপর হামলা করেছে।"

"বটে, বটে—এসব তোমার কাণ্ড?"

পল্‌তোরাৎস্কি হেসে বলল, "না, না, প্রিন্স, ওরা নিজেরাই হামলা করেছিল।"

"শুনলাম একটি সৈনিক আহত হয়েছে?"

"হ্যাঁ, খুবই দুঃখের কথা। সে খুব ভাল যোদ্ধা।"

"আঘাত কি গুরুতর?"

"তাই তো মনে হয়......পাকস্থলীতে লেগেছে।"

"আমি কোথায় চলেছি তা জান কি?" ভরন্ত্‌সভ বলল।

"না।"

"অনুমান করতে পার?"

"না।"

"হাজি মুরাদ আত্মসমর্পণ করেছে; আমরা তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।"

"কি বলছেন আপনি?"

অনেক কষ্টে খুশির হাসি চেপে ভরন্ত্‌সভ বলল, "কাল তার দূত এসেছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শালিনে এসে সে আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। ততদূর পর্যন্ত গোলন্দাজদের মোতায়েন করে তুমি এসে আমার সঙ্গে মিলিত হবে।"

"বুঝেছি," বলে পল্‌তোরাৎস্কি টুপিতে হাত ছুঁইয়ে তার সেনাদলে ফিরে গেল।

আহত আভ্‌দীভ্‌কে ততক্ষণে দুর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নির্দেশমত কাজ শেষ করে ভরন্ত্‌সভের উদ্দেশ্যে যাবার পথে পলতোরাৎস্কি লক্ষ্য করল, কয়েকজন অশ্বারোহী পিছনদিক থেকে এগিয়ে আসছে। সকলের আগে সাদা লোমওয়ালা ঘোড়ায় চেপে চলেছে দর্শাসই চেহারার একটি লোক। তার

মাথায় পাগড়ি, সঙ্গে সোনার অলংকার পরানো অস্ত্রশস্ত্র। লোকটি হাজি মুরাদ। পল্‌তোরাৎস্কির কাছে এসে তাতার ভাষায় কি যেন বলল। ভুরু তুলে হাত নেড়ে পল্‌তোরাৎস্কি একটু হেসে ইসারায় তাকে বুঝিয়ে দিল যে তার কথা বুঝতে পারে নি। হাসির জবাবে হাজি মুরাদও হাসল; আর সেই শিশুর মত উদার হাসি দেখে পল্‌তোরাৎস্কি অবাক হয়ে গেল। এই দুর্ধর্ষ পার্বত্য সর্দারকে এরকমটা দেখার আশা সে করে নি। সে আশা করেছিল দেখতে পাবে একটি বিষণ্ণ-বদন কঠোর চেহারার মানুষকে, আর এ যে এমন একটি হাসি-খুশি মানুষ যার হাসিতে ছড়িয়ে আছে পূর্ব-পরিচয়ের আন্তরিকতা। তার একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য দুটি বিস্ফারিত চোখ: কালো ভুরুর নীচ থেকে অন্যের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে শান্ত, মনোযোগী ও গভীর দৃষ্টি মেলে।

পাঁচজনকে নিয়ে হাজি মুরাদের দল--খান মাহোমা, অভর খানেফি, এল্ডার, ও গম্‌জালো। পথের উপর ভরন্ত্‌সভ এসে হাজির হওয়াতে পল্‌তোরাৎস্কি আঙুল বাড়িয়ে তাকে দেখিয়ে দিল। হাজি মুরাদ তার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল; ডান হাতটা বুকের উপর রেখে তাতার ভাষায় কি যেন বলে থামল। দো-ভাষী চেচেনটি সে কথা বুঝিয়ে বলল: সে বলছে, "রাশিয়ার জারের কাছে আমি আত্মসমর্পণ করছি। আমি তার সেবা করতে চাই। অনেকদিন আগেই এটা আমি চেয়েছিলাম, কিন্তু শামিল আমাকে তা করতে দেয় নি।"

দো-ভাষীর কথা শুনে ভরন্ত্‌সভ দস্তানা-পরা হাতটা বাড়িয়ে দিল। হাজি মুরাদ মুহূর্তকাল ইতস্তত করে হাতটা চেপে ধরে আবার কিছু বলে প্রথমে দো-ভাষীর দিকে এবং পরে ভরন্ত্‌সভের দিকে তাকাল।

"সে বলছে, তুমি ছাড়া আর কারও কাছে সে আত্মসমর্পণ করবে না, কারণ তুমি সর্দারের ছেলে আর সে তোমাকে খুব শ্রদ্ধা করে।"

ভরন্ত্‌সভ মাথা নেড়ে ধন্যবাদ জানাল। দলের লোকদের দেখিয়ে হাজি মুরাদ আবার কিছু বলল।

"সে বলছে, এরা সবাই তার অনুচর; সকলে তার মতই রুশদের সেবা করবে।"

ভরন্ত্‌সভ তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার মাথা নাড়ল।

ভরন্ত্‌সভ ও হাজি মুরাদ দলবল নিয়ে দুর্গে ফিরে গেলে সৈনিকরা ছুটি পেয়ে দলে দলে ভাগ হয়ে নানা রকম মন্তব্য করতে লাগল।

"ওই বদমাশ লোকটা কত মানুষকে মেরেছে! এবার দেখো ওকে নিয়ে তারা কি কাণ্ড করে।

"খুবই স্বাভাবিক। সে ছিল শামিলের ডান হাত, আর এখন—কোন ভয় নেই।"

"তবু—লোকটি ভাল—রীতিমত একজন সাহসী ঘোড়সওয়ার।"

"আর ওই লাল লোকটা। সে তো জন্তুর মত ট্যাঁড়া চোখে তাকায়।"

"উঃ। যেন একটা শিকারী কুকুর!"

যেখানে কাঠ কাটা চলছিল সেখানে রাস্তার কাছে লোকগুলো ছুটে এল তাদের দেখতে। তাদের অফিসার চেঁচিয়ে ডাকল, কিন্তু ভরন্ত্‌সভ তাকে থামিয়ে দিল।

"পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে ওদের একবার দেখা করতে দাও।"

তারপর কাছের সৈনিকটিকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি জান ও কে?"

"না ইয়োর এক্সেলেন্সি।"

"হাজি মুরাদ। .... নাম শুনেছ?"

"না শুনে কি পারি ইয়োর এক্সেলেন্সি? অনেকবারই তো তাকে হটিয়ে দিয়েছি।"

"হ্যাঁ। আবার তার হাতে মারও খেয়েছি।"

সৈনিকটি বলল, "সেটা সত্যি কথা ইয়োর এক্সেলেন্সি।"

হাজি মুরাদ বুঝতে পারল, ওরা তার কথাই বলছে। তার চোখ দুটি হেসে উঠল যেন।

খুশি মনে ভরন্ত্‌সভ দুর্গে ঢুকল।

৬

আর কেউ নয়, একমাত্র সেই হাজি মুরাদকে দলে টানতে পেরেছে, এতে যুবক ভরন্ত্‌সভ খুব খুশি—শামিলের পরে সেই তো রাশিয়ার প্রধান ও সক্রিয় শত্রু। বাড়িতে ঢুকে হাজি মুরাদের অনুচরদের রেজিমেন্ট-অ্যাড্‌জুটান্টের হেপাজতে ছেড়ে দিয়ে হাজি মুরাদকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে ঢুকল।

প্রিন্সেস মারিয়া ভাসিলেভ্‌না ও তার ছোট ছেলের সঙ্গে বসার ঘরেই হাজি মুরাদের দেখা হয়ে গেল। প্রিন্সেস সুন্দর সাজগোজ করেছে, মুখটা হাসিতে ভরা; ছ' বছরের সুন্দর ছেলেটির মাথা-ভর্তি কোঁকড়া চুল। হাজি মুরাদ বুকে হাত রেখে দো-ভাষীর সাহায্যে জানাল, নিজেকে সে প্রিন্সের কুনাক (অন্তরঙ্গ ভাই) বলে মনে করে, কারণ প্রিন্স তাকে নিজের বাড়িতে এনে তুলেছে; কুনাকের মতই তাঁর গোটা পরিবারই তার চোখে সমান পবিত্র।

হাজি মুরাদের চেহারায় ও আচরণে মারিয়া ভাসিলেভ্‌না বেশ খুশি হল। তার উপর নিজের সাদা হাতখানা বাড়িয়ে দিতে সে যখন লজ্জায় লাল হয়ে উঠল তখন প্রিন্সেসের তাকে আরও বেশী ভাল লাগল। তাকে বসতে বলে প্রিন্সেস তার জন্য কফি আনতে বলল। কিন্তু সে কফি নিল না। সে রুশ ভাষা

কিছু কিছু বোঝে, কিন্তু বলতে পারে না। তাকে বলা কোন কথা না বুঝতে পারলে সে হাসে; সেই হাসি মারিয়া ভাসিলেভ্‌নাকে আরও খুশি করল। কোঁকড়া-চুল, তীক্ষ্ণ-চোখ ছোট ছেলেটি (মা তাকে বুল্কা বলে ডাকে) পাশে বসে এক দৃষ্টিতে হাজি মুরাদকে দেখে; অনেকদিন থেকেই সে শুনে আসছে যে লোকটি খুব বড় যোদ্ধা।

হাজি মুরাদকে স্ত্রীর কাছে রেখে ভরন্তসভ তার আপিসে গেল প্রয়োজনীয় কাজ সারতে। প্রথমে একটা প্রতিবেদন লিখল বাম ব্যূহের প্রধান জেনারেল কজ্‌লোভ্‌স্কিকে; তারপর একটা চিঠি লিখল বাবাকে। তারপরেই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেল; না জানি সেই ভয়ংকর অতিথিটিকে নিয়ে তার স্ত্রী কতখানি বিব্রত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এটা তার অকারণ আশংকা। ভরন্তসভের বি-পুত্র ছোট্ট বুল্কাকে হাঁটুর উপর বসিয়ে হাজি মুরাদ বসে আছে একটা হাতল-চেয়ারে, আর মারিয়া ভাসিলেভ্‌না হাসতে হাসতে যে কথা বলেছে দো-ভাষীর মুখে তার ব্যাখ্যা শুনছে মাথাটা নীচু করে একান্ত মনযোগের সঙ্গে।

প্রিন্স ঘরে ঢুকতেই হাজি মুরাদ বুল্কাকে নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল; তার হাসিখুশি মুখটা কেমন যেন গম্ভীর ও কঠোর হয়ে উঠল। ভরন্তসভ একটা আসনে বসলে তবে সে নিজেও বসল।

আলোচনার জের টেনে মারিয়া ভাসিলেভ্‌নার প্রশ্নের জবাবে জানাল, কুনাক কোন জিনিসের প্রশংসা করলে সেটা তাকে উপহার দেওয়াই তাদের সমাজের রীতি।

ততক্ষণে ছেলেটি আবার তার হাঁটুর উপর উঠে বসেছে। তার চুলে হাত বুলিয়ে রুশ ভাষায় সে বলল, "তোমার ছেলে, কুনাক।"

মারিয়া ভাসিলেভ্‌না ফরাসী ভাষায় স্বামীকে বলল, "খুব মজার লোক তোমার এই দস্যুটি। বুল্কা তার ছুরিটার প্রশংসা করায় সে ওটা তাকে দিয়ে দিয়েছে।"

ছুরিটা বাবাকে দেখিয়ে বুল্কা বলল, "খুব দামী জিনিস।"

ভরন্তসভ বলল, "সুযোগমত আমরাও তাকে একটা উপহার দিয়ে দেব।"

চোখ নীচু করে ছেলেটির কোঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে হাজি মুরাদ বলতে লাগল, "ঝিগিৎ। ঝিগিৎ। (সাহসী অশ্বারোহী!)

ছুরির ধারালো ফলাটা অর্ধেক বের করে ভরন্তসভ বলল, "সুন্দর, সুন্দর ছুরিটা। তোমাকে ধন্যবাদ।" দো-ভাষীকে বলল, "ওকে জিজ্ঞাসা কর ওর জন্য কি করতে পারি।"

দো-ভাষী কথাটা অনুবাদ করে দিলে হাজি মুরাদ সঙ্গে সঙ্গে জানাল, তার আর কিছু চাই না, শুধু নামাজ করার মত একটা জায়গার ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক।

ভরন্ত্‌সভ খানসামাকে ডেকে বলে দিল, হাজি মুরাদের ইচ্ছামত সব ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক।

তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে একাকি হওয়ামাত্রই হাজি মুরাদের মুখটা বদলে গেল। খুশি-খুশি ভাবের পরিবর্তে মুখে ফুটে উঠল উৎকণ্ঠা। ভরন্ত্‌সভ তার প্রতি আমার অতিরিক্ত ভাল ব্যবহার করেছে। কিন্তু তাদের ব্যবহার যত বেশী ভাল হয়েছে ততই ভরন্ত্‌সব ও তার অফিসারদের উপর হাজি মুরাদের ভরসা কমেছে। তার অনেক রকম ভয়: তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে, শিকল পরানো হতে পারে, সাইবেরিয়ায় পাঠানো হতে পারে, এমন কি মেরে ফেলাও হতে পারে, আর তাই সে সর্বদাই সতর্ক থাকে। এল্ডার ঘরে ঢুকলে সে মুরাদদের ঘোড়াগুলির খোঁজ করল। এল্ডার জানাল, ঘোড়াগুলিকে রাখা হয়েছে প্রিন্সের আস্তাবলে, লোকজনদের রাখা হয়েছে গোলাঘরে, অস্ত্রশস্ত্র যার যার সঙ্গেই আছে, আর দো-ভাষীই তাদের খাদ্য ও চা জোগান দিচ্ছে।

হাজি মুরাদ সন্দেহের ভঙ্গীতে মাথা নাড়তে লাগল। পোশাক ছেড়ে নামাজ শেষ করে এল্ডারকে তার রূপোর ছুরিটা আনতে বলল। তারপর পোশাক পরে, কোমরবন্ধ এঁটে ডিভানে পা ভেঙে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

বিকেল চারটেয় দো-ভাষী এসে তাকে নিয়ে গেল প্রিন্সের সঙ্গে আহার করতে।

খেতে বসে সে প্রায় কিছুই খেল না; শুধু যে থালা থেকে মারিয়া ভাসিলেভ্‌না পোলাও তুলে নিয়েছিল সেখান থেকে কিছুটা পোলাও নিয়ে খেল।

মারিয়া ভাসিলেভ্‌না স্বামীকে বলল, "ওর ভয় হয়েছে আমরা ওকে বিষ খাওয়াব।" হাজি মুরাদের দিকে ফিরে দো-ভাষীর মারফৎ জানতে চাইল, সে আবার কখন নামাজ পড়বে। পাঁচটা আঙুল তুলে হাজি মুরাদ সূর্যকে দেখাল। "তাহলে তো অবিলম্বেই সময় হয়ে যাবে," বলে ভরন্ত্‌সভ পকেট-ঘড়িটা বের করে স্প্রিংটা টিপল। ঘড়িতে সোয়া চারটে বাজল। হাজি মুরাদ অবাক হয়ে ঘড়ির শব্দটা আর একবার শুনতে চাইল; ঘড়িটা দেখতেও চাইল।

প্রিন্সেস স্বামীকে বলল, "এই সুযোগ! ঘড়িটা ওকে দিয়ে দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে ভরন্ত্‌সভ হাজি মুরাদকে ঘড়িটা দিল।

বুকের উপর হাত রেখে হাজি মুরাদ ঘড়িটা নিল। বার কয়েক স্প্রিং টিপে শব্দ শুনে খুশিতে মাথা নাড়তে লাগল।

ডিনারের পরে মেলার-জাকোমেলস্কির এড-ডি-কং ঘরে ঢুকে প্রিন্সকে জানাল, হাজি মুরাদের আগমনের সংবাদ শুনে প্রিন্স খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছে, কারণ ব্যাপারটা তাকে জানানো হয় নি; তার হুকুম, হাজি মুরাদকে যেন অবিলম্বে তার কাছে পাঠানো হয়। ভরন্ত্‌সভ উত্তরে জানাল, সেনাপতির

হুকুম অবশ্য তামিল করা হবে; দো-ভাষীর মারফৎ হাজি মুরাদকে হুকুমটা জানিয়ে দিয়ে তাকে মেলায়ের কাছে যেতে বলল।

খবর শুনে মারিয়া ভাসিলেভ্না বুঝতে পারল, এই নিয়ে তার স্বামী ও সেনাপতির মধ্যে একটা মন-কষাকষি হতে পারে; তাই স্বামীর আপত্তি সত্ত্বেও সে স্থির করল, তারাও হাজি মুরাদের সঙ্গে যাবে।

"তুমি বাড়িতে থাকলেই ভাল করতে…এটা আমার কাজ, তোমার নয়।"

"আমি যদি সেনাপতির স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাই তা তুমি ঠেকাতে পার না।"

"তুমি অন্য সময়ও যেতে পারতে।"

"কিন্তু আমি এখনই যেতে চাই।"

কোন উপায় নেই। ভরন্ত্সভ রাজী হল। তিনজনই গেল।

সেখানে পৌঁছলে মেলার গম্ভীর ভদ্রতার সঙ্গে মারিয়া ভাসিলেভ্নাকে স্ত্রীর কাছে নিয়ে গেল; এড-ডি-কংকে বলল হাজি মুরাদকে বসার ঘরে নিয়ে যেতে; পরবর্তী হুকুমের আগে তাকে যেন ছেড়ে দেওয়া না হয়।

পড়ার ঘরের দরজা খুলে প্রিন্সকে আগে ঢুকতে দিয়ে ভরন্ত্সভকে বলল, "দয়া করে…।"

ঘরে ঢুকে প্রিন্সকে বসতে না বলেই তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল: "আমি এখানকার সেনাপতি। কাজেই শত্রুপক্ষের সঙ্গে সব আলাপ-আলোচনা আমার মারফতেই করতে হবে। হাজি মুরাদ আমাদের দলে এসেছে একথা আমাকে জানাও নি কেন?"

উত্তেজনায় বিবর্ণমুখে ভরন্ত্সভ জবাব দিল, "একজন দূত এসে খবর দিল, সে একমাত্র আমার সঙ্গেই সন্ধি করতে ইচ্ছুক।"

"আমি জানতে চাইছি আমাকে খবর দেওয়া হল না কেন?"

"আমি আপনাকে খবর দিতে চেয়েছিলাম ব্যারণ, কিন্তু…"

"তুমি আমাকে 'ব্যারণ' বলে সম্ভাষণ করবে না, বলবে 'ইয়োর এক্সেলেন্সি'।" তারপরই ব্যারণের অনেকদিনের অবরুদ্ধ ক্রোধ হঠাৎ ফেটে পড়ল; যে কথাগুলি অনেকদিন ধরেই তার মনের মধ্যে টগবগ করছিল সেটাই সে বলে ফেলল।

"কেবলমাত্র পারিবারিক সম্পর্কের জোরে যারা মাত্র গতকাল চাকরিতে ঢুকেছে নিজেদের অধিকারের মাত্রা ছাড়িয়ে তারাই আমার নাকের উপর হুকুম জারি করে চলবে—সেটা দেখার জন্য আমি সাতাশ বছর ধরে সম্রাটের সেবা করি নি।"

ভরন্ত্সভ বাধা দিয়ে বলল, "ইয়োর এক্সেলেন্সি, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, যা সত্য নয় সেকথা বলবেন না।"

আরও রেগে সেনাপতি বলল, "যা সত্য তাই আমি বলছি; আমি

কিছুতেই…”

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ঘাগড়ার খসখসানি শব্দ তুলে ঘরে ঢুকল মারিয়া ভাসিলেভ্‌না; সঙ্গে একটি বিনীত চেহারার ছোটখাট মহিলা—মেলার-জাকোমেল্‌স্কির স্ত্রী।

মারিয়া ভাসিলেভ্‌না বলল, “শুনুন, শুনুন ব্যারণ। আপনাকে অখুশি করার ইচ্ছা সাইমনের ছিল না।”

“আমি সেকথা বলছি না প্রিন্সেস…”

“আহা, সেসব ভুলে যান।…আপনি তো জানেন, 'ভাল ঝগড়ার চাইতে খারাপ সন্ধিও ভাল।'…আরে, আমি এসব কী বলছি।” মহিলাটি হেসে উঠল।

সুন্দরীর মোহময় হাসির কাছে ক্রুদ্ধ সেনাপতি হার মানল। তার গোঁফের উপর হাসি খেলে গেল।

ভরন্ত্‌সভ বলল, “আমি স্বীকার করছি আমার ভুল হয়েছিল, কিন্তু—”

“আর আমিও একটু বেশী রেগে গিয়েছিলাম,” বলে মেলার প্রিন্সের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

নতুন করে সন্ধি হল; স্থির হল, আপাতত হাজি মুরাদ সেনাপতির কাছেই থাকবে, পরে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বাম ব্যূহের সেনাপতির কাছে।

হাজি মুরাদ পাশের ঘরেই বসে ছিল, এদের কথাবার্তা না বুঝলেও যেটুকু বোঝা দরকার তা সে ঠিকই বুঝতে পেরেছে—যথা, তাদের ঝগড়াটা তাকে নিয়েই, সে যে শামিলকে ছেড়ে এদের দলে এসেছে সেটা এদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, আর তাই এরা তাকে নির্বাসনে পাঠাবে না, মেরেও ফেলবে না, কিন্তু সে এদের কাছ থেকে অনেক কিছু দাবী করতে পারবে। সে আরও বুঝতে পেরেছে, কম্যাণ্ডিং-অফিসার হলেও অধীনস্থ ভরন্ত্‌সভের উপর তার খুব একটা জোর নেই; ভরন্ত্‌সভই আসল লোক, মেলার জাকোমেল্‌স্কি নয়। সুতরাং মেলার জাকোমেল্‌স্কি যখন তাকে ডেকে এনে জেরা করতে লাগল তখন হাজি মুরাদ গর্বোদ্ধত কণ্ঠে বলল, সে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে সাদা জারকে সেবা করতে; তাই একমাত্র তার সর্দার অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি তিফ লিসের প্রিন্স ভরন্ত সভ সিনিয়রের কাছে সে জবাবদিহি করবে।

৭

আহত আভ্‌দীভ্‌কে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। দুর্গের মুখেই বোর্ডের ছাদওয়ালা একটা ছোট কাঠের বাড়ি। সাধারণ ওয়ার্ডের একটা

খালি বিছানায় তাকে শুইয়ে দেওয়া হল। ওয়ার্ডে রোগীর সংখ্যা চার। সকলেই নবাগতকে ঘিরে ধরে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল।

ডাক্তার এল। বুলেটটা পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে কি না দেখার জন্য আহত লোকটিকে উপুড় করে দিতে বলল।

রোগীর পিঠে ও কোমরে বড় বড় সাদা ক্ষত-চিহ্ন দেখে ডাক্তার প্রশ্ন করল, "এসব কি?"

আর্তনাদ করে আভ্‌দীভ্‌ বলল, "ওগুলো অনেক দিন আগেকার ইয়োর অনার!"

মদ খেয়ে টাকা উড়িয়ে দেবার জন্য তাকে যখন চাবুক মারা হয়েছিল এ সব তারই দাগ।

আভ্‌দীভ্‌কে আবার উল্টে দেওয়া হল। কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও ডাক্তার পেটের ভিতর থেকে বুলেটটা বের করতে পারল না। ঘাটাকে ড্রেস করে তার উপর প্লাস্টার লাগিয়ে চলে গেল।

ঘরে ঢুকল তার বন্ধু পানভ ও সেরোগিন। আভ্‌দীভ্‌ একইভাবে শুয়ে থেকে অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে সহকর্মীদের চিনতে পারল।

পানভ বলল, "পিটার, বাড়িতে কোন খবর পাঠাতে চাও কি?"

আভ্‌দীভ্‌ জবাব দিল না; পানভের দিকে তাকিয়ে রইল।

বুঝি বা জ্ঞান ফিরে পেল।

"ওঃ!·· ····পানভ!"

"হ্যাঁ, আমি!····আমি এসেছি! বাড়িতে কোন খবর পাঠাবে? সেরোগিন চিঠিটা লিখে দিতে পারে।"

অনেক কষ্টে সেরোগিনের দিকে তাকিয়ে আভ্‌দীভ্‌ বলল, "সেরোগিন··· তুমি লিখবে?·····...আচ্ছা। তাহলে এই রকম লেখ: 'তোমার ছেলে পিটার জানাচ্ছে তুমি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে। সে তার ভাইকে ঈর্ষা করে···কিন্তু আজ সে খুশি। তাকে দুঃখ দিওনা····তাকে বেঁচে থাকতে দাও। ঈশ্বর তাকে বাঁচতে দিন। আমি খুশি!' এই কথাগুলি লেখ।"

কথাগুলি বলে সে নীরবে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পানভের দিকে।

হঠাৎ প্রশ্ন করল, "তোমার পাইপটা পেয়েছ?"

পানভ জবাব দিল না।

"তোমার পাইপ ..তোমার পাইপ। আমি বলছি, সেটা পেয়েছ কি?" আভ্‌দীভ্‌ বার বার বলতে লাগল।

"আমার ব্যাগের মধ্যে ছিল।"

"ঠিক আছে!...আচ্ছা, আমার হাতে একটা মোমবাতি দাও তো। .... আমি মরতে চলেছি," আভ্‌দীভ্‌ বলল।

ঠিক তখনই পল্‌তোরাৎস্কি ঘরে ঢুকল।

বলল, "ও কেমন আছে হে? খুব খারাপ?"

আভ্‌দীভ্‌ চোখ বুজে নেতিবাচকভাবে মাথা নাড়ল। তার চওড়া-চোয়ালের মুখটা বিবর্ণ ও কঠোর। কোন জবাব দিল না। আবার পানভকে বলল, "একটা মোমবাতি আন···আমি মরতে চলেছি।"

তার হাতে একটা জলন্ত মোমবাতি দেওয়া হল; কিন্তু আঙুলগুলি না বাঁকায় মোমবাতি হাতের মধ্যে রেখে অন্য একজন ধরে রইল।

পল্‌তোরাৎস্কি চলে গেল। পাঁচ মিনিট পরে আর্দালি আভ্‌দীভের বুকে কান রেখে বলল, "সব শেষ হয়ে গেছে।"

তিফ্‌লিসে পাঠানো প্রতিবেদনে আভ্‌দীভের মৃত্যুর এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হল:

"২৩শে নভেম্বর।—কুরিন রেজিমেণ্টের দুই কোম্পানি সৈন্য একটা গাছ-কাটা অভিযানে দুর্গ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। দুপুরবেলা পাহাড়িদের একটা বড় দল হঠাৎ কাঠ-কাটাদের আক্রমণ করে। বন্দুকবাজরা পিছু হঠতে থাকলেও ২নং কোম্পানিটি সঙ্গীন উঁচিয়ে আক্রমণ চালিয়ে পাহাড়িদের হটিয়ে দেয়। এই সংঘর্ষে দু'জন প্রাইভেট সামান্য আহত হয় ও একজন মারা যায়। পাহাড়িদের প্রায় শ'খানেক লোক হতাহত হয়।

৮

পিটার আভ্‌দীভ্‌ যেদিন ভজ্‌দ্‌ভিজেনস্ক-এর হাসপাতালে মারা যায় সেই দিনই তার বুড়ো বাবা দাদার স্ত্রী ও বয়স্থা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে জমাট বরফের মেঝের উপর ওট ঝাড়াইয়ের কাজ করছিল।

আগের রাতে ভারী বরফ পড়েছে। সকালেও ঘন হয়ে পড়ছে ছেঁড়া-ছেঁড়া তুষার। মোরগরা যখন তৃতীয়বার ডাকল তখনই বুড়োর ঘুম ভেঙে গেল। বরফ-জমা জানালার কাঁচের ভিতর দিয়ে উজ্জ্বল চাঁদের আলো দেখে বুড়ো স্টোভের উপর থেকে নেমে এল, বুটজোড়া পরল, ছাগলের চামড়ার কোট ও টুপি চাপাল, তারপর ঝাড়াই-ঘরে চলে গেল। সেখানে ঘণ্টা দুই কাজ করে ঘরে ফিরে এসে ছেলে ও মেয়েদের জাগাল। তারপর সকলে ঝাড়াই-ঘরে ফিরে গিয়ে কাজ শুরু করল।

চাঁদ ডুবে গিয়ে ভোর হল। তখন বড় ছেলে আকিম এসে কাজে যোগ দিল।

কাজ থামিয়ে নিজের ঝাড়নের উপর ভর দিয়ে বাবা চেঁচিয়ে বলল, "এতক্ষণ কি করছিলে বাপু?"

"ঘোড়াগুলোকে দেখতে হবে তো।"

তার নকল করে বাবা বলল, "ঘোড়াগুলোকে দেখতে হবে তো! সে কাজটা বুড়িই করবে।...এখন ঝাড়ন হাতে নাও। মদ খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি তো বাগিয়েছ বেশ।"

"তোমার পয়সায় তো খাই না," ছেলেও জবাব দিল।

"কী?" কঠিন চোখ তুলে বুড়ো বলল।

ছেলে নিঃশব্দে ঝাড়ন তুলে নিল; চারটে ঝাড়ন একসঙ্গে ঝাড়াইয়ের কাজে লেগে গেল।

"ট্রাক, টপাটম...ট্রাক, টপাটম... ট্রাক...."

"আরে, গর্দানখানা তো বানিয়েছ বেশ ভদ্রলোকের মত। আর এদিকে দেখ তো, আমার ট্রাউজারটা তো আর পরাই যায় না," বুড়ো বলল।

এক সারি ঝাড়াইয়ের কাজ শেষ হয়ে গেল। মেয়েরা উকনঠেঙা দিয়ে খড় সরাতে লাগল।

"পিটারটা বোকা, তাই তোমার বদ্‌লি হয়ে গেছে। সেনাবাহিনীতে ঢুকলে মজাটা টের পেতে। আর বাড়ির কাজ সে তো একাই করত তোমার মত পাঁচজনের সমান।"

ছেলের বৌ বলল, "খুব হয়েছে বাবা।"

"তা তো বটেই; ছ' জনকে খাওয়াব, অথচ কেউ কুটোটি নাড়বে না। পিটার একা দুজনের কাজ করত।

এই সময় বাকলের জুতো পরে বুড়োর বৌ এসে হাজির হল। বলল, "প্রাতরাশ তৈরী...সব্বাই চলে এস। বুঝলে?"

"ঠিক আছে", আকিমকে উদ্দেশ্য করে বুড়ো বলল, "ছিট-ছিট কালো ঘোড়াটাকে জিন পরিয়ে মজুরদের কাজ দেখতে চলে যাও।...দেখ, সেদিনকার মত আবার আমাকে বিপদে ফেলো না।...পিটার থাকলে এত কথা বলতে হত না।"

আকিমও পাল্টা জবাব দিল, "সে যখন বাড়িতে ছিল তখন তো তাকেও বকতে। এখন সে চলে গেছে, তাই তার গুণ-কীর্তনে একেবারে পঞ্চমুখ।"

এবার মাও যোগ দিল, "তবেই বোঝ। তুমি কোনদিন পিটারের সমান হতে পারবে না।"

ছেলে বলল, "ওহো, ঠিক আছে।"

"'ঠিক আছে'—বটে! বললেই হল 'ঠিক আছে'।"

ছেলের বৌ বলল, "যা হবার তা তো হয়েই গেছে। সেসব ভুলে যাও।"

অনেকদিন ধরেই—বলতে গেলে পিটার সৈনিক হয়ে চলে যাবার পর থেকেই বাপ ও ছেলের মধ্যে খিটিমিটি লেগেই আছে। তখনই বাবার মনে হয়েছিল, কোকিলের বদলে সে একটি ঈগলকে ছেড়েছে। অবশ্য বুড়োর মতে কাজটা সে ঠিকই করেছে—একটি পারিবারিক লোকের বদলে একজন

সন্তানহীনকে পাঠানোই ঠিক হয়েছে। আকিমের চারটি সন্তান, পিটারের একটিও নয়। কিন্তু পিটার ছিল তার বাবার মতই কর্মঠ, কৌশলী, শক্ত-সমর্থ, আর পরিশ্রমী। সে চলে যাওয়াতে বুড়ো দুঃখ পেয়েছে, কিন্তু কোন উপায় তো ছিল না। তখনকার দিনে আবশ্যিক সেনাদলে যোগদান ছিল মৃত্যুর মত। সৈনিক তো গাছের একটা কাটা ডালের মত; বাড়িতে তার কথা ভাবা মানেই অকারণে হৃৎপিণ্ডকে ছিন্ন করা। তবু বড় ছেলেকে খোঁচা দেবার জন্যই বুড়ো মাঝে মাঝে তার কথা বলে। কিন্তু মা প্রায়ই ছোট ছেলের কথা ভাবে—এক বছরের বেশী হয়ে গেল সে প্রায়ই স্বামীকে বলে পিটারকে কিছু টাকা পাঠাতে, কিন্তু বুড়ো কান দেয় না।

আজ আবার নতুন করে তার কথা উঠে পড়ায় বুড়ি আবার তাকে অন্তত এক রুবল ছোট ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ জানাল। বুড়োও রাজী হয়ে গেল।

বুড়ো যখন শহরে নিয়ে বিক্রি করার জন্য ছিয়ানব্বই বস্তা ওট বোঝাই করে তিনটে স্লেজ প্রস্তুত করল, তখন তার স্ত্রী গির্জার কেরাণীকে দিয়ে একটা চিঠি লিখিয়ে বুড়োর হাতে দিল। বুড়োও কথা দিল, শহরে পৌঁছে চিঠির সঙ্গে এক রুবল জুড়ে দিয়ে সঠিক ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে।

শহরে পৌঁছে সরাইওয়ালাকে চিঠিটা পড়তে বলে বুড়ো মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল।

চিঠিতে পিটারের মা প্রথমে তাকে আশীর্বাদ পাঠিয়ে তারপরে সকলের অভিনন্দন জানিয়েছে এবং তার ধর্মবাপের মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছে। শেষে লিখেছে, আক্সিনিয়া (পিটারের স্ত্রী) তাদের বাড়ি ছেড়ে চাকরি করতে চলে গেছে; তবে তারা শুনেছে যে সেখানে সে সৎভাবে জীবন যাপন করছে এবং ভাল আছে। তারপর একটি রুবলের কথা উল্লেখ করে উপসংহারে চোখের জলে ভিজিয়ে মনের কথাগুলি জানিয়েছে, আর গির্জার কেরাণীও হুবহু সেই কথাগুলি লিখে দিয়েছে।

"আর একটি কথা, সোনা আমার, ছোট পাখিটি আমার, আমার পিটারকিন। তুমি আমার চোখের আলো, তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে আমার চোখ যে অন্ধ হয়ে গেল। কার কাছে তুমি আমাকে রেখে গেছ?....এ পর্যন্ত বলে বুড়ি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলেছিল: "ওতেই হবে!" কিন্তু নিয়তির বিধান নয় যে স্ত্রীর গৃহত্যাগের খবর, বা রুবল পাঠানোর খবর, অথবা মার শেষ কথাগুলি পিটারের কাছে পৌঁছয়। টাকাসমেত চিঠিটা ফেরৎ এল; সেই সঙ্গে খবর এল যে "জার, পিতৃভূমি ও ধর্মকে রক্ষা করতে গিয়ে পিটার যুদ্ধে মারা গেছে।" সেনাবাহিনীর কেরাণী এই কথাগুলিই লিখেছে।

খবরটা পেয়ে বুড়ি অনেকদিন কেঁদে কাটাল। তারপর আবার কাজকর্ম করতে লাগল। মাত্র একটি বছর একসঙ্গে কাটালেও বিধবা আক্সিনিয়াও খবর

শুনে অনেক কাঁদল। কিন্তু মনে মনে সে খুশিই হল, কারণ যে দোকানিটির ~~সঙ্গে সে~~ এখন বাস করে তার দ্বারা সে গর্ভবতী হয়েছে; দোকানি তাকে আগেই কথা দিয়েছে সে তাকে বিয়ে করবে, আর সেক্ষেত্রে কেউ আর তার নিন্দা করতে পারবে না!

৯

মাইকেল সেমিনোভিচ ভরন্ত্‌সভ একজন রুশ রাষ্ট্রদূতের ছেলে। ইংলণ্ডেই লেখাপড়া করেছে বলে সেই ধরনের ইওরোপীয় শিক্ষা সে পেয়েছে যা সেকালের উচ্চপদস্থ রুশ কর্মচারিদের মধ্যে খুবই বিরল। সে উচ্চাকাংখী, শান্ত এবং অধীনস্থ কর্মচারিদের প্রতি সদয়; আবার উর্ধ্বতন কর্মচারিদের প্রতি তার আচরণ সম্পূর্ণ ক্রটিহীন। সর্বপ্রকার উচ্চ সম্মান ও পদকটি সে লাভ করেছে; সকলেই তাকে সম্মান করে একজন কুশলী সেনাপতি, এমন কি ক্রাস্‌নোয়েতে নেপোলিয়নের বিজয়ী হিসাবে।

১৮৫২-তে তার বয়স হয়েছে সত্তরের উপরে, কিন্তু বয়সের তুলনায় তাকে ছোট দেখায়; চাল-চলনে চটপটে এবং বুদ্ধিদীপ্ত আচরণের অধিকারী বলে সে সকলের কাছেই জনপ্রিয়। প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী সে—নিজের এবং স্ত্রীর (কাউণ্টেস ব্রানিৎস্কি হিসাবে) সম্পত্তি মিলিয়ে—আবার ভাইস্‌রয় হিসাবে মোটা মাইনেও পায়। ক্রিমিয়ার দক্ষিণ উপকূলে একটি প্রাসাদ তৈরী এবং একটা বাগান গড়ে তুলতে বেশ কিছু টাকা ব্যয় করেছে।

১৮৫২-র ৪ঠা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় জনৈক সংবাদবাহকের ত্রয়কা এসে দাঁড়াল তার তিফ্‌লিসের প্রাসাদের সামনে। রুশ বাহিনীর কাছে হাজি মুরাদের আত্মসমর্পণের খবর দিয়ে জেনারেল কজ্‌লোভ্‌স্কি এই ক্লান্ত, ধুলিমলিন অফিসারটিকে পাঠিয়েছে। চওড়া গাড়ি-বারান্দায় ঢুকে সে পায়ের মাংসপেশীগুলোকে একটু টানটান করে নিল। ছ'টা বাজে। ভরন্ত্‌সভ নৈশ ভোজনে যাবে এমন সময় সংবাদবাহকের আসার খবর তাকে জানানো হল। তখনই তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ায় নৈশ ভোজনে কয়েক মিনিট দেরী হয়ে গেল।

ত্রিশজনকে নৈশ ভোজনে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ বসেছে প্রিন্সেস এলিজাবেথ জাভিরেভ্‌না ভরন্ত্‌সভার পাশে, কেউবা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে জানালার আশে পাশে। ভরন্ত্‌সভ বসার ঘরে ঢুকতেই সকলে তার দিকে মুখ ফেরাল। তার পরনে কালো মিলিটারি কোট, কাঁধে পট্টি আছে কিন্তু কোন স্কন্ধত্রাণ নেই, গলায় ঝুলছে অর্ডার অব সেণ্ট জর্জের সাদা ক্রুশ।

পরিষ্কার কামানো শেয়ালের মত মুখে হাসি ফুটিয়ে সে সকলকে একবার দেখে নিল। মৃদু পায়ে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে বিলম্ব ঘটার জন্য মহিলাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল ; তারপর বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সের প্রাচ্য ধরনের দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী মহিলা প্রিন্সেস মানানা ওর্বেলিয়ানির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল তাকে নিয়ে আসনে বসিয়ে দেবার জন্য। প্রিন্সেস এলিজাবেথ জাভিরেভ্না হাতে হাত মেলাল তিফ্লিস পরিদর্শনে আগত খোঁচা-খোঁচা গোঁফওয়ালা লাল-চুল এক সেনাপতির সঙ্গে। অন্য সকলে কেউ জোড়ায়, কেউবা এককভাবে গিয়ে নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়ল। তকমাধারী পরিচারকরা চেয়ারগুলো ঠিক করে দিল, আর প্রধান পরিবেশক রূপোর পাত্র থেকে গরম সুপ ঢেলে দিতে লাগল।

দীর্ঘ টেবিলের একদিকে মাঝখানে বসল ভরন্ত্সভ। আর তার বিপরীত দিকে সেনাপতিকে ডাইনে নিয়ে বসল তার স্ত্রী। প্রিন্সের ডাইনে বসল সুন্দরী ওর্বেলিয়ানি আর বাঁয়ে বসল হীরে-মুক্তোয় ঝলমল, হাস্যমুখী এক লাল-কপোল জর্জীয় সুন্দরী।

দূত কি খবর এনেছে স্ত্রীর এই প্রশ্নের উত্তরে ভরন্ত্সভ বলল, "চমৎকার খবর গো! সাইমনের ভাগ্য ভাল!" তারপর সকলকে শুনিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল হাজি মুরাদের আত্মসমর্পণ ও দু' একদিনের মধ্যেই তাকে তিফ্লিসে নিয়ে আসার খবর।

সকলেই চুপ করে শুনতে লাগল।

প্রিন্সেস পার্শ্ববর্তীকে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা জেনারেল, আপনার কি হাজি মুরাদের সঙ্গে কখনও দেখা হয়েছে?"

"একাধিকবার হয়েছে প্রিন্সেস।"

সেনাপতি বলতে আরম্ভ করল কেমন করে ১৮৪৩-এ পাহাড়িরা গের্গেবেল দখল করার পরে হাজি মুরাদ জেনারেল পাহ্লেনের সেনাদলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং তাদের চোখের সামনেই কর্ণেল জলোতুখিনকে হত্যা করেছিল।

সেই প্রসঙ্গেই হাজি মুরাদের সঙ্গে দ্বিতীয় সংঘর্ষের কথাও উঠল।

"সে কি, ইয়োর এক্সেলেন্সির নিশ্চয় মনে আছে, 'বিস্কুট' অভিযানে উদ্ধারকারী দলটিকে যে আত্মগোপনকারী পাহাড়ি দলটি আক্রমণ করেছিল তাদেরও নেতৃত্বে ছিল এই হাজি মুরাদ।"

চোখ কুঁচকে ভরন্ত্সভ শুধাল, "কোথায়?"

সাহসী সেনাপতিটি যে 'উদ্ধারকারী' দলটির কথা বলল আসলে সেটি দুর্ভাগ্যজনক দার্গো অভিযানের একটি ঘটনা ; সেই অভিযানে প্রিন্স ভরন্ত্সভ পরিচালিত একটা গোটা বাহিনীই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত যদি না নতুন সেনাদল এসে তাদের উদ্ধার করত। সকলেই জানে, প্রিন্স ভরন্ত্সভ পরিচালিত দার্গো অভিযানে রুশদের অনেক সৈন্য হতাহত হয়েছে, অনেক কামান নষ্ট

হয়েছিল। সেটা একটা লজ্জাজনক ঘটনা।

তাই সে ঘটনার উল্লেখে সকলেই অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। তবে সে অস্বস্তি কাটিয়ে দিল জর্জিয়ার প্রিন্স। সে হঠাৎ বলে বসল কেমন করে হাজি মুরাদ মেখ্‌তুলির আহ্‌মেত খানের বিধবা পত্নীকে অপহরণ করেছিল।

"রাতের বেলা গ্রামে ঢুকে সে যা চেয়েছিল তাই হাতিয়ে নিল এবং গোটা দল নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে গেল।"

প্রিন্সেস শুধাল, "বিশেষ করে ওই স্ত্রীলোকটিকেই সে চেয়েছিল কেন?"

"ওঃ, সে ছিল স্বামীর শত্রু; তাই তার বিধবা পত্নীর উপর সে প্রতিশোধ নিয়েছিল।"

"কী ভয়ংকর?" চোখ বুজে মাথা নেড়ে কাউন্টেস বলে উঠল।

ভরন্ত্‌সভ হেসে বলল, "না, না! আমি শুনেছি, বন্দিনীর সঙ্গে সে ভদ্র ব্যবহার করেছে, এবং পরে তাকে মুক্তি দিয়েছে।"

"হ্যাঁ, মুক্তি-পনের বিনিময়ে।"

"তা তো বটেই। কিন্তু ভাল ব্যবহার তো করেছে।"

মোট কথা, সারাক্ষণ ধরে হাজি মুরাদকে নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। প্রত্যেকেই একের পর এক তার সাহস, ক্ষমতা, ও উদারতার প্রশংসা করতে লাগল। কেউ কেউ অবশ্য একথাও বলল যে, সে ছাব্বিশজন বন্দীকে হত্যার হুকুম দিয়েছিল। কিন্তু তার জবাবে অন্যরা বলল, "কী আর করা যাবে বল? যুদ্ধ তো যুদ্ধই।"

"সে একজন মহান মানুষ।"

জর্জিয়ার প্রিন্স বলল, "ইওরোপে জন্মালে সে হয় তো আর একজন নেপোলিয়ন হতে পারত।"

ভরন্ত্‌সভ বলল, "ঠিক নেপোলিয়ন হয় তো হত না, তবে অশ্বারোহী বাহিনীর একজন সাহসী সেনাপতি অবশ্যই হতে পারত।"

"নেপোলিয়ন না হলে মুরাত হত।"

"তার নাম হাজি মুরাদ!"

একজন মন্তব্য করল, "হাজি মুরাদ আত্মসমর্পণ করেছে; এবার শামিলের খেলাও সাঙ্গ হবে।"

"তারা বুঝতে পেরেছে এখন (অর্থাৎ ভরন্ত্‌সভের আমলে) আর বাহাদুরি চলবে না।"

মানানা ওর্বেলিয়ানি বলল, "এ সবই আপনার কল্যাণে হয়েছে।"

নৈশ ভোজনের পর সকলে বসার ঘরে হাজির হলে সেখানে কফি পরিবেশন করা হল। প্রিন্স ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে কথা বলল। তারপর এসে তাসের টেবিলে বসল। ডালার উপর প্রথম আলেক্সান্দারের ছবি আঁকা সোনার নস্য-দানিটা পাশে রেখে অত্যন্ত ঝকঝকে এক প্যাকেট তাস বের

করে সকলকে দিতে যাবে এমন সময় ইতালীয় খানসামাটি রুপোর পাত্রে একটা চিঠি এনে দিল।

"আর একজন সংবাদবাহক ইয়োর এক্সেলেন্সি।"

ভরন্তসভ তাস রেখে চিঠি খুলে পড়তে লাগল।

ছেলের চিঠি। লিখেছে হাজি মুরাদের আত্মসমর্পণ ও মেলার-জাকোমেলস্কির সঙ্গে তার সংঘাতের কথা।

প্রিন্সেস এগিয়ে এসে জানতে চাইল ছেলে কি লিখেছে।

"সেই একই কথা।....স্থানীয় কম্যাণ্ড্যাণ্টের সঙ্গে কিছুটা খটাখটি হয়েছে। ত্রুটিটা সাইমনের।....তবে সব ভাল যার শেষ ভাল।" চিঠিটা স্ত্রীর হাতে দিয়ে খেলুড়েদের কাছে ফিরে গিয়ে তাস বেটে দিতে বলল। তাসগুলো প্রথম বারের মত দেওয়া হয়ে গেলে খোস মেজাজে থাকলে সাধারণত ভরন্তসভ যা করে থাকে ঠিক সেই কাজটিই করল: কুঁচকে-যাওয়া সাদা হাত দিয়ে এক টিপ্ ফরাসী নস্য তুলে নিয়ে সেটাকে নাকে গুঁজে দিয়ে নাকটা ঝাড়ল।

১০

পরদিন হাজি মুরাদ যখন প্রিন্সের প্রাসাদে এসে হাজির হল তখন বসার ঘরটা লোকে ভর্তি। গতকালের সেই খোঁচা-খোঁচা গোঁফওয়ালা জেনারেল হাজির হয়েছে পুরো ইউনিফর্মে বুকে-কাঁধে সম্মান-পদক ঝুলিয়ে। সে বিদায় নিতে এসেছে। এসেছে একজন রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার কমি-সারিয়েটের তহবিল তছরূপের অভিযোগের কোর্ট-মার্শালের হাত এড়াবার ধান্ধা করতে। যুদ্ধে নিহত জনৈক অফিসারের স্ত্রী এসেছে একটা পেন্সন অথবা সন্তানদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে। গির্জার বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরে পাবার তদ্বির করতে জমকালো পোশাক পরে এসেছে জর্জিয়ার এক প্রিন্স। একজন খানও এসেছে শুধু প্রিন্সের সঙ্গে একবার দেখা করতে।

হাজি মুরাদ যখন ঈষৎ খুঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকল তখন সকলেই তার দিকে ফিরে তাকাল; মুখে-মুখে উঠল তার নামের গুঞ্জন।

একটা পা ছোট হওয়ায় শরীরটাকে দোলাতে দোলাতে সে এগিয়ে গেল। কারও দিকে ফিরে তাকাল না।

প্রিন্সের দো-ভাষী প্রিন্স তর্খানভ এগিয়ে এসে হাজি মুরাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। একজন দর্শনার্থী প্রিন্সের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই এড-ডি-কং হাজি মুরাদকে ডেকে প্রিন্সের ঘরের দরজাটা দেখিয়ে দিল।

হাজি মুরাদ প্রধান সেনাপতির টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রিন্সের

বার্ধক্যজীর্ণ মুখে কালকের মত হাসি নেই ; যেমন কঠোর, তেমনি গম্ভীর।

কোনরকম তাড়াহুড়া না করে হাজি মুরাদ অতি স্পষ্ট উচ্চারণে কুম্য়িক কথ্য ভাষায় বলতে লাগল :

"মহান জারের ও আপনার শক্তিমান আশ্রয়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছি, আর প্রতিজ্ঞা করছি আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে শ্বেত জারকে সেবা করব। আমি আশা রাখি, আমার ও আপনার শত্রু শামিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমি আপনার কাজে লাগতে পারব।"

দো-ভাষীর মুখে কথাগুলি শুনে ভরন্ত্‌সভ তাকাল হাজি মুরাদের দিকে, আর হাজি মুরাদ তাকাল ভরন্ত্‌সভের দিকে।

দুজনের চোখে চোখ পড়ল এবং সে দৃষ্টি-বিনিময় পরস্পরকে এমন কিছু বলল যা কথায় বলা যায় না—যা দো-ভাষীর কথার চাইতেও কিছু বেশী। ভরন্ত্‌সভের চোখ বলছে, হাজি মুরাদের একটি কথাও সে বিশ্বাস করে না; সে জানে, যা কিছু রুশ হাজি মুরাদ তারই শত্রু ছিল এবং চিরদিন থাকবে; বাধ্য হয়েছে বলেই সে আত্মসমর্পণ করেছে। হাজি মুরাদও তা বুঝল, তবু নিজের বিশ্বস্ততার কথাই বলতে লাগল। তার চোখ বলছে, "ঐ বুড়ো মানুষটির উচিত মৃত্যুর কথা ভাবা, যুদ্ধের কথা নয়; কিন্তু বুড়ো হলেও সে ধূর্ত; তাই আমাকে সতর্ক থাকতে হবে।" ভরন্ত্‌সভ তাও বুঝল, তবু হাজি মুরাদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে লাগল যাকে সে যুদ্ধজয়ের জন্য দরকারী বলে মনে করে।

ভরন্ত্‌সভ বলল, "ওকে বল যে আমাদের সম্রাট যেমন করুণাময় তেমনি শক্তিমান; আমার অনুরোধে তিনি হয় তো ওকে ক্ষমা করবেন এবং কাজে লাগাবেন। ... বলেছ তো? যতক্ষণ আমার প্রভুর সদয় সিদ্ধান্ত না পাচ্ছি ততক্ষণ নিজের দায়িত্বেই আমি ওকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং এখানে সবরকম স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

হাজি মুরাদ আবারও বুকের মাঝখানে হাত রেখে উৎসাহের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

দো-ভাষী অনুবাদ করে বলল, "ও বলছে, পূর্বে ১৮৩৯-এ সে যখন আভরিয়া শাসন করত তখনও সে বিশ্বস্ততার সঙ্গে রুশদের সেবা করেছে, আর তার শত্রু আহ্‌মেত খান যদি তাকে ধ্বংস করার বাসনায় জেনারেল ক্লুগেনোর কাছে তার নিন্দাবাদ না করত তাহলে সে কখনও রুশদের পরিত্যাগ করত না।"

"আমি জানি, আমি জানি," ভরন্ত্‌সভ বলল (যদিও একসময় জানলেও অনেক আগেই সেসব কথা সে ভুলে গেছে)। নিজে আসনে বসে এবং দেয়ালের পাশের ডিভানটা হাজি মুরাদকে দেখিয়ে ভরন্ত্‌সভ আবার বলল, "আমি জানি।" হাজি মুরাদ কিন্তু বসল না; দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে যে এমন

একজন পদস্থ লোকের সামনে বসতে পারে না সেই কথাটাই ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়ে দো-ভাষীকে সম্বোধন করে বলল :

"আহ্‌মেত খান ও শামিল দুজনই আমার শত্রু। প্রিন্সকে বলে দাও, আহ্‌মেত খান মরে গেছে, তাই তার উপর প্রতিশোধ নিতে পারব না, কিন্তু শামিল বেঁচে আছে, তার উপর প্রতিশোধ না নিয়ে আমি মরব না।" ঠোঁট চেপে ভুরু কুঁচকে সে কথাগুলি বলল।

ভরন্তসভ বলল, "খুব ভাল, খুব ভাল। কিন্তু ঠিক কি সে করতে চায়? .... বস, বস!"

হাজি মুরাদ বসল। জানাল, তারা যদি তাকে লেস্‌খিয়ান সীমান্তে পাঠায় এবং একটি বাহিনীকে তার সঙ্গে দেয়, তাহলে গোটা দাঘেস্তানকে সে দলে টানতে পারবে; তখন আর শামিল তাকে ঠেকাতে পারবে না।

"সেটা চমৎকার হবে .... কথাটা ভেবে দেখব", ভরন্তসভ বলল।

দো-ভাষী ভরন্তসভের কথাটা অনুবাদ করে দিলে হাজি মুরাদ কি যেন ভাবল। পরে বলল, "সর্দারকে আরও একটা কথা বলে দাও। আমার পরিবার রয়েছে শত্রুর হাতে; যতক্ষণ তারা পাহাড়ে থাকবে ততক্ষণ আমার হাত-পা বাঁধা, আমি তার সেবা করতে পারব না। আমি যদি প্রকাশ্যে শামিলের বিরোধিতা করি তাহলে সে আমার স্ত্রী, আমার মা, ও আমার ছেলেমেয়েদের খুন করবে। প্রিন্স আগে বন্দীদের বিনিময়ে আমার পরিবারকে এখানে নিয়ে আসুন, তারপর আমি হয় শামিলকে শেষ করব, নয় তো নিজে মরব।"

ভরন্তসভ বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি ভেবে দেখব। .... এখন ওকে সর্দারের কাছে নিয়ে যাও এবং ওর বর্তমান অবস্থা ও মনের ইচ্ছা তাকে বুঝিয়ে বল।"

এইভাবে হাজি মুরাদ ও ভরন্তসভের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎকার শেষ হল।

সেদিন সন্ধ্যায় প্রাচ্য রীতিতে সুসজ্জিত নতুন রঙ্গমঞ্চে একটা ইতালীয় অপেরা অভিনীত হচ্ছিল। ভরন্তসভ বসে ছিল বক্সে। এমন সময় পাগড়ি-পরিহিত খোঁড়া হাজি মুরাদ দেখা দিল স্টলে। সে এসেছে ভরন্তসভের এড্‌-ডি-কং লোরিস-মেলিকভের সঙ্গে। তারা বসল একেবারে সামনের সারিতে। একটা অংক দেখেই হাজি মুরাদ দর্শকদের চোখের সামনে হল থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন সোমবার। ভরন্তসভের ভবনে যথারীতি সান্ধ্য আসর বসেছে। উজ্জ্বলভাবে আলোকিত বড় হলটাতে গাছের আড়ালে ব্যাণ্ডের সুর বাজছে। যুবতী নারীরা এবং যুবতী নয় এমন নারীরাও খালি গলা, বাহু, ও বুক খোলা পোশাক পরে ইউনিফর্ম-পরা পুরুষদের বক্ষলগ্না হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছে। বুফের সময় হলে সুবেশ পরিচারকরা মহিলাদের জন্য পরিবেশন করল

শ্যাম্পেন ও মিষ্টি। বয়স হওয়া সত্ত্বেও সর্দারের স্ত্রীও একই রকম অর্ধ-পোশাকে সজ্জিত হয়ে মিষ্টি হেসে হেসে অতিথিদের সঙ্গে কথা বলছে। দো-ভাষীর মারফৎ হাজি মুরাদকেও কয়েকটা মিষ্টি কথা বলল। হাজি মুরাদ কিন্তু একই উদাসীন দৃষ্টিতে সকলকে দেখল। গৃহ-কর্ত্রীর পরে একে একে অপর অর্ধনগ্ন নারীরাও তার কাছে এগিয়ে এসে নির্লজ্জের মত দাঁড়াল এবং হেসে হেসে একই প্রশ্ন শুধাতে লাগল: যা কিছু দেখছে তা তার কেমন লাগছে? সোনার স্কন্ধত্রাণ পরে ভরন্ত্সভ নিজেও এগিয়ে এসে ঐ একই প্রশ্ন করল। অন্য সকলের মত তাকেও হাজি মুরাদ জানাল যে তার নিজের সমাজে এ রকমটা কখনও করা হয় না; এটা ভাল কি মন্দ সে বিষয়ে কোন মতামতই সে প্রকাশ করল না।

এগারোটা বাজলে হাজি মুরাদ লোরিস-মেলিকভকে জিজ্ঞাসা করল, এবার সে চলে যেতে পারে কিনা। লোরিস-মেলিকভ জানাল তা পারে, তবে থেকে যাওয়াই ভাল। তা সত্ত্বেও হাজি মুরাদ আর সেখানে থাকল না; ফিটনে চড়ে তার জন্য নির্দিষ্ট বাসায় ফিরে গেল।

১১

হাজি মুরাদের তিফ্লিসে আসার পর পঞ্চম দিনে ভাইস্রয়ের নির্দেশে তার এড্-ডি-কং এল তার সঙ্গে দেখা করতে।

সেই একই কূটনৈতিক ভঙ্গিমায় মাথা নীচু করে বুকে হাত রেখে হাজি মুরাদ বলল, "আমার মস্তিষ্ক ও হাত দুটি সর্দারের সেবা করতে পেরে খুশি। আদেশ করা হোক!"

লোরিস-মেলিকভ বসল টেবিলের পাশে রাখা হাতল চেয়ারটাতে, আর বিপরীত দিকের নীচু ডিভানে বসে হাঁটুর উপর হাত রেখে মাথা নীচু করে হাজি মুরাদ মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনতে লাগল।

লোরিস মেলিকভ খুব দ্রুত তাতার ভাষা বলতে পারে। বলল, যদিও প্রিন্স তার অতীত জীবনের খবর রাখে তবু সমস্ত কাহিনীটা সে তার কাছ থেকেই শুনতে চায়।

"তুমি বল, আমি সব লিখে নেব। তারপর সেটা অনুবাদ করিয়ে প্রিন্স পাঠিয়ে দেবে সম্রাটের কাছে।"

সম্রাট তার কাহিনী শুনবে জেনে খুশি হয়ে হাজি মুরাদ বলল, "তা করতে পারি, কিন্তু বলার কথা যে অনেক—অনেক। অনেক ঘটনাই তো ঘটেছে!"

লোরিস-মেলিকভ বলল, "যদি একদিনে সবটা বলতে না পার, অন্যদিন

শেষ করো।"

"প্রথম থেকেই শুরু করব কি?"

"হ্যাঁ, একেবারে শুরু থেকে ···· কোথায় জন্মেছিলে, কোথায় বড় হয়েছিলে—সব।"

হাজি মুরাদ অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর ডিভানের পাশ থেকে একটা লাঠি তুলে নিয়ে সোনার কাজ-করা হাতির দাঁতের বাঁটওয়ালা ছোট ছুরিটা বের করে লাঠির গায়ে শান দিতে দিতে কথা বলতে লাগল।

"লেখ: পাহাড়িদের ভাষায় 'গাধার মাথার মাপের' ছোট আওল সেলমেস-এ জন্ম। অনতিদূরে দুই কামানের গোলার পথ পেরিয়ে খুন্‌জাখে বাস করত খানরা। আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাদের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল।

"আমার সব চাইতে বড় দাদা ওস্‌মান যখন জন্মাল তখন আমার মা সকলের বড় খান আবু নুৎসাল খানকে প্রতিপালন করল। তারপর খানের দ্বিতীয় ছেলে উম্মা খানকে প্রতিপালন করল। কিন্তু আমার মেজদা আখ্‌মেত মারা যাবার পরে যখন আমি জন্মালাম এবং খান্‌শার কোলে এল বুলাচ খান তখন মা তার ধাইয়ের কাজ করতে রাজী হল না; বাবা তাকে যেতে বলল, তবু মা গেল না; বলল, "আবার আমার নিজের ছেলেকে মেরে ফেলব; আমি যাব না।" বাবা তখন রেগে একটা ছুরি বের করে মাকে আঘাত করল। সকলে এসে ছাড়িয়ে না নিলে মাকে মেরেই ফেলত। এইভাবে মা আমাকে ছেড়ে গেল না; এই নিয়ে পরে মা একটা গানও বেঁধেছিল ··· কিন্তু সে কথা থাক।"

"তোমাকে সব কথা বলতে হবে। বলাটা দরকারী," লোরিস-মেলিকভ বলল।

হাজি মুরাদ ভাবতে লাগল। তার মনে পড়ল, সাক্লিয়ার ছাদের উপর একটা লোমের কোটের উপর মা তাকে নিজের পাশে শুইয়ে দিয়েছিল, আর সে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল এখনও তার ক্ষত চিহ্নটা কোথায় দেখা যায়।

মনে পড়ে যাওয়াতে সে গানটা গাইতে লাগল:

"ইস্পাতের ফলায় আমার সাদা বুকটা ফাঁক হয়ে গেল,
কিন্তু আমার উজ্জ্বল সূর্য সোনার বাছাকে আমি
বুকের মধ্যে চেপে ধরলাম,
আর তার শরীরটা যেন স্নান করে উঠল আমার রক্তে।
কোন ওষুধ বা ঘাসের প্রলেপ ছাড়াই ঘা শুকিয়ে গেল।
আমি তো মৃত্যুকে ভয় করি নি, তাই আমার ছেলেও
তাকে ভয় করবে না।"

তারপর সে বলল, "আমার মা এখন শামিলের হাতে; তাকে উদ্ধার করতেই

হবে।"

পাহাড়ের নীচেকার ঝর্ণাটাকে তার মনে আছে; মার শারোভারি (তুর্কী পাজামা) ধরে সে তার সঙ্গে যেত জল আনতে। মনে পড়ে, সেই প্রথমবার মা তার মাথা কামিয়ে দিয়েছিল; আর দেয়ালে ঝোলানো পিতলের পাত্রের গায়ে তার গোলাকার নীলাভ মাথার ছবি ফুট উঠতে দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। মনে পড়ে, একটা শুঁটকো কুকুর তার মুখ চেটে দিয়েছিল মায়ের দেওয়া লেপেস্‌খির (এক রকম পিঠে) ধোঁয়াটে টক দুধের গন্ধ এখনও তার মনে আছে। একবার তাকে একটা ঝুড়িতে ভরে মা তাকে নিয়ে গিয়েছিল গোলাবাড়িতে ঠাকুর্দার সঙ্গে দেখা করতে। তার মনে আছে, ঠাকুর্দার শরীর ছিল কুঁচকে-যাওয়া আর মাথার চুল ছিল সাদা; পেশীবহুল হাত দিয়ে সে রুপোর উপর হাতুড়ি পেটাত।

মাথাটা ঝাঁকিয়ে সে বলতে লাগল। "কাজেই মা তো ধাইয়ের কাজ করতে গেল না, আর খান্‌শা আর একজন ধাই ঠিক করল। তবু সে মাকে ভালবাসত, আর মাও মাঝে মাঝেই ছেলেদের নিয়ে খান্‌শার প্রাসাদে যেত। আমরাও তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করতাম। খান্‌শা আমাদেরও ভালবাসত।"

"অল্পবয়সী খানরা ছিল তিনজন: আবু নুৎসাল খান ছিল আমার দাদা ওসমানের ধাই-ভাই; উম্মাখান আমার পাতানো-ভাই, আর সকলের ছোট বুলাচ খান—যাকে শামিল পাহাড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু সেটা আরও পরের ঘটনা।

"আমার যখন বছর ষোল বয়স তখন মুরিদরা (শিষ্য) আওলে আসতে শুরু করল। কাঠের খড়্গ দিয়ে পাথরে ঘা দিয়ে তারা চীৎকার করে বলত, "মুসলমানগণ, ঘজভাত!" চেচেনরা সকলেই মুরিদবাদে দীক্ষা নিল; অন্যরাও সে দলে যোগ দিতে শুরু করল। আমি তখন খানদের ভাইয়ের মতই তাদের প্রাসাদে বাস করছিলাম। যা খুশি তাই করতাম, বেশ ধনীও হয়েছিলাম। আমার ঘোড়া ছিল, অস্ত্রশস্ত্র ছিল, টাকা-পয়সা ছিল। কোন চিন্তা-ভাবনা ছিল না; বেশ খুশিতেই ছিলাম। এমন সময় ইমাম কাজী-মুল্লাকে হত্যা করা হল, আর হমজাদ তার স্থলাভিষিক্ত হল। খানদের কাছে দূত পাঠিয়ে জানাল, তারা যদি 'ঘজভাৎ'-এ যোগ না দেয় তাহলে সে খুনজাখকে ধ্বংস করে ফেলবে।"

ব্যাপারটা ভাববার মত। খানরা রুশদের ভয় করত, আবার ধর্ম-যুদ্ধে যোগ দিতেও ভয় পেত। বুড়ি খান্‌শা তার মেজ ছেলে উম্মা খানের সঙ্গে আমাকে তিফ্‌লিসে পাঠাল রুশ প্রধান সেনাপতির কাছে হমজাদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করতে। তখন তিফ্‌লিসে প্রধান সেনাপতি ছিল ব্যারণ রোজেন। সে আমাদের কাউকেই অভ্যর্থনা জানাল না। আমাদের সাহায্য

করবে বলে খবর পাঠাল, কিন্তু কিছুই করল না। শুধু তার অফিসাররা ঘোড়ায় চড়ে এসে উম্মাথানের সঙ্গে তাস খেলতে লাগল। তারা তাকে মদ খাইয়ে খারাপ জায়গায় নিয়ে যেত। তাদের সঙ্গে তাস খেলে সে সর্বস্ব খোয়াল। তার শরীর ছিল ষাঁড়ের মত শক্ত, তার সাহস ছিল সিংহের মত, কিন্তু তার মনটা ছিল জলের মত দুর্বল। আমি জোর করে সরিয়ে না আনলে সে তার শেষ ঘোড়া ও অস্ত্রও হারাত।"

"তিফ্‌লিস থেকে ফিরে এসে আমার মত পাল্টাল; বুড়ি খান্‌শা ও খানদের পরামর্শ দিলাম 'ঘজভাত'-এ যোগ দিতে।"

"তোমার মত পাল্টে গেল কেন?" লোরিস-মেলিকভ জানতে চাইল। "রুশদের ব্যবহারে তুমি কি খুশি হও নি?"

হাজি মুরাদ চুপ করে রইল। তারপর বলল, "না, খুশি হই নি। 'তাছাড়া, 'ঘজভাত'-এ যোগ দেওয়ার আরও একটা কারণ ছিল।"

"সেটা কি?"

"সেলমেসের কাছে খান ও আমি তিনজন মুরিদকে মুখোমুখি পেয়ে গেলাম; তাদের দুজন পালিয়ে গেল, আর তৃতীয়জনকে আমি গুলি করলাম।"

"তার অস্ত্রগুলি হাতাবার জন্য কাছে গিয়ে দেখলাম, সে তখনও বেঁচে আছে। আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "তুমি আমাকে মারলে....আমি খুশি হয়েছি; কিন্তু তুমি তো শক্ত-সমর্থ যুবক মুসলমান। 'ঘজভাত'-এ যোগ দাও। সেটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

"যোগ দিলে?"

"না, যোগ দেই নি, কিন্তু তার কথাগুলি আমাকে ভাবনায় ফেলল। ..হম্‌জাদ যখন খুন্‌জাখের কাছে এল তখন গ্রাম-প্রধানদের তার কাছে পাঠিয়ে জানালাম, আমরা 'ঘজভাত'-এ যোগ দিতে রাজী আছি যদি সে একজন মৌলভিকে পাঠায় ব্যাপারটা আমাদের বুঝিয়ে বলতে। হম্‌জাদ আমাদের প্রধানদের গোঁফ কামিয়ে দিল, নাক ফুটো করে ঘুটে ঝুলিয়ে দিল, আর সেই অবস্থায় তাদের ফেরৎ পাঠিয়ে দিল।"

"প্রধানরা এসে জানাল, আমাদের 'ঘজভাত' বোঝাতে হম্‌জাদ রাজী আছে অবশ্য যদি খান্‌শা জামিন হিসাবে তার ছোট ছেলেকে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়। তার কথায় বিশ্বাস করে খান্‌শা ছোট ছেলে বুলাচ খানকে পাঠিয়ে দিল। হম্‌জাদ তাকে সাদরে গ্রহণ করে অন্য দুই দাদাকেও ডেকে পাঠাল। বলে পাঠাল, তার বাবা যেমন খানদের বাবার সেবা করেছে তেমনি সেও খানদের সেবা করতে ইচ্ছুক। খান্‌শা ছিল দুর্বল, বোকা ও আত্মম্ভরী। দুটি ছেলেকেই পাঠাতে সে ভয় পেল; পাঠাল শুধু উম্মা খানকে। আমিও তার সঙ্গে গেলাম। সেখানে পৌঁছতেই হম্‌জাদ তাঁবু থেকে বেরিয়ে

এসে উম্মা খানের পা-দানির কাছে গিয়ে তাকে খান হিসাবে অভ্যর্থনা জানাল। বলল, "তোমার পরিবারের কোন ক্ষতি আমি করি নি, করবার ইচ্ছাও নেই। শুধু তুমি আমাকে মেরো না; সব লোকজন নিয়ে 'ঘজভাত'-এ যোগ দিতে আমাকে বাধা দিও না; তাহলেই আমার বাবা যেমন তোমার বাবার সেবা করেছে, তেমনি আমিও সসৈন্যে তোমার সেবা করব। আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে চল; সেখানেই তোমাকে সব রকম পরামর্শ দেব; তারপর তোমার যা খুশি তাই করো!"

"উম্মা খান বেশী কথা বলতে জানত না। কি জবাব দেবে বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল। তখন আমি বললাম, তাই যদি হয় তো হম্‌জাদ খুন্‌জাখে চলুক; খান্‌শা ও খানরা সসম্মানে তাকে বাড়িতে অভ্যর্থনা জানাবে। কিন্তু আমাকে কথা শেষ করতে দিল না—সেখানেই শামিলের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা; সে ইমামের পাশেই ছিল। বলল, "তোমাকে তো কিছু বলা হয় নি; কথা হচ্ছে খানের সঙ্গে!"

"আমি চুপ করলাম। হম্‌জাদ উম্মা খানকে নিয়ে তাঁবুতে ঢুকল। পরে আমাকে ডেকে হমজাদ তার দূতদের সঙ্গে আমাকেও খুন্‌জাখে ফিরে যেতে বলল। ফিরে গেলাম। দূতরা বড় ছেলেকেও হম্‌জাদের কাছে পাঠাতে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আমি বিশ্বাসঘাতকতার গন্ধ পেয়ে তাকে পাঠাতে নিষেধ করলাম। কিন্তু মেয়েদের বুদ্ধি তো ডিমের মাথায় চুলের মতই। সে ছেলেকে যেতে বলল। আবু মুৎসাল খানের যাবার ইচ্ছা ছিল না। তখন তার মা বলল, দেখছি তুমি ভয় পেয়েছ। "আবু মুৎসালের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল, কিন্তু আর কোন কথা না বলে ঘোড়া যুজতে বলল। আমি তার সঙ্গে গেলাম।

"উম্মা খানের চাইতেও বেশী সম্মানের সঙ্গে হম্‌জাদ আমাদের স্বাগত জানাল। নিজে ঘোড়া চালিয়ে রাইফেলের দুই গুলির পথ নেমে এসে সে আমাদের সঙ্গে দেখা করল।"

"তাঁবুতে পৌঁছে হমজাদ খানকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল; আমি ঘোড়ার কাছেই রয়ে গেলাম····

"পাহাড়ের কিছুটা নীচে থাকতেই হম্‌জাদের তাঁবুর ভিতরে গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। দৌড়ে সেখানে গিয়ে দেখলাম উম্মা খান রক্তের স্রোতের মধ্যে পড়ে আছে, আর আবু মুৎসাল মুরিদদের সঙ্গে লড়াই করছে। তার একটা গাল কেটে ঝুলে পড়েছে। এক হাতে সেটাকে চেপে ধরে অন্য হাতে সমানে ছুরি চালাচ্ছে। দেখলাম, সে হম্‌জাদের ভাইকে এক কোপে কেটে ফেলল; আর একজনকে লক্ষ্য করে ছুরি তুলতেই মুরিদরা গুলি ছুঁড়ল; সে পড়ে গেল।"

হাজি মুরাদ থামল। তার রোদে-পোড়া মুখটা রাগে কাল্‌চে লাল হয়ে

উঠল। চোখদুটি রক্তবর্ণ।

"ভয় পেয়ে আমি পালিয়ে গেলাম।"

"সত্যি? ··· আমি ভেবেছিলাম তুমি কখনও ভয় পাও নি," লোরিস-মেলিকভ বলল।

"তারপর থেকে আর কখনও ভয় পাই নি। ··· সেদিন থেকেই সে লজ্জার কথা আমি মনে করে রেখেছি; সে কথা মনে হলেই আমার সব ভয় চলে যায়!"

১২

"অনেক হয়েছে। নামাজের সময় হয়ে গেছে," বলে হাজি মুরাদ তার সার্কাসীয় কোটের ভিতরকার বুক-পকেট থেকে ভরন্ত্‌সভের ঘড়িটা বের করে সযত্নে স্প্রিংটা টিপল। অমনি ঘড়িতে সওয়া বারোটা বাজল। শিশুসুলভ হাসিটা চেপে মাথাটা একদিকে রেখে হাজি মুরাদ কান পেনে শুনল।

হেসে বলল, "কুনাক ভরন্ত্‌সভের উপহার।"

লোরিস-মেলিকভ বলল, "ভাল ঘড়ি। আচ্ছা, তাহলে এখন যাও, নামাজ কর গে। আমি অপেক্ষা করছি।"

"ভাল কথা," বলে হাজি মুরাদ শোবার ঘরে ঢুকল।

লোরিস-মেলিকভ একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। শোবার ঘরের বিপরীত দিকের দরজার কাছে গিয়ে শুনতে পেল, তাতার ভাষায় অনেক কণ্ঠের সোৎসাহ শব্দ। হাজি মুরাদের মুরিদরা কথা বলছে অনুমান করে সে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল।

পাহাড়িদের গায়ের বিশেষ ধরনের চামড়ার কটুগন্ধে ঘরটা ভরে গেছে। মেঝেতে বুর্কা বিছিয়ে একচক্ষু, লাল-চুল গম্‌জালো তেলচিটে ছেঁড়া বেশ্‌মেত পরে বসে আছে। উত্তেজিতভাবে কর্কশ গলায় কি যেন বলছিল; লোরিস-মেলিকভকে ঢুকতে দেখেই চুপ করে গিয়ে হাতের চাবুকটা বুনতে শুরু করে দিল।

তার সামনে দাঁড়িয়ে খান মাহোমা সাদা দাঁত বের করে বার বার কি যেন বলছে। সুদর্শন এল্ডার আস্তিন গুটিয়ে পেরেকের সঙ্গে ঝোলানো একটা জিনকে পালিশ করছে। আসল কাজের লোক খানেফি ঘরে নেই; রান্নাঘরে রাতের খাবার তৈরী করছে।

লোরিস মেলিকভ শুধাল, "কি নিয়ে তোমরা ঝগড়া করছিলে?"

খান মাহোমা বলল, "আরে, ও তো কেবলই শামিলের প্রশংসা করে চলেছে। বলে, 'শামিল একজন মহান লোক,—শিক্ষিত, পবিত্র ও সাহসী।"

"তাকে ছেড়ে এসেও ও তার প্রশংসা করছে কেমন করে? ও কি সত্যি তাকে একজন সাধুসন্ত বলে মনে করে?"

গম্‌জালো তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "সন্ত না হলে তো লোকে তার কথা শুনত না।"

মাহোমা জবাবে বলল, "শামিল সন্ত নয়, সন্ত ছিল মন্‌সুর! সে ছিল সত্যিকারের সন্ত। সে যখন ইমাম ছিল, তখন মানুষরাও অন্য রকম ছিল। সে যখন আওলের ভিতর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেত তখন সকলে এসে তার কোটের প্রান্ত চুম্বন করত, তার কাছে সব পাপ স্বীকার করত, কোন রকম অন্যায় করবে না বলে শপথ নিত। বুড়োরা এখনও বলে—তার সময়ে সকলেই সাধুসন্তের মত জীবন কাটাত: মদ খেত না, ধূমপান করত না, নামাজে অবহেলা করত না, রক্তপাত ঘটলেও একে অন্যের পাপকে ক্ষমা করত। তখন যদি কেউ কোন টাকা বা জিনিস পেত, তাহলে সেটাকে লাঠির মাথায় বেঁধে পথের পাশে রেখে দিত। সেকালে ঈশ্বর সব কাজে লোককে সাফল্য দান করত—এখনকার মত হত না।"

গম্‌জালো বলল, "পাহাড়ি অঞ্চলে লোকে এখনও ধূমপান করে না, বা মদ খায় না।"

লোরিস-মেলিকভের দিকে চোখ টিপে খান মাহোমা বলল, "তোমার শামিল তো ছিল একজন লামোরি।"

গম্‌জালো বলল, "ঠিকই তো; লামোরি মানে তো পাহাড়ি। পাহাড়েই তো ঈগলরা থাকে।"

"বেশ বলেছ! খাসা বলেছ!" মুচকি হেসে খান মাহোমা বলল।

লোরিস-মেলিকভের হাতে রূপোর সিগারেট-কেসটা দেখে খান মাহোমা একটা সিগারেট চাইল। লোরিস-মেলিকভ যখন বলল যে তাদের তো ধূমপান নিষেধ, তখন একটা চোখ টিপে হাজি মুরাদের ঘরের দিকে মাথাটা নেড়ে বলল যে কেউ না দেখলে ধূমপান করতে দোষ নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে ধূমপান করতে শুরু করল—ধোঁয়া টানল না, অদ্ভুতভাবে লাল ঠোঁট দুটো ফুলিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

"এটা অন্যায়," বলে গম্‌জালো ঘর থেকে চলে গেল। সেদিকে চোখ টিপে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে লোরিস মেলিকভের কাছে জানতে চাইল, একটা রেশমী বেশ্‌মেত ও সাদা টুপি কোথায় কিনতে যাবে।

"সে কি, তোমার কি অত টাকা আছে?"

"আমার কাছে অনেক টাকা আছে।"

সুন্দর হাসি মুখখানাকে লোরিস-মেলিকভের দিকে ঘুরিয়ে এল্‌দার বলল, "ওকে জিজ্ঞাসা কর তো টাকাটা কোথায় পেল।"

"ও হো, ওটা তো আমি জিতে নিয়েছি," বলে খান মাহোমা আগের

দিন তিফ্‌লিসের পথে হাঁটতে হাঁটতে কিছু রুশ ও আর্মেনীয়ের সঙ্গে "আর্লিয়াংকা" (একধরনের জুয়া) খেলার বিস্তারিত বিবরণ দিতে শুরু করল।

লোরিস-মলিকভ বলল, "কি করে খেললে? তোমার কি অত টাকা ছিল?"

মুচকি হেসে খান মাহোমা বলল, "আমার কাছে ছিল মাত্র বারো কোপেক।"

"কিন্তু যদি হেরে যেতে?"

"কেন? এটা ছিল।" বলে খান মাহোমা তার পিস্তলটা দেখাল।

"সে কি? ওটা দিয়ে দিতে?"

"তা কেন? সেখান থেকে পালিয়ে যেতাম, আর কেউ বাধা দিতে এলে তাকেই শেষ করে দিতাম—বাস!"

"তাহলে তুমি জিতলে?"

"হ্যাঁ, সবটা জিতে নিয়ে চলে এলাম।"

খান মাহোমা ও এল্ডার যে কি চরিত্রের লোক এ থেকেই লোরিস-মেলিকভ সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারল। কিন্তু সে বুঝতে পারল না লাল-চুল গম্‌জালোকে। লোকটা শামিলের ভক্ত। রুশদের সে ভাল চোখে দেখে না। তাহলে কেন সে তাদের দলে এসেছে? সঙ্গে সঙ্গে অন্য অনেক পদস্থ কর্মচারির মতই তার মনেও সন্দেহ দেখা দিল। হাজি মুরাদের আত্মসমর্পণ ও শামিলের প্রতি ঘৃণার কাহিনী হয় তো সবটাই বানানো; হয় তো রুশদের দুর্বল স্থানগুলির সন্ধান জানতেই সে আত্মসমর্পণ করেছে, যাতে পরে এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে তদনুসারে আক্রমণ পরিচালনা করতে পারে। গম্‌জালোর হালচাল দেখেই সে সন্দেহ দৃঢ়তর হল। সে ভাবল, "হাজি মুরাদ ও অন্য সকলে মনের কথা চেপে রাখতে জানে, কিন্তু এই লোকটা খোলাখুলিই তার রুশ বিদ্বেষের কথা প্রকাশ করে ফেলে।'

সেই সময় হাজি মুরাদের চতুর্থ মুরিদ আভার খানেফি ঘরে ঢুকল চাল নিয়ে যেতে। লোরিস-মেলিকভ তাকে থামিয়ে জানতে চাইল, সে কোথা থেকে এসেছে এবং হাজি মুরাদের সঙ্গে কতদিন আছে।

খানেফি জবাব দিল, "পাঁচ বছর। হাজি মুরাদের একই আওল থেকে আমি এসেছি। আমার বাবা তার খুড়োকে মেরে ফেলেছিল, তাই তারাও আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তখন আমি তাদের বললাম আমাকে দত্তক-ভাই নিতে।"

"দত্তক-ভাই মানে কি?"

"দু'মাস আমি মাথা কামালাম না, নখ কাটলাম না, তারপর তাদের কাছে গেলাম। তার মা পতিমাত আমাকে বুকের দুধ খাওয়াল, আর আমি তার ভাই

হয়ে গেলাম।"

হাজি মুরাদের ডাক শুনে খানেফি তাড়াতাড়ি চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে বলল, "তোমাকে ডাকছে।"

খান মাহোমাকে আর একটা সিগারেট দিয়ে লোরিস-মেলিকভ বসার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

১৩

লোরিস-মেলিকভ ঘরে ঢুকলে হাজি মুরাদ উজ্জ্বলমুখে তাকে অভ্যর্থনা করল।

ডিভানের উপর আরাম করে বসে বলল, "তাহলে আরম্ভ করি ?"

লোরিস-মেলিকভ বলল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়। তোমার অনুচরদের সঙ্গে আলাপ করছিলাম। ··· একজন বেশ মজার লোক।"

"হ্যাঁ, খান মাহোমা একটু বেশী বকবক করে", হাজি মুরাদ বলল।

"সুন্দর ছেলেটিকে আমার ভাল লেগেছে।"

"ও, সে তো এল্ডার। বয়স কম, কিন্তু দৃঢ়চেতা—লোহা দিয়ে তৈরী।"

কিছুক্ষণ দুজনই নীরব।

"তাহলে শুরু করি ?"

"হ্যাঁ। হ্যাঁ।"

"খানদের কিভাবে মারা হল তা তো বলেছি। ··· তাদের শেষ করে হম্‌জাদ ঘোড়ায় চেপে খুন্‌জাখে গেল এবং তাদের প্রাসাদেই আস্তানা নিল। পরিবারের একমাত্র খানশা তখন জীবিত। হম্‌জাদ তাকে ডেকে পাঠাল। তাকে তিরস্কার করায় হম্‌জাদ তার মুরিদ আসেল্‌দারকে চোখ টিপতেই সে পিছন থেকে আঘাত করে খানশাকেও মেরে ফেলল।

"তাকে কেন মারল ?" লোরিস-মেলিকভ শুধাল।

"আর কি করবে ? ···· সামনের পা যেখানে গেছে পিছনের পাও তো সেখানেই যাবে! গোটা পরিবারকেই সে হত্যা করল। ছোট ছেলেকে মারল শামিল—তাকে পাহাড়ের উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।····"

তখন গোটা আভারিয়া হম্‌জাদের কাছে আত্মসমর্পণ করল। কিন্তু দাদা ও আমি আত্মসমর্পণ করলাম না। খানদের রক্তের বদলে চাইলাম তার রক্ত। আমরা আত্মসমর্পণের ভান করলাম, কিন্তু আমাদের একমাত্র চিন্তা হল কেমন করে তার রক্ত ঝরাব। ঠাকুর্দার সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলাম, সে যতদিন প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে না আসে ততদিন অপেক্ষা করব এবং তারপর গোপনে তাকে হত্যা করব। কেউ আমাদের কথাবার্তা শুনে

হম্‌জাদকে বলে দেয়। সে তখন ঠাকুর্দাকে ডেকে বলল, "শোন, তোমার নাতিরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে একথা যদি সত্য হয় তাহলে তাদের সঙ্গে তোমাকেও একই কড়িকাঠ থেকে ঝুলতে হবে। আমি ঈশ্বরের কাজ করছি, কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না। ...যাও, যা বললাম মনে রেখো!"

"ঠাকুর্দা বাড়ি এসে আমাদের সব বলল।"

"তখন স্থির করলাম, আর অপেক্ষা নয়, মসজিদে ভোজসভার প্রথম দিনেই কাজ হাসিল করতে হবে। সহকর্মীরা আমাদের সঙ্গী হল না, কিন্তু দাদা ও আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

দুজন দুটো পিস্তল নিয়ে বুর্কা পরে মসজিদে গেলাম। ত্রিশজন মুরিদ সঙ্গে নিয়ে হম্‌জাদ মসজিদে ঢুকল। সকলের হাতেই খোলা তলোয়ার। তার প্রিয় মুরিদ আসেলদার (যে খান্‌শার মাথাটা কেটে ফেলেছিল) আমাদের দেখতে পেয়ে চীৎকার করে বুর্কা খুলে ফেলতে বলে আমাদের দিকে ছুটে এল। আমার হাতে ছুরিও ছিল; সেটা দিয়ে তাকে মেরে ফেলে হম্‌জাদের দিকে ছুটে গেলাম; দাদা ওসমান ততক্ষণে তাকে গুলি করেছে। কিন্তু তখনও সে জীবিত ছিল; ছুরি হাতে নিয়ে দাদার দিকে ছুটে গেল, কিন্তু তার মাথায় মোক্ষম আঘাত হানলাম। মুরিদরা সংখ্যায় ত্রিশ, আর আমরা মাত্র দুজন। দাদা ওসমানকে তারা মেরে ফেলল, কিন্তু আমি তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে গেলাম।

হম্‌জাদ মারা পড়েছে জেনে লোকজনরা রুখে দাঁড়াল। মুরিদরা পালিয়ে গেল; যারা পালাল না তারা মরল।"

হাজি মুরাদ থেমে ঘন ঘন শ্বাস টানতে লাগল।

পরে বলতে লাগল, "এতদূর পর্যন্ত ভালই চলছিল কিন্তু তারপরেই সব গোলমাল হয়ে গেল।

"হম্‌জাদের স্থলাভিষিক্ত হল শামিল। আমার কাছে দূত পাঠিয়ে জানাল, রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার সঙ্গে যোগ দেওয়া আমার কর্তব্য; আমি যদি তা না করি তাহলে সে খুন্‌জাখ ধ্বংস করবে এবং আমাকে মেরে ফেলবে।"

"আমি জানিয়ে দিলাম, তার সঙ্গে যোগ দেব না, আর তাকে আমার কাছে আসতেও দেব না ...."

"তার সঙ্গে গেলে না কেন?" লোরিস-মেলিকভ শুধাল।

হাজি মুরাদ ভুরু কুঁচকাল; সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না।

"যেতে পারলাম না। তার হাতে যে লেগেছে আমার দাদার রক্ত, আবু নুৎসাল খানের রক্ত। তার কাছে গেলাম না। জেনারেল রোজেন একটা অফিসার্স কমিশন পাঠিয়ে আমাকে আভারিয়া শাসন করবার হুকুম দিল। এসবই ভাল ছিল, কিন্তু রোজেন কাজী-কুমুখের খান হিসাবে প্রথমে

নিয়োগ করল মাহোমেত-মুর্জাকে, তারপর আখ্‌মেত খানকে ; সে আমাকে ঘৃণা করত। ছেলের সঙ্গে খান্‌শার মেয়ে সুলতানেতার বিয়ে দেবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু খান্‌শা তাতে গররাজী ; তার ধারণা হয়েছিল আমিই তার কারণ।....হ্যাঁ, আহ্‌মেত খান আমাকে ঘৃণা করত ; তার অনুচরদের পাঠিয়েছিল আমাকে খুন করতে, কিন্তু আমি পালিয়ে বাঁচলাম। তখন সে জেনারেল ক্লুগেনোর কাছে আমার নিন্দা করতে লাগল। জেনারেল অবশ্য তার কথায় বিশ্বাস করল না, বরং হুকুম জারি করল, কেউ যেন আমার গায়ে হাত না তোলে। কিন্তু জেনারেল তিফ্‌লিসে ফিরে গেলে আহ্‌মেত খান যা খুশি তাই করতে লাগল। একদল সৈন্য পাঠিয়ে সে আমাকে গ্রেপ্তার করল, একটা কামানের সঙ্গে আমাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখল।

"এইভাবে ছ'দিন কেটে গেল। সপ্তম দিনে সে আমাকে খুলে দিয়ে তেমির-খান-শুরাতে পাঠাবার ব্যবস্থা করল। গুলিভর্তি বন্দুক নিয়ে চল্লিশটি সৈনিক সঙ্গে চলল। আমার হাত দুটো বাঁধা ; আমি জানতাম পালাবার চেষ্টা করলেই তারা আমাকে গুলি করবে।

"মানসোখার কাছাকাছি পৌঁছতেই রাস্তাটা সরু হয়ে এল ; ডান দিকে প্রায় এক শ' কুড়ি গজ একটা গভীর খাদ। আমি ডানদিকে খাদের একেবারে তীরে চলে গেলাম। একটি সৈনিক আমাকে বাধা দিতে এলে তাকে নিয়েই নীচে ঝাঁপ দিলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ল, কিন্তু, দেখতেই পাচ্ছ, আমি বেঁচে গেলাম।

"পাঁজরা, মাথা, হাত, পা—সব ভাঙল। হামাগুড়ি দেবার চেষ্টা করে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। জেগে দেখলাম রক্তে ভিজে গেছি। একটি মেষ-পালক আমাকে দেখতে পেয়ে লোকজন ডেকে আওলে নিয়ে গেল। পাঁজরা ও মাথা ভাল হয়ে গেল ; পাও ভাল হল, কিন্তু একটু ছোট হয়ে গেল। এখনও তো চলাফেরা করছি, সেটাই যথেষ্ট।

"লোকজনরা খবর শুনে আমার কাছে এল। ভাল হয়ে সেল্‌মেসে ফিরে গেলাম। আভাররা আবার আমাকে ডাকল তাদের শাসন করতে, আর আমিও রাজী হলাম।"

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে সে জিনের থলের ভিতর থেকে একটা পোর্ট-ফোলিও বের করে তার ভিতর থেকে দুটো বিবর্ণ চিঠি বের করে একখানা লোরিস-মেলিকভের হাতে দিল। চিঠি দুখানা জেনারেল ক্লুগেনোর। লোরিস-মেলিকভ প্রথম চিঠিখানা পড়ল। চিঠিখানা এইরকম :

"লেফ্‌টেন্যান্ট হাজি মুরাদ, তুমি আমার অধীনে কাজ করেছ। তোমার কাজে আমি খুশি হয়েছি, এবং তোমাকে একজন ভাল লোক বলেই মনে করি।

"সম্প্রতি আহ্‌মেত খান আমাকে জানিয়েছে যে তুমি বিশ্বাসঘাতক, তুমি পাগড়ি পরেছ, শামিলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছ, এবং লোকদের বলছ

রুশ সরকারকে অমান্য করতে। আমি তোমার গ্রেপ্তারের হুকুম জারি করে তোমাকে আমার কাছে আনতে বলেছিলাম, কিন্তু তুমি পালিয়েছিলে। ভাল করেছিলে কি মন্দ করেছিলে জানি না, কারণ তুমি দোষী ছিলে কি নির্দোষ তাও আমি জানি না।

"এবার আমার কথা শোন। তোমার বিবেক যদি নিষ্কলংক হয়, যদি তুমি কোনভাবেই মহান জারের কাছে দোষী না হও, তাহলে আমার কাছে চলে এস, কাউকে ভয় করো না। আমি তোমার রক্ষাকর্তা। খান তোমার কিছুই করতে পারবে না; সে নিজেই আমার হুকুমের অধীন, কাজেই তোমার ভয়ের কিছু নেই।"

লোরিস-মেলিকভ চিঠি পড়া শেষ করলে দ্বিতীয় চিঠিখানা তার হাতে দেবার আগে হাজি মুরাদ প্রথম চিঠির জবাবে কি লিখেছিল সেটা তাকে জানাল।

"আমি লিখেছিলাম, আমি পাগড়ি পরেছি আমার আত্মার মুক্তির জন্য, শামিলের জন্য নয়; শামিলের পক্ষে যাবার ইচ্ছা আমার ছিল না, যেতে পারিও না, কারণ সে আমার বাবাকে, আমার ভাইদের ও আত্মীয়-স্বজনদের খুন করেছে; কিন্তু রুশদের সঙ্গেও আমি যোগ দিতে পারি না, কারণ তারা আমার অসম্মান করেছে। কিন্তু সব চাইতে বড় কথা, মিথ্যেবাদী আহ্‌মেত খানকে আমি ভয় করি।

"তারপর জেনারেল আমাকে এই চিঠিটা পাঠায়", বলে হাজি মুরাদ অপর বিবর্ণ কাগজটা লোরিস-মেলিকভের হাতে তুলে দিল।

সে পড়তে লাগল: "আমার প্রথম চিঠির জবাব দিয়েছ; সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি লিখেছ, ফিরে আসতে তুমি ভয় পাও না, কিন্তু কোন একজন বিধর্মী তোমায় অপমান করেছিল বলে আসতে পারছ না; কিন্তু আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, রুশ আইন ন্যায়ধর্মী: নিজের চোখেই দেখতে পাবে যে তোমায় অপমান করেছিল তার শাস্তি হচ্ছে। এ ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশও দিয়েছি।

"শোন হাজি মুরাদ। আমাকে ও আমার মর্যাদাবোধকে বিশ্বাস না করার জন্য তোমার উপর অসন্তুষ্ট হবার অধিকার আমার আছে; কিন্তু তোমাকে আমি ক্ষমা করছি, কারণ আমি জানি পাহাড়িরা সাধারণতই সন্দেহপ্রবণ। তোমার বিবেক যদি নিষ্কলংক হয়, যদি শুধুমাত্র আত্মার মুক্তির জন্যই পাগড়ি পরে থাক, তাহলে তুমি ঠিক কাজই করেছ, আর আমার দিকে এবং রুশ সরকারের দিকে সাহসের সঙ্গে চোখ তুলে তাকাতে পার। আমি কথা দিচ্ছি, যে তোমার অসম্মান করেছে তার শাস্তি হবে, তোমার সম্পত্তি তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, রুশ আইন যে কি বস্তু তা তুমি দেখতে ও বুঝতে পারবে। তাছাড়া, আমরা রুশরা সবকিছুকে অন্য চোখে দেখি;

কোন এক শয়তান তোমার অসম্মান করেছে বলেই তুমি আমাদের চোখে ছোট হয়ে যাও নি।

"সুতরাং আমি আবার বলছি, তোমার ভয়ের কিছু নেই। যে লোককে দিয়ে এই চিঠি পাঠাচ্ছি তার সঙ্গেই তুমি চলে এস। সে আমার প্রতি বিশ্বস্ত, তোমার শত্রুদের ক্রীতদাস নয়; আমাদের সরকার যাকে বিশেষ অনুগ্রহ করে সেই লোকের সে বন্ধুস্বরূপ।"

লোরিস-মেলিকভ চিঠি পড়া শেষ করলে হাজি মুরাদ বলল, "তার কথায় আমি বিশ্বাস করি নি, ক্লুগেনোর কাছে যাই নি। আমার প্রধান কাজ আহ্মেত খানের উপর প্রতিশোধ নেওয়া, রুশদের সহায়তায় সেটা করতে পারতাম না। তখন আহ্মেত খান সেলমেসকে ঘিরে ফেলল, আমাকে ধরতে বা খুন করতে চাইল। আমার লোকবল অল্প, তাই তাকে তাড়িয়ে দিতে পারতাম না। ঠিক সেই সময় একটি দূত এল শামিলের চিঠি নিয়ে; সে আমাকে কথা দিয়েছে আহ্মেত খানকে পরাস্ত করে মেরে ফেলতে এবং গোটা আভারিয়ার শাসনকর্তা হতে আমাকে সাহায্য করবে। অনেক দিন ধরে ভেবেচিন্তে শামিলের দলেই চলে গেলাম, এবং তারপর থেকেই রুশদের বিরুদ্ধে একটানা যুদ্ধ করে চলেছি।"

এখানে হাজি মুরাদ তার সামরিক অভিযানগুলির বর্ণনা দিতে লাগল, তার কিছু কিছু লোরিস-মেলিকভ আগে থেকেই জানত। তার সব অভিযান ও হামলাই অসাধারণ ক্ষিপ্রগতি ও সাহসিকতার জন্য বিখ্যাত।

"আমার ও শামিলের মধ্যে কখনও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে নি। কিন্তু সে আমাকে ভয় করত, আমাকে তার দরকার ছিল। আমাকে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করত শামিলের পরে কে ইমাম হবে; আমি বলতাম: "যার তরবারির ধার বেশী সেই হবে।"

এ কথা শামিলের কানে গেলে সে আমাকে সরিয়ে দিতে চাইল। আমাকে পাঠিয়ে দিল তারাসারিয়ানে। সেখানে গিয়ে আমি একহাজার ভেড়া ও তিন শ' ঘোড়া দখল করে নিলাম। কিন্তু সে বলল, আমি ঠিক কাজ করি নি, আমাকে নায়েবের পদ থেকে বরখাস্ত করল এবং সব টাকা ফিরিয়ে দিতে বলল। এক হাজার মোহর পাঠিয়ে দিলাম। সে তার মুরিদদের পাঠিয়ে দিল; তারা আমার সব সম্পত্তি কেড়ে নিল। সে আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলল, কিন্তু আমি জানতাম সে আমাকে খুন করতে চাইছে তাই গেলাম না। তখন সে আমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠাল। তাদের হটিয়ে দিয়ে আমি ভরন্তসভের কাছে চলে এলাম। আমার পরিবারকে সঙ্গে আনলাম না। আমার মা, স্ত্রীরা, ছেলে—সকলেই তার হাতের মুঠোয় থেকে গেল। সর্দারকে বলো, আমার পরিবার যতদিন শামিলের হাতের মধ্যে থাকবে ততদিন আমি কিছুই করতে পারব না।"

"তাকে বলব," লোরিস-মেলিকভ বলল।

কাহিনীর শেষে হাজি মুরাদ বলল, "একটু কষ্ট করো, খুব চেষ্টা করো। ... যা আমার তাতো তোমারও, প্রিন্সকে বুঝিয়ে বলো। আমার হাত-পা বাঁধা; সে দড়ির শেষ প্রান্ত শামিলের হাতে।"

১৪

২০শে ডিসেম্বর তারিখে ভরন্তসভ যুদ্ধ-মন্ত্রী চেনিশভকে চিঠি লিখল। চিঠিটা ফরাসীতে লেখা :

"প্রিয় প্রিন্স, গত ডাকে আপনাকে লিখি নি, কারণ হাজি মুরাদকে নিয়ে কি করা উচিত সে বিষয়ে আগে সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিলাম। গত দু'তিন দিন যাবৎ আমি মোটেই ভাল বোধ করছি না।

"গত চিঠিতে হাজি মুরাদের এখানে আসার কথা আপনাকে জানিয়েছি। সে তিফলিসে পৌঁচেছে ৮ তারিখে, পরদিনই তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, আর পরবর্তী সাত আট দিন ধরে তার সঙ্গে কথা বলেছি আর ভেবেছি ভবিষ্যতে তাকে আমরা কি কাজে লাগাতে পারি; বিশেষ করে বর্তমানে তাকে নিয়ে আমরা কি করব, কারণ পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন সে খুবই চিন্তিত : বেশ খোলাখুলিভাবেই সে বলছে যে তারা যতদিন শামিলের হাতে থাকবে ততদিন সে পঙ্গু, আমাদের কোন কাজই সে করতে পারবে না, বা যেরকম বন্ধুত্বপূর্ণ অভ্যর্থনা আমরা তাকে জানিয়েছি বা ক্ষমা করেছি তার জন্য আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার কোন নিদর্শনও সে দেখাতে পারবে না।

"প্রিয়জনের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাকে অস্থির করে তুলেছে; তার সঙ্গে যাদের থাকবার ব্যবস্থা করেছি তারাই আমাকে বলেছে যে সে রাতে ঘুমোয় না, প্রায় কিছুই খায় না, সব সময় প্রার্থনা করে, আর শুধু বলে কয়েকজন কসাককে সঙ্গে দিয়ে তাকে ঘোড়ায় চেপে কিছুক্ষণ বাইরে যাবার অনুমতি দেওয়া হোক—সারা জীবনের অভ্যাসের ফলে এটাই তার একমাত্র প্রমোদ ও ব্যায়াম। প্রতিদিন সে আমার কাছে এসে জানতে চায় তার পরিবারের কোন খবর পেয়েছি কি না; বলে, আমাদের হাতের সব বন্দীদের একত্র করে যেন শামিলের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাদের বদলি হিসাবে। কিছু টাকা দিতেও সে রাজী। এর জন্য তাকে কিছু টাকা দেবার মত লোকও আছে। সে আমার কাছে এসে বার বার বলছে: 'আমার পরিবারকে রক্ষা করুন, আপনার সেবা করবার একটা সুযোগ আমাকে দিন, আর যদি একমাসের মধ্যেই আপনাকে কোন বড় রকমের কাজ

দেখাতে না পারি তাহলে আপনার ইচ্ছামত যে কোন শাস্তি আমাকে দেবেন।' জবাবে আমি তাঁকে বলেছি, সে যা বলছে সবই ঠিক, কিন্তু আমার ধারণা কোন মতেই শামিল তার পরিবারকে ছেড়ে দেবে না ; বরং এই বলে ভয় দেখাবে যে হাজি মুরাদ যদি ফিরে না যায় তাহলে সে তার মা, স্ত্রীগণ, ও ছ'টি ছেলেমেয়েকে খুন করবে। তাকে আরও জিজ্ঞাসা করেছি, শামিলের কাছ থেকে এ রকম কোন ঘোষণা এলে সে কি করবে। দুই চোখ তুলে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে সে বলেছে, সবই ঈশ্বরের হাতে, কিন্তু সে কোনদিন শত্রুর হাতে নিজেকে সঁপে দেবে না, কারণ সে নিশ্চিত জানে যে শামিল তাকে ক্ষমা করবে না, কাজেই তাকে বেশীদিন বাঁচতেও দেবে না। তার পরিবারকে ধ্বংস করার ব্যাপারে সে মনে করে না যে শামিল সে রকম কোন বেপরোয়া কাজ করবেঃ প্রথমত, তাকে আরও বেশী বেপরোয়া ও বিপজ্জনক শত্রু করে তুলতে সে চাইবে না ; দ্বিতীয়ত; দাঘেস্তানে এমন অনেক প্রভাবশালী লোক আছে যারা সে রকম কোন কাজ করা থেকে শামিলকে বিরত রাখবে। আর সর্বশেষ, সে বার বার বলছে ভবিষ্যতে তার ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, বর্তমানে পরিবারের মুক্তিটাই তার কাছে সব চাইতে বড় কথা, আর তাই সে ঈশ্বরের নামে আমাকে মিনতি করছে যাতে আমি চেচ্‌নিয়ার কাছাকাছি এমন কোন অঞ্চলে তাকে পাঠিয়ে দেই যেখান থেকে আমাদের সেনাদের সহায়তায় সে তার পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে পারে। তাহলেই আমাদের কল্যাণের জন্য কাজ করে আমাদের বিশ্বাস অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব হবে।

"সে চাইছে এমন বিশ-ত্রিশজন বাছাই কসাককে সঙ্গে দিয়ে তাকে গ্রোজ্নিতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক যারা একই সঙ্গে শত্রুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করবে এবং তার উপরেও নজর রাখতে পারবে।

"প্রিয় প্রিন্স, আপনি তো বুঝতেই পারছেন যে এই সব ব্যাপার নিয়ে আমি খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছি, কারণ যাই করি না কেন একটা বড় রকমের দায়িত্ব আমার কাঁধে এসে চাপবেই। তাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা খুবই অবিবেচকের কাজ হবে, আবার তার পালাবার সব রকম পথ বন্ধ করতে হলে তাকে তালাবন্ধ করে রাখাই উচিত, অথচ আমার মতে সেটা হবে অন্যায় ও অযৌক্তিক। সে রকম কোন কাজ করা হলে সে খবর অচিরেই সারা দাঘেস্তানে ছড়িয়ে পড়বে এবং তাতে আমাদের সমূহ ক্ষতি হবে, কারণ যে সমস্ত লোক এখনও শামিলের বিরোধিতা করছে (প্রকাশ্যেই হোক আর মনে মনেই হোক) এবং ইমামের সব চাইতে সাহসী ও কর্মক্ষম যে কর্মীটি এখন বাধ্য হয়ে আমাদের হাতে এসে পড়েছে তার প্রতি আমরা কিরূপ ব্যবহার করি সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। হাজি মুরাদের প্রতি আমরা যদি বন্দীর মত আচরণ করি তাহলে এই পরিস্থিতির সব সুযোগ-

সুবিধাই আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। সুতরাং আমি মনে করি যে আমি যা করেছি তার অন্যথা করতে পারতাম না, যদিও সেই সঙ্গে আমি এটাও বুঝতে পারছি যে হাজি মুরাদ যদি পুনরায় পালাবার মতলব করে তাহলে আমার বিরুদ্ধে মস্ত বড় একটা ভুল করার অভিযোগ উঠতে পারে। এ রকম জটিল পরিস্থিতিতে কোনরকম ভুল-ভ্রান্তির ঝুঁকি না নিয়ে এবং দায়িত্ব না এড়িয়ে সোজা পথে কোন কাজ করা অসম্ভব না হলেও খুবই শক্ত, কিন্তু একবার একটা পথকে সঠিক বলে মনে হলে সে পথে আমাকে চলতেই হবে, তার ফল যাই হোক না কেন।

"প্রিয় প্রিন্স, আপনার কাছে আমার মিনতি এই বিষয়টি আপনি মহামান্য সম্রাটের বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দিন ; আমাদের মহামান্য সম্রাট যদি আমার কাজকে সমর্থন করেন তাহলে আমি খুশি হব।

"উপরে যা কিছু লিখলাম সবই আমি জেনারেল জাভদোভ্স্কি এবং কজ্লোভ্স্কিকেও লিখেছি। হাজি মুরাদকে সতর্ক করে দিয়েছি যে কজ্লোভ্স্কির অনুমতি ছাড়া সে যেন কোন কাজ না করে বা কোথাও না যায়। তাকে আমি আরও বলেছি, সে যদি আমাদের সেনাদলের সঙ্গে যায় সেটাই সব চাইতে ভাল হবে, কারণ অন্যথায় শামিল গুজব রটাতে পারে যে আমরা তাকে বন্দী করে রেখেছি ; সেই সঙ্গে তার কাছ থেকে আমি এ কথাও আদায় করেছি যে সে কখনও ভজ্দ্ভিঝেন্স্কিতে যাবে না, কারণ আমার ছেলে, যার কাছে সে প্রথমে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং যাকে কুনাক (বন্ধু) বলে মনে করে। সে সেখানকার কম্যাণ্ডার নয়, তাই কিছু অপ্রীতিকর ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে। সে যাই হোক, ভজ্দ্ভিঝেন্স্কি একটি ঘনবসতিপূর্ণ শত্রু-উপনিবেশের বড় বেশী কাছাকাছি অবস্থিত, অথচ বন্ধুদের সঙ্গে যে যোগাযোগ সে স্থাপন করতে ইচ্ছুক তার পক্ষে গ্রোজ্নিই সব দিক থেকে উপযুক্ত স্থান।

"যে বিশজন কসাক তার অনুরোধক্রমেই তার কাছাকাছি থাকবে তারা ছাড়াও ক্যাপ্টেন লোরিস-মেলিকভকেও তার সঙ্গে পাঠাচ্ছি—এই ক্যাপ্টেনটি কর্মক্ষম, চমৎকার, এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান ; সে ভাল তাতার ভাষা বলতে পারে এবং হাজি মুরাদকে ভালমতই জানে ; তার উপর হাজি মুরাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাসও আছে। যে দশটি দিন হাজি মুরাদ এখানে কাটিয়েছে সেই সময়ে সে লেফ্টেন্যান্ট—কর্নেল প্রিন্স তর্খানভের সঙ্গে একই বাড়িতে ছিল। তার উপর আমার পরিপূর্ণ আস্থা আছে। সে হাজি মুরাদের বিশ্বাসও অর্জন করেছে। যেহেতু সে তাতার ভাষা খুবই ভাল জানে, তার মারফতেই আমরা সব গোপন আলোচনা সেরেছি। সেও আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে আমি যা করেছি সেটাই করা দরকার ছিল ; অন্যথায় হাজি মুরাদকে কারাগারে বন্ধ করে কড়া পাহারায় রাখতে হত। অথবা তাকে এ দেশ থেকেই

সরিয়ে দিতে হত। কিন্তু শেষের দুটো পথ নিলে শুধু যে শামিলের সঙ্গে হাজি মুরাদের ঝগড়া থেকে উদ্ভূত সুবিধাগুলি আমাদের হাতছাড়া হয়ে যেত তাই নয়, শামিলের বিরুদ্ধে বর্তমান অসন্তোষ এবং ভবিষ্যতে বিদ্রোহের সম্ভাবনার গতিও অনিবার্যভাবে রুদ্ধ হয়ে যেত। প্রিন্স তর্কানভ নিজে আমাকে বলেছে, হাজি মুরাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে তার মনে কোন সন্দেহ নেই এবং হাজি মুরাদের স্থির বিশ্বাস যে শামিল কোনদিন তাকে ক্ষমা করবে না; ক্ষমার যত প্রতিশ্রুতিই দিক সে তাকে কোতল করবেই। হাজি মুরাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তর্খানভ মাত্র একটা বিষয় বুঝতে পেরেছে যা আমাদের উদ্বেগের কারণ হতে পারে—সেটা হচ্ছে তার ধর্মানুরাগ। সেদিক থেকে শামিল যে তাকে প্রভাবিত করতে পারে সেকথা তর্খানভও অস্বীকার করে নি। কিন্তু আমি তো আগেই বলেছি, হাজি মুরাদ তার কাছে ফিরে গেলে আজ হোক কাল হোক শামিল যে তার প্রাণনাশ করবে না এমন কথা শামিল তাকে কখনও বলবে না।

"প্রিয় প্রিন্স, এখানকার ব্যাপারে এই অধ্যায় সম্পর্কে এইটুকুই আমার বক্তব্য।"

১৫

১৮৫১-র ২৪শে ডিসেম্বর এই প্রতিবেদনটি তিফ্লিস থেকে পাঠানো হল এবং একজন দূত একডজন ঘোড়ার মুখে রক্ত তুলে দ্রুত ছুটিয়ে, একডজন চালককে পিছনে ফেলে তৎকালীন যুদ্ধ-মন্ত্রী প্রিন্স চের্নিশোভের হাতে সেটি পৌঁছে দিল নববর্ষের সন্ধ্যায়, আর ১৮৫২-র ১লা জানুয়ারি চের্নিশোভ অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে ভরন্তসভের প্রতিবেদনটি নিয়ে গেল সম্রাট নিকলাসের কাছে।

সকাল সাড়ে ন'টার সময় এক শীতার্ত সকালের (ব্যারোমিটারে তখন তাপাংক ছিল শূন্য ফারেনহিটের ১৩ ডিগ্রি নীচে) কুয়াসার ভিতর দিয়ে চের্নিশোভের দাড়িওয়ালা মোটা কোচয়ান মাথায় নীল ভেলভেটের টুপি পরে একটা ছোট স্লেজের বক্সে বসে শীতকালীন রাজভবনের ফটকে এসে থামল। কিছুক্ষণ আগেই নিকলাসের অনুরূপ স্লেজটিও এসে দাঁড়িয়েছে। তার কোচয়ানটিও মনিবকে প্রাসাদে পৌঁছে দিয়ে বসে বসে হাত ঘসছিল। চের্নিশোভের কোচয়ান তাকে দেখে বন্ধুর মত মাথা নাড়ল। চের্নিশোভের পরনে লম্বা আলখাল্লা, রুপোর কাজ-করা বীবরের লোমের ফোলানো কলার, মাথায় পালক-জড়ানো তিন-কোণা টুপি। জুতোর কাঁটায় শব্দ তুলে কার্পেট পাতা সিঁড়ি বেয়ে হল-ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে সে ভিতরে গেল। আলখাল্লাটা ছুঁড়ে দিতেই একজন তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে সেটা ধরে নিল।

একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কোঁকড়া পরচুলার উপর থেকে টুপিটা খুলে ফেলল। তারপর নিজের হাতেই চুল ও পোশাক ঠিকঠাক করে নিয়ে কার্পেট-পাতা সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠে গেল। সেখানে তাকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানাল সম্রাটের নবনিযুক্ত এড্-ডি-কং।

সহকারী যুদ্ধ-মন্ত্রী প্রিন্স ভাসিলি দল্‌গরুকি তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

মন্ত্রীসভার ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে চের্নিশোভ এড্-ডি-কংকে শুধাল, "সম্রাট ?"

হিজ ম্যাজেস্টি এইমাত্র ফিরেছেন বলেই এড্-ডি-কং সসম্ভ্রমে দরজা পার হয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

দল্‌গরুকি পোর্টফোলিওটা খুলে দেখে নিল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঠিক আছে কিনা, আর চের্নিশোভ ভুরু কুঁচকে অবশ পা দুটোর রক্ত-চলাচল ঠিক রাখতে পায়চারি করতে করতে সম্রাটকে কি বলতে হবে মনে মনে সেই কথাগুলিই ভাবতে লাগল। দরজার কাছাকাছি পৌঁছতেই সেটা আবার খুলে গেল, আর এড্-ডি-কং আগের চাইতেও সসম্ভ্রম ভঙ্গিতে মন্ত্রী ও তার সহকারীকে ভিতরে আমন্ত্রণ জানাল।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন আগেকার অগ্নিকাণ্ডের পরে শীতকালীন প্রাসাদটিকে নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু নিকলাস এখনও উপর-তলার ঘরগুলিতেই বাস করছে। যে ঘরে সম্রাট, মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করে সেটা খুব উঁচু। ঘরে চারটে বড় বড় জানালা আছে। সামনের দিকে টাঙানো রয়েছে সম্রাট প্রথম আলেকসান্দারের একখানি বড় প্রতিকৃতি। জানালাগুলির মাঝখানে দুটো ডেস্ক, আর দেয়ালের পাশে পাশে কিছু চেয়ার। ঘরের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড লেখার টেবিল, তার সামনে নিকলাসের জন্য একটা হাতল-চেয়ার এবং দর্শনার্থীদের জন্য আরও কয়েকখানি চেয়ার।

কালো কোট পরে টেবিলের পাশে বসে আছে নিকলাস। প্রকাণ্ড দেহটাকে—শক্ত করে বাঁধা ফুলে-ওঠা ভুঁড়িসমেত পিছনে হেলান দিয়ে স্থির নিষ্প্রাণ চোখে তাকিয়ে আছে নবাগতদের দিকে। লম্বা, বিবর্ণ মুখটা সেদিন যেন আরও বেশী নির্জীব ও কঠিন দেখাচ্ছে। স্বভাবত নিষ্প্রভ চোখদুটিকে আরও বেশী নিষ্প্রাণ মনে হচ্ছে। ওল্টানো গোঁফের নীচে ঠোঁট দুটি চাপা, উঁচু থুতনিকে চেপে ধরেছে, সদ্য-কামানো ফোলা গালের উপর সরু জুলফি—সব মিলিয়ে মুখের উপর নেমে এসেছে একটা খুশিহীন, এমনকি রুষ্ট ভাবের আভাষ। আগের রাতে একটা মুখোস-নাচের আসরে যোগ দেওয়ার ক্লান্তি-বশতই তার মন-মেজাজ আজ খারাপ। সেই আসরে ইতস্তত হাঁটতে হাঁটতে তার সঙ্গে পুনরায় দেখা হয়েছিল এমন একজন মুখোশধারিণীর আগেকার আর একটি মুখোশ-নাচের আসরে যার শুভ্র সুন্দর দেহ ও নরম কণ্ঠস্বর তার

বুকের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল যৌন কামনা। পরবর্তী মুখোশ-নাচের সময় তার সঙ্গে মিলনের প্রতিশ্রুতি দিয়েই সে রাতে সুন্দরীটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

গত রাতের মুখোশ-নাচের আসরে সেই সুন্দরী তার কাছে এলে সম্রাট তাকে যেতে দেয় নি, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল নিজের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট বক্সটাতে একলা কাছে পাবার আশায়। নিঃশব্দে বক্সের দরজায় পৌঁছে নিকলাস পরিচারকের খোঁজ করল, কিন্তু দেখতে পেল না। ভুরু কুঁচকে নিজেই ঠেলে দরজাটা খুলে মহিলাটিকে আগে ঢুকতে দিল।

থেমে গিয়ে মুখোসধারিণী বলল, "ওখানে কে যেন রয়েছে।"

বক্সটাতে সত্যি লোক ছিল। ভেলেভেট-মোড়া ছোট সোফায় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে একজন উহ্‌লান অফিসার ও ঊর্ধ্বাঙ্গে ছদ্মবেশপরিহিতা সুকেশী এক সুন্দরী তরুণী; তার মুখোশটা খোলা। দণ্ডায়মান নিকলাসের ক্রুদ্ধ মূর্তিটা চোখে পড়তেই মেয়েটি তাড়াতাড়ি মুখোশটা পরে ফেলল, কিন্তু উহ্‌লান অফিসারটি ভয়ে কাঠ হয়ে সোফা থেকে না উঠেই স্থির দৃষ্টিতে নিকলাসের দিকে তাকিয়ে রইল।

তার ভয়ার্ত অবস্থা দেখে খুশি হয়ে নিকলাস অফিসারটিকে বলল, "দেখ বন্ধু। তুমি তো আমার চাইতে বয়সে ছোট, তাই তোমার জায়গাটা আমাকে ছেড়ে দিলেই পার।"

অফিসারটি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার মুখটা প্রথমে বিবর্ণ ও পরে লাল হয়ে উঠল। অনেকটা ঝুঁকে পড়ে সে নিঃশব্দে সঙ্গিনীটিকে অনুসরণ করে বক্স ছেড়ে চলে গেল। সেখানে রইল শুধু নিকলাস ও মহিলাটি।

দেখা গেল, মহিলাটি বাইশ বছরের এক সুন্দরী কুমারী, জনৈকা সুইডিস গভর্ণেসের মেয়ে। সে নিকলাসকে বলল, খুব ছোটবেলা থেকেই সম্রাটের ছবি দেখে সে তার প্রেমে পড়েছিল এবং তখনই মনে মনে স্থির করেছিল যেভাবেই হোক তার মনোযোগ আকর্ষণ করবেই। আজ সে সফল হয়েছে; আর কিছুই সে চায় না।

নিকলাস সাধারণত যেখানে মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি করে এই মেয়েটিকেও সেখানেই নিয়ে গেল এবং এক ঘণ্টার বেশী সময় তার সঙ্গে কাটাল।

সে রাতে নিজের ঘরে ফিরে এসে সগর্বে নির্বাচিত ছোট শক্ত বিছানাটায় শুয়ে সেই আলখাল্লাটা দিয়ে নিজের শরীরটাকে ঢেকে নিল যেটাকে সে নেপোলিয়নের টুপির মতই বিখ্যাত মনে করে। অনেকক্ষণ তার চোখে ঘুম এল না। একবার মনে পড়ল মেয়েটির সুন্দর মুখের ভীত ও উল্লসিত ভাব, আবার মনে পড়ল তার পুরনো মিস্ট্রেস মেলিডভার চওড়া, শক্ত কাঁধের কথা। দুটোকে তুলনা করল। একজন বিবাহিত লোকের পক্ষে লক্ষণটা যে খারাপ এটা তার মাথায়ই ঢুকল না; এ জন্য কেউ তার নিন্দা করলেও সে খুবই আশ্চর্য হয়ে যেত।

তথাপি সে যে ঠিকই করেছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হলেও একধরনের অপ্রীতিকর অনুভূতি তার মনে জড়িয়েই রইল, আর সেই অনুভূতিকে চাপা দেওয়ার সেই একই চিন্তায় সে ফিরে গেল যা তাকে সব সময় শান্ত করে রাখে—সে চিন্তা তার নিজের মহত্বের।

অনেক রাতে ঘুমিয়ে পড়লেও আটটার আগেই সে উঠে পড়ল; যথারীতি স্নানাদি সেরে, প্রার্থনা শেষ করে সামরিক জোব্বা ও টুপি পরে নদীর তীরে চলে গেল।

হাঁটতে হাঁটতে প্রথম যে কথাটা মনে এল তাই উচ্চারণ করতে লাগল।

"কোপার ভাইন ··· কোপার ভাইন"—বার বার বলল, (এটা কালকের সেই মেয়েটির নাম)। "ভয়ংকর ··· ভয়ংকর"—না ভেবেচিন্তেই কথাগুলি বলল, কিন্তু সেগুলি কানে ঢুকতেই তার মনটা শান্ত হয়ে এল।

আবার সেই অসন্তোষের ভাবটা মনে আসতেই বলল, "হাঁা, আমি বিহনে রাশিয়ার কি হবে? শুধু রাশিয়ার নয়, আমি বিহনে ইওরোপের কি হবে?" "তার শ্যালক প্রাশিয়ার রাজার দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতার কথা মনে পড়াতে সে মাথা নাড়তে লাগল।

ফিরে এসে নিজের ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জুল্‌ফি, কপালের উপরকার চুল এবং টাকের উপরকার পরচুলাটা ঠিক করে নিল, গোঁফজোড়াকে উপরের দিকে পাকাল, তারপর সোজা ঢুকে গেল মন্ত্রীসভার ঘরে।

সে প্রথমেই ডাকল চের্নিশোভকে। তার মুখ, বিশেষ করে চোখ দুটি দেখেই চের্নিশোভ বুঝতে পারল সেদিন নিকলাসের মেজাজ খুব খারাপ আছে; পরে রাতের অভিযানের কথা জেনে তার কারণটাও বুঝতে পারল। প্রথমে কমিসারিয়েট অফিসারদের তহবিল তছরূপ, প্রাশিয়া সীমান্তে সৈন্য চলাচল, নববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রদেয় পুরস্কার-তালিকার একটা সংশোধনী প্রভৃতির উল্লেখ করে চের্নিশোভ হাজি মুরাদের ব্যাপারে ভরন্‌ত্‌সভের প্রতিবেদনের কথা তুলল, এবং সব শেষে একাডেমি অব্‌ মেডিসিনের একজন ছাত্র কর্তৃক জনৈক অধ্যাপকের প্রাণ নাশের চেষ্টার কথা বলল।

তহবিল তছরূপের ব্যাপারে সব কথা শুনে নিকলাস বলল, "আমার তো মনে হয় রাশিয়াতে মাত্র একজনই সৎলোক আছে, আর সবাই চোর।"

চের্নিশোভ বুঝল, সেই একমাত্র সৎলোকটি স্বয়ং নিকলাস। সম্মতিসূচক হাসির সঙ্গে বলল, "সেই রকমই তো দেখা যাচ্ছে ইয়োর ইম্পিরিয়াল ম্যাজেস্টি।"

দলিলটা নিয়ে টেবিলের একপাশে রেখে দিয়ে নিকলাস বলল, "ছেড়ে দাও—আমি যা করার করব।"

অন্যান্য বিষয়ে কথার পরে চের্নিশোভ জানতে চাইল, "আর হাজি মুরাদের ব্যাপারে ইয়োর ম্যাজেস্টির কি হুকুম?"

"কেন, ভরন্ত্সভ তো লিখেইছে, সে তাকে ককেসাসে কাজে লাগাতে চায়।"

চের্নিশোভ বলল, "সেটা কি বিপজ্জনক হবে না? আমার তো ভয় হয় ভরন্ত্সভ বড় বেশী বিশ্বাস করছে।"

নিকলাস সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, "আর তুমি—তুমি কি ভাবছ?"

"দেখুন, আমি মনে করি তাকে মধ্য রাশিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়াটাই অধিকতর নিরাপদ।"

নিকলাস ব্যঙ্গের স্বরে বলল, "তুমি মনে কর। কিন্তু আমি তা মনে করি না; ভরন্ত্সভের সঙ্গে আমি একমত। তাকে সেইভাবে লিখে দাও।"

"তাই হবে" বলে চের্নিশোভ অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

নৈশ ভোজের সময় সে হাজি মুরাদের আত্মসমর্পণের কথা জানিয়ে বলল যে বনের গাছপালা কাটিয়ে পাহাড়িদের আক্রমণের সুযোগ কমিয়ে দেওয়ায় এবং অনেকগুলি ছোট ছোট দুর্গ তৈরীর ব্যবস্থা করায় তার ফলে ককেসাসের যুদ্ধ এবার অচিরেই শেষ হয়ে যাবে।

নৈশাহারের পরে নিকলাস ব্যালে দেখতে চলে গেল। সেখানে শত শত মেয়ে আঁটো স্বল্পবাসে ঘুরে ঘুরে নাচল। তাদের একজন তাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করল। জার্মান ব্যালে-মাস্টারকে ডাকিয়ে এনে হুকুম দিল, তাকে একটা হীরের আংটি উপহার দেওয়া হোক।

পরদিন চের্নিশোভ পুনরায় দেখা করতে এলে নিকলাস ভরন্ত্সভের প্রতি নির্দেশকে সমর্থন করে বলল, এখন যখন হাজি মুরাদ আত্মসমর্পণ করেছে তখন চেচেনদের আরও সক্রিয়ভাবে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা হোক, এবং তাদের চতুর্দিকের বেষ্টনীকে আরও কঠোর করা হোক।

চের্নিশোভ সেই মর্মে ভরন্ত্সভকে চিঠি লিখল, এবং অপর এক সংবাদবাহক অনেক ঘোড়াকে পিছনে ফেলে, অনেক সওয়ারের মুখে আঘাত হেনে ঘোড়া ছুটিয়ে তিফ্লিসে চলে গেল।

১৬

নিকলাসের হুকুমমত সেই মাসেই অর্থাৎ ১৮৫২-র জানুয়ারিতেই চেচ্নিয়ার উপর একটা হামলা করা হল।

তাতে যে সেনাদল পাঠানো হল তাতে ছিল চার ব্যাটেলিয়ান পদাতিক, দুই কোম্পানি কসাক, ও আটটি কামান। সেনাদল এগিয়ে চলেছে রাস্তা বরাবর, আর তাদের দুই পাশে সারি বেঁধে চলেছে "ফাগের"রা। পায়ে হাই বুট, গায়ে ভেড়ার চামড়ার কোট, মাথায় উঁচু টুপি, দুই কাঁধে রাইফেল,

কোমরে কার্তুজের বেল্ট।

তখনও শীতকাল চলছে। কিন্তু দুপুর নাগাদ সেনাদল মাইল তিনেক এগিয়ে যাবার পরে সূর্য অনেক উপরে উঠে এল, সকলের বেশ গরম লাগল, সূর্যের রশ্মি এত উজ্জ্বল হয়ে উঠল বেয়নেটের ইস্পাতের ফলার দিকে, বা কামানের পিতলের অংশের দিকে যে তাকানোই কঠিন হয়ে পড়ল।

স্বচ্ছ জলের একটা স্রোতস্বিনী পিছনে পড়ে রইল। সামনে চষা ক্ষেত ও প্রান্তর। আরও দূরে সম্মুখে প্রসারিত অরণ্য শোভিত রহস্যময় পর্বতশ্রেণী; তার পিছনে মাথা তুলেছে শিখরের পর শিখর; আরও দূরে চিরসুন্দর ও চিরপরিবর্তনশীল বরফ-ঢাকা চূড়াগুলি সূর্যের আলো নিয়ে হীরকখণ্ডগুলির মত খেলা করছে।

৫ম কোম্পানির প্রথমেই চলেছে বাটলার; এই লম্বা সুদর্শন অফিসারটি সম্প্রতি রক্ষী-বাহিনী থেকে বদলি নিয়ে এই কোম্পানিতে যোগ দিয়েছে। পরনে কালো কোট ও উঁচু টুপি, কাঁধে তরবারি। বেঁচে থাকার আনন্দের এক উৎসাহভরা অনুভূতিতে তার মন ভরে উঠেছে; সেই সঙ্গে আছে মৃত্যুর ঝুঁকি, কর্মের উদ্যম, এবং একটিমাত্র ইচ্ছায় পরিচালিত একটা পুরো দলের অংশ হবার অনুভূতি। এই দ্বিতীয়বার সে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে।

সেনাদলটি ভাল রাস্তা ছেড়ে একটা অব্যবহৃত পথ ধরে ভুট্টার ক্ষেতটা পেরিয়ে বনের কাছাকাছি পৌঁছতেই অশুভ হিস্-হিস্ শব্দ করে একটা গোলা তাদের পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে পথের পাশের মাটিতে ছিটকে পড়ল।

উজ্জ্বল হেসে বাটলার পাশের সহকর্মীটিকে বলল, "শুরু হয়ে গেল।"

ঠিকই তাই। গোলার পরেই বনের ভিতর থেকে নিশান উড়িয়ে বেরিয়ে এল একদল অশ্বারোহী চেচেন। ভিড়ের মধ্যে একটা বড় সবুজ নিশান চোখে পড়ল; একজন বুড়ো অথচ দূরদর্শী সার্জেন্ট-মেজর বাটলারকে জানাল, নিশ্চয় শামিল ওখানেই আছে। অশ্বারোহীরা পাহাড় বেয়ে নেমে আসতে লাগল। জেনারেলের নির্দেশে বাটলার তার সেনাদলকে তাদের দিকে চালিয়ে নিয়ে গেল। পিছনের দুটো গোলা ফাটার শব্দ শুনে ফিরে তাকাল: দুটো কামানের মুখ থেকে ধূসর ধোঁয়ার মেঘ উঠে উপত্যকার উপর ছড়িয়ে পড়েছে। পাহাড়ি অশ্বারোহীরা হটতে শুরু করল। বাটলারের সৈন্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে লাগল; সমস্ত খাদটা গুলির ধোঁয়ায় ভরে গেল। খাদের উপরে দেখা গেল, পাহাড়িরা দ্রুত পালাচ্ছে, আর পালাতে পালাতেই পশ্চাদ্ধাবনকারী কসাকদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। সেনাদল তাদের পিছু নিয়ে দ্বিতীয় খাদটার নীচে একটা আওল দেখতে পেল।

কসাকদের অনুসরণ করে বাটলারও সদলে এক দৌড়ে সেই আওলে ঢুকে পড়ল। একেবারে পরিত্যক্ত গ্রাম। শস্য, খড় ও সাক্লিয়াগুলি পুড়িয়ে দেবার হুকুম দেওয়া হল। দেখতে দেখতে গোটা আওল জ্বলতে লাগল।

সৈন্যরা যে যা পেল টেনে বের করতে লাগল, আর যে সব মুর্গি পাহাড়িরা নিয়ে যেতে পারে নি সেগুলিকে গুলি করে মারতে লাগল।

ধোঁয়ার কিছুটা দূরে বসে অফিসাররা খাবার খেয়ে মদে চুমুক দিতে লাগল। সার্জেন্ট-মেজর তাদের জন্য একটা মৌচাক এনে দিল। কোথাও চেচেনদের চিহ্নমাত্র নেই। বিকেলে ফিরে যাবার হুকুম হল।

সকলে ফিরে চলল। বাটলারের মন-মেজাজ খুব ভাল। তার দলের কেউ আঘাত পায় নি। সকালে যে ছোট নদীটা পার হয়ে গিয়েছিল পুনরায় সেটা পেরিয়ে এসে গোটা বাহিনী ভুট্টার ক্ষেত ও উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ল। আর তার পরেই প্রতিটি সেনাদলের গায়করা এগিয়ে এসে গানে গানে বাতাস ভরে তুলল।

পদমর্যাদার তার ঠিক উপরের অফিসার মেজর পেত্রভের পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে চলেছে বাটলার। তার সঙ্গেই সে একত্রে থাকে। এই মেজর এবং জনৈক সার্জেনের আর্দালির মেয়ে—যার নাম আগে ছিল মাশা আর এখন যাকে সম্মানের সঙ্গে ডাকা হয় মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না বলে—এখন স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করে। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না সুশ্রী, সুকেশী, নিঃসন্তান, বয়স ত্রিশ বছর। অতীত যাই হোক এখন সে মেজরের অনুরাগী সঙ্গিনী, নার্সের মত তার সেবা করে—সেবা করাটা দরকারীও বটে, কারণ সে প্রায়ই মদ খেয়ে সব কিছু ভুলে যায়।

দুর্গে ফিরে মেজর যেরকমটি আশা করেছিল তাই ঘটল। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না তাকে, বাটলারকে, ও দুজন আমন্ত্রিত অফিসারকে সুখাদ্য পরিবেশন করল। পেট ভরে খেয়ে ও মদ টেনে মেজরের যখন আর কথা বলার শক্তি রইল না তখন সে শুতে চলে গেল। বেশীমাত্রায় চিকির টেনে বাটলার নিজের ঘরে গিয়ে পোশাক না ছেড়েই গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়ল।

১৭

যে আওলটা ধ্বংস করা হল, রুশদের সঙ্গে যোগ দেবার আগের রাতটা হাজি মুরাদ সেখানেই কাটিয়েছিল। রুশ সেনাদলকে আসতে দেখেই সাডো সপরিবারে আওল ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখল তার সাক্লিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে—ছাদ ভেঙে পড়েছে, দরজা ও পরচালার খুঁটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ভিতরটা জঞ্জালে পরিপূর্ণ। উজ্জ্বল চোখের যে ছেলেটি গভীর উৎসাহে হাজি মুরাদের দিকে তাকিয়েছিল তাকে মৃত অবস্থায় একটা বুর্কায় জড়িয়ে ঘোড়ার পিঠে করে মসজিদে ফিরিয়ে আনা হয়েছে: বেয়নেটের খোঁচায় তার পিঠ এফোড়-ওফোড় হয়ে গেছে। যে

মহিলাটি হাজি মুরাদকে খাবার পরিবেশন করেছিল সে এখন ছেলের পাশে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে; জামার বুকের দিকটা ছেঁড়া, শুকনো বুক দেখা যাচ্ছে, চুল ঝুলে পড়েছে, নখের খোঁচায় রক্তাক্ত মুখে অবিরাম আর্তনাদ করছে। কোদাল ও কুড়ুল নিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সাডো গেছে ছেলের কবর খুঁড়তে। ভাঙা সাক্লিয়ার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে বুড়ো ঠাকুর্দা একটা লাঠি কাটতে কাটতে শূন্য দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে আছে। এইমাত্র সে মৌমাছি-পালন-কেন্দ্র থেকে ফিরেছে।

ঝর্নার জল ইচ্ছা করে নষ্ট করে দিয়ে গেছে, কাজেই সে জল ব্যবহার করা যাবে না। মসজিদ অপবিত্র করে রেখে গেছে, মোল্লা সহকারীদের নিয়ে সে সব পরিষ্কার করছে। রুশদের প্রতি একটিও ঘৃণার কথা কেউ উচ্চারণ করছে না। শিশু থেকে বৃদ্ধ প্রতিটি চেচেনের মনোভাব ঘৃণার চাইতে তীব্রতর। সেটা ঘৃণা নয়, কারণ এই সব রুশ কুত্তাদের তারা মানুষ বলে গণ্য করে না; এই সব জীবের অর্থহীন নিষ্ঠুরতায় তারা এতই আহত, বিরক্ত, ও বিমূঢ় হয়ে পড়েছে যে ইঁদুর, বিষাক্ত মাকড়শা, বা নেকড়ের মতই তাদের নির্মূল করার বাসনা আত্মরক্ষার ইচ্ছার মতই তাদের কাছে এক স্বাভাবিক ও সহজাত প্রবৃত্তি হয়ে দেখা দিয়েছে।

আওলের অধিবাসীদের সামনে দুটো পথ খোলা আছে। হয় এখানে থেকে ভাঙা ঘর আবার নতুন করে গড়তে হবে, আর প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হবে কখন আবার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে; অথবা তাদের প্রতি বিরক্তি ও ঘৃণা সত্ত্বেও, নিজেদের ধর্মবিরোধী হলেও রুশদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। প্রার্থনা সেরে বুড়োরা সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করল সাহায্যের আবেদন জানিয়ে শামিলের কাছে দূত পাঠাবে। তারপর সকলে ভাঙা ঘর নতুন করে গড়ে তোলার কাজে হাত লাগাল।

১৮

হামলার পরদিন সকালে—খুব ভোরে নয়—প্রাতরাশের আগে একটু হাঁটতে ও তাজা বাতাসে শ্বাস টানতে বাটলার খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যেই সূর্য পাহাড়ের উপর থেকে দেখা দিয়েছে। অরণ্যশোভিত পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বাটলার গভীরভাবে শ্বাস টানল। তার মনটা এই চিন্তায় খুশি যে সে বেঁচে আছে, কেবল সেই বেঁচে আছে, আর বেঁচে আছে এমন একটা সুন্দর জায়গায়।

গতকালের কথা ভাবতে গিয়ে পেত্রভের মিস্ট্রেস মাশার কথাও মনে পড়ল। সকলের প্রতি তার কত সুন্দর ও সরল ব্যবহার; বিশেষ করে তার প্রতি

সে কত সদয়।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নার ঘন কালো চুল, চওড়া কাঁধ, উন্নত বুক, আর ছিট-ছিট সদয় মুখের উজ্জ্বল হাসি—এ সবকিছুই বাটলারের মনকে টানে। সেও তো একটি স্বাস্থ্যবান অবিবাহিত যুবক। কখনও কখনও তার মনে হয় মাশা তাকে চায়, কিন্তু সে মনে করে যে তাতে তার ভাল মানুষ সরল হৃদয় সহকর্মীটির প্রতি অন্যায় করা হবে। তাই সে মাশার প্রতি সরল, সশ্রদ্ধ ব্যবহার করে, আর তাতেই খুশি থাকে।

এই সব ভাবছে এমন সময় সামনের ধূলিধূসরিত পথে অনেক অশ্বক্ষুরের শব্দ কানে আসায় তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। কয়েকজন অশ্বারোহী এইদিকেই আসছে। জন বিশেক কসাকের সামনে দুজন অশ্বারোহী: একজনের গায়ে সাদা সার্কাসীয় কোট, মাথায় লম্বা পাগড়ি; অপরজন রুশ ইউনিফর্ম ও অস্ত্র-সজ্জিত অফিসার।

অফিসার এগিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, "এটা কি কম্যাণ্ডিং অফিসারের বাড়ি?" তার উচ্চারণে বিদেশী ছাপ স্পষ্ট।

বাটলার হ্যাঁ বলে অফিসারের আরও কাছে গিয়ে পাগড়ি-মাথায় লোকটিকে দেখিয়ে বলল, "ও কে?"

অফিসার বলল, "এই হল হাজি মুরাদ। কম্যাণ্ডারের কাছে থাকবে বলে এখানে এসেছে।"

বাটলার হাজি মুরাদের কথা জানত; অবশ্য এই ছোট দুর্গে তাকে দেখতে পাবে সেটা মোটেই আশা করে নি। হাজি মুরাদ বন্ধুর মত চোখে তার দিকে তাকাল।

বাটলার বলল, "শুভ দিন, কৎকিলদি।" তাতারদের এই সম্ভাষণটা সে নতুন শিখেছে।

হাজি মুরাদ মাথা নেড়ে বলল, "সউবুল।" (ভাল থাক) দুই আঙুলে চাবুক-ধরা হাতটা বাড়িয়ে দিল। জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি সর্দার?"

"না, সর্দার ভিতরে আছে। আমি গিয়ে তাকে ডেকে আনছি।" সিঁড়ি দিয়ে উঠে সে দরজায় ধাক্কা দিল। কিন্তু দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না বন্ধ করে রেখেছে। বাটলার খিড়কির দরজায় গিয়ে আর্দালিকে ডাকল, কোন সাড়া পেল না। রান্না ঘরে গিয়ে দেখল মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না মাথায় রুমাল বেঁধে মোটা মোটা সাদা হাতের আস্তিন গুটিয়ে পেস্ট্রি তৈরি করছে।

"আর্দালিরা গেল কোথায়?"

"কোথায় আবার যাবে? মদ গিলতে গেছে। কি চাই?"

"সদর দরজাটা খুলে দাও গে। পাহাড়িয়া দল বেঁধে তোমার বাড়ির সামনে হাজির। হাজি মুরাদ এসেছে।"

"আরও কিছু বানিয়ে বল!" মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না হেসে বলল।

"ঠাট্টা নয়, সত্যি সে পরচালায় অপেক্ষা করছে!"

"সত্যি?"

"মিথ্যে বলতে যাব কেন? গিয়েই দেখ না।"

"তাই নাকি, তাহলে তো যেতেই হচ্ছে।" আস্তিন নামিয়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখল চুলের ভাঁজ ঠিক আছে কিনা। "আমি যাই, আইভান মৎভীচকে তুলে দেই গে।"

"না, আমি নিজেই যাচ্ছি।" পেত্রভের আর্দালি এসে হাজির হওয়ায় বাটলার তাকে বলল, "এই যে বন্দারেংকো, দরজাটা খুলে দাও গে তো।"

মেজর মৎভীচ পেত্রভ হাজি মুরাদের কথা আগেই শুনেছে। তাই সে এসেছে শুনে মোটেই অবাক হল না। বিছানায় বসে একটা সিগারেট পাকাল, আগুন ধরাল, পোশাক পরতে শুরু করল। সজোরে গলা পরিষ্কার করে "শয়তানটাকে" তার কাছে পাঠানোর জন্য কর্তাদের বিরুদ্ধে গজর-গজর করতে লাগল।

তৈরি হয়ে আর্দালিকে খানিকটা ওষুধ এনে দিতে বলল। আর্দালি জানে ওষুধ মানে ভদ্‌কা, আর তাই এনে দিল।

যইয়ের রুটিতে কামড় দিয়ে ভদ্‌কায় চুমুক দিয়ে বলে উঠল, "ভেজাল জিনিসের মত খারাপ কিছু হয় না। কাল যৎসামান্য চিকির খেয়েই মাথাটা ধরেছে।" বসার ঘরে ঢুকে দেখল বাটলার ইতিমধ্যেই হাজি মুরাদ ও অফিসারটিকে এনে বসিয়েছে।

অফিসার বাম ব্যূহের কম্যাণ্ডারের হুকুমনামাটা মেজরের হাতে দিল। তাতে লেখা ছিল, সে যেন হাজি মুরাদকে গ্রহণ করে এবং গুপ্তচরের মারফৎ পাহাড়িদের সঙ্গে তার যোগাযোগ করিয়ে দেয়, কিন্তু কোন অবস্থাতেই কসাক প্রহরীদলকে সঙ্গে না দিয়ে তাকে যেন দুর্গ থেকে বের হতে না দেয়।

হুকুমনামাটা পড়ে মেজর একবার হাজি মুরাদের দিকে একবার কাগজটার দিকে তাকাল। এই রকম বারকয়েক করে হাজি মুরাদের উপর চোখ রেখে বলল:

"ইয়াকৃশি, বেক, ইয়াকৃশি! (খুব ভাল, স্যার, খুব ভাল।) ও এখানে থাকুক, ওকে বলে দাও আমার উপর আদেশ হয়েছে ওকে বাইরে যেতে দেওয়া হবে না—আর সে আদেশ পবিত্র! আচ্ছা বাটলার, ওকে কোথায় রাখা যায় বল তো? অফিসে রাখব কি?"

বাটলার কিছু বলার আগেই মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না মেজরকে বলল, "কেন? এখানেই রাখ। আমরা ওকে অতিথিদের ঘর আর ভাঁড়ার ঘরটা দেব। তাহলেই সে আমাদের চোখে-চোখে থাকবে।" কথার শেষে হাজি মুরাদের চোখে চোখ পড়তেই সে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

ছুরির হাতলে হাত রেখে হাজি মুরাদ চুপচাপ বসে রইল। তার ঠোঁটে একটা অস্পষ্ট তাচ্ছিল্যের হাসি। মুখে বলল, তাকে যেখানেই থাকতে দেওয়া হোক সবই তার কাছে সমান। তার একমাত্র চিন্তা কি ভাবে পাহাড়িদের সঙ্গে তার যোগাযোগ হবে।

কিন্তু গুপ্তচরদের মারফৎ যে খবর সে পেল সেটা মোটেই ভাল নয়। দুর্গে অবস্থানের প্রথম চারদিনেই তারা দু'বার তার সঙ্গে দেখা করতে এল, আর দু'বারই নিয়ে এল খারাপ খবর।

১৯

হাজি মুরাদ দল ছেড়ে রুশদের কাছে যাবার কিছুদিন পরেই তার পরিবারকে ভেদেনোতে সরিয়ে নিয়ে কড়া পাহারায় রেখে দেওয়া হল শামিলের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। পতিমাত এবং দুই স্ত্রী ও পাঁচটি ছোট ছেলেমেয়েকে কড়া পাহারায় রেখে দেওয়া হল অফিসার ইব্রাহিম রশিদের সাক্লিয়াতে, আর হাজি মুরাদের আঠারো বছরের ছেলে ইউসুফকে আরও সাতজন অপরাধীর সঙ্গে রাখা হল কারাগারে—অর্থাৎ সাত ফুটের বেশী গভীর একটা গর্তের মধ্যে।

শামিল রুশদের বিরুদ্ধে অভিযানে চলে যাওয়ায় তার সিদ্ধান্ত আসতে বিলম্ব হচ্ছিল।

১৮৫২-র ৬ই জানুয়ারি তারিখে সে ভেদেনোতে ফিরে এল। দুপুর বেলা সে ফিরল একদল মুরিদ পরিবৃত হয়ে। রাইফেল ও পিস্তলের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে একটানা লায় ইল্লা ইল্ আল্লাহ্ ধ্বনি দিয়ে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে গেল তার বাসভবন পর্যন্ত।

শাসনকর্তাকে দেখার জন্য বড় আওলটির সব অধিবাসী হয় পথে নেমে এল, নয়তো বাড়ির ছাদে উঠে গেল; জয়ের স্মারক হিসাবে সকলেই রাইফেল ও পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়তে লাগল। শামিল এল একটা সাদা আরবি ঘোড়ায় চেপে। ঘোড়াটার গায়ে কোন সোনা বা রূপোর অলংকার ছিল না; সাজসজ্জা খুবই সাদাসিদে। আওলের ভিতর দিয়ে ঘোড়ায় চেপে যেতে যেতে সে বুঝল হাজারো চোখের সাগ্রহ দৃষ্টি পড়েছে তার উপরে, কিন্তু সে নিজে কারও দিকেই তাকাল না।

সাক্লিয়ার অপর বাসিন্দাদের সঙ্গে হাজি মুরাদের স্ত্রীরাও পরচালায় বেরিয়ে এল ইমামকে দেখতে। কিন্তু তার বুড়ি মা পতিমাত বাইরে গেল না; পাকা চুল এলিয়ে দুই লম্বা হাতে ক্ষীণ হাঁটু দুটিকে বেড় দিয়ে ধরে সে মেঝেতে বসে রইল; তার অগ্নিময় কালো চোখ দুটি তাকিয়ে রইল অগ্নি-

কুণ্ডের নিভন্ত অঙ্গারের দিকে। ছেলের মতই সেও চিরদিনই শামিলকে ঘৃণা করে এসেছে, এখন আরও বেশী ঘৃণা করে। হাজি মুরাদের ছেলেও শামিলের এই বিজয়মিছিল দেখতে পেল না। অন্ধকার দুর্গন্ধ গর্তের মধ্যে বসে সে শুনল গুলি ও প্রার্থনার শব্দ, আর জলতে লাগল সেই জ্বালায় যা অনুভব করতে পারে শুধু স্বাধীনতাবঞ্চিত প্রাণশক্তিতে পূর্ণ যৌবন।

শামিল বাড়িতে ঢুকল। প্রথমেই তার ঘরে ঢুকল শশুর ও শিক্ষক জেমালএদ্দিন। দীর্ঘকায় পাকাচুল এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ, লম্বা দাড়ি বরফের মত সাদা, মুখটা গোলাপি। একটি প্রার্থনা উচ্চারণ করে সে শামিলকে নানা প্রশ্ন করল অভিযান প্রসঙ্গে, আর নিজে শোনাতে লাগল এখানকার ঘটনাবলীর বিবরণ।

তার ঘরেই খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করল তার সবচাইতে বড় বিবি জিদাত; কৃষ্ণবর্ণ, তীক্ষ্ননাসা বদ্‌খৎদর্শন এই বৃদ্ধাকে সে ভালবাসে না, তবু সেই তার প্রধানা বিবি।

তারপর শামিল ঢুকল দরবার-কক্ষে। যে ছ'জন লোককে নিয়ে তার পরিষদ তাদের সকলেরই দাড়ি সাদা, ধূসর বা লাল, মাথায় লম্বা টুপি, কারও পাগড়ি আছে, কারও নেই, পরনে বেশ্‌মেত ও সার্কাসীয় কোট, কটিদেশে বাঁধা ফিতের সঙ্গে ছুরি ঝোলানো। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা করল। তার মাথা উঠল সকলের মাথার উপরে। ঘরে ঢুকেই সে নিজে ও অন্য সকলেই দুই হাত উপরে তুলল, চোখ বুজে প্রার্থনা করল, দুই হাতে মুখ নামিয়ে এনে দাঁড়ির প্রান্তে মিশিয়ে দিল। তারপর সকলে বসল—শামিলের কুশনটা অন্য সকলেই কুশনের চাইতে বড়।

শুরু হল দরবারের কাজ। অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা হল শরিয়ত অনুসারে: চুরির অপরাধে দুজনের হাত কেটে দেওয়া হবে, খুনের জন্য একজনের মাথা কাটা হবে, আর বাকি তিনজনকে ক্ষমা করা হবে।

তারপর উঠল হাজি মুরাদের ব্যাপার। সে যে রুশদের সাহায্য করবে সেটা কোন মতেই বরদাস্ত করা হবে না, কাজেই তাকে ভুলিয়ে এনে হত্যা করতে হবে। সে কাজ করার একমাত্র উপায় তার পরিবারকে, বিশেষ করে তার বড় আদরের ছেলেকে কাজে লাগানো।

পরিষদের সকলের কথা শোনার পর শামিল চোখ বুজে চুপ করে বসে রইল।

সকলেই জানে এর অর্থ সে পয়গম্বরের বাণী শুনবার জন্য কান পেতেছে; পয়গম্বরই তাকে বলে দেবে কি করতে হবে।

পাঁচ মিনিট গম্ভীর নীরবতার পরে শামিল চোখ খুলল। দুই চোখ ছোট করে বলল:

"হাজি মুরাদের ছেলেছে আমার কাছে নিয়ে এস।"

"সে এখানেই আছে," জবাব দিল জেমালএদ্দিন। বস্তুত হাজি মুরাদের ছেলে ইউসুফ বাইরের উঠোনের ফটকেই অপেক্ষা করে ছিল। যুবকটি শীর্ণ, বিবর্ণ, ছিন্নবস্ত্র পরিহিত, দুর্গন্ধযুক্ত, তবু মুখখানি সুন্দর, দেহ সুঠাম; ঠাকুরমা পতিমাতের মতই কালো চোখ দুটি জ্বলছে।

শামিলের প্রতি তার বাবার যে মনোভাব ইউসুফ তার অংশীদার নয়। অতীতে যা ঘটেছে তার কোন খবর সে রাখে না। দরজায় এসে দাঁড়াতেই সে শামিলের আধবোজা চোখের স্থির দৃষ্টির সম্মুখীন হল। একমুহূর্ত থেমে শামিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার লম্বা আঙুলওয়ালা বড় হাতটাতে চুমো খেল।

"তুমি হাজি মুরাদের ছেলে?"

"হ্যা ইমাম।"

"সে কি করেছে তা তুমি জান?"

"জানি ইমাম; সেজন্য আমি দুঃখিত।"

"তুমি লিখতে পার?"

"আমি মোল্লা হবার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম—"

"তাহলে তোমার বাবাকে লিখে দাও, এখন যদি সে বৈরাম উৎসবের আগে আমার কাছে ফিরে আসে তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করব এবং সবকিছু আগের মতই চলবে; অন্যথায় সে যদি রুশদের পক্ষেই থাকে তাহলে"—শামিলের মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হয়ে উঠল—"তোমার ঠাকুরমা, মা ও অন্যদের বিভিন্ন আওলে বিলিয়ে দেব, আর তোমার মাথা কেটে ফেলব।"

ইউসুফের মুখের একটা মাংসপেশীও কাঁপল না; মাথাটা নুইয়ে সে বুঝিয়ে দিল শামিলের কথা সে বুঝতে পেরেছে।

"এই কথা লিখে সেটা আমার দূতের হাতে দাও।"

শামিল থামল; নীরবে অনেকক্ষণ ইউসুফের দিকে তাকিয়ে রইল।

'লিখে দাও যে তোমাকে আমি করুণা করি, তোমাকে খুন করব না, কিন্তু সব বিশ্বাসঘাতকদের মতই তোমার চোখ দুটো উপড়ে নেব। .... যাও।'

শামিলের সামনে ইউসুফ চুপ করেই ছিল, কিন্তু তাকে ঘর থেকে বের করে আনামাত্রই সে নিজের অনুচরের দিকে ছুটে গিয়ে তার খাপ থেকে ছুরিটা টেনে বের করে নিজের বুকে বসিয়ে দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার আগেই তার হাতটা চেপে ধরে বেঁধে ফেলে তাকে আবার সেই গর্তের মধ্যে রেখে দেওয়া হল।

সেদিন গোধূলির সময় সন্ধ্যার নামাজ শেষ করে শামিল লোমের পাড় বসানো সাদা জোব্বা পরে বেড়ার অপরদিকে তার বিবিদের মহলে ঢুকল এবং সোজা চলে গেল তার ছোট বিবি সুন্দরী অমিনলের ঘরে। কিন্তু সেখানে তাকে পেল না। সে ছিল প্রবীণা বিবিদের কাছে। যাতে কেউ দেখতে না

পায় সেইভাবে সে দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু অমিনল তার উপর রাগ করেছে, কারণ সে রেশমী পোশাক এনে জীদাতকে দিয়েছে, তাকে দেয় নি। তাই তাকে নিজের ঘরের দিকে যেতে দেখে সে ইচ্ছা করে সরে পড়েছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত জীদাতের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে শামিলের সাদা মূর্তিটাকে ঘর-বার করতে দেখে সে হাসতে লাগল।

বৃথাই অপেক্ষা করে মধ্যরাতের নামাজের সময় হলে শামিল তার নিজের ঘরে ফিরে গেল।

২০

দুর্গের ভিতরে মেজরের বাড়িতে হাজি মুরাদের এক সপ্তাহ কেটে গেল। সে সঙ্গে এনেছে মাত্র দুজন মুরিদ-খানেফি ও এল্ডার। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না নোংরা খানেফির সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে মেরে রান্নাঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু হাজি মুরাদকে সে সম্মান ও সহানুভূতির সঙ্গে দেখে। এখন আর সে হাজি মুরাদকে খাদ্য পরিবেশন করে না, সে কাজটা এল্ডারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সুযোগ পেলেই তার সঙ্গে দেখা করে, তার কাজ করে দেয়। তার পরিবার সম্পর্কে সব রকম খোঁজখবর রাখে, তার ক'টি বিবি ও ক'জন ছেলেমেয়ে, তাদের বয়স কত সব জেনেছে। যখনই কোন গুপ্তচর তার সঙ্গে দেখা করতে আসে তখনই সে সাধ্যমত তাদের আলোচনার ফলাফল জানতে চেষ্টা করে।

এক সপ্তাহেই হাজি মুরাদের সঙ্গে বাটলারের বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে। কখনও হাজি মুরাদ যায় বাটলারের ঘরে, কখনও বাটলার যায় হাজি মুরাদের ঘরে। দো-ভাষীর মারফৎ দুজন কথা বলে। কখনও বা আকার-ইঙ্গিতে ও হাসি দিয়েই কাজ চালায়।

হাজি মুরাদের ধর্ম-ভাই খানেফির সঙ্গেও বাটলারের বন্ধুত্ব হয়েছে। খানেফি অনেক পাহাড়ি গান জানে, গায়ও ভাল। হাজি মুরাদ প্রায়ই তাকে নিজের পছন্দমত গানগুলি গাইতে বলে।

হাজি মুরাদের বিশেষ পছন্দের একটি গান বাটলারেরও খুব ভাল লেগেছে। দোভাষীকে দিয়ে সেটাকে সে অনুবাদ করিয়ে নিল।

খানেফি ও হাজি মুরাদের মধ্যে যে রক্তাক্ত সংগ্রাম একদিন চলেছিল সেটাই এই গানের বিষয়-বস্তু। গানটি এইরূপ :

"আমার কবরের মাটি একদিন শুকিয়ে যাবে,
মা, আমার মা!
তুমিও আমাকে ভুলে যাবে!

সতেজ ঘাসরা তুলবে আমার উপরে,
বাবা, আমার বাবা।
চোখের জল যখন তোমার কালো আঁখি দুটিকে ভেজাবে না
তখন তুমি আমার জন্য শোক করবে না,
বোন, প্রিয় বোন!
দুঃখ আর তোমাকে বিরক্ত করবে না।

কিন্তু তুমি, বড় ভাই আমার, কখনও ভুলতে পারবে না
প্রতিহিংসা বশে তুমি আমাকে অস্বীকার করেছিলে!
আর তুমি, ছোট ভাই আমার, চিরদিন দুঃখ করবে
যতদিন না আমার পাশে ঘুমিয়ে পড়বে!

হে মৃত্যুবাহী গোলা, বড় দ্রুত তুমি এসেছিলে,
তোমাকে পদাঘাত করেছিলাম,
কারণ তুমি ছিলে আমার ক্রীতদাস!
আর তুমি, কালো মাটি, যুদ্ধের ঘোড়া তোমাকে
দলিত, মথিত করেছে,
তুমিই ঢেকে দেবে আমার কবর!

হে মৃত্যু, তুমি শীতল, তবু আমি ছিলাম তোমার
প্রভু, তোমার মনিব!
আমার দেহ দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে মাটিতে, আমার আত্মা
উড়ে চলেছে স্বর্গের দিকে দ্রুততর গতিতে।"

হাজি মুরাদ সব সময়ই চোখ বুজে কান পেতে এ গান শুনত, আর গানের শেষ রেশটি মিলিয়ে গেলে রুশ ভাষায় বলত—

"ভাল গান! বিদগ্ধ গান!"

হাজি মুরাদের আগমন এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর থেকেই পার্বত্য জীবনের কবিতা গভীর প্রভাব ফেলেছে বাটলারের উপর। একটা বেশ্‌মত সার্কাসীয় কোট ও পায়ের পট্টি সে যোগাড় করেছে; নিজেকে পাহাড়ি কল্পনা করে তাদের মত জীবন যাপন করতে শুরু করেছে।

হাজি মুরাদের চলে যাবার দিন সেই উপলক্ষ্যে মেজর অফিসারকে নিমন্ত্রণ করল। সকলে একটা টেবিলে বসেছে। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না চা ঢেলে দিচ্ছে। আর একটা টেবিলে আছে ভদ্‌কা, চিকির ও খাদ্য। এমন সময় যাত্রার জন্য তৈরী হয়েই হাজি মুরাদ একটু খুঁড়িয়ে ঘরে ঢুকল।

মেজর তাকে ডিভানে বসতে বলল, কিন্তু হাজি মুরাদ তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে জানালার নীচে একটা চেয়ারে বসল। সেখান থেকেই সমবেত সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

পেত্রোভ্স্কি নামক একটি চটপটে অফিসার এই প্রথম হাজি মুরাদকে দেখল। দো-ভাষীর মারফৎ তাকে জিজ্ঞাসা করল তিফলিস তার ভাল লেগেছে কি না।

সে উত্তর দিল, "আলিয়া!"

দো-ভাষী অনুবাদ করে বলল, "সে 'হ্যাঁ' বলছে।"

"সেখানে কি তার ভাল লেগেছে?"

হাজি মুরাদ উত্তরে কিছু বলল।

"তার সব চাইতে ভাল লেগেছে থিয়েটার।"

"প্রধান সেনাপতির বাড়িতে বল-নাচ তার কেমন লেগেছিল?"

হাজি মুরাদ ভুরু কোঁচকাল। "প্রত্যেক জাতির নিজস্ব রীতিনীতি আছে। আমাদের মেয়েরা ওরকম পোশাক পরে না।"

"তাহলে সেটা তার পছন্দ হয় নি?"

হাজি মুরাদ দো-ভাষীকে বলল, "আমাদের একটা প্রবাদ আছে, 'কুকুর গাধাকে মাংস দিল, গাধা কুকুরকে খড় দিল, আর দুজনই ক্ষুধার্ত রয়ে গেল'।" হেসে বলল, "প্রত্যেক জাতির কাছেই তার নিজের আচার-আচরণ ভাল লাগে।"

আলোচনা আর এগল না। কিছু অফিসার চা নিল, কেউ বা নিল খাবার। হাজি মুরাদ এক গ্লাস চা নিল। তারপর মাথাটা নীচু করল।

বাটলার বলল, "তাহলে তুমি বিদায় নিচ্ছ। আবার কখন দেখা হবে?"

হাজি মুরাদ রুশ ভাষায় বলল, "বিদায়, বিদায়!"

দরজার মুখে দেখা গেল, একটা বড় সাদা কিছু কাঁধে নিয়ে আর একখানা তরবারি হাতে নিয়ে এল্ডার ঢুকছে। হাজি মুরাদ তাকে ইসারায় কাছে ডেকে বুর্কাটা হাতে নিয়ে দো-ভাষীকে কিছু বলে বুর্কাটা মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্নাকে দিল।

"দো-ভাষী বলল, "সে বলছে, তুমি বুর্কাটার প্রশংসা করেছ তাই ওটা নাও।"

"সে কি, কেন?"

"এটা দরকার। আদমের মত", হাজি মুরাদ বলল।

বুর্কাটা নিয়ে মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না বলল, "তোমাকে ধন্যবাদ। ঈশ্বর

করুন, তুমি যেন ছেলেকে উদ্ধার করতে পার। উল্লান ইয়াকৃশি। ওকে বল, ছেলের উদ্ধারের চেষ্টায় আমি ওর সাফল্য কামনা করছি।"

তার দিকে তাকিয়ে মাথাটা নেড়ে হাজি মুরাদ এল্ডারের হাত থেকে তরবারিটা নিয়ে সেটা মেজরকে দিল। সেটা হাতে নিয়ে মেজর দো-ভাষীকে বলল, "ওকে আমার বাদামী ঘোড়াটা নিতে বল। ওকে দেবার মত আর কিছু তো আমার নেই।"

হাজি মুরাদ তার মুখের সামনে হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিল, সে কিছুই চায় না, তাই ঘোড়াটা সে নেবে না। তারপর প্রথমে পাহাড়ের দিকে ও পরে নিজের বুকের দিকে আঙুল বাড়িয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাড়ির লোকজন দরজা পর্যন্ত তার সঙ্গে গেল। অফিসাররা ভিতরেই থেকে গেল। বাটলার পরচালা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিল। তখনই এমন একটা ঘটনা ঘটল যা দ্রুত পর্যবেক্ষণ, স্থির সংকল্প ও কর্মতৎপরতার অভাব ঘটলে হাজি মুরাদের পক্ষে মারাত্মক হতে পারত।

তাশ্‌-কিচুর কুমুখদের আওলের অধিবাসীরা ছিল রুশদের বন্ধু। তারা হাজি মুরাদকে খুব শ্রদ্ধা করত, এবং বিখ্যাত নায়েবটিকে দেখার জন্য প্রায়ই দুর্গে আসত। তিনদিন আগে তারা লোক পাঠিয়ে শুক্রবার দিন তাকে তাদের মসজিদে আসতে বলেছিল। কিন্তু তাশ-কিচুর কুমুখ প্রিন্সরা হাজি মুরাদকে ঘৃণা করত কারণ তাদের মধ্যে ছিল রক্তাক্ত শত্রুতার সম্পর্ক। এই নিমন্ত্রণের খবর শুনে তারা জনসাধারণকে জানিয়ে দিল যে তারা হাজি মুরাদকে মসজিদে ঢুকতে দেবে না। লোকরা উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং প্রিন্সদের সমর্থকদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বেঁধে গেল। রুশ কর্তৃপক্ষ পাহাড়িদের শান্ত করে হাজি মুরাদকে জানিয়ে দিল সে যেন মস্‌জিদে না যায়।

হাজি মুরাদ যায় নি, আর সকলেই ধরে নিয়েছিল যে ব্যাপারটা মিটে গেছে।

কিন্তু যাত্রার মুহূর্তে সে যখন পরচালার সামনে এসে দাঁড়াল তখন বাটলার ও মেজরের পরিচিত কুমুখ প্রিন্স আর্স্‌লান খান ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে এসে হাজির হল।

হাজি মুরাদকে দেখেই সে কোমরবন্ধ থেকে পিস্তলটা বের করে বাগিয়ে ধরল, কিন্তু সে গুলি করবার আগেই হাজি মুরাদ বিড়ালের মত এমন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আর্স্‌লান খানের দিকে ছুটে গেল যে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

আর্স্‌লান খানের ঘোড়ার লাগাম এক হাতে চেপে ধরে অপর হাতে নিজের ছুরিটা টেনে বের করে হাজি মুরাদ চীৎকার করে তাতার ভাষায় কি যেন বলে উঠল।

বাটলার ও এল্ডার ছুটে গিয়ে শত্রুর হাত চেপে ধরল। গুলির শব্দ শুনে মেজরও বেরিয়ে এল।

"এসবের অর্থ কি আর্স্‌লান—আমার বাড়ির সামনে এমন জঘন্য কাজ শুরু করে দিয়েছ?" সব কথা শুনে মেজর বলল। "এটা ঠিক কর নি বন্ধু! 'যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে রেহাই দিও না!'—কিন্তু আমার বাড়ির সামনে এ হেন রক্তারক্তি—"

কালো গোঁফওয়ালা ছোটখাট আর্স্‌লান খান বিবর্ণ মুখে কাঁপতে কাঁপতে ঘোড়া থেকে নামল; হাজি মুরাদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মেজরের সঙ্গে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে হাসতে হাসতে হাজি মুরাদ দাঁড়ানো ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল।

"ও তোমাকে মারতে চেয়েছিল কেন?" বাটলার শুধাল।

হাজি মুরাদের উত্তরটা দো-ভাষী অনুবাদ করে শুনিয়ে দিল, "ও বলছে এটাই তাদের রীতি। জনৈক আত্মীয়ের রক্তের বদলা আর্স্‌লানকে নিতেই হবে, আর তাই সে ওকে খুন করতে চেষ্টা করেছিল।"

বাটলার আবার প্রশ্ন করল, "আর ও যদি পথের মধ্যে একে ধরে ফেলত'?"

হাজি মুরাদ হাসল।

"দেখ, সে যদি আমাকে খুন করে তাহলে বুঝতে হবে যে সেটাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।.... বিদায়," আবার সে রুশ ভাষায় কথাটা বলল। যারা তাকে বিদায় জানাতে এসেছিল সকলের দিকেই একবার তাকাল। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নার দিকে তাকিয়ে বলল, "বিদায় গো মেয়ে। তোমাকে ধন্যবাদ।"

"ঈশ্বর তোমার সহায় হোন—তোমার পরিবারকে উদ্ধারের ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করুন!"

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নার কথাগুলি সে বুঝতে পারল না, তার সহানুভূতিটা অনুভব করে মাথা নাড়ল।

বাটলার বলল, "দেখো, তোমার কুনাককে ভুলে যেয়ো না।"

হাজি মুরাদ দো-ভাষীকে বলল, "ওকে বলে দাও, আমি ওর প্রকৃত বন্ধু, কখনও ওকে ভুলব না।"

একটা পা ছোট হলেও সে সহজেই একলাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। খানেফিও এল্ডার ও ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তাদের মুরিদকে অনুসরণ করল।

যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল তারা হাজি মুরাদ সম্পর্কে নানারকম মন্তব্য করতে লাগল।

পেত্রোভ্‌স্কি বলল, "আমি বলছি, লোকটা মহা ধূর্ত।"

"রুশদের মধ্যে এরকম ধূর্ত লোক বেশী নেই এটাই যা দুঃখ", মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না হঠাৎ বিরক্ত গলায় পাল্টা জবাব দিল। "লোকটি এক সপ্তাহ

এখানে ছিল, আমরা তো ভাল ছাড়া মন্দ কিছু দেখি নি। সে ভদ্র, জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ।"

"কি করে বুঝলে?"

"যে করেই হোক বুঝেছি।"

২১

চেচেন সীমান্তে আমাদের অগ্রবর্তী দুর্গগুলির জীবনযাত্রা স্বাভাবিকভাবেই চলতে লাগল। বিবৃত সবশেষ ঘটনাবলীর পরে দু'বার বিপদ-সংকেত ঘোষণা করার ফলে সেনাদলকে বাইরে পাঠানো হয়েছে, আর দেশরক্ষী সৈনিকরা ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে; কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই পাহাড়িরা পালিয়ে গেছে; শুধু একবার ভজ্‌দ্‌ভিঝেন্‌স্কে তারা একজন কসাককে হত্যা করেছে, আর আটটা কসাক ঘোড়াকে নিয়ে পালিয়েছে। যে হামলায় একটা আওলকে ধ্বংস করা হয়েছিল তারপর আর কোন হামলা চালানো হয় নি। তবে বামব্যূহের নতুন কম্যাণ্ডার নিযুক্ত হওয়ার ফলে একটা বড় মাপের অভিযান আশা করা হচ্ছে। নতুন কম্যাণ্ডার প্রিন্স বেরিয়াতিন্‌স্কি ভাইস্‌রয়ের পুরনো বন্ধু এবং আগে কর্বদা রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার ছিল। গ্রোজ্‌নিতে পৌঁছেই সে চেনিশোভ কর্তৃক ভরন্ত্‌সভকে পাঠানো জারের নির্দেশ পালনের জন্য একটা সেনাদল গড়ে তুলেছে। সেই সেনাদলটি দুর্গ থেকে বেরিয়ে গিয়ে কুরিনের কাছে ঘাঁটি গড়েছে। সেখানেই আবার আর একটা সেনাদল তাঁবু ফেলে গাছ কাটার কাজে লেগেছে। যুবক ভরন্ত্‌সভ সেখানে একটা চমৎকার কাপড়ের তাঁবুতে থাকে, আর তার স্ত্রী মারিয়া ভাসিলেভ্‌না প্রায়ই বাইরে রাত কাটায়। মারিয়া ভাসিলেভ্‌নার সঙ্গে বেরিয়াতিন্‌স্কির সম্পর্কটা কারও কাছেই গোপন নেই। যে সমস্ত অফিসার অভিজাত মহলের লোক নয় তারা এবং সৈনিকরা নোংরা ভাষায় মহিলাকে গালাগালি করে, কারণ সে তাঁবুতে এলেই তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় সারারাত শত্রুর অপেক্ষায় গুপ্তস্থানে লুকিয়ে থাকতে।

দুর্গ থেকে কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে বাটলার শিবিরে এসেছে কিছু পুরনো মেস-সঙ্গী ও কুরিন রেজিমেণ্টের সতীর্থ অফিসারদের সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে তার দিনগুলি বেশ ভালই কাটছে। সে বাসা নিল পল্‌তোরাৎস্কির তাঁবুতে। সেখানেও কিছু পূর্ব-পরিচিত লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তারাও তাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। সে ভরন্ত্‌সভের সঙ্গেও দেখা করল; একসময়ে তারা একই রেজিমেণ্টে ছিল। ভরন্ত্‌সভ তাকে সাদরে গ্রহণ

করল এবং জেনারেল কজলোভস্কির বিদায়-ভোজে তাকে নিমন্ত্রণও করল।

২২

চেচনিয়াতে মনস্কামনা সিদ্ধ না হওয়ায় হাজি মুরাদ তিফ্‌লিসে ফিরে গেল। প্রতিদিনই ভরন্ত্‌সভের কাছে যায়। যখনই সুযোগ পায় সব পাহাড়ি বন্দীদের একত্র করে তার পরিবারের সঙ্গে বন্দী-বিনিময়ের ব্যবস্থা করতে ভাইস্‌রয়কে মিনতি জানায়। বলে, সে ব্যবস্থা যতদিন না হয় ততদিন তার হাত বাঁধা, ততদিন সে রুশদের কোন কাজে লাগবে না, শামিলকেও ধ্বংস করতে পারবে না। ভরন্ত্‌সভ তাকে আশ্বাস দেয়, কিন্তু কাজে কিছু করে না, কেবলই বলে জেনারেল আর্গুতিন্‌স্কি তিফ্‌লিসে এলেই সে তার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলবে।

হাজি মুরাদ তখন ভরন্ত্‌সভের কাছে অনুমতি চাইল কিছুদিন নুখায় গিয়ে থাকবার। নুখা ট্রান্‌সককেসিয়ার একটা ছোট শহর। তার ধারণা সেখান থেকেই তার পরিবার সম্পর্কে শামিলের সঙ্গে এবং তার নিজের লোকদের সঙ্গে আলোচনা করার সুবিধা হবে। তাছাড়া, নুখা একটি মুসলিম শহর হওয়ায় সেখানে একটি মসজিদ আছে; সেখানে প্রার্থনাদি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তার পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক হবে। ভরন্ত্‌সভ এ বিষয়ে পিতার্সবুর্গে চিঠি লিখল, কিন্তু ইতিমধ্যে হাজি মুরাদকে নুখা যাবার অনুমতিও দিল।

নুখাতে মসজিদ ও খানের প্রাসাদের কাছাকাছি একটা পাঁচ-ঘরের বাড়িতে হাজি মুরাদের থাকার ব্যবস্থা হল। ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা, তার দো-ভাষী, ও অনুচররা—সকলেই একই বাড়িতে থাকে। পাহাড় থেকে আগত দূতদের সঙ্গে আলোচনা এবং মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়েই হাজি মুরাদের দিন কাটে।

২৪শে এপ্রিল তারিখে ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে ফিরে এসে হাজি মুরাদ শুনল তার অনুপস্থিতিতে ভরন্ত্‌সভ কর্তৃক প্রেরিত একজন দূত এসেছে তিফ্‌লিস থেকে। সোজা শোবার ঘরে ঢুকে দুপুরের নামাজ পড়া শেষ করে সে অপেক্ষমান কর্মচারি ও ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে গেল। তিফ্‌লিস থেকে আগত কাউন্সিলর কিরিলভ জানাল, ভরন্ত্‌সভের ইচ্ছা সে যেন ১২ই তারিখে তিফ্‌লিসে গিয়ে জেনারেল আর্গুতিন্‌স্কির সঙ্গে দেখা করে।

হাজি মুরাদ রেগে বলল, "ইয়াকৃশি। টাকা এনেছ?"

"এনেছি", কিরিলভ জবাব দিল।

প্রথমে দুই হাত ও পরে চারটি আঙুল তুলে হাজি মুরাদ বলল, "দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। এখনই দাও।"

"এখনই দেব," বলে কর্মচারিটি ব্যাগ থেকে টাকার থলি বের করল। দো-ভাষীর মারফৎ জানতে চাইল, এখানে তার একঘেয়ে লাগছে কি না। হাজি মুরাদ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকিয়ে বলল, "ওকে বলে দাও ওর সঙ্গে কোন কথা হবে না। আমাকে টাকাটা দিয়ে দিক।" তারপরই সে টাকাটা গুণতে বসল।

হাজি মুরাদ দৈনিক পাঁচ মোহর হিসাবে ভাতা পেত। পুরো টাকাটাকে সার্কাসীয় কোটের পকেটে ফেলে সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল; খুবই অপ্রত্যাশিত-ভাবে কাউন্সিলরের মাথার টাকের উপর একটা চাটি মেরে যাবার জন্য পা বাড়াল।

কাউন্সিলর লাফ দিয়ে উঠে দো-ভাষীকে হুকুম করল, ওকে বলে দাও যে সে একজন কর্ণেলের মর্যাদাসম্পন্ন অফিসার, কাজেই এ রকম ব্যবহারের স্পর্ধা যেন তার না হয়। হাজি মুরাদ মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল যে সে সব জানে। তারপরই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ভারপ্রাপ্ত অফিসার বলল, "একে নিয়ে কী যে করি। কোন্ দিন বুঝি বুকের মধ্যে ছুরি বসিয়ে দেবে। বাস, হয়ে গেল! এই সব শয়তানদের সঙ্গে কথা বলাই দায়! লোকটা যেন ক্রমেই মরিয়া হয়ে উঠছে।"

অন্ধকার নেমে আসতেই দুজন গুপ্তচর চোখ পর্যন্ত মাথা ঢেকে পাহাড় থেকে নেমে এল তার সঙ্গে দেখা করতে। ভারপ্রাপ্ত অফিসার তাদের নিয়ে গেল হাজি মুরাদের ঘরে। যে খবর তারা এনেছে সেটা মোটেই আশাপ্রদ নয়। হাজি মুরাদের যে বন্ধুরা তার পরিবারকে উদ্ধার করার দায়িত্ব নিয়েছিল শামিলের ভয়ে তারা এখন পরিষ্কারভাবে তাদের অক্ষমতা জানিয়ে দিয়েছে, কারণ শামিল শাসিয়েছে যে কেউ হাজি মুরাদকে সাহায্য করবে তাকেই ভীষণভাবে নির্যাতন করা হবে। খবর শুনে সে অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে বসে রইল।

ভাবনা আর ভাবনা। শেষ বারের মত ভাবনা। এবার চরম সিদ্ধান্ত নিতে হবে। শেষ পর্যন্ত মাথা তুলে প্রত্যেককে একটা করে মোহর দিয়ে বলল, "যাও!"

"কি জবাব দেব সেখানে গিয়ে?"

"ঈশ্বরের ইচ্ছামত জবাবই হবে ··· যাও!"

তারা চলে গেল। দুই হাঁটুর উপর কনুই রেখে হাজি মুরাদ কার্পেটের উপরেই বসে রইল। ভাবতে লাগল।

"আমি কি করব? শামিলের কথায় বিশ্বাস করে তার কাছে ফিরে যাব? সে তো শেয়াল, আমাকে ঠকাবে। না ঠকালেও সেই ভাহা মিথ্যা-বাদীর কাছে ধরা দেওয়া অসম্ভব, কারণ রুশদের পক্ষে আসার পরে এখন আর সে আমাকে বিশ্বাস করবে না।" একটা তাভ্‌লিনীয় উপকথা তার মনে পড়ে গেল। একটা বাজপাখি ধরা পড়ে মানুষদের সঙ্গে অনেক দিন কাটিয়ে একদিন বাজপাখিদের কাছে পাহাড়ে ফিরে গেল। তার পায়ের চামড়ার বেড়িতে ঘণ্টা বাঁধা। অন্য বাজপাখিরা তাকে গ্রহণ করল না। তারা বলল, "যেখানে তোমার পায়ে রুপোর ঘণ্টা বেঁধে দিয়েছে সেখানেই ফিরে যাও।" বাজপাখিটা ফিরে গেল না; বাড়িতেই থেকে গেল। কিন্তু অন্য বাজপাখিরা তাকে সেখানে থাকতে দিল না, ঠুকরে মেরে ফেলল।

হাজি মুরাদ ভাবল, "সেইভাবে ওরাও আমাকে ঠুকরে মেরে ফেলবে। তাহলে কি আমি এখানে থেকেই রাশিয়ার জারের হয়ে ককেসিয়া জয় করে নেব এবং খ্যাতি, উপাধি, ও সম্পদের অধিকারী হব? ... সেটাই করা যেতে পারে। কিন্তু আমাকে এখনি সিদ্ধান্ত নিতে হবে; অন্যথায় শামিল আমার পরিবারকে শেষ করে ফেলবে।"

সে রাতটা সে জেগে কাটাল। কেবলই ভাবল।

২৩

মাঝরাত নাগাদ সে মনস্থির করে ফেলল। সে পালিয়ে পাহাড়ে চলে যাবে, এখনও যে সব আভার তার প্রতি অনুরক্ত আছে তাদের নিয়ে ভেদেনোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তারপর হয় মরবে না হয় পরিবারকে উদ্ধার করবে। তাদের উদ্ধার করে আবার রুশদের কাছে ফিরে আসবে, কি খুনজাখে পালিয়ে গিয়ে শামিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সে সম্পর্কে মনস্থির করতে পারে নি। শুধু জানে, প্রথমেই তাকে এখান থেকে পালিয়ে পাহাড়ে যেতে হবে এবং পরিকল্পনামত কাজ শুরু করে দিতে হবে।

বালিশের নীচ থেকে কালো বেশ্‌মেতটা টেনে বের করে নিয়ে সে অনুচর-দের ঘরে গেল। হলের অন্য পাশেই তারা থাকে। ঘরে আলো নেই, তবে জানালা দিয়ে চাঁদের ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে। ঘরের একদিকে একটা টেবিল ও দুটো চেয়ার। চারজন অনুচর কার্পেটের উপর অথবা মেঝেতে বুর্কা বিছিয়ে শুয়ে আছে। খানেফি ঘুমিয়েছে বাইরে ঘোড়াগুলির কাছে। দরজা খোলার শব্দ শুনে গমজালো ঘুম থেকে জেগে উঠে তাকে দেখে আবার শুয়ে পড়ল। এল্ডার পাশেই শুয়েছিল। সে কিন্তু লাফ দিয়ে উঠে বেশ্‌মেতটা পরতে

লাগল। খান মাহোমা ও বাটা ঘুমতেই লাগল। হাজি মুরাদ তার বেশ্‌মেতটা টেবিলের উপর রাখল। তার ভিতরে সেলাই করে ভরে রাখা মোহরের ঠোকা লেগে শব্দ হল।

সেদিন পাওয়া মোহরগুলি এল্ডারের হাতে দিয়ে হাজি মুরাদ বলল, "এগুলিও সেলাই করে ভরে দাও।" এল্ডার সেগুলি নিয়ে তৎক্ষণাৎ চাঁদের আলোয় গিয়ে একটা ছোট ছুরি বের করে বেশ্‌মেতের লাইনিং কাটতে শুরু করল। গম্‌জালো উঠে পা ভেঙে বসল।

হাজি মুরাদ বলল, "শোন গম্‌জালো, সকলকে বলে দাও রাইফেল ও পিস্তল পরীক্ষা করে নিয়ে গোলাগুলি তৈরি রাখতে। কাল আমরা অনেক দূরে যাব।"

ভোর হবার আগে হাজি মুরাদ আর একবার হলে ঢুকল হাত-মুখ ধোবার জল নিতে। ভোরের পাখিদের কলকাকলি এখন আরও উচ্চ ও অবিরাম শোনা যাচ্ছে। অনুচরদের ঘরে তরবারি ও ছুরিতে শান দেওয়ার শব্দ হচ্ছে।

জল নিয়ে নিজের ঘরের দরজায় পৌঁছতেই মুরিদদের ঘরের অস্ত্রে শান দেওয়ার শব্দকে ছাপিয়ে কানে এল খানেফির গলায় একটা পরিচিত গানের সুর। থেমে সে কান পাতল। গানের ভিতর দিয়ে বলা হয়েছে, কেমন করে হম্‌জাদ নামক একজন দিঝিগিট (সাহসী অশ্বারোহী) তার সাহসী অনুচরদের নিয়ে রুশদের একদল সাদা ঘোড়া আটক করেছিল; কেমন করে এক রুশ প্রিন্স তাকে তিরেক পর্যন্ত ধাওয়া করে একটা জঙ্গলের মত বড় বাহিনী নিয়ে ঘেরাও করে ফেলে; কেমন করে হম্‌জাদ ঘোড়াগুলিকে মেরে ফেলে রক্তাক্ত বাঁধের পিছনে তার লোকজনদের ট্রেঞ্চের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছে যতক্ষণ তাদের রাইফেলে ছিল বুলেট, কোমরবন্ধে ছিল ছুরি, আর শিরায় ছিল রক্ত। কিন্তু মরবার আগে আকাশে পাখিদের উড়তে দেখে হাম্‌জাদ তাদের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বলেছিল:

> "উড়ে যাও পাখিরা, উড়ে যাও আমাদের ঘরে!
> আমাদের মাকে বলো, বোনকে বলো,
> বলো আমাদের সাদা মেয়েদের যে আমরা যুদ্ধ করে মরেছি
> ঘজভাতের জন্য! তাদের আরও বলো আমাদের দেহ
> কোন কবরে শুয়ে বিশ্রাম করবে না!
> তাকে ছিঁড়ে খাবে নেকড়ের দল,
> কাক ও শকুনরা ঠুকরে তুলে নেবে আমাদের চোখ।"

গানটা এখানেই শেষ; শেষের কথাগুলি গাওয়ার সময় বাটার জোরদার গলা সেই সুরের সঙ্গে মিশে গেল।

খানেফির গান শুনতে শুনতে হাজি মুরাদের মনে পড়ল তার মায়ের গানের কথা, তার শিশুকালের কথা। নিজের শৈশবের কথা মনে করিয়ে

দিল তার ছেলে ইউসুফের কথা ; নিজের হাতে সেই প্রথমবার তার মাথা কামিয়ে দিয়েছিল। আজ ইউসুফ একটি সুদর্শন, যুবক দিঝিগিট! বাড়ি থেকে আসার সময় সে ছেলেকে বলেছিল, "তুমি এখানেই থাক। এখন তুমি বাড়িতে একা। তোমার মা ও ঠাকুরমার যত্ন নিও।" সেই ছেলের চোখ দুটি শামিল আজ উপড়ে ফেলতে চাইছে!

এইসব চিন্তা তাকে এতই উত্তেজিত করে তুলল যে সে আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না। লাফ দিয়ে উঠে খুঁড়িয়ে দরজার কাছে গিয়ে এল্ডারকে ডাকল। এখনও সূর্য ওঠে নি, কিন্তু বেশ আলো দেখা দিয়েছে। পাখিদের গান ভেসে আসছে।

সে বলল, "যাও, অফিসারকে বলে এস আমি ঘোড়ায় চড়ে বাইরে যেতে চাই, আর ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাও।"

২৪

এই সময়টাতে বাটলারের একমাত্র সান্ত্বনাস্থল ছিল যুদ্ধের কাব্য। শুধু চাকরির ক্ষেত্রেই নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও সে তাই নিয়েই মেতেছিল। নিজের পদমর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে বিস্মৃতি খুঁজতে লাগল শুধু যুদ্ধের কাব্যেই নয়, মদেও। প্রতিদিন মদ খাওয়া বাড়তে লাগল, দিনের পর দিন সে নীতির দিক থেকে দুর্বল হতে লাগল। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্নার প্রতি আচরণে এখন সে আর আগেকার পবিত্র "জোসেফ" নেই, বরং তার সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করেছে, আর তার ফলে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যেমন অবাক হয়েছে, তেমনি লজ্জাও পেয়েছে।

এপ্রিলের শেষে একটা নতুন সেনাদল দুর্গে এসে পৌছল। বেরিয়াতিন্স্কির ইচ্ছা তাদের নিয়ে সে চেচ্নিয়ার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হবে—এতদিন যে কাজকে অসম্ভব মনে করা হত তাকে সম্ভব করে তুলবে। দুর্গের অধিবাসীরা নবাগতদের সম্মানে একটা নৈশভোজের আয়োজন করল। সেখানে গান-বাজনার শেষে চলল মদের মহোৎসব। মেজর পেত্রভ পাড় মাতাল হয়ে একটা চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে কল্পিত সৈন্যদের লক্ষ্য করে তরবারি ঘোরাচ্ছে ; কখনও শপথ নিচ্ছে, কখনও হাসছে ; একবার কাউকে আলিঙ্গন করছে, পরক্ষণেই নাচছে।

বাটলারও সেখানে ছিল। যুদ্ধের কাব্য খোঁজার চেষ্টা করছিল। মনে মনে মেজরের জন্য দুঃখও বোধ করছিল। অবশ্য এখন তাকে থামানো অসম্ভব। আর বাটলার যখন বুঝল যে মদের নেশা তার মাথায়ও চড়ে বসেছে, তখন সে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বাড়ির পথে পা বাড়াল।

সাদা বাড়িগুলোর মাথায় আর রাস্তার পথের উপর চাঁদের আলো পড়েছে। ফলে প্রতিটি পাথর, প্রতিটি খড়, প্রতিটি ধুলোর স্তূপ চোখে পড়ছে। বাড়িতে যাবার মুখে মারিয়া দিমিত্রিয়েভনার সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। একটা শাল দিয়ে তার মাথা ও গলা জড়ানো। প্রত্যাখ্যাত হবার পর থেকে লজ্জায় সে মহিলাটিকে এড়িয়েই চলে। কিন্তু এখন চাঁদের আলোয় মদের নেশায় বুঁদ হয়ে সে তারদিকে এগিয়ে গেল। শুধাল, "কোথায় চললে গো?"

মহিলা খুশির স্বরে বলল, "কেন, আমার বুড়োর খোঁজে।"

"তাকে নিয়ে ভাবছ কেন? এখনই এসে পড়বে।"

"আসবে কি?"

"না এলে সকলে ধরে নিয়ে আসবে।"

"তাই বটে .... কিন্তু এটা ঠিক নয়, বুঝলে। ... কিন্তু তুমি বলছ আমার যাবার দরকার নেই?"

"হ্যাঁ। তুমি বরং বাড়ি যাও।"

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না ঘুরে তার পাশাপাশিই হাঁটতে লাগল। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় মনে হচ্ছে তাদের দুজনের মাথার ছায়াকে ঘিরে একটা আলোর ছটা এগিয়ে চলেছে পথের উপর দিয়ে। বাটলারের ইচ্ছা হল বলে সে তাকে আগের মতই পছন্দ করে, কিন্তু কিভাবে আরম্ভ করবে ঠিক বুঝতে পারছিল না। দুজন চুপচাপ হাঁটতে লাগল। এমন সময় মোড় ঘুরে একজন অশ্বারোহী দেখা দিল। রক্ষীসহ একজন অফিসার।

"কে আসছে?" বলে মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না এক পাশে সরে দাঁড়াল। লোকটি পিতর নিকলায়েভিচ কামেনেভ; একসময়ে মেজরের সহকর্মী ছিল; তাই মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না তাকে চিনতে পারল।

"আরে, পিতর নিকলায়েভিচ তুমি?"

"হ্যাঁ, আমি। এই যে বাটলার, কেমন আছ? .... এখনও ঘুমও নি? মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্নার সঙ্গে একটু ঘুরছ? সরে পড়, নইলে মেজর মজা দেখাবে .... সে কোথায়?"

"কেন, ওখানে। ... ওই শোন।" যেখানে "তুলুম্বাস" (এক রকম ড্রাম) বাজছে আর গান হচ্ছে সেই দিকে আঙুল বাড়িয়ে মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা বলল, "ওরা ফুর্তি করছে।"

"সে কি? নিজেদের খুশিতে?"

"না; কয়েকজন অফিসার এসেছে হসভ-ইয়ার্ড থেকে; তাদের জন্য একটু ফুর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

"ওঃ, তা ভাল। আমি ভাল সময়েই এসে পড়েছি। .... একমুহূর্তের জন্য আমার মেজরকে দরকার।"

"কাজ আছে?" বাটলার শুধাল।

"হ্যাঁ, একট কাজ আছে।"

"ভাল না মন্দ?"

"সেটা নির্ভর করছে। ··· আমাদের পক্ষে ভাল ; আর কারও পক্ষে মন্দ," কামেনেভ হেসে উঠল।

ততক্ষণে তারা মেজরের বাড়িতে পৌঁছে গেল।

সঙ্গী একজন কসাককে ডেকে কামেনেভ বলল, "চিখিরেভ, এখানে এস।"

অন্যদের ভিতর থেকে একজন ডন কসাক ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এল।

কামেনেভ ঘোড়া থেকে নেমে বলল, "এবার জিনিসটা বের কর।"

কসাকটি ঘোড়া থেকে নেমে জিনের সঙ্গে বাঁধা ঝোলার ভিতর থেকে একটা বস্তা বের করল। সেটা নিয়ে কামেনেভ তার মধ্যে হাতটা ঢুকিয়ে দিল।

"এবার একটা নতুন জিনিস দেখাব কি? মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা, ভয় পাবে না তো?"

"ভয় পাব কেন?"

"এই দেখ!" বলে কামেনেভ একটা মানুষের মুণ্ডু বের করে চাঁদের আলোয় তুলে ধরল। "চিনতে পারছ?"

মাথাটা কামানো, মোটা ভুরু, ছোট করে ছাটা কালো দাড়ি ও গোঁফ, এক চোখ খোলা আর এক চোখ বোজা। মাথার খুলিটা দুই ভাগ হয়ে গেছে, নাকের নীচে রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। একখানা রক্ত মাথা তোয়ালে দিয়ে গলাটা বাঁধা। মাথায় অনেকগুলি আঘাত সত্ত্বেও নীল ঠোঁটে এখনও লেগে রয়েছে শিশুর মত হাসি।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না সেদিকে তাকিয়ে কোন কথা না বলে মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত পায়ে বাড়িতে ঢুকে গেল।

সেই ভয়ংকর মাথাটা থেকে বাটলার চোখ ফেরাতে পারছিল না। এ যে সেই হাজি মুরাদের মাথা যার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনায় এই সেদিনও সে অনেক সন্ধ্যা কাটিয়েছে।

বলল, "এর অর্থ কি? কে তাকে মেরেছে?"

"পালাবার চেষ্টা করে সে ধরা পড়ে," বলে মাথাটা কসাকটির হাতে দিয়ে সে বাটলারের সঙ্গে বাড়ির ভিতরে গেল।

বলল, "লোকটা বীরের মত মরেছে।"

"কিন্তু এত সব ঘটনা ঘটল কি করে?"

"একটু অপেক্ষা কর, মেজর এলেই সব বলব। সেইজন্যই আমাকে পাঠানো হয়েছে। সব দুর্গ ও আওল ঘুরে ঘুরে আমি এটা দেখাচ্ছি।"

মেজরকে খবর পাঠানো হল। তার মতই মাতাল দুটি অফিসারের সঙ্গে এসে মেজর কামেনেভকে আলিঙ্গন করল।

কামেনেভ বলল, "হাজি মুরাদের মাথা এনেছি।"

"বল কি? ···· সে মারা পড়েছে?"

"হ্যাঁ, পালাবার চেষ্টা করেছিল।"

"আমি তো আগাগোড়াই বলেছি সে সকলকে ফাঁকি দেবে। ··· সেটা কোথায়? আমি মাথাটার কথা বলছি। ···· একবার দেখাও।"

কসাকটিকে ডাকা হল। সে মাথাশুদ্ধ বস্তাটা নিয়ে এল। সেটা বের করা হলে মেজর নেশাগ্রস্ত চোখে অনেকক্ষণ সেটার দিকে তাকিয়ে রইল।

বলল, "যাই বল বড় ভাল লোক ছিল। একবার চুমো খেতে দাও!"

অফিসারদের একজন বলল, "হ্যাঁ, তা ঠিক। খুব সাহসী মাথা।"

সকলে দেখে মাথাটা কসাককে ফিরিয়ে দিল। সে সেটাকে বস্তাবন্দী করল।

একজন অফিসার জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা কামেনেভ, মাথাটা দেখাবার সময় তুমি কি বক্তৃতা কর?"

"না। ··· আমি ওকে চুমো খাব। ও আমাকে একখানা তরবারি দিয়েছিল!" মেজর চেঁচিয়ে বলল।

বাটলার বাইরে পরচালায় চলে গেল।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না দ্বিতীয় ধাপে বসেছিল। মুখ ঘুরিয়ে বাটলারকে দেখে আবার সক্রোধে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

"ব্যাপার কি মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না?"

"তোমরা গলা-কাটার দল। ···· এসব কাজকে আমি ঘৃণা করি! সত্যি তোমরা গলা-কাটা", বলে সে উঠে দাঁড়াল।

"যুদ্ধ? যুদ্ধই বটে। ···· সব গলা-কাটা, আর কিছু না। মৃতদেহকে কবর দেওয়া উচিত, আর ওরা সব দাঁত বের করে হাসছে। · গলা-কাটার দল", বার বার কথাটা বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সে পিছনের দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেল।

বাটলার ঘরে ফিরে গিয়ে কামেনেভকে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিতে লাগল।

কামেনেভ সব বলল।

ঘটনাটা এই রকম।

২৫

হাজি মুরাদকে শহরের আশেপাশে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যেতে দেওয়া হত, কিন্তু তার সঙ্গে কসাক পাহারা থাকত। নুখাতে যতজন সৈন্য থাকত তার থেকে দশজন অফিসারদের কাজ করত; ফলে দশজনকে যদি হাজি

মুরাদের সঙ্গে থাকতে হত (সেই রকমই হুকুম ছিল) তাহলে একদিন পরপর একই সেনাদলকে তার সঙ্গে যেতে হত। ফলে প্রথম দিন দশজনকে পাঠালেও স্থির হয় যে তারপর থেকে মাত্র পাঁচজনকে পাঠানো হবে, আর হাজি মুরাদকেও বলে দেওয়া হল সে যেন তার সব সঙ্গীদের সঙ্গে না নেয়। কিন্তু ২৫শে এপ্রিল সে পাঁচজনকেই সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিল। সে যখন ঘোড়ায় চাপল তখন পাঁচজনকেই তার সঙ্গে যেতে দেখে কম্যাণ্ডার বলল, তাকে তো সকলকে সঙ্গে নিতে নিষেধ করা হয়েছে ; কিন্তু হাজি মুরাদ না শোনার ভান করে ঘোড়ায় চেপে বসল। কম্যাণ্ডারও আর পীড়াপীড়ি করল না।

কসাকদের সঙ্গে একজন নন-কমিশণ্ড্ অফিসার ছিল। নাম নজারভ। লোকটি সাহসিকতার জন্য সেন্ট জর্জ ক্রুশ পেয়েছিল। স্বাস্থ্যবান, বাদামি চুলভর্তি মাথা ; যুবকটি গোলাপের মত তাজা। গরীব পরিবারের বড় ছেলে, পিতৃহীন অবস্থায় বড় হয়েছে। বুড়ো মা, তিন বোন ও দুই ভাইকে মানুষ করেছে।

কম্যাণ্ডার চেঁচিয়ে বলল, "ওর খুব কাছে কাছে থেকো নজারভ!"

"ঠিক আছে ইয়োর অনার!" বলে পা-দানিতে পা তুলে পিঠে ঝোলানো রাইফেলটাকে ঠিক করে নিয়ে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। কসাক চারজন তার পিছনে ছুটল।

সকালে বেশ কুয়াশা ছিল, কিন্তু পরে পরিষ্কার হয়ে গেছে। নবোদ্গত পত্র-পল্লব, সদ্য-গজানো ঘাস, অংকুরিত ফসল, পথের বাঁ দিকের স্রোতস্বিনীর ঊর্মিমালা—সূর্যের আলো পড়ে সবকিছুই ঝিকমিক করছে।

হাজি মুরাদ প্রথমে দুল্‌কিচালে ঘোড়া চালাতে লাগল। তার পিছনে কসাক ও অনুচররা। মাইল দেড়েক যাবার পরে তার সাদা কর্বদা ঘোড়ার পিঠ ছুঁতেই সেটা গতি বাড়িয়ে দিল ; তার সঙ্গে তাল রাখতে অন্য সকলেও ঘোড়া ছুটিয়ে দিল কদমে।

ফেরাপন্তভ নামের কসাকটি বলল, "আঃ, ওর ঘোড়াটা খুব ভাল!"

আর একজন বলল, "সত্যি ; তিফ্‌লিসে ঘোড়াটার জন্য দাম দেওয়া হয়েছিল তিন শ' রুবল।"

"কিন্তু এই ঘোড়ায় চড়েই আমি ওকে ছাড়িয়ে যেতে পারি", নজারভ বলল।

"ছাড়িয়ে যাবে? বটে!"

হাজি মুরাদ গতি বাড়িয়েই চলল।

তার কাছে পৌছবার চেষ্টা করে নজারভ চেঁচিয়ে বলল, "হেই কুণাক, ওরকম ছুটো না। ধীরে চল!"

হাজি মুরাদ পিছন ফিরে তাকাল, কিছু বলল না ; একই গতিতে ছুটতে লাগল।

ইগ্‌নাতভ বলল, "দেখ, ঐ শয়তানদের মাথায় কোন মতলব আছে। দেখছ না, কি রকম তীরের মত ছুটছে।"

এই ভাবে প্রায় মাইলখানেক তারা পাহাড়ের দিকে ছুটল।

"আমি বলছি এ চলবে না!" নজারভ চেঁচিয়ে বলল।

হাজি মুরাদ উত্তর দিল না, ফিরেও তাকাল না; শুধু গতি বাড়িয়ে দিল।

"প্রতারক! তোমাকে ছাড়ছি না!" নজারভ ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসিয়ে পা-দানিতে দাঁড়িয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে ঝড়ের বেগে উড়ে চলল।

আকাশ উজ্জ্বল, বাতাস নিষ্কলংক, নজারভের মন জীবনের আনন্দে ভরপুর। মসৃণ পথে সে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে হাজি মুরাদের দিকে। একটা দুঃখের বা ভয়ংকর ঘটনা যে ঘটতে পারে তা কখনও তার মনে হয় নি।

পিছনে বড় ঘোড়াটার পায়ের শব্দে হাজি মুরাদ বুঝতে পারল যে সেটা অচিরেই তাকে ধরে ফেলবে। তাই ডান হাতে পিস্তল ধরে বাঁ হাতে সে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল।

তার পাশাপাশি পৌঁছে হাত বাড়িয়ে তার ঘোড়ার লাগাম ধরার চেষ্টা করে নজারভ চীৎকার করে বলল, "ও চেষ্টা করো না, আমি বলছি!" কিন্তু লাগামটা চেপে ধরার আগেই একটা গুলি ছোঁড়া হল। বুক চেপে ধরে নজারভ আর্তনাদ করে উঠল, "কি করছ তুমি? ...ওদিকে ছেলেরা!" মাথা ঘুরে সে জিনের উপর উপুড় হয়ে পড়ল।

কিন্তু পাহাড়িরা তার আগেই যার যার অস্ত্র তুলল, কসাকদের লক্ষ্য করে পিস্তল চালাল, তরবারির কোপ বসাল।

নজারভ ঘোড়ার গলা থেকে ঝুলে আছে। ইগ্‌নাতভের ঘোড়াটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল; দুটি পাহাড়ি জোয়ান ঘোড়া থেকে না নেমেই তরবারি উঁচিয়ে তাদের মাথায় ও হাতে আঘাত করতে লাগল। পেত্রাকভ সহকর্মীকে উদ্ধার করতে ছুটে যেতেই দুটো গুলি এসে তার পিঠে ও পাঁজরে লাগল; একটা বস্তার মত ধপ্‌ করে সে মাটিতে পড়ে গেল।

মিশ্‌কিন ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দুর্গের দিকে ছুটিয়ে দিল। খানেফি ও বাটা তার পিছনে ছুটল, কিন্তু ধরতে পারল না।

ইগ্‌নাতভকে খতম করে গম্‌জালো নজারভকেও তরবারির কোপ বসিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বাটা নিহতদের কার্তুজের থলেগুলো তুলে নিল। হাজি মুরাদ সকলকে ডাক দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। পিছন পিছন ছুটল মুরিদরা তারা যখন নুখা থেকে ছয় মাইলেরও বেশী দূরে ধান ক্ষেতে পৌঁছে গেল তখন সেখানকার দুর্গ-চূড়া থেকে সতর্কতাজ্ঞাপক গুলির শব্দ করা হল।

"হে প্রভু! হে ঈশ্বর! হায় ঈশ্বর! ওরা কী করেছে!" হাজি মুরাদের পলায়নের সংবাদ শুনে দুর্গাধিপতি দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে চীৎকার করে বলতে লাগল। মিশ্‌কিনের মুখে সব শুনে বলল, "ওরা আমাকেও শেষ করে দিয়েছে! শয়তানদের পালাতে দিয়েছে!"

চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল। পলাতকদের ধরতে কসাকদের দ্রুত পাঠানো হল। তাছাড়া রুশ-সমর্থক আওলগুলি থেকে যত আধা-সামরিক লোক সংগ্রহ করা গেল তাদেরও পাঠানো হল। জীবিত বা মৃত অবস্থায় হাজি মুরাদকে ধরবার জন্য এক হাজার রুবল পুরস্কার ঘোষণা করা হল। কসাকদের হাত থেকে তার সদলে পলায়নের দু'ঘণ্টা পরেই ভারপ্রাপ্ত অফিসারের অধীনে দু'শ'র বেশী অশ্বারোহী পলাতকদের গ্রেপ্তার করতে ছুটে গেল।

বড় রাস্তা ধরে কয়েক মাইল ঘোড়া ছুটিয়ে হাজি মুরাদ ক্লান্ত ঘোড়াটাকে পরীক্ষা করে দেখল। ঘোড়াটা হাঁপাচ্ছে, ঘামে ভিজে গেছে, গায়ের রং সাদা থেকে ধূসর হয়ে গেছে।

রাস্তার ডান দিকে দেখা যাচ্ছে বেনের্দ্‌ঝিক আওলের সাক্লিয়া ও মিনারগুলি; বাঁ দিকে কিছু ক্ষেত ও তারপরে নদী। পাহাড়ে যাবার রাস্তাটা ডান দিকে হলেও হাজি মুরাদ বাঁ দিকে মোড় নিল, কারণ সে ধরেই নিল যে অনুসরণকারীরা ডান দিকেই তার খোঁজ করবে। কিন্তু নদী পর্যন্ত যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। বসন্তকালে যেরকম হয়ে থাকে, বাঁ দিকের শস্যক্ষেতগুলি বন্যার জলে ভেসে গিয়ে জলাভূমির রূপ নিয়েছে। ঘোড়ার পা সেখানে ডুবে যাচ্ছে। জল-কাদার ভিতর দিয়ে অনেক কষ্টে পথ চলে নদী পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই অন্ধকার নেমে এল। তাদের বাঁ দিকে কিছুটা ঝোপ-জঙ্গলে ঢাকা উঁচু জমি দেখা গেল। হাজি মুরাদ স্থির করল, রাতটা সেখানেই কাটাবে। ঘোড়াগুলি বিশ্রাম পাবে, চরে খেতেও পারবে। লোকজনরা সঙ্গে যা খাবার ছিল তাই খেল।

রাত নামল। প্রথমে চাঁদ উঠল। তারপর পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ল। অন্ধকার হল। চারদিকে অনেক নাইটিঙ্গেল পাখি। এই সব ঝোপের মধ্যেও দুটি ছিল। চারদিকে চুপচাপ হয়ে গেলে তাদের গলায় গান ফুটে উঠল।

রাত জেগে হাজি মুরাদ রাতের সব রকম শব্দ শুনতে লাগল। নাইটিঙ্গেলের গান শুনে তার মনে পড়ে গেল গত রাতে শোনা হম্‌জাদের গান। যেকোন মুহূর্তে তারও তো হম্‌জাদের মত অবস্থা হতে পারে। হঠাৎ তার মন খারাপ হয়ে গেল। বুর্কাটা পেতে হাত-মুখ ধুয়ে নিল এমন সময় শুনতে পেল কারা যেন তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। জলাভূমিতে অনেক অশ্বক্ষুরের শব্দ।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি বাটা ঝোপের শেষ প্রান্তে ছুটে গেল। অন্ধকারে দেখতে পেল

কালো কালো ছায়া—কেউ পদাতিক, কেউ অশ্বারোহী। অপর দিকে খানেফির চোখে পড়ল সেই একই দৃশ্য। আধা-সরকারী বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে জেলার সামরিক কম্যাণ্ডার কর্গানভ।

হাজি মুরাদ ভাবল, "তাহলে তো আমাদেরও হম্জাদের মতই লড়াই করতে হবে।"

একদল স্বেচ্ছাসৈনিক ও কসাকদের নিয়ে হাজি মুরাদের পিছু নিয়েছিল কর্গানভ। কিন্তু তার কোনরকম হদিশ করতে না পেরে ফিরেই যাচ্ছিল, এমন সময় সন্ধ্যার দিকে একটি বুড়োকে দেখতে পেয়ে জানতে চাইল, সে কোন অশ্বারোহী দলকে দেখেছে কি না। বুড়ো জবাব দিল, দেখেছে; ছ'জন অশ্বারোহী জল-কাদায় নাস্তানাবুদ হয়ে দূরের জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে; সে কাঠ কাটতে সেখানে গিয়েছিল। তখনই বুড়োকে সঙ্গে নিয়ে সে এগিয়ে গেল এবং জঙ্গলটাকে ঘিরে অপেক্ষা করতে লাগল, যাতে সকাল হলেই জীবিত বা মৃত হাজি মুরাদকে ধরতে পারে।

পরিস্থিতি অনুধাবন করে এবং জঙ্গলের মধ্যে একটা নালা দেখতে পেয়ে হাজি মুরাদ স্থির করল সেখানেই ট্রেঞ্চ কেটে যতক্ষণ শক্তি ও গুলিতে কুলোয় ততক্ষণ অনুসরণকারীদের বাধা দেবে। কথাটা সঙ্গীদের জানিয়ে নালার সামনে একটা বাঁধ তৈরী করবার হুকুম দিল। সঙ্গে সঙ্গে অনুচররা ডালপালা কেটে মাটি খুঁড়ে একটা ট্রেঞ্চ বানিয়ে ফেলল। হাজি মুরাদও তাদের সঙ্গে হাত লাগাল।

আলো দেখা দিতেই কম্যাণ্ডার জঙ্গল পর্যন্ত ঘোড়া চালিয়ে এসে চীৎকার করে বলল:

"হেই! হাজি মুরাদ, আত্মসমর্পণ কর! আমরা সংখ্যায় অনেক, আর তোমরা মাত্র জনাকয়!"

উত্তরে এল একটা রাইফেলের গুলির শব্দ, নালার ভিতর থেকে উঠে এল ধোঁয়ার একটুকরো মেঘ, বুলেট এসে বিদ্ধ করল একটা ঘোড়াকে, স্খলিত পদে সেটা পড়ে গেল। তার প্রত্যুত্তরে জঙ্গলের প্রান্ত থেকে রাইফেলের ফটাফট শব্দ ভেসে এল, স্বেচ্ছাসৈনিকদের বুলেট হিস্-হিস্ ফিস্-ফিস্ করে ডাল-পাতা কেটে বাঁধের গায়ে বিঁধতে লাগল, কিন্তু ট্রেঞ্চের মধ্যে কেউ আহত হল না। স্বেচ্ছাসৈনিকরা কাছাকাছি এগিয়ে এলে তবেই হাজি মুরাদ ও তার সঙ্গীরা গুলি ছুঁড়ছে, আর তারা লক্ষ্যভ্রষ্টও হচ্ছে না। তিনটি স্বেচ্ছাসৈনিক আহত হল, অন্যরা দূরে সরে গিয়ে গুলি চালাতে লাগল।

ঘণ্টাধিক কাল ধরে এই চলল। সূর্য উঠে এল অর্ধেক গাছের উঁচু পর্যন্ত। সদ্য আগত অনেক মানুষের চীকার শুনতে পেয়ে হাজি মুরাদ ভাবল এবার ঘোড়ায় চেপে নদীর দিকে যাবার চেষ্টা করবে। অনুচরবর্গ সঙ্গে নিয়ে এসেছে মেখ্‌তুলির হাজি আগা। একসময় সে হাজি মুরাদের

কুনাক ছিল, পাহাড়ে তার সঙ্গেই বাস করত, কিন্তু পরে রুশদের দলে চলে গিয়েছিল। তার সঙ্গে আছে হাজি মুরাদের পুরনো শত্রুর ছেলে আহ্মেত খান।

কর্গানভের মতই হাজি আগাও হাজি মুরাদকে ডেকে আত্মসমর্পণ করতে বলল। আগের মতই হাজি মুরাদ তার উত্তর দিল একটা গুলি দিয়ে।

নিজের তরবারি উঁচিয়ে হাজি আগা চীৎকার করে উঠল, "সঙ্গীরা, তরবারি তোল!" একশ' মানুষ সশব্দে ধেয়ে গেল জঙ্গলের দিকে মুক্ত কৃপাণ হাতে।

স্বেচ্ছাসৈনিকরা ছুটতে লাগল ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, কিন্তু ট্রেঞ্চের ভিতর থেকে একের পর এক গুলি আসতে লাগল। তিনজন পড়ে গেল। তারা থেমে গিয়ে পাল্টা গুলি চালাতে শুরু করল। গুলি করতে করতেই তারা এক ঝোপ থেকে বেরিয়ে আর এক ঝোপের আড়ালে গিয়ে ক্রমাগত এগোতে লাগল ট্রেঞ্চের দিকে। কেউ কেউ এগিয়ে যেতে পারল, কেউ কেউ বা হাজি মুরাদ ও তার লোকদের গুলিতে মাটিতে পড়ে গেল। হাজি মুরাদের গুলি অভ্রান্তলক্ষ্য। গম্‌জালোর গুলিও কদাচিৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়; যখনই তার বুলেট লক্ষ্যভেদ করে তখনই সে খুশিতে চীৎকার করে ওঠে। খান মাহোমা নালার প্রান্তে বসে "ইল্ লিয়াখা ইল্ আল্লাখ" গান করছে আর আয়েস করে গুলি ছুঁড়ছে; সে গুলি প্রায়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে। এল্ডারের সারা শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে; হাজি মুরাদের উপর চোখ রেখে সে অনবরত গুলি ছুঁড়ছে। তার মন চাইছে ছুরি হাতে নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। খানেফি আস্তিন গুটিয়ে এখানেও ভৃত্যের কাজই করছে। হাজি মুরাদ ও খান মাহোমার হাত থেকে বন্দুক নিয়ে অনবরত তাকে গুলি ভরে দিচ্ছে, বারুদ ঠেসে দিচ্ছে। বাটা ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঘোড়াগুলিকে নিরাপদ জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেই প্রথম আহত হল; একটা বুলেট গলায় ঢুকে যাওয়ায় সে বসে পড়ে রক্তবমি করতে লাগল। তারপর আহত হল হাজি মুরাদ; বুলেট তার কাঁধে বিঁধল। বেশ্‌মেতের লাইনিং থেকে খানিকটা তুলো ছিঁড়ে নিয়ে ক্ষতস্থানের মুখটা বন্ধ করে দিয়ে সে আবার গুলি চালাতে লাগল।

এল্ডার বার বার বলতে লাগল, "তরবারি নিয়ে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি চল।" বাঁধের আড়াল থেকে মাথা তুলে শত্রুর দিকে ছুটে যাবার চেষ্টা করা মাত্রই একটা বুলেটের আঘাতে সে মাথা ঘুরে পড়ে গেল হাজি মুরাদের ঠ্যাঙের উপর। হাজি মুরাদ তাকাল তার দিকে। ভেড়ার মত সুন্দর চোখ দুটি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। উপরের ঠোঁটটা ছোট শিশুর মত উল্টে আছে। হাজি মুরাদ পাটা সরিয়ে এনে আবার গুলি ছুঁড়তে লাগল।

মৃত এল্ডারের উপর ঝুঁকে পড়ে খানেফি তার কোটের কার্তুজের থলে

থেকে গুলি বের করে নিতে লাগল।

খান মাহোমা আলস্যভরে বন্দুকে গুলি ভরে ছুঁড়ছে আর গান গেয়ে চলেছে। চীৎকার করতে করতে শত্রুপক্ষ ঝোপ থেকে ঝোঁপে ছুটছে, আর ক্রমেই কাছে—আরও কাছে এগিয়ে আসছে।

আর একটা বুলেট এসে হাজি মুরাদের বাঁ দিকে লাগল। নালার মধ্যে শুয়ে পড়ে আবারও বেশ্‌মেত থেকে খানিকটা তুলো বের করে ক্ষতস্থানে চেপে দিল। এবারকার আঘাতটা মারাত্মক; সে বুঝতে পারল মৃত্যু আসন্ন। কল্পনায় একের পর এক স্মৃতির ছবি অসাধারণ দ্রুততায় সরে সরে যাচ্ছে। এই দেখছে, শক্তিমান আবু মুত্‌সাল খান উদ্যত ছুরি হাতে আসছে, আর সে কাটা গালটা চেপে ধরে শত্রুর দিকে ধেয়ে চলেছে; তারপরেই দুর্বল রক্তহীন বৃদ্ধ ভরন্ত্‌সভের ধূর্ত সাদা মুখটা ভেসে উঠল, কানে এল তার নরম কণ্ঠস্বর; তারপরেই দেখল ছেলে ইউসুফকে, স্ত্রী সোফিয়াকে এবং শত্রু শামিলের লাল দাড়িওয়ালা বিবর্ণ মুখ ও আধবোজা দুটি চোখ। এইসব ছবি মনের পর্দায় ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু তার মনে কোন অনুভূতি জাগছে না—না করুণা, না ক্রোধ, না কোন বাসনা: তার ভিতরে যা শুরু হয়ে চলেছে, অথবা শুরু হয়ে গেছে, তার তুলনায় এ সবকিছু যেন অতি তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু তার শক্তিশালী দেহ তখনও আরব্ধ কাজটি করেই চলেছে। শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করে সে বাঁধের পিছন থেকে উঠে দাঁড়াল, অগ্রসরমান লোকটিকে লক্ষ্য করে পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়ল। গুলি লাগল। লোকটি পড়ে গেল। তখন হাজি মুরাদ নালা থেকে সম্পূর্ণ উঠে বড় বেশী খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুরি হাতে নিয়ে সোজা ছুটল শত্রুর দিকে

কয়েকটা গুলি ছুটে এল। সে মাথা ঘুরে পড়ে গেল। কয়েকজন স্বেচ্ছা-সৈনিক বিজয়-উল্লাসে চীৎকার করতে করতে তার ভূপাতিত দেহটার দিকে ছুটে এল। কিন্তু যে দেহটাকে মনে হয়েছিল মৃত সেটা হঠাৎ নড়ে উঠল। প্রথমে উঠল অনাবৃত, রক্তাক্ত, কামানো মাথাটা; তারপর উঠল দেহটা দুই হাতে একটা গাছের গুঁড়িকে ধরে। তাকে এতই ভয়ংকর দেখাচ্ছিল যে যারা ছুটে এসেছিল তারা হঠাৎ থেমে গেল। কিন্তু সহসা তার দেহের ভিতরটা শিরশির করে উঠল, স্খলিত পায়ে গাছটা থেকে সরে এসে সটান উপুড় হয়ে পড়ে গেল—একটা ছেটে-ফেলা কাঁটা-গাছ যেন—আর সে নড়ল না।

দেহ নড়ল না, কিন্তু মনটা তখনও সজীব।

প্রথম তার কাছে এগিয়ে এল হাজি আগা। একটা বড় ছুরি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করল। হাজি মুরাদের মনে হল, কে যেন হাতুড়ি দিয়ে তার মাথায় ঘা মারল, কিন্তু কে মারল, কেন মারল তা সে বুঝতে পারল না। দেহের সঙ্গে সংযোগের সেটাই তার শেষ চেতনা। আর কিছুই সে জানল না,

বুঝল না ; শত্রুরা তার যে দেহটাকে লাথি মারল, টানাটানি করল সেটা যেন তার নয়।

হাজি আগা মৃতদেহের উপর পা রেখে দুই কোপে মাথাটা কেটে ফেলল ; পাছে রক্ত লেগে তার জুতোজোড়া নষ্ট হয়ে যায় তাই অতি সাবধানে পা দিয়ে সেটাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। গলার ধমনী থেকে লাল রক্ত ফোয়ারার মত ছিটকে বের হতে লাগল, আর মাথার কালো রক্ত ঘাসকে ভিজিয়ে দিল।

শিকারীরা যেভাবে নিহত জন্তুকে ঘিরে দাঁড়ায় সেইভাবে- কর্গানভ, হাজি আগা ও আহ্‌মেত খান এবং অন্য সকলেই হাজি মুরাদ ও তার অনুচরদের (খানেফি, খান মাহোমা ও গম্‌জালোকে তারা বেঁধে রেখেছে) চারদিকে ঘিরে দাঁড়াল। ঝোপ-ঝাড়ের মাথায় যে বারুদের ধোঁয়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল তার মধ্যেই তাদের বিজয়-উল্লাস প্রকাশ করতে লাগল।

যতক্ষণ গুলি চলছিল ততক্ষণ নাইটিঙ্গেলরা তাদের গান বন্ধ রেখেছিল ; এবার আবার তাদের গান শুরু হল : প্রথমে খুব কাছে একটি গলায়, তারপর দূরে দূরে অনেক গলায়।

* * *

চষা ক্ষেতের মাঝখানে একটা দুমড়ানো কাঁটা-গাছ দেখে এই মৃত্যুর কথাটাই আমার মনে পড়ে গেল।

———

সংসারের সুখ

Family Happiness

প্রথম পর্ব

॥ এক ॥

মা মারা গেলেন হেমন্তকালে। কাতিয়া, সোনিয়া ও আমি—আমরা তিনজন সারা শীতকালটা গ্রামেই কাটালাম। কাতিয়া আমাদের পরিবারের পুরনো বন্ধু। গভর্নেস হিসাবে সেই আমাদের মানুষ করেছে। জ্ঞান হবার পর থেকে তাকেই আমরা ভালবেসেছি। সোনিয়া আমার ছোট বোন।

পক্রভ্স্কয়েতে বেশ দুঃখের ভিতর দিয়েই সে শীতটা কাটল। খুব ঠাণ্ডা। দমকা হাওয়া। জানালা ছাড়িয়ে উঠেছে বরফের স্তূপ। বলা যায়, সারা শীতকালটা বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায় নি। আর বাড়িতে লোকও আসত খুব অল্প। তারা এলেও বাড়িতে আনন্দের সাড়া জাগত না। সকলেই বিষণ্ণ মুখে আসত, নীচু গলায় কথা বলত। মুখে হাসি নেই; শুধুই দীর্ঘশ্বাস। আমার দিকে তাকিয়ে তারা মাঝে মাঝেই কেঁদে উঠত। সে কান্না আরও গভীর হত কালো ফ্রক পরা ছোট্ট সোনিয়াকে দেখলে। কেবলই মনে হত, মৃত্যু বুঝি তখনও বাড়িটার মায়া কাটায় নি। চারদিকেই একটা থমথমে বিষণ্ণ ভাব।

তখন আমার বয়স সতেরো বছর। মারা যাবার আগে মা স্থির করেছিল আমাকে নিয়ে শহরে যাবে; আমাকে উঁচু সমাজের উপযুক্ত করে তুলবে। কিন্তু মৃত্যু সে আশায় বাদ সাধল। একটা শীত আমাকে এই গ্রামেই কাটাতে হবে। সেকথা ভাবলেও মন খারাপ হয়ে যেত।

সকলে বলতে লাগল, আমি রোগা হয়ে গিয়েছি। দেখতে কেমন যেন সাদাসিধে। হলামই বা। কী এসে যায় তাতে? ভাল থাকলেও তো এই পাড়াগাঁয়েই কাটাতে হবে।

কিন্তু শীতের শেষের দিকটায় কাতিয়া আমার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। স্থির করল, যেমন করে হোক আমাকে বিদেশে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার জন্য অর্থের প্রয়োজন। মা টাকাপয়সা কি রেখে গেছে আমরা জানতাম না। তাই আমাদের অভিভাবকের আসার অপেক্ষায় দিন গুণতে লাগলাম।

অভিভাবক এল মার্চ মাসে। কাতিয়া বলল, "বাঁচলাম বাবা। সের্গেই মিখাইলিচ এসেছেন। আমাদের খোঁজ করেছেন। ডিনারে আসতে চান। মাশা, মুখ গোমড়া করে থেকো না তো। তোমাকে ওরকম দেখলে তিনি

কি ভাববেন বল তো ?”

সের্গেই মিখাইলিচ আমাদের প্রতিবেশী। বাবার চাইতে বয়সে অনেক ছোট হলেও তার বন্ধুর মত। তার আসার খবর শুনে খুশি হলাম। ভাবলাম, এবার হয় তো গ্রাম ছেড়ে যেতে পারব।

তাকে আমার ভাল লাগত। বাড়ির সবাই তাকে ভালবাসত। সোনিয়া আবার তার ধর্ম-মেয়ে। তাছাড়া, মার একটা কথা আমি কোনদিন ভুলব না। একবার মা বলেছিল, তাঁর ইচ্ছা এমন একজন মানুষের সঙ্গেই যেন আমার বিয়ে হয়। কথাটা শুনে তখন অবাক হয়েছিলাম। কিছুটা খারাপও লেগেছিল। সের্গেই মিখাইলিচের তখন যৌবন পার হয়ে গেছে। দীর্ঘাকৃতি চেহারা, শরীরটা ভারি। আমার আদর্শ নায়ক ছিল একেবারে অন্য ধরনের। ছ'বছর আগে তখন আমার বয়স ছিল এগারো। সে আমাকে “তুমি” বলত, আমার সঙ্গে খেলা করত, আমার নাম দিয়েছিল “ছোট্ট ভায়োলেট”। তাই বড় ভয় হত। মাঝে মাঝে নিজেকেই প্রশ্ন করতাম, সে যদি হঠাৎ আমাকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে কি করব ?

ডিনারের আগেই এসে গেল সের্গেই মিখাইলিচ। জানালা দিয়ে দেখলাম একটা ছোট স্লেজে চেপে সে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালিয়ে গেলাম বৈঠকখানায়। স্থির করলাম, এমন ভান করব যেন মোটেই তার অপেক্ষায় ছিলাম না। কিন্তু হল-ঘরে তার পায়ের ভারী শব্দ আর দরাজ গলা শোনা-মাত্র নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। দৌড়ে হল-ঘরে চলে গেলাম। কাতিয়ার হাত ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে। চড়া গলায় কথা বলছে আর হাসছে। আমাকে দেখে কথা বন্ধ করে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। বুঝতে পারলাম, অস্বস্তিতে আমি লাল হয়ে উঠেছি।

পরক্ষণেই সে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল, “আরে! কত বদলে গেছেন আপনি! কত বড় হয়ে গেছেন! দেখছি আমার ছোট্ট ভায়োলেট এখন গোলাপ হয়ে ফুটেছে।”

ছ'বছর তাকে দেখি নি। অনেক বদলে গেছে। চেহারায় বয়সের ছাপ পড়েছে, রং আরও ময়লা হয়েছে। মুখে জুল্‌ফি রেখেছে ; সেটা তার মুখে খুবই বেমানান লাগছে। কিন্তু তার সহজ, সরল ভাবটা বদলায় নি। বদলায় নি তার মুখের অকপট ভাব। প্রশস্ত মুখে বুদ্ধিদীপ্ত দুটি উজ্জ্বল চোখ ; হাসিটা স্নিগ্ধ, প্রায় শিশুর মত।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে আর এ বাড়ির অতিথি রইল না, সকলের সঙ্গেই আপন জনের মত ব্যবহার করতে লাগল। তাকে নিয়ে চাকরবাকররাও বেশ খুশি হয়ে উঠল।

সন্ধ্যায় বৈঠকখানার পুরনো জায়গায় বসে কাতিয়া চা ঢেলে দিল, ঠিক মায়ের আমলে যেমন করত। তার পাশে বসলাম আমি আর সোনিয়া।

বাবার একটা পাইপ ছিল বুড়ো গ্রেগরির কাছে। ও সেটা সের্গেই মিখাইলিচকে এনে দিল।

পাইপ টানতে টানতে পায়চারি করতে করতে একসময় সে বলল, "বাড়িটাতে কত দুঃখের ঘটনাই ঘটেছে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাতিয়া বলল, "তা ঠিক।"

"বাবাকে আপনার মনে আছে কি?" সের্গেই মিখাইলিচ আমাকে জিজ্ঞাসা করল।

"খুব অল্প", আমি বললাম।

সে মৃদুকণ্ঠে বলল, "এখন তিনি থাকলে কত ভাল হত। আপনার বাবাকে আমি খুব ভালবাসতাম।"

"আর এখন ওর মাও স্বর্গে গেছেন", বলেই কাতিয়া তাড়াতাড়ি চায়ের পাত্রটা ঢাকা দিয়ে রুমাল বের করল চোখের জল মুছতে।

প্রসঙ্গ পাল্টাতে সের্গেই বলল, "তোমার খেলনাগুলো দেখাও তো সোনিয়া।" বলেই সে ড্রয়িং-রুমে চলে গেল।

কাতিয়া বলল, "ওঁর মত বন্ধু আর হয় না।"

ও-ঘর থেকে সে হেঁকে বলল, "মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না, এ ঘরে আসুন তো। আমাদের একটু বাজনা শোনান।"

তার বন্ধুর মত ব্যবহার বেশ ভাল লাগল। গেলাম।

বীঠোফেনের "স্বপ্ন-সোনাটা"র একটা অংশ খুলে সে বলল, "এই নিন। এটাই বাজান।" চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে সে ঘরের এককোণে চলে গেল।

যতটা পারি সাধ্যমত বাজালাম। শেষ করার আগেই সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বাবার কথা বলতে শুরু করল—কিভাবে তার সঙ্গে বাবার পরিচয় হয়েছিল, আর আমি যখন শুধু বই আর খেল্না নিয়েই মেতে থাকতাম।

বাকি সন্ধ্যাটা সে কাতিয়ার সঙ্গে জমিদারীর আলোচনাতেই কাটিয়ে দিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে "আসি তাহলে" বলে আমার কাছে এসে হাতটা ধরল।

কাতিয়া জানতে চাইল, "আবার কবে দেখা হবে?"

"বসন্তকালে", সে জবাব দিল। আমার হাত তখনও ছাড়ে নি। "এখন যাব দানিলভ্‌কাতে। সেখানকার সব কিছু দেখব, বন্দোবস্ত যা করার করব, তারপর নিজের কাজে মস্কো যাব। গ্রীষ্মকালে আবার দেখা হবে।"

"এত বেশী দিনের জন্য যাচ্ছেন কেন?" আমি বিষণ্ণ গলায় বললাম। যেন আমি আশা করেছিলাম যে রোজ তার সঙ্গে দেখা হবে।

সে বলল, "পড়াশুনা নিয়ে থাকবেন। মন-মরা হয়ে থাকবেন না। বসন্তকালে এসে আপনার পরীক্ষা নেব।" আমার দিকে না তাকিয়েই সে আমার হাতটা ছেড়ে দিল।

বাইরের ঘরে তাকে বিদায় জানালাম। সে কিন্তু তাড়াহুড়া করে কোটটা গায়ে চাপাল; আমার দিকে একবার তাকাল না পর্যন্ত।

সে রাতে কাতিয়ার আর আমার চোখে অনেকক্ষণ ঘুম এল না। তাকে নিয়েই দু'জন গল্প করে কাটালাম। নতুন কোন প্রশ্ন এসে আমাকে উত্যক্ত করল না। মনে হল: সুখী হবার জন্য বেঁচে থাকা দরকার। মনে আশা জাগল, ভবিষ্যতে আমি সুখী হব। পত্রভ্স্কয়েতে আমাদের পুরনো বাড়িটা হঠাৎ আলোয় আর প্রাণের ছোঁয়ায় ঝল্‌মল্ করে উঠল যেন।

॥ দুই ॥

বসন্তকাল এল। বদলে গেল আমার জীবনযাত্রার ধারা। সোনিয়াকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি। সময় কাটে গানবাজনা আর পড়াশুনা নিয়ে। মাঝে মাঝে বাগানে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়াই; বসে বসে ভাবি আর ভাবি। ভগবান জানেন, কি চাই, কিসের আশায় দিন কাটাই। কখনও বা সারাটা রাত, বিশেষ করে জ্যোৎস্নাভরা রাত কাটে জানালার ধারে বসে। কখনও গোপনে চলে যাই বাগানে; শিশির-ভেজা ঘাসের বুকে পা ফেলে হেঁটে বেড়াই পুকুর পাড়ে।

সের্গেই মিখাইলিচ ফিরে এল মে মাসের শেষে।

তখন সন্ধ্যা। বারান্দায় চা খেতে বসেছি। টেবিলে ধপধপে চাদর। পালিশ-করা সামোভারটা ঝকঝক করছে; মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। টেবিলে থালাভর্তি ক্রেন্দোস্কি পিঠে, বিস্কুট আর একজগ ক্রিম। বেজায় ক্ষিধে পেয়েছে। তাই চায়ের অপেক্ষায় না থেকে ঘন ক্রিমে রুটি ভিজিয়ে খেতে শুরু করেছি। এমন সময় কাতিয়াই প্রথম দেখতে পেল তাকে। বলল, সের্গেই মিখাইলিচ, এইমাত্র আপনার কথাই হচ্ছিল।'

পোশাক বদলাবার জন্য উঠে পড়তেই সে আমার পথ আটকে দাঁড়াল। হেসে বলল, "পাড়াগাঁয়ে আবার এসব ভদ্রতার কি দরকার? বুড়ো গ্রেগরির কাছে এভাবে বের হতে তো আপনার লজ্জা করে নি, তাহলে আমার কাছে লজ্জা কেন?"

চলে যেতে যেতে বললাম, "এখুনি আসছি"।

পিছন থেকে সে বলল, "ব্লাউজটা কি দোষ করল? ওটা পরে আপনাকে একেবারে কিষাণ কন্যার মত দেখাচ্ছে।'

পোশাক বদলে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। তখন সে কাতিয়ার সঙ্গে সাংসারিক কথাবার্তা বলছিল। জমিদারীর সুখবর জানিয়ে বলল, এই গ্রীষ্মকালটা আমাদের গ্রামেই কাটাতে হবে; তারপর সোনিয়ার লেখাপড়ার

জন্ত আমরা পিতার্সবুর্গে বা অন্ত কোন শহরে যাব।

কাতিয়া বলল, "আপনি আমাদের সঙ্গে বিদেশে গেলে খুব ভাল হয়। আপনাকে ছাড়া খুবই অসহায় বোধ করব।"

সের্গেই বলল, "আপনাদের সঙ্গে সারা পৃথিবীটা ঘুরতে পারলে তো ভালই হত।"

আমি বললাম, "তাহলে চলুন না, সারা পৃথিবীটাই একসাথে চক্কর দিয়ে আসি।"

হেসে মাথা নেড়ে সে বলল, "আর আমার মার কি হবে? আমার নিজের কাজকর্ম? এসব বাজে কথা থাক। এবার বলুন, কেমন ছিলেন। আশা করি, আবার মন-মরা হন নি?"

সন্ধ্যাটা সুন্দর কাটল। চায়ের সরঞ্জাম সরিয়ে নেবার পরেও আমরা বারান্দায় বসে কথা বলতে লাগলাম। সে আমার অনেক প্রশংসা করল। আমাকে আদর করল।

কথাবার্তার ফাঁকে একসময় বলল, "আপনাদের পক্রভ্স্কয়েতে আমার খুব ভাল লাগে। সারাটা জীবন যদি এখানে বসে কাটাতে পারতাম।"

"তাই থাকুন না", কাতিয়া বলল।

সে নীচু গলায় বলল, "থাকতে পারলে ভাল হত। কিন্তু জীবন তো বসে থাকে না।

কাতিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করল, "আপনি বিয়ে করেন না কেন? স্বামী হিসাবে আপনি তো খাসা লোক।"

সে হেসে বলল, "বিয়ে করি না বসে থাকতে চাই বলে। না কাতেরিনা কার্লভ্না, আপনার আর আমার বিয়ের বয়স ফুরিয়ে গেছে।"

কাতিয়া পাল্টা বলে উঠল, "তা আর নয়! বয়স তো মোটে ছত্রিশ, এর মধ্যেই জীবন শেষ।"

"সব শেষ", সের্গেই বলল। "আমি চাই কেবল বসে থাকতে; কিন্তু বিয়ে করতে হলে আরও অনেক কিছু করা দরকার।" আমার দিকে মাথাটা নেড়ে আরও বলল, "ওকেই জিজ্ঞাসা করুন না। ওর মত লোকদেরই তো বিয়ে করা উচিত। আপনার আর আমার তো ওদের বিয়ে দেখেই আনন্দ।"

তার গলায় বেদনার আভাষ পেলাম। কিছুক্ষণ সকলেই চুপ। চেয়ারে ঘুরে বসে সেই আবার কথা শুরু করল।

'আচ্ছা, ধরুন একটি সপ্তদশীকে হঠাৎ বিয়ে করে ফেললাম। যেমন এই মাশাকে—মানে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্নাকে। আচ্ছা, বুকে হাত দিয়ে আপনিই বলুন তো, এমন একটা বুড়োর সঙ্গে বাঁধা পড়লে আপনার খারাপ লাগবে না? সে চায় শুধুই বসে থাকতে, আর আপনার মনে কত ব্যাকুলতা, কত বাসনা।"

বিব্রত বোধ করলাম। কি বলব বুঝতে না পেরে চুপ করে গেলাম।

সে হেসে বলল, "আরে না, না, আমি বিয়ের প্রস্তাব করছি না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় একলা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে যেমন বরের স্বপ্ন আপনি দেখেন আমি তো তেমনটি নই ; তাই তো? আর সেটা তো দুর্ভাগ্যই হবে, তাই না?"

"দুর্ভাগ্য নয়—" আমি শুরু করলাম।

"—কিন্তু সুখেরও নয়", সে সম্পূর্ণ করল কথাটা।

"না, কিন্তু আমাকে হয় তো ভুল—"

বাধা দিয়ে সে বলল, "দেখলেন তো? ঠিক কথাই উনি বলেছেন, আর সেজন্য ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।"

"অদ্ভুত মানুষ আপনি—ঠিক আগেকার মত", বলে কাতিয়া রাতের খাবার দিতে বলার জন্য বাড়ির ভিতরে চলে গেল। দু জন চুপচাপ বসে রইলাম। কারও মুখে কথা নেই।

চারদিক নিস্তব্ধ। গান শুরু করল একটি নাইটিঙ্গেল। সে গানে সমস্ত বাগান ভরে গেল। দূরে খাদ থেকে জবাব দিল আর একটি নাইটিঙ্গেল। বাগানের পাখিটা ক্ষণেক চুপ করে থেকে আরও জোরে গান ধরল। তাদের গানের মহিমায় ঝংকৃত হয়ে উঠল রাতের পৃথিবী। সে পৃথিবীকে আমরা কতটুকু চিনি!

বাগানের মালী আমাদের পাশ দিয়ে ফুলের ঘরে শুতে চলে গেল। ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল তার ভারী বুটের শব্দ। পাহাড়ের নীচ থেকে তীক্ষ্ণ শিস শোনা গেল দু'বার। তারা সব চুপচাপ।

তার দিকে তাকালাম। একদৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ বলে উঠল, "বেঁচে থাকাটাই ভাল। কি বলেন?"

আমি তার কথারই পুনরুক্তি করলাম, "হ্যা, বেঁচে থাকাটা ভাল।"

এবার সের্গেই উঠে দাঁড়াল। বলল, "আচ্ছা, তাহলে আসি। আমার খাবার অপেক্ষায় মা বাড়িতে বসে আছে।'

বললাম, "ভেবেছিলাম নতুন সোনাটাটা আপনাকে শোনাব।"

"সে আর একদিন হবে। চলি।"

নিরাসক্ত জবাব। কোন সন্দেহ নেই, সে চটেছে। খারাপ লাগল। কাতিয়া আর আমি গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত তার সঙ্গে গেলাম। গাড়ি হাঁকিয়ে সে চলে গেল। দাঁড়িয়ে দেখলাম।

সের্গেই মিখাইলিচ আবার এল। আবার। নানা আলোচনার মধ্যে দিয়ে অস্বস্তির ভাবটা সম্পূর্ণ কেটে গেল। সারা গ্রীষ্মকালটা সপ্তাহে দু'তিনদিন সে আমাদের বাড়ি আসত। তার আসায় এত অভ্যস্ত হয়ে গেলাম যে কিছুদিন না এলেই খুব খারাপ লাগত।

সের্গেই আসার পর থেকেই আমার এতদিনের চেনা জগৎটা যেন একেবারেই

বদলে গেল। আমাদের চাষীদের, বাড়ির ঝি-চাকরদের একেবারে অন্যভাবে দেখতে শেখাল সে। আমাদের কুঞ্জবন, বাগান, আর মাঠ-ঘাট হঠাৎ আমার কাছে নতুন আর সুন্দর হয়ে উঠল। সের্গেই মিখাইলিচ ঠিক কথাই বলে: জীবনে সত্যিকারের আনন্দ মাত্র একটি—অন্যের জন্য বাঁচা। তখন কথাটা অদ্ভুত ঠেকেছিল, মাথায় ঢোকে নি। কিন্তু ধারণাটা এবার দানা বাঁধতে শুরু করল আমার মনে। আমার জীবনযাত্রায় কোন রকম পরিবর্তন না করে, শুধু নিজের ছাপ ছাড়া কোন কিছুতে নতুন কিছু যোগ না করে চারদিকে একটি আনন্দময় জগৎ যেন সে খুলে ধরল। শৈশব থেকে সে জগতের সবকিছু আমাকে ঘিরে রেখেছিল, কিন্তু কখনও মুখ খোলে নি। সে এল, আর সঙ্গে সঙ্গে তারা মুখর হয়ে উঠল; আমাকে আনন্দে ভরে তুলতে চাইল আমার অন্তরে প্রবেশ করে।

সেবারের গ্রীষ্মে প্রায়ই নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তাম। সুখের একটা উত্তেজনা আমাকে ভরিয়ে তুলত। ঘুম আসত না চোখে। ছোট ঘরটা নিঃশব্দ: শুধু কাতিয়ার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। আর পাশের ঘড়িটার টিকটিক। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতাম, ফিসফিস করে মন্ত্র আওড়াতাম, বুকে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকতাম, গলার ক্রুশে চুমো খেতাম। মনে হত, আমার স্বপ্ন, আমার চিন্তা, আমার প্রার্থনা এই অন্ধকারে আমার সঙ্গেই রয়েছে, উড়ছে বিছানার আশেপাশে, দাঁড়িয়ে আছে আমার উপরে। আরও মনে হত, আমার সব ধ্যান-ধারণা, তারই ধ্যান-ধারণা, সমস্ত অনুভূতি তারই অনুভূতি। এটা যে পূর্বরাগ তখনও বুঝি নি। মনে হত, এ ধরনের অনুভূতি যেকোন সময়েই আসতে পারে।

॥ তিন ॥

ফসল কাটার সময় এসে গেল।

একদিন দুপুরের খাবার খেয়ে কাতিয়া ও আমি সোনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে গেলাম। লেবু গাছের ছায়ায় প্রিয় বেঞ্চিটাতে বসলাম সকলে। সেখান থেকে অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়।

তিন দিন হল সের্গেই মিখাইলিচ এদিকে আসে নি। নায়েবের কাছে শুনেছি, আজ তার আসার কথা আছে। তার প্রিয় পিচ ও চেরি ফল কিছু আনিয়ে নিয়ে কাতিয়া বেঞ্চিতে শুয়ে ঝিমুতে লাগল। সোনিয়া একটা বুড়ো লেবু গাছের শেকড়ে পুতুলের ঘর বানাতে ব্যস্ত। আমার উৎকণ্ঠ দৃষ্টি পথের দিকে।

গুমোট গরম। হাওয়া নেই। মেঘ ক্রমেই কালো হয়ে আসছে। সকাল

থেকেই বিদ্যুতের ঝিলিক। আমার অস্থির লাগছে। কিন্তু ক্রমে মেঘ সরে গেল। সূর্য দেখা দিল। বুঝলাম, আজ আর ঝড় আসবে না।

পথের ধারে বার্চ গাছের চূড়ায় সূর্য অস্ত গেল। এখনও তার দেখা নেই। এমন তো হবার নয়। হঠাৎ দেখলাম, যেদিক থেকে তার আসার কথা নয় সেই দিক থেকেই আসছে বড় বড় পা ফেলে। মুখখানা হাসিখুশি। হাতে একটা টুপি।

আমার হাতে চাপ দিয়ে ফিসফিস করে বলল, "কি খবর ছোট্ট ভায়োলেট, কেমন আছেন? ভাল তো?"

আমার প্রশ্নের জবাবে সে হেসে উত্তর দিল, "আমি চমৎকার আছি। আর তেরোতে পা দিলাম তো, তাই মনে হচ্ছে ঘোড়ায় চাপি বা গাছে চড়ি।"

তার হাসি-ভরা চোখে চোখ রেখে বললাম, "বুনো উচ্ছ্বাস বুঝি?"

"হ্যাঁ," চোখ ঠেরে সে জবাব দিল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "সত্যি আপনি ভায়োলেট। ধুলো আর গরমের ভিতর দিয়ে এলাম আপনার কাছে, মনে হল ভায়োলেটের গন্ধ পেলাম।"

প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য প্রশ্ন করলাম, "ফসল কাটা কেমন চলছে?"

"চমৎকার। এরা সবাই চমৎকার লোক। ওদের যত বেশী চেনা যায় ততই ভাল লাগে।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। আপনি আসার আগে বসে বসে ওদের কাজ দেখছিলাম। হঠাৎ এমন লজ্জা করতে লাগল—ওরা কাজ করছে, আর আমি এখানে বসে—"

বাধা দিয়ে সে বলল, "ওভাবে বলবেন না। এটা পবিত্র ভাব। এধরনের অনুভূতি নিয়ে কখনও জাঁক করা উচিত নয়।"

"কিন্তু আমি তো জাঁক করি নি, শুধু কথাটাই বলেছি।"

"তা জানি। যাক গে, এদিকে চেরিগুলো তো ফুরিয়ে গেল। এখন কি হবে?"

ফলের বাগানের গেট তালাবন্ধ। মালীদের কাউকে দেখা গেল না। চাবি আনতে ছুটল সোনিয়া। সে কিন্তু অপেক্ষা না করে দেয়ালের উপর উঠে লাফিয়ে পড়ল ওদিকে। বলল, "আরও চেরি চাই তো রেকাবিটা দিন।"

"না, আমি নিজের হাতে তুলতে চাই। চাবিটা নিয়ে আসি। সোনিয়া খুঁজে পাবে না।"

কিন্তু সে ওখানে একা কি করছে দেখার খুব ইচ্ছা হল। সত্যি কথা বলতে কি, তাকে চোখের আড়াল করতে ইচ্ছা করছিল না।

দেয়াল ঘুরে পা টিপে টিপে অন্যদিকে গেলাম। ওখানটা আরও নীচু। একটা খালি পিপের উপর দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়লাম।

সের্গেই মিখাইলিচ ধরেই নিয়েছে যে আমি চলে গেছি। কেউ ওকে

দেখতে পাচ্ছ না। তাই টুপি খুলে চোখ বুঁজে একটা দো-ডালার ফাঁকে বসে আছে। হঠাৎ কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে ঈষৎ হেসে অস্ফুট গলায় কি যেন বলল। মনে হল সে বলছে, "মাশা"; কিন্তু তা তো হতে পারে না। সে আবার বলল, "মাশা আমার।" এবার আরও আস্তে, আরও কোমল স্বরে। কথাগুলো কানে আসতেই বুকটা ঢিপ্‌ঢিপ্ করতে লাগল, একটা তীব্র আনন্দ আমাকে অভিভূত করে ফেলল। পাছে পড়ে যাই সেই ভয়ে দেয়ালটাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরলাম।

শব্দ শুনে চমকে উঠে সে চারদিকে তাকাল। মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। কি একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। আরক্তিম মুখে দাঁড়িয়ে রইল। একবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমিও হাসলাম। সুখে তার সারা মুখ লাল। এখন আর সে পরিবারের এক প্রবীণ বন্ধু নয়। এখন সে আমার সমবয়সী এমন একজন মানুষ যে আমাকে ভালবাসে আর ভয় করে, যাকে আমিও ভালবাসি আর ভয় করি। কোন কথা না বলে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তারপরই হঠাৎ তার ভুরু কুঁচকে গেল। মিলিয়ে গেল মুখের হাসি আর চোখের উজ্জ্বলতা। বলে উঠল, "নেমে পড়ুন, নইলে পড়ে যাবেন যে! আর চুলটা ঠিক করে নিন। যা একখানা চেহারা বানিয়েছেন।"

হঠাৎ কি মনে করে "না, আমি নিজের হাতে চেরি তুলতে চাই" বলে একেবারে গাছের ডালটা ধরে আবার দেয়ালে উঠে পড়লাম। সে হাতটা বাড়াবার আগেই লাফিয়ে নামলাম ফলের বাগানে।

আবার লাল হয়ে সে বলে উঠল, "কী বোকামী হচ্ছে। যদি লেগে যায় তখন কি হবে?"

তারপর দুজনই চুপচাপ। সোনিয়া চাবি নিয়ে দৌড়ে আসায় অস্বস্তির হাত থেকে রেহাই পেলাম। তবু অনেকক্ষণ দুজনে কথা বললাম না, সোনিয়াকে নিয়েই ব্যস্ত রইলাম।

খাবার পরে পিয়ানোর কাছে গেলাম। সের্গেইও এল পিছন পিছন। বলল, "একটা কিছু বাজান। অনেক দিন আপনার বাজনা শুনি নি।"

একটু ইতস্তত করে বললাম, "সের্গেই মিখাইলিচ⋯আমি⋯আপনি আমার উপর রাগ করেন নি তো?"

"রাগ করব কেন?"

"দুপুরে আপনার কথা শুনি নি বলে।"

সে হেসে মাথা নাড়াল। পিয়ানোতে বসতে বসতে বললাম, "যাক, তাহলে কিছু হয় নি, আবার আমাদের ভাব হয়েছে।"

"তাই তো মনে হচ্ছে," সে বলল।

পিয়ানোর উপর দুটো মোমবাতি জ্বলছে। বাকি ঘরটায় আবছা

আলো-আঁধার। খোলা জানালায় গ্রীষ্ম রাতের ইসারা। আর সব চুপ।

সের্গেই বসেছিল আমার পিছনে। তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু অন্তরের মধ্যে অনুভব করছিলাম তার উপস্থিতি। মোসার্টের "স্বপ্ন-সোনাটা"-টা সেই আমাকে এনে দিয়েছিল। সেটাই বাজালাম। মনে হল ভালই বাজিয়েছি; অনুভব করলাম সেও খুশি হয়েছে। তার দিকে ফিরে তাকালাম। জ্যোৎস্না রাতের পশ্চাৎপটে তার মাথাটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। চিবুকে হাত রেখে সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। হেসে বাজনা থামিয়ে দিলাম। সেও হেসে বাজনাটা চালিয়ে যেতে বলল।

বাজনা শেষ হল। চাঁদ অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। মোমবাতির ক্ষীণ আলো ছাড়াও একটা রূপোলি আভা এসে পড়েছে মেঝেতে।

বারান্দার খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সের্গেই আমাকে ডেকে বলল, "আজকের রাতটা কেমন একবার দেখে যান।"

কাছে গেলাম। সত্যি, এ রকম রাত পরে আর কখনও দেখি নি। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। ছাদ ও থামগুলোর ছায়া তেরছাভাবে পড়েছে বাগানের পথে ও ফুলের কেয়ারিতে। আলোর বান ডেকেছে সর্বত্র। শিশিরে ও চাঁদের আলোয় সব কিছু রূপোলি। কাঁকর-বিছানো পথটা চলে গেছে অনেক দূরে। যতদূর চোখ যায় চিকচিক করছে আলো।

বলে উঠলাম, "একটু বেড়িয়ে আসা যাক।"

কাতিয়া রাজী হয়ে জানাল, আমার রবারের জুতো পরে নেওয়া উচিত।

আমি বললাম, "লাগবে না। সের্গেই মিখাইলিচের হাত ধরে যাব।"

সে হাত ধরলে যেন আমার পা ভিজবে না। অথচ সেই মুহূর্তে কথাটা কারও কানেই অদ্ভুত ঠেকে নি।

বারান্দা থেকে সকলেই নেমে পড়লাম। মনে হল, সমস্ত পৃথিবী, আকাশ, বাগান, আর হাওয়া যেন একেবারেই নতুন, অচেনা।

কাতিয়া বলে উঠল, "ওমা! একটা কালো ব্যাং।"

সের্গেই শুধাল, "ভয় করছে না কি?"

তার দিকে তাকালাম। গাছপালার ফাঁকে মুখটা স্পষ্ট দেখা গেল। কী সুন্দর সে মুখ। কী সুখী সে।

সে বলল, "ভয় করছে নাকি?" কিন্তু আমি শুনলাম "তোমায় ভালবাসি।" তার স্পর্শ, তার চাউনি ঝংকার তুলল, "ভালবাসি, ভালবাসি!" সেই কথাটাই বুঝি উচ্চারণ করল আলো, ছায়া, আর বাতাস—সকলে।

পুরো বাগানটা চক্কর দিলাম। কাতিয়া হাঁপাতে লাগল। বেচারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বলল, "ফেরার সময় হয়েছে।"

কাতিয়ার জন্য দুঃখ হল। আমাদের মত অনুভূতি নেই কেন তার মনে? আজকের রাতে সবাই কেন আমাদের দু'জনের মত সুখী নয়—নবীন নয়?

বাড়ি ফিরলাম। সে অনেকক্ষণ রয়ে গেল। মোরগ ডাকছে, সবাই শুতে গেল ; কিন্তু সে গেল না।

গল্প-গুজবের মধ্যে বুঝতে পারি নি কখন তিনটে বাজল। তৃতীয়বার মোরগ ডাকল। ভোর হয়ে এসেছে। তখন সের্গেই চলে গেল। অতি সাধারণ বিদায়-সম্ভাষণ। তবু আমি জানলাম সেদিন থেকে সে আমার, তাকে কোনদিন হারাব না।

অনেকক্ষণ ধরে বারান্দায় পায়চারি করলাম। পরে বাগানে নেমে দু'জনের হাঁটা-পথে আবার হাঁটলাম। তার প্রতিটি কথা, প্রতিটি নড়াচড়া মনে পড়তে লাগল।

সারারাত ঘুম এল না চোখে। জীবনে সেই প্রথম অত ভোরে সূর্যোদয় দেখলাম। সেরকম রাত আর প্রভাত আর কখনও দেখি নি।

॥ চার ॥

তখন উস্পেন্স্কির পরব চলছে। তাই আমার উপোসের কথা জেনে কেউ অবাক হল না।

সারা সপ্তাহে সে একবারও এল না। কিন্তু তাতে অবাক হলাম না ; রাগও হল না। বরং খুশিই হলাম। আমার জন্মদিনে সে আসবে—সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় রইলাম।

প্রতিদিন খুব ভোরে উঠতাম। একলা ঘুরে বেড়াতাম বাগানে। আগের দিনের ভাল-মন্দের হিসাব কষতাম মনে মনে।

একদিন। সবে গির্জা থেকে ফিরে গাড়ি থেকে নেমেছি, এমন সময় পিছনে পুলের উপর থেকে একটা গাড়ির পরিচিত খট্-খট্ শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখলাম সের্গেই মিখাইলিচকে।

সে এসে আমাকে জন্মদিনের অভিনন্দন জানাল। দুজন একসঙ্গে বৈঠকখানায় ঢুকলাম।

পিয়ানোর কাছে গেলাম। সে কিন্তু পিয়ানোটা বন্ধ করে চাবিটা পকেটে রেখে বলল, "এটা বাজালে মেজাজ খারাপ্ হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে আপনার অন্তরের সঙ্গীত পৃথিবীর যে কোন সঙ্গীতের চাইতে ভাল।"

কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। খাবার খেতে খেতে সে জানাল, সে এসেছে আমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে আর বিদায় নিতে ; পরের দিনই সে মস্কো চলে যাবে।

খাবারের পরেই সে চলে যেতে চাইল। কিন্তু কাতিয়া ক্লান্ত হয়ে শুয়ে

পড়েছে। সে না ওঠা পর্যন্ত সের্গেইকে অপেক্ষা করতেই হবে বিদায় নেবার জন্য।

হলে বড় বেশী আলো বলে দু'জনে বারান্দায় গেলাম।

"কেন আপনি চলে যাচ্ছেন?" সোজাসুজি তার মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলাম।

একটু চুপ করে থেকে সে বলল, "কাজ আছে।"

বুঝলাম, আমার কাছে মিথ্যা বলাটা ওর কাছে কত শক্ত। বললাম, "আজকের দিনটা আমার কাছে কতখানি জানেন তো। আপনাকে আমি ভালবাসি। তাই প্রশ্নটা করছি, কারণ উত্তরটা আমাকে জানতেই হবে। কেন আপনি চলে যাচ্ছেন?"

সে জবাব দিল, "যাবার সত্যি কারণটা আপনাকে বলা আমার পক্ষে শক্ত। গোটা সপ্তাহ আপনাকে ও আমাকে নিয়ে অনেক ভেবেছি। আর স্থির করেছি, আমাকে যেতেই হবে। কেন জানেন? আমাকে যদি ভালবেসে থাকেন তো আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। আমার পক্ষে কাজটা কঠিন ··· আর আপনি তা বোঝেন।"

বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

বললাম, "না, বুঝি না। তাই বলছি, আপনি বলুন। ঈশ্বরের দোহাই, আপনি বলুন। আজকের দিনটার খাতিরে বলুন। সব বলুন। আমি শান্ত-ভাবে শুনব।"

"বেশ।" বলে সে বলতে শুরু করল। "কথাটা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তাছাড়া, আমার পক্ষে কষ্টকরও বটে। তবু বোঝাবার চেষ্টা করব।"

"বলুন।"

"ধরুন, একটি লোক আছে, তার নাম "ক"। লোকটার অনেক বয়স। আর আছে একটি মেয়ে, তার নাম "খ"। মেয়েটির বয়স কম, বেশ হাসি-খুশি, সংসারের কিছুই জানে না। ঘটনাচক্রে লোকটি তাকে মেয়ের মত ভালবাসত। তাকে অন্যভাবে ভালবাসবে এ-আশংকাই কখনও করে নি।"

সের্গেই থামল। আমিও চুপ করে রইলাম।

"কিন্তু "ক" ভুলে গিয়েছিল "খ"র বয়স অল্প—জীবনটা তখনও তার কাছে খেলার জিনিস। ভুলে গিয়েছিল ওকে অন্যভাবে ভালবাসাটা সহজ, কিন্তু ওর কাছে সেটা খেলার সামিল। কিন্তু "ক' ভুল করল, হঠাৎ বুঝতে পারল সেই অন্য ধরনের অনুভূতি এসেছে মনে। সে ভয় পেল। মনে হল, দু'জনের আগেকার বন্ধুত্বটা হয় তো নষ্ট হয়ে যাবে। তাই স্থির করল সেটা ঘটার আগেই সে চলে যাবে।"

চোখটা রগড়ে সে আবার চুপ করল।

আমি বললাম, "অন্যভাবে ভালবাসতে ভয় পেল কেন ?"

সে বলল, "আপনার বয়স কম, আমার বয়স বেশী। আপনি খেলতে চান, আমি চাই অন্য কিছু। আপনি খেলা করুন, কিন্তু আমার সঙ্গে নয়, কারণ আমার মনে হতে পারে যে খেলাটা সত্যিকারের। তাতে আমি ব্যথা পাব, আর আপনিও লজ্জা পাবেন। ··· কেন চলে যাচ্ছি বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়। দোহাই আপনার, এ নিয়ে আর কোন কথা নয়।"

"না, না! আরও কিছু বলা দরকার," আমি কান্না-ভেজা গলায় বলে উঠলাম। "সে ওকে ভালবাসত, না বাসত না ?"

সে কোন জবাব দিল না।

"ভাল না বাসলে কেন সে মিছিমিছি মেয়েটির সঙ্গে খেলা করেছিল ?"

"হ্যাঁ, "ক' দোষ করেছিল। কিন্তু এবার তো সব খেলা শেষ হল, তাদের ছাড়াছাড়ি হল—বন্ধুভাবে।"

"কি ভয়ংকর! এর কোন শেষ নেই বুঝি ?" এত নীচু গলায় কথাটা বললাম যে নিজেই কেমন যেন ভয় পেলাম।

আমার দিকে সোজা তাকিয়ে সে বলল, "অন্য রকম শেষ অবশ্যই আছে। দু'রকমের। কিন্তু বাধা দেবেন না, শান্ত হয়ে শুনুন। কেউ কেউ বলে "ক"-র মাথা খারাপ হল, পাগলের মত "খ"-র প্রেমে পড়ল, সেটা তাকে জানাল ···· আর "খ" শুধু হেসে উঠল। ব্যাপারটা ওর কাছে মজার, কিন্তু "ক"-র কাছে যে এটা জীবন-মরণের সমস্যা।"

চমকে উঠে বাধা দিতে যাচ্ছিলাম। সের্গেই আমার হাতে হাত রেখে বাধা দিল। ওর গলা কাঁপছে। বলল, "দাঁড়ান! আবার কেউ কেউ বলে মেয়েটির দয়া হল "ক"-র উপর। সংসারকে চেনে না তো; তাই রাজী হল তাকে বিয়ে করতে। আর লোকটাও পাগল বলেই বিশ্বাস করল যে তার জীবন আবার নতুন করে শুরু হবে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মেয়েটি বুঝতে পারল যে সে লোকটিকে ঠকিয়েছে, আর সেও ঠকিয়েছে তাকে। ···· যাক, এ নিয়ে আর কথা বলব না।"

সের্গেই কথা শেষ করল। বুঝলাম, আর বলার ক্ষমতা নেই তার। নিঃশব্দে কেবল পায়চারি করতে লাগল।

কিছু একটা বলতে চাইলাম, কিন্তু কথা বলতে কষ্ট হল। তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, নীচের ঠোঁটটা কাঁপছে। দুঃখ হল তার জন্য। তাই মুখ খুললাম।

"আর তৃতীয় সমাপ্তিটা ··· থেমে গেলাম। সেও নির্বাক। "তৃতীয় সমাপ্তিটা হল লোকটি ভালবাসত না মেয়েটিকে ··· গভীর দুঃখ দিল তার মনে। ব্যাপারটা আপনার কাছে মজার, আমার কাছে নয়। প্রথম থেকেই ভালবেসেছি আপনাকে, সত্যি ভালবেসেছি।"

বলতে বলতে আমার মৃদুকণ্ঠ চীৎকার করে উঠল। এত তীব্র চীৎকার যে নিজেই ভয় পেলাম।

বিবর্ণ মুখে সে দাঁড়িয়ে রইল আমার সামনে। ঠোঁট দুটি আরও কাঁপছে; দু'ফোঁটা চোখের জল গালের উপর গড়িয়ে পড়ল।

ক্রোধে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করে বললাম, "অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছেন। কেন করলেন?" যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

সে বাধা দিল। আমার কোলে মাথা রেখে দুই হাতে চুমু খেতে লাগল। তার চোখের জলে আমার হাত ভিজে গেল।

"হা ভগবান! যদি আগে জানতাম," সে অস্ফুট গলায় বলল।

"কেন করলেন?" জোর গলায় আবার বললাম বটে, কিন্তু আমার বুকটা তখন সুখের সাগর।

মিনিট পাঁচেক পরে সোনিয়া দোতলায় ছুটে গেল কাতিয়ার কাছে, সমস্ত বাড়িকে জানিয়ে দিল যে মাশা বিয়ে করতে চায় সের্গেই মিখাইলিচকে।

॥ পাঁচ ॥

আমাদের বিয়েটা পিছিয়ে দেবার কোন কারণ ছিল না। সের্গেই বা আমি কেউ তা চাই না। কাতিয়ার অবশ্য সাধ, মস্কোতে গিয়ে আমার জন্য গয়নাগাটি আর নববধূর পোশাকের ব্যবস্থা করা। আর সের্গেইর মায়ের সাধ, বিয়ের আগে সে নতুন একটা গাড়ি আর আসবাবপত্র কিনুক, ঘরের দেয়ালে নতুন কাগজ লাগানো হোক। কিন্তু আমরা দুজনই জেদ ধরে বসলাম, দরকার মনে করলে ও সব পরে করা যাবে; আমার জন্মদিনের দু'সপ্তাহ পরেই বিয়েটা হয়ে যাক। বিয়েতে হৈ-চৈ করার দরকার নেই; দরকার নেই গয়নাগাটি আর নতুন পোশাকের, ভোজ বা শ্যাম্পেনের, কিম্বা গতানুগতিক অন্য সব অনুষ্ঠানের।

সেই দুটো সপ্তাহ রোজই আমাদের দেখা হত। সে আসত দুপুরে, থাকত মাঝরাত পর্যন্ত। মুখে বলত, আমাকে ছাড়া তার পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব, কিন্তু কার্যত কখনও আমার সঙ্গে সারা দিন কাটাত না, আগের মতই নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকত। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত কোন পরিবর্তন হল না আমাদের। পরস্পরকে সম্বোধন করতাম "আপনি" বলে, কখনও সে আমার হাত চুম্বন করত না, আমার সঙ্গে নিরিবিলিতে থাকার সুযোগ খোঁজা দূরের কথা, সব সময় সে সুযোগ এড়িয়ে চলার চেষ্টাই সে করত।

আবহাওয়া খারাপ থাকায় আমাদের বেশীর ভাগ সময় কাটত ঘরের মধ্যে—ড্রয়িং-রুমের জানালায় বসে।

একদিন সন্ধ্যার শেষে সেমেঁই বলল, "অনেকদিন ধরে আপনাকে একটা কথা বলব ভাবছি।"

"থাক, কিছু বলার দরকার নেই; আমি সব জানি।"

সে হেসে বলল, "তা বটে। তাহলে বলব না।"

"না বলুন। কথাটা কি?"

"বেশ, তাহলে বলি। "ক" আর "খ"-র কথা বলেছিলাম একদিন মনে আছে?"

"ও রকম ডাহা বোকামির কথা কি করে ভুলব বলুন?"

"আপনিই তখন বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। তবে — তখন কিন্তু সত্যি কথা বলি নি। শেষ পর্যন্ত বলছি, শুনুন।"

"থাক, থাক, দরকার নেই।"

সে হেসে বলল, "ভয়ের কিছু নেই। শুধু কথাটা খুলে বলতে চাই।"

আমি আর কিছু বললাম না, শুধু তার চোখে চোখ রাখলাম। হঠাৎ বিচিত্র একটা অনুভূতি জাগল মনে—প্রথমে চারদিকের সব জিনিস দৃষ্টিপথ থেকে সরে গেল, তারপর মিলিয়ে গেল তার মুখ; শুধু দেখতে পেলাম তার দুটি দীপ্ত চোখ; সেই দুটি চোখ যেন আমার ভিতরে প্রবেশ করল, আর অমনি সব কিছু কালো হয়ে গেল। আর কিছুই চোখে পড়ল না। তার চাউনিতে যে আনন্দ, যে ভয় জাগল মনে সেটা কাটাতে শক্ত করে চোখ বুজলাম।

বিয়ের আগের দিন আকাশ পরিষ্কার হল। এল হেমন্তের হিমেল সন্ধ্যা। বিয়ের দিনে আবহাওয়া সুন্দর থাকবে এই ভেবে খুশি মনে শুতে গেলাম।

ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। আজই বিয়ে ভেবে অবাক লাগল, ভয় হল।

বাগানে গেলাম। সূর্য উঠেছে। ছড়িয়ে পড়েছে আলো পাতার ফাঁকে ফাঁকে। আকাশ মেঘমুক্ত।

নিজের সুখকে যেন বিশ্বাস হল না; নিজেকেই শুধালাম, "তাহলে সত্যি আজই বিয়ে? তাহলে কাল আর আমার ঘুম এ বাড়িতে ভাঙবে না, ভাঙবে নিকলস্কয়ের ওই থামওয়ালা বাড়িটাতে। আর কখনও তার অপেক্ষায় থাকব না, তার সঙ্গে দেখা করতে যাব না, রাতে তাকে নিয়ে কাতিয়ার সঙ্গে গল্প করব না। ....আর কখনও সোনিয়াকে পড়াতে বসব না, তার সঙ্গে খেলা করব না, সকালে দেয়ালে টোকা দিয়ে শুনব না তার খিলখিল হাসি। সত্যি কি নিজের কাছেই অচেনা হয়ে যাব? শুরু হবে নতুন জীবন? সফল হবে আমার সব আশা আর স্বপ্ন?

অস্থির প্রতীক্ষা—কখন সের্গেই মিখাইলিচ আসবে? একলা থাকা কী দুঃসহ। তার আসতে দেরী হল না, আর তখনই পুরো বিশ্বাস হল যে আজ থেকে আমি তার স্ত্রী হব। মন থেকে কেটে গেল সব ভয়-ভাবনা।

মধ্যাহ্ন ভোজের আগে বাবার উদ্দেশে প্রার্থনা জানাতে আমরা গির্জায় গেলাম।

"আজ যদি বাবা বেঁচে থাকতেন!" আমার মন বলল। সের্গেই ছিল বাবার ঘনিষ্ট বন্ধু।

ফিরবার পথে সের্গেই বলল, "আপনার বাবা একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলেন—'আমার মাশাকে তুমি বিয়ে করো।'

তার হাতে চাপ দিয়ে বললাম, "বেঁচে থাকলে আজ বাবা কত না খুশি হতেন!"

আমার চোখে চোখ রেখে সের্গেই বলল, "তখন আপনি কত ছেলে-মানুষ ছিলেন। আমি আপনাকে মাশা বলে ডাকতাম।"

"তাই বলেই ডাকতে যাচ্ছিলাম; তুমি যে একান্তভাবেই আমার।"

বড় ইচ্ছা হল তাকে "তুমি" বলে ডাকি, কিন্তু লজ্জায় তা বলতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি শুধু বললাম, "এত তাড়াতাড়ি হাঁটছ কেন?"

আমার মুখটা লাল হয়ে উঠল। সেও তাকাল আমার দিকে। মুখে আরও সুখের ছাপ লেগেছে।

বাড়ি ফিরে দেখলাম সের্গেই মিখাইলিচের মা ও কিছু নিমন্ত্রিত অতিথি আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে। তাই গির্জা ছেড়ে নিকলস্কয়েতে যাবার জন্য গাড়িতে না ওঠা পর্যন্ত তাকে আর একলা পেলাম না।

গাড়িতে বসে বারবার তার দিকে তাকালাম। সে দৃষ্টিতে সাড়া দিয়ে সের্গেই বলল, "এটা যে সম্ভব হবে এক মুহূর্ত আগেও তা ভাবতে পারি নি।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ; কিন্তু আমার ভয় করছে।"

আমার হাতটা টেনে নিয়ে সে বলল, "আমাকে ভয় করছে নাকি সোনা?"

মৃদুস্বরে বললাম, "হ্যাঁ।"

সঙ্গে সঙ্গে হৃদ্‌স্পন্দন বেড়ে গেল; হাতটা কেঁপে উঠল; তার হাতটা চেপে ধরলাম। আবছা আলোয় তার দিকে তাকালাম। তখনই বুঝলাম তাকে ভয় পাই নি—এই ভয়টাই ভালবাসা। এ ভালবাসা নতুন, আগেকার চাইতে নরম আর প্রবল। মনে হল আমার সবকিছুই তার। আমার উপর তার এই প্রভুত্বের বোধ আমাকে আরও সুখী করে তুলল।

দ্বিতীয় পর্ব

॥ ছয় ॥

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল। শান্তিতে কেটে গেল দুটো মাস। সে দুটো মাসের অনুরাগ, আর আনন্দ সারা জীবনের পক্ষে যথেষ্ট।

একদিন প্রার্থনা করছি এমন সময় সের্গেই ঘরে ঢুকল। একবার তার দিকে তাকিয়ে প্রার্থনায় মেতে গেলাম। টেবিলে বসে সে একটা বই খুলল। বুঝলাম সে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। আমিও তাকালাম। সে অল্প হাসল, আমি আরও জোরে হেসে উঠলাম।

বললাম, "তোমার প্রার্থনা শেষ হয়েছে?"

"হ্যাঁ। তোমাকে বোধ হয় বাধা দিলাম। আমি চলি।"

"প্রার্থনা করবে না কি?"

সে উত্তর দিল না। হয় তো বেরিয়েই যেত, আমি বাধা দিলাম।

"দাঁড়াও লক্ষ্মীটি, আমার খাতিরে একসঙ্গে প্রার্থনা কর।"

সে আমার পাশে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা শুরু করে দিল। শেষ হলে হেসে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। সে লাল হয়ে গেল। আমার হাতে চুমো খেয়ে বলল, "না; তুমি আর বদলাবে না দেখছি। তোমাকে দেখলে নিজের বয়সটাই দশ বছর কমে যায়।"

আমাদের গাঁয়ের বাড়িটা পুরনো। সেখানে তাদের কয়েক পুরুষের বাস। সবকিছুতেই পারিবারিক স্মৃতি জড়ানো। বাড়িটা সাজিয়েছিলেন তাতিয়ানা সেমিওনভ্না। তিনি সংসার চালাতেন সেকেলে রীতিতে। চাকরবাকর, আসবাবপত্র, খাবারদাবার—সবকিছুরই ছড়াছড়ি। আর সব কিছুই টেকসই, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সঠিক। দেখলেই সম্ভ্রম জাগে মনে।

কখনও চড়া গলায় কথা বলতেন না তাতিয়ানা সেমিওনভ্না, তবু সব কিছু চলত শৃংখলার সঙ্গে—ঘড়ির কাঁটার মত।

ভোজনপর্বের পরে মা বসতেন একটা বড় চেয়ারে। তামাক পিষে নস্যি বানাতেন, অথবা নতুন কোন বইয়ের পাতা কাটতেন। আর আমরা হয় তাকে কিছু পড়ে শোনাতাম, নয় তো হল-ঘরে চলে যেতাম পিয়ানো বাজাতে। সে সময় দু'জন একসঙ্গে পড়তাম অনেক, তবে সঙ্গীত-চর্চা করতাম আরও বেশী। দুজনেরই মন ঝংকৃত হয়ে উঠত; মনে হত আমরা পরস্পরকে আরও ভাল করে চিনছি।

এইভাবে দু'মাস কেটে গেল। শীতকাল এল ঠাণ্ডা আর তুষার-ঝড় নিয়ে। স্বামী কাছে থাকা সত্ত্বেও নিজেকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ লাগত। কেবলই মনে হত জীবনে কোন বৈচিত্র্য নেই, নতুন কিছু নেই, দুজনই যেন পাক খাচ্ছি একই পুরনো বৃত্তে। স্বামীর সদা ধীরস্থির ভাব একটা জ্বালা ধরিয়ে দিল আমার মনে। তাকে আগের মতই ভালবাসি, তার ভালবাসায় আমার সুখও আগের মতই, কিন্তু সে ভালবাসা যেন থমকে দাঁড়িয়েছে, আর বাড়ছে না মোটেই। প্রেম ছাড়াও একটা অস্থিরতা আমাকে পেয়ে বসল। ভালবাসায় আরও বেশী গতি চাই। চাই বিপদ আর উত্তেজনা। নিজের প্রেমের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে চাই। তাই তো মাঝে মাঝে আমার অসংযত ভালবাসা ও আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখে আমার স্বামী ঘাবড়ে যেত।

মনের এই অবস্থার ফলে স্বাস্থ্য খারাপ হতে লাগল। স্নায়বিক অস্থিরতা দেখা দিল। একদিন সকালে অন্য দিনের চাইতেও খারাপ লাগছিল। সের্গেইও আপিস থেকে ফিরল খারাপ মেজাজ নিয়ে। কি হয়েছে জানতে চাইলাম, কিন্তু সে কিছুই জানাল না। কেবল বলল, বলার মত কিছু নয়। পরে জানলাম, জেলার পুলিশ-অফিসার আমাদের কয়েকটি চাষীকে তলব করে শাসিয়েছে। তাই তার মন-মেজাজ ভাল নেই। শুনেই আমার খুব রাগ হল। মনে হল, সে আমাকে নেহাৎই খুকি মনে করে, ভাবে তার কথা বুঝবার ক্ষমতা আমার নেই, তাই কিছু বলে নি।

তার কাছে গেলাম। সে তখন পড়ার ঘরে বসে লিখছিল। আমার পায়ের শব্দ শুনে একবার তাকিয়েই আবার লেখায় মন দিল। আমার আরও খারাপ লাগল। তাই কাছে না গিয়ে ডেস্কের পাশেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

সে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে তোমার? মেজাজ ঠিক নেই বুঝি?"

বললাম, "কি হয়েছিল আজ?"

সে জবাব দিল, "তেমন কিছু নয়। সামান্য অপ্রীতিকর একটা ব্যাপার। আমাদের দুটি চাষী শহরে গিয়েছিল—"

বাধা দিয়ে বললাম, "তখন বললে না কেন এ কথা?"

"হয় তো আজেবাজে কিছু বলে ফেলতাম তাই। তখন মেজাজটা ভাল ছিল না।"

"কিন্তু আমার তখনই জানা দরকার ছিল।"

"কেন?"

"তোমার কোন কাজে আমি লাগতে পারি না, এটা ভাব কেন?"

কলমটা রেখে সে বলল, "তাই ভাবি বুঝি? মোটেই না। আমি ভাবি যে তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না। শুধু সাহায্য নয়, আমি চাই আমার সব কিছু তুমি করে দাও। কী বোকা!" সে হেসে উঠল। তুমি যে আমার সর্বস্ব। সব কিছু আমার ভাল লাগে কারণ তুমি এখানে আছ,

তোমাকে আমার দরকার।"

"জানি। আদরের খুকি তো আমি, তাই আমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত রাখা দরকার। তাই না? কিন্তু শান্ত হতে আমি চাই না।"

অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "আহা, শোনই না ব্যাপারটা কি হয়েছিল—"

বাধা দিয়ে বললাম, "এখন আর শুনতে চাই না। আমি চাই তোমার সমান হয়ে থাকতে, তোমার সমান হয়ে—"

গভীর বিষণ্ণতা ফুটে উঠল তার মুখে। তা দেখে আমি থমকে গেলাম।

একটু চুপ করে থেকে সে প্রশ্ন করল, "কিসে তুমি আমার সমান নও বল? পুলিশ আর মাতাল চাষীদের নিয়ে আমাকে কাজ চালাতে হয়, তোমাকে নয়—সেইজন্য কি?"

"না, শুধু তা নয়।"

সে বলতে লাগল, "দোহাই তোমার, আমাকে বোঝার চেষ্টা কর মাশা। উৎকণ্ঠা সব সময়ই কষ্টকর। তোমাকে আমি ভালবাসি, তাই তোমাকে উৎকণ্ঠা থেকে দূরে রাখতে চাই। তোমার ভালবাসা আমার জীবনের সর্বস্ব। তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।"

অন্যদিকে তাকিয়ে বললাম, "তোমার ভুল তো কখনও হয় না।"

"মাশা, কি হয়েছে তোমার? কে ঠিক কে বেঠিক সেটা তো কথা নয়। কথাটা অন্য। আমার উপর তুমি রাগ করেছ। কিন্তু কেন? সব ভেবে-চিন্তে আমাকে খুলে বল। তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছ। হয় তো তার সঙ্গত কারণও আছে, কিন্তু কোথায় আমার দোষ সেটা আমাকে জানতে দাও।"

আমি বললাম, "তোমার উপর চটি নি আমি। আমার বড় একঘেয়ে লাগছে, আর সেটা আমি চাই না।"

তার দিকে তাকালাম। মুখে ফুটে উঠেছে ব্যথা আর উৎকণ্ঠা। উত্তেজিত গলায় সে বলে উঠল, "মাশা, এখন আমরা যা করছি সেটা ঠাট্টার বস্তু নয়। তার উপর নির্ভর করছে আমাদের ভাগ্য। দয়া করে তর্ক করো না, যা বলছি শোন।"

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, "তুমি যা বলবে সেটাই তো ঠিক—সবসময়ই ঠিক।" জবাবটা আমার কানেই রূঢ় শোনাল।

কাঁপা গলায় সে বলল, "তুমি কি বলছ তা যদি বুঝতে।"

হঠাৎ কেঁদে ফেললাম। বেশ হাল্কা বোধ করলাম। সে চুপচাপ বসে রইল আমার পাশে। মুখ তুলে তার দিকে তাকালাম। তার কোমল দৃষ্টি যেন আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। তার একটা হাত ধরে বললাম, "কিছু মনে করো না। কি যে বলেছি তা নিজেই বুঝতে পারি নি।"

"আমি কিন্তু বুঝেছি।"

"কি?"

"আমাদের সেণ্ট পিতার্সবুর্গ যাওয়া দরকার। এখানে করবার কিছু নেই।"

"তোমার যা ইচ্ছা তাই হবে", আমি বললাম।

আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে সে বলল, "আমাকে ক্ষমা কর। তোমার কাছে আমার অপরাধ হয়েছে।"

সেদিন সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ তাকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনালাম। ঘরময় পায়চারি করতে করতে সে অভ্যাসমত ফিসফিস করে কি যেন বলতে লাগল।

শুধালাম, "ফিসফিস করে কি বলছ?"

সে মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে লারমন্তভ-এর দু'পংক্তি কবিতা সে আবৃত্তি করল:

> "সে বিদ্রোহী, চায় ঝড়ের হাওয়া,
> যেন ঝড়ের পাশেই শান্তি!"

মনে মনে বললাম, "সে তো মানুষ নয়, মানুষের চেয়ে বড়, সব জানে। তাকে না ভালবেসে কি থাকা যায়?" তার হাত ধরে পায়ের সঙ্গে পা ফেলে পায়চারি শুরু করলাম। দুজনেরই ফূর্তি বেড়ে গেল। চোখ উঠল উজ্জ্বল হয়ে। লম্বা পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে দুজন খাবার ঘরে ঢুকলাম। মা "পেসেন্স" খেলছিলেন। আমাদের ওভাবে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আমরা হো-হো করে হেসে উঠলাম।

দু'সপ্তাহ পরে, ছুটির ঠিক আগে, আমরা পৌঁছে গেলাম সেণ্ট পিতার্সবুর্গে।

॥ সাত ॥

সেণ্ট পিতার্সবুর্গে যাবার পথে এক সপ্তাহ মস্কোতে কাটিয়েছি। নতুন রাস্তা ঘাট, নতুন নতুন শহর, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, নতুন বাড়িতে গৃহস্থালি পেতে বসা—সব কিছুই যেন স্বপ্নের ভিতর দিয়ে কেটে গেল। সব কিছুই এত বৈচিত্র্য আর আনন্দে ভরা, সের্গেই'র ভালবাসা এতই উষ্ণ ও উজ্জ্বল যে গ্রামের শান্ত জীবনযাত্রাকে তার তুলনায় বড়ই সাধারণ ও তুচ্ছ মনে হতে লাগল।

গ্রাম ছাড়ার আগে সে আমাকে বলেছিল, "সেখানে কি ভাবে চলবে সেটা বলে দিচ্ছি। এখানে আমরা ছোটখাট বাদশা-বেগম, কিন্তু শহরে আমাদের ধনী বলাই চলবে না। সেখানে আমরা ইস্টার পর্যন্তই থাকতে পারব। আর উঁচু সমাজে বেশী ঘোরাফেরাও চলবে না, কারণ তাতে ধার হয়ে যাবে।"

আমি বলেছিলাম, "উঁচু সমাজে ঘুরব কেন? আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করব, থিয়েটার দেখব, আর ভাল গান-বাজনা শুনব। তারপর ইস্টারের আগেই গ্রামে ফিরে আসব।

কিন্তু পিতার্সবুর্গে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সে সংকল্প মিলিয়ে গেল। হঠাৎ গিয়ে পড়লাম একটা নতুন জগতে, ভেসে গেলাম আনন্দের বন্যায়, নতুন নতুন বাসনা জাগল মনে।

সেখানে কিছুদিন থাকার পরে মাকে একটা চিঠি লিখে সের্গেই আমাকে বলল তাতে কিছু লিখে দিতে। বারণ সত্ত্বেও তার লেখা অংশটা পড়ে ফেললাম। সে লিখেছিল: "মাশাকে আপনি ঠিক চিনতে পারেন নি। আমিও না। এত সুন্দর আত্মবিশ্বাস, এরকম লাবণ্য, এমন রসবোধ ও সামাজিকতা ও কোথায় পেল! ওকে নিয়ে সকলেই মুগ্ধ। আমিও। ওকে যদি আরও বেশী ভালবাসা সম্ভব হত তাহলে তাই বাসতাম।"

এত ভাল লাগল, এত আনন্দ হল যে কী বলব! মনে হল তার উপর আমার ভালবাসাটাই বেড়ে গেছে। সকলের মুখেই আমার প্রশংসা আর প্রশংসা। স্বামীর খুড়তুতো বোন প্রবীণা প্রিন্সেস "দ" তো আমার প্রেমেই পড়ে গেলেন। একটা বল-নাচে আমাকে নিমন্ত্রণ করে তিনি আমার স্বামীর কাছে জানতে চাইলেন তার কোনরকম আপত্তি আছে কিনা। সের্গেই হেসে আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল আমি যেতে চাই কিনা। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। সে হেসে বলল, "কথাটা মুখে বললে কি মহাপাপ হত?"

হেসে বললাম, "তুমিই তো বলেছিলে উঁচু সমাজে যাওয়া আমাদের চলবে না।"

"তোমার যখন যাবার এত ইচ্ছা তখন অবশ্যই যাব। কি জান, উঁচু সমাজটা আসলে খারাপ নয়, কিন্তু সেখানকার অতৃপ্ত বাসনাগুলি বড়ই খারাপ, কুৎসিত। আমরা যাব, নিশ্চয় যাব।"

আমার মনোবাসনা পূর্ণ হল। সেখানে গেলাম। প্রত্যাশার অতিরিক্ত আনন্দ পেলাম। মনে হল, আলোয় আলো-করা প্রকাণ্ড হল-ঘর, গান-বাজনা, লোকজনের সমাবেশ—এসবই আমার জন্য, আমাকে কেন্দ্র করেই এত আয়োজন। উপস্থিত সকলেই যেন বুঝিয়ে দিতে চাইল—তারা আমাকে ভালবাসে। সবকিছু এত ভাল লেগে গেল যে স্বামীকে খোলাখুলিই বললাম যে আরও দু'তিনটে বল-নাচে যেতে চাই আমি। সেও সাগ্রহে রাজী হয়ে গেল। প্রথম প্রথম বেশ খুশি হয়েই সে আমার সঙ্গে যেত। কিন্তু ক্রমেই এসব তার একঘেয়ে লাগতে লাগল। আমাদের জীবনযাত্রায় সে ক্লান্ত হয়ে উঠল।

একদিন রাতে বল-নাচ থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাকে বললাম, "তুমি

তো ন-ন-র সঙ্গে বেশ চালিয়েছিলে আজ।" মহিলাটি সেণ্ট পিতার্সবুর্গে সকলেরই খুব চেনা, আর আমার স্বামী সেদিন সত্যি তার সঙ্গে কথা বলেছিল।

আমার প্রশ্ন শুনে তার দুই ভুরু কুঁচকে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল, "কী যাতা বলছ তুমি? এসব কথা তোমার মুখে মানায় না মাশা।"

লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেলাম। স্বামী বলল, "এবার আমাদের গ্রামে ফেরার সময় হয়েছে।"

কোথা দিয়ে শীতকালটা কেটে গেল। আগেকার পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। ইস্টারও কাটল সেণ্ট পিতার্সবুর্গেই। সেণ্ট টিমোথি সপ্তাহের গোড়ায় আমরা গ্রামে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। অনেক কেনাকাটা হল। নানা উপহার ও ফুল কেনা হল।

হঠাৎ স্বামীর খুড়তুতো বোন এসে অনুনয়-বিনয় শুরু করে দিল, আমরা যেন শনিবার পর্যন্ত যাত্রা স্থগিত রাখি। কাউণ্টেস "র"-র বাড়িতে একটা বড় পার্টি আছে। তার একান্ত ইচ্ছা আমি তাতে উপস্থিত থাকি। প্রিন্স "ম"-ও সেখানে আমার সঙ্গে আলাপ করতে খুব ইচ্ছুক।

আমি বললাম, "পরশু দিন আমাদের গ্রামে ফিরে যাবার কথা। আমরা তো গোছগাছ করে বসে আছি।"

আমার স্বামী একটু দূরে অন্য কার সঙ্গে কথা বলছিল। কিন্তু তার কানটা ছিল আমাদের দিকে। সেখান থেকেই সে বলে উঠল, "ও বরং আজ রাতেই গিয়ে প্রিন্সকে একবার সেলাম জানিয়ে আসুক। তাহলেই তো ঝামেলা মিটে যায়।" তার গলায় চাপা বিরক্তির সুর।

হেসে উঠে খুড়তুতো বোন স্বগত উক্তির মত বলল, "হা ভগবান। হিংসে হয়েছে দেখছি। আগে তো এরকমটা দেখি নি।" তারপর সের্গেইকে বলল, "শুধু প্রিন্সের জন্য নয়, আমাদের সকলের জন্যই ওকে থেকে যেতে বলছি সের্গেই মিখাইলিচ। কাউণ্টেস "র" ওকে বিশেষ করে আমন্ত্রণ করেছেন।"

"সেটা ওর মর্জি!" কঠিন গলায় কথাটা বলে সের্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এর পরে আর খুড়তুতো বোনকে কোন কথা দেওয়া চলে না। সে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমি স্বামীর কাছে গেলাম। চিন্তিত মুখে সে পায়চারি করছে। আমার পায়ের শব্দ তার কানে গেল না।

হঠাৎ মুখ তুলে সে আমাকে দেখতে পেল। ভুরু কুঁচকে গেল। একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল, "শনিবার পার্টিতে যেতে চাও তো?"

বললাম, "চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমার তো ওসব ভাল লাগে না। তাছাড়া, এদিকে গোছগাছও হয়ে গেছে।"

"মঙ্গলবার পর্যন্ত থেকে যাব। ওদের বলব জিনিসপত্র খুলে ফেলতে। ইচ্ছা হলে তুমি যেতে পার। আমি যাব না।"

তার চোখে এমন কঠোর দৃষ্টি আগে কখনও দেখি নি। এত কঠিন গলায় আগে কখনও কথা বলে নি আমার সঙ্গে।

সের্গেই উত্তেজিতভাবে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। এটা তার বরাবরের স্বভাব।

শান্তভাবে বললাম, "মুখে তো বল তুমি কখনও উত্তেজিত হও না; তাহলে এমন ভাবে কথা বলছ কেন আমার সঙ্গে? আগে তো এমন বিদ্রূপের স্বরে কখনও কথা বলো নি আমার সঙ্গে।"

একই সুরে সে আবার বলল, "তাই বুঝি? তুমি তো আত্মত্যাগ করছ। আমিও তাই করছি। আত্মত্যাগের দরাজ প্রতিযোগিতা! আহা! কী সুখের সংসার আমাদের!"

তার মুখে এ রকম তিক্ত বিদ্রূপ এই প্রথম শুনলাম। কিন্তু তাতে আমার লজ্জা হল না; ভয়ও পেলাম না; শুধু সেই তিক্ততাই সঞ্চারিত হল আমার মধ্যে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, "কত বদলে গিয়েছ তুমি। কী অপরাধ করেছি আমি? পার্টিটা আসল কথা হতে পারে না। নিশ্চয় আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিযোগ আছে। সব খুলে বল আমাকে।"

ঘরের কোণে দাঁড়িয়েই সে আমাকে প্রশ্ন করল, "তুমি কি বোঝ নি?"

"না।"

"তাহলে খুলেই বলি। জীবনে এই প্রথম আমার মনে একটা ঘৃণাকর অনুভূতি জেগেছে।"

"তার মানে?"

"প্রিন্স তোমাকে খাসা সুন্দরী মনে করেন সেটা ঘৃণাকর। আর স্বামীর কথা, নিজের কথা, নারীত্বের মর্যাদার কথা—সব ভুলে তুমি তার কাছে যেতে চাইছ সেটাও ঘৃণাকর। আত্মমর্যাদাহীন স্ত্রীকে নিয়ে স্বামীর মনের অবস্থাটা তুমি বোঝ না—সেটা আরও ঘৃণাকর।"

যত কথা বলছে ততই তার কণ্ঠস্বর চড়ছে, ততই বাড়ছে তার ক্রোধ। সে কণ্ঠস্বর কর্কশ, নিষ্ঠুর, বিষাক্ত। আমার মুখ লাল হয়ে উঠল।

বললাম, "এ রকম যে হবে আমি আগেই জানতাম। বল, বলে যাও।"

সে বলতে লাগল, "তুমি কি জানতে আমি জানি না। এই সমাজের নোংরামি আর বিলাসিতার মধ্যে দিনের পর দিন একটা খারাপ কিছু যে ঘটবে এটা আমার আগেই ধরে নেওয়া উচিত ছিল। আজ সেটা ঘটেছে। কিন্তু আগে কখনও আজকের মত আঘাত ও অপমান বোধ করি নি, তাই এতদিন বাধা দেই নি।"

কথা শুনে আমারও রাগ হয়ে গেল। বললাম, "শনিবারের পার্টিতে যাব—

নিশ্চয় যাব।"

সের্গেই অসংযত আবেগে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "তাই যেয়ো। প্রাণ খুলে ভোগ করো। কিন্তু তোমার আমার মধ্যে এই শেষ। তুমি আমাকে আর কষ্ট দিতে পারবে না। একদিন বোকার মত চলেছি—"

তার কথা শেষ হল না। ঠোঁট কাঁপতে লাগল। অনেক কষ্টে সামলে নিল।

সেই মুহূর্তে তাকে ভয় পেলাম। ঘৃণা করলাম। কোন কথা বলতে পারলাম না। মনে হল, কথা বলতে গেলেই কেঁদে ফেলব। নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেলাম। একলা অনেকক্ষণ কাঁদলাম।

সন্ধ্যায় যখন চা খেতে গেলাম তখন আমার স্বামী ও স-র সঙ্গে দেখা হল। স. এসেছিল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। মনে হল, আমাদের দুজনের মাঝখানে নেমে এসেছে দুস্তর ব্যবধান। স.-ই প্রথম আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কবে যাচ্ছি।

আমি কথা বলার আগেই স্বামী বলে উঠল, "মঙ্গলবার। কাউন্টেস-এর পার্টিতে আমরা যাচ্ছি। তুমি যাচ্ছ তো?" শেষের প্রশ্নটা আমাকে।

চোখ তুলে তাকালাম। সের্গেই আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বিদ্রূপশানিত। কণ্ঠস্বর অবিচল, কঠিন।

"হ্যাঁ," আমি জবাব দিলাম।

সন্ধ্যাবেলায় আমরা দুজনে যখন একলা হলাম তখন সে আমার কাছে এসে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে মৃদু স্বরে বলল, "তখন যা বলেছি সে সব কথা ভুলে যাও।"

হাতটা ধরলাম। চোখে জল এসে গেল। সে কিন্তু হাতটা টেনে নিল। দূরের একটা সোফায় গিয়ে বসল। বলল, "খবরটা মাকে লিখতে হবে; নইলে তিনি চিন্তা করবেন।"

"আমরা কবে যাব?" আমি জানতে চাইলাম।

"মঙ্গলবার, পার্টির পরে।"

"আশা করি সেটা আমার খাতিরে করছ না?"

সে আমার দিকে তাকাল; কোন জবাব দিল না। তার মুখটা হঠাৎ যেন কেমন বুড়োটে ও অপ্রীতিকর দেখাল।

একসঙ্গে পার্টিতে গেলাম। দুজনের সম্পর্কের উন্নতি ঘটেছে; তবু যেন আগের চাইতে অনেক আলাদা।

পার্টিতে বসে আছি, এমন সময় প্রিন্স এল। তার সঙ্গে কথা বলার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। হঠাৎ কেমন যেন লজ্জা পেলাম, বিব্রত বোধ করলাম। মুখ আর গলা লাল হয়ে উঠল। স্বামীর দিকে তাকালাম। দূর থেকে আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল সে।

নানা কথার মধ্যে প্রিন্স আমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে চাইল। দেখলাম,

হল-ঘরের এককোণে দুজনের দেখা হল। কথা হল। হয়তো আমাকে নিয়েই কোন কথা। আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল প্রিন্স। হঠাৎ আমার স্বামী লাল হয়ে উঠল। নীচু হয়ে মাথা নুইয়ে প্রিন্সের কাছ থেকে সরে গেল সে। আমার ভারি লজ্জা হল।

তার খুড়তুতো বোন আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিল। পথে নানা কথা হল। নিজেকে চেপে রাখতে পারলাম না। তার কথাও উঠল। এই পার্টিটা নিয়ে তার সঙ্গে আমার ঝগড়ার কথাটাও বলে ফেললাম। সে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, এটা অতি সাধারণ ব্যাপার, অচিরেই মিটে যাবে। আমার স্বামীর সম্পর্কে বলল, সে খুব দাম্ভিক আর অসামাজিক। আমিও তাতে সায় দিলাম।

কিন্তু যখন কেবল সে আর আমি থাকি তখন তার সম্পর্কে আমার এই ধারণাটা আমার বিবেকের উপর চেপে বসে। তখনই বুঝতে পারি, তার আর আমার মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

॥ আট ॥

সেদিন থেকে আমাদের জীবন, আমাদের দুজনের সম্পর্ক একেবারেই বদলে গেল। দুজন কাছাকাছি আছি, অথচ আগেকার প্রীতি আর নেই। আমাদের মধ্যে ব্যবধানটা যে কোথায় তাও বুঝতে পারছি, কিন্তু সেটার সম্মুখীন হতেই ভয় পাই। সে যে দাম্ভিক আর রাগী তাতে কোন সন্দেহ নেই, তাই সে বিষয়টা এড়িয়ে চলি। আবার সেও জানে, উঁচু সমাজকে বাদ দিয়ে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব, গ্রামের জীবনে আমার রুচি নেই; তাই আমার নীচু রুচির সঙ্গে মানিয়েই তাকে চলতে হবে। অতএব দুজন দুজনকে এড়িয়ে চলি, পরস্পরকে ভুল বিচার করি।

পিতার্সবুর্গ ছাড়ার আগেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তাই নিকলস্কয়েতে না গিয়ে শহরের বাইরে একটা বাড়ি ভাড়া করা হল। সেখান থেকে আমার স্বামী একাই মায়ের কাছে চলে গেল। আমি একাই রয়ে গেলাম।

সেই সময়টা বড় একা লাগত, জীবনটাকে ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হত। কিন্তু স্বামী যখন ফিরে এল তখন অবাক হলাম—তার ফিরে আসায় আমার জীবনে আগেকার মত কোন পরিবর্তন এল না। আমাদের সম্পর্কটা অলক্ষিতে এতই বদলে যেতে লাগল যে কেউই সেটা টেরও পেলাম না। দুজনের পৃথিবী একেবারে আলাদা হয়ে গেল, আলাদা আলাদা আগ্রহ দেখা দিল জীবনে, কিন্তু তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামালাম না।

ক্রমে অবস্থাটা দুজনের সয়ে গেল। বছর খানেকের মধ্যেই পরস্পরের দিকে অকুণ্ঠচিত্তে তাকাতে পারলাম। দু'জন আর একসঙ্গে প্রার্থনা করি না। দেখা-সাক্ষাৎও কমে গেল; প্রায়ই সে কাজে বেরিয়ে যায়। আমাকে একা রেখে যেতে ওর কোন দুঃখ হয় না, ভয়ও হয় না। আমিও আগের মতই উঁচু সমাজে চলাফেরা করি; সেখানে তাকে আমাকে কোন দরকার হয় না।

এখন আর দুজনের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি বা মন-কষাকষি হয় না। আমি তাকে খুশি করতে চেষ্টা করি, আর সেও আমার সব ইচ্ছা পূরণ করে। মনে হয়—দুজন দুজনকে ভালবাসি।

উঁচু সমাজের চাকচিক্য আর তোষামোদ আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল, ক্রমে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, সেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। সে সমাজ আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল, আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে বসল। ধরে নিলাম যে এটাই ঠিক, সারা জীবন আমাকে এইভাবেই কাটাতে হবে।

তিন বছর কেটে গেল। আমাদের সম্পর্কের কোন পরিবর্তন ঘটল না। যেন জমাট বেঁধে গেছে, সে সম্পর্ক আর খারাপও হতে পারে না, ভালও হতে পারে না।

এই তিন বছরে আমাদের সংসারে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল, কিন্তু তাতে আমার জীবনটা মোটেই বদলাল না। ঘটনা দুটি হল আমার প্রথম সন্তানের জন্ম আর তাতিয়ানা সেমিওভ্‌নার মৃত্যু।

মায়ের ভালবাসা প্রথমে আমাকে এত বেশী উচ্ছ্বসিত করে তুলল যে মনে হল বুঝি নতুন জীবন শুরু হবে। কিন্তু দু'মাসের মধ্যেই আবার উঁচু সমাজে যাতায়াত শুরু করলাম, মাতৃত্বের অনুভূতিটা ফিকে হয়ে এল; শেষে দাঁড়াল প্রাত্যহিক অভ্যাসে, নিছক কর্তব্য পালনে। ছেলে হবার পরে আমার স্বামী কিন্তু বদলে গেল। আগের মত শান্ত ও ঘরকুনো হয়ে পড়ল। ছেলেই হয়ে উঠল তার চোখের মণি।

মায়ের মৃত্যুতে সের্গেই খুব শোক পেয়েছিল। নিকলস্কয়েতে থাকা তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। আমার কিন্তু মা নেই বলে গ্রামের জীবন আরও সুখকর, আরও শান্তিপূর্ণ মনে হল। অবশ্য মার মৃত্যুতে আমার দুঃখ হয়েছিল, স্বামীর শোকে মায়াও হত। তবু তিন বছরের বেশীর ভাগ সময় শহরেই কাটল। একবার দু মাসের জন্য দেশে গিয়েছিলাম; তৃতীয় বছরে গেলাম বিদেশে।

একটা স্পা-তে গ্রীষ্মকালটা কাটালাম।

তখন আমার বয়স একুশ বছর। মনে হল, আমাদের অবস্থাটা খুবই ভাল। চেনা-পরিচিতরা সকলেই আমাকে ভালবাসে। শরীর সুস্থ হয়েছে। স্পা-তে আমার চাইতে ভাল সাজপোশাক কারুর নেই। নিজেকে খুবই উপভোগ করছিলাম। জীবনটা ভরে উঠল। বিবেক শান্ত হল। যা পেয়েছি তাই নিয়েই

আমি খুশি, আর কিছু চাই না আমার, আর কোন প্রত্যাশা নেই।

সেবার চোখে পড়ার মত কাউকে দেখলাম না সেখানে। আমাদের রাষ্ট্রদূত প্রবীণ প্রিন্স ক., সোনালী-চুল জনৈক ইংরেজ বা ছোট দাড়ি একজন ফরাসী—আমার কাছে সকলেই একরকম। শুধু জনৈক ইতালীয় জমিদার মার্কুইস দ. আমাকে কিছুটা আকর্ষণ করত। সে আমার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করত বেপরোয়াভাবে। ভদ্রলোকের বয়স কম, চেহারা ভাল, কিন্তু সব চাইতে বড় কথা হল তার হাসি আর কপাল আমাকে মনে করিয়ে দিত আমার স্বামীর কথা। দুজনের সাদৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যেতাম। তখন মনে হত, সে আমাকে গভীরভাবে ভালবাসে।

আমার স্বামী তখন দিন কয়েকের জন্য হাইডেলবার্গে গিয়েছে। মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে আসত। আমার চিকিৎসা শেষ হলেই রাশিয়াতে ফিরে যাবার অপেক্ষায় আছে।

একদিন সন্ধ্যায় একটা গানের আসরে গিয়ে শুনলাম, লেডি স. এসেছেন। অনেকদিন ধরেই এই নাম-করা সুন্দরীটির আসার অপেক্ষায় ছিলাম। তাকে দেখলাম। সত্যি রূপসী। তবে তার আত্মপ্রসাদের ভাবটা আমার ভাল লাগল না।

পরদিন দুর্গ-প্রাসাদে বেড়াতে যাবার আয়োজন করলেন লেডি স.। আমি গেলাম না। অথচ আমাকে একা রেখে অন্য প্রায় সকলেই চলে গেল তার সঙ্গে। পুরুষদের এই স্তাবকতা দেখে বিরক্ত হলাম। কান্না পেয়ে গেল। স্থির করলাম চিকিৎসা শেষ করে দেশে ফিরে যাব।

উঁচু সমাজে যাওয়া ছেড়ে দিলাম। মাঝে মাঝে সকালের দিকে যেতাম খনিজ জল খেতে। কখনও বা রুশ মহিলা ল. ম.-র সঙ্গে গাড়িতে চড়ে আশপাশের গ্রামে বেড়াতে যেতাম।

একদিন লেডি স. সকলকে নিয়ে শিকারে বের হলেন। দুপুরের পরে ল. ম. ও আমি গেলাম দুর্গ-প্রাসাদ দেখতে।

ধীরে ধীরে গাড়ি চলছে। রাস্তাটা এঁকে বেঁকে চলে গেছে বুড়ো বাদাম-গাছগুলির ভিতর দিয়ে। অস্তরবির আলো পড়েছে ছড়িয়ে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে মাঠঘাট চোখে পড়ছে।

নিজেদের পরিবার, ছেলেমেয়ে, আর এখানকার অতি সাধারণ জীবনযাত্রা নিয়ে গল্প করলাম দুজনে। দুজনেরই ইচ্ছা রাশিয়ায় ফিরে যাব; সেখানকার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াব। একটা মধু বিষণ্ণতায় মনটা ভরে গেল।

দুর্গ-প্রাসাদে ঢোকার পরেও সে ভাবটা রয়ে গেল। ভিতরটা ছায়া-ঢাকা, ঠাণ্ডা। উপরে ধ্বংসস্তূপের বুকে রোদের ঝিলিমিলি। সেখান থেকে আসছে পায়ের আর গলার শব্দ। কিছুক্ষণ ঘুরে দুজনে বিশ্রাম নিতে বসলাম। চোখ রইল দূরে অস্তসূর্যের দিকে।

উপরে গলার আওয়াজ স্পষ্টতর হল। কান পাতলাম। আমার চেনা

গলা—মার্কুইস দ. ও তার এক বন্ধু। আমাকে আর লেডি স.-কে নিয়ে কথা হচ্ছে। আমাদের নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা হচ্ছে। কোন রকম খারাপ কথা না বললেও কথাবার্তা শুনে আমার মুখ রাঙা হয়ে উঠল।

আর বেশী কিছু শোনা গেল না। ওরা অন্যদিকে চলে গেল। একটু পরেই পাশের একটা দরজা দিয়ে ওরা বেরিয়ে এল। আমাদের দেখে অবাক হয়ে গেল। মার্কুইস দ. আমার দিকে এগিয়ে আসতে আরও লাল হয়ে উঠলাম। আর দুর্গ-প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আমার হাত ধরাতে খুব খারাপ লাগল। কিন্তু বাধা দিতে পারলাম না। মার্কুইসের বন্ধু ও ল. ম.-র পিছন পিছন দুজন গাড়ির দিকে চললাম।

সেখানকার অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আর অপ্রত্যাশিতভাবে আমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় তার মনে মধুর আনন্দের উদয়—এমনি সব কথা বলছিলেন মার্কুইস। আমি তাতে কান দিলাম না। আমার তখন বারবার মনে হচ্ছিল স্বামীর কথা, ছেলের কথা, রাশিয়ার কথা। লজ্জা, অনুশোচনা, কিসের যেন প্রত্যাশা, তাড়াতাড়ি "হোটেল দ বাদেন"-এ ফিরে একা বসে সব কিছু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা—এমনি সব অনুভূতি মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। কিন্তু ল. ম. হাঁটছেন আস্তে আস্তে, গাড়িটাও বেশ দূরে, আর মার্কুইসও যেন আমাকে আটকে রাখতেই ইচ্ছা করে হাঁটছেন ধীর পায়ে। আরও জোরে পা চালাতেই তিনি আমাকে বাধা দিতে আরও জোরে চাপ দিলেন আমার হাতে। ল. ম. পথের একটা বাঁক ঘোরাতে আমরা দুজন দলছাড়া হয়ে পড়লাম। আমার ভয় করতে লাগল।

"মাপ করবেন," শক্ত গলায় কথাটা বলে হাতটা ছাড়িয়ে দিতে চাইলাম। কিন্তু আস্তিনের লেসটা আটকে গেল তার জামার বোতামে। তিনি আমার বুকের উপর ঝুঁকে সেটা খুলতে লাগলেন, তার দস্তানাবিহীন আঙুল আমার হাতটা স্পর্শ করল। একটা নতুন অনুভূতিতে আমার শিরদাঁড়ার ভিতরটা শিরশির করে উঠল। ফিরে তাকালাম তার দিকে। তার জ্বলন্ত দুটি চোখ তীব্র কামনায় তাকিয়ে আমার গলা, আমার বুকের দিকে; তার দুটো হাত খেলা করছে আমার দুই বাহুতে। ঠোঁট ফাঁক করে বললেন তিনি আমাকে ভালবাসেন, আমি তার সর্বস্ব। তার ঠোঁট দুটো আরও কাছে এগিয়ে এল, গরম হাতে আরও জোরে চেপে ধরলেন আমার হাত। আমার সমস্ত শরীরে অগ্নিস্রোত বয়ে গেল; সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল। থরথর করে কেঁপে উঠলাম। বাধা দেবার চেষ্টায় কি যেন বলতে চাইলাম, কিন্তু কথাগুলি গলায় আটকে গেল।

একসময় তার ঠোঁট দুখানি স্পর্শ করল আমার গাল। কাঁপতে কাঁপতে চোখ তুলে তাকালাম। নড়াচড়ার বা কথা বলার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেললাম। তীব্র ভয়ে কিসের যেন প্রতীক্ষা। ভয়ংকর একটি মুহূর্ত। সেই

মুহূর্তে তাকে দেখলাম অন্য চোখে। তার মুখটা আমার এত চেনা। আমার স্বামীর সঙ্গে এত মিল: টুপির কিনারার নীচু কপাল অবিকল তার মত। খাড়া নাক, মোমে-মাজা লম্বা গোঁফ, কামানো মসৃণ গাল, তামাটে গলা। তার প্রতি ঘৃণা হল, ভয় হল; তবু সেই ভিন্ন প্রকৃতির লোকটিকে দেখে বুকের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল কী প্রচণ্ড কামনা! তার মোটা অথচ সুন্দর ঠোঁটের চুম্বনে, আংটি-পরা নীল শিরাবহুল হাতের আলিঙ্গনে নিজেকে সঁপে দেবার কী অদম্য কামনা জাগল মনে। নিষিদ্ধ আনন্দের পংকিল নর্দমায় ঝাঁপ দেবার সে কী তীব্র উন্মাদনা।

মনে হল, "আমি তো ভাগ্যহীনা; আরও দুর্বিপাকে জড়িয়ে পড়লে ক্ষতি কী।"

এক হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে মুখ নীচু করলেন মার্কুইস। মনে মনে বলল, "আরও লজ্জা, আরও পাপ যদি ভেঙে পড়ে আমার মাথায় তো পড়ুক না।"

ফরাসী ভাষায় সে ফিসফিসিয়ে বলল, "আমি আপনাকে ভালবাসি।" গলাটা অবিকল আমার স্বামীর। বহুকাল আগে চেনা স্বামী আর সন্তানের কথা মনে পড়ল; তাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক যেন ছিন্ন হয়ে গেল।

হঠাৎ রাস্তার বাঁক থেকে ল. 'ম'-র ডাক কানে এল। নিজেকে ফিরে পেলাম যেন। হাতটাকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেলাম। মার্কুইসের দিকে ফিরেও তাকালাম না।

গাড়ির ভিতর ঢুকে একবার ফিরে তাকালাম। মার্কুইস টুপি খুলে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে হাসি; কি যেন বলছেন। তার প্রতি একটা তীব্র বিতৃষ্ণা জাগল মনে। নিজেকে বড়ই অসুখী মনে হতে লাগল। ভবিষ্যতের কোন আশা নেই। অতীতও অন্ধকারে ঢাকা। গলার যেখানটায় মার্কইস চুমো খেয়েছিলেন লজ্জায় সেখানটায় জ্বালা ধরেছে। স্বামী ও সন্তানের চিন্তাও অসহ্য মনে হচ্ছে।

বাড়ি ফিরে একলা থাকতে ভয় করতে লাগল। চা দিয়েছিল; সেটা শেষ না করেই ভীষণ তাড়াহুড়া করে বাঁধা-ছাঁদা শুরু করে দিলাম। সন্ধ্যার ট্রেনেই হাইডেলবার্গে স্বামীর কাছে চলে যাব।

পরিচারিকার সঙ্গে ট্রেনে উঠলাম। কামরাটা ফাঁকা। ট্রেন ছাড়ল। জানালা দিয়ে তাজা হাওয়ার ঝলক এল। নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে বসলাম।

আমাকে দেখেই স্বামী বলে উঠল, "কী করে জানলে বল তো? বসে বসে ভাবছিলাম কালই তোমার কাছে চলে যাব।" তারপর আমার দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলল, "কি হয়েছে তোমার?"

"কিছু হয় নি।" চোখের জল চেপে কোনরকমে বললাম। "আমি

একেবারেই চলে এসেছি। কালই রওনা হতে চাই। এবার ঘরে ফেরা যাক।"

অনেকক্ষণ সে চুপ করে রইল। আমাকে দেখল মনোযোগ দিয়ে। আর একবার বলল, "কিন্তু কি হয়েছে বল তো?"

আপনা থেকেই লাল হয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম। ছলনা করে বললাম, "হবে আবার কি? বড়ই একঘেয়ে আর খারাপ লাগছিল। আমাদের জীবনের কথা, তোমার কথা অনেক ভেবেছি। তোমার কাছে আমার অপরাধের শেষ নেই।" চোখে জল এল। তবু আবার বললাম, "চল গ্রামে ফিরে যাই বরাবরের মত।"

স্বামী কঠিন গলায় বলল, "এত বেশী আবেগপ্রবণ হবার দরকার নেই। হাতে টাকা-পয়সা বেশী নেই; তাই গ্রামে ফিরে যেতে চাও শুনে খুব ভালই লাগছে। কিন্তু সেখানে বরাবর থাকা সেটা তো স্বপ্নমাত্র। আমি জানি যে সেখানে তুমি বেশীদিন থাকতে পারবে না। থাক এসব কথা। এখন চা খাওয়া যাক—সেটাই সব চাইতে ভাল।' চাকরকে ডাকার জন্য সে উঠে দাঁড়াল। এ অবস্থায় সে আমার সম্পর্কে কি ভাবতে পারে কল্পনা করতে লাগলাম। তার চোখের সলজ্জ চাউনি দেখেই ভীষণ অপমানিত বোধ করলাম। না, সে আমাকে বোঝে না, বুঝতে চায় না।" খোকাকে দেখে আসি" বলে তার কাছ থেকে চলে এলাম। আমি একা থাকতে চাই—কাঁদতে চাই, শুধু কাঁদতে—

॥ নয় ॥

নিকলস্কয়ের ফাঁকা বাড়িটায় মানুষ ফিরে এল আবার, কিন্তু তার সেই জীবন আর ফিরল না। মা তো অনেকদিনই নেই, আমরা দুজন একলা; নিঃসঙ্গতা যেন চেপে বসল আমাদের উপর।

শীতটা খারাপভাবে কাটল। আমি অসুস্থ হলাম। শরীর সারল দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর। শহরে আমাদের জীবন একরকম কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু এখানে গ্রামের বাড়িতে মেঝের তক্তাগুলি, ঘরের সব দেয়াল, প্রতিটি ডিভান মনে করিয়ে দিত এককালে স্বামী আমার কতখানি ছিল আর কী আমি হারিয়েছি। দুজনের মধ্যে অন্যায় রচনা করেছে একটা ব্যবধান। সে অন্যায়ের মার্জনা মেলেনি। কোন কারণে সে আমাকে শাস্তি দিচ্ছে অথচ এমন ভান করছে যেন সে বিষয়ে কিছুই জানে না। তার কাছে ক্ষমা চাইবার তো কিছু নেই। আমার কাছে নিজেকে আর আগের মত উজাড় করে দেয় না সে—সেটাই আমার শাস্তি।

বসন্তকাল এল। গ্রীষ্মটা কাটাবার জন্য সোনিয়া ও কাতিয়া এসে হাজির হল। নিকলস্কয়ের বাড়িটা মেরামত করতে হবে। তাই আমরা পক্রভ্‌স্কয়েতে গিয়ে উঠলাম। আগেকার সেই পুরনো বাড়ি। সেই বারান্দা, ড্রয়িং-রুমে লম্বা টেবিল আর পিয়ানো। আমার সেই পুরনো ঘর। দুটো ছোট খাট। একটা আমার পুরনো খাট, তাতে শুয়ে থাকে ককোশা। আর একটা ছোট খাটে কাপড়ের পুটুলির ভিতর থেকে উঁকি দেয় ছোট্ট ভানিয়া। তাদের উপর ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াই। পুরনো দিনের সব স্বপ্ন যেন দেয়াল আর পর্দা থেকে বেরিয়ে ভিড় করে দাঁড়ায়। শুনতে পাই কৈশোরের সেই সব গান। কোথায় গেল আমার সেই সব স্বপ্ন? আমার মধুর নামগুলির কি হল? পড়ে আছে কেবল কঠিন নিরানন্দ জীবন। জানালা দিয়ে চোখে পড়ে সেই বাগান, সেই পথ, সেই বেঞ্চি, পুকুরের ধারে ডালে বসে নাইটিঙ্গেল পাখির সেই গান, লাইলাক ফুলের সেই বাহার, আর বাড়ির উপরে আকাশে সেই চাঁদ—সবই আছে আগেকার মত। অথচ সব কিছুই কতনা বদলে গেছে। যা ছিল এত নিকট আর প্রিয় সব কিছুই আজ কত উদাসীন, কত দূরের।

আগেকার মতই বৈঠকখানায় বসে কাতিয়াকে স্বামীর কথা বলি। কিন্তু কাতিয়ার মুখ বলীরেখায় আকীর্ণ, চোখে নেই আশা ও আনন্দের সেই দীপ্তি, আগেকার মত স্বামীকে নিয়ে আমরা আর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি না, আমরা তার বিচার করি। কিন্তু সে তো আগেকার মতই আছে; কেবল কপালের রেখাগুলি আরও গভীর হয়েছে, চুলে আরও পাক ধরেছে, তার দৃষ্টিটাও কেমন যেন ঝাপসা মনে হয়। আমিও তো আগেকার মতই আছি, অথচ অন্তরে ভালবাসা নেই, ভালবাসার বাসনাও নেই।

সেন্ট পিতার্সবুর্গে যাবার পরে গানবাজনা ছেড়েই দিয়েছিলাম; কিন্তু পুরনো পিয়ানোটা, পুরনো সঙ্গীতগুলো আবার আমাকে টানতে লাগল।

শরীর ভাল না থাকায় একদিন বাড়িতে একলাই ছিলাম। কাতিয়া ও সোনিয়া গেছে নিকলস্কয়েতে সের্গেই্র সঙ্গে।

টেবিলে চা দেওয়া হল। নীচে গিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। একসময় পিয়ানোর পাশে গিয়ে বসলাম। বীঠোফেনের সোনা-টাটা খুলে বাজাতে শুরু করলাম। দেখার কেউ নেই, শোনার কেউ নেই। বিষণ্ণ গম্ভীর আওয়াজে ঘর ভরে গেল।

জানালা দিয়ে সূর্যাস্তের আলোয় চোখ পড়ল লাইলাক ফুলের একটা ঝোপ; সন্ধ্যার একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঘরে ঢুকল। পিয়ানোতে কনুই রেখে হাতে মুখ ঢেকে ভাবতে লাগলাম সেই অতীতের কথা যা আর কোনদিন ফিরে আসবে না। মনে মনে বললাম, "হে ঈশ্বর, দোষ যদি করে থাকি তাহলে ক্ষমা কর, ফিরিয়ে দাও আমার অন্তরের সেই সুন্দর অনু-ভূতিগুলোকে। না হয় তো বলে দাও কী করতে হবে, কেমন করে বাঁচতে

হবে।"

বাজনা শেষ হল। পিছনে পায়ের শব্দ শুনলাম। কে যেন আমার কাঁধে হাত রাখল।

"কী সুন্দর বাজালে সোনাটাটা," আমার স্বামী বলল।

জবাব দিলাম না।

"চা খাও নি?"

তার দিকে না তাকিয়েই মাথা নাড়লাম।

স্বামী বলল, "ওরা এখুনি এসে পড়বে। ঘোড়াটা এত ছটফট করছিল যে গাড়ি থেকে নেমে ওরা সোজা পথে হেঁটে আসছে।"

"তাহলে ওদের জন্য অপেক্ষা করি," বলে বারান্দায় চলে গেলাম। আশা করেছিলাম স্বামীও আমাকে অনুসরণ করবে। কিন্তু সে বাচ্চাদের কাছেই রয়ে গেল।

তার উপস্থিতি, তার সদয় কণ্ঠস্বর আমাকে জানিয়ে দিল—সব হারিয়েছি ভাবাটা আমার ভুল হয়েছে। আর কি চাইবার থাকতে পারে? সে তো স্বামী হিসাবে ভাল, পিতা হিসাবে যোগ্য। আর কি চাই আমার? নিজেই তা জানি না।

বারান্দায় গিয়ে বেঞ্চিতে বসলাম। এই বেঞ্চিতে বসেই প্রথম আমাদের প্রেমের আদান-প্রদান হয়েছিল। সূর্য অস্ত গেছে। অন্ধকার নেমেছে। বাড়ি আর বাগানের উপর বসন্তের কালো মেঘ। কেবল গাছের মাথায় সূর্যাস্তের মুমূর্ষু আলো। দূরে তারকাখচিত একখণ্ড পরিষ্কার আকাশ।

নীচে নেমে এসে সের্গেই আমার পাশে বসল।

ক্রমে হাওয়া পড়ে গেল। আকাশে মেঘ দেখা দিল। একফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। পথের কাঁকরে আর এক ফোঁটা। ঝোপের চওড়া পাতায় কয়েকটা ফোঁটার শব্দ। তার পর শুরু হল অঝোর ধারায় বৃষ্টি।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল নাইটিঙ্গেল আর ব্যাঙের ডাক।

ভিতরে যাবার জন্য সের্গেই উঠে দাঁড়াল।

বাধা দিয়ে বললাম, "কোথায় যাচ্ছ? এ জায়গাটা বেশ সুন্দর।"

স্বামী বলল, "ওদের জন্য ছাতা আর রবারের জুতো পাঠিয়ে দিতে হবে।"

"তার দরকার হবে না। বৃষ্টি এখনি থেমে যাবে।"

বারান্দায় রেলিং-এর পাশে দুজন দাঁড়িয়ে রইলাম।

রেলিং-এ ভর দিয়ে আমি মাথাটা বাড়িয়ে দিলাম। বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল চুলে, গলায়।

ভিজে চুলে হাত বুলিয়ে সে বলল, "কী চমৎকার!"

আদরের কথাটা কিন্তু আমার কাছে তিরস্কারের মত লাগল। আমার কান্না পেল।

সে উচ্ছ্বসিত গলায় আবার বলল, "মানুষের আর কি চাই? এখন আমার তৃপ্তির সীমা নেই। আর কিছু চাই না। আমি সম্পূর্ণ সুখী।"

মনের কথা যাই হোক, তার কথার জবাবে আমি বললাম, "আমিও ভাল আছি। কিন্তু সবকিছু এত ভাল বলেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। আমার ভিতরে সবকিছু এত গোলমেলে, এত খাপছাড়া যে কী বলব। তোমার এরকম মনে হয় না?"

হাতটা সরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ সে চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, "হ্যাঁ, এককালে, বিশেষ করে বসন্তকালে, এ রকমটা হত। রাত্তিরে ঘুম আসত না, কিসের আশায় যেন জেগে থাকতাম। এখন আমার যা আছে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট, তৃপ্ত।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "আর কিছুই চাই না তোমার?"

আমার মনোভাবটা বুঝতে পেরে সে উত্তর দিল, "অসম্ভব কিছু চাই না।"

আবার প্রশ্ন করলাম, "অতীতের কোন কাজের জন্য তোমার অনুশোচনা হয় না?"

সে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, "না।"

"তোমার ইচ্ছা হয় না সে দিন আবার ফিরে আসুক?"

বাগানের দিকে চোখ রেখে সে বলল, "সে ইচ্ছা নেই, যেমন নেই পাখা গজাবার ইচ্ছা। সেটা হবার নয়।"

"অতীত সম্বন্ধে তোমার কোন অভিযোগ নেই? নিজেকে বা আমাকে দোষ দাও না?"

"কখনও না। যা কিছু হয়েছে ভালর জন্যই হয়েছে।"

এবার তার হাতটা ছুঁয়ে বললাম, "শোন। আমি তোমার ইচ্ছামত চলি সেটাই যে তুমি চাও সে কথা কখনও আমাকে বল নি কেন? কেন আমাকে এত স্বাধীনতা দিয়েছিলে? তুমি যদি চাইতে, যদি আমাকে পথ দেখাতে তাহলে তো কিছুই ঘটত না।"

বিরক্তি আর ভর্ৎসনায় আমার কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠল।

সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, "কী ঘটত না? কিছু তো ঘটে নি। সব কিছুই তো ভাল, খুব ভাল।" সে শেষ করল।

সত্যি কি আমার কথা সে বুঝতে পারছে না? আমার চোখে জল এসে গেল। বলে উঠলাম, "তাহলে তোমার এই উদাসীনতা ও অবজ্ঞার শাস্তি আমাকে বইতে হত না। আমি নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও যা কিছু আমার প্রিয় তা যে তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছ সেটা ঘটত না।"

"কী বলছ তুমি সোনা?"

"আমাকে বাধা দিও না। আমাকে বলতে দাও। আমার উপর থেকে তোমার বিশ্বাস, তোমার ভালবাসা, এমন কি তোমার শ্রদ্ধা পর্যন্ত সরিয়ে নিয়েছ।

যা ঘটেছে তারপর আমি বিশ্বাস করি না যে তুমি আমাকে ভালবাস।"

সে কিছু বলার চেষ্টা করতেই বাধা দিয়ে বললাম, "দাঁড়াও। সবকিছু খুলে বলতে দাও আমাকে।...জীবনটা যে কী তা আমার জানা ছিল না। সেটা জানার জন্য তুমি যে আমাকে একলা ছেড়ে দিলে সেটা কি আমার দোষ? প্রায় এক বছর ধরে তোমার কাছে ফিরে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করছি আর তুমি বারবার আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছ, সেটাও কি আমার দোষ?"

অবাক গলায় সের্গেই এবার জানতে চাইল, কি থেকে এটা তোমার মনে হল?"

"তুমিই তো কাল বললে যে এখানে আমি কোনমতেই টিকে থাকতে পারব না। শীতকালে আমাদের সেই সেন্ট পিতার্সবুর্গে ফিরে যেতে হবে যে শহরকে আমি ঘেন্না করি। সাহায্য করা দূরে থাক মন খুলে কখনও আমাকে কিছু বল না, তোমার মুখ থেকে একটাও মনের কথা কখনও শুনতে পাই না। অথচ পরে আমি যখন গোল্লায় যাব তখন তুমিই আমাকে দোষ দেবে, আমি গোল্লায় গেছি বলে খুশি হবে।"

"দাঁড়াও!" সের্গেই হুংকার দিয়ে বলল। "এখন যা বলছ সেটা ভাল কথা নয়। এতে শুধু প্রমাণ হয় আমার প্রতি তুমি বিরূপ, আমাকে তুমি—"

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, "তোমাকে ভালবাসি না, এই তো? বল, বল!" বলতে বলতে আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম। বেঞ্চিতে বসে মুখ ঢাকলাম রুমালে।

সে আবার বলল, "জানি না কেন তুমি আমাকে দোষ দিচ্ছ। আগেকার মত করে তোমাকে ভালবাসি না বলেই হয় তো।"

"আগেকার মত!" রুমাল-ঢাকা মুখে আমি বললাম। তপ্ত অশ্রুজলে দুই চোখ ভরে গেল।

সে বলল, "তাহলে দোষ দিতে হয় সময়কে আর নিজেদের। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভালবাসার চেহারাও ভিন্ন ভিন্ন হয়। খোলাখুলি কথাই যদি শুনতে চাও তাহলে সত্যি কথাটাই বলি, যে বছর তোমাকে প্রথম চিনলাম সে বছর তোমার কথা ভেবে, তোমার ভালবাসার স্বপ্ন দেখে অনেক রাত আমি ঘুমোই নি। নিজের ভালবাসাকে নিজেই সৃষ্টি করেছি। বুকের মধ্যে সে ভালবাসা ক্রমে ক্রমে বেড়েছে। আর পিতার্সবুর্গে ও বিদেশে যে ভালবাসা আমাকে যন্ত্রণা দিয়েছে তাকে ভেঙেচুড়ে শেষ করে অনেক বিনিদ্র রাত কাটিয়েছি। ভালবাসা শেষ হয় নি, কিন্তু যা আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল তাকে শেষ করেছি। মনে শান্তি ফিরে এল। এখনও আমি তোমাকে ভালবাসি, তবে সে ভালবাসা অন্য ধরনের।"

অস্ফুটস্বরে বললাম, "তুমি সেটাকে ভালবাসা বলতে পার, কিন্তু আসলে সেটা যন্ত্রণা। উঁচু সমাজকে তুমি যদি এতই খারাপ মনে কর যে সেজন্য আমাকে ভালবাসাই ছেড়ে দিলে, তাহলে সে সমাজে আমাকে থাকতে দিলে কেন?

কেন আমার উপর জোর করলে না? কেন আমাকে মেরে ফেললে না? আমার সমস্ত সুখ থেকে আমাকে বঞ্চিত করার চাইতে সেটাই তো ভাল হত। তাহলে আমার মনে তৃপ্তি থাকত, লজ্জার কোন কারণ থাকত না।"

মুখ ঢেকে আবার কাঁদতে শুরু করলাম।

কাতিয়া আর সোনিয়া বাড়ি ফিরে বারান্দায় ঢুকল। বৃষ্টিতে ভিজে ভারি খুশি। কিন্তু আমাদের দেখে কোন কথা না বলেই ওরা চলে গেল।

আবার দুজনই নীরব। অনেকক্ষণ কেঁদে মনটা হাল্কা হল। স্বামীর দিকে তাকালাম। দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে বসে আছে। কি একটা বলতে গিয়েও বলল না। যেমন ছিল তেমনি বসে রইল।

তার কাছে গিয়ে হাতটা ধরলাম। আমার দিকে তাকাল। মুখে চিন্তার ছাপ। ধীরে ধীরে বলল, সত্যিকারের জীবনে ফিরে আসার জন্য সবাইকে, বিশেষ করে মেয়েদের অনেক তুচ্ছতার ভিতর দিয়ে যেতে। সেই তুচ্ছতার কোন অভিজ্ঞতা তোমার ছিল না। তাই তোমাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম তার মধ্যে মনে হয়েছিল, তোমাকে আটকাবার কোন অধিকার আমার নেই।

আমি শুধালাম, "তুমি তো আমাকে ভালবাসতে, তাহলে কেন এমনটা করলে?"

"কারণ আমি চাইলেও তখন তুমি আমার কথা মেনে নিতে না। নিজের চোখে সব কিছু দেখার দরকার ছিল তোমার। আজ সেটা দেখেছ।"

আবার চুপচাপ।

আমি বললাম, "তোমার চলায় মাপ ছিল বড় বেশী, ভালবাসা ছিল কম।"

হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে লাগল। একসময় বলল, "নিষ্ঠুর হলেও তোমার কথাটা সত্যি। দোষ আমার। উচিত ছিল তোমাকে না ভালবাসা, অথবা সহজভাবে ভালবাসা।"

আবেগের সঙ্গে বললাম, "সে সবকিছু আমি ভুলে যাব।"

"না। যা হয়ে গেছে তাকে আর ঠিক করা যায় না।" তার গলাটা কোমল শোনাল।

সে আমার হাতটা ধরে চাপ দিল। ধীরে ধীরে বলতে লাগল, "অতীত নিয়ে কোন অনুশোচনা নেই এ-কথাটা সত্যি বলি নি। অনুশোচনা হয় বৈকি; সেদিনের সেই ভালবাসার জন্য দুঃখ হয়। কিন্তু কার দোষে এটা হল বুঝতে পারি না। ভালবাসা আজও আছে, কিন্তু এ আর এক ভালবাসা। তাতে না আছে জোর, না আছে সরসতা। শুধু স্মৃতি আর কৃতজ্ঞতা—"

বাধা দিয়ে বললাম, "এমন কথা বলো না। আগেকার সবকিছু আবার ফিরে আসবে। তা কি হতে পারে না?"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম যা বললাম সেটা অসম্ভব। স্বামীও হেসে উঠল। শান্ত, উদার হাসি। মনে হল, যেন বৃদ্ধের হাসি। মুখে বলল, "তোমার বয়স কম, কিন্তু আমার তো অনেক বয়স হয়েছে। তুমি যা চাইছ সেটা আর আমার মধ্যে নেই। নিজেকে ঠকিয়ে কি লাভ বল?"

কোন কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সে বলতে লাগল, "যা চলে গেছে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা বৃথা। কোন মিথ্যের বালাই রাখব না নিজেদের মধ্যে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে চাইবার মত, উত্তেজিত হবার মত কিছুই আমাদের নেই। সুখের ভাগ তো অনেক পেয়েছি। এখন সরে দাঁড়িয়ে ওকে পথ ছাড়ার সময় হয়েছে।"

আয়া এসেছিল ভাসিয়াকে কোলে নিয়ে। তাকে দেখিয়ে শেষের কথাটা বলে সের্গেই একটু ঝুঁকে চুমো খেল আমার মাথায়। মনে হল, চুম্বনটা প্রেমিকের নয়, পুরনো বন্ধুর।

সহসা বুঝি বাগান থেকে ভেসে এল মধুরতর গন্ধ। তারার আলো আরও দীপ্ত হয়ে উঠল। তার দিকে চোখ তুলে তাকালাম। মনটা অনেক হাল্কা হয়ে গেল। কপালের দপ্‌দপে শিরাটা বুঝি সরে গেছে। ভাল করে অনুভব করলাম, আগেকার অনুভূতি একেবারেই চলে গেছে। তাকে আবার ফিরিয়ে আনা শুধু যে অসম্ভব তাই নয়, সে চেষ্টাই হবে যন্ত্রণাময়। সে সব দিন কি সত্যি এত অপরূপ ছিল? কি জানি। আজ তো সে সময়টা দূরে, বহুদূরে সরে গেছে।

সে বলল, "চায়ের কথাটা কিন্তু ভুলেই গেছি।"

দুজনে বৈঠকখানায় গেলাম। দোরগোড়ায় আয়ার সঙ্গে দেখা হল আবার। তার কোলে ভাসিয়া। তাকে কোলে নিয়ে রাঙা পা দু'খানি ঢেকে দিয়ে চেপে ধরে আলতো করে চুমো খেলাম। দুই চোখ মেলে সে আমার দিকে তাকাল; ফুটে উঠল চেনার ঝলকানি। হাসিতে ফাঁক হয়ে গেল দু'খানি ঠোঁট। ও তো একান্তভাবে আমার। ভাবতেই সুখের জোয়ার বইল বুকে। দুই হাতে চেপে ধরলাম সোনামণিকে। চুমো খেলাম ওর ঠাণ্ডা পায়ে, পেটে আর হাতে। পশমে ঢাকা ছোট্ট মাথায়। স্বামী এগিয়ে এল কাছে। ভাসিয়ার মুখটা চট করে ঢেকে দিয়ে আবার খুলে দিলাম।

স্বামী ডাকল, "ইভান সের্গেইচ!" আঙুল বাড়িয়ে ওর চিবুকটা স্পর্শ করল। তাড়াতাড়ি আমি আবার তাকে ঢেকে দিলাম। আমি ছাড়া আর কেউ ওর দিকে বেশীক্ষণ তাকাক তা আমি চাইনা।

স্বামীর দিকে তাকালাম। তার চোখ হাসিতে ঝিলমিল করছে। অনেকদিন পরে এই প্রথম তার চোখে চোখ রেখে মনটা হাল্কা আর খুশি হয়ে উঠল।

সেদিন থেকেই স্বামীর সঙ্গে আমার রোমান্সের পর্ব শেষ হল। যা আর ফিরে আসবে না কোনদিন, তার প্রিয় স্মৃতির মতই রয়ে গেল আমার পুরনো ভালবাসা। কিন্তু ছেলেদের এবং তাদের বাপের প্রতি ভালবাসার একটা নতুন অনুভূতির ভিতর দিয়ে অন্য একটি জীবনের সূচনা হল। সে সুখী জীবন সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। সে জীবন আজও শেষ হয় নি।

॥ শেষ ॥